তপোভূমি নর্মদা

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রকাশক
শ্রী আনন্দমোহন ঘোষাল
৪১, দানেশ শেখ লেন
হাওড়া-৭১১১০৯

প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ১৯৬০

প্রাপ্তিস্থান ঃ

(২) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৬০
(৩) নাথ ব্রাদার্স
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩
(৪) দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
গিরি প্রিন্ট সার্ভিস
৯১-এ, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা- ৭০০ ০০৯

≈ গ্রন্থ-সূচী ≈

মহাদেব – শুকদেবেশ্বর মন্দিরে স্থিতি – মহাত্মা নাগাবাবার দর্শনলাভ – Atomএর ব্যাখ্যা – কর্ণেশ্বর রণছোড়জীর মন্দির – শুকেশ্বর মন্দিরে যজ্ঞ দর্শন – নাঙ্গাবাবার সূর্য হতে উৎপত্তি বিষয়ে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা – বাসুকীর তপস্যাস্থল নাগেশ্বর মহাদেব দর্শন – নলের তপস্যাক্ষেত্র পুতিকেশ্বর মহাদেবের মন্দির – নাঙ্গাবাবা প্রদত্ত পাতার রসে ক্ষতের উপশম – কটোরাতে হনুমন্তেশ্বর শিব দর্শন – ভোলানন্দ তীর্থের কথা – জীগোর থেকে বাঁদরিয়ার পথে যাত্রা – মুদ্গল ঋষির তপস্যাক্ষেত্র ভীমেশ্বর দর্শন ও অলৌকিক অনুভূতি – নাঙ্গাবাবার প্রাণতত্ত্ব আলোচনা – সহরাব গ্রামে কেদারনাথ দর্শন – ব্যাসের জন্মস্থান – গোপারেশ্বর তীর্থ – মঙ্গলেশ্বর তীর্থ – বৃহস্পতি ও শনিগ্রহের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আলোচনা – সহস্রার্জুনের তপস্যাক্ষেত্র অর্জুনেশ্বর মন্দিরে এক শুক্লবসনা যোগীশ্বরীর দুগ্ধদান (নর্মদার আবির্ভাব !) – ভীমেশ্বর, ধর্মেশ্বর, লুন্কেশ্বর, ধনেশ্বর, জটেশ্বর শিব দর্শন – স্বপ্নে মা নর্মদার দর্শনলাভ – রঞ্জন বাউলের সুমধুর গান – মুণ্ডেশ্বর শিব – মাতৃতীর্থ – নর্মদা তীর্থ – রবীশ্বর তীর্থ – আনন্দেশ্বর তীর্থ – বৈদ্যনাথ শিব – ইন্দ্রবাণী গ্রামে স্থিতি – পিপরিয়া (শূলপাণির ঝাড়ি আরম্ভ) – পিপ্পলাদ আশ্রম – প্রাণের উৎপত্তি রহস্য নিয়ে নাঙ্গাবাবার বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা – ষটচক্র এবং কুণ্ডলিনী তত্ত্ব – তারকজ্ঞান – গোরাঘাট হয়ে উলূক তীর্থ – নাগাবাবার জন্য শূলপাণির ঝাড়িতে অজগর সাপের হাত হতে রক্ষা – মত্ত হস্তীর দল – হাতীর জান্তব প্রবৃত্তি – উলূক তীর্থ হতে মোক্কড়ী গঙ্গা – জলপ্রপাত – হস্তিনীর সন্তান প্রসব – শূলপাণির ঝাড়ির ভয়াবহতা – যোগেশ্বর নাঙ্গাবাবার ব্যাঘ্র ও হায়না বিতাড়ন – ভৃগু পর্বতের কাছে দেবগঙ্গা ও নর্মদার সঙ্গমস্থলে শূলপাণীশ্বর মহাদেব দর্শন – পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা – ভৃগু তুঙ্গ পর্বতে চিত্রসেন, কাশীরাজ, মার্কণ্ডেয় দীর্ঘতমা প্রভৃতির কথা, রুদ্রকুণ্ডের কথা – চক্রতীর্থের কথা – মহর্ষি জৈগীষব্যের কথা – কথা প্রসঙ্গে নাঙ্গা মহাত্মার মহাভারতের গুহ্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা, গায়ত্রী মন্ত্রের ভর্গদেবতার তত্ত্ব-বিচার – বেদমন্ত্র ব্যাখ্যা – শূলপাণীশ্বর মন্দিরে 'একটি মজার খেলা' দেখাবার অজুহাতে নাঙ্গাবাবার নির্বিকল্প সমাধিলাভ – দেহরক্ষা – বৈদিক আচারে তাঁর দেহের অগ্নিসংস্কার – শূলভেদ তীর্থের সর্বশ্রেষ্ঠ শূলপাণীশ্বর তীর্থ – তার রহস্য উদঘাটন – সজ্ঞানে দেহরক্ষা প্রসঙ্গে কামরূপ মঠের মণীষ্যানন্দ ও ভাবানন্দ তীর্থের কথা – কঠিনতম ঝাড়ি সির্দূরী সঙ্গম ও ডেহরী সঙ্গম অতিক্রম – কুট, ভূর্জ ও চীর গাছের জঙ্গল – ভূর্জগাছের তলায় মার্কণ্ডেয়ের অপূর্ব মূর্তি – গুহায় অবস্থান – ঘোড়ার মুখোস পরা লোকের আবির্ভাব – ভয় – বানর জাতীয় ব্রাহ্মণের কথা – কামা-কামাচী দর্শন – ঐ পাহাড়ী দেবতার পূজা – তাদের ইতিবৃত্ত – ডেহরী পাহাড়ের তলদেশে নর্মদার জলে শালগ্রাম শিলা – বাঘের মুখে বাসবানন্দজী ও তুরীয় চৈতন্যের মৃত্যু – সদ্-গুরুর শক্তি বর্ণনা – উত্তুঙ্গ পাহাড়ে আরোহণ – কালো চিতার আক্রমণ – মহাত্মা সোমানন্দজীর আবির্ভাব ও রক্ষা – মাতাপিতার মহিমা বর্ণনা – ডহর মুনির আশ্রম – তাঁর প্রসঙ্গ আলোচনা – রঞ্জনের অপূর্ব বাউল গান – সোমানন্দজীর মাতৃপিতৃভক্তি সম্বন্ধে দৈববাণী – মাতাপিতার কথা – হিরন্ময়ানন্দজীর ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গ ত্যাগ – মহাত্মা ভোলানন্দ তীর্থের কথা – হিরন্ময়ানন্দজীর জন্য হরানন্দজীর বেদনা – ডহরাশ্রমের চারিদিকে অপার প্রাকৃতিক

সৌন্দর্য্য – অলৌকিক ভাবে ভহরাশ্রমে দুগ্ধ-প্রাপ্তি – মহর্ষি সোমানন্দের মহাদেবের তত্ত্ব আলোচনা – নেপথ্য হতে সোমানন্দজীর উত্তর দান – ভয়ঙ্কর পথ পরিক্রমা – বরুণের মহিমা – দমখেড়াতে ওয়াঙ্কিদের পল্লীতে রাত্রিবাস – ভূচেগাঁও, উদী নদীর বর্ণনা – কামরূপ মঠের চারজন অসুস্থ সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা – তাদের মুখে হিরন্ময়ানন্দজী সহ অন্যান্য সাধুদের শোচনীয় পরিণতির কথা শ্রবণ – অশ্বত্থামার কথা – অশ্বত্থামার পদ-চিহ্ন ও গুহা দর্শন – সাদরী মহল্লা – ভীল্লেশ্বর শিব ও ভীল সর্দারের কাহিনী – স্বপ্নে বাবার দ্বারা বিদগ্ধমুখমণ্ডনমের হেঁয়ালি শ্লোকের ব্যাখ্যা – ভীল্লেশ্বর দর্শনের পথে সূর্য বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে সবিতা, অশ্বিদ্বয়, উষার তত্ত্ব নিরুক্ত ও বেদদৃষ্টিতে – ভর্গ ও সূর্য – আকাশ পথে সূর্যের সংবৃত্ত ও পরাবৃত্ত গতি – ভীলদের আতিথেয়তা – ঋষি দীর্ঘতমার মাধ্যন্দিন সূর্য বা বিষ্ণুতত্ত্ব – বেদোক্ত বিষ্ণু কে ? – বহাদল সঙ্গম – হাতনী সঙ্গম – ঋষি ব্যাঘ্রপাদ ও উপমন্যুর তপস্থলী – উপমন্যু ও ধৌম্যের কথা – উপমন্যুর মায়ের শিবতত্ত্ব বর্ণনা – মড়াইয়া বাবার আশ্রমে স্থিতি – মড়াইয়া বাবার অর্ন্তযামীত্বের পরিচয় – বেদে সর্বোদার সার্বভৌম দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দান – খাড়া চৌকী – হিরণফাল – হিরণ্যাক্ষ ও দুর্বাশার তপস্যাস্থল – বৈখানস মুনির তাঁবুতে স্থিতি – শিবরাত্রিতে শিবের পূজা – উপমন্যুর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিনীর দুর্বাসার প্রতি ভক্তির উপাখ্যান – শ্রীকৃষ্ণের শিব পূজার কথা – শিবতত্ত্বের নানা দিক – শৈবাগম তন্ত্রের ব্যাখ্যা – অতিবৃদ্ধ মহাযোগী ব্রহ্মানন্দদেবের কথা – অদ্বৈতবাদ তর্ক বা আলোচনার বিষয় নয় – শঙ্করাচর্যের রূঢ় সমালোচনা – বীজাসেনী তীর্থের গল্প – গৌরবার্তা ও নর্মদার সঙ্গম অতিক্রম – অনঙ্গেশ্বর মহাদেব – মায়ের কুঠার নামক সদাবর্ত – ভৌতিঘাট বা মনোরথ তীর্থ – মেঘনাদ তীর্থ – কামদেবের অনঙ্গ হওয়ার বিবরণ – বাঞ্জারাদের বিষাক্ত সাপ নাচানো ও নানা অভিচার ক্রিয়া – লছু সর্দারের সঙ্গে পরিচয় – দামাদ 'সোয়ামীজীর' সঙ্গে রাজঘাট পর্যন্ত যাত্রা – পথে যেতে যেতে বিশ্রবা, রাবণ, কুম্ভকর্ণ ইত্যাদির জন্মরহস্য বর্ণনা – পুরাণ নিয়ে কিছু তর্ক – ক্ষমা প্রার্থনা – বাবলা গঙ্গা – ভয়ঙ্কর শূলপাণীর ঝাড়ির শেষ ।

তপোভূমি নর্মদা

ওঁ

॥ হর নর্মদে হর ॥

হরিধাম অতিক্রম করে এসে দক্ষিণতটে বসে বসে নানা চিন্তায় বিভোর হয়ে আছি। ভাবছি মাতা নর্মদার অনন্ত মহিমা, নর্মদা-পরিক্রমায় না এলে ভারত মহিমা এভাবে শতরূপে বহুরূপে তার বিশ্বজনীন তাৎপর্য নিয়ে কখনই আমার কাছে ধরা পড়ত না ; সাধে কি বিবেকানন্দ বলেছিলেন – ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের ঋষিরা বলেছিলেন – ভারতই হল, ভারতাজির অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণ। 'ভারতের মৃত্তিকা যে আমার স্বর্গ' একথা আমিও আজ বলতে পারি, সকল ভারতবাসীই একথা আবেগদীপ্ত কণ্ঠে বলতে পারেন, ভাবতে পারেন, অন্ততঃ সকলেরই স্বামীজীর ঐ চেৎবাণীকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা উচিত বলে আমি মনে করতে পারছি আজ, কিন্তু প্রাচীন ঋষিরা যে বলেছেন ভারত একেবারে বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণ বা দিব্যধাম একথা আজও আমার দুর্ভাগ্যক্রমে উপলব্ধিতে ফোটেনি। একথা স্বীকার করতে আমার কোন লজ্জা নাই। তবে এ যুগের অপর ঋষি কবি যে বলেছেন – ভারতবর্ষ মহামানবের পুণ্যতীর্থ, একথা যে কত সার্থক কত ধ্রুব, তা মা নর্মদার দয়ায় তাঁরই শ্বাপদ অধ্যুষিত ঘনঘোর জঙ্গলাকীর্ণ তটে তটে পরিক্রমা করতে করতে বরাভয়দাতা তপস্বীদের করুণাঘন প্রেমমূর্তির পুণ্য সান্নিধ্যে এসে উপলব্ধি করেছি এবং নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ বলে মনে করছি। আজ আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে আমি জীর্ণ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি নি। শহরের অন্ধকারাচ্ছন্ন কদর্য বস্তি দেখে শহরের ঐশ্বর্য আড়ম্বর ও আনন্দ কোলাহলের যেমন কোন পরিমাপ পাওয়া যায় না, যেমন বলতে পারা যায় না শহরটা দরিদ্র, জীর্ণ বা নিরানন্দ পূর্ণ তেমনি ভারতবাসীর নিত্যকার প্রাণধারণের গ্লানি, তাদের দৈনন্দিন জীবনের ভাঙ্গাগড়া অভাব অনটনের নিরিখে ভারতের প্রাণের উল্লাস, তার ভাবজীবনের অনন্ত ঐশ্বর্যকে কিছুতেই জীর্ণ শীর্ণ বলা যাবে না। আজ দু বছর ধরে নর্মদার তটে তটে পরিক্রমা করতে করতে দু চোখ মেলে যা দেখে এলাম, চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হল না। বিস্ময়ের অন্ত পেলাম না। প্রতিদিন উষাকালে, সন্ধ্যায় কখনও গভীর রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে, ঘনঘোর জঙ্গলের মধ্যে হোমাগ্নিপূত ঋষিদের গিরিগুহায় আমার অনুভূতিতে আমি না চাইলেও আলতোভাবে ছুঁয়ে গেছে, সেই সকল সত্তার আত্মীয়-সম্বন্ধের গূঢ় মহিমময় বিশ্বাধার একমের পরমাশ্চর্যরূপ যাঁর খুশীতেই নিরন্তর অসংখ্যরূপের প্রকাশে বিচিত্রভাবে আমার প্রাণ খুশী হয়ে উঠেছে, বলে উঠেছে – কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ ? আমি পুনরায় ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম এই সাগরমেখলা বিশ্বময়ীর আঁচল পাতা ভারতমাতাকে, জাগতিক ও পারমার্থিক সত্যের ধারয়িত্রী ও পালয়িত্রী ভারতভূমিকে।

হঠাৎ পিছন দিক থেকে কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলাম। আমার চিন্তায় আচমকা ছেদ পড়ল। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি এক বোধনা কাঠ কাঁধে নিয়ে নৌকারই এক মাঝি

মামাকে বলছে – আপ্ ক্যা এহি জাড়াকে দিনমেঁ ইধর বৈঠকে সারারাত বীতা দেঙ্গে ? শাম হো গয়া। নাও কা সব যাত্রী চলা গয়া। আপ্ কাঁহা ঠারেঙ্গে ?

আমি উত্তর দিলাম – বিমলেশ্বরজীকা মন্দির ত নজদিগ্ হ্যায়। হম্ ওহি মন্দিরমেঁ রাত বীতায়েঙ্গে।

আমার কথা শুনে মাঝি খলখল করে হেসে উঠল। বিদ্রূপ ভরা কর্কশ কণ্ঠে বলল – বিমলেশ্বর মন্দির কা জো নাম শোনা, উহ্ নামমাত্র মন্দির হৈ। খপরেল কা টুটা-ফুটা মকান সা হৈ, ইসমে গুফা কী ভান্তি নিচে শিবজী হৈ, উনকী পূজা ভী কোই নিয়মিত করতা হৈ য়া নহী। ইয়ে বিমলেশ্বর ছোটা সা গাঁও হৈ, উহা ন রহনে কা কোই স্থান হৈ ন ধরমশালা। মন্দির ভী ত টুটা-ফুটা জীর্ণ-শীর্ণ দশামেঁ হৈ। আপ্ চলিয়ে হামারা সাথমেঁ, নাওকা ছৈ কা অন্দর কোই সুরত সে এক রাত বীত যায়েগা।

তার কথায় চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম, চারদিক অন্ধকারে ঢেকে গেছে। কখন যে সূর্যাস্ত হয়েছে, আমার খেয়াল ছিল না। লোকটি নৌকাতে যাবার জন্য আবার তাগাদা দিল – উঠিয়ে বাবা, চলিয়ে হামার সাথমেঁ। জঙ্গল নজদিগ্ হ্যায়। আপ্ আভিতক্ বাচ্চা হ্যায়, ইয়ে আঁধেরা মেঁ আপকো হম্ ছোড়েগা থোড়ি। আমি উঠে পড়লাম। গাঁঠরী ঝোলা এবং কমণ্ডলু হাতে নিয়ে লোকটিকে অনুসরণ করলাম। মনে মনে ভাবছি – এই হল আমাদের ভারতবাসীর সাধারণ লোকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ভারতবর্ষের অনন্য মহিমার একটি দিক।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নৌকায় উঠলাম। নৌকার উপর দুটি ছৈ টাঙান হয়েছে। একটির মধ্যে উনুন জ্বেলে রুটি তৈরী হচ্ছে, বাকী তিনজন মাঝি গাঁজাতে দম দিতে দিতে গান ধরেছে –

তুম হিঁ নীক লাগৈ রঘুরাই
সো মোহি দেহু দাস সুখ দাই।

অর্থাৎ হে রঘুপতি, দাসের সুখ বিধান তোমার লীলা, তোমার যা অভিরুচি, তাই তুমি আমাকে দাও।

ভক্তচূড়ামণি তুলসীদাসজীর রামচরিতমানসের মুখবন্ধের প্রার্থনায় যে ভক্তির সুর, অকিঞ্চনতাবোধ ও দৈন্য আদ্যোপান্ত ধ্বনিত হয়ে রাম কথাকে অপূর্ব হৃদয়স্পর্শী কাব্যে পরিণত করেছে, সেই শরণাগতি ও আত্মনিবেদনের মধুর রস ফল্গুনদীর ধারার মত অন্তঃসলিলা হয়ে বয়ে চলেছে, ভারতের অপামর জনসাধারণের মর্মকোষে। আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের এই বিশিষ্ট চিত্তপ্রসাদ অন্য দেশে দুর্লভ। সারাদিন সমুদ্র বক্ষে নৌকা চালাতে গিয়ে যে হাড়ভাঙা পরিশ্রম ও দুঃসহ উদ্বেগ ভোগ করতে হয়, তা তারা ভুলে যায় রাম কথার মধুনিস্যন্দিনী সঞ্জীবনী রস-সিঞ্চনে।

আবার তারা বিভোর হয়ে গেয়ে উঠলো –

এক বাণি করুণানিধান কী
সো প্রিয় জাকে গতি ন আনকী।

অর্থাৎ করুণাময় রামচন্দ্রের এই একই রীতি, যার আর কোন গতি নাই, অসহায় যে, সেই তাঁর প্রিয়।

রত্নসাগরের বুকে ভাসমান নৌকায় দাঁড়িয়ে, সন্ধ্যার পটভূমিতে এই সঙ্গীতের মূর্ছনা আমাকে বিহ্বল করে তুলল। প্রায় দু মিনিট কাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর প্রধান মাঝির তাগিদে আমি ছৈ এর মধ্যে ঢুকে এক কোণে আসন পাতলাম। মাঝিরা কলকণ্ঠে গান গাইছে –

জড় চেতন জগ জীবজে সকল রামময় জানি ।
বন্দোঁ সবকে পদকমল সদা জোরি যুগ পাণি ॥

– জড় ও চেতন, জীব ও জগৎ, সকলই রামময় জানি, যুক্তকরে সকলের পদকমল বন্দনা করি।

বড় সার্থক ও সময়োপযোগী এই গান ! মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে স্বতঃই হিল্লোল তুলে। ধন্য তুলসীদাস, তোমার রচনার গুণে বাহ্যজগৎ অন্তর্জগতের ব্যঞ্জনার আধারস্বরূপ হয়ে উঠে। সকলই রামময় এই একটি শব্দই ভারতের প্রজ্ঞাসম্পদকে জড়োয়া গহনায় সোনার বাঁধনের মাঝে মণিমুক্তার মত ঝলমল করে তুলেছে। সত্যই ত এই মুহূর্তে আমার উত্তরতটে যে সমস্ত সাথী সাধু সন্তের অকুণ্ঠ কৃপা ও সাহায্য পেয়ে হরিধাম পর্যন্ত এসে এই দুস্তর সাগর অতিক্রম করে এই দক্ষিণতটে এসে পৌছতে পারলাম তাঁদের সকলকেই রামময় জেনে সকলেরই মনে মনে পাদবন্দনা করা আমার কর্তব্য। আমি সাধ্যমত সকলেরই কথা স্মরণ করে তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালাম।

মাঝিদের কণ্ঠ নীরব হয়েছে। বোধ হয় তারা আহারে বসেছে। আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, আজ ১৩৬১ সালের ৩০শে কার্তিক। বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি। বাংলাদেশের বহু গৃহস্থের বাড়ীতে আজ কার্তিক পূজা হচ্ছে। মহাত্মা পূষণ গিরিজীর কৃপায় জেনেছি, কার্তিক হলেন ভগবান সনৎকুমার, মূর্ত ব্রহ্মবিদ্যার প্রতীক। আমি মা নর্মদা এবং ভগবান সনৎকুমারের কথা অনুধ্যান করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম। এক ঘুমেই সকাল হল।

বাইরে বেরিয়ে দেখি চারপাশ কুয়াশায় ঢাকা। তটের দিকে গাছপালা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ছৈ এর মধ্যে পুনরায় ঢুকে চুপ করে বসে রইলাম। ধীরে ধীরে কুয়াশা পাতলা হতেই গাঁঠরী বেঁধে আমি নৌকার দুজন মাঝিকে আলিঙ্গন করে তাদের কাছে বিদায় নিলাম। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম দক্ষিণতটে। পাহাড়ের উপর দিয়ে পত্রান্তরাল হতে প্রভাত সূর্যের উদয়-রশ্মি ধীরে ধীরে অত্যন্ত ক্ষীণ ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে পথের উপর। সমুদ্রের ওপারে পেছনে পড়ে রইল উত্তরতট, মনের মধ্যে তার অমৃতময়ী আনন্দ বিজড়িত স্মৃতিকে মনের মণিকোঠায় সযত্নে শ্রদ্ধাভরে তুলে রেখে দক্ষিণতটের সম্পদ আহরণের জন্য সাগ্রহে এগিয়ে চললাম। আজ ১লা অগ্রহায়ণ (১৭।১২।১৯৫৪)। রেবা মন্ত্র জপ করতে করতে সমুদ্রের কোল হতে উঠে এলাম পাহাড়ী পথের উপর, যে পথ গিয়েছে নিকটবর্তী বিমলেশ্বর তীর্থের দিকে। উদয়-সূর্যের বন্দনা গান গাইতে গাইতে দশ মিনিট হেঁটে পৌছে গেলাম গন্তব্যস্থলে।

মন্দিরের দৈন্যদশা দেখে হতাশ হলাম। মাঝি ঠিকই বলেছিল – টুটা-ফুটা মন্দির, এককালে হয়ত সমৃদ্ধি ছিল, এখন কিন্তু সত্যই জীর্ণ দশা। মূল মন্দিরের তিন দিকে খাপরালের টাট নামিয়ে কোনমতে মন্দিরকে খাড়া করে রাখা হয়েছে। মূল মন্দিরের প্রবেশ দ্বার দিয়ে কয়েক ধাপ নিচে নেমে গেলেই এক কুণ্ড, সেই কুণ্ডের মধ্যে বিরাজমান আছেন বিমলেশ্বর –যে বিমলেশ্বর সম্বন্ধে স্বয়ং মহামুনি মার্কণ্ডেয় বলে গেছেন – 'কোন এক সময় মুনি পত্নীগণকে ছলনা করার জন্য উমা স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবকে দারু বনে প্রেরণ করেন। স্বয়ং শংকর এই ব্যাপারে নিজে মলিনতা প্রাপ্ত হন। তিনি রেবাসাগর সঙ্গমের এই স্থানে এসে তপস্যা করে বিমল হন। তদবধি তিনি এখানে বিমলেশ্বর নামে নিত্য প্রকট রয়েছেন।

বিমলোহসৌ যতো জাতস্তেনাসৌ বিমলেশ্বরঃ।
তেন নাম্না স্বয়ং তস্থৌ লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥
(রেবাখণ্ড, ২২৬ অধ্যায়)

শুধু তাই নয় মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে পড়েছি, ত্বষ্টা নামে এক প্রজাপতি ইন্দ্রকে জব্দ করার জন্য ত্রিশিরা নামে এক পুত্রের জন্ম দেন। ত্রিশিরার সূর্য চন্দ্র ও অগ্নির ন্যায় তিনটি মুখ ছিল। তিনি একমুখে বেদাধ্যয়ন, একমুখে সুরাপান এবং একমুখে সর্বগ্রাসী কোপন দৃষ্টিতে সব কিছু নিরীক্ষণ করতেন। পিতার আদেশে ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য ত্রিশিরা কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলে ইন্দ্র ভয় পেয়ে তাঁকে হত্যা করলে ইন্দ্রকে ব্রহ্ম হত্যার পাপ স্পর্শ করে। সেই পাপমুক্তির জন্য ইন্দ্র এই বিমলেশ্বরে এসে তপস্যা করে পাপমুক্ত হন। সূর্য এবং ব্রহ্মাও এখানে তপস্যা করেছিলেন। দশরথ কৃত পুত্রেষ্টি যজ্ঞের হোতা, বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিও স্বপত্নী শান্তাকে সঙ্গে নিয়ে এসে এখানে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন রাজান্ন ভোজনের দোষ হতে শুদ্ধি লাভের জন্য। এছাড়াও অনেক পরিক্রমাবাসীর কাছে শুনেছি, উপরোক্ত দেবতা ঋষি মুনি ছাড়া আরও সহস্র সহস্র ঋষি মুনি দক্ষিণতটের এই সর্বদোষঘ্ন ও সর্ব পাপঘ্ন স্থানে যুগ যুগ ধরে এখানে বিমলতা লাভের জন্য তপস্যা করে গেছেন। বিমলেশ্বর তীর্থ সমগ্র নর্মদা তটে প্রবাদ বাক্যের মত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এই বলে যে, দৈনন্দিন জীবনে কোন দোষ অপরাধ, জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত যাই হোক না কেন, এমন কি তপ জপে কোন বিঘ্ন ঘটলে কিংবা আশানুরূপ কোন অগ্রগতি না ঘটলেও 'চলো বিমলেশ্বর। প্রভু বিমলেশ্বর সব দোষ স্খালন করবেন, সর্ব অপরাধ মার্জনা করবেন।' এ হেন প্রসিদ্ধ তপস্যা স্থলের এই রকম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা দেখে, আমার মনটা খুবই বিষণ্ণ হয়ে উঠল। যাই হোক, আমি মন্দিরের প্রবেশ দ্বার দিয়ে, কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙ্গে কুণ্ডস্থিত মহাদেবকে প্রণাম করলাম।

প্রণাম করে উঠতে না উঠতেই শুনতে পেলাম, একজন হাঃ হাঃ শব্দে সারা শরীর দুলিয়ে গমকে গমকে হাসছেন। তাঁর হাসির শব্দে চমকে মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম, একজন সাধুমূর্তি হাসতে হাসতে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন –

পাতু ত্বাম্ গিরিজা মাতা যস্য দ্বাদশলোচনঃ।
অথবা গিরি-জামাতা, দ্বাদশাদূর্ধ্বলোচনঃ॥

স্বয়ং মা ভগবতী যাঁর জননী সেই দ্বাদশলোচন ষড়ানন অথবা হিমালয়ের যিনি জামাতা সেই দ্বাদশাধিকলোচন বিশিষ্ট মহাদেব আপনাকে রক্ষা করুন। মহাশয়ের নিবাস কোথায়? আপনি কি পরিক্রমাবাসী? বাঙালী?

– সাধুজী! আপনি যে একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন করলেন! আমার ভাষা শুনে যেমন আপনি বুঝতে পারছেন আমি বাঙালী, তেমনই আপনার বাক্যসুধা শুনে আমিও বুঝতে পেরেছি যে, আপনি বাঙালী। বাংলাদেশ থেকে এত দূরে এসে একজন বাঙালীর মুখ দেখতে পাব, তা একান্তভাবে অপ্রত্যাশিত হলেও আপনাকে দেখে আমার খুবই আনন্দ হচ্ছে! তবে আমার একটি বিনীত প্রশ্ন, আপনার উচ্চারিত শ্লোকে ষড়াননকে যস্য দ্বাদশলোচনঃ অর্থাৎ যাঁর বারটি চক্ষু, সরলভাবে এই কথাটি ব্যক্ত করলেও পঞ্চাননের প্রতিটি আননে অর্থাৎ মুখমণ্ডলে সাধারণভাবে দুটি চক্ষু ছাড়াও যে আরও একটি করে তৃতীয় চক্ষু অর্থাৎ ৫ × ৩ = ১৫টি চক্ষু আছে, সরলভাবেই তা তো আপনি বলতে পারতেন – যঃ পঞ্চদশলোচনঃ! তা না করে দ্বাদশাদূর্ধ্বলোচনঃ এই রকম হেঁয়ালি করে বলার হেতু কি?

আমার কথা শুনে তিনি আবার হো হো করে হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতেই তিনি বললেন – আমি যে শ্লোকটি আপনাকে শুনিয়েছি তা যে বিখ্যাত হেঁয়ালি কাব্য বিদগ্ধমুখমণ্ডনম্ এরই প্রথম শ্লোক। কাজেই শ্লোকের মধ্যে কিছুটা হেঁয়ালি থাকবেই। এখন বলুন, আপনি কি পরিক্রমাবাসী? আপনি উত্তরতটের হরিধাম হতে নৌকাতে করে কাল বিকালে ৫টার সময় এখানে এসে পৌচেছেন তা আমি দেখেছি। আমি অন্যান

সাধুদের সঙ্গে ঐ নৌকাতেই ছিলাম। আমি উত্তরতটে তবরাতে গিয়েছিলাম। সমুদ্রের সঙ্গে যেখানে রেবার সঙ্গম হয়েছে, নৌকা সেখানে পৌছতেই দাঁড়িয়ে উঠে আবেগদীপ্ত কণ্ঠে আপনি যে ভাবে দিব্যগুরুদের স্তবপাঠ করলেন, তাতে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমি সংকল্প করেছিলাম যে ভাবে হোক, আপনার কাছে ঐ দুর্লভ নিগূঢ় তত্ত্বসমন্বিত শ্লোকরাজি টুকে নিব। কিন্তু নৌকা ঘাটে লাগতেই অন্যান্য সহযাত্রীদের সঙ্গে তাড়াহুড়ো করে হাঁটতে গিয়েই আমি আপনাকে আর দেখতে পাইনি। ভাবলাম, আপনি যেই হোন, দক্ষিণতটে পৌছে একটি বার হলেও বিমলেশ্বর মন্দির আসবেনই। সেই জন্যই আপনার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমি এখানে প্রতীক্ষা করছি।

কথাগুলি বলে আবার তিনি হাসিতে ফেটে পড়লেন। আমি তাঁকে জানালাম, পরে আপনার সঙ্গে ভাল করে আলাপ পরিচয় করব, এখন স্নান করে বিমলশ্বেরজীর পূজা করতে চাই। কোথায় স্নান করি, বলুন তো ?

– মন্দির হতে ৫০ গজ দূরেই যে কুঁয়াটি দেখছেন, ওতে স্নান করতে পারবেন না। কারণ কুঁয়ার জল লবণাক্ত। কিন্তু কুঁয়া থেকে একটু দূরে যে তালাও অর্থাৎ পুকুরটি দেখা যাচ্ছে, সেখানকার জল ভাল, পান করাও চলে। আপনি সেখানে গিয়েই স্নান করে আসুন। আমি এখানে বসছি।

ঝোলা গাঁঠরী সেখানেই পড়ে রইল, আমি গামছা ও কমণ্ডলু হাতে নিয়ে পুকুরে স্নান করে এলাম। স্নানের পর বিমলেশ্বর মন্দিরের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম সমুদ্রের ধারে। সমুদ্রে যখন জোয়ার আসে, তখন বিমলেশ্বর মন্দিরের গা পর্যন্ত জল উপছে আসে। এখন ভাটা চলছে। আমি অতি সন্তর্পণে সমুদ্রে ফুটখানিক নেমে সূর্য তর্পণ ও পিতৃ তর্পণ সারলাম। সেই সাধুকে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে বিমলেশ্বরের নিত্যপূজার জন্য কোন পুরোহিত আসেন না ?

তিনি বললেন – একবার নিশ্চয়ই আসেন, তবে তাঁর আসার কোন নির্ধারিত সময় নাই। শুনেছি, এখান থেকে মাইলখানিক দূরে কোথাও তাঁর নিবাস। বড়বানীর রাজা বিমলেশ্বরজীর সেবার জন্য প্রচুর দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেছেন। সেই সব ভূ-সম্পত্তি চাষবাসেই তিনি বেশী ব্যস্ত, ঠাকুরের সেবায় তাঁর তেমন অভিরুচি নাই। তবে রাস্তার ওপারে বাঁধের নিচেই কয়েকজন নাগা সন্ন্যাসীর একটা আখড়া আছে। বেলা ১২টার সময় সেখান থেকে তিনজন নাগা আসেন মন্দিরে। বিমলেশ্বরজী যে কুণ্ডে বিরাজমান সেই কুণ্ডের সঙ্গে সমুদ্রের সংযোগ আছে। তাই মধ্যাহ্ন ক্ষণে যে সব শিবলিঙ্গ কুণ্ড থেকে চার দিকে ঠিকরে ঠিকরে পড়ে, সেই সব নাগা সন্ন্যাসী তা সযত্নে কুড়িয়ে নিয়ে পুনরায় কুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। ব্যতিপাত যোগ, শিব চতুর্দশী, কার্তিকী পূর্ণিমা এবং বৈশাখী পূর্ণিমাতে এখানে মেলা বসে। সে সময়েও নাগারা ত্রিশূল হস্তে এই মন্দির পাহারা দেন এবং ঠিক মধ্যাহ্ন ক্ষণে কুণ্ড থেকে শিবলিঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হওয়া মাত্রই তা কুড়িয়ে নিয়ে কুণ্ডে ফেলে দেন। ঠিক বেলা বারটা বাজলেই বারটা থেকে একটা পর্যন্ত কিভাবে এবং কেন যে কুণ্ড থেকে ছোট ছোট শিবলিঙ্গ কোথা হতে আবির্ভূত ও ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে সে দুর্জ্ঞেয় রহস্য আমার জানা নাই। নাগারাই বা কেন তা পূজার্থী যাত্রীদেরকে স্পর্শ করতে দেন না, এই রকম খবরদারী করার জন্য কেই বা তাঁদেরকে অধিকার দিয়েছেন, তাও আমার অজানা। তবে আমি এর আগেও এখানে দুবার এসেছি, প্রতিবারেই মধ্যাহ্ন ক্ষণে কুণ্ড হতে শিবলিঙ্গগুলির

সহসা উদ্ভব, উৎক্ষেপ এবং যথারীতি নাগাদের পুনরায় কুণ্ড মধ্যে নিক্ষেপ পর্ব আমি দেখে গেছি।

আমি মা নর্মদাকে স্মরণ করে কমণ্ডলু হাতে সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে গেলাম কুণ্ডের কাছে। অপূর্ব শিবলিঙ্গ। কুণ্ড হতে জলের উপর যতটুকু জেগে আছেন, তারই পিঙ্গলবর্ণের হিরণ্যচ্ছটা ও চন্দ্রমৌলী রূপ দেখে আমার মন আবিষ্ট হয়ে পড়ল। শিবলিঙ্গের মাথায় একাক্ষরী মহামন্ত্রে কমণ্ডলুর জল ঢেলে আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম। তারপর আরম্ভ করলাম মহর্ষি তণ্ডীকৃত স্তবরাজ অর্থাৎ মহাদেবের অষ্টোত্তর সহস্রনাম কীর্তন –

ওঁ স্থিরঃ স্থাণুঃ প্রভুর্ভীমঃ প্রবরো বরদো বরঃ।
সর্বাত্মা সর্ববিখ্যাতঃ সর্ব সর্বকরো ভবঃ॥
জটী চর্মী শিখণ্ডী চ সর্বাঙ্গঃ সর্বভাবনঃ।
হরশ্চ হরিণাক্ষশ্চ সর্বভূতহরঃ প্রভুঃ॥ ইত্যাদি

পাঠ যখন শেষ হয়ে আসছে, তখন দেখলাম ত্রিশূলধারী তিনজন নাগা এসে কুণ্ডকে ঘিরে বসে 'হর হর ববম্ মহাদেও', অবিরত এই ধ্বনি দিতে লাগলেন। মিনিট পাঁচেক পরেই কুণ্ড থেকে দু চারটি করে শিবলিঙ্গ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে লাগল। কতকগুলি দেখলাম, ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে কুণ্ডের মধ্যেই অন্তর্লীন হয়ে গেল। আর যেগুলি কুণ্ডের বাইরে ছিটকে পড়ল, নাগারা তা কুড়িয়ে কুণ্ডের মধ্যেই ফেলে দিতে লাগলেন। আমার পাঠ শেষ হয়ে গেছল। আমি হাতজোড় করে বসে রইলাম, ইষ্টমন্ত্র জপ করতে করতে ঐ অভিনব দৃশ্য দু চোখ ভরে দেখতে লাগলাম। যে শিবলিঙ্গগুলি বাইরে ঠিকরে পড়ছিল, লক্ষ্য করলাম, সেগুলি প্রত্যেকটিই মূল বিমলেশ্বর স্বয়ম্ভু লিঙ্গের অবিকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্করণ যেন! সেই একই বর্ণ, একই চিহ্নাঙ্কিত, একই বর্ণচ্ছটা। প্রায় ঘণ্টাখানিক পরে শিবলিঙ্গের উদ্গম ও বিলয়পর্ব শেষ হল। নাগারা কর্পূর জ্বেলে মহাদেবের আরতি করলেন। সকলে প্রণাম করে উঠে আসার সময় লক্ষ্য করলাম, আমারই পিছনে আমার সদ্য পরিচিত সাধুও চিত্রার্পিতবৎ সেই দৃশ্য দেখছিলেন। তিনিও প্রণাম করে আমাদের সঙ্গে উঠে এলেন। নাগা সন্ন্যাসীরা চলে যেতেই তিনি আমাকে বললেন – আপনার কমণ্ডলুর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেখুন তো ভাই, ওর মধ্যে কোন শিবলিঙ্গ পান কিনা। আমি স্পষ্ট দেখেছি, একটি শিবলিঙ্গ ঠিকরে এসে আপনার কমণ্ডলুর মধ্যে পড়েছে। একবার একসঙ্গে অনেকগুলি শিবলিঙ্গ ঠিকরে আসায় নাগাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে! কতকটা অবিশ্বাসের সঙ্গেই আমি কমণ্ডলুর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেখি, সত্যই কমণ্ডলুর মধ্যে একটি শিবলিঙ্গ পড়ে আছে। মূল বিমলেশ্বর শিবলিঙ্গের অবিকল প্রতিরূপ। * শিবলিঙ্গটি মাথায় ঠেকিয়ে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। কমণ্ডলুর মধ্যেই সেটিকে রেখে দিয়ে আমি পুনরায় ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম বিমলেশ্বর মহাদেবের উদ্দেশ্যে। আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, থরথর করে কাঁপছি তখন। আমার পা দুটো টলছে দেখে, সাধুজী আমার হাত ধরে নিয়ে এলেন সেই পঞ্চায়েত বাড়ীতে, তাঁর সাময়িক আস্তানায়।

আমার কাছে সযত্নে রক্ষিত এই বিমলেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গের প্রতিরূপটিকে আমি বৈদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের এক সাপ্তাহিক অধিবেশনকালে সভ্যদেরকে দেখিয়েছি।

বাঁধের গায়েই এই আস্তানা, পিছনেই জঙ্গল। বাড়ীটিতে দুখানি কামরা। গতকাল আমার সাথে হরিধাম হতে একই নৌকায় যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের কয়েকজন এখানেই ধুনি জ্বালিয়ে রাত্রিবাস করেছিলেন। সকাল হতেই যে যার গন্তব্যস্থলে চলে গেছেন। বাড়ীটির তিনপাশে লজ্জাবতীর জঙ্গল, কণ্টিকারীর ঝোপঝাড়। কতকগুলো জায়গায় বনতুলসীতে ছেয়ে গেছে। আকন্দর ডালপালা ছড়িয়ে গেছে চারদিক। মাঝে মাঝে কেরকেরী লতার ঝাড়। শুনেছি, কেরকেরী এবং আকন্দ প্রভৃতি দিয়ে গাদা বন্দুকের বারুদ তৈরী করে স্থানীয় লোকেরা। একটু দূরেই শাল, সেগুন, বাত্‌রা, রশিবন্ধন, তেঁতরা, গামহার, মিটকুনিয়া, সালাই, কুচিলা, শিশু আরও কতরকম গাছ জড়াজড়ি করে রয়েছে এই বনে। বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, একটু দূরে একটা ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে কলকল শব্দে। ঝর্ণার কাছে অনেকখানি জায়গায় ঘাস গজিয়েছে কচিকচি। একটা কোট্‌রা পট্‌পট্‌ করে ঘাস খাচ্ছিল। হঠাৎ মুখ তুলে আমাদেরকে দেখতে পেয়েই ৰাক্ ৰাক্ শব্দে দৌড়ে পালাল ঝোপ ঝাড় ঠেলে। পাহাড়ের দিকের জঙ্গল থেকে একটা চিতাবাঘের গলার করাতচেরার মত আওয়াজ কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘুমন্ত জঙ্গল জেগে উঠল গাছে গাছে হনুমানদের হুপ্-হাপ শব্দে। পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে সে ডাক আবার ফিরে এল বনে। তারপর পাতায় পাতায় কাঁপতে থাকল।

আমার সাথী বললেন – ঘরে এসে বসুন ভাই। কাছেই জঙ্গল, একটু আগেই ত চিতাবাঘের ডাক শোনা গেল! দরজা বন্ধ করে বসে থাকাই ভাল।

তাঁর কথায় আমি ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলাম। ইতিমধ্যেই তিনি আমার গাঁঠরী এবং নিজেরটি খুলে আসন বিছিয়ে ফেলেছেন। যাঁরা এখানে রাত্রিবাস করেছিলেন তাঁদের ধুনির দগ্ধাবশিষ্ট কাঠ এক জায়গায় জড়ো করে একটি ধুনি জ্বালার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। ঘরের কোণে গেরুয়া কাপড়ে ঢাকা একটা একতারা দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি একতারা বাজিয়ে গান করেন।

– হ্যাঁ, ঐটাই আমার একমাত্র নেশা! পায়ে ঘুঙুর পরে নাচি-ও। আমি যে ব্রাত্য বাউল! গান ছাড়া কি বাউল বাঁচতে পারে? আমার ঝোলায় কিছু ছাতু আছে, লঙ্কা দিয়ে আগে দু জনে কিছু ছাতু খাই আসুন, তারপর ভাল করে আলাপ পরিচয় করা যাবে! জল দিয়ে ছাতু মাখিয়ে আমরা দুজনেই ছাতু খেলাম। তিনি তাঁর গাঁঠরী খুলে একটি পকেট ঘড়ি বের করে বললেন – এখন বেলা তিনটা বেজেছে। এই অবেলায় জঙ্গল পথে যাত্রা করা উচিত হবে না। রাত্রিটা এখানে কাটিয়ে যেদিকে ইচ্ছা রওনা হওয়াই আমার বিবেচনায় নিরাপদ হবে। আপনি এখান হতে কোন্‌দিকে যেতে চান?

– আমার ইচ্ছা অঙ্কলেশ্বর হয়ে হাঁসোট পর্যন্ত যাবো। তারপর সোজা অমরকন্টকের পথে। আমি পরিক্রমাবাসী, অমরকণ্টক হতে ভৃগুক্ষেত্র অর্থাৎ ভারোচ পর্যন্ত সাধ্যমত পরিক্রমার নিয়মানুসারে বিধিমত পরিক্রমা করে গতকাল হরিধাম হয়ে এখানে এসে পৌছেছি। এবার দক্ষিণতট পরিক্রমা করে পুনরায় অমরকণ্টকে পৌঁছাতে চাই।

– আমি শুনেছি, এই বিমলেশ্বর ক্ষেত্রই দক্ষিণতটের শেষ মোকাম। তবে নৈষ্ঠিক পরিক্রমাবাসীরা হাঁসোটের সূর্যকুণ্ডও দর্শন করে থাকেন। ঠিক আছে আমিও আপনার সঙ্গে হাঁসোট পর্যন্ত যাব। এখান থেকে হাঁসোট পর্যন্ত যাওয়ার ভাল রাস্তা আছে। পথে পড়বে অঙ্কলেশ্বর। হাঁসোট থেকে এক সঙ্গেই অমরকণ্টক যাব। ঠাকুরের কী দয়া! এই দুর্গম জঙ্গল পথে একই ভাষা-ভাষী স্বদেশের কোন লোককে সাথী হিসাবে পাব, এতটা সৌভাগ্য আমি আশা করি নি। মনের মত মানুষ না পেলে ভ্রমণে সুখ থাকে না।

এই বলেই হাসতে হাসতেই তিনি তাঁর একতারাটি টেনে নিয়ে গান আরম্ভ করলেন –

মনের মানুষ কোথায় গেলে পাই ?
তারে একদিন না দেখলাম ভাই।
সে মনের মানুষ না পেলে যে মন ওঠে না বলছি তাই॥
আমি ঘুরে ঘুরে হইলাম হয়রান,
তার ঠিক ঠিকানা কেউ জানেনা, না পাই সন্ধান।
আমার সকল চেষ্টা বৃথা হলো, এখন আমি কোথায় যাই ?
ক্ষেপা বলে – ওরে আমার মন,
মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ,
একবার দিব্যচক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি সর্বঠাঁই॥

চমৎকার সুরেলা কণ্ঠস্বর ! উত্তরতটের শূলপাণির ঝাড়ি যেখানে শেষ হয়েছে, সেই আদিত্যেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে এক সাধকের কণ্ঠে যে স্বর্গীয় সংগীত শুনেছিলাম, এঁর বাউল গানে ততখানি সর্বপ্লাবী মাদকতা ও মাধুর্যের স্বাদ না পেলেও এঁর গানও তন্ময় হয়ে শুনতে হয়। সাধু দু তিন বার প্রায় প্রত্যেকটি লাইনই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইলেন। তাঁর গান যখন শেষ হল, তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছেন। তাঁরই পকেট ঘড়িতে দেখলাম, বেলা তখন সাড়ে চারটা। জানালা দিয়ে ঘরের পিছনের জঙ্গলে দৃষ্টি পড়তেই দেখলাম, একটু দূরে একটা শিমূলের ডালে বসা ময়ূর হঠাৎ কি জানি কেন ডেকে উঠল তীক্ষ্ম স্বরে কেঁয়া কেঁয়া করে। সমস্ত জঙ্গলটা যেন রিন্‌রিন্ করে উঠল। শিমূল গাছটার পাশ দিয়ে দেখলাম একদল সম্বর ঘ্বাক্ ঘ্বাক্ শব্দে ধাতব ডাক ডেকে জোরে জঙ্গলের গভীরে দৌড়ে চলে গেল। ডান দিকের জঙ্গলে হনুমানরা নূতন করে সোচ্চার হয়ে উঠল। আমি সাধুকে বললাম – আমার মন বলছে, ধারে কাছে কোথাও বাঘ আছে কিংবা পাহাড়ের দিক হতে এই পথেই হয়ত কোন বাঘ আসছে। তিনি বললেন – হতে পারে ! তবে তার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে লাভ কি ? আমরা যা হোক একটা ঘরের মধ্যেই ত আছি, দরজাতেও মজবুত কাঠের খুড়কা দিয়ে আঁটা। তাছাড়া সামনেই রয়েছেন দেবাদিদেব বিমলেশ্বর ভগবান ! আমি লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেলাম। ঝোলা হাতড়ে একটা ছোট মোমবাতি জ্বাললাম আমি। তিনি বলে চললেন – আমার সঠিক পরিচয় জানার জন্য নিশ্চয়ই আপনার মনে আগ্রহ জন্মেছে। দীর্ঘ ঝাড়িপথে নানা বিপদ আপদের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে এক সঙ্গে যেতে হবে, তখন পরস্পরের মধ্যে গভীর জানা শোনা থাকা প্রয়োজন। আমার নাম – রঞ্জন বাউল। পূর্ব বাংলায় বরিশাল শহরের উপকণ্ঠেই আমার বাড়ী। পিতৃদত্ত নাম নিরঞ্জন লাহিড়ী, মা আদর করে ডাকতেন 'রঞ্জন' বলে। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় আমি খুব ভাল ফলই করেছিলাম। যখন আমি বরিশালের দেশবিখ্যাত ব্রজেন্দ্র মোহন কলেজে আই. এ. তে. ভর্তি হলাম, তখনই আমার জীবনে দুর্দৈব দেখা দিল। তিন দিনের অসুখে মা মারা গেলেন। মৃত্যুর আগেও আমার মাথাটা বুকে চেপে বলে গেলেন – তোকে বি. এ. এম. এ. সব পাশ করতে হবে। মাকে হারিয়ে আমি সর্বহারা হয়ে গেলেও মায়ের কথা রক্ষা করার জন্য আমি কলেজে নিয়মিত যেতে লাগলাম। আপনি নিশ্চয় বাংলাদেশের সুসন্তান মহাত্মা অশ্বিনী দত্তের নাম শুনেছেন। মহাত্মা বললেও তাঁর সম্বন্ধে খুব অল্পই বলা হয়। তাঁর হৃদয়বত্তার কোন তুলনাই হয় না। তিনি বি. এম. কলেজের ছাত্রদের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখেরও খবরা খবর রাখতেন। তিনি আমার অকালে মাতৃবিয়োগের খবর পেয়ে একদিন কাছে ডেকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন, প্রেরণা দিলেন। আমি মন দিয়েই লেখাপড়া করছিলাম কিন্তু এক বৎসর শেষ হতে না হতেই বাবা পুনরায় বিয়ে করে বসলেন। নির্বিচারে বাবার দ্বারা

মায়ের স্মৃতির এই অপমান এবং বিমাতার ক্রমবর্ধমান নির্যাতন, আমাকে পাগল করে তুলল। তবুও আমার মমতাময়ী মায়ের পবিত্র মুখখানি স্মরণে এনে সব কিছু নীরবে সহ্য করতাম এবং কলেজের ক্লাস করতাম। কিন্তু বি. এ. পরীক্ষা দিবার পর আর টিকতে পারলাম না ঘরে। কলেজে পড়তে পড়তেই আমি মাঝে মাঝে আমার বাড়ী থেকে তিন মাইল দূরে বিখ্যাত মদন বাউলের আখড়ায় যেতাম এবং বাউল গান শিখতাম। ছোটবেলা থেকেই আমার কণ্ঠস্বর মোটামুটি মিষ্টি ছিল। বাউল গানে আমি রস পেলাম, শান্তি পেলাম। আখড়াতেই পড়ে থাকলাম দিন রাত্রি। আখড়াতে থাকতে থাকতেই আমি শুনতে পেলাম, বি. এ. পরীক্ষায় দর্শন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছি। বুঝলাম এটা কেবল মায়ের আশীর্বাদেই সম্ভব হয়েছে। বিমাতার প্ররোচনায় বাবা আমার এতদিন কোন খোঁজ খবরই করেন নি। কিন্তু ভয় হল ছাত্র প্রেমিক মহাত্মা অশ্বিনী দত্ত যদি আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই আখড়ায় এসে স্বয়ং উপস্থিত হন, তাঁকে ত ফেরাতে পারব না! ঐ সময় সহসা এক সুযোগ উপস্থিত হল, আখড়ার যিনি কর্তা সেই নন্দদাস বা নন্দ বাউল বীরভূমে জয়দেবের মেলায় যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আমি সেই সুযোগ ছাড়লাম না। তাঁর দলের সঙ্গে কেন্দুবিল্বে গিয়ে উপস্থিত হলাম। প্রায় দুই বৎসর ধরে বিভিন্ন বাউল আখড়ায় ঘুরে ফিরে নন্দদাসজীর সঙ্গে পুনরায় ফিরে গেলাম তাঁরই আখড়াতে। ইতিমধ্যে তিনি আমাকে বাউলের সাজ পরিয়ে দিয়েছেন – এই গেরুয়া বস্ত্র, কপালে হরিচন্দনের তিলক এবং গলায় তুলসীর কণ্ঠী। নূতন নামকরণ হল রঞ্জন দাস বা রঞ্জন বাউল। লোকমুখে শুনতে পেলাম বিমাতার সৎ পরামর্শে পিতাঠাকুর আমাকে ত্যজ্যপুত্র করেছেন। বিমাতার কোলে ঘরের শোভা আমার একটি ভাইএরও আবির্ভাব ঘটেছে। মায়ের স্মৃতি বুকে নিয়ে আমার দিন কাটতে লাগল। প্রতি রাত্রেই মায়ের কথা ভেবে ভেবে চোখের জলে বালিশ ভিজত। আমি মন প্রাণ ঢেলে দিলাম বাউল গানের সাধনায়। কিন্তু আমার ভাগ্যে এইটুকু সুখও বেশীদিন টিকল না। আরও চার বছর বাদে আমার ভাগ্য আবার নূতন খেলা সুরু করল; হঠাৎ নন্দ বাউল নিরুদ্দেশ হলেন। মাত্র ৫ মাস আগে হঠাৎ তাঁর টেলিগ্রাম গেল আখড়াতে। তিনি ভারোচের কাছে তবরাতে পড়ে আছেন মৃত্যুশয্যায়ে। আখড়ার কর্তারা আমাকেই পাঠালেন ভারোচে। অনেক খোঁজখবর ও তত্ত্বতালাস করে আমি শেষ পর্যন্ত কয়েকবার বিভিন্ন স্থানে ট্রেন বদলে প্রায় চারমাস আগে ভারোচে এসে পৌঁছাই। ভারোচ হতে ৬ মাইল দূরে পথিমধ্যে ঝাড়েশ্বর গ্রামে ঘোড়েশ্বর ও বৈদ্যনাথজীকে দর্শন করে তবরা গ্রামে এসে পৌঁছেছিলাম। নন্দদাসজী তবরার কপিলেশ্বর তীর্থের পাশেই বাস করছিলেন। দেখলাম, কলেরাতে আক্রান্ত হয়ে তিনি কঙ্কালসার হয়ে গেছেন। বরিশালে টেলিগ্রাম যোগে জানালাম তাঁর দৈহিক অবস্থার বিবরণ; এও জানালাম, তিনি শরীরে একটু বল পেলেই তাঁকে জোর করে এখান থেকে নিয়ে যাব। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, ঘটে এক। আজ ৫ দিন আগে তাঁর দেহান্ত হয়েছে। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তিনি একবার অমরকন্টকে গিয়ে মা নর্মদাকে দর্শন করতে বলে গেছেন। আমি তাঁর কাছে আসার কয়েকদিন পরেই তিনি ভারোচ হয়ে নর্মদা সেতু অতিক্রম করে হাঁসোটের সূর্যতীর্থ, অঙ্কলেশ্বর মহাদেব এবং বিমলেশ্বর দর্শন করতে পাঠিয়ে ছিলেন। দু জন সন্ন্যাসীকে আমার সঙ্গে দিয়েছিলেন। ঐ সব তীর্থদর্শন করে গিয়ে তাঁকে বেশ সুস্থই দেখেছিলাম, কিন্তু সহসা নিয়তি তাঁকে টেনে নিলেন। তিনি কট্টর বাউল হয়েও কিভাবে যে শৈবতে রূপান্তরিত হলেন, সে রহস্য আমার অজানা রয়ে গেল। তবে তাঁর শেষ নির্দেশ আমি পালন করবই। আপনার সঙ্গেই আমি অমরকন্টকে গিয়ে মাতৃদর্শন করতে চাই।'

তিনি নীরব হলেন। আমি আমার শয্যাতে বসেই সন্ধ্যা জপে মন দিলাম। আমার সন্ধ্যাক্রিয়া যখন শেষ হল, তখন দেখি তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমিও একটু পরে শুয়ে

পড়লাম। বাবার কথা এবং হরিধাম অতিক্রম কালে নৌকাতে বসে সমুদ্রের অভ্যন্তরে সেই তৃতীয় চক্ষু দর্শনের বিস্ময়কর দৃশ্য ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। গভীর রাত্রে একবার ঘুম ভাঙল হঠাৎ কোন শব্দে। মনে হল ঘরের বন্ধ দরজায় কেউ যেন ধাক্কা দিচ্ছে, নিশুতি রাত, জঙ্গলের পরিবেশে চারদিকেই যেন একটা ছমছমে ভাব। কোন হিংস্র জন্তু জানোয়ারও হতে পারে, চাই কি একটা বাঘই হয়ত এসেছে। ভয় পেয়ে আমি উঠে বসলাম, সেই সময় অদ্ভুত কণ্ঠের শব্দও কানে এল – হ্যাঁক্ হ্যাঁক্ হক্ক হক্ক ! আমি রঞ্জন বাউলের গায়ে ঠেলা মেরে ফিস্ ফিস্ করে ডাকতে থাকলাম – রঞ্জনদা ! রঞ্জনদা ! তিনি ধড়ফড় করে উঠে কয়েক সেকেণ্ড কান খাড়া করেই বললেন – ভয় পাবেন না ! কুচিলা খাঁই পাখীগুলো ডাকছে কুচিলা গাছে বসে। তবরাতে ঐ পাখীর ডাক আমি শুনেছি, দেখেওছি। দেখবেন, এক সময় ওরা আপনা হতেই হঠাৎই থেমে যাবে। এই বলে আবার তিনি পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন। সত্য সত্যই একটু পরেই 'হ্যাঁক্ হ্যাঁক্ হক্ক হক্ক' শব্দের বিরতি ঘটল। বাইরে কপাটে যে ধাক্কার শব্দ শুনেছিলাম তাও থেমে গেছে। অগত্যা আমিও বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন কানে ভেসে এল একতারার মৃদু টুং টাং ধ্বনি এবং গুণ্‌গুণ্ শব্দে গাওয়া গানের কলি। আমি বিছানা থেকে উঠেই পঞ্চায়েৎ-বাংলোর একটা জানালা ঈষৎ ফাঁক করে দেখলাম, চারদিক কুয়াশায় ঢাকা, গাছের পাতা হতে টুপটুপ শিশির পড়ছে, আবছা অন্ধকারে পথ ঘাট এখনও ঢাকা। এখন বাইরে বেরুনো যাবে না। কাজেই জানালাটা আবার বন্ধ করে সাথীকে বললাম, একটু গলা ছেড়েই গান, বসে বসে গান শুনি। তিনি তখন তাঁর কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামেই তুললেন –

> আমি কোথায় পাবো তারে
> আমার মনের মানুষ যে রে।
> হারায়ে সেই মানুষে, তার উদেশে দেশ বিদেশে
> বেড়াই ঘুরে।
> লাগি সেই হৃদয়-শশী, সদা প্রাণ হয় উদাসী
> পেলে মন হত খুশী,
> দিবানিশি দেখতাম তারে নয়ন ভরে।
> আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে, নিভাই কেমন করে ?
> ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে ? দেনা তোরা হৃদয় চিরে।
> দিব তার তুলনা কি, যার প্রেমে জগৎ সুখী,
> হেরিলে জুড়ায় আঁখি,
> সামান্যে কি দেখতে পায় তারে ?
> তারে যে দেখেছে সেই মজেছে ছাই দিয়ে সংসারে ॥

অত্যন্ত দরদ দিয়ে রঞ্জন বাউল, তাঁর একতারা বাজিয়ে গানখানি গাইলেন। গানের উদ্দিষ্ট মনের মানুষের বিরহে বাউল মাত্রেই কাতর হন। রঞ্জন বাউলও কাতর হয়েছেন। তাঁর চোখ দিয়ে অবিরল ধারে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। তিনি কিছুটা স্থির বা আত্মস্থ হতেই আমি উঠে ঘরের একমাত্র জানালাটি খুলে দিলাম। কুয়াশা প্রায় কেটে এসেছে। আকাশে সূর্যোদয়ের আভাস জেগেছে। আমি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে প্রাতঃকৃত্য করতে গেলাম। বাঁধ থেকে নেমে গেলাম বিমলেশ্বর মন্দিরের কাছে সেই পুকুরটিতে। মুখ হাত ধুয়ে বিমলেশ্বরজীকে প্রণাম করে ফিরে এসে দেখি, ইতিমধ্যেই রঞ্জন বাউল তাঁর গাঁঠরী বেঁধে প্রস্তুত হয়ে পড়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি আমার বিছানা কম্বলাদি সব গুছিয়ে আমার

গাঁঠরীটিও বেঁধে ফেলেছেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে দুজনেই পথে বেরিয়ে পড়লাম। আমার জিনিষপত্র তিনি সযত্নে বেঁধে দিবার জন্য মুখে কিছুটা অনুযোগ করলেও মনে মনে বুঝলাম, দূর পথে বিশেষতঃ বিদেশ যাত্রায় এইরকম সাথী পাওয়া সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই। পুনরায় বিমলেশ্বরজীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে আমরা পশ্চিমমুখী রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম খোওয়া এবং পাথর ফেলা একটা রাস্তা ধরে। এখন আমাদের লক্ষ্য অঙ্কলেশ্বর মহাদেবের স্থান।

সূর্যোদয় হয়ে গেছে। আজ ২রা অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার। সবে মাত্র গতকাল নৌকা থেকে নেমে এসে দক্ষিণতটের এই প্রসিদ্ধ তীর্থ বিমলেশ্বর মন্দিরে পৌছেই প্রায় বেলা দুটো পর্যন্ত মন্দিরেই কেটে গেছে। রঞ্জন বাউলের সঙ্গে পঞ্চায়েৎ বাংলোতে ঢোকার পর আর বাইরে বেরোই নি। শীতকালের বেলা ছোট হওয়ায় তাড়াতাড়ি সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসাতেই মনে হয়েছিল, হয়তা বা জঙ্গলের মধ্যেই আছি। কিন্তু এখন রৌদ্রোদ্ভাসিত পথে চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে বুঝলাম, বাঁধের ধারে এবং বাঁধ থেকে কিছুটা দূরে শাল সেগুন পলাশ মিটকুনিয়া শালাই প্রভৃতি গাছের জড়াজড়ি করে অবস্থান থাকলেও সেটুকু কেবল অল্পস্থান জুড়েই আছে। ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের 'কুপ' এর জ্বালাই এখানকার, অনেকাংশই সাফ হয়ে গেছে। অল্প গাছপালা দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তবে প্রস্তরময় বাঁধের ধারে ধারে কণ্টিকারী ঝোপঝাড় বড্ড বেশী বলে মনে হচ্ছে। বিমলেশ্বর মহল্লাকে একেবারে জনশূন্য বলা যায় না। দূরে দূরে কিছু কিছু ঘরবাড়ী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছি। বাঁধের ঢালে এবং নিচের দিকে দু দশ জন বাসিন্দারও চলাফেরা চোখ পড়ল। চলার পথেই একজন স্থানীয় বাসিন্দাকে অঙ্কলেশ্বরের পথ জিজ্ঞাসা করতেই সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন – সিধা। বীচ্ বীচ্‌মেঁ ছোটা ছোটা ঝাড়ি পথ!

আমরা দ্রুততালে ঝোপঝাড় এড়িয়ে হাঁটতে লাগলাম। মাইল পাঁচেক এইভাবে কঙ্কর ও প্রস্তরময় পথে হাঁটার পর আমরা একটা জঙ্গল পেলাম। রাস্তার দুপাশে বড় বড় শাল শিমুল বাত্‌রা ও শিশু গাছের ভীড়। আমরা সাবধানে পথের দু দিক লক্ষ্য করতে করতে হাঁটতে লাগলাম। জঙ্গলের ভিতরে আধ মাইলটাক হেঁটে যাবার পরেই আমরা দেখলাম আমাদের পথের বাঁ দিক দিয়ে তিন জন লোক কাছাকাছি কোন মহল্লা থেকে এসে পৌছলো। দুটি সাইকেল, একজনের সাইকেলের পিছনের ক্যারিয়ারে আরেকজন বসে এল। ক্যারিয়ারে উপবিষ্ট যুবকটি সাইকেল থেকে নেমেই অপর দুজনকে প্রণাম করেই বাঁধের উপর উঠে এল। যাঁর সাইকেলের পিছনে বসে এল, সেই বয়স্ক ভদ্রলোকের পরিচ্ছদ ও দীর্ঘ শিখা দেখেই অনুমান করলাম যে তিনি ব্রাহ্মণ। যুবকটিরও মাথায় শিখা, পরিধানে বস্ত্র ও তুলার বেনিয়ান। বয়স্ক ভদ্রলোক উচ্চৈস্বরে আমাদেরকে যা জানালেন তার সারমর্ম এই যে, যুবক তাঁর সন্তান। অঙ্কলেশ্বর মহাদেবের নিকটস্থ রামকুণ্ডের কাছে যুবকের মেশা ও মাসীমা বাস করেন। সেখানেই যুবকটি যাবে। এই জঙ্গলটুকু এক সঙ্গেই যেন আমরা অতিক্রম করি। আমরা সানন্দেই হাত তুলে সম্মতি জানালাম। যুবক বাঁধের উপর উঠে আসতেই আমি তার হাত ধরে কাছে টেনে নিলাম। তিনজন হাঁটতে হাঁটতে যুবকের দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছন ফিরে তাকাতেই দেখলাম, যুবকের পিতা তখনও সতৃষ্ণ নয়নে পুত্রের পথের পানে তাকিয়ে আছেন। এই দৃশ্য দেখেই আমার বুকটা গুর্‌গুর্ করে উঠল। বাবার কথা মনে পড়ে গেল! তিনিও এইভাবে আমি কোথাও গেলে, আমার চলার পথের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন কাতর দৃষ্টিতে। আমার চোখ জলে ভরে গেল।

রঞ্জন বাউল ইতিমধ্যে যুবকটির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতেই আলাপ জমিয়ে তুলেছেন। যুবকটি তাঁকে বলছেন শুনতে পেলাম – অঙ্কলেশ্বর মহাদেওজী বহুৎ জাগ্রৎ হৈ। উহাঁ রামকুণ্ডভী প্রসিদ্ধ তীর্থ হৈ। উহাঁ বহুৎ সে পৈদল পরিক্রমা করনে বালে আপকো মিল

যাবেগা। উধরই ভারোচ যানেকো নর্মদাজী পর পুল হৈ। অঙ্কলেশ্বর সে নাদোদ তক্ রেলবে সড়ক হৈ, বহুৎ আচ্ছা স্থান হৈ। উহাঁ সে হাঁসোট তক পক্কী সড়ক হৈ ইত্যাদি।

কতকটা ধাতস্থ হয়ে আমি এবার যুবকটির সঙ্গে কথাবার্তায় যোগ দিলাম। জঙ্গল যেন কিঞ্চিৎ গভীরতর হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। কথায় কথায় যুবকের কাছে জানতে পারলাম যে, যুবকের নাম নান্দুরাম। আর তিনমাস পরেই কাব্যের উপাধি পরীক্ষা দিবে। তার মেসোমশাই সংস্কৃতের বড় পণ্ডিত। তাঁর কাছে দুমাস থেকে পরীক্ষার প্রস্তুতি চালাবে। তাঁর মেশোমশাই-ই অঙ্কলেশ্বর মন্দিরের পুরোহিত এবং সেবাইৎ। অঙ্কলেশ্বরে চার পাঁচশ' লোকের বাস। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে নান্দুরাম জানালো যে, এই জঙ্গলে একটা বুড়ো বাইসন আছে। তার গায়ের রং পেকে বাদামী হয়ে গেছে। রণক্লান্ত ট্যাঙ্কের মত সে একা একা ঘুরে বেড়ায়, ধূলোতে গড়ায়। তাকে দুবার সে দেখেছে। বাইসনটাকে দেখে তার মনে হয়েছে জীবন সম্বন্ধে তার যেন কোন ঔৎসুক্যই নাই। ঐ বনে একটা বুড়ো সম্বরও আছে, এককালে ছিল সম্বরপালের সর্দার, এখন মনে হয় বিতাড়িত। একটা ছোকরা সম্বর [illegible] গায়ের জোরে বুড়োটাকে মেরে ক্ষতবিক্ষত করে তাড়িয়ে দিয়েছিল একদিন দল থেকে। ওর পুরানো সঙ্গিনীরা তখন কোন প্রতিবাদ করেনি। তার হয়ে একজনও ছোকরা সম্বরকে তাড়া করে যায় নি। সেদিন মূক উদাস চোখে কেবল তারা দাঁড়িয়ে থেকেছে। তারপর পুরাণো সর্দার একা একা আহত অবস্থায় চলে যেতেই নূতন সর্দারের উরু চেঁটেছে তারা প্রেম ভরে।

আমাদের দুজনের দিকে রঙ্গভরা দৃষ্টিতে একবার তাকিয়েই বলতে লাগল – জানেন, মাদী সম্বররা যে কোন যুবতী নারীর মতই। ওদের বিবেক নাই। ওরা যে কোন মূল্যেই ওদের সুখ ছিনিয়ে নিতে জানে পৃথিবীর কাছ থেকে।

কাব্যের ছাত্র কাব্যময় ভাষায় কথাগুলি বলেই শরীর দুলিয়ে হাসতে লাগল।

ক্রমে পথের ধারে এই ছোট্ট ঝাড়ি পথ একরকম নিরাপদেই পার হওয়া গেল। পথের দুধারে মাঝে মাঝেই শালগাছ ও অন্যান্য ছোট ছোট ঝোপঝাড়ের জটলা পেরিয়ে নান্দুরামের অনুসৃত পথে দ্রুততালে হাঁটতে হাঁটতে তাকেই সামনে রেখে আমরা বেলা ১টার সময় এসে পৌছলাম অঙ্কলেশ্বর মহল্লায়। অঙ্কলেশ্বরে লোকজনের অনেক বাড়ীঘর চোখে পড়ল। নান্দুরাম জানাল, এই মহল্লায় সাজোত্রী গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণ, গুজরাটী বৈশ্য, কিছু মাঝিমাল্লাদের বাসগৃহ ইতঃস্ততঃ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তারা নিজেরা সাজোত্রী গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণ, তার মেশোমশাই-এর বাড়ী রামকুণ্ডের ধারে। তিনিই এই মহল্লার সবচেয়ে সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত। তাঁর বাস গৃহের বাইরে একটি চতুষ্পাঠী গৃহ আছে। সেখানে বসেই তিনি সংস্কৃতানুরাগী ছাত্রদেরকে কাব্য এবং ব্যাকরণের পাঠ দিয়ে থাকেন। পথের বাঁক পেরোতেই আমাদের চোখে এক বিরাট রেলওয়ে পুল চোখে পড়ল। বিরাট পুল, সেই পুলের উপর দিয়ে একটি মালগাড়ীকে যেতে দেখলাম। রেলওয়ে ব্রীজের পাশ দিয়ে কিছু লোককে হেঁটে যেতে দেখলাম। নান্দুরাম জানাল, ঐ পুল নর্মদার উপর দিয়ে গেছে। পুল অতিক্রম করে কিছুটা হেঁটে গেলেই ভারোচ শহর। পরিক্রমাকারী পরিক্রমা ভঙ্গের ভয়ে সর্বথা ঐ পুলের পথ বর্জন করে চলেন। তবে সাধারণ লোক ঐ পুলের উপর দিয়েই ভারোচ শহরে যাতায়াত করে। আপনাদেরকে কেউ বলেছে কিনা জানিনা, বিমলেশ্বরে মাতা নর্মদার ধারা সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পরও তাঁর একটি স্বতন্ত্র ধারা যেমন দূর খাঁড়িতে গিয়ে সমুদ্রে লয় প্রাপ্ত হয়েছেন, তেমনই আর একটি ধারা আমাদের বাঁ দিক দিয়ে বয়ে চলেছেন। সামনে যে পুল ঐটি নর্মদার উপর দিয়েই গেছে, এজন্য একে নর্মদার পুলই বলা হয়। সমুদ্র এখান

থেকে প্রায় সওয়া ক্রোশ দূরে। এই মহল্লায় প্রায় দেড় দুহাজার লোকের বাস।

কথা বলতে বলতে অবশেষে আমরা অঙ্কলেশ্বর মন্দিরে এসে উপস্থিত হলাম। সামনেই একটি বড় তালাও বা পুষ্করিণী, যার নাম রামকুণ্ড। রামকুণ্ডের চার পাড়েই বহু সাধু সন্ন্যাসীর ছাউনী এবং গেরুয়া কাপড় রৌদ্রে শুকোতে দেওয়া হয়েছে দেখতে পেলাম। নান্দুরাম জানাল – ওঁরা সবাই পরিক্রমাবাসী বলেই মনে হচ্ছে। ওঁরা সবাই হাঁসোট পর্যন্ত যাবেন। আগে বিমলেশ্বর থেকে হরিধামে অর্থাৎ উত্তরতটে যাবার জন্য নৌকার চিঠি দেওয়া হত, কিন্তু এখন সে ব্যবস্থা নানা কারণে উঠে গেছে। এখন কয়েকজন শেঠ মিলিত হয়ে বিমলেশ্বরে সমুদ্র পার হওয়ার জন্য হাঁসোট থেকে নৌকার চিঠি করে দেন অর্থাৎ তাঁরাই পরিক্রমাবাসীদের নৌকার খরচ জুটিয়ে দেন, সমুদ্র পূজার জন্য নারকেল আদিও সংগ্রহ করে দেন। ঐ চিঠি না পেলে কারও পক্ষে সমুদ্র পার হওয়া সম্ভব হয় না। শুনেছি, যাঁরা উত্তরতট পরিক্রমা করে হরিধাম পৌঁছে দক্ষিণতটে আসতে চান, তাঁদেরকে নর্মদাতটের প্রসিদ্ধ বিকট মহাত্মা পূষণ গিরিজী মহারাজের নানা উৎকট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নৌকার চিঠি পেতে হিমসিম খেতে হয়।

নান্দুরামের এই কথা যে কত খাঁটি তা মনে মনে অনুভব করলাম। কারণ, নান্দুরাম তার শোনা কথা আমাদেরকে বলছে, কিন্তু আমি নিজেই যে ভুক্তভোগী! যাই হোক আমি সে বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করলাম না। অঙ্কলেশ্বর মন্দিরে পৌঁছে গাঁঠরী ঝোলা মন্দিরের দাওয়ায় রেখে কিছুক্ষণ জিরোবার জন্য বসে পড়লাম। নান্দুরাম আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে মহাদেবকে প্রণাম করে রামকুণ্ডের ও পাড়ে, তার মাসীমার ঘর চলে গেল।

বেলা বোধ হয় দুটা বাজতে যায়। মন্দিরে গাঁঠরী ঝোলা ফেলে রেখে আমরা কমণ্ডলু নিয়ে রামকুণ্ডে স্নান করতে নামলাম। স্নান তর্পণাদি সেরে মন্দিরে ঢুকলাম অঙ্কলেশ্বরের মাথায় জল ঢালতে। মন্দিরে কোন দরজা নাই। সুপ্রাচীন পাথরের মন্দির, হয়ত পূর্বে মজবুত দরজা ছিল, কালে কালে তা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে। কমণ্ডলুতে রামকুণ্ডের জল ভরে মন্দিরাভ্যন্তরে অঙ্কলেশ্বরকে দর্শন করেই আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বিরাট শিবলিঙ্গ। কলেবরও যেমন বিরাট, গাত্রবর্ণও তেমনি ঘোর ধূম্রবর্ণ। কাশীতে কেদারঘাটে কেদারনাথের আয়তন এবং আকৃতি যেমন, অঙ্কলেশ্বরের অবয়বও ঠিক সেই রকম দেখতে। পার্থক্য কেবল বর্ণে, খুঁটিয়ে দেখলে হিমালয়স্থ গৌরী-কেদারনাথের যেন অবিকল প্রতিরূপ! ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করে মহাদেবের মাথায় জল ঢালবার জন্য উদ্যোগ করছি, এমন সময় বম্ ববম্ ধ্বনি দিতে দিতে ত্রিশূলধারিণী একজটা এক ভৈরবী এসে রঞ্জন বাউলকে ঠেলে দূরে সরিয়ে মন্দিরের দ্বারে দাঁড়িয়েই আমাকে বলতে লাগলেন – বলো বেটা! ওঁ সর্বায় সর্বেশ্বরায় সর্বপতয়ে সর্বসম্ভবায় ওঁঙ্কলেশ্বরায় নমো নমঃ। ওঁ ভূতায় ভূতেশ্বরায় ভূতনাথায় ভূতসম্ভবায় ওঁঙ্কলেশ্বরায় নমো নমঃ। ওঁ সংসার ক্লেশ দগ্ধস্য মন্ত্রেনানেন শঙ্কর। প্রসীদ সুমুখোনাথ জ্ঞানদৃষ্টি প্রদোভব॥

সহসা এই ভৈরবী মূর্তির আবির্ভাবে আমি কিঞ্চিৎ চমকে উঠলেও ঐ মাতৃমুখে উচ্চারিত মন্ত্রপাঠ করতে করতেই মহাদেবের মাথায় জল ঢাললাম।

প্রণাম করে বাইরে আসতেই সেই ভৈরবী মা দুজনের দুহাত ধরে একরকম প্রায় টানতে টানতেই নিয়ে এলেন রামকুণ্ডের অগ্নিকোণে একটা ঝোপঝাড়ের আড়ালে একটা কুটীরে। সামনেই একটা বড় বেলগাছ। সেই বেলতলায় আমাদেরকে বসতে ইঙ্গিত করেই কুটীরের ভিতরে ঢুকলেন। একটু পরেই দুটো কলাপাতা আমাদের সামনে পেতে দিয়ে একটা পিতলের ছোট হাঁড়ি এনে তার থেকে কতকটা করে চরুর মত দ্রব্য ঢেলে খাবার জন্য ঈঙ্গিত করলেন। খাবার জলও দিলেন দুটো বড় বড় মাটির ভাঁড়ে। আমরা প্রথম থেকেই এই রহস্যময়ীর আচরণে সভ্য কথা বলতে কি হকচকিয়ে গেছি। কাজেই কোন উচ্চবাচ্য না

করে নীরবে সেই ঘৃতপক্ব গলা ভাত ধীরে ধীরে খেয়ে ফেললাম। খাওয়ার পরেই হাতমুখ ধুয়ে সাহসে ভর করে আমিই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম — প্রথম থেকেই সকলের কাছে শুনে আসছি, এই মহাদেবের নাম অঙ্কলেশ্বর। আপনি আমাকে মন্ত্রপাঠ করালেন ওঁঙ্কলেশ্বর বলে। কোনটি শুদ্ধ নাম। তিনি হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন — সংস্কৃত বা স্থানীয় গুজরাটী ভাষায় 'অঙ্কল' শব্দের কোন অর্থ হয় না। কথাটির শুদ্ধরূপ 'ওঁঙ্কলেশ্বর', ওম্ + কল্ + ঈশ্বর। ওঁঙ্কার হল মহাউদ্গীথ নাদস্বরূপ ব্রহ্ম। আর কল শব্দ কল্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ ভাবে। তার অর্থ মধুর অস্ফুট ধ্বনি — যে যে শব্দে স্পষ্টবর্ণ উচ্চারিত হয় না কিন্তু যা শুনতে মধুর সেই অব্যক্ত ধ্বনি। নর্মদার স্রোতের ধারাতেও এই মধুনিস্যন্দিনী অব্যক্ত নাদ অনুস্যূত আছে। তাঁর ঈশ্বর যিনি, তিনি ওঁঙ্কলেশ্বর। আবার কল শব্দটি কল্ ধাতুর উত্তর ক্তি + অচ্ প্রত্যয় করেও নিষ্পন্ন হয়। তখন তার অর্থ দাঁড়ায় যন্ত্র, যে যন্ত্রের মধ্যে অনাদিকাল ধরে বিশ্বের সেই অনাহত অনাদি ধ্বনি নিত্য গুঞ্জরিত হচ্ছে। ওঁঙ্কলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে ঐ মহা সঙ্গীত নিত্য ঝঙ্কৃত হচ্ছে। কোন সময়ে মন্দিরে বসে ধ্যানে বসলে আশুতোষের কৃপা হলে ঐ নিত্য প্রকটিত মহাসঙ্গীত শুনতে পাবি। এই বলেই তিনি অট্টাট্ট হাসিতে ফেটে পড়লেন। হাসির শেষে বিঘূর্ণিত লোচনে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন - ভাগো হিঁয়াসে। মশানিয়া কোটেশ্বরমেঁ ইস্‌কা পূরা স্বাদ মিলেগা। এই বলেই তিনি ত্রিশূল উঁচিয়ে ধরলেন। আমরা শশব্যস্তে তাঁকে প্রণাম করে চলে গেলাম ওঁঙ্কলেশ্বরের মন্দিরে।

মন্দিরে পৌঁছে দেখি, নান্দুরাম এবং তাঁর মেশোমশাই আমাদেরই খোঁজে এসে দাঁড়িয়ে আছেন মন্দিরে। আমরা নমস্কার বিনিময় করে ঐ ভৈরবীর প্রসঙ্গ তুললাম। তিনি শুনেই বললেন — আপনাদের ত দেখছি ভাগ্য খুবই ভাল যে, তিনি আপনাদের সঙ্গে খুবই সদয় ব্যবহার করেছেন, সাদরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ভিক্ষা দিয়ে সৎকার করেছেন। ওঁর উগ্রমূর্তি এবং ততোধিক উগ্র ব্যবহারের জন্য এখানকার কোন গৃহস্থী বা পরিক্রমাবাসী কেউ ওঁর ধারে কাছে ঘেঁসেন না। এই মন্দিরে বসে তিনি রাতভোর সাধনা করেন, শেষরাত্রিতে টলতে টলতে উঠে যান নিজের কুটীরে। এ ঘটনা এখানকার অনেকের এমন কি আমারও চোখে দু চারবার পড়েছে। ওঁর মুখে বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ এবং ভাবাবস্থায় ওঁর মুখ দিয়ে সংস্কৃত সংলাপ অনর্গল বেরোতে থাকে, তাও দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। ওঁকে বিদুষী এবং উচ্চকোটির সাধিকা বলেই আমি মনে করি। তবে মায়ের স্বভাবটি সত্যই বড় উগ্র। আজ তিন বৎসর হল, উনি এখানে এসেছেন। কোথা থেকে এসেছেন তাও কারও জানা নাই। এখানে কার সাহায্যে কি ভাবেই যে রাতারাতি কুটীর নির্মাণ হল, তাও আমরা কেউ জানতে পারিনি। একদিন সকালে খবর পেলাম যে, এই অঙ্কলেশ্বর মহল্লায় এক ভৈরবী মায়ের আবির্ভাব ঘটেছে। এই তপোভূমি নর্মদায় কত মহাত্মাই ত সহসা আসেন এবং কিছুকাল পরে নিজেদের ইচ্ছা মত অন্তর্ধান করেন, এই রকম বহু ঘটনার কথা ত জানি, তাই ঐ নিয়ে আমরা আর কেউ অনাবশ্যক কৌতূহল প্রকাশ করি নি।

গল্প করতে করতে আমরা মন্দির হতে তাঁর বাড়ীতে এসে পৌঁছে গেলাম। আগে থেকেই তাঁরা চতুষ্পাঠী গৃহে আমাদের বিশ্রামের আয়োজন করা ছিল। আমরা সেখানে গাঁঠরী আদি রেখে নিজেদের আসন বিছিয়ে নিলাম। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পণ্ডিতজী আরতি করতে গেলেন ওঁঙ্কলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে। আমরা দুজনও বেরিয়ে পড়লাম পুনরায় মন্দিরের পথে। রামকুণ্ডের জলে হাত মুখ ধুয়ে মন্দিরে গিয়ে দাঁড়ালাম, হাতজোড় করে। পরিক্রমাবাসী যত সাধু এখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা প্রায় সবাই এসে উপস্থিত হয়েছেন। ঘণ্টাধ্বনি সহ আরতি শুরু হতেই সাধুরা শিঙা ডম্বরু বাজিয়ে শিবস্তোত্র পাঠ করতে থাকলেন। আরতির শেষে আমাদের বিশ্রামস্থলে পৌঁছে দেখি, ঘরে নান্দুরাম একটি হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রেখে গেছে। আজ সারাদিন খুব ধকল গেছে, দীর্ঘপথ হেঁটে এসেছি

হ্যারিকেনের দম কমিয়ে বাইরের বারান্দায় রেখে এসে আমরা দুজনে অর্ধশায়িত অবস্থায় কম্বল মুড়ি দিয়ে গল্প করতে লাগলাম। আমি রঞ্জন বাউলকে জিজ্ঞাসা করলাম – আচ্ছা ভাই, আপনারা যে নিজেকে 'বাউল' বলে পরিচয় দেন, চৈতন্যচরিতামৃতে অদ্বৈতপ্রভুর মুখ দিয়ে যে লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'বাউল' শব্দ ব্যবহার করেছেন তার সাধারণ অর্থ ত ব্যাকুল ! ব্যাকুলের অপভ্রংশ বাউল। কিন্তু বাউল বলতে যখন এক বিশিষ্ট সাধক গোষ্ঠীকে বুঝায় তখন তার অর্থ কি দাঁড়াবে ?

– বাউল শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করেছেন। অনেকে বলেন বাউল শব্দটি 'বায়ু' শব্দের সঙ্গে 'আছে' এই অর্থদ্যোতক 'ল' প্রত্যয় যোগে বাউল শব্দ নিষ্পন্ন এবং এই 'বায়ু' শব্দের অর্থে যোগশাস্ত্রের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চারকে বুঝায়। যে সম্প্রদায় দেহের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চারকে সঞ্চয় করার জন্য সাধনা করে, তারাই প্রকৃত অর্থে বাউল। কারও মতে, 'বায়ু' মানে নাসার শ্বাস-প্রশ্বাস এবং শ্বাস-প্রশ্বাসই জীবনধারা; সেই শ্বাস-প্রশ্বাসকে সংরোধ ও সংযম করে যারা দীর্ঘজীবন লাভ করার সাধনা করেন, তারাই বাউল নামে পরিচিত।

আমি দীর্ঘকাল বাউলদের সঙ্গে মেলামেশা করে যেটুকু বুঝেছি, তাতে মনে হয় এই সম্প্রদায় রসের সাধক। তাদের সংগীতের সাধনাও এই রসেরই সাধনার বহিঃপ্রকাশ বলেই মনে হয়। যেখানে বাক্য আর অর্থ প্রকাশ করতে পারে না, তখন সেখানে আসে কবিতা, কবিতা যেখানে ভাবের নাগাল পায় না, সেখানে আসে গান। বাউলদের মরমিয়া অনুভব সেইজন্য গানের আকারেই প্রকাশ পেয়েছে, তাদের সাধনার অঙ্গ হয়েছে গান। বাউলরা সামাজিক কোন রীতিনীতি মেনে চলতে চায় না। এরা সমাজে মৃতকল্প হয়ে বাস করতে চায়। এই জীবন্মৃত অবস্থাকে সুফী সাধকরা বলেন – ফর্ণা, আর বৈষ্ণব সাধকরা বলেন 'জীবন্মুক্ত' বা 'প্রাপ্তব্রহ্মলয়'। বাউলদের মতে জীবনে প্রেম মানে জীবনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে প্রাণসম্পদ ও প্রাণের উল্লাস, Joy de vivre, কেবল বেঁচে থেকে সৌন্দর্য সম্ভোগের আনন্দ। নন্দদাসজীর মুখে শুনেছি, একেই নাকি অর্থববেদে 'উচ্ছিষ্ট' বলা হয়েছে; উচ্ছিষ্ট অর্থে যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। আপনার পোটলাতে ত দেখছি বেদগ্রন্থ আছে ; আপনি কি কোথাও এই 'উচ্ছিষ্ট' শব্দের উল্লেখ পেয়েছেন ?

আমি তাঁকে জানালাম, অথর্ববেদে কোথাও 'উচ্ছিষ্ট' শব্দ চোখে পড়েনি। তবে অথর্ববেদের ১০ম কাণ্ডের চতুর্থ অনুবাক এবং পঞ্চদশ কাণ্ডের ২য় অনুবাক আলোচনা করলে তাতে 'ব্রাত্য' নামে এক সম্প্রদায়ের পরিচয় পাই। তারা কোন প্রকারেরই বিধি নিষেধ বা শাস্ত্র-শাসনের অধীনতা স্বীকার করতেন না। এইজন্য তাঁদের নাম হয়েছিল ব্রাত্য বা ব্রতহীন। তারা নিজের নিজের অন্তরের বুদ্ধি বা প্রেরণা দ্বারা নিজেদের পরিচালিত করত। যারা এইভাবে স্বাধীন বিচার বুদ্ধিবশে জীবন নির্বাহ করত, তাদের প্রশংসা করে অথর্ববেদে বলা হয়েছে –

ব্রাত্য আসীদ্ ঈয়মান এব, স প্রজাপতিং সমৈরয়ৎ।

অর্থাৎ ব্রাত্য ছিলেন চলমান ও গতিশীল, তিনি কোন বন্ধনে আবদ্ধ নন, তিনি স্বয়ং জীবন বিধাতাকে সঞ্চালিত করেন।

সোহবর্ধত স মহান্ অভবৎ, স মহাদেবোহভবৎ।

– সেই ব্রাত্য বর্ধিত হয়েছিলেন, তিনি মহান হয়েছিলেন, তিনি মহাদেব হয়েছিলেন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দেবত্ব লাভ করেছিলেন।

· যদ্ এনম আহ – ব্রাত্য যথা তে প্রিয়ং তথাস্ত্বিতি, প্রিয়ং এব তেনাবরুদ্ধে

যিনি ব্রাত্যকে বলতে পারেন, হে ব্রাত্য, তোমার যেরূপ ইচ্ছা তাই হোক, তিনি তার দ্বারা নিজের প্রভু হতে পারেন। বাউলরা এই ব্রাত্যদেরই স্বাধীন ভাবের আরাধনার যথার্থ উত্তরাধিকারী। বাউলরা বলেন – সত্যকে যে কোন ভাবে লাভ করতে হবে এবং সেই সত্য স্বরূপ তিনি, যিনি মানুষের অন্তর্যামী।

যে পুরুষে ব্রহ্মবিদুস্ তে বিদুঃ পরামেষ্ঠিনম্।

অর্থাৎ যে মানুষের মধ্যে বৃহত্মকে উপলব্ধি করতে পারে, সে পরম দেবতাকে জানতে পারে।

আমি রঞ্জন বাউলের দৃষ্টিতে দৃষ্টি স্থাপন করে বেশ জোর দিয়েই বললাম, বেদোক্ত ব্রাত্যদের সাধনাই যদি বর্তমান বাউল সম্প্রদায়ের সাধনার ক্রম হয়ে থাকে, তাহলে আপনারা ধন্য। কারণ বেদ বলেছেন

তস্মাদ্ বৈ বিদ্বান্ পুরুষম্ ইদং ব্রহ্মেতি মন্যতে।
সর্বাহ্যস্মিন্ দেবতা, গাবো গোষ্ঠ ইবাসতে॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষকে নিশ্চিত রূপে সম্যক রূপে জানে, তখন সে তাকে অর্থাৎ প্রতিটি মানুষকেই বৃহৎ ও ব্রহ্ম বলে মানতে বাধ্য। সে হেন অনুভবী পুরুষের শরীরে সকল দেবতা অবস্থান করে থাকেন, যেমন গোষ্ঠে বহু গো একত্র অবস্থান করে। এখানকার বাউলরা বেদোক্ত ব্রাত্য বা যথার্থ বাউল হতে পারলে সে তো বড়ই আনন্দের কথা।

আচ্ছা ভাই, আপনি যে বাউল হয়েছেন আপনার গুরু কে ? নন্দদাসজী কি আপনার গুরু ছিলেন ?

আমার কথা শুনে ঘুম জড়ানো কণ্ঠে তিনি দুলাইন গান গুণ্গুণ্ করে গেয়ে উঠলেন –

জীবে জীবে চাহিয়া দেখি্ সবই যে তার অবতার,
ও তুই নূতন লীলা কী দেখাবি, যার নিত্যলীলা চমৎকার !

তারপরই একেবারেই নীরব হলেন। একটু পরেই তাঁর মৃদু নাসিকা ধ্বনি শুনতে পেলাম। বুঝলাম তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আজ সারাদিনই কোথাও বিশ্রাম না নিয়ে একটানা হেঁটে এসেছি, কাজেই এই ক্লান্তি স্বাভাবিক। আমারও হাত পা টন্ টন্ করছে, ঘুম পাচ্ছে। ভাল করে কম্বল মুড়ি দিয়ে আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেখি রঞ্জন বাউল তাঁর একতারা নিয়ে বড়ই মধুর সুরে গেয়ে চলেছেন –

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন ?
তোর অথিক গুরু, পথিক গুরু, ও তোর গুরু অগণন,
ও তোর গুরু সর্বজন।
গুরুরে তোর বরণ-ডালা, গুরুরে তোর মরণ-জ্বালা,
গুরুরে তোর হৃদয়-ব্যথা, যে ঝরায় দু নয়ন॥
ও তুই গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন ?

আমি বিছানা ছেড়ে উঠে নিজের গাঁঠরী বেঁধে ফেললাম। তাঁকেও বললাম – সব গুছিয়ে নিন ভাই, প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে কুয়াশা কেটে গেলেই হাঁসোটের পথে যাত্রা করব। আমাদের প্রাতঃকৃত্য সারতে সারতেই দেখলাম, কুয়াশা ধীরে ধীরে সরে যেতেই পরিষ্কার ভাবে পথ ঘাট দেখতে পেলাম। সদর দেউড়ীতে তখন নান্দুরামের মেশোমশাই বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। তিনি একটি বেঞ্চিতে বসে সশব্দে উচ্চারণ করতে লাগলেন –

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাঽক্ষরদ্বয়ং
আপদস্তস্য নশ্যন্তিতমঃ সূর্যোদয়ে যথা॥ দুর্গা ! দুর্গা ! দুর্গা !

অর্থাৎ নিত্য প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করে যে ব্যক্তি 'দুর্গা দুর্গা' এই দুটি অক্ষর স্মরণ করে, সূর্যোদয়ে যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয়, সেইরকম ভাবে তার সমস্ত বিপদ-আপদ দূর হয়। আমি তাঁর কাছে গিয়ে জানালাম যে, আমরা এখনই হাঁসোটের পথে যাত্রা করতে চাই। আপনার আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাকে ছোট করতে চাই না। আপনি ব্রাহ্মণ, তায় আবার ওঁঙ্কলেশ্বর ভগবানের সেবক। আপনি আর্শীবাদ করুন, আমরা যেন নিরাপদে পরিক্রমা যথোচিত ভাবে শেষ করতে পারি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বললেন – সে কি, আপনারা আমার আতিথ্য গ্রহণ করলেন কোথায় ? আপনারা ত আমার বাড়ীতে জল ছাড়া কিছুই গ্রহণ করেন নি ? পরিক্রমাবাসীরা একাহারী হন, বিশেষতঃ সূর্যাস্তের পর ত পরিক্রমাবাসীকে কিছু গ্রহণ করতে বলাও ত গৃহীর পক্ষে অপরাধ ! তাই আমার গৃহে কিছু গ্রহণ করার জন্য অনুরোধও করি নি। আমি সবিনয়ে জানালাম, এই দুর্দান্ত শীতের রাতে মুক্ত আকাশের তলায় পড়ে থাকতে হলে আমাদের নিদারুণ কষ্ট হত। আপনার চতুষ্পাঠী গৃহে স্থান পাওয়ায় সে কষ্ট থেকে ত বেঁচেছি। মা নর্মদা আপনার পরিবারের মঙ্গল করুন। এই রকম কয়েকটি মামুলি শিষ্টাচার পূর্ণ বাক্যালাপের পরেই আমরা দুজনে নিজের গাঁঠরী নিয়ে কুণ্ডের ধার দিয়ে ওঁঙ্কলেশ্বর মন্দিরে এলাম মহাদেবকে প্রণাম করতে। মহাদেবকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়েছি, এমন সময়ে, আমাদের দুজনকে বেষ্টন করে একটি দড়ির ফাঁস আমাদের গায়ে এসে পড়ল। চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি, সেই ভৈরবী মা অত্যন্ত শান্তমুখে দড়িটি হাতে নিয়ে হাসছেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন - 'সবেরে সবেরে কঁহা ভাগতে হো বেটা ? ইধর সমুচা তীর্থ ত আভিতক্ দর্শন নাহি কিয়া। ইস্ মহান তীর্থকা বারেমেঁ সব বাত ত শুনা ভি নাহি।' আমি বললাম – মা। আমরা হাঁসোট যাবো বলে সংকল্প করে বেরিয়েছি।

– তব যাইয়ে, লেকিন, ফিন হাঁসোট সে লোটকে ইধর আনে পড়েগা। আয়েগা ত ? বাত দেকর্ যাইয়ে। আপ ত পরিক্রমাবাসী হৈ। পরিক্রমাকী বখৎ যো সংকল্প মন মেঁ উদয় হোগা, উহ্ ত পালন করনেই পড়েগা। আভি হম আপকো রুকেগা নেহি। লেকিন, ইধর আকর হামারা সাথ ফিন ভেট করিয়েগা।

দড়ির ফাঁসটা খুলে নিয়ে তিনি বললেন চালিয়ে ম্যায় ভি তুমহারা সাথ পুলকা নীচা তক যায়েগা। ইয়ে ওঁঙ্কলেশ্বর সে জো নাদোদ কে লিয়ে ছোটী লাইন গঈ হৈ উসকা গুমানদেব রেলবে ষ্টেশন হৈ। উহাঁ হনুমানজীকা মন্দির হৈ। হম উস্ মন্দিরমেঁ আজ যাত্রা করেঙ্গে।

কাল তাঁর যে উগ্ররূপ দেখে ভয় পেয়েছিলাম, আজ তা দেখছি না। এখন তাঁর শান্ত সৌম্য ও হাস্যময়ী রূপ দেখে আমাদের খুবই ভাল লাগল। তিনি আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন পুলের দিকে, যে পুল রেবা-সাগরের উপর দিয়ে ভারোচ পর্যন্ত গিয়েছে। পথে যেতে যেতে ভৈরবী মা বলতে লাগলেন – হাঁসোট এই ভারোচ জেলার মধ্যে ওঁঙ্কলেশ্বর তালুকের অন্তর্ভুক্ত। ওখানে আছে প্রসিদ্ধ সূর্যকুণ্ড, সূর্যকুণ্ডের উপরের হংসেশ্বর মহাদেবের মন্দির। সূর্যদেবের তপস্যা স্থল। ওখানকার পুরোহিত এবং সাধারণ পরিক্রমাবাসী সাধুদের কাছে শুনতে পাবে রামায়ণ মহাভারতোক্ত কিংবা কোন পুরাণ বর্ণিত সূর্যদেবের কাহিনী। তা নিশ্চয় মন দিয়ে শুনবে কিন্তু আমার কাছে শুনে রাখ হাঁসোটের ঐ সূর্যকুণ্ড বেদোক্ত সূর্যনারায়ণের তপস্যা ক্ষেত্র। সিদ্ধ তপস্থলী ! বেদে সূর্য, সবিতা, আদিত্য, বিবস্বান ও বিষ্ণু, এই পাঁচটি বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন মহিমায় সূর্যের বন্দনা মন্ত্র পাওয়া যায়। নিরুক্তকার মহর্ষি যাস্কের মতে, আকাশ হতে যখন অন্ধকার অপসৃত হয়, কিরণ বিস্তৃত হয়, সেইটি সবিতার কাল। সায়নাচার্যের মতে সূর্য উদয়ের পূর্বে যে মূর্তি বা রূপ আকাশে প্রকটিত হয়, তিনিই সবিতা আর উদয় হতে অস্ত পর্যন্ত তাঁর যে রূপবিভা তাকে

সূর্য নামে অভিহিত করা হয়। এই সূর্যের উদয়গিরিতে আরোহণ, মধ্য আকাশে স্থিতি এবং অস্তাচলে অস্তাগমন, এই তিনটি পর্যায়কে বিষ্ণুর পদবিক্ষেপ বলে শাস্ত্রে বর্ণিত। বিবস্বান শব্দে আকাশকেও বুঝায়।

ঋগ্বেদের ১০টি সূক্তে সূর্যনারায়ণের স্তুতি আছে। সেই সূর্য জড় জ্যোতিঃ পিণ্ড নন, ইনি সূর্যমণ্ডল মধ্যবর্তী দেবতা। আলোকোদ্ভাসিত আকাশ তাঁর মুখ, সূর্যমণ্ডল তাঁর চক্ষু, তিনি হিরণ্যপাণি, সর্বদর্শী, বিশ্বভুবনের চর, মর্ত্যজনের সমূহ সৎ ও অসৎকর্মের সাক্ষী। হিরন্ময় সপ্তাশ্ব যোজিত একচক্ররথে ইনি বিশ্ব পর্যটন করেন। বরুণ এঁর পথ পরিষ্কার করে দেন। সূর্য দেবতাই মানুষকে কর্মে প্রবর্তিত বা জাগ্রত করেন। স্থাবর ও জঙ্গম, সমস্ত পদার্থের ইনি প্রাণস্বরূপ। সমস্ত প্রাণী এঁরই অধীন, ইনিই বিশ্বস্রষ্টা। প্রেমিক যেমন প্রেমিকাকে তদ্‌গতচিত্ত হয়ে অনুসরণ করেন, তেমনি ভাবে সূর্যও ঊষার অনুগমন করেন। বেদের এক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে স্বর্ভানু নামক রাক্ষস অন্ধকারে সূর্যকে আচ্ছাদন করে গ্রহণ করে। এই ঘটনাকেই পুরাণাদিতে রূপকের আকারে রাহু কর্তৃক সূর্যকে গ্রাসের কথা বলা হয়েছে। অবশ্য অথর্ববেদে রাহুর উল্লেখ প্রথমে পাওয়া যায়।

সূর্য সময়ের সৃষ্টি কর্তা। ইনি ৩৬০ দিনে সম্বৎসর গঠন করেন। সূর্য চক্রে বারটি অরা (মাস) আছে। তা আকাশে ৭২০ বার (৩৬০ দিন + ৩৬০ রাত্রি) আবর্তিত হয় অথর্ববেদ এবং আরণ্যকে সপ্তসূর্যের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে তাকেই সপ্তাশ্ব ও সপ্তরশ্মি বলা হয়েছে। সূর্য সপ্তাশ্ব বাহিত রথে চংক্রমণ করেন, কাব্য পুরাণাদির এই রকম আলংকারিক বর্ণনা পড়ে তোমরা কখন যেন ভেবে বস না যে, সত্য সত্যই সাতটা ঘোড়ায় সূর্যের রথ আকাশ পথে ঘুরে বেড়ায়!

গল্প করতে করতে আমরা পুলের তলায় পৌঁছে গেছি। ভৈরবী মা সামনের দিকে একটি পাকা রাস্তা দেখিয়ে বললেন - ইয়ে লম্বি সড়ক সিধা হাঁসোট তক্ চলা গিয়া। আপ্ ইস্ রাস্তাকো পাকড়ো। সূর্যকুণ্ড ঔর হংসেশ্বর মহাদেওকো দর্শন করকে হমারা পাশ জরুর আইয়েগা। এই বলে তিনি ষ্টেশনে যাওয়ার জন্য পুলের নিচ থেকে বাঁধানো পাকা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। আমরা পশ্চিমাভিমুখী রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। এদিকে আর জঙ্গল নাই। পাকা রাস্তার দুধারেই নানা দোকান পসরা, গ্রাম গঞ্জ ছড়িয়ে আছে। রাস্তার উপর লোক চলাচলও কম নয়। রঞ্জন বাউল তাঁর ঘড়ি দেখে বললেন এখন সকাল সাড়ে সাতটা। আমরা দুজনে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে হাঁটতে লাগলাম দ্রুততালে। একটানা হেঁটে বেলা প্রায় ১০টা নাগাদ রাস্তার ধারে একটা ছায়াঘেরা অশ্বত্থ গাছের তলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার জন্য বসলাম দুজনে। কাঁধ থেকে গাঁঠরী ঝোলা নামিয়ে একটা বাঁধানো কুঁয়াধারে গিয়ে দেখলাম, কুঁয়াতে অগাধ স্বচ্ছ জল টল্‌টল্ করছে কিন্তু কুঁয়াতলায় কোন দড়ি বালতি নাই। কি করে পিপাসা মেটাবো ভাবছি, এমন সময়ে প্রায় দু'শ গজ দূর থেকে একটি সাধারণ লোককে দড়ি বালতি হাতে নিয়ে দৌড়ে আসতে দেখলাম। লোকটি এসে আমাদেরকে বালতি ভরে কুঁয়া থেকে জল তুলে দিল। এখানকার জল লোনা নয়, মিষ্টি জল, স্বচ্ছ ও স্নিগ্ধ। হাতে মুখে জল দিয়ে আমরা পেটভরে জল খেলাম। আমি রঞ্জন বাউলকে বললাম, এই আমাদের সনাতন ভারতের একটি প্রধান শিক্ষা। নিকটস্থ বস্তির দিকে তাকিয়ে দেখুন, এরা আমাদের দীনদরিদ্র ভারতবাসী, কিন্তু সনাতন সংস্কৃতি এদের অস্থিমজ্জাগত। আমাদেরকে পিপাসার্ত বুঝতে পেরে অতদূর থেকে দৌড়ে এসেছে দড়ি বালতি নিয়ে। আকণ্ঠ জল পান করে, আমরা গাছতলায় এসে বসেছি, দেখলাম, লোকটিও ধীরে ধীরে আমাদের কাছে এসে বসল। জিজ্ঞাসা করল - আপ্ পরকম্মাবাসী বা? রঞ্জনদা উত্তর দিলেন - ম্যাঁয় নেহি হুঁ, লেকিন মেরা সাথী পরকম্মাবাসী জরুর।

লোকটি তখন আমার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে জানাল যে, তার গুরুদেব নর্মদা তটে তটে পরিক্রমা করে ১০ বছর ঘুরেছেন। গত পাঁচ মাস আগে, 'নানা বিমারীতে' ভুগে এখানে এসে পৌঁছেছিলেন। লোকটি তাঁকে নিজের ঘরে রেখে নানারকম 'ইলাজের' ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু আজ দুমাস আগে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি প্রলাপের ঘোরে বলতেন – সুরত যমুনা বহি জ্ঞান মথুরা বসা। গ্রাম গোকুল বিশোয়াস আয়া। শান্তি যশোদা দেওকী, সত্‌গুরু নন্দ বসুদেও যদু প্রীতি লায়া। জিও ও বরম্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলদেও জি কংস অহংকার কো মার লায়া। বিবেক বৃন্দাবন সন্তোষ কা কদম্‌ হৈ। গোয়াল দ্বীং বিচ দয়া। সন্দেশা শ্রীরাধিকা শোলকী গোপ্তা তত্ত্ব লৈছিন খায়া। এই 'লফজ' গুলি বলতে বলতেই তাঁর দেহান্ত হয়। গুরুদেব তাঁর অন্তিমকালে এই কথাগুলি অনেকবার আওড়েছেন। কথাগুলি বারবার শুনে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু অর্থ কিছু বুঝতে পারিনি। এখান দিয়ে অনেক সাধু যাতায়াত করে থাকেন। তাঁদের অনেককে ঐ শব্দগুলির অর্থ জিজ্ঞাসা করেছি। কিন্তু ঐ গুলিকে তাঁরা মুমূর্ষু ব্যক্তির বিকারের ঘোরে প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, তাঁর অন্তিম বাক্যগুলির সত্যই কি কোন 'মতলব' আছে? না কি প্রলাপ?

আমি তাঁকে বললাম – আপনার গুরুদেবের বাক্যগুলি মোটেই বিকারের ঘোরে প্রলাপ নয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ইষ্টচিন্তায় তদ্‌গত হয়ে ভাবাবস্থায় যা বলেছিলেন, তার অর্থ হল – মনোরূপী যমুনা নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে। জ্ঞানরূপী মথুরাপুরী বসে গেছে বা ধ্বসে গেছে। বিশ্বাস-রূপী গোকুল গ্রাম উৎপন্ন হয়েছে। শান্তি জেগেছে মনে ; ঐ শান্তি হলেন যশোদা ও দেবকী স্বরূপিনী। সদ্‌গুরু হলেন নন্দ ও বসুদেব স্বরূপ, প্রীতি যদুকুল স্বরূপ। জীবও ব্রহ্মরূপ কৃষ্ণ ও বলদেব অহংকার রূপ কংসকে ধ্বংস করেছে। বিবেক বৃন্দাবন স্বরূপ। সন্তোষ কদম্ব বৃক্ষস্বরূপ হয়েছে। শরীরের অভ্যন্তরস্থিত দয়া হল গোপ ও গোপাল স্বরূপ। সন্দেহ রূপ অর্থাৎ জিজ্ঞাসা রূপিনী শ্রীরাধিকা তত্ত্ব রূপ (ননী) জোর করে কেড়ে নিয়ে ভক্ষণ করেছেন।

আপনার গুরুদেব নিশ্চয়ই কৃষ্ণ ভক্ত ছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে নর্মদা পরিক্রমা করার ফলে তপঃস্বরূপিনী মা নর্মদা তাঁকে তপস্যার ফল দান করেছেন। তাঁর সারাজীবনের তপস্যার ফল ভাবানুভূতি রূপে অন্তিমকালে আত্মপ্রকাশ করেছিল। আমার কথা শুনে লোকটি আনন্দে বিহ্বল হয়ে কাঁদতে থাকল। আমরা তাঁকে প্রবোধ দিয়ে ঝোলা গাঁঠরী কাঁধে তুলে পুনরায় হাঁটতে লাগলাম হাঁসোটের পথে। প্রায় ঘণ্টাখানিক হেঁটে যাবার পর আমরা পাকা রাস্তার নিচে একটা বটগাছের তলায় একজন বৈষ্ণব বাবাজীকে শুয়ে থাকতে দেখলাম। তিনি আমাদেরকে দেখতে পেয়েই হাত নেড়ে তার কাছে যাবার ইঙ্গিত করলেন। আমরা রাস্তা থেকে নেমে তাঁর কাছে যেতেই অত্যন্ত কাতর কণ্ঠেই বললেন – হমারা লাঠি টুট গিয়া। হম গির গয়ে থে। একঠো পায়ের কা নখুন ভি ফাঁসা হৈ। দেখিয়ে আভিতক খুন নিকালতা হৈ। মুঝে থোড়া মদত দিজিয়ে।

আমরা তার পায়ের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। হোঁচট খেয়ে তাঁর ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের নখটি জখম হয়েছে সেখান থেকে তখনও বিন্দু বিন্দু রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তিনি বললেন – আমি অনুমান করছি আপনারা বোধহয় হাঁসোটেই যাচ্ছেন। হাঁসোটে কাছারী বাড়ী হতে কিছু দূরেই আমার একটা ঝোপড়া আছে। সেখানেই আমার ঠাকুরজী থাকেন। সকালে তাঁর পূজা করে ভিক্ষায় বেরিয়েছিলাম। পথিমধ্যে এই বিভ্রাট। ফিরে গিয়ে ঠাকুরজীর ভোগের বন্দোবস্ত করতে হবে। এখান থেকে পাঁচ ছ মিনিট হেঁটে গেলেই এক কম্পাউণ্ডার বাবা থাকেন! তাঁর দাবাখানা পর্যন্ত যদি আমাকে ধরে ধরে নিয়ে যান, তাহলে সেখানে 'দাবা কর লেঙ্গে, তব আসানি সে হাঁসোট মেঁ পহুঁচ যাবেঙ্গে'।

অগত্যা আর কি করা যায় ! আমরা যে যার গাঁঠরী কাঁধে নিয়ে, তাঁকে মাঝখানে রেখে দুজনে দুদিক দিয়ে তাঁর দুহাত জাপ্‌টে ধরে ধীরে ধীরে নিয়ে যেতে থাকলাম । তিনি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে মাঝে মাঝেই আর্তকণ্ঠে বলে চলেছেন – হরি হর । হর নর্মদে !

এই সময় রাস্তার উপর একটা হাতে টানা রিক্সা হাঁসোটের দিক থেকে এদিকে আসতে দেখা গেল । রঞ্জনদা আমাকে বললেন – আমার কাছে এখনও কিছু টাকা আছে, রিক্সাওয়ালাকে থামিয়ে এঁকে রিক্সার উপর তুলে দিই । এই বলে তিনি রিক্সাওয়ালাকে হাত তুলে দাঁড় করালেন । কিন্তু বাবাজী কিছুতেই রিক্সাতে উঠতে চাইলেন না । বললেন – সব আদমী নারায়ণজীকা দাস হ্যায় । হম্ ক্ষুদ্ দাস হোকর, সেবক হোকর ক্যায়সে উনকা সেবা গ্রহণ করেঁ ? এই বলে জিভ্ কেটে ঘাড় নাড়তে লাগলেন । অগত্যা রিক্সাওয়ালাকে বিদায় দিয়ে আমরাই তাঁকে হাত ধরে নিয়ে যেতে থাকলাম । তাঁর কাঁধের ঝুলিটিও বেশ ভারী, নানা ভিক্ষা দ্রব্যে পরিপূর্ণ ! যাইহোক, আধঘণ্টা অতি মন্থর গতিতে হেঁটে হেঁটে তাঁর পরিচিত সেই দাবাখানায় এসে পৌছলাম ! কম্পাউণ্ডার বাবু তাঁকে দেখেই তাঁর কাছে এসে প্রণাম করেই তাঁকে সাদরে বসালেন তাঁর ডাক্তারখানায় এবং দ্রুত বোরিক পাউডার মিশ্রিত গরম জলে তাঁর ক্ষতটি ধুইয়ে সেখানে প্রয়োজনীয় ঔষধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন এবং কিছু বড়িও খাইয়ে দিলেন । সেখানেই বেলা সাড়ে বারটা বেজে গেল ।

ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়েই দেখলাম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হলেও কতকটা স্বস্তির মধ্যে বাবাজী সাবধানে হাঁটতে পারছেন । আমার লাঠিটা তাঁর হাতে দিয়েছি । তিনি আগে আগে চলেছেন । তাঁর পিছনে আমরা দুজন । এইভাবে মাইল খানিক হেঁটে রাস্তার দিকে বাঁক ফিরতেই দূরে অনেক বাড়ী ঘর দু'তিনটা মন্দির চোখে পড়ল । তিনি আমাদেরকে বলতে লাগলেন – ঐ যে হাঁসোটের হংসেশ্বর মন্দির দেখা যাচ্ছে । হাঁসোট সমুদ্রতীরে অবস্থিত হলেও সমুদ্রের জল প্রায় এক ক্রোশ দূরে । ঠিক ঠিক শহর না হলেও হাঁসোটকে একটা বড়গঞ্জ বলা যায় । প্রায় পাঁচ ছয় হাজার লোকের বসতি আছে । ওখানে বাজার, পোষ্ট অফিস, কাছারী নানা দোকান পসরা সবই আছে । ঐখান হতে পাঁচ ছয়জন গুজরাটি শেঠ পরিক্রমাবাসীদের উত্তরতটে যাবার জন্য নৌকার বন্দোবস্তো করে দেন । প্রয়োজনীয় পূজার দ্রব্য নারিকেল ও কড়াই প্রসাদ সমুদ্রে অর্পণের জন্য যাবতীয় খরচ তাঁরাই বহন করেন । আগে বিমলেশ্বর হতে সমুদ্র অতিক্রম করে হরিধামে যাবার জন্য সরকারী নৌকার ব্যবস্থা ছিল । নানা কারণে সে ব্যবস্থা এখন উঠে গেছে । তবে হরিধাম হতে বিমলেশ্বর পৌছে দক্ষিণতটে আসার জন্য এখনও উত্তরতটে সরকারী ব্যবস্থা আছে । এখন বিমলেশ্বর হতে নৌকা পারাপার করতে হলে এখান থেকেই সে নৌকা যায় । কমপক্ষে পনের কুড়িজন না হলে এখান থেকে বিমলেশ্বরে নৌকা পাঠানো হয় না ।

বেলা প্রায় দেড়টা নাগাদ হাঁসোটে পৌছে তিনি তাঁর 'ঝোপড়াতে' আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে পৌছলেন । ঝোপড়াই বটে ! এসবেষ্টসের ছাউনী দেওয়া প্রায় চারখানি কামরা, সামনে দুটি এবং পিছনে দুটি । মাঝখানে একটি উঠোনকে ঘিরে গোলাকারে এই চারখানা কামরা নির্মিত । উঠোনে একটি পাথরের তৈরী তুলসীমঞ্চ । তাঁর তথাকথিত ঝোপড়ার বাইরে একটি পাথরের কুঁয়াও আছে । তিনি তাঁর ঝোপড়াতে পৌছে 'হরিহর' 'হরিহর' শব্দ করতেই শিখা ও তিলকধারী একজন যুবক শশব্যস্তে বেরিয়ে এসেই তাঁকে খোঁড়াতে দেখেই 'ক্যায়সে' এই রকম জখম হল, সে সম্বন্ধে সমবেদনা প্রকাশ করতে করতে তাঁকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসালেন । তিনি তাঁর সেবককে বললেন – ইয়ে দো হরিহর মূর্তি মেহমান্ হৈ । ইনকো ঠারনে কে লিয়ে কামরা খোল দো । আচ্ছিতরেসে দেখ ভাল কিয়া করো । 'জী হাঁ' বলেই তাঁর সেবক আমাদেরকে একটি ঘর দেখিয়ে দিলেন । আমরা সেই ঘরে গাঁঠরী ঝোলা রেখে কুঁয়া হতে জল তুলে দুজনেই স্নান করে নিলাম । স্নান করার পরেই

আমরা গেলাম সূর্যকুণ্ড এবং হংসেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করতে। সূর্যকুণ্ডের জলে তর্পণ করে হংসেশ্বর মহাদেবকে গিয়ে প্রণাম করলাম। মন্দিরের ধারে কাছে কিছু সাধু সন্ন্যাসী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একটা সাধুদের ছাউনীও পড়েছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, তাঁরা সকলেই পরিক্রমাবাসী। অমরকণ্টক হতে দক্ষিণতট ধরে পরিক্রমা করে এখানে তিন চারদিন হল এসেছেন। হরিধামে পৌঁছবার জন্য নৌকার চিঠির আশায় বসে আছেন কিন্তু শেঠজীরা নৌকার এখনও কোন বন্দোবস্থ করে দিতে পারেন নি। বেলা প্রায় চারটা নাগাদ সেই বৈষ্ণব বাবাজীর 'ঝোপড়া' বা আখড়াতে ফিরে আসতেই বাবাজী বললেন, সন্ধ্যা হয়ে গেল আপনারা আর কিছু গ্রহণ করতে পারবেন না। বেলা থাকতে থাকতে ঠাকুরজীর একটু খানি প্রসাদ গ্রহণ করে নিন। এই বলে তিনি তাঁর সেবককে দিয়ে দুখানা করে রুটি কিছু ফলের কুচি এবং কতকটা করে গুড় দিলেন। তাই আমরা অমৃতজ্ঞানে গ্রহণ করলাম। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ তিনি তাঁর সেবককে ডেকে বললেন – হরিদাস, তুম্ বেটা ইয়ে দো মেঁহমানকে সাথমেঁ লেকর হংসেশ্বর ভগবানজী কী আরতি দেখা কর লে আইয়ে। সন্ধ্যার পর মন্দিরে গুড়ুগুড়ু শব্দে ডম্বরু বেজে উঠতেই হরিদাসজীর সঙ্গে আমরা মন্দিরে গেলাম। মন্দিরে বহুলোকের ভিড় হয়েছে। পুরোহিতজী আরতি আরম্ভ করলেন। শিঙ্গা ডম্বরুর নাদের সঙ্গে তাল বজায় রেখে পুরোহিতজী আরতি করছেন। রঞ্জন বাউলের কি ভাবের উদয় হল জানি না, সহসা কোন দিকে দৃকপাত না করে তিনি হাততালি দিয়ে ছন্দে ছন্দে দোল খেতে খেতে গলা ছেড়ে গাইতে লাগলেন –

বিশ্বেশ্বর বিশ্বপাবন ভব, ভব-ভয়-ভঞ্জন,
মৃত্যুঞ্জয় মদন-দমন মরণ-জনম-নিবারণ।
চরণ-সরোজ নবারুণ ছটা, তাহে বিল্বদল চন্দনের ছিটা,
শার্দুল ছালে কটিতট আঁটা যোগীজন–মনোমোহন ॥
গলে হাড়মালা দল দল দোলে, বব বব বম্ বাজে ঘন গালে
বাজায়ে ডমরু নাচে তালে তালে, নাচে সাথে ভূত অগণন ॥
পন্নগভূষা পিণাকপাণি ঝলমল ভালে জ্বলে নিশামণি,
কুলুকুলু শিরে বহে মন্দাকিনী, ঢুলুঢুলু প্রেমে দুনয়ন ॥
সৃষ্টিলয়কারী জগৎ পিতা, জ্ঞান ময় প্রেম ভক্তি দাতা,
এ দীন সন্তানে ভুলে আছ কোথা, নিজ গুণে দাও দরশন ॥
বিশ্বেশ্বর বিশ্বপাবন ভব ভব-ভয়-ভঞ্জন ॥

আরতি শেষ হল, তাঁর গানও শেষ হল। গানের শেষে তিনি টলে পড়ে যাচ্ছিলেন, একজন সন্ন্যাসী তাঁকে ধরে বসিয়ে দিলেন। সকলেই সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি নিজেও তাঁর দরাজ গলায় এই রকম ভাবগম্ভীর শিব বন্দনা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেছি। অনেকে হিন্দী ও গুজরাটিতে তাঁর নিবাস সম্প্রদায় ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করলেন, তিনি কোন উত্তর দিলেন না। চুপ করে বসে রইলেন। ধীরে ধীরে একটু ধাতস্থ হতেই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের আস্তনাতে ফিরে এলাম। এসেই রঞ্জনদা শুয়ে পড়লেন, কম্বল মুড়ি দিয়ে। আমিও কম্বল মুড়ি দিয়ে শোবার উপক্রম করছি, এমন সময় একটি জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নিয়ে বাবাজী আমাদের ঘরে ঢুকলেন। হরিদাস তাঁর জন্য একটা আসন পেতে দিয়ে গেল। তিনি বসেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন – আপনার ঐ সাথীটির গুরু কে? উনি কোন্ সম্প্রদায়ের সাধু? হরিদাসের কাছে শুনলাম, ওঁর কণ্ঠস্বর নাকি অপূর্ব। ভগবান হংসেশ্বরকে ভজন শুনিয়ে উপস্থিত সমস্ত ভক্তবৃন্দকে নাকি চমকে দিয়েছেন। আমি তাঁকে জানালাম – হরিদাস আপনাকে সঠিক সংবাদই জানিয়েছে তবে

ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে অল্প কিছুদিন আগে। হরিধাম অতিক্রম করে এসে বিমলেশ্বর মন্দিরে ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। ওঁর গুরু কে বা উনি আনুষ্ঠানিক ভাবে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত তা আমার জানা নাই। তবে উনি যে আমার স্বদেশবাসী সেটা আমি জেনেছি। ওঁর গান শুনে ওঁকে বাউল বলে বুঝেছি।

একটু খানি থেমে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম – আপনি কি বৈষ্ণব ? কিন্তু বৈষ্ণবদের মালা ও তিলক প্রভৃতি বিভিন্ন চিহ্নাদি ধারণের সঙ্গে আপনার চিহ্নাদির কোন মিল দেখছি না। তিনি হাসিমুখে বলতে লাগলেন – গুরু আমার নাম দিয়েছেন বৈকুণ্ঠ দাস। আমরা হরিব্যাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। হরি ও হর দুই দেবতাই আমাদের উপাস্য। দক্ষিণ ভারতের মুগিপট্টনে আমাদের প্রধান আস্তানা আছে। আমরা রামায়েৎ বা রামানন্দী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের মত কপালে তিলক কাটি না বা গলাতে কেবল তুলসী মালাই ধারণ করি না। আমরা রুদ্রাক্ষ মালাও গলায় ধারণ করে থাকি। তবে রামানন্দী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবরা কপালে গোপীচন্দন লেপন করে যে অর্ধগোলাকৃতি বা তদনুরূপ এক প্রকার আকৃতি প্রস্তুত করে তাকে সিংহাসন বলে। আমরা হরিব্যাসীরা সেই রকম সিংহাসন না এঁকে ললাটস্থ ঊর্ধ্বপুণ্ড্রের নিচে অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি রেখামাত্র করে থাকি। ব্যাসদেব যেমন হরি হর দুজনকেই মানতেন তেমনি আমরা তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে হরি হর দুজনেরই অর্চনা করি। এইজন্যই আমরা হরিব্যাসী নামে পরিচিত।

আমি তাকে বললাম – আপনি দয়া করে এই সূর্যকুণ্ড এবং হংসেশ্বর মহাদেবের কথা যদি কিছু শোনান, তাহলে খুবই আনন্দ পাব।

– তব আপ্‌কো সাথী কো ভি জাগা দিজিয়ে, এক সাথ শুননেসে আচ্ছাই হোগা।

– আমাকে আর জাগাতে হবে না, আমি জেগেই আছি। এই বলে রঞ্জনদা উঠে বসলেন। তখন সাধু সোৎসাহে তীর্থ বৃত্তান্ত শোনাতে লাগলেন। রামায়ণ ও মহাভারতের মতে, বিবস্বান সূর্য প্রজাপতি কশ্যপ এবং অদিতির পুত্র। অদিতির পুত্র বলে সূর্যের অপর নাম আদিত্য। বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন এবং সংজ্ঞার গর্ভে তাঁর তিনটি সন্তানও জন্মগ্রহণ করেছিলেন – যথা বৈবস্বত মনু, যম ও যমুনা। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে, সংজ্ঞা সূর্যের অসহ্য তেজ সহ্য করতে পারতেন না, সূর্যকে দেখলেই চক্ষু নিমীলিত করতেন। এইজন্য সূর্য ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন, সংজ্ঞা তাঁর চক্ষু সংযমন করার জন্য প্রজাদের সংযমনকারী যমকে প্রসব করেন। তখন অত্যন্ত ভীত হয়ে সংজ্ঞা চপলভাবে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। তাঁর এই চপল চক্ষু দেখে সূর্য বললেন যে, তিনি চঞ্চল স্বভাবা নদীকে প্রসব করবেন। তার ফলে চঞ্চলা যমুনার উদ্ভব হল। স্বামীর মুহুর্মুহু কোপ এবং দুঃসহ তেজ সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সংজ্ঞা নিজের অনুরূপ ছায়া নাম্নী এক সুন্দরী নারী সৃষ্টি করে তার উপর আপন পুত্র কন্যার পরিচর্যার ভার দিয়ে পিতৃগৃহে ফিরে যান। কিন্তু বিশ্বকর্মা তাঁর এই কাজ সমর্থন না করায় সংজ্ঞা সূর্যের কাছে ফিরে না গিয়ে উত্তরকুরুবর্ষে গিয়ে ঘোটকীর রূপ ধারণ করে ইতঃস্তত ভ্রমণ করতে থাকেন। এদিকে সূর্য ছায়াকে সংজ্ঞা মনে করে তাঁর গর্ভেও তিন সন্তানের জন্মদান করেন – সাবর্ণি মনু, শনি এবং তপতী বা তাপ্তী। ছায়া কিন্তু সংজ্ঞার পুত্রকন্যাদের নিজ সন্তানদের মত স্নেহ করতেন না। তাতে সংজ্ঞা পুত্র যম ক্রুদ্ধ হয়ে পিতা সূর্যদেবের কাছে অভিযোগ করেন যে 'পিতাজী ! প্রতীত হোতা হৈ ইহ ছায়াদেবী হমারী যথার্থ মাতা নহী। যমের কথায় সূর্যদেবের টনক নড়ে। তিনি ধ্যান দৃষ্টিতে বুঝতে পারেন সংজ্ঞার অবস্থান। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘোটকের রূপ ধারণ করে উত্তরকুরুবর্ষে গিয়ে ঘোটকী রূপিনী সংজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হলেন। এই মিলনের ফলে প্রথমে যমজ যুগল দেবতা অশ্বিনীকুমার এবং পরে রেবন্তের জন্ম হল। এরপর সূর্য সংজ্ঞাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে সঙ্গে করে ফিরিয়ে এনে তাঁর তেজ কমিয়ে দিতে অনুরোধ

করেন শ্বশুর বিশ্বকর্মাকে। বিশ্বকর্মা সূর্যের বিষম তেজ হ্রাস করার জন্য তাঁর দেহের অষ্টম অংশ ছেদন করে দেন। সেই কর্তিত অংশ জ্বলন্ত অবস্থায় পৃথিবীতে এইস্থানে এসে পতিত হওয়ায় তার থেকেই ঐ সূর্যকুণ্ডের উৎপত্তি হয়েছে তাই সূর্যকুণ্ড পরম পবিত্র তপঃস্থলী। যেহেতু পূর্ণের কোন অংশ হয় না, তা দেবতার দিব্যতেজে খণ্ডিত হলেও সেই খণ্ডিত অংশে মূলের তেজ পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে। সেইজন্য সূর্যকুণ্ডের মধ্যে সূর্যের পবিত্র দিব্যদ্যুতি পূর্ণভাবে বিদ্যমান। তাই এখানে তপ, জপ, গায়ত্রী পুরশ্চরণে সিদ্ধি লাভ হয়ে থাকে। এইজন্য পরিক্রমাবাসী মহাত্মা মাত্রই বিমলেশ্বর থেকে এখানে আসাকে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেন। রবিবারে সূর্যকুণ্ডের জলস্পর্শ করার জন্য তাই এখানে খুব ভিড় হয়। যে রবিবারে সপ্তমী তিথি পড়ে তার মাহাত্ম্য এখানে খুব বেশী বলে গণ্য করা হয়।

এইবার রঞ্জন বাউল তাঁকে বললেন – সূর্যকুণ্ডের গল্প ত শুনলাম, এইবার হংসেশ্বর মহাদেবকে কেন্দ্র করে পুরাণকাররা রোচক মনোহারী গল্প রচনা করে গেছেন তাও একটু শুনিয়ে দিন। রঞ্জনদার কথার মধ্যে পুরাণকারদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ হুলের সন্ধান পেয়ে বাবাজী কয়েক সেকেণ্ড তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখ মুখের ভঙ্গিমাতে ক্রোধের ভাব কিঞ্চিৎ প্রকাশ পেলেও তিনি দ্রুত তা সামলে নিয়ে বেশ সংযত কণ্ঠেই বলতে লাগলেন – আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, মানুষ পশু পাখী বৃক্ষাদি সমস্ত চেতন পদার্থের উৎপত্তি কর্তা প্রজাপতি কশ্যপ। কশ্যপ শব্দের গূঢ় অর্থ হল – দ্রষ্টা। য পশ্যতীতি স পশ্যকঃ। পাণিনি ব্যাকরণের আদ্যন্ত বিপর্যয়শ্চ এই সূত্রানুসারে পশ্যক হয়েছে কশ্যপ অর্থাৎ পরমাত্মা। পরমাত্মা মহর্ষি কশ্যপ রূপে প্রকট হওয়ার পর তাঁর পত্নীর গর্ভে কান্তিশিখা নামে এক হংস উৎপন্ন হয়। এই হংসই পৃথিবীর সমস্ত হংসকুলের আদি জননী। কান্তিশিখাকে ব্রহ্মা নিজের বাহন রূপে নির্বাচিত করে নেন। সেই সত্যযুগে ব্রহ্মা একদিন দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞ বাসরে যখন যাবার জন্য উদ্যোগ করেন, সেই সময় কোন কারণে কান্তিশিখা ব্রহ্মার কাছে যথাসময়ে উপস্থিত হতে পারেন নি। সময় পর আপনা বাহন ন আবে ত ক্রোধ আনা স্বাভাবিক হী হৈ। ব্রহ্মাজীকো ক্রোধ আগয়া উন্‌হনে কান্তিশিখা হংসকো শাপ দিয়া – তু ব্রহ্মলোক সে চ্যুত হোকর মনুষ্যলোক মেঁ চলা জা। ব্রহ্মার অভিশাপ শুনে কান্তিশিখা অনেক কাঁদাকাটা করলে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মা তাঁকে বলেন – তুমি নর্মদা তটে গিয়ে তপস্যা কর। শিব সাধনা কর। মহাদেব তুষ্ট হলে পুনরায় তুমি ব্রহ্মলোকে আমার কাছে আসতে পারবে। সেই কথা শুনে কান্তিশিখা পৃথিবীর এই অংশে এসে হংসেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপন করে ঘোরতর তপস্যা করেন এবং মহাদেবের প্রসাদে পুনরায় তার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ঘটে। হংসেশ্বর মহাদেবের নামানুসারেই এই স্থানের নাম হাঁসোট হয়েছে।

তাঁর কাছে এইভাবে তীর্থ কাহিনী শুনতে শুনতে আমাদের চোখে ঘুম এসে গেল। রঞ্জনদাই তাঁর ঘড়ি দেখে বাবাজীকে বললেন – ঘুম পাচ্ছে! আবার পরে আপনার কাছে এখানকার সব কথা শুনব। রাত্রি সাড়ে নটা বেজে গেছে। বাবাজী কিন্তু উঠলেন না। তিনি তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলেন – আপনার সাথীকে একটু আগে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনার গুরু সম্বন্ধে। উনি বললেন – আপনি না কি বাউল সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু বাউলের ত গুরু থাকেন। গুরু ছাড়া ত ইষ্টসিদ্ধি হয় না। আপনার দীক্ষা দাতা গুরুর নামটা জানতে পারি কি? আপনার বিধিদত্ত মধুর কণ্ঠস্বরের কথা হরিদাসের মুখে শুনে আপনার গুরুর সম্বন্ধে জানতে আগ্রহ হয়েছে। রঞ্জনদা সরাসরি তাঁকে কোন জবাব না দিয়ে বাঁ হাতে একতারাটি টেনে নিয়ে আট দশ সেকেণ্ড একতারাতে টুং টাং করে আবেগ ভরে গাইতে লাগলেন –

আমার যেদিন জনম হল সেদিনই ত আমি দীক্ষা পেয়েছি।
এক অক্ষরের মন্ত্র মায়ের ভিক্ষা পেয়েছি।
দীক্ষা বিনা চলে না যে একটি প্রাণের শ্বাস।
সেই কথাতে গভীর আমার রয়েছে বিশ্বাস।
আমি নীর পেয়েছি, ক্ষীর পেয়েছি, পরাণ পেয়েছি,
তারি সাথে সাথে মায়ের শিক্ষা পেয়েছি॥

সত্যই তাঁর কণ্ঠস্বর বিধাতার দান! তিনি প্রতিটি লাইন এমন মধুর ভাবে গাইলেন যে, তাঁর গানের ভাষা বাংলা হলেও তাঁর সুর ও ছন্দ ভিন্ন দেশী মানুষের মনকেও সহজেই চঞ্চল ও আলোড়িত করে তোলে। আমাদের সামনে উপবিষ্ট বাবাজী গানের সব ভাষা বুঝলেন কিনা জানিনা, তাঁর চোখ দুটি দেখলাম আর্দ্র হয়ে উঠেছে। তিনি ধীরে ধীরে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। আমাদেরও মুখে কোন ভাষা ফুটলো না। মিনিট পাঁচেক স্থির হয়ে বসে থেকে যে যার শয্যায় শুয়ে পড়লাম।

সকালে মঙ্গল আরতির শব্দে ঘুম ভাঙল। বাবাজীর আখড়ায় হরিদাস মঙ্গল আরতি করছেন। আমি বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে দেখলাম, বাবাজী ঠাকুর ঘরের সামনে বসে জপ করছেন। সকাল হয়ে গেলেও কুয়াশার জন্য বাইরে মনে হচ্ছে গাছপালায় যেন অন্ধকার জড়িয়ে আছে। আমি ঘরে গিয়ে নিজের আসনে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে রইলাম। উত্তরতটের নানা প্রসঙ্গ মনের মধ্যে ভিড় করে এল। সেই সব কথা চিন্তা করতে করতে আমি পুনরায় ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভাঙল, তখন আকাশে সূর্যোদয় হচ্ছে। আখড়ার বাবাজী আমাদেরকে বললেন, কাল আপনারা কুঁয়াতে স্নান করতে বাধ্য হয়েছেন। এই খোঁড়া লোকটাকে সঙ্গে করে টেনে আনার জন্য, এখানে পৌঁছতে আপনাদের যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে গেছল। আজ আপনারা নর্মদাতে গিয়ে স্নান করে আসুন। কিছুটা হেঁটে গেলেই নর্মদার ঘাট পাবেন। মাইল দুই গিয়েই নর্মদার বিস্তার ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে রত্ন সাগরে গিয়ে লয় প্রাপ্ত হয়েছে। রেবা ও সমুদ্রের সংগম মুখে অবস্থিত বলে হাঁসোট একটি বড় বাণিজ্যিক কেন্দ্র রূপে গড়ে উঠেছে। জাহাজ ও নৌকাতে করে এখানে দিনরাত নানাবিধ বাণিজ্য দ্রব্য আসা যাওয়া করছে। পরিক্রমাবাসীদের বিমলেশ্বর হয়ে হরিধামে যাবার নৌকাও তাই এখান থেকেই যায়। নর্মদার উপর শত শত বাঁশ ও তুলা বোঝাই অনেক বড় বড় নৌকা ভাসছে দেখতে পাবেন। গুজরাটে কার্পাস একটি প্রধান ফসল বলে, এবং নর্মদা সমুদ্র সংগমের জন্য জাহাজ আসার সুবিধা থাকায় দেশ বিদেশে কার্পাস জাত বহু দ্রব্য আমদানি ও রপ্তানী করার সুবিধা আছে। নর্মদাতে স্নান করে সূর্যকুণ্ড ও হংসেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে পূজা জপাদি অবশ্যই করবেন। সূর্যকুণ্ডে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করলে তা তাঁদের খুবই তৃপ্তিদায়ক হয়। সূর্যকুণ্ডের সমীপেই মাতৃকা তীর্থ বিদ্যমান। তাও দর্শন করে এখানে অবশ্যই ফিরে আসবেন। আজ, আর কাল রবিবার, এই দু দিনই আমার এখানে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য এখন থেকেই আমন্ত্রণ করে রাখলাম। রবিবার সূর্যকুণ্ড থেকে আমি যেতে দিব না। পরশু আর আপনাদেরকে আটকাবো না, আপনাদের যথাভীষ্ট স্থানে যাত্রা করবেন, কোন বাধা দিব না। বৃদ্ধের এই অনুরোধ আপনাদেরকে রাখতেই হবে।

তাঁর কথার মধ্যে এমনই আন্তরিকতার সুর দেখলাম যে, আমরা আর না বলতে [illegible]ম না। কমণ্ডলু ও বস্ত্রাদি নিয়ে আমরা নর্মদার তটের দিকে এগোতে লাগলাম। [illegible] নর্মদার উপর সত্য সত্যই বাঁশ ও কার্পাস বোঝাই অনেক নৌকা দেখতে পেলাম। দূরে সমুদ্র হতে ভেসে আসা জাহাজের সিটি বা ভোঁ ভোঁ ধ্বনিও শুনলাম। আমরা ঘাটে কোমর পর্যন্ত নেমে স্নান ও সূর্যার্ঘ্য সেরে এসে পৌছলাম হংসেশ্বর মন্দিরে। স্নান করে

আসতে আসতেই রঞ্জন বাউল আমাকে অনুরোধ করেছিলেন – আমি এতকাল বাউলদের সঙ্গে ঘুরে ফিরে কেবল গান গেয়েই কাটিয়েছি, পূজার মন্ত্র কিছুই শিখিনি। আপনি ভাই কৃপা করে আমাকে শিবপূজার মন্ত্র বলে দিবেন, বাবাজী বললেন, সূর্যকুণ্ডের জলে মাতা পিতা এবং পিতৃপুরুষের তর্পণ করলে তাঁরা তৃপ্তি পাবেন। আমি কেবল মায়েরই তর্পণ করতে চাই। আমার চিরদুঃখিনী মমতাময়ী মায়ের কথা ভাবলে আজও আমার বুক ভরে যায়। এই কথা বলতে বলতেই তিনি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। আমি বললাম – ছিঃ ভাই, এই পুণ্য তীর্থে এসে পিতার সম্বন্ধে কোন বিতৃষ্ণা মনের মধ্যে রাখতে নাই। শিব শিবানীর মধ্যে যেমন কোন পৃথকত্বের বোধ রাখতে নাই, তাঁরা তেমন উভয় একাত্ম এবং অভিন্ন। এখন আমি সংক্ষেপে সূর্যকুণ্ডে আপনাকে তর্পণ করিয়ে দিচ্ছি। বাবাজীর আখড়ায় গিয়ে আপনাকে মন্ত্রগুলি ভাল করে একটি কাগজে লিখে দিব। যত শীঘ্র পারেন মুখস্থ করে নিবেন। আমার মতে তর্পণই মা বাবার শ্রেষ্ঠ পূজা।

হংসেশ্বর মন্দিরে পৌঁছে দেখি, পুরোহিত সহ অনেকেই মহাদেবের পূজা করছেন। ধূপদীপের সুরভিতে মন্দিরাভ্যন্তর পরিপূর্ণ। অনেক সাধু সন্ন্যাসী মন্দিরের চারপাশের বারান্দায় বসে কেউ জপ করছেন, কেউ বা মহিম্ন স্তোত্র পাঠ করছেন। রঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে হংসেশ্বরকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে তাঁকে প্রত্যেকটি শব্দ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিয়ে বাবার মাথায় নর্মদার জল দুই দিক দিয়ে দুজনে ঢালতে ঢালতে বলতে লাগলাম – ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে। সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং। উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ। মৃত্যোর্মুক্ষীয় মা অমৃতাৎ। ওঁ নমঃ শিবায়।

মহাদেবকে প্রণাম করে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সূর্যকুণ্ডের ঘাটে নামলাম। আগে তাঁকে মাতৃপিতৃ তর্পণ করালাম মন্ত্র পাঠ করে। ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিশ্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৃন্ ইত্যাদি পাঠ করিয়ে ক্রমে ক্রমে যখন তাঁর মায়ের নাম জেনে নিয়ে পাঠ করালাম – বিষ্ণুরোম অমুক গোত্রে মাতরমুকি দেবি তৃপ্যতামেতৎ পুণ্যোদক তস্যৈ স্বধা – তখন সূর্যের দিকে তাকিয়ে অঞ্জলিবদ্ধ জল অর্পণ করতে করতে রঞ্জন বাউল ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কান্না আর কিছুতেই থামে না। কোন মতে একটু প্রকৃতিস্থ হতেই তাঁকে ঘাটের পৈঠায় জোর করে বসিয়ে দিয়ে বললাম – দীক্ষা হয়ে থাকলে ইষ্টমন্ত্র অথবা গায়ত্রী, অথবা সে সব ভুলে গিয়ে থাকলে বসে বসে 'হর নর্মদে' জপ করতে থাকুন। এবারে আমাকে তর্পণ করতে দিন।

যথাজ্ঞান সূর্যস্মরণ ও পিতৃলোককে আবাহন করে আমি সূর্যকুণ্ডের জলে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করলাম। তর্পণ সেরে গায়ত্রী জপ করে যখন তীরে উঠলাম, তখন সূর্য মধ্যগগনে অর্থাৎ বোধ হয় তখন বেলা ১২টা বেজে গেছে। রঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে একজন সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করে মাতৃকা তীর্থে পৌঁছলাম। সূর্যকুণ্ডের কাছেই মাতৃকা তীর্থ। সেই সন্ন্যাসীও আমাদের সঙ্গে এলেন। একটি ছোট মন্দিরে ছয়টি তপস্বিনী নারীমূর্তি দেখিয়ে তিনিই আমাদেরকে জানালেন যে, সপ্তর্ষির মধ্যে বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতীকে বাদ দিয়ে বাকী ছয়জন ঋষির স্ত্রীকে কৃত্তিকা বলা হয়। কৃত্তিকারা একদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাতে স্নান করতে গিয়ে অগ্নি সেবন করেন। সেই অগ্নির তেজে তাঁরা গর্ভবতী হন। পরে তাঁরা সেই তেজ হিমালয়-শিখরে পরিত্যাগ করেন। সেই মিলিত তেজঃপুঞ্জ হতেই কুমার কার্তিকেয় জন্মলাভ করেন। কৃত্তিকারাই ষড়াননকে প্রতিপালন করতে থাকেন, কিন্তু তাঁদের ছ জনের স্তন্য দুগ্ধেও শিশুর পেট ভরত না। তাঁরা খুবই চিন্তায় পড়েন। এই সময় নারদের সঙ্গে তাঁদের দেখা হলে নারদ তাঁদেরকে বলেন – 'আপ্ নর্মদা কিনারে জাকর তপস্যা করিয়ে আপকো মনস্কামনা সিদ্ধ হোগী।' সেই মাতৃকারা নারদের বাক্যানুসারে এইখানে এসে

তপস্যা করে সিদ্ধকামা হন। সেই থেকে এই মন্দির মাতৃকা তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। বশিষ্ঠ পুরাণের অন্তর্গত রেবাখণ্ডের ১৭৫ অধ্যায়ে এই ঘটনার বর্ণনা আছে।

সাধুকে ধন্যবাদ জানিয়ে মাতৃকা তীর্থে প্রণাম জানিয়ে আমরা হাঁসোটের কাছারী বাড়ী লক্ষ্য করে হাঁটতে লাগলাম। এতক্ষণ রঞ্জনের মুখে কোন কথা শোনা যায় নি। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতেই তিনি এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে লাগলেন – তর্পণে যে এত আনন্দ হয়, তা আজ জীবনে প্রথম অনুভব করলাম। সূর্যের রশ্মিপথে এক মুহূর্তের জন্য যেন মায়ের রেখাচিত্র আমার চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল। আমি খুবই তৃপ্তি পেয়েছি। আমাদের ঋষিদের রচিত মন্ত্র এবং বিধিব্যবস্থাতে সত্যি কথা বলতে কি আজই আমার বিশ্বাস জন্মাল।

– তাহলে এ ব্রাহ্মণের ত কিছু দক্ষিণা আপনার কাছে পাওনা হয়েছে!

– বলুন ভাই, আমার সাধ্যে কুলালে নিশ্চয়ই আপনাকে দিব।

– যথা সময়ে বলব, কিঞ্চিৎ ধৈর্য ধরে আপনি অপেক্ষা করুন।

কথা বলতে বলতে আমরা সেই হরিব্যাসী বাবাজীর 'ঝোপড়াতে' এসে পৌছে গেলাম। তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের ঠাকুর সেবাদি হয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে আমরা খেতে বসলাম। কিছু শব্জীর তরকারী ও রুটি, খুব তৃপ্তির সঙ্গে আমরা খেলাম। খাওয়ার পর নিজেদের নির্দিষ্ট কামরায় ঢুকলাম বিশ্রাম করতে। কিন্তু রঞ্জন আমাকে বিশ্রাম করতে দিলেন না। একখানা খাতা বের করে আমাকে তাঁর খাতায় পিতৃ তর্পণের মন্ত্র লিখে দিতে বললেন। তর্পণের মন্ত্র লিখে দিতেই সন্ধ্যা হয়ে এল। রঞ্জন আমাকে জানালেন যে তিনি আজ আর হংসেশ্বরের আরতি দেখতে যাবেন না। ঘরে বসে তর্পণের মন্ত্র মুখস্থ করবেন। কয়েকদিন আমারও ডায়েরী লেখা হয় নি। আমি একা একা আর গেলাম না। আমিও ডায়েরী লিখতে বসলাম। হরিদাস সন্ধ্যা হতে না হতেই কালকের মত মোমবাতি ঘরে জ্বেলে দিয়ে গেছে। ডায়েরী খোলার পর আমি একটি ছোট বাংলা কবিতাও ডায়েরীতে লিখে ফেললাম। আখড়ার ঠাকুরঘরে সন্ধ্যারতির আয়োজন হচ্ছে দেখে, আমি আমার সদ্যলিখিত কবিতাটি এক টুকরো কাগজে লিখে রঞ্জনের হাতে দিয়ে বললাম – আরতি দেখতে যাচ্ছি। আপনি আমাকে তর্পণের মন্ত্র শিখানোর জন্য দক্ষিণা দিবেন বলেছিলেন, আপনি যদি আমার এই ছোট্ট কবিতাটি আপনার বাউল সুরে গানে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, তাহলে সেই হবে আমার দক্ষিণা। তিনি সাগ্রহে কবিতাটি নিয়ে পড়তে লাগলেন, আমি গিয়ে ঠাকুর ঘরের সামনে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখেই বাবাজী বললেন – আপনি নর্মদার জল স্পর্শ করে আমার কাছে এসে বসুন, আপনাকে আমার ঠাকুরজীকে দেখাই, এই বলে তিনি তাঁর ঠাকুরজীকে করতলে স্থাপন করে দেখাতে লাগলেন। একটি বিচিত্র শালগ্রাম শিলা, তার উর্ধ্বদেশে একটি মুখ এবং আধোদেশেও একটি মুখ। প্রতিটি মুখ বা গহ্বরে দুটি করে চক্র থাকায় শালগ্রামটিতে মোট চারটি চক্র। ঘন কৃষ্ণবর্ণের শিলা। বাবাজী বললেন – আমাদের এই ঠাকুরজীর নাম হরিহর, হরিব্যাসী সম্প্রদায়ের একমাত্র উপাস্য দেবতা। আমাদের গুরুদেব এঁর লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন – চতুশ্চক্রো হরিহরো দ্বিমুখোঽধস্তথোপরি। বিনশ্যতি গৃহস্থানাং বনং ক্ষেত্রং কুলং ক্রমাৎ। শ্লোকের অর্থ নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, এই কৃপাসিন্ধুকে অর্চনা করলে পূজকের ইনি সর্বনাশ করে ছাড়েন। তবুও গুরুদেব এঁকে আমৃত্যু বুকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। আমিও বুকে করে রেখেছি। আমরা বেনিয়া নয়, কেবল বেনিয়া প্রকৃতির যারা তারাই কেবল ঠাকুরের কাছে নিজের ঐহিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঠাকুরকে পূজা করেন। ছলোছলো চোখে তিনি ঠাকুরকে বেদীর উপর একটি ছোট তাম্র সিংহাসনে স্থাপন করে হরিদাসকে ঠাকুরের আরতি করতে বললেন। নিজে একটি শাঁখ বাজাতে লাগলেন, আমি ঝাঁঝ বাজাতে লাগলাম।

আরতির শেষে ঘরে ফিরে দেখলাম, রঞ্জন বাউল আমার কবিতাটি নিয়ে গুণ্‌গুণ্ করে গলা সাধছেন। একটু পরেই বাবাজী এসে আমাদের ঘরে ঢুকলেন। আমাদের সামনে বসেই বলতে লাগলেন – হামারা পায়েরকা জখম থোড়াসা আরাম হোগয়া। শোচ্‌তা হুঁ কাল সবেরমেঁ হাম আপলোগ্‌কা সাথ তিলাদেশ্বর তীর্থ তক যানে সেকেগা। এহি হাঁসোট মে হি হংসেশ্বর তীর্থ সে এক মিল্‌কা অন্দর তিলাদেশ্বর বিরাজমান হৈ।

রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি বাবাজীর কথায় কান দিচ্ছেন না। নিজের মনেই গুণ্‌গুণ্ করে যাচ্ছেন। একটু পরেই একতারাটি টেনে নিয়েই আমাকে বললেন – তর্পণের দক্ষিণা অর্পণ করছি, গ্রহণ করুন। তাঁর একতারাতে ফুটে উঠল আমার লেখা কবিতার সুর ও ভাষা –

কারে বলব, কে করবে বা প্রত্যয়।
আছে, আছে এই মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময়।
যারে আকাশ পাতাল খুঁজে মরিস্
সামনে যে, সে রয় –
পিতার মাঝেই পরম পিতা চিদানন্দময়।
এ ঠাকুরের নাই ছত্র দণ্ড, নাইক সিংহাসন
আমার লেগেই খাটেন সদা, করেন সুখের অন্বেষণ।
এমন দয়াল এমন প্রেমিক, কোথাও পাবে নাই,
পিতাই যে মোর পরম গুরু, দীন দরদী সাঁই॥

রঞ্জন এমন দরদ দিয়ে গানটি গাইলেন যে, তাঁর সুরের মূর্ছনা আমার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনুরণন তুলল। বাবার অপার স্নেহ ও দয়ার নানা স্মৃতি আমার মনে ভিড় করে উদয় হল, আমি দরবিগলিত অশ্রু হয়ে চোখ বন্ধ করে বসে রইলাম। প্রায় মিনিট দশেক চোখ বন্ধ করে বসে থেকে যখন চোখ খুললাম, তখন দেখি বাবাজী ঘর থেকে চলে গেছেন। আমি আবেগ ভরে রঞ্জনের হাত দুটি ধরে বললাম, আপনার কণ্ঠে যাদু আছে। মা নর্মদা আপনার মঙ্গল করুন। দুজনেই মোমবাতি নিবিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যেই স্বপ্ন দেখলাম বাবাকে।

ঘুম ভাঙতেই বুঝতে পারলাম, ভোরের মঙ্গল আরতি শেষ হয়ে গেছে। আজ কুয়াশা নাই। সূর্যরশ্মি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে। রঞ্জনও উঠে পড়েছেন, তিনি জানালেন যে তাঁর প্রাতঃকৃত্যও শেষ হয়ে গেছে। আমি প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে দেখি, বাবাজী আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে নর্মদাতে স্নান করতে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। আমরা দুজনেই কমণ্ডলু ও গামছা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি, এমন সময় 'হরি-হর, হরি-হর, হরি-হর, হর-নর্মদে' ধ্বনি দিতে দিতে একজন বাবাজীর সঙ্গে চারজন পুরুষ ও তিন জন নারীমূর্তি এসে আখড়াতে উপস্থিত হলেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই কাঁধে বড় বড় ঝুলি, ঝুলি গুলি নানা দ্রব্যে পরিপূর্ণ। প্রত্যেকেরই ললাটে ঊর্ধ্বপুণ্ড্রের নিচে হরিব্যাসী সম্প্রদায়ের চিহ্ন, অর্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা। বাবাজী তাঁদের এই বলে পরিচয় দিলেন – ইয়ে লোগোঁনে হমারা চেলা হ্যয়। হিঁয়াসে করীব করীব তিন, সাড়ে তিন মাইল আগে মেঁ মোটিয়া নামকে এক মহল্লা হ্যায়, উধর মাতৃতীর্থ হ্যায়, মাতৃতীর্থ সেই ইয়ে লোগ আর্তে হৈ।

হরিদাসকে ডেকে তাঁদের 'দেখভাল' করার জন্য বলে দিয়ে তিনি আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। পথে যেতে যেতে রঞ্জন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন – মাতৃতীর্থে কোন্ মহাদেব বিরাজিত? বাবাজী উত্তর দিলেন – এ্যায়সা ত নর্মদা মেঁ হর জাগামেঁ মহাদেব হ্যায়ই হ্যায়। ইয়ে শিবভূমি হ্যায়, লেকিন্ মাতৃতীর্থ মেঁ কোঈ প্রতিষ্ঠিত মহাদেব

নেহি, উধর এক কুণ্ড হৈ। পূর্ব কল্পমেঁ যব ব্রহ্মাজীকো সৃষ্টি করনে ভগবান কী আজ্ঞা হই তো উন্‌হনে সর্বপ্রথম মন সে হী দশ মানস পুত্র পৈদা কর লিয়া। উহ্ দশ মানস পুত্র কো দশ প্রজাপতি কহা জাতা হৈ, ইন্‌কা নাম – মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, প্রচেতা, দক্ষ, ভৃগু ও নারদ। সৃষ্টি বড়ানেকে লিয়ে দক্ষ প্রজাপতি ৫০ কন্যায়েঁ পৈদা কী। উনমেঁ সে ত্রয়োদশ কন্যায়েঁ কশ্যপ মহর্ষি কো দী। কশ্যপজী সৃষ্টি বড়ানেকা উপক্রম করনে লগে, তবে মাতায়োঁ নে কহা – 'ভগবন! তপস্যা দ্বারা হী সম্পূর্ণ কার্য সিদ্ধ হোতে হৈঁ, অতঃ পহিলে হমেঁ তপ করনা চাহিয়ে।' কশ্যপজী কে অনুমোদন করনে পর ইন্ মাতায়োঁ নে ইহা নর্মদা কিনারে পর আকর এক কুণ্ড বনায়া ঔর উস্ কুণ্ডমেঁ নর্মদাজী কা জল ভর লিয়া ঔর উসকে কিনারে পর দিব্য সৌ বর্ষো তক তপস্যা কী। উসীকা নাম মাতৃতীর্থ হৈ। উহাঁ তপস্যা করনে সে বন্ধ্যাকো পুত্র লাভ হোতী হৈ।'

তাঁর মুখে মাতৃতীর্থের বর্ণনা শুনতে শুনতে আমরা নর্মদার নির্দিষ্ট স্নানের ঘাটে পৌঁছে গেলাম। গতকালও এখানেই এসেছিলাম। স্নান তর্পণাদি শেষ হতেই তিনি আমাদেরকে পাকা রাস্তা হতে নেমে মাঠের উপর দিয়ে মিনিট দশেক হাঁটিয়ে তিলাদেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে এসে পৌঁছালেন। ছোট একটি শিব মন্দির। সামনে বাঁধানো কুঁয়াও আছে। যে মাঠের উপর দিয়ে তাঁর সঙ্গে এলাম, সেই মাঠে পান, গম, মুগ ও অড়হর প্রভৃতি নানা শস্যে পরিপূর্ণ দেখলাম। হাঁসোট গ্রামের মধ্যেই এই শিব মন্দির। সেখান থেকে সূর্যকুণ্ডস্থিত হংসেশ্বর মন্দিরের ধ্বজা দেখতে পেলাম। আমরা তিলাদেশ্বর মহাদেবের প্রায় ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ হরিদ্রাভ শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢেলে পূজা করার পর তিনি এই মহাদেবের মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে জানালেন যে পূর্বকালে জাবালি নামে এক মুনি ছিলেন; ইনি রামায়ণের রামচন্দ্রের হিতোপদেষ্টা জাবালি নন। যাই হোক, এই জাবালি দুষ্ট সঙ্গে পড়ে তপোভ্রষ্ট হন। তাঁর খুব অনুতাপ হয়। তিনি পাতক নিবৃত্তির জন্য বহু তীর্থে পর্যটন করতে থাকেন কিন্তু কিছুতেই পূর্বের মত তপঃশক্তি আর ফিরে পেলেন না। অবশেষে দৈববশাৎ তপোভূমি নর্মদার এই স্থানে পৌঁছে তিনি এখানকার শান্ত পরিবেশ দেখে এখানেই তপস্যা করতে সুরু করেন। তিনি প্রতিদিন একটি মাত্র তিল ভক্ষণ করতেন, আর কিছু খেতেন না। এইভাবে প্রায় ৩২ বৎসর তপস্যা করার পর তিল তিল করে ক্ষয় হতে হতে তার সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়, তিনি তাঁর হৃত তপঃশক্তি ফিরে পান। তিনিই এই তিলাদেশ্বর মহাদেবের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি নিজেও তিলাদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন – তিলান্ অত্তীতি অতঃ তিলাদঃ। এখানে তপস্যার খুব মহিমা।

তিলাদেশ্বরকে প্রণাম করে আমরা মাঠ চেপে কোণাকুণি রাস্তা ধরে বেলা ১০টা নাগাদ হংসেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে এসে পৌঁছলাম। বাবাজী আমাদেরকে জানালেন – আখড়ামেঁ অতিথি লোগোঁ নে আয়া হৈ। হম যাতে হৈঁ। আপলোগোনেঁ পূজা জপ করকে আইয়ে। আজ এতোয়ার হ্যায়, ইস তীর্থকে লিয়ে ইয়ে আচ্ছা পুণ্যদিন হৈ।

বাবাজী চলে যেতেই আমি রঞ্জনকে বললাম আপনি মহর্ষি উপমন্যুর নাম শুনেছেন? মহর্ষি আয়াদধৌম্যের শিষ্য, যিনি গুরুর আশ্রমের গরুগুলি চরাতে গিয়ে কিঞ্চিৎ দুধ খেতেন বলে গুরু কর্তৃক ভর্ৎসিত হয়ে আকন্দ পাতা চিবিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেন, যার ফলে অন্ধ হয়ে গিয়ে কুঁয়াতে পড়ে গেছলেন, পরে তাঁর গুরুভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে গুরু আয়াদধৌম্য তাঁকে দিব্যজ্ঞান দান করেছিলেন, সেই মহর্ষি উপমন্যু কৃত তিনটি শিবমন্ত্র যা মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে রয়েছে, তা পাঠ করে আজ হংসেশ্বরের মাথায় জল ঢালতে চাই। প্রতিটি মন্ত্রপাঠ সঙ্গে সঙ্গে তার বাংলা অনুবাদও আওড়ে যাব। আপনার বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না। আপনি কেবল আমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করতে

করতে শিবের মাথায় জল ঢালতে থাকুন। আমার কথায় তিনি সানন্দে সোৎসাহে সম্মতি জানাতেই আমি শিবলিঙ্গে নর্মদার জল ঢালতে ঢালতে মন্ত্র পাঠ করতে লাগলাম –

ওঁ নম আদিত্য বক্ত্রায় অদিত্যনয়নায় চ।
নম আদিত্য বর্ণায় আদিত্য প্রতিমায় চ॥

সূর্যবদন ও সূর্যনয়নকে নমস্কার এবং সূর্যবদন ও সূর্যসদৃশকে নমস্কার॥

ওঁ খচরায় নমস্তুভ্যং গোচরাভিরতায় চ।
ভূচরায় ভুবনায় অনন্তায় শিবায় চ॥

হে মহাদেব! আপনি চন্দ্র ও সূর্যরূপে আকাশচারী, ব্রহ্মরূপে যোগিগণের হৃদয়চারী, দেশরূপে পৃথিবীচারী, পৃথিবী মূর্তি, অসীম ও শিবরূপী, আপনাকে নমস্কার॥

ওঁ নমো দিগ্বাসসে নিত্যমধিবাসসুবাসসে।
নমো জগন্নিবাসায় প্রতিপত্তিসুখায় চ॥

হে ভক্ত বৎসল! আপনি দিগম্বর, সর্বদা ভক্তের হৃদয়ে বাস করেন এবং দিব্যবস্ত্র পরিধান করেন, আপনাকে নমস্কার। জগতের আধার আপনি, দয়া করে ভক্তকে সুখী করেন, আপনাকে নমস্কার।

হংসেশ্বরকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে আমরা সূর্যকুণ্ডের ঘাটে এসে বসলাম। আমি রঞ্জনকে বললাম, আপনি খাতা দেখে তর্পণ করে জপ করতে থাকুন। আমি বসে বসে পুঁথি পাঠ করতে থাকি। আমি নর্মদাতে যাওয়ার সময়েই আলখাল্লার ভিতরে মহাত্মা প্রলয়দাসজী প্রদত্ত পুঁথিটি সঙ্গে করে এনেছিলাম। আমি সূর্যকুণ্ডের জলে তর্পণ করে মহর্ষি তণ্ডিকৃত মহাদেবের অষ্টোত্তর সহস্রনাম পাঠ করতে থাকলাম। স্তব পাঠের শেষে ঘাটে নেমে সূর্যার্ঘ্য এবং পিতৃ তর্পণ যখন শেষ হল, তখন মধ্যাহ্ন হয়ে গেছে। বেলা প্রায় পৌনে দুটার সময় বাবাজীর আখড়াতে এসে উপস্থিত হলাম।

আজ দেখলাম ঠাকুরজীর ভোগ নানা উপকরণে দেওয়া হয়েছে। সকলের সঙ্গে প্রসাদ পেয়ে নিজেদের কামরায় যখন ঢুকলাম তখন রঞ্জনের ঘড়িতে তিনটা বেজে গেছে। আধঘন্টা পরেই সদ্য আগত ছোট বাবাজী ছাড়া বাবাজীর অন্যান্য সব ভক্তরাই চলে গেলেন। আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে পুনরায় হংসেশ্বরের মন্দিরে গেলাম আরতি দেখতে। প্রথম দিন মন্দিরে এসে চারদিকে যত সাধু সন্ন্যাসীর ভিড় দেখেছিলাম, আজ তাঁদের কাউকে দেখতে পেলাম না। শুনলাম, সন্ন্যাসীরা নৌকার বন্দোবস্ত হতেই বিমলেশ্বরের পথে রওনা হয়ে গেছেন রেবা সমুদ্র সংগম অতিক্রম করে উত্তরতটে হরিধামে পৌঁছাবেন বলে। আরতি দেখে এবং মন্দিরেই সন্ধ্যা সেরে ফিরে এলাম আখড়াতে। রঞ্জনকে বললাম, আজ ৫ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, হাঁসোটে ত্রিরাত্রি বাস হয়ে গেল। কাল সকালে উঠেই আমরা ফিরে যাব, আবার সেই ওঁঙ্কলেশ্বরে, ভৈরবী মায়ের কাছে। আশা করি, এতদিনে তিনি গুমান হতে ফিরে এসেছেন।

আমরা এইভাবে নিজেদের মধ্যে কথা বলছি, এমন সময় বাবাজী ছোট বাবাজীকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের ঘরে এসে প্রবেশ করলেন। হরিদাস তাঁদের বসার জন্য একটি সৎরঞ্জি এঁদের ভাষায় 'দড়ি' বিছিয়ে দিয়ে গেলেন। দড়িতে বসেই বাবাজী আমাদের সম্বন্ধে ছোট বাবাজীকে বলতে লাগলেন – গত শুক্রবারে আমি ভিক্ষা করতে বেরিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই উত্তরেশ্বর তীর্থের কাছে। আমার ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা চোট লেগে জখম হয়ে গেছল। গাছতলায় পড়েছিলাম। এই দুজন সজ্জন ভক্ত হাঁসোট আসছিলেন। এঁরাই আমাকে ধরে ধরে দাবাখানাতে ব্যাণ্ডেজ করিয়ে আখড়াতে অতিকষ্টে নিয়ে এসেছিলেন। এঁদের সাহায্য ছাড়া আমি সেদিন আখড়াতে কিছুতেই পৌছতে পারতাম না। আমি নিজেই

তখন যন্ত্রণাতে কাৎরাচ্ছি, মোটা লোক, দেহের ভারে হাঁপাচ্ছি, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল, তাই আসার পথে এঁদেরকে উত্তরেশ্বর ও নর্মদেশ্বর তীর্থ দর্শন করানো ত দূরের কথা, ঐ দুই তীর্থের মহিমা সম্বন্ধে কোন কথা শোনাতে পারিনি। এঁরা যদি কাল সকালে ওঁঙ্কলেশ্বরে ফিরে যান, তাহলে যাওয়ার পথে তুমি এঁদেরকে ঐ দুটি তীর্থ অবশ্যই দর্শন করিয়ে তারপর তুমি ফিরে যাবে মোটিয়া গ্রামে। মোটিয়ার মাতৃতীর্থের কাহিনী আমি যতটা জানি, আজ সকালেই এঁদেরকে শুনিয়েছি।

রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন – ভেইয়াজী ! আমি শুনেছি বাউলরা সহজ পথের পথিক। সহজ ভাবে যাকে ধর্ম বলে উপলব্ধি করা যায়, তার সাধনাই নাকি বাউলদের সহজ সাধনা। এতো সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধ সহজ-যানের কথা ! রাঢ় দেশের সিদ্ধাচার্য লুইপাদ খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে সর্বপ্রথম এই মত প্রচার করেন। কাজেই আপনাদের বাউল সাধনা ত বৌদ্ধ তান্ত্রিকাচারেরই প্রকার ভেদ !

বাবাজীর কথা শুনে রঞ্জন বাউল কিঞ্চিৎ তেঁতে উঠলেন বলে মনে হল। তিনি বলতে লাগলেন – বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য লুইপাদ বাউল ধর্মের আদি প্রবর্ত্তক কিনা জানিনা, তবে বাংলা বাউলদের পূর্বসুরী হলেন বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ও জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি। কবীর সাহেবেরও অনেক বাণী বচনে বাউর বা বাউল শব্দের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়, তাঁরা কেউ তান্ত্রিকাচারে লিপ্ত ছিলেন, একথা কখনও শুনিনি। মাধবেন্দ্র পুরী, মায়াবাদী শংকরাচার্য প্রতিষ্ঠিত দশনামী সম্প্রদায়ের পুরী উপাধি যুক্ত সন্ন্যাসী হলেও তাঁর কতকগুলি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর প্রথম যখন বাংলাদেশে আগমন ঘটে, তখন কোথায় তাঁর জন্ম, কে বা তাঁর পিতা মাতা, কেনই বা তিনি সন্ন্যাসী হয়েছেন, সে সময় কেউ তা জানত না। তিনি অন্যান্য সন্ন্যাসীদের মত ভিক্ষা করতেন না, স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে কেউ কিছু দিলে তবে তিনি আহার করতেন নতুবা উপবাসেই থাকতেন। এই সব বিশেষ গুণ তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করে লোকে তাঁকে ভক্তি করতে আরম্ভ করে। তিনি সর্বদা উন্মনা থাকতেন, নির্জনে একাকী বসে কখনও হাসতেন, কখনও কাঁদতেন। তা দেখে লোকে তাকে বাউল বলত। তাঁর সেই বাউলভাব তাঁর অন্তরের প্রগাঢ় প্রেম ভক্তির বিকাশ মাত্র কিন্তু সাধারণের কাছে যে বাউল নাম রটে গেছল, তার আর বদল হল না। এই মাধবেন্দ্র পুরীরই শিষ্য ছিলেন ঈশ্বর পুরী ও অদ্বৈত আচার্য। এই দুজন সর্বদাই চেষ্টা করতেন গৌরাঙ্গকে ভক্তির পথে টানতে কিন্তু জ্ঞান গর্বিত নিমাই পণ্ডিত তাঁদের প্রেম ভক্তিকে সর্বদাই উপহাস করতেন। অবশেষে গয়ায় গিয়ে ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে নিমাই পণ্ডিতের পুনরায় সাক্ষাৎ হল, তখন তাঁর ভাবান্তর উপস্থিত হল। তিনি উপহাসিত ঈশ্বর পুরীকেই গুরু বলে স্বীকার করে তাঁর কাছেই বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা নেন। পরে তিনি কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নিয়ে কৃষ্ণ চৈতন্য ভারতী, সংক্ষেপে চৈতন্য মহাপ্রভু নামে অভিহিত হন। তারপর হতেই চৈতন্যদেবই আদি বাউলদের প্রধান হয়ে উঠেন। চৈতন্যদেব এবং তাঁর সহচর নিত্যানন্দ কৃষ্ণকথা শুনতে শুনতে অধীর হয়ে উঠতেন, তাঁদের উভয়েরই শরীরে অশ্রু কম্প পুলক স্বেদ রোমাঞ্চ প্রভৃতি দেখা যেত। তাঁদের কৃষ্ণনামে উদ্দণ্ড নৃত্য এবং অবিরাম ক্রন্দন দেখে লোকে তাঁদেরকে বলত 'মহাবাউল'।

অদ্বৈত আচার্য এবং চৈতন্যদেব উভয়ে যে বাউল ছিলেন, অদ্বৈত আচার্যের স্বীকারোক্তির মধ্যেই তার পরিচয় পাই। চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় ১৯শ পরিচ্ছেদে পাই, অদ্বৈত আচার্য চৈতন্যদেবকে সাঙ্কেতিক ভাষায় কিছু বার্তা পাঠিয়েছিলেন –

তরজা প্রহেলি আচার্য কহে ঠারেঠোরে।
প্রভু মাত্র বুঝে, কেহ বুঝিতে না পারে ॥
বাউলকে কহিও লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিও কামে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥

অদ্বৈত আচার্য চৈতন্যদেব প্রভৃতি যে ধরণের, যে অর্থে বাউল নামে পরিচিত ছিলেন, সেই ধরণের বাউলের মধ্যে বৌদ্ধ তান্ত্রিকাচার কল্পনারও অতীত। ইদানীংকালে পূর্ববঙ্গে মদন বাউল এবং লালন ফকির ছিলেন বাউল ধর্মের শ্রেষ্ঠ উত্তর সাধক। মদন বাউলেরই শিষ্য আমার সঙ্গীত শিক্ষক নন্দদাস বাউল বছর তিনেক আগে ভাব ও বৈরাগ্যবশতঃ ছুটে এসেছিলেন এই শৈবতীর্থ নর্মদারই উত্তরতটে তবরাতে। তিনি কোন তান্ত্রিকাচারের পীঠস্থানে যাননি। আমি তবরা থেকেই এই দক্ষিণতটে এসে পৌছেছি।

তাঁর কথা শেষ হতেই বাবাজী রঞ্জনের দুটি হাত ধরে বললেন – আমার কথা হতে কোন অনাবশ্যক দুঃখ আহরণ করবেন না। আপনার মনে কোন আঘাত দিবার জন্য সিদ্ধাচার্য লুইপাদের বৌদ্ধ তান্ত্রিকাচারের সঙ্গে বাউল ধর্মের কোন মিল আছে, একথা বলতে চাই নি। আপনার কথায় বাউল ধর্ম যে এক প্রকারের বৈষ্ণব ভক্তিবাদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে, তা আজ বুঝতে পারলাম। সকাল হলেই আপনারা চলে যাবেন। আর হয়ত জীবনে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে না, এখনই ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটুক। এই বলে বৃদ্ধ বাবাজী রঞ্জনের হাতে ঝাঁকি দিয়ে আদর করলেন। এক মিনিট চুপ করে থেকে বললেন, শেষ বারের মত আর একটা বাউল গান শুনিয়ে যান। আমাদের এই ছোট বাবাজী নিজের চোখে দেখে যান, অনুভব করার চেষ্টা করুন বাউলের গানে কী ভাব সম্পদ লুকিয়ে আছে!

তাঁর অনুরোধে রঞ্জন একতারা বাজিয়ে গান ধরলেন –

আমার ঘরের চাবি পরেরই হাতে
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখব চক্ষেতে ?
আপন ঘরে বোঝাই সোনা, পরে করে লেনা দেনা,
আমি হলেম জন্ম-কাণা, না পাই দেখিতে।
রাজী হলে দরওয়ানী, দ্বার ছাড়িয়ে দিবেন তিনি,
তারে কই চিনি শুনি, বেড়াই কুপথে।
এই মানুষে আছে রে মন, যারে বলে মানুষ রতন,
লালন বলে পেয়ে সে ধন পারলাম না চিনতে ॥

রঞ্জন তাঁর গানের সুরে যে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করলেন, আমরা গান শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। পরে তাঁরা ঘর থেকে চলে যেতেই আমরা কেউ একটি কথা না বলে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল পরদিন সকালে। আমরা প্রাতঃকৃত্য সেরে প্রস্তুত হতে না হতেই দেখি, দুই বাবাজীই আমাদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমরা যে যার ঝোলা গাঁঠরী বেঁধে নিয়ে আশ্রমস্থ ঠাকুরকে প্রণাম করে বিদায় নিলাম বাবাজীর কাছে। বাবাজী আমাদেরকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন! আমরা প্রথমেই গেলাম হংসেশ্বর মন্দিরে। তখন হয়ে গেছে। হংসেশ্বর মহাদেব এবং সূর্যকুণ্ডকে প্রণাম করে, ছোট বাবাজীর সঙ্গে লাগলাম ওঙ্কলেশ্বরগামী পাকা রাস্তা ধরে পূর্বদিকে। পশ্চিমগামিনী নর্মদার শেষ প্রান্ত দেখা

হয়ে গেল, দেখা হয়ে গেল কিভাবে নর্মদা অমরকণ্টক হতে উদ্গতা হয়ে পশ্চিম সমুদ্রে এসে লয়প্রাপ্ত হয়েছেন। এবারে আমাদের যাত্রা শেষ হবে একেবারে মেকল পর্বতের উদ্গম মন্দিরে গিয়ে। মা নর্মদার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালাম মনে মনে।

প্রায় মাইল তিনেক হেঁটে আসার পরেই ছোট বাবাজী পাকা রাস্তা থেকে নেমে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন একটি রমণীয় স্থানে। রমণীয় এইজন্য বলছি যে আমাদের বামদিকে বয়ে চলেছেন নর্মদা, নর্মদার তটে কয়েকটি শাল, আসান এবং কুসুম গাছ, তাদের গায়ে গায়ে মনোরম হরিৎবর্ণ ফুলে ভরা সরগুঁজা ক্ষেত, সবুজ কুরুথীর ক্ষেত, আঁখ এবং গম জনারের গাছ, দূরে দূরে গরু মহিষ চরে বেড়াচ্ছে, প্রায় ১০টি চামেলী গাছের কুঞ্জ। দু তিনটি বেলগাছও আছে। মধ্যে একটি ছোট শিব মন্দির, মন্দিরের প্রাঙ্গণে সিন্দূর রঞ্জিত একটি বিশাল ত্রিশূল একটি বেদীর উপর প্রোথিত। এই স্থানটিকে একটি কুঞ্জবন বললেও অত্যুক্তি হয় না। সকালে এই কুঞ্জবনের মধ্যে চমৎকার আলোছায়ার খেলা। ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে সূর্যালোক এসে পড়েছে। ফুলের সৌরভে ভরে আছে চারদিক। ছোট বাবাজী বললেন - মন্দিরে আছেন নর্মদেশ্বর মহাদেব। এই মহল্লার নাম সীরা গ্রাম। একবার মহাদেব বৃদ্ধ বৃষভের রূপ ধারণ করে নর্মদার উত্তর এবং দক্ষিণতটে ইতঃস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। মা নর্মদা লীলাময়ের ছদ্মরূপ চিনতে পেরে জলের মধ্য হতে উঠে এসে তাঁর বিধিবৎ পূজা করেন। মহাদেব তখন স্বরূপে প্রকট হয়ে তাঁকে বর দেন যে নর্মদা তটের প্রতিটি কঙ্করে আমি শঙ্কর রূপে চিরকাল বিরাজমান থাকব। সেই থেকে এই স্থান প্রত্যেক পরিক্রমাবাসীর কাছে তীর্থের মর্যাদা পেয়েছে।

আমরা মহাদেবকে প্রণাম করে আবার উঠে এলাম বড় রাস্তার উপর। মাইলখানেক হাঁটার পরেই তিনি আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে একটি সমৃদ্ধ পল্লীতে প্রবেশ করলেন। পল্লীর শেষ প্রান্তে নর্মদার ধারেই একটি শিব মন্দিরে পৌঁছে বললেন - ইয়ে মহল্লাকী নাম হৈ উত্তরাজ ঔর মন্দিরস্থ মহাদেবকী নাম - উত্তরেশ্বর। প্রাচীনকালমেঁ এক রাজর্ষি শশিবিন্দু নামকে রাজা থে, উনকে পুত্র তো নাথো থে কন্যা এক হী থী। কন্যা বড়হী সুন্দরী গুণবতী থী, উসকে লিয়ে মহারাজ নে বহুৎ সে বর খোঁজে কিন্তু উসকো উপযুক্ত এক ভী বর নহী মিলা। রাজা কো বড়ী চিন্তা হুই। তব ঋষিয়োঁ নে কন্যা সে কহা - বেটি! তুম তপস্যা করো। তপসা কিং ন সিদ্ধতি ?'

ঋষিয়োঁ কো আজ্ঞা পাকর কন্যা ইহাঁ নর্মদা কিনারে আকর তপস্যা করনে লগী। উসী সময় পৃথ্বী সে ইয়ে উত্তরেশ্বর স্বয়ম্ভু লিঙ্গ প্রকট হুয়া ঔর স্বয়ং মহাদেব স্বয়ম্ভু লিঙ্গ সে প্রকট হো কর কহা - 'বেটি! তুমহারা তপস্যা সফল হুই। মহারাজ ভৃগবিন্দুকে পুত্র সে তুমহারা সাদি হোগা।' শিবজী কী বাণী সফল হুই। তভী সে ইহ্ তীর্থ ভক্তো কী মনোবাঞ্ছা কো পূর্ণ করনে লগা।

ছোট বাবাজী তীর্থের 'কহানী' বর্ণনা করেই মন্দিরের দরজা খুলে দিলেন। শিবলিঙ্গ দেখে অবাক হলাম। লিঙ্গটি একেবারে শ্বেতশুভ্র না হলেও প্রায় দুফুট দীর্ঘ শিবলিঙ্গটি সাদাটে সন্দেহ নাই, তাতে পিঙ্গল বর্ণের জটা, শিবলিঙ্গকে ঘিরে খচিত রয়েছে স্বাভাবিক মুণ্ডমালা এবং ত্রিশূল। আমি ছোট বাবাজীকে বললাম - আপনার মহল্লা মোটিয়া গ্রামের মাতৃতীর্থ এখান থেকে কত দূরে ? তিনি জানালেন - এখান থেকে পাকা রাস্তা পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে মাইল খানিক হাঁটলেই আমি স্বগ্রামে পৌঁছে যেতে পারব।

- তবে ভাই আপনি এখান থেকে ফিরে যান নিজের মহল্লায় আমরা এখানে স্নান ও পূজা করে ওঙ্কলেশ্বরে সহজেই ফিরতে পারব।

তাঁকে অনেক ধন্যবাদ এবং সুক্রিয়া জানিয়ে বিদায় করলাম। তারপর নর্মদাতে নেমে স্নান তর্পণ করলাম। রঞ্জনকে বললাম, আপনি খাতা দেখে মন্ত্র পড়ে পড়ে তর্পণ করতে থাকুন; আমি গিয়ে শিবলিঙ্গের পূজা করি। রঞ্জনের তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। কারণ

তিনি ত পরিক্রমাবাসী নন। শিবলিঙ্গ অর্চনার চেয়ে তিনি এখন তর্পণেই রস বেশী পাচ্ছেন। আমি ঘাট থেকে উঠে এসে মন্দিরের প্রাঙ্গণেই একটি ছোট বেলগাছের গোড়া থেকে পাঁচ ছটি বেলপাতা সংগ্রহ করে নিলাম। গাঁঠরী খুলে বের করলাম – হরকুমার ঠাকুর সম্পাদিত 'শিলাচক্রার্থবোধিনী' নামক পুঁথিটি। পুস্তকের 'অথ বাণলিঙ্গলক্ষণম্' অধ্যায়টির পাতা উল্টাতে উল্টাতে এই শিবলিঙ্গের বর্ণনা খুঁজে পেলাম। সেখানে স্পষ্ট লেখা আছে – শুভ্রাভং পিঙ্গলজটং মুণ্ডমালাধরং পরম্। ত্রিশূলধরমীশানং লিঙ্গং সর্বার্থসাধনম্॥ পুস্তকের বর্ণিত সমস্ত লক্ষণ উত্তরেশ্বর শিবের মধ্যে খুঁজে পেয়ে আমার মনে খুব আনন্দ হল। নর্মদার জল ঢেলে ঢেলে ঈশানের পূজা করে প্রণাম করলাম। পূজা শেষ করে বাইরে বেরিয়ে এসে ঘাটে গিয়ে দেখি, সেই মাত্র রঞ্জনের তর্পণ শেষ হয়েছে। তাঁর চোখ দিয়ে তখনও অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তিনিও এসে মহাদেবের মাথায় জল ঢাললেন। এই সময় পাঁচ ছ জন ভক্ত ভক্তানীকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরের পুরোহিত মশাই এসে উপস্থিত হলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন – আপ পরিক্রমাবাসী বা ? আমি ইতিবাচক উত্তর দিতেই তিনি জানালেন যে, দুজন বন্ধ্যা নারী পুত্র লাভের কামনায় আজ এখানে 'ধর্ণা' বা 'হত্যা' দিতে এসেছেন।

আমরা তাঁকে নমস্কার জানিয়ে পাকা রাস্তার উপরে উঠে এলাম। এবারে আমাদের গন্তব্যস্থল সোজা ওঁঙ্কলেশ্বর। রঞ্জনের পকেট ঘড়িতে তখন বেলা ১০টা বাজতে পাঁচ মিনিট মাত্র বাকী, উত্তরেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করে আমরা দুজনে যখন নর্মদা পুলের তলা দিয়ে ওঁঙ্কলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে এসে পৌছলাম, তখন বেলা সাড়ে এগারটা বেজেছে। মন্দিরে কাউকে দেখতে পেলাম না। মিনিট দুই দুজনে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে এলাম যে, নান্দুরামের চতুষ্পাঠী গৃহে আজ রাত্রিবাস করব তবে তার আগে ভৈরবী মায়ের সঙ্গে দেখা করলে ভাল হয়। ওঁঙ্কলেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করবার জন্য মন্দির দ্বারে গিয়েছি, এমন সময় মন্দিরাভ্যন্তর হতে হাসতে হাসতে ভৈরবী মা বেরিয়ে এলেন। বললেন – ক্যা, সূর্যকুণ্ড দর্শন করকে আয়া ? হাঁসোট ক্যায়সা জাগা হ্যায় ? আভি ইধর প্রণাম করকে হামারা সাথমেঁ চলিয়ে হামারা ঝোপড়ামেঁ। বগলমেই ঔর একঠো ছোটাসা ঝোপড়া হ্যায়। আজ রাত মেঁ কোঙ্গ সুরত সে উধরই ঠারেগা। কাল সুবে হম্ আপ্ দোনোকো সাথ মেঁ লেকর সিদ্ধেশ্বর অক্রূরেশ্বর বোলবোলা কুণ্ড বেগারা তীর্থ মেঁ লে চলেঙ্গে। আমরা প্রণাম করে তাঁর সঙ্গেই হাঁটতে লাগলাম। আজ মায়ের মূর্তি দেখে চমকে গেলাম। তাঁর শরীর দিয়ে যেন একটা দিব্যদ্যুতি ফুটে বেরুচ্ছে। উগ্র গৌরবর্ণের মুখমণ্ডলে শিরা উপশিরাগুলি রক্তাভ হয়ে উঠেছে। এইরকম সিন্দুর রঞ্জিত দেহের আভা মহাত্মা প্রলয়দাসজী এবং মহাত্মা সোমানন্দের মুখমণ্ডলেও মাঝে মাঝে ফুটে উঠতে দেখেছি। রামকুণ্ডের ধার দিয়ে তাঁর ঝোপড়াতে পৌছতেই তিনি প্রথম দিনের মত আজও দুটি কলা পাতা পেতে পূর্বের মতই চরু খেতে দিলেন। খেতে খেতেই আমি ভাবতে লাগলাম, রাতভোর ত ইনি ওঁঙ্কলেশ্বর মন্দিরাভ্যন্তরেই সাধনায় মগ্ন থাকেন বলে মনে হয়। সকালে কিছুক্ষণের জন্য হয়ত মন্দির থেকে চলে আসেন, মন্দিরের পুরোহিত বা সমাগত ভক্তবৃন্দ ওঁঙ্কলেশ্বরকে প্রণাম ও পূজা করে চলে গেলে আবার নিশ্চয়ই মন্দিরে গিয়ে প্রবেশ করেন। কারণ, এখানে প্রথম যেদিন আমরা বিমলেশ্বর থেকে এসে পৌছাই, সেদিনও মন্দিরে এসে এঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, আজও হাঁসোট থেকে ফিরে এসেও মন্দিরেই এঁর দর্শন পেলাম। সেদিনও তিনি আমাদেরকে জোর করে ধরে এনে গরম গরম চরু খাইয়েছিলেন, আজও সে চরু খেতে দিয়েছেন, তাও গরমই দেখছি। ইনি রান্না করার সময় পান কখন ? তবে কি ইনি মহাত্মা প্রলয়দাসজী যেমন ওঁঙ্কারেশ্বরে তাঁর গুহার মধ্যে ঢুকে তদ্দণ্ডেই গরম গরম খাবার এনে দিতেন, সেই রকম পরমাশ্চর্য যোগ বলেই আমাদেরকে খাদ্য পরিবেশন করছেন ? মনে আমার এ ভাবনা

উদয় হওয়া মাত্রই তাঁর খিল্ খিল্ করে হাসির শব্দ শুনতে পেলাম ঝোপড়ার মধ্য থেকে। তিনি অকারণে এত হাসছেন কেন এর রহস্য কিছু বুঝতে পারলাম না। যাই হোক, আমরা খেয়ে উঠে উচ্ছিষ্ট স্থান পরিষ্কার করে হাত মুখ ধুচ্ছি, এমন সময়ে তিনি ঝোপড়া থেকে বেরিয়ে এসে আমাদেরকে পার্শ্বস্থিত আর একটি ছোট ঝোপড়ায় নিয়ে গিয়ে নিজেদের আসন পেতে বিশ্রাম করতে বললেন। ঘণ্টা দেড়েক আমরা বিশ্রাম করার পর ঝোপড়ার বাইরে 'হর হর বম্ বম্' শব্দে আমরা শশব্যস্তে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, ভৈরবী মা বিল্ববৃক্ষমূলে এসে বসেছেন। তাঁর কাছে গিয়ে আমরাও তাঁর সামনে করজোড়ে বসলাম। তিনি আমাদেরকে বলতে লাগলেন – বর্তমানে এই স্থান ওঁঙ্কলেশ্বর নামে পরিচিত হলেও সত্যযুগে এই শিবক্ষেত্রের নাম ছিল মাণ্ডবেশ্বর, মুনি মাণ্ডব্যের সিদ্ধ তপস্থলী।

অত্র সর্বং শিবক্ষেত্রাচ্ছরপাতং সমন্ততঃ।
ন সঙ্করেত্তয়োদ্বিগ্না ব্রহ্মহত্যা নরাধিপ ॥
যত্র যত্র স্থিতো বৃক্ষান্ পশ্যতে তীর্থ তৎপরঃ।
বিবিধৈঃ পাতকৈর্মুক্তো মুচ্যতে নাত্র সংশয় ॥

অর্থাৎ এই স্থানের মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে মহামুনি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে জানিয়েছিলেন যে, একটি শর নিক্ষেপ করলে তা যতদূর যায়, সকল দিকের সেই সম পরিমাণ স্থানই এখানকার শিবক্ষেত্র। এখানে ব্রহ্মহত্যার পাপও ভয়োদ্বিগ্না হয়ে প্রবেশ করতে পারে না। তীর্থের প্রতি শ্রদ্ধানিষ্ঠ যে কোন লোক এই স্থানের যে কোন তীর্থ তরু দূর হতে দর্শন করলেও সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়ে থাকে সন্দেহ নাই।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত রেবাখণ্ডের ১৬৯ – ১৭৩ অধ্যায়ে এই মাণ্ডব্যেশ্বর মহাদেব এবং মাণ্ডব্য মুনির পুণ্য জীবনালেখ্য বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন, বশিষ্ঠ সংহিতার অন্তর্গত রেবাখণ্ডের ১৭৭ অধ্যায়ে এমন কি মহাভারতেও মাণ্ডব্য মুনির প্রসঙ্গ আছে। মহাভারতে আছে, মাণ্ডব্য মুনি একদিন যখন তপস্যায় মগ্ন ছিলেন, তখন একদল দস্যু এদেশের তৎকালীন রাজকন্যার বহুমূল্য রত্নহার অপহরণ করে মাণ্ডব্য ঋষির কুটীরে এসে আত্মগোপন করে। নগরপালরা দস্যুদেরকে তাড়া করে এইখানে ছুটে আসছে দেখে দস্যুরা তাঁর কুটীরের মধ্যে রত্নহারটি রেখে দিয়েই পালিয়ে যায়। নগরপালরা মুনির কুটীরে রত্নহারটি দেখতে পেয়ে অবাক হয়। তারা মুনিকে রত্নহার প্রসঙ্গে বারবার প্রশ্ন করে কিন্তু মুনি তখন এমনই ধ্যানমগ্ন ছিলেন যে, নগরপালদের কোন প্রশ্নই তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি। নগরপালরা মুনিকে দস্যুদের একজন সহযোগী এবং পৃষ্ঠপোষক ভেবে তাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাজদ্বারে উপস্থিত করে। মুনির তখন চলছিল মৌনব্রত। রাজা তাঁক বারবার প্রশ্ন করেও কোন উত্তর পেলেন না। ক্রুদ্ধ রাজা তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন, মাণ্ডব্যকে শূলে চড়ান হয়। মৌন ধ্যানমগ্ন মুনি এ বিচারের কোন কারণ বুঝলেন না। শূলবিদ্ধ অবস্থাতেও তাঁর কিন্তু মৃত্যু হল না। রাজা এই অত্যদ্ভুত ব্যাপারের বিবরণ শুনে বুঝতে পারেন যে, তিনি ভুল করে একজন নিরপরাধ তপস্বীকে সাজা দিয়ে ফেলেছেন। অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রাজা তখন মাণ্ডব্যের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর পদতলে পতিত হয়ে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলেন। মাণ্ডব্য তাঁকে ক্ষমা করলেন এবং জানালেন রাজা আপনার কোন দোষ নাই। পূর্ব জন্মকৃত কোন পাপের ফলেই আমি এই কষ্ট ভোগ করলাম। জন্মান্তরে মানুষ যেমন কর্ম করে, পরজন্মে তাকে ঠিক তদনুরূপ ফল ভোগ করতে হয়। সুকৃতই হোক দুষ্কৃতই হোক, তার ফল তাকেই ভোগ করতে হয় –

স্বয়মেব কৃতং কর্ম স্বয়মেবোপভুজ্যতে।
সুকৃতং দুষ্কৃতং পূর্বং নান্যে ভুঞ্জতি কর্হিচিৎ ॥

রাজা ঋষিকে শূল হতে নামিয়ে শূল বের করবার বহু চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত কৃতকার্য হলেন না। তখন তিনি শূলের বাইরের অংশটুকু কেটে দেন। মাণ্ডব্য সেই শূল নিয়েই তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করতেন। সেই থেকে তাঁর নাম হয় – অণীমাণ্ডব্য (অণী অর্থাৎ শূলের অগ্রভাগ)।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই অণীমাণ্ডব্য যমের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন – কোন পাপে তাঁকে এই রকম কঠোর শাস্তিভোগ করতে হল। যম জানালেন – বাল্যকালে আপনি পতঙ্গের মলদ্বারে তৃণ শলাকা প্রবেশ করিয়ে মজা উপভোগ করেছিলেন, সেই পাপের ফল আপনাকে এখন ভোগ করতে হচ্ছে। ঋষি বললেন – লঘু পাপে আপনি আমাকে গুরুদণ্ডের বিধান দিয়েছেন। সর্বপ্রাণী বধের চেয়ে কোন তপস্বীকে বধ বা প্রাণান্তকর যন্ত্রণা দেওয়া গুরুতর পাপ। এইজন্য আপনাকে শূদ্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হবে। অতঃপর আমি এই বিধান দিচ্ছি যে, চৌদ্দ বৎসর বয়সের পূর্বে অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য কাউকে আর দণ্ডভোগ করতে হবে না।

বেদব্যাস মহাভারতে এই ঘটনার উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন যে, মাণ্ডব্যের অভিশাপের ফলে পরবর্তী কালে যম দাসী গর্ভে বিদুর রূপে জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হন।

এই পর্যন্ত বলে ভৈরবী মা বললেন, মার্কণ্ডেয় মহামুনি রচিত রেবাখণ্ডে মহাভারতে বর্ণিত ঘটনা মোটামুটি একই রকম হলেও তিনি লিখেছেন যে, মাণ্ডব্যের শাস্তি বিধান যিনি করেছিলেন সেই রাজার নাম ছিল তপন, তাঁর পত্নীর নাম দাত্যায়নী, তাঁদের একমাত্র কন্যার নাম ছিল কামপ্রমোদিনী। কন্যা একদিন যখন সখীদেরকে সঙ্গে নিয়ে জল বিহার করছিলেন, তখন শম্বর নামে এক দুষ্ট দৈত্য রাজকন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে শ্যেন পক্ষীর রূপ ধরে কন্যাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়, রাজকন্যা আর্তনাদ করতে করতে নিজের রত্নহার ছিঁড়ে ভূতলে নিক্ষেপ করে, সেই রত্নহার মাণ্ডব্য মুনির আশ্রমে পতিত হয়েছিল। নগরপালরা তা দেখতে পেয়ে স্বয়ং মুনিকে রত্নহারের অপহারক ভেবে রাজদ্বারে টেনে নিয়ে গেছল। বশিষ্ট-সংহিতার অন্তর্গত রেবাখণ্ডে একই ঘটনার অনুরূপ বর্ণনা আছে। কিন্তু সেখানে রাজার নাম বলা হয়েছে – দেবরাজ এবং রাজকন্যার নাম কুমুদিনী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পুরাণের ঘটনায় যেমন অতিরঞ্জন থাকে তেমনি নানা অসামঞ্জস্যও থাকে। সেই সব বহিরঙ্গ বর্ণনার তারতম্যের কথা বাদ দিয়ে এই সার সত্য তোমরা জেনে রাখ যে, মুনি মাণ্ডব্য পরে তপোবলে ঋষি অণীমাণ্ডব্য নামে পরিচিত হয়ে এখানকার নর্মদাকূলে এই অচ্যুত্য শিবলিঙ্গ মাণ্ডব্যেশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁরই তপোবলে এখানে অত্যুগ্র সাধনায় মহাউদ্গীথ নাদ প্রকট হয়, নানা সময়ে নানা ঋষি এবং সাধকরা তা অনুভব করায় কালক্রমে তিনি ওঁঙ্কলেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

ভৈরবী মায়ের বর্ণনা শেষ হল। আমরা স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। হঠাৎ দেখি কোথা হতে এক বৃদ্ধ মুসলমান এসে উপস্থিত হলেন। পরণে লুঙ্গি, গলায় তসবীর মালা, মাথায় একটি সাদা টুপী; তাঁর শুভ্র শ্মশ্রু নূর এবং সৌম্যমূর্তি দেখে মনে হল যেন একজন ধর্মনিষ্ঠ দরবেশ এসে আমাদের কাছে সহসা আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি এসেই উর্দু বা আরবীতে কিছু আওড়াতে আওড়াতে ভৈরবী মাকে প্রদক্ষিণ করলেন তারপর পশ্চিম দিকে অস্তোন্মুখ সূর্যের দিকে তাকিয়ে উচ্চৈঃস্বরে সুর করে বলতে লাগলেন –

ইল্লাকবর ইল্ললেয়ি ইল্লাল্লাঃ ইল্লা

ইল্লাল্লা ইল্ললেয়ি ইল্লাল্লাঃ ইল্লা
ইল্লাল্লা অনাদিস্বরূপা আথর্বনী শাখা
হ্রুং হ্রীং পশূন্ সিদ্ধান্ জলচরান্
অদৃষ্টং কুরু কুরু ফট্।
অসুরসংহারিণীম্ হ্রুং অল্লার সুবমহমদবকম্
বরস্য অল্লো অল্লাং ইল্ললেতি ইল্লল্লঃ ॥'

সন্ধ্যাকালে বা ভোরবেলা মস্জিদে মুসলমান মোল্লা ও মৌলবী ভাইরা যেমন সুরে আজানের ডাক দেয়, সেই রকম সুরে উপরোক্ত মন্ত্র নানা মুদ্রা এবং অঙ্গভঙ্গী সহকারে তিনবার পাঠ করে ঐ মুসলমান ভদ্রলোক ভৈরবী মাকে 'সালাম আলেকুম' জানিয়ে চলে গেলেন। তিনি চলে যেতেই ভৈরবী মা বললেন – এই ওঙ্কারেশ্বর মহল্লাতে অল্লোপনিষদ্-পন্থী কিছু মুসলমান বাস করে। এই মৌলবী সাহেব তাদের নেতা বা সর্দার। এখানকার স্থানীয় মুসলমানরা এঁকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে মনে করেন। এঁর যে কিছু কিছু সিদ্ধাই আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তোমরা অল্লোপনিষদের নাম কখনও শুনেছ বলে মনে হয় না, পড়া ত দূরের কথা। বিচিত্র সংস্কৃত শব্দ এবং আরবী শব্দের প্রয়োগে ঐ উপনিষদটি রচিত। তাই স্বভাবতঃই হিন্দু বা মুসলমান সকলের কাছেই ঐ গ্রন্থ সমানভাবে দুর্বোধ্য। বেদবেদান্তের ছাত্ররা সাধারণতঃ ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতরঃ ও কৌষীতকী – এই প্রধান বারটি উপনিষদেরই নাম জানে। ভগবান শঙ্করাচার্য ঐ প্রধান বারটি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করে অদ্বৈতবাদ প্রবর্তন করায় ঐ বারটি উপনিষদেরই সাধারণতঃ পঠন পাঠন হয়ে থাকে। কিন্তু তাই বলে এইরকম সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, ভগবান শঙ্করাচার্যের সময়ে ঐ বারটি ছাড়া অন্য কোন উপনিষদের প্রচলন ছিল না। কারণ, ভগবান বাদরায়ণ বা বেদব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য মধ্যে মহানারায়ণ, জাবাল প্রভৃতি উপনিষদ্ সম্বন্ধে উল্লেখ দেখা যায়। বহু প্রাচীন কাল হতে, সেই বৈদিক যুগের প্রারম্ভ থেকেই আমাদের দেশের বিদ্যা ছিল গুরুমুখী, গুরু ও শিষ্য পরম্পরা ক্রমে স্মৃতি ও স্বাধ্যায়ের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল বলে অনেক প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য কালের প্রবাহে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, এই সত্য অস্বীকার করার উপায় নাই। নষ্ট হলেও আমাদের দেশের উদ্যমশীল আচার্য ও মনীষীবর্গ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না। তাঁরা স্ব স্ব মতকে শ্রুতি স্মৃতির প্রমাণ সম্বলিত করে সমাজে সুগম ও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য উপনিষদ্ নাম দিয়ে নূতন নূতন গ্রন্থ রচনা করে দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন, তার ফলে কালে কালে বহু উপনিষদের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। শ্রুতি স্মৃতির আবরণ দ্বারা আবৃত হওয়াতে তুলনামূলকভাবে অর্বাচীন হলেও স্ব স্ব শিষ্যবর্গের দ্বারা অবিরাম প্রচারের ফলে এক এক মনীষী আচার্যকে কেন্দ্র করে বহু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু উপনিষদ্ নামটির মধ্যেই যাদু আছে, সেই জন্য স্ব স্ব মতবাদকে ভিত্তি করে তাঁরা একদিকে যেমন তাঁদের গ্রন্থের নামের সঙ্গে উপনিষদ্ শব্দটি যুক্ত করেছিলেন তেমনি অন্যদিকে অপ্রচারিত অবস্থায় পাছে গ্রন্থখানি বিলুপ্ত হয়ে যায়, এই ভয়ে তাঁরা শিষ্যপরম্পরা এবং পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে নানাস্থানে প্রচারের ব্যবস্থাও করে গেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, নৃসিংহতাপনীয় রামতাপনীয় এবং গোপালতাপনীয় – এই তিনখানি উপনিষদের নাম উল্লেখ করতে পারি। বৈদিক যুগে এই সমস্ত উপনিষদের অস্তিত্বও ছিল না। তবুও পরবর্তীকালে অন্যান্য প্রামাণ্য উপনিষদ অর্থাৎ শ্রুতি প্রস্থান স্মৃতি প্রস্থান এবং ব্রহ্মসূত্রের বহু মন্ত্রের অদলবদল ঘটিয়ে নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদে নৃসিংহ অবতারের, রামতাপনীয় উপনিষদে রাম অবতারের এবং গোপালতাপনীয় উপনিষদ কৃষ্ণাবতারের নানা মহিমাজ্ঞাপক আখ্যায়িকা রচনা করে গ্রন্থ মধ্যে সংযোজন করা হয়েছে এবং আশ্চর্য ভাবে তা অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করাও হয়েছে। স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রচারের ফলে এইভাবে যে সমস্ত অর্বাচীন উপনিষদ বিস্তৃতি লাভ করেছে, তার মধ্যে ২৩৫ খানির অস্তিত্ব উপনিষদ্-অনুসন্ধানী পণ্ডিতগণ খুঁজে বের করেছেন। মুক্তিকোপনিষদে এইরকম ১০৮ খানি উপনিষদের নাম আছে। প্রাচীন হস্তলিপি এবং ভাষা ও ভাবের তারতম্য বিচারে পণ্ডিতগণ করেছেন যে উক্ত উপনিষদের কতকগুলি মাত্র প্রাচীন আর অধিকাংশই অর্বাচীন. যুগের বহু পরবর্তীকালে রচিত। অর্বাচীন উপনিষদ্গুলির কোনটি ঋষি প্রণীত নয়;

ঐগুলিকে অভিসন্ধিপরায়ণ সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতদের রচিত বলে গণ্য করা যেতে পারে। ঐ সব তথাকথিত উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে আবার অল্লোপনিষদ্ সবচেয়ে অর্বাচীন। সবচেয়ে হাস্যকর যে এই উপনিষদ্‌টিকে আথর্বণ সূক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আথর্বণ সূক্ত ত দূরের কথা বইটিকে উপনিষদ্ আখ্যাই দেওয়া যায় না। ঐ ভক্ত মুসলমানটি আজানের সুরে যে মন্ত্রটি পাঠ করে গেলেন, তাতে এমন বিচিত্র সব শব্দের প্রয়োগ আছে, যা সংস্কৃত ভাষায় কুত্রাপি দেখা যায় না।- 'ইল্লাকবর ইল্লল্লেয়ি' মন্ত্রাংশটিতে আকবরের নামোল্লেখ থাকায় অনুমান করা যায় যে, বাদশাহ আকবরের সময়কালেই উক্ত গ্রন্থ সংকলিত ও অনূদিত হয়েছিল। পারস্যদেশে 'মুণ্ড খবুৎ ত্তবারিক' নামক একটি ফারসী গ্রন্থে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, দাক্ষিণাত্যের একজন শিক্ষিত ব্রাহ্মণ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর তাঁর নাম হয় শেখ ভাবন। আকবর দেখলেন যে, ব্রাহ্মণ সংস্কৃত এবং ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত। তাই তিনি শেখ ভাবনের উপর অথর্ববেদকে ফারসীতে অনুবাদ করার ভার অর্পণ করলেন। সম্রাটের আদেশানুসারে শেখ ভাবন অনুবাদ কার্য সুরু করলেন কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর বুঝলেন যে, অথর্ববেদের মত একটি মৌলিক গ্রন্থকে এভাবে অনুবাদ করা যায় না। তিনি প্রমাদ গণলেন। তিনি অকপটে সম্রাটের কাছে গিয়ে নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন। তখন আকবর এই অর্ধসমাপ্ত কাজের ভার দিলেন ফৈজী এবং হাজী ইব্রাহিমকে। তাঁরা কোনমতে অথর্ববেদের কোন কোন মন্ত্র ফারসী ভাষার সঙ্গে মিশ্রিত করে অল্লোপনিষদ্ সৃষ্টি করলেন। সম্রাটের আনুকূল্যে এবং হাজী ইব্রাহিম ও শেখ ভাবনের প্রচার কৌশলে অল্লোপনিষদ্‌কে ভিত্তি করেই একটি ছোট সম্প্রদায় গড়ে উঠল। এখানকার ভক্ত মুসলমানটি সেই নববিধানের অন্তর্ভুক্ত পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে সেই ধারার বংশধর। বিরাট মুসলমান সমাজের তুলনায় এদের সংখ্যা নগন্য। এরা প্রকৃত মুসলমানদের কাছেও সমাদর পান না, হিন্দু সমাজের কাছেও উপহাসের পাত্র। এদের এখন অবস্থা 'ন ঘরকা, ন ঘাটকা'।

মিনিট খানিক চুপ থেকে ভৈরবী মা বলতে লাগলেন – মোট কথা, তোমরা জেনে রাখ, অল্লোপনিষদের মতই অন্যান্য অর্বাচীন উপনিষদ রচনার মূলে ছিল স্ব স্ব সম্প্রদায়ের পুষ্টির জন্য কূট অভিসন্ধি এবং সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি। এর ফলে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষ বুদ্ধিও বেড়ে গেছে। অথচ ভেবে দেখ, যাঁকে কেন্দ্র করে মানুষ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করতে চেয়েছিল, তিনি কিন্তু কোন সম্প্রদায়গত নন। তিনি নিত্য, সত্য, শাশ্বত, সদা বিদ্যমান, এবং মহামহীয়ান। তাঁকে বেষ্টন করা যায় না, বিদ্যা দিয়ে তাঁকে অভিভূত করা যায় না, বুদ্ধি দিয়েও তাঁকে পরাজিত করা যায় না। তবুও অজ্ঞানী মানুষ বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দিয়ে সেই অনাদি অনন্তের মীমাংসায় উপনীত হতে চায়।

যাই হোক, আমার সারকথা হল – ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতরঃ ও কৌষীতকী – এই বারখানি উপনিষদই বহু প্রাচীন, প্রামাণ্য এবং মান্য। প্রধানতঃ এই বইগুলিই হাজার হাজার বছর ধরে কালের প্রভাবকে সহ্য করে অবিকৃত অবস্থায় এখনও বেঁচে আছে এবং আশা করছি, ভবিষ্যতেও একইভাবে হিন্দুধর্মের জ্যোতিঃ বিকিরণ করে চলবে।

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই মুসলমান পল্লী থেকে ভেসে এল আজানের সুরে উচ্চারিত একটি মন্ত্রধ্বনি –

'মালাকুম্ মিন দুনোই মিন্ ওয়ালিয়েন ওয়ালা-শাফিয়েন্'।

ভৈরবী মা আনন্দে গদগদ হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলে উঠলেন – মূল কোরাণের এইটি একটি খাঁটি উপদেশ। মূল আরবী ভাষায় রচিত এ বাণীর অর্থ হল – 'পরমেশ্বর ব্যতীত

তোমাদের কোন বন্ধু নাই এবং সুপারিশকারীও নাই।' কাজেই এখন আমরা চল বন্ধুর গৃহে। ওঁঙ্কলেশ্বর মন্দিরে বসেই সান্ধ্যক্রিয়া সেরে আসবে।

এই বলেই তিনি হেঁটে চললেন। তাঁকে অনুসরণ করে আমরাও হাঁটতে লাগলাম। রামকুণ্ডের ধার দিয়ে হেঁটে মন্দিরে পৌছে সন্ধ্যা করতে বসলাম। ভৈরবী মা ঢুকে গেলেন সরাসরি মন্দিরের মধ্যে। মন্দিরের মধ্যে দেখলাম, একটি ঘি এর প্রদীপ জ্বলছে। মনে হল, আমরা যখন ঝোপড়ার কাছে বসে ভৈরবী মায়ের কথাতে মগ্ন ছিলাম, সেই সময়ের মধ্যে নান্দুরামের মেশোমশাই এসে সন্ধ্যারতি সেরে গেছেন। আমি কমণ্ডলুর জলে আচমন করে সন্ধ্যা করতে বসলাম, আমার কাছে একটু দূরেই বসলেন রঞ্জন বাউল। স্থান মাহাত্ম্য স্বীকার করতেই হবে। ধীরে ধীরে মন ডুবে গেল গভীরে, মনে হচ্ছে আমার মস্তিষ্ক কোষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে, ঘণ্টা বাজছে ডান দিক ঘেঁসে, কিছুক্ষণ পরেই ঘণ্টাধ্বনি আচম্বিতে পরিবর্তিত হয়ে গেল শঙ্খধ্বনিতে, শঙ্খধ্বনিতে এত মাদকতা! আমার ধমণীতে ধমণীতে যেন আনন্দ ক্ষরণ হচ্ছে, মুহূর্তকাল পরেই মনে হল গুড় গুড় শব্দে মেঘ ডাকছে, মেঘে মেঘে ঘর্ষণ হলে যেমন বিদ্যুৎ ঝলসে উঠে সেই রকম বিদ্যুতের অবিরাম ঝিলিক দেখে আমি ঠাওর করতে পারলাম না, এই বিদ্যুৎ চমক ভিতরে না বাইরে। আমি চোখ খুলবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু চোখদুটো কেউ যেন আঁঠা দিয়ে এঁটে দিয়েছে, চোখ ত খুলতে পারলামই না পরিবর্তে ভিতরেই গর্জে উঠল ওঁ-কার, ওঁ-কার, রা-রং-কার, সো-হং, সো-হং। আমার চেতনা বিলুপ্ত হল, আঃ! বড় শান্তি!

কতক্ষণ যে এইভাবে আমি বিভোর হয়ে থাকলাম, তা জানা নাই। 'আভি উতর যাইয়ে একদিন মেঁ এ্যাতনা নেহি। তুমহারা দোস্ত ভাগ গয়া' ভৈরবী মায়ের কণ্ঠস্বরে আমার ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে এল। আমি ধীরে ধীরে চোখ খুলেই দেখতে পেলাম ভৈরবী মাকে, তিনি খিল্ খিল্ করে হাসছেন। কিন্তু একি! ঘড়িতে রেডিয়ামের কাঁটা থাকলে তা যেমন ঘন অন্ধকারের মধ্যেও আলোকময় দেখায়, তেমনি এই ঘন অন্ধকারের মধ্যে ভৈরবী মায়ের মূর্তি জ্যোতির্মণ্ডিত দেখাচ্ছে! আমি তাঁকে প্রণাম করবার উপক্রম করতেই তিনি বলে উঠলেন – 'ইধর নেহি, উধর' – এই বলে ওঁঙ্কলেশ্বর বিগ্রহের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করলেন। আমি মহাদেবকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে উঠে বসতেই পলকের জন্য মনে হল বিগ্রহ মূর্তির পরিবর্তে সেখানে যেন এক জ্যোতির গোলক বিরাজমান্। আমি চোখ দুটো রগড়ে নিলাম, ভৈরবী মা সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত ধরে টেনে তুললেন। তিনি হাত ধরেই আমাকে নিয়ে চললেন তাঁর ঝোপড়ার দিকে। আমার মনে পড়ল আজই আমরা হাঁসোট থেকে ফিরেছি, গতকাল রবিবার হাঁসোটেই কেটেছে, আজ তাহলে সোমবার ৬ই অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি, তাই চারদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। রামকুণ্ডের সীমা পেরিয়ে আসতেই রঞ্জনের গলা শুনতে পেলাম। একতারা বাজিয়ে সে আপন মনে গেয়ে চলেছে –

বলুক সে বলুক বলুক, যার মনে যা লয় গো,
আপনা পথের পথিক আমি, কার বা করি ভয় গো।
আমের বীচে হয়ই রে আম,
জামের বীচে হয় তো রে জাম,
আমি বীচে পাকা আমি, জয়গুরু জয় জয় গো॥

আমরা বেলগাছের তলায় পৌছতেই রঞ্জন টর্চ টিপে ধরলেন। ভৈরবী মা আমাকে ঝোপড়ার ভিতর ঢুকে, আমার শয্যা বা আসন পাতাই ছিল, সেখানে শুইয়ে দিলেন। রঞ্জনকে বললেন – তুমহারা দোস্তকা তবিয়ৎ মেঁ থোড়াসা গড়িবড়ি হুয়া। নিদ্ হোনেসে আচ্ছা হো জাবেগা। তুম জ্যাদা বক্‌বক্ মৎ করনা।' এই বলেই তাঁর নিজের কুটীরে চলে গেলেন। রঞ্জন আমার কম্বলটা ভাল করে আমার গায়ে জড়িয়ে দিতে দিতে বললেন

– কি করব, এঁর আশ্রয়েই এসে উঠেছি, ইনি যত্ন করে খেতেও দিচ্ছেন, তাই কিছু মন্তব্য করা আমার পক্ষে শোভনও নয়, তবুও ভাই মন খুলেই বলছি, এই ভৈরবী মাকে দেখলেই আমার অস্বস্তি হয়। ইনি মহাবিদুষী এবং মহা সাধিকা একথা স্বীকার করে নিয়ে বলছি, এঁকে আমার ভাল লাগছে না। শিব মন্দিরে গিয়েই ইনি ভিতরে ঢুকে গেলেন, আপনিও জপে বসে গেলেন, আমি অন্য তন্ত্রের কারবারী, গানই আমার মন্ত্র, গান আমার জপ তপ, শিবটিব্ আমার খুব ভাল লাগেনা, মন্দিরে গিয়েও আমি কোন রস পাই না। তাই আমি মন্দির থেকে উঠে চলে এসেছিলাম .... ইত্যাদি।

আমি তাঁর কথার কোন উত্তর দিলাম না। মিনিট খানিক চুপ করে থেকেই নিজেই আপন মনে বলতে লাগলেন – রাত্রি বারটা বাজতে যায়। আপনি ঘুমান, আমি ঘুমাই। এই বলে নিজেও কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে যখন আমাদের ঘুম ভাঙল, তখন সাতটা বেজে গেছে। সূর্যরশ্মি গাছপালার উপর পড়ে ঝিলিমিলি খেলছে। ঝোপড়ার দরজা খুলে দেখলাম ভৈরবী মা তাঁর একটি ছোট ঝোলা হাতে নিয়ে বেলতলায় একবারে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা তাড়াতাড়ি বাইরে আসতেই বললেন – তুরন্ত মুখ হাত সাফ করকে প্রস্তুত হো যাইয়ে। আভি যাত্রা করেঙ্গে ঔর দো চারঠো তীর্থ আপকো ঘুমা দেঙ্গে। আমরা পনের মিনিটের মধ্যে মুখ হাত ধুয়ে নিজেদের গাঁঠরী বেঁধে তাঁর সঙ্গে যাত্রা করলাম। 'জয় ওঁঙ্কলেশ্বর মহাদেও, হর হর বম্ বম্' ধ্বনি দিতে দিতে তিনি আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন। তিনি পথে যেতে যেতেই বলেন 'আমি তোমাদেরকে প্রথমে নিয়ে যাব অক্রূরেশ্বর তীর্থে। এখান থেকে মাত্র মাইল খানিক হেঁটে গেলেই নর্মদার তীরেই সেই তীর্থ দর্শন করতে পারবে। লঙ্কেশ্বর রাবণের মধ্যম ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের এক পুত্র ছিল, সে মোটেই রাক্ষস স্বভাবের ছিল না। ক্রূরতা ত দূরের কথা সে খুবই ভক্তিমান ছিল। তার নামও ছিল অক্রূর। সে তার কাকা বিভীষণের খুব প্রিয় ছিল। যখন রামচন্দ্রের হাতে সমস্ত রাক্ষসকুল বিনষ্ট হল, তখন অক্রূর লঙ্কা পরিত্যাগ করে এই নর্মদা তটে এসে নিজের নামে অক্রূরেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপন করে ঘোর তপস্যায় মগ্ন হয়। ইনকে ভক্তিসে প্রসন্ন হোকর্ শিবজী ইস্‌কে সম্মুখ প্রকট হুয়ে ঔর বরদান মাঁগনে কো কহা, তব ইস্‌নে এহি বর মাঁঙ্গা কি মেরী ভগবান বিষ্ণুকে চরণোঁ মেঁ সদা অহৈতুকী ভক্তি বনী রহে।' মহাদেব 'তথাস্তু' বলে তাকে ভগবদ্ ভক্তির শুভাশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন। সেই থেকে এই তীর্থের উৎপত্তি হয়েছে।'

সে পথ দিয়ে আমরা যাচ্ছি, সে পথ খুব ভাল নয়। একে ছোট ঝাড়িপথ বলাই সঙ্গত। আমি দু চারবার হোঁচট খেলাম। রাস্তার দু ধারেই ঝোপ ঝাড়। মাঝে মাঝে বড় বড় শাল সেগুন ও পাকুড় গাছও দেখতে পেলাম। আধঘন্টাটাক হাঁটার পরেই রাস্তার ডান দিকে কতকটা নেমে এসে একটি পুরাতন জীর্ণ মন্দির দেখিয়ে বললেন – এই হল অক্রূরেশ্বর তীর্থ। তোমরা এইখানেই নর্মদাতে স্নান করে নাও। তিনি মন্দিরের বারান্দায় বসলেন। আমরা স্নান তর্পণ করে মন্দিরে ঢুকে শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢাললাম। পূজা ও প্রণাম সেরে আমরা 'হর নর্মদে' ধ্বনি দিতে দিতে ভৈরবী মার সঙ্গে তাঁরই প্রদর্শিত ঝাড়ি পথ ধরে আবার হাঁটতে লাগলাম। ওঁঙ্কলেশ্বর পেরিয়ে হাঁসোট পর্যন্ত ত আমরা যেমন বাঁধানো পাকা রাস্তা পেয়েছিলাম সে ত দূরের কথা, বিমলেশ্বর থেকে ওঁঙ্কলেশ্বর পর্যন্ত যেমন একটা নির্দিষ্ট রাস্তা পেয়েছিলাম, এই পথ মোটেই সেই রকম নয়। এবড়ো খেবড়ো ঝাড়ি পথ, কন্টকাকীর্ণ এবং কঙ্করময়। রঞ্জন বাউল বারবার হোঁচট খাচ্ছে দেখে ভৈরবী মা বললেন, 'সাবধানে হাঁটো। নর্মদা থেকে আমরা দূরে সরে আসছি ক্রমশঃ। পরিক্রমাবাসীরাও নর্মদা তট হতে এইভাবেই উপরে উঠে আসতে বাধ্য হন, কারণ এখন যে তীর্থ লক্ষ্য করে যাচ্ছি, তার নাম বোলবোলা বা বলাবল কুণ্ড। এই কুণ্ডতীর্থ পরম পাবন তীর্থ। সেখানে চতুর্ভুজ,

নীলকণ্ঠ শিবজী এবং নর্মদামায়ীর মূর্তি আছে। আর কুণ্ডের মধ্যে নর্মদামাতা সতত বিরাজমান বলে নর্মদাতটের অনেক প্রসিদ্ধ মহাত্মাও উপলব্ধি করে গেছেন। এই কুণ্ডতীর্থ দর্শন না করলে পরিক্রমা সম্পূর্ণ হয় না। আমাদেরকে প্রায় এখনও সাতমাইল হেঁটে যেতে হবে। ঐ পুণ্যস্থানে প্রাচীন যুগে মহর্ষি কশ্যপের আশ্রম ছিল। তিনি জগতের সকল জীবকে রোগগ্রস্ত দেখে তাদের দুঃখ মোচনের জন্য মহাদেবকে ধন্বন্তরী রূপে স্মরণ করেন। তাঁর তপোবলে মহাদেব কশ্যপের আশ্রমস্থিত বোলবোলা কুণ্ডে ধন্বন্তরী রূপে আবির্ভূত হয়ে বিভিন্ন ব্যাধি নিরাময়ের বিভিন্ন ঔষধের নাম বলে যান। সেই থেকে এই তীর্থের মহিমা ভক্তদের কাছে প্রচারিত হয়েছে। ঐ বোলবোলা কুণ্ডের জলে সর্বব্যাধি নিরাময়ের শক্তিও নিহিত আছে। শুধু এই কারণেও অনেক দূর দূর থেকে এখানে যাত্রীরা এসে থাকেন। ঐ কুণ্ডতীর্থে পৌঁছালে তোমরা নিজেরাই অনেক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

কথা বলতে বলতে আমরা মাইল চারেক হেঁটে ফেলেছি। এমন সময় একদল লোককে তীর ধনুক হাতে বাঁকের মুখে হেঁটে আসতে দেখা গেল। ভৈরবী মা কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়ালেন, তারপর আবার হাঁটতে সুরু করলেন। আমাদের দিকে পিছনে ফিরে বললেন – ভয়ের কিছু নাই। ওরা ভিনদেশী পাহাড়ী সন্দেহ নাই তবে ওরা হয়ত দল বেঁধে কোন বিবাহ সাদির ব্যাপারে কোন ভিন্ গাঁয়ে যাচ্ছিল। ঝাড়ি পথে হাঁটতে হলেই এদেশের প্রায় প্রত্যেকেই হয় লাঠি, না হয় তীর ধনুক হাতে নিয়ে যায়। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন – মহর্ষি কশ্যপ সম্বন্ধে তুমি যতটা জান বর্ণনা কর। আমি বিনম্র ভাবে বলতে লাগলাম – মহর্ষি কশ্যপ বিখ্যাত প্রজাপতি ঋষি। ইনিই দেবদৈত্যদের জনক। শুক্লযজুর্বেদ প্রভৃতি বৈদিক সংহিতার মতে, ইনি হিরণ্যবর্ণ ব্রহ্মা হতে জন্মলাভ করেন। লিঙ্গ পুরাণ মতে মহর্ষি কশ্যপ ব্রহ্মার মানস পুত্র। আবার কোন কোন পুরাণ মতে ইনি মরীচির তপোবলে সমুৎপন্ন হয়েছিলেন। ইনি দক্ষ প্রজাপতির তেরটি কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁরাই সমস্ত লোকের জননী। জগৎ প্রসবিনী সেইসব কন্যার নাম – অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্ঠা, সুরসা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, সুরভা, সরমা ও তিমি। এই ত্রয়োদশ দক্ষ কন্যা হতেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির তেরটি জাতির উদ্ভব হয়। আদিতি হতে দেবগণ, দিতি হতে দৈত্যগণ, দনু হতে দানবগণ, কাষ্ঠা হতে অশ্বাদি পশুগণ, অরিষ্ঠা হতে গন্ধর্বগণ, সুরসা হতে রাক্ষসকুল, ইলা হতে বৃক্ষ উদ্ভিদ প্রভৃতি, মুনি হতে অপ্সরাগণ, ক্রোধবশা হতে পিশাচকুল, তাম্রা হতে পক্ষী সমূহ, সুরভি হতে গোমহিষাদি চতুষ্পদ জন্তু সমূহ, সরমা হতে শ্বাপদ কুল এবং তিমি হতে জলজন্তু সমূহের উৎপত্তি হয়েছে। আমার এই ভেবে খুবই আনন্দ হচ্ছে, যে আপনার দয়ায় আজ সেই প্রজাপতি কশ্যপের তপস্থলী দেখবার সৌভাগ্য হচ্ছে।

আমার কথা শুনে ভৈরবী মা আমার চিবুকে নাড়া দিয়ে বললেন – সাবাস্ বেটা। তুমহারা পিতাজীকা আশীর্বাদমেঁ, তুম্ বচপন্‌সে বহু অধীতী বন গয়ে, তুম কুছ্ না বোলনেসে ভী মুঝে পতা চল্ গয়া যে, তুম সমুচা উত্তরতট পরকরমা করকে ইধর আয়া। মহর্ষি কশ্যপ জী কা বারেমেঁ আপ আচ্ছা হি বিবরণ দিয়া। লেকিন্ রামায়ণমেঁ বাল্মীকিজীনে উন্‌কা বারেমেঁ যো কুচ্ বাতায়ে, উস্‌কা ভি জিকর করনা চাহিয়ে থা। এই বলে তিনি নিজেই বলতে লাগলেন – রামায়ণের মতেও কশ্যপ মরীচির পুত্র। ভগবান বিষ্ণু বামনরূপে তাঁর পুত্রত্ব স্বীকার করেছিলেন। বাল্মীকির বিবরণানুসারে মহর্ষি কশ্যপ দক্ষ প্রজাপতির ৮টি কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের নাম – অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মুনি ও অলকা। বিবাহের পর কশ্যপ স্ত্রীদের বলেন – এখন তোমরা তপস্যা করে আমার যোগ্য পুত্রের জন্ম দাও। অদিতি, দিতি, দনু ও অলকা এতে সম্মত হয়ে যথাক্রমে – অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র ও যুগল অশ্বিনীকুমার এই ৩৩ জন দেবতা, দৈত্য ও দানবসকল, অশ্বগ্রীব, নরক ও কালক প্রভৃতির জন্ম দেন। বাকী যাঁরা সম্মত হলেন না,

তাঁরা তোমার উল্লিখিত অন্যান্য প্রাণীর জন্মদাত্রী। পুরাণের ঐ সব বর্ণনা বিচারশীল মানুষের সাধারণ বিচার বুদ্ধিকে গুলিয়ে দেয়। মানুষের মনে সংশয় জাগা স্বাভাবিক যে, ঋষির ঔরসে ঋষিপত্নীদের গর্ভে, প্রাকৃতিক রজঃ বীর্যের সংমিশ্রণ জনিত সকল বৈজ্ঞানিক সত্যকে অস্বীকার করে কিভাবে তাঁরা স্থাবর পদার্থ, গাছ পাথর এবং পশুপক্ষী শ্বাপদ প্রভৃতি জঙ্গম পদার্থের জন্ম দিলেন ? এই জন্যই ঋষি প্রণীত শাস্ত্রের শব্দার্থ রহস্য ঋষি প্রণীত শব্দকোষ যেমন নিরুক্ত, ব্যাকরণ (যেমন পাণিনিকৃত) প্রভৃতির সাহায্যেই বুঝতে হয়। তাহলে বিচার বুদ্ধি কোন মতেই আচ্ছন্ন হয় না। হাঁসোটে হরিব্যাসী সম্প্রদায়ের সাধু বৈকুণ্ঠ দাস কশ্যপ শব্দের যে অর্থ বলেছিলেন, তা যথার্থ। যঃ পশ্যতীতি স পশ্যকঃ। পাণিনির 'আদ্যন্তঃ বিপর্যয়শ্চ' এই সূত্রানুসারে পশ্যকঃ হল কশ্যপঃ অর্থাৎ সর্বদ্রষ্টা সেই ভগবানই স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় পার্থিব পদার্থ হতে আরম্ভ করে দেবদৈত্য গন্ধর্ব মনুষ্য সকলেরই স্রষ্টা। সকলেরই উৎপত্তি 'তিনি' হতে। কশ্যপের এই ব্যাকরণ সিদ্ধ অর্থ জানা থাকলে তখন আর মনে কোন সংশয় জাগে না।

কথা বলতে বলতে আমরা প্রায় সাড়ে বারটা নাগাদ্ বলাবল কুণ্ড বা বোলবোলা কুণ্ডতীর্থে এসে পৌছে গেলাম। চারদিকে গাছপালা ঘন সন্নিবিষ্ট হলেও এই পল্লীতে যে অনেক সম্পন্ন গৃহস্থ বাস করেন, তা গ্রামে ঢুকেই বুঝতে পেরেছি। গ্রামের মধ্যস্থলেই এই পবিত্র তীর্থ। কুণ্ডের চারপাড়েই চারটি ছোট ছোট মন্দির। কুণ্ডের সামনে আমরা উপস্থিত হওয়া মাত্রই পুরোহিত সহ আটদশজন ভক্ত এক সঙ্গে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলেন – হর হর ববম্ মহাদেও। জয়যোগিনী যুক্তেশ্বরী মাতাজীকো জয় হো। তাঁরা একে একে এসে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। আমি রঞ্জন বাউলের কানে কানে চুপিসারে বললাম – আমরা নিজেরাই ভুল করে এঁকে 'ভৈরবী মা' বলে অভিহিত করছিলাম, এখন বুঝা যাচ্ছে এঁর প্রকৃত নাম – যোগিনী যুক্তেশ্বরী। 'যুক্তেশ্বরী মা এসেছেন' মুখে মুখে একথা রাষ্ট্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক গৃহস্থ বধূ আসতে লাগলেন মাকে প্রণাম করতে। মাতাজী পুরোহিতজীকে বললেন – তুমি ভাল করে ওদেরকে কুণ্ডের বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দাও এবং নীলকণ্ঠ চতুর্ভুজ মহাদেব এবং নর্মদাকে প্রণাম করাও। ইয়ে দোনো মূর্তিকা ব্রাহ্মণ শরীর হ্যায়। আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে তাদেরকে জানালেন – ইয়ে ব্রহ্মচারীজী পরকরমাকারী হ্যায়। পিতাজীকা আদেশমেঁ ইনোনে জলেহরি পরকরমা কর রহা হ্যায়। ঔর উনকা সাথী জো হ্যায়, উহ্ বাচ্চা হরবোলা হ্যায়, হরবখৎ গুণ্‌গুণ্ করকে গানা গাতা হৈ। বলেই তিনি খিল্ খিল্ করে হেসে গড়িয়ে পড়লেন। যাই হোক, তিনি সমাগত ভক্তদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, পুরোহিতজী আমাদেরকে নিয়ে শিব নর্মদা চতুর্ভুজ নীলকণ্ঠ প্রভৃতির বিগ্রহকে দর্শন ও প্রণাম করিয়ে কুণ্ডের সামনে দাঁড় করালেন। দেখলাম, কুণ্ডটির চারদিক পাথর দিয়ে বাঁধানো। জলের মধ্যে বুগ্‌বুগ্ শব্দে ধ্বনি উঠছে। উনুনে এক হাঁড়ি জল গরম করতে চাপালে তা যেমন টগবগিয়ে ফুটে উঠে, তেমনি জলে অহরহ মৃদু আলোড়ন হচ্ছে, স্থির হয়ে কান পাতলে বুগ্‌বুগ্ ধ্বনিও শ্রুতিগোচর হচ্ছে। রঞ্জন কুণ্ডের জল গরম কিনা জিজ্ঞাসা করতেই পুরোহিতজী বললেন – নেহিজী, কুণ্ডমেঁ হাত দিজিয়ে পানি বিলকুল ঠাণ্ডা হ্যায়। কুণ্ডসে তিনচার হাত দূরমেঁ জাকর মিট্টিমেঁ কান ডালিয়ে উধর ভি নাদ শুনাই দেগা। আমরা দুজনেই একটু দূরে ভূপৃষ্ঠে কান পাতলাম। সত্যিই মাটির নিচে সেই একই বুগ্‌বুগ্ ধ্বনি। কুণ্ডের কাছে ফিরে আসতেই পুরোহিতজী বললেন – অতি উচ্চকোটির্ সাধক সাধিকারা অনুভব করেছেন যে, এই কুণ্ডের মধ্যে নর্মদামাতা নিত্য বিরাজমানা। এই কুণ্ডের সঙ্গে সমুদ্রেরও সংযোগ আছে। তাই এই কুণ্ডের জল লবণাক্ত কিন্তু অল্প দূরেই যে পুষ্করিণীটি দেখতে পাচ্ছেন তার জল সুমিষ্ট এবং সুপেয়। সমুদ্র ও রেবার সংগম স্থল হতে এই কুণ্ড ৩/৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত হলেও প্রত্যেক পরিক্রমাবাসীকে এই স্থানে উঠে এসে দর্শন

করে যেতে হয়। মহর্ষি কশ্যপের তপস্যার স্থলকে প্রণাম না করলে পরিক্রমা খণ্ডিত হয়ে যায়।

যুক্তেশ্বরী মা যেখানে বসেছিলেন সেইখান থেকে চেঁচিয়েই বললেন – দোনো হাত জোড়কে বলো বেটা 'হর নর্মদে' আমরা তৎক্ষণাৎ যুক্তকরে বলে উঠলাম – 'হর নর্মদে'। দেখলাম, কুণ্ডের মধ্যে বেশী করে বুদ্ বুদ্ উঠছে। ফিন্ বোলো, জোরসে বোলো – 'হর নর্মদে'। আমরা লক্ষ্য করলাম, হর নর্মদে বা নর্মদে হর মন্ত্র যত উচ্চৈঃস্বরে এবং যত ঘন ঘন বলা যায়, ততই বুদ্‌বুদ্ বেশী উঠে। এই পরমাশ্চর্য কাণ্ড দেখে খুবই অভিভূত হয়ে পড়লাম।

হঠাৎ পিছনে হাততালির শব্দ শুনে পিছন ফিরে দেখি, যুক্তেশ্বরী মা আমাদেরকে তাঁর কাছে ডাকছেন। তাঁর কাছে গিয়ে দেখি তাঁর সামনে হাত জোড় করে বসে আছেন একজন বৃদ্ধা। বৃদ্ধার দুই হাতের দুই বাহুতে এবং গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে চন্দনের ত্রিপুণ্ড্র। মা তাঁকে দেখিয়ে বললেন – ইনি শিব ভক্ত। পরিক্রমাবাসীকে ভিক্ষা দান, এঁর ব্রত। তোমাদের জন্য ভক্তিভরে ভিক্ষা এনেছেন। এঁর সঙ্গে সামনের চালাতে বসে ভিক্ষা গ্রহণ করে এস। আমি এখানেই বসে থাকব। তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে আমরা সেই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর সঙ্গে চালাঘরে গিয়ে ভিক্ষা গ্রহণ করলাম। পুরী শব্জী লাড্ডু ও দুধ, আমরা দুজনেই পেট ভরে খেলাম। তিনি বালতিতে করে আমাদের হাতমুখ ধোওয়ার জন্য জলও এনেছিলেন। ভিক্ষা গ্রহণের পর তাঁর কাছে আসতেই তিনি বললেন – আজ তোমরা এখানেই পুরোহিতজীর ঘরে থাক। এই কুণ্ডের কাছে বসে ধ্যান জপেও কাটাও। অন্ততঃ একরাত্রি এই তীর্থে বাস করা উচিত। কাল সকালে এসে তোমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সাজোতে যাব। আমি কোথায় থাকব, কি করব, তোমাদের জানার দরকার নাই। এই বলে তিনি পুরোহিতজীকে তাঁর বাড়ীতে আমাদেরকে নিয়ে যেতে বললেন। পুরোহিতজী আমাদেরকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। বোল্‌বোলা কুণ্ড হতে কিঞ্চিৎ দূরে যে পুষ্করিণী, সেই পুষ্করিণীর পাড়েই তাঁর ভদ্রাসন। বৈঠকখানায় তিনি আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। বললেন – এখন এখানে বিশ্রাম করুন, সন্ধ্যারতির পূর্বে আপনাদেরকে আমি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।' মায়ের সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন – যুক্তেশ্বরী মায়ের রহস্যময় আচরণ সম্বন্ধে কিছু ভাববেন না। আমরা বিশ বছর ধরে ওঁর নানা রহস্যময় কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত। আমার এক ভাই হাঁসোটে থাকে। সে গত বৎসর হাঁসোট হয়ে এখানে আসার পথে ওঁঙ্কলেশ্বর মন্দিরে প্রণাম করতে গিয়ে মন্দিরের মধ্যে বেলা সাতটার সময় যুক্তেশ্বরী মাকে দেখে আসেন। বেলা সাড়ে এগারটার সময় এখানে পৌঁছে কুণ্ডের ধারে ওঁকে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে যায়। তার বিস্ময়ের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, যখন সে আমাদের কাছে শুনল যে সকাল সাতটার সময় আমরা যুক্তেশ্বরী মাকে এখানে সশরীরে উপস্থিত থাকতে দেখেছি। আমার ভাই তার ভাবীজীকে অর্থাৎ আমার ধর্মপত্নীকে খুবই শ্রদ্ধা ও মান্য করে। তাঁর কাছে যখন শুনল যে, সেই বিশেষ দিনটিতে আমার পত্নী সামনের পুষ্করিণীতে স্নান করে সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ কুণ্ডের নিকটে নীলকণ্ঠ মহাদেবকে যখন প্রণাম করতে যান, তখনই তিনি কুণ্ডের ধারে যুক্তেশ্বরী মাকে সর্বপ্রথম ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকতে দেখেছিলেন। তার ভাবীজীর মুখে এই কথা শুনে আমার ভাই পাঁচ মিনিট কাল স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। মহাপুরুষদের কার্যকলাপ বুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।

পুরোহিতজী চলে যেতেই আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নির্বাক হয়ে বসে রইলাম। আমরা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, পুরোহিতজীর ডাকে আমরা উঠে বসলাম। রঞ্জন তাঁর ঘড়িতে দেখলেন বেলা সাড়ে চারটা বেজে গেছে। বেলা পড়ে এসেছে, শীতকালের বেলা, আর ঘণ্টা খানিকের মধ্যেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। পুরোহিতজী মন্দিরে চলে

গেলেন, আমরা তাড়াতাড়ি উঠে পুকুরে মুখ হাত ধুয়ে এসে মন্দিরে রওনা হলাম। মন্দিরে একে একে পল্লীবাসীরা আসছেন। প্রত্যেক মন্দিরের সামনে একটা করে ঘি-এর প্রদীপ জ্বলছে, কুণ্ডের সামনে একটা মোটা কাঠ পুতে তাতে একটা ডেলাইট জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত তীর্থ প্রাঙ্গণ আলোতে আলোময়। সন্ধ্যা হতেই আরতি সুরু হল, শিঙ্গা ডম্বরু বাজিয়ে নর্মদা মাতার বন্দনা গান এবং শিবস্তোত্র পাঠ করা হল। একটি মাত্র হ্যারিকেন জ্বেলে রেখে ডেলাইট নিভিয়ে ভক্তরা সবাই চলে গেলেন মন্দির থেকে। 'আমরা কিছুক্ষণ থাকব' বলাতে পুরোহিতজী বললেন – আপনারা নির্ভয়ে নিশ্চিত মনে বসে ধ্যান জপ করুন, যাওয়ার সময় হ্যারিকেনটা দয়া করে হাতে করে নিয়ে যাবেন। আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে কুণ্ডের ধারে বসেই সান্ধ্যক্রিয়াতে মন দিলাম। মনে আনন্দের স্রোত বইতে লাগল। কোথা দিয়ে সময় কেটে গেল, বুঝতে পারি নি। মা নর্মদা ও মহাদেবকে যখন প্রণাম করে উঠলাম, তখন কানে একতারার টুং টাং শব্দ শুনতে পেলাম, কিন্তু বাদককে চোখে দেখতে পেলাম না। আমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, এমন সময় রঞ্জন আমার সামনে এসে উপস্থিত হল। বলল – 'তপে জপে আমার মন নাই। তুমি জপে বসলা আর আমি কম্বল চাপাইয়া ঐ চালাঘরে যাইয়্যা টুং টাং করতে লাগলাম। আমি হাজার বার কইছি না, গানই মোর লাইগ্যা প্রাণ, গানই মোর জপ মন্ত্র। অনেক ভাইব্যা চিন্তা নন্দদাস বাউলরে গুরু বানাইলাম, সেও দেহি 'শিব শিব' কইর‍্যা দেহ ছাড়ল্যা। এখন কারে গুরু করুম ভাবতাছি।' এই বলেই কুণ্ডের সামনে নেচে নেচে একতারা নিয়ে গান সুরু করে দিলেন জাত-বাউল রঞ্জন লাহিড়ী –

> কোন্ পথে যে আসবা গুরু,
> ওরে তাতো আমার জানা নাই।
> তাই ভাইবা মরি, প্রণাম আমার
> রাইখা দিমু কোন্ বা ঠাঁই।

যাক্ আমার ভাগ্য ভাল যে এই চার আখর গান গেয়েই রঞ্জন বাউল ক্ষান্ত হল। হ্যারিকেনটি হাতে নিয়ে পুরোহিতজীর বৈঠকখানায় এসে প্রবেশ করলাম। রঞ্জনের ঘড়ি দেখে বুঝলাম, রাত তখন ১১টা বেজেছে। দরজা বন্ধ করে হ্যারিকেন নিভিয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। বোলবোলা কুণ্ডের এই রহস্যময় বুগ্‌বুগ্ ধ্বনি, 'নর্মদে হর' বললেই ঘন ঘন বুদ্‌বুদের উত্তাল হয়ে উত্থান-পতন – এই সবের কার্যকারণ তত্ত্ব চিন্তা করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখলাম, রঞ্জন যথারীতি একতারাটি বাজিয়ে গুণ্‌গুণ্ করে গান গাইছেন অর্থাৎ তিনি আমার আগেই জেগেছেন। আমার মনে পড়ল যুক্তেশ্বরী মার কথা। আমি শুয়ে শুয়েই ভাবছি আমি যে উত্তরতট পরিক্রমা করে এসেছি, কিংবা বাবার আদেশেই যে 'জলে-হরি' পরিক্রমার সংকল্প নিয়ে নর্মদার কূলে কূলে পরিক্রমা করছি এ কথা উনি জানলেন কি করে? রঞ্জন সুর ধরেছেন – কোন্ পথে যে আসবা গুরু, ওরে তাতো আমার জানা নাই .... তাঁর এই কথার জের টেনে বাইরে যুক্তেশ্বরী মায়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম – 'ওরে কোন্ পথে যে আসবা গুরু', তা তোর জানা না থাকলেও উহ্ মুঝে পাতা হৈ। তুমহারা গুরুভি ইস্ বখৎ ওঁঙ্কারেশ্বর ক্ষেত্রমেঁ গানা গাতা হৈ। যৈসে গুরু গানাওয়ালা, উন্‌কা চেলা ভি গানাওয়ালা। যোগ্য যোগ্যেন যুজ্যতে! তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে দুজনেই চমকে উঠলাম। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গিয়েই তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম। 'তুরন্ত শৌচাদি সমাপন করকে ইয়ে পোখরামেঁ নাহা লিজিয়ে। হম্ কুণ্ডকে কিনারামেঁ তুমহারা লিয়ে প্রতীক্ষা করতা হুঁ। হমলোগ আজ সহজোত মহল্লাকী তরফ যাত্রা করেঙ্গে। বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বোল্‌বোলা কুণ্ডের দিকে হেঁটে যেতে লাগলেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে গাঁঠরী ঝোলা গুছিয়ে রেখে স্নানাদি সেরে নিলাম।

পুরোহিতজীর কাছে বিদায় নিয়ে কুণ্ডের কাছে গিয়ে তাঁকে বসে থাকতে দেখলাম। তাঁর নির্দেশে কুণ্ডটিকে তিনবার প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম পথে। কি করে সবাই খবর পেয়েছেন জানি না, অনেক স্ত্রী-পুরুষ বালক বালিকাকে সঙ্গে নিয়ে যুক্ত করে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি হাসি মুখে বাচ্চাদের কারও গাল টিপে, কারও চিবুক ধরে নেড়ে দিয়ে 'শিবং ভূয়াৎ, শিবং ভূয়াৎ' বলতে বলতে এগিয়ে চললেন। যাঁদের সন্তানদেরকে তিনি এইভাবে স্পর্শ করলেন, তাদের মা বাবাকে দেখলাম আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতে। সবাই জয়ধ্বনি দিলেন জৈ (জয়) মুক্তেশ্বরী মাতাজীকে জৈ'!

ধীরে ধীরে মহল্লাটি অতিক্রম করে আমরা একটা পরিষ্কার রাস্তা পেলাম। রাস্তাটি পাথর বালি ও মাটি দিয়ে বাঁধানো। রাস্তার দুধারেই ভুট্টা ক্ষেত, কিছু দূরে দূরে বড় বড় গাছপালা দেখা যাচ্ছে। আরও দূরে পাহাড়ের চূড়া। চারদিক রৌদ্র ঝলমল করছে, কিন্তু ভুট্টা গাছের আগায় তখনও শিশির শুকায় নি, এখন সকাল আটটা বাজেনি। মুক্তেশ্বরী মা বলতে লাগলেন – এই সিধা রাস্তা ধরে পল্লী পথে প্রায় মাইল চারেক হেঁটে গেলেই আমরা সহজোত মহল্লা বা সাজোত গ্রামে পৌঁছে যাব। সেখানে সিদ্ধরুদ্রেশ্বর মহাদেব, সিদ্ধরুদ্রেশ্বর কুণ্ড এবং ভারতবিশ্রুত সিদ্ধকুল শিরোমণি ভগবান দত্তাত্রেয়জীর মন্দির আছে। স্বয়ং মহাদেবের সিদ্ধক্ষেত্র ঐ স্থান। সিদ্ধরুদ্রেশ্বর কুণ্ডকে সংক্ষেপে রুদ্রকুণ্ড বলা হয়। সিদ্ধরুদ্রেশ্বর স্বয়ম্ভু লিঙ্গ, খুবই জাগ্রত বিগ্রহ। কুণ্ডের মধ্যেই তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হওয়ায় স্বয়ং নর্মদাও সেখানে জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে সিদ্ধরুদ্রেশ্বরের অর্চনা করেছিলেন। যার বহু সাধনাতেও সিদ্ধিলাভ ঘটেনি, সে এখানে এসে সাধনা করলেই তার মন্ত্র চৈতন্য হয়, সূক্ষ্ম যোগ চক্রগুলির রুদ্ধ দুয়ার খুলে যায়, কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হয় এমনকি পরাকুণ্ডলীও উদ্বুদ্ধা হন। এইজন্যই পরিক্রমাবাসীরা এখানে সমুদ্র ও নর্মদা তট হতে দূরে হলেও এসে থাকেন, চাতুর্মাস্য ব্রত পালন ও উদ্‌যাপন করে থাকেন। এই তীর্থ সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী হচ্ছে – প্রাচীন যুগে কোন এক সময়ে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে কে বড় এই নিয়ে বিবাদ হয়। তখন উভয়ে মীমাংসার জন্য মহাদেবের নিকট উপস্থিত হন। মহাদেব তাঁর লিঙ্গের আদি ও অন্ত দেখে আসতে নির্দেশ দেন। বিষ্ণু বহুকাল পরে শিবলিঙ্গের অন্ত না পেয়ে ফিরে এসে অকপটে মহাদেবকে তাঁর ব্যর্থতার সংবাদ দেন। ব্রহ্মাও ঊর্ধ্বে ও নিম্নে বহুদূর পর্যন্ত গিয়ে অবধি পান না। কিন্তু তিনি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য 'অন্ত আমি দেখে এসেছি' বলে মিথ্যা ভাষণ দেন। শুধু তাই নয়, তাঁর সাক্ষ্য স্বরূপ কপিলা গাভী, চম্পক বৃক্ষাদিকে মহাদেবের নিকট উপস্থিত করেন। ব্রহ্মার এই মিথ্যা ভাষণে মহাদেব কুপিত হয়ে পঞ্চমুখী ব্রহ্মার এক মস্তক নখের দ্বারা ছিঁড়ে ফেললেন এবং মিথ্যা সাক্ষ্যদানের জন্য কপিলা গাভীকে তার মুখ সর্বদাই অপবিত্র থাকবে এবং চম্পক পুষ্প কদাপি শিবপূজায় লাগবে না বলে অভিশাপ দিলেন। পঞ্চানন ব্রহ্মা এই ঘটনার পর ত চতুরানন হলেন কিন্তু ব্রহ্মহত্যার পাপ মহাদেবকে স্পর্শ করার জন্য তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতে লাগলেন। ব্রহ্মহত্যার স্পর্শদোষ হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলেন কিন্তু কিছুতেই ব্রহ্মহত্যার সান্নিধ্য থেকে রেহাই পেলেন না। অবশেষে তিনি এখানে এসে ঘোর তপস্যা শুরু করেন। দেবতারা তখন এই কুণ্ড খনন করে তাতে সর্বতীর্থের জল ঢেলে দেন। মহাদেব তাতে স্নান করে ব্রহ্মহত্যার পাপ হতে মুক্ত হন। শুধু তাই নয়, ব্রহ্মার মস্তক ছিন্ন করার পর মহাদেবকী হাতমেঁ ব্রহ্মাজীকা যো কপাল চিপট গয়ে থে, ইহাঁ অস্নান করনে সে উহ্ কপাল গির গয়া, তভী সে ইহ্ তীর্থ পরম পাবন মানা জানে লগা।

এই পর্যন্ত বর্ণনা করে মা মিনিট খানিক চুপ থেকে পুনরায় হাঁটতে হাঁটতে বলতে থাকলেন – এই সব পৌরাণিক কাহিনীর কথা বাদ দিলেও সামনের সহজোত মহল্লা আমার

ব্যক্তিগত ভাবে নিজের এত প্রিয় স্থান এই কারণে যে, এখানে সাজোত্রা গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণদের বাস। তাঁদের মধ্যে অনেকেই সাগ্নিক এবং অগ্নিহোত্রী[১]। এখানকার অধিকাংশ ব্রাহ্মণই বেদাধ্যায়ী। সকাল সন্ধ্যায় এখানে বেদধ্বনি শোনা যায়। বিশিষ্ট পণ্ডিত মাত্রেরই গৃহে অগ্ন্যাধ্যানের[২] ব্যবস্থা আছে। অগ্নীধ্ বা অগ্নীধ্রের[৩] গৃহে যজ্ঞপাত্র, আজ্যস্থালী[৪], প্রোক্ষণী পাত্র বা প্রণীতা[৫] ও চমসা আছে।

এই সাজোত মহল্লাতে অন্ততঃ পাঁচটি চতুষ্পাঠী আছে, ঐ চতুষ্পাঠীগুলির দেশ জুড়ে নাম। গুজরাটের বিভিন্ন প্রান্ত হতে বেদ পাঠেচ্ছু বহু ছাত্র এখানে বেদপাঠের জন্য এসে থাকে। প্রাচীন পদ্ধতিতে এখানে পঠন পাঠন হয়ে থাকে। তুমি ত উত্তরতট পরিক্রমার সময় শুক্লতীর্থ দেখে এসেছ। সেখানে যেমন সায়ং সন্ধ্যায় ব্রহ্মচারী বালকরা নর্মদাতে স্নান ও স্নানের পর প্রত্যবর্তনের পথে বেদধ্বনি করে থাকে, এখানেও তেমনি সায়ং সন্ধ্যাকালে রুদ্রকুণ্ডে স্নান করে বেদপাঠী ছাত্ররা বেদধ্বনি করে থাকে। তা শুনলে তোমরা আশ্চর্য হয়ে যাবে। গানাওয়ালা হরবোলা বাবাজীর কথা ধরছি না, কিন্তু তুমি ত তোমার বাবার কাছে বেদাধ্যয়ন করেছ, কাজেই তুমি জান যে বেদ ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বেদমার্গানুসারীদের মধ্যে নানা মত আছে। এক পক্ষের এই মত যে, বেদের ব্যাখ্যার বা তার অর্থ গ্রহণের জন্য কোন চেষ্টা করারই প্রয়োজন নাই ; বেদ মন্ত্রই অলৌকিক দিব্য শক্তিসম্পন্ন ; মন্ত্র যথাযথ উচ্চারিত হলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

আমি দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চীতে ছিলাম, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী উভয় স্থানেই বাস করে এসেছি। সেখানে মন্ত্রোচ্চারণের বিশুদ্ধি অর্থাৎ যে মন্ত্রের যে বর্ণটি পর্যন্ত যে স্বর, যে সুর ও যে ছন্দে উচ্চারণ করার বিধান, যথাযথভাবে তা উচ্চারিত হলে কার্যসিদ্ধি হয়, এ বিশ্বাস কাঞ্চীতে প্রবল। এখনও সেখানে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দিয়ে বৈদিক 'কারীরী যজ্ঞ' অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। উচ্চারণের দোষে, বেদধ্বনি প্রস্ফুট করায় কোন ত্রুটি বা ছন্দোপতন হলে 'কারীরী যজ্ঞ' দু'একটি স্থলে ব্যর্থ হতে দেখেছি, কিন্তু উচ্চারণ যথাযথ হলে যজ্ঞের শেষেই আকাশে মেঘের সঞ্চার হয় এবং দু'চার ঘণ্টার মধ্যেই বৃষ্টি হতে আমি নিজের চোখেই দেখেছি।

এই সাজোত গ্রামেও মন্ত্রার্থ বুঝার চেয়েও বিশুদ্ধভাবে মন্ত্রোচ্চারণের প্রথাই প্রবল। কাঞ্চীর মত এখানেও মন্ত্রবোধের চেয়েও মন্ত্রোচ্চারণে বিশুদ্ধি রক্ষার দিকেই লক্ষ বেশী।

তাঁর এই কথা শুনে আমি বললাম — মা, এই কথাটা আমি ঠিক উপলব্ধি করতে পারছি না। আমার বাবা প্রায়ই একটি শ্লোক বলতেন —

মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ
লক্ষবারং জপেৎ যদি তস্য মন্ত্রং ন সিধ্যতি।

১। অগ্নিহোত্রী — সাগ্নিক ব্রাহ্মণের প্রতিদিনানুষ্ঠিত হোমকার্যকে অগ্নিহোত্র বলে। অগ্নিহোত্র মাস সাধ্য ও যাবজ্জীবন সাধ্য ভেদে দ্বিবিধ। প্রতিদিন হোমানুষ্ঠাতাকে অগ্নিহোত্রী বলা হয়।

২। অগ্ন্যাধ্যান — বেদমন্ত্রের দ্বারা শ্রুতিবিহিত অগ্নিস্থাপন এবং অগ্নিরক্ষা, অগ্নিরক্ষার স্থানকে অগ্ন্যাধ্যান বলা হয়।

৩। অগ্নীধ্ বা অগ্নিধ্র — অগ্নিরক্ষাকারী সাগ্নিক ব্রাহ্মণ।

৪। আজ্যস্থালী — হোমকালে ঘৃত রাখিবার পাত্র।

৫। প্রণীতা বা প্রোক্ষণী পাত্র — হোমকালে হস্ত প্রক্ষালনের জন্য জল রাখা হয়।

অর্থাৎ মন্ত্রের অর্থ এবং মন্ত্র চৈতন্যের কৌশল না জেনে কেউ যদি লক্ষ লক্ষ বারও জপ বা মন্ত্রের বর্ণাত্মকরূপ উচ্চারণ করে চলেন, তাতে সিদ্ধিলাভ ঘটে না। তাছাড়া এমনই সাধারণ বুদ্ধিতেও ত বুঝা যায় যে, মন্ত্রের অর্থ এবং তার প্রয়োগ কৌশল যথাযথভাবে না জানলে কিভাবে তা কার্যকরী হবে ? মন্ত্রের অর্থবোধ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন; অর্থবোধ ভিন্ন মন্ত্র উচ্চারণ বিড়ম্বনা মাত্র বলে মনে করি। সাধারণ বুদ্ধিতেও ত বুঝা যায়, মন্ত্রের অর্থবোধ না থাকলে, সেই মন্ত্রোচ্চারণেও ত স্বাভাবিক ভাবে দোষ আসতে বাধ্য ! গায়ত্রীর অর্থ বুঝে তবেই গায়ত্রী উচ্চারণ করা বিধেয়, শাস্ত্রের বহু স্থানে এ ধরণের ইঙ্গিত আছে আমি দেখেছি। ভগবান মনুও বলে গেছেন – 'বেদার্থ-জ্ঞান লাভ করে তবেই কর্মে প্রবৃত্ত হবে'।

তুমি ঠিক কথাই বলছ। তবে বাবা ! আমাদের দেশে একদল পণ্ডিত যেমন মন্ত্রার্থের উপর জোর দিয়ে থাকেন, তেমনি আর এক দল যেমন কাশী এবং সাজোতের পণ্ডিতবর্গ মন্ত্রোচ্চারণের উপরেই বেশী জোর দিয়ে থাকেন। সায়ণাচার্যের ভাষ্য খুঁটিয়ে পড়লে বুঝা যায়, মন্ত্রের অর্থোদ্ধারের পক্ষে যত না হোক, স্বর-প্রণালীর প্রতিই তিনি অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। উচ্চারণের যাতে কোন মতেই কোন ব্যত্যয় না ঘটে, সেদিকেই তাঁর বেশী লক্ষ্য ছিল। এখানে যেমন মতানৈক্য, তেমনি মতানৈক্য রয়েছে বেদের ব্যাখ্যা এবং প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ধারণা, বেদে কেবল কর্মকাণ্ডেরই কথা আছে, বেদে জ্ঞানকাণ্ডের বা ভক্তিকাণ্ডের প্রসঙ্গ থাকতেই পারে না কারণ বৈদিক যুগে আমরা নাকি আদিম অবস্থাতেই ছিলাম, সেই আদিম অবস্থায় নাকি ভক্তি জ্ঞানাদির স্ফূর্তি আদৌ হওয়া সম্ভব ছিল না ! পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের আর দোষ দিব কি, তারা ত আমাদেরকে অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতিকে হেয় করে দেখাতে পারলেই খুশী হন ! কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা, ঐ সব পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের উচ্ছিষ্ট ভোজী এদেশেরই একদল পণ্ডিত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বেদমন্ত্রে নানা মনগড়া অর্থ আরোপ করে বেদকে ছোট করতে তাঁদের সকল উৎসাহ নিয়োজিত করেছেন।

– মা, এ সম্বন্ধে তোমার মত কি, তা দয়া করে স্পষ্ট কথায় বল।

– (খিল খিল করে হাসতে হাসতে) আমার মতে, বেদে কর্ম জ্ঞান ভক্তি সকলই বীজ রূপে নিহিত আছে। বেদে এই তিনেরই বিকাশ। কর্মকাণ্ডের কর্ম রূপে, ভক্তিকাণ্ডের ভক্তিরূপে এবং জ্ঞানকাণ্ডের জ্ঞানরূপে সে বীজ অঙ্কুরিত, মুকুলিত ও পল্লবিত হয়ে পড়েছে। বেদে নাই – এমন বস্তু কোনও শাস্ত্রে কোথাও নাই। আমার মতে বেদই নিখিল শাস্ত্রের মূল। প্রতিটি বেদমন্ত্রের যৌগিক ও তাত্ত্বিক অর্থ আছে, তার গূঢ় গোপন বিশিষ্ট প্রয়োগ পদ্ধতিও আছে।

এই বলেই তিনি 'আঃ ! আঃ ! আহা ! বলে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন – বাতাসে কী সুন্দর পবিত্র সৌরভ ভেসে আসছে, তোমাদের নাকে কি ঢুকছে না ? নাক উঁচু করে, নাক এদিক ওদিকে আমার মত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখ, বাতাসে হোমের গন্ধ এবং বেদমন্ত্রের দিব্য সুরভি ভেসে আসছে। এখানে যে সব গৃহে অগ্ন্যাধ্যান আছে, প্রাতঃকালে সাগ্নিকরা সেখানে যে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া করেছেন, এই গন্ধ তারই ! বেদমন্ত্র যে চিন্ময় ! তাই এখানকার সমগ্র পরিমণ্ডলও এই মুহূর্তে এখনও চিন্ময় আছে। মন্ত্রের তড়িৎকণা অণু-পরমাণুতে মিশে গেছে ! আমরা সাজোত গ্রামে প্রবেশ করেছি। সামনে যে সব বাড়ীঘর দেখতে পাচ্ছ, এগুলি সবই ব্রাহ্মণদের। তোমাদেরকে বলতে ভুলে গেছি, আজ বোধ হয় ৮ই অগ্রহায়ণ বুধবার, কৃষ্ণা চর্তুদশী তিথি। এখানে প্রতিমাসেই সিদ্ধরুদ্রেশ্বর এবং রুদ্রকুণ্ডের সামনে প্রতি কৃষ্ণা চতুর্দশী এবং শুক্লা চতুদশী তিথিতে বেলা ১০টার সময় হোমের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আর একটু তাড়াতাড়ি হাঁট। রঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করলেন কয়টা বেজেছে ? রঞ্জন 'সাড়ে নটা' বলতেই তিনি এক রকম

দৌড়তে দৌড়তেই এগোতে লাগলেন। মিনিট দশেক পরেই আমরা পৌঁছে গেলাম সিদ্ধরুদ্রেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে। সামনেই বিশাল কুণ্ড, কিন্তু চারদিকে প্রায় শতাধিক নারীপুরুষ একটি কুণ্ড সংলগ্ন যজ্ঞ মণ্ডপকে ঘিরে রয়েছেন, কুণ্ডের কাছে যাওয়াই দুষ্কর হয়ে পড়ল। তাঁকে দেখতে পেয়েই সকলের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সকলেই সমবেত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে আনন্দে কোলাহল করে উঠলেন – যুক্তেশ্বরী মাতাজী আ গয়ি! জৈ যুক্তেশ্বরী মাতাজীকে জৈ! মা বললেন – নেহিজী! নেহিজী! বলো – জয় সিদ্ধরুদ্রেশ্বর মহাদেও কো জয়! মাকে স্বাগত জানাতে যজ্ঞস্থলে সমবেত মাতৃবৃন্দ শঙ্খ ও উলুধ্বনি করতে লাগলেন এবং যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করার জন্য সকলে ভক্তি সহকারে সরে সরে দাঁড়ালেন। আমরা সিদ্ধরুদ্রেশ্বর মন্দিরের একধারে আমাদের গাঁঠরী ঝোলা রেখে যজ্ঞমণ্ডপ থেকে একটু দূরে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে রইলাম। সিদ্ধরুদ্রেশ্বর ও যজ্ঞকুণ্ডের মাঝখানে রুদ্রকুণ্ডের কাক্ চক্ষু জল টল্‌টল করছে। সমগ্র যজ্ঞ মণ্ডপ ফুলে সুসজ্জিত। ৫ জন ব্রাহ্মণ তাঁদের সামনে এক একটি ছোট ছোট ঘট স্থাপন করে বেদপাঠ করে চলেছেন। ধূপ ধূনার গন্ধে, পুষ্পমালার আভরণে, বেদধ্বনির গুঞ্জনে সমগ্র পরিবেশই অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হয়েছে। যজ্ঞকুণ্ডে হোমের জন্য থরে থরে কাঠও সজ্জিত করা হয়েছে। সাতটি ঘৃত প্রদীপও জ্বালা হয়েছে। যজ্ঞকুণ্ডটিকে ঘিরে একটি সুন্দর ও সুচিত্রিত সর্বতোভদ্রমণ্ডল ও কাশ্মীরী শৈবাগমের অন্তর্গত সারদাতন্ত্রের নিয়মানুসারে অঙ্কিত করা হয়েছে। পূর্ব পশ্চিমে ও উত্তর-দক্ষিণে দুটি দুটি রেখা দ্বারা একটি বড় চতরস্র বা চতুষ্কোণ এঁকে তার মধ্যে কতকগুলি পদ্ম এবং মৎস্য পুচ্ছাকৃতি রেখা, প্রতিটি পদ্মের কর্ণিকা ও কেশর পঞ্চবর্ণের গুঁড়ি দিয়ে রঞ্জিত করা হয়েছে। পঞ্চবর্ণের গুঁড়ি অর্থাৎ হরিদ্রাচূর্ণ (পীতবর্ণ), তণ্ডুলচূর্ণ (শুক্লবর্ণ), কুসুম্ভচূর্ণ (রক্তবর্ণ), শস্যহীন ধান পুড়িয়ে সেই কৃষ্ণবর্ণ গুঁড়ি এবং শ্যামবর্ণের বিল্বপত্র চূর্ণ দিয়ে মণ্ডিত রেখাচিত্রটির কী অপূর্ব শোভা!

যুক্তেশ্বরী মা যজ্ঞ মণ্ডপের সন্নিহিত হতেই তাড়াতাড়ি একটি চৌকী পেতে তার উপর একখণ্ড কৃষ্ণসার মৃগচর্ম বিছিয়ে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর হাত ধরে বসালেন এবং তাঁকে জানালেন যে, 'বাচস্পতিজী ক্ষুদ্ গিয়া অগ্ন্যাধ্যান সে অগ্নিচয়ণকো লিয়ে, আভি যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত কিয়া জাবেগা।' মিনিট তিনেক পরেই মহাদেব মন্দিরের পিছন দিকের পল্লী হতে শঙ্খধ্বনি উঠল। শঙ্খধ্বনি এগিয়ে আসছে। একটু পরেই দেখা গেল, একটি মাটির সরাতে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা হাতে নিয়ে সিদ্ধরুদ্রেশ্বরের প্রধান পুরোহিত বাচস্পতিজী এগিয়ে আসছেন, তাঁর সামনে আর একজন ব্রাহ্মণ যুবক রাস্তার উপর জল ঝারি দিতে দিতে আসছেন। তিনিই এসেই মাতাজীকে হেসে অভিবাদন করে অগ্নিশিখার সরাটি সামনে রেখে আচমনাদি করে যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নিস্থাপন করার উদ্যোগ করতেই সহসা যুক্তেশ্বরী মা উঠে দাঁড়িয়ে, '–মৈবম্, মৈবম্-মা এবং মা এতৎ পদ্ধতি না অর্থাৎ এই রকম নয়, এইভাবে নয়, এই পদ্ধতিতে নয়, বলেই যজ্ঞকুণ্ডের চারদিকে নাচের ভঙ্গীতে বিনম্রভাবে নমস্কারের ভঙ্গীতে মাথা দোলাতে দোলাতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র পুত্র মধুচ্ছন্দা দৃষ্ট ঋগ্বেদের আগ্নেয় সূক্তের অন্তর্গত প্রথম মণ্ডলের প্রথম মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে করতে যজ্ঞকাষ্ঠের উপর এক কষায় ঘৃত সিঞ্চন করতে থাকলেন, তাঁর কণ্ঠে গায়ত্রী ছন্দে মন্ত্র উদ্গীত হতে থাকল –

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।
হোতারং রত্নধাতমং ॥

ওঁ অগ্নিং ঈলে। ওঁ অগ্নিং পুরঃহিতং ঈলে। ওঁ হোতারং ঈলে। ওঁ ঋত্বিজং ঈলে। ওঁ রত্নঃধাতমং দেবং ঈলে। ওঁ যজ্ঞস্য পুরোহিতং হোতারং ঋত্বিজং রত্নধাতমং দেবং অগ্নিং ঈলে ॥

এইভাবে মন্ত্রের প্রতিটি শব্দ ভেঙ্গে ভেঙ্গে গমকে গমকে তালে তালে পরিপূর্ণ গায়ত্রী ছন্দে উচ্চারণ করে পুরোহিতের জন্য নির্দিষ্ট আসনে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে সূর্যের দিকে তাকিয়ে সুদীর্ঘ বিলম্বিত শ্বাস টানলেন প্রায় দেড় মিনিট কাল ধরে তারপর একই বিলম্বিত তালে নিঃশ্বাস ফেললেন ঘৃত সিক্ত যজ্ঞ কাষ্ঠের উপর। নিঃশেষিত ভাবে শ্বাস ফেলেই তিনি পুনরায় সূর্যের প্রতি দৃষ্টিস্থাপন করে ঋগ্বেদেরই ১ম মণ্ডলান্তর্গত চতুর্দশ সূক্তের কণ্বপুত্র মেধাতিথি দৃষ্ট নবম ঋক্‌মন্ত্রটি একই গায়ত্রী ছন্দে নিখুঁত স্বরব্যঞ্জনায় গেয়ে উঠলেন –

ওঁ আকীং সূর্যস্য রোচনাদ্বিশ্বান, দেবাঁ উষর্বুধঃ
বিপ্রো হোতেহ বক্ষতি ॥ ওঁ ॥

তাঁর মন্ত্রোচ্চারণও শেষ হল আর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে যজ্ঞকুণ্ডে দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল। আক্ষরিক অর্থেই চক্ষু বিস্ফারিত করে স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম স্বয়ং প্রকটিত অগ্নিশিখার নর্তনলীলা! যজ্ঞকুণ্ডস্থিত প্রত্যেকটি কাঠ দেখতে দেখতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। বিনা অগ্নিতে কেবল মন্ত্র শক্তিতে এইভাবে অগ্নি দেবতার আবির্ভাব দৃশ্য জীবনে এই প্রথম দেখলাম, দেখলাম এই ঘোর কলিকাল নামে নিন্দিত যুগে, প্রত্যক্ষ দিবালোকে! নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি যজ্ঞাগ্নির দিকে। আমার মনের অবস্থা তখন বিস্মিত, হতচকিত, অবাক, স্তব্ধীভূত, স্তম্ভিত বা হতবাক প্রভৃতি যতগুলি আক্ষরিক বর্ণাত্মক শব্দ আমার জানা আছে, তার কোনটি দিয়েই আমার তৎকালীন অবস্থা বর্ণনা করা যাবে না। একি তপঃশক্তি? যোগবল? না বিশুদ্ধ ছন্দ ও সুর-স্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণের মহিমা? যাই হোক, বেদমন্ত্র যে চিন্ময়, মন্ত্রের মধ্যে নিহিত বা অনুস্যূত যে তড়িৎকণার বিস্ফুরণ উচ্চারণের বিশুদ্ধিতে যে ঘটে থাকে নিজের চোখে তা প্রত্যক্ষ করে বেদমন্ত্রে আজ আমার ধ্রুব আস্থা বা নিষ্ঠা জন্মাল। আনন্দে তখন বিহ্বল হয়ে পড়েছি, রঞ্জনই আমার গায়ে সতর্কতা সূচক কিঞ্চিৎ টোকা দিয়ে দেখালেন যে যুক্তেশ্বরী মা পুরোহিতকে তাঁর আসনে বসে যজ্ঞকুণ্ডে ঘৃতাহুতি দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে আমাদের কাছেই আসছেন। আমাদের সামনে এসে বললেন – এখন চল সিদ্ধরুদ্রেশ্বরকে প্রণাম ও পূজা করে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত থাকা কালেই রুদ্রকুণ্ডের জলে পিতৃপুরুষদের তর্পণ শেষ করবে। তাঁর পিছনে ভাব বিহ্বলা কিছু ভক্তিমতী স্ত্রীলোক আসবার উপক্রম করছিলেন, তিনি হাত তুলে তাঁদেরকে নিরস্ত করলেন। মা মন্দিরের মধ্যে ঢুকে এক কোণে চুপ করে বসে রইলেন, রঞ্জন সিদ্ধরুদ্রেশ্বরকে প্রণাম করে তর্পণের খাতা হাতে রুদ্রকুণ্ডের ধারে গিয়ে বসলেন তর্পণ করতে। আমি মহাদেবকে প্রণাম করে পূজা করার উদ্যোগ করছি যুক্তেশ্বরী মা স্বগতভাবে বলে উঠলেন – যত্র চৈব স্বয়ং ব্যক্তং লিঙ্গমস্তু স্বয়ম্ভুতৎ। ধমণী যস্য সংস্পর্শাৎ দহতি ক্ষিপ্রমেব তু ॥ অর্থাৎ স্বয়ং যিনি আবির্ভূত হন এবং যাঁতে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবার মত তাপ লাগে, তিনি হলেন স্বয়ম্ভু লিঙ্গ। এই কয়টা কথা বলে তিনি চোখ বন্ধ করলেন। মন্দিরের মধ্যে কস্তুরীর উগ্র গন্ধ, বড়ই মনোমুগ্ধকর, এই গন্ধ স্বয়ং এই বিগ্রহের, না, যুক্তেশ্বরী মায়েরই স্বাভাবিক গাত্র সৌরভ তা বুঝে উঠতে পারলাম না। আমি সিদ্ধরুদ্রেশ্বরের পূজায় মন দিলাম। পূজা সেরে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করে দেখলাম, মায়ের তখন ধ্যান নিমীলিত দৃষ্টি। আমি ধীরে ধীরে মন্দির হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কুণ্ডের তটে এলাম তর্পণ করতে।

যজ্ঞ-মণ্ডপের দিকে তাকিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য! প্রথম যখন আসি তখন লোক ছিল শতাধিক। এখন দেখছি সহস্রাধিক। কিন্তু সবাই ভক্তিভরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছেন। বাচস্পতিজীর কণ্ঠে উচ্চারিত মন্ত্রে ধ্বনিত হচ্ছে –

ওম বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব ॥ যজুঃ। অঃ ৩০/৩)

ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ওঁ সূর্যায় স্বাহা। ওঁ সিদ্ধরুদ্রেশ্বরায় স্বাহা ॥

আমি পিতৃপুরুষদের তর্পণ যখন শেষ করলাম, তখন পুরোহিতজীর আহ্বানে সমবেত ভাবে সকলে 'ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা' মন্ত্রে আহুতি দিতে আরম্ভ করেছেন। অন্তে পূর্ণাহুতি দেওয়াও শেষ হল।

আহুতির পরেই দলে দলে যজ্ঞ মণ্ডপ হতে ভক্তবৃন্দরা আসতে লাগলেন যুক্তেশ্বরী মাতাজীকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য। সর্বপ্রথম এসে তাঁকে প্রণাম করলেন – বাচস্পতিজী। তাঁকে মা স্বস্তিবাচন করতে গিয়ে বললেন – শতং জীবতু। আপনার চতুষ্পাঠীতে যে সব ছাত্র বেদভ্যাস করে আমি লক্ষ্য করেছি, তারা আপনার শিক্ষা নৈপুণ্যে বিশুদ্ধ স্বর বিন্যাসে বেদ মন্ত্রোচ্চারণে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে থাকে। বেদমন্ত্র শুদ্ধ ও সঠিক ভাবে উচ্চারিত না হলে সিদ্ধিলাভ সুদূর পরাহত। বাচস্পতিজী বিনয়ের সঙ্গে গদগদ হয়ে বললেন – আজ আপনি আগ্নেয় সূক্তের নবম ঋক্‌টি উচ্চারণ করে বেদমন্ত্রের মহিমা ও চিন্ময়ত্ব দেখালেন, সারাজীবন বেদাধ্যয়ন ও বেদচর্চায় নিরত থেকেও এ জিনিষ কখনও দেখিনি। মা নর্মদা বেদময়ী। কিন্তু দুঃখের কথা, প্রতি বৎসর শত শত পরিক্রমাবাসী এখানে পরিক্রমার পথে এসে থাকেন, আমরা সাজ্ঞোতবাসীরা চিরকালই পরিক্রমাবাসীদেরকে শ্রদ্ধাভক্তি করি, সাধ্যমত তাঁদের সেবা করি, চাতুর্মাস্য কালে তাঁদের ব্রত উদ্‌যাপনেও সাহায্য করি, কিন্তু তাঁদের মধ্যে দুচারজন ছাড়া কাউকে বেদাধ্যায়ী দেখি না। সিদ্ধ মাহাত্মা নামে নর্মদা তটবাসী যে সব সাধুর প্রসিদ্ধি আছে তাঁদের মধ্যেও বেদজ্ঞের বড়ই অভাব ঘটেছে। আজ আপনার দ্বারা যেভাবে বেদমন্ত্রের মহিমা বাস্তবে রূপায়িত হতে দেখলাম, তা আমাদের সাজ্ঞোতবাসী ব্রাহ্মণদের স্মৃতিতে চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে। মা, প্রতিবৎসর অন্ততঃ একটি বারের জন্য আপনার পদার্পণের প্রার্থনা আমরা জানিয়ে রাখলাম। তিনি উঠে পড়তেই যুক্তেশ্বরী মা মন্দির দ্বারে দাঁড়িয়ে সকলেরই উদ্দেশ্যে 'শিবমস্তু শিবমস্তু' জানাতে থাকলেন। বেলা দু'টা নাগাদ মন্দির প্রাঙ্গণ হতে সবাই চলে যেতেই দেখলাম, পবিত্র পট্টবস্ত্রে ঢেকে বাচস্পতিজী এবং তাঁর ধর্মপত্নী আমাদের দুজনের জন্য ভিক্ষা নিয়ে উপস্থিত হলেন। মায়ের ইঙ্গিতে আমরা রুদ্রকুণ্ডের উত্তরদিকে একটি মণ্ডপ গৃহে গেলাম। এই মণ্ডপটি দেখে আমার উত্তরতটের ডিণ্ডিমেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের মণ্ডপ গৃহের কথা মনে পড়ল। রুটি এবং পরমান্ন আমাদেরকে যত্ন করে খাইয়ে ব্রাহ্মণ দম্পতি ফিরে গেলেন নিজেদের গৃহে।

আমরা উঁকি মেরে যুক্তেশ্বরী মাকে কোথাও দেখতে পেলাম না। শিব মন্দিরের দরজা খোলা দেখে বুঝলাম তিনি সেখানেই আছেন। আমরা দুজনে নিজেদের গাঁঠরী ঝোলা এনে মণ্ডপ গৃহেই আসন পাতলাম। শোওয়া মাত্রই রঞ্জনের ঘুম এসে গেল। আমার চোখে ঘুম এল না, আজ যে মন্ত্রোচ্চারণেই যজ্ঞকুণ্ডে আগুন জ্বলে উঠতে দেখলাম, আজব বলে মনে হলেও সেই বিস্ময়কর প্রত্যক্ষ ঘটনার কথাই শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছি, এমন সময়ে যুক্তেশ্বরী মা যেখানে এসে উপস্থিত হলেন। আমি ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ালাম, তিনি সেই মণ্ডপ গৃহের পাথরের ঠাণ্ডা মেঝেতে বসবার উপক্রম করতেই আমি তাড়াতাড়ি আমার জপের আসনটি পেতে দিলাম। তিনি বললেন – 'নিজের জপের আসন কাউকে স্পর্শ করতে দিতে নাই।' আমি বললাম তা হোক, আপনি এতেই বসুন, আপনার পাদস্পর্শে আমার জপের আসন শক্তিপূত হয়ে উঠবে! আমার কথা শুনে তিনি খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে শুভ্র দন্ত পংক্তি মুক্তোর মত ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। এঁর কত বয়স অনুমান করতে পারছি না, এখনও তার দাঁত অক্ষত রয়েছে!' এ কথা আমার মনে উদয়

হওয়া মাত্রই তিনি হাসিমুখেই আমাকে প্রশ্ন করলেন – কায়কল্পধারী কোন মহাপুরুষকে জীবনে কখনও দেখেছ কি ? কায়কল্প সম্বন্ধে কিছু শুনেছ কি ?

– পরিক্রমা করতে করতে আমি গত বৎসর ধাবড়ী কুণ্ডে চাতুর্মাস্য করেছিলাম। সেখানে মহাত্মা একলিঙ্গস্বামীর আশ্রমেই ছিলাম, তাঁর একাধিক শিষ্যের মুখে শুনেছিলাম যে তিনি কায়কল্প করে তিন চারশ বৎসর ধরে নিজের শরীরকে যৌবন দীপ্ত রেখেছেন। কিভাবে যে কায়কল্প করে দেহকে জরামুক্ত রাখা যায় সে সম্বন্ধে আমার জানা নাই।

– হ্যাঁ, হ্যাঁ, একলিঙ্গস্বামীকে আমি চিনি। যোগীরা নানারকম জটিল ও রহস্যময় পদ্ধতিতে নানা কঠোর নিয়ম পালন করে যৌগিক পদ্ধতিতে কায়কল্প করে থাকেন। তবে সেই সব যৌগিক পদ্ধতির সাহায্য ছাড়াও বৈদিক 'সুপ্রতহ্বম্' নামক এক ক্রিয়া আছে। দীর্ঘকাল ধরে বিশেষ বিশেষ বৈদিক মন্ত্রের মনন এবং স্বাধ্যায়েও বৃক্ষ হতে প্রাচীন পত্র ঝরে যাওয়ার পর নবীন পত্রোদ্গমের মত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই শরীর জরামুক্ত হয় এবং মৃত্যু সেই বেদবিৎ যোগীর ইচ্ছাধীন হয়।

এই বলেই তিনি ঐ প্রসঙ্গ তাড়াতাড়ি চাপা দিবার জন্য বলে উঠলেন – তুমি পরিক্রমাবাসী। পরিক্রমাবাসীকে সব বিষয়ে মা নর্মদার উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করে চলতে হয়। তাঁর যখন যা ইচ্ছা হবে, তিনি তাই করাবেন, তাই জানাবেন, তাঁর ইচ্ছাকেই জীবনে বরণ করে চলা এবং তাতেই সন্তুষ্ট থাকাই পরিক্রমাকারীর একমাত্র ধর্ম। কাজেই তুমি ঐ বিষয়ে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না। অন্য কোন প্রশ্ন থাকলে স্বচ্ছন্দে তা জিজ্ঞাসা করতে পার।

তাঁর আশ্বাস পেয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলাম – আজ এখানকার যজ্ঞস্থলীতে যে বেদমন্ত্রটি উচ্চারণ করতেই বিনা অগ্নি সংযোগেই স্বতঃই অগ্নিদেব প্রকটীভূত হলেন, সেই মন্ত্রটির মোটামুটি শব্দার্থ আমি জানি। আজ তোমার দ্বারা যে অবিস্মরণীয় ঘটনার বাস্তবরূপ প্রত্যক্ষ করলাম, তা আমার স্মৃতিপটে অক্ষয় হয়ে থাকবে। মন্ত্রের স্থূল শব্দার্থ জানতে চাচ্ছি না, আমি জানতে চাচ্ছি, ঐ মন্ত্রের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাটি কি ? তুমি দয়া করে আমাকে জানালে কৃতার্থ হব।

এক মিনিট চুপ করে থেকে যুক্তেশ্বরী মা বলতে লাগলেন – দেখ বাবা, বেদ এমনই এক অলৌকিক বস্তু যে, যিনি যে দৃষ্টিতে দর্শন করবেন, বেদমন্ত্র তাঁর কাছে সেইভাবেই প্রতিভাত হবে। বেদমন্ত্রের মধ্যে আস্তিক এক অর্থ খুঁজে পাবেন, নাস্তিক অন্য এক অর্থ পাবেন। বর্ণাশ্রম ধর্মাবলম্বী বেদমন্ত্রের মধ্যে যে সামগ্রী দেখবেন, তদিতর ধর্মাবলম্বী তার মধ্যে বিপরীত সামগ্রী দর্শন করবেন। বেদের এইটাই বিশেষত্ব। তাই বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে চিরকাল ধরে বিতণ্ডা চলে আসছে। তবে একটি বিষয়ে দৃঢ় লক্ষ্য রেখে বেদমার্গে অগ্রসর হতে পারলে মন্ত্রের সত্যার্থ ধরতে পারা যায়। সেই লক্ষ্যটি হল – পূর্বাপর অর্থের সামঞ্জস্য বজায় রেখে অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা। বেদমন্ত্র এমনই একটি সুরে গ্রথিত আছে যে, বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় বেদের কোথাও সেই সুরের ব্যত্যয় ঘটে নি। পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করে অর্থানুধাবনের সাধনা করলেই মন্ত্রের সেই সুর এবং সেই তন্ত্রীটি স্বচ্ছভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠে। নচেৎ সায়ণাচার্যের মত একই শব্দের এই মন্ত্রে এক অর্থ, অন্য মন্ত্রে সেই একই শব্দের অন্য অর্থ ধরলে অর্থ বিপর্যয় ঘটতে বাধ্য। বেদ মন্ত্রোচ্চারণের সুর ছন্দ স্বর ব্যঞ্জনার প্রকাশটি যেমন বিশুদ্ধ হওয়া চাই তেমনি তার অর্থবোধটিও নিখুঁত হওয়া চাই। তাহলেই পরম পদার্থের সন্ধান পাওয়া এবং মন্ত্রকে জীবন্ত করে তোলা সম্ভব হয়। এই জন্যই অধিকারী অনুসারে, সাধনার তারতম্য ক্রমে বেদের অর্থও যেমন বিভিন্নরূপ হয়, মন্ত্রকেও অনেক সময় নির্জীব, কেবল শব্দ সমষ্টি বলে মনে হয়। এইজন্যই অনধিকারীর পক্ষে বেদ আলোচনা নিষিদ্ধ আছে। পাছে ভ্রান্ত মতের অনুসরণে মানুষ

বিপর্যস্ত হয়, তাই এই নিষেধ আদেশ। নচেৎ, বেদ পরম সাম্যভাবে পরিপূর্ণ; বেদ সকলেরই অক্ষয় জ্ঞান ও মোক্ষলাভের ভাণ্ডার।

সে যাই হোক, তুমি আজ যজ্ঞস্থলীতে উচ্চারিত মন্ত্রের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাটি জানতে চেয়েছ, এখন সেই প্রসঙ্গের আলোচনা করা যাক্। মনে রাখবে, তুমি শব্দার্থ জানতে চাও নি, তুমি জানতে চেয়েছ ঐ বিশেষ মন্ত্রটির অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা! মন্ত্রটির অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা রয়েছে আলোচ্য মন্ত্রের 'সূর্যস্য রোচনাৎ' শব্দটিতে। সূর্যস্য রোচনাৎ অর্থাৎ সূর্যমণ্ডলাৎ, সূর্যমণ্ডলান্তর্গতরশ্মিবৎ সর্বব্যাপকত্বাৎ! অভীষ্ট দেবতাকে যে আবাহন করব, আগে তিনি কোথায় আছেন, কিভাবে আসবেন বা প্রকট হবেন, কতদূর হতে কোন আশমান্ হতে আসবেন, আদৌ তিনি আসবেন কিনা তাতো আগে জানা চাই? বেদমাতাই তার সঙ্কেত দিয়েছেন তাঁর মন্ত্রের মধ্যেই সূর্যস্য রোচনাৎ বাক্যে, দেবগণ কোথায় কিভাবে বিদ্যমান আছেন তার আভাস দিয়েছেন। সূর্যরশ্মি যেমন পৃথিবীর সর্বত্র দৃশ্যাদৃশ্যভাবে ওতঃপ্রোত সঞ্চারিত রয়েছে, মন্ত্র এখানে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ দেবগণও সেইরকম শুদ্ধসত্ত্বভাবের মধ্যে অনুপরমাণুক্রমে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। যেখানেই শুদ্ধসত্ত্ব ভাবের সঞ্চার হবে, সেখানেই তাঁদের বিদ্যমানতা উপলব্ধি করতে পারা যাবে। কেমন জীবন্ত আশ্বাস আর জ্বলন্ত প্রত্যয়ের কথা দেখ, মন্ত্র বলে দিচ্ছে – রশ্মির মধ্যেই দেবতারা আছেন, জ্যোতির মধ্যেই তাঁরা আছেন, জ্ঞানের মধ্যেই তাঁরা আছেন।

ঋকে তাই অগ্নিদেবের নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে – হে দেব! আপনি মেধাবী, আপনি প্রজ্ঞা সম্পন্ন, আমাদের অবস্থা ও যোগ্যতা ত আপনার অবিদিত নাই, আমাদের অন্তরের ভাবও আপনি সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত আছেন। অতএব যেরকম ভাবে আমাদেরকে কর্মে প্রবৃত্ত করালে আমাদের অভিষ্ট সিদ্ধ হয়, আপনার আগমন সম্ভব হয়, আমাদের শ্রেয়ঃ সাধিত হয় আপনি সেই মতই ব্যবস্থা করুন। আপনি নিজেই যজ্ঞ সম্পাদক, আমাদের যজ্ঞ নিজেই সুসম্পন্ন করে দিন। আমাদের হৃদয় অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন বটে কিন্তু আপনি যে উষর্বুধঃ অর্থাৎ উষার উদয়ে যেমন অন্ধকার দূর হয় তেমনি আপনিও ত আমাদের চিত্তপটে উষাবৎ উদিত হয়ে অজ্ঞানান্ধকার দূর করে দিতে পারেন। তাই প্রার্থনা করি, যে রকম দেবভাবে আমাদের হৃদয় পূর্ণ হলে আপনার প্রকট হওয়া সম্ভব হয়, এই পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আপনি আমাদের মধ্যে সেইভাবে দেবভাবের সঞ্চার করুন। আপনি এবং অন্যান্য সকল দেবতাই যখন 'সর্বব্যাপকত্বাৎ' সর্বত্র পরিব্যাপ্ত সূর্যরশ্মির মত সর্বত্র বিশ্বের অণুপরমাণুতে বিচরণ করছেন, তখন আমরা কেন আপনার সান্নিধ্য হতে বঞ্চিত থাকি? আপনি একটু কৃপা করলেই, একটু জ্ঞানের সঞ্চার করে দিলেই ত আপনাকে তথা সমস্ত দেবতাকেই ত প্রত্যক্ষ করতে পারি। যেহেতু 'উষর্বুধঃ', উষার মত উদ্বোধক এবং প্রবুদ্ধকারী আপনি, আপনি দয়া করে জ্ঞানদৃষ্টি দান করুন, আমাদের নিকট প্রত্যক্ষীভূত হউন।

প্রভু ওঁঙ্কলেশ্বরের দয়ায় বেদমন্ত্রের চিন্ময়ত্বে এবং সূর্যরশ্মিবৎ সর্বত্র দেবতাদের বিদ্যমানতায় আমার জ্বলন্ত ধ্রুব নিষ্ঠা গড়ে উঠেছে বলে আমি নিজের প্রাণরশ্মির সাহায্যে সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী মূল রশ্মিকে আকর্ষণ করতেই মূলতঃ এই বেদমন্ত্রের প্রভাবেই অগ্নিদেব প্রকট হয়ে গেলেন, যজ্ঞকুণ্ডে তাঁর আবির্ভাব ঘটে গেল। এতে আমার কোন বাহাদুরী নাই। এর মূলে রয়েছে বেদমন্ত্রের চিন্ময়ত্ব।

আমি কোন বৈষ্ণবীয় দৈন্য প্রকাশ করছি না, যা প্রকৃত ঘটনা, তাই তোমাকে বলছি। এ কথাটি ত তুমি বুঝ যে, দেবতারা তোমার আমার মত দেহধারী নন – অশরীরী, শুদ্ধসত্ত্বরূপে তাঁরা বিশ্বের সর্বত্র ওতঃপ্রোতভাবে বিদ্যমান আছেন। তেজরূপে, বায়ুরূপে, অপ-রূপে, সত্যরূপে সৎস্বরূপে তাঁদের অস্তিত্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে নিয়ত বর্তমান। তোমার প্রাণ যে ভাবে তাঁকে পেতে চাইবে, সেই ভাবের সূক্ষ্মসত্ত্ব চিৎকণারূপে, পরমাণু রূপে এসে

তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন। একটি স্থূল উদাহরণ দিচ্ছি। একটি গাছ লাগাতে বা ফুল ফুটাতে চাইলে, সেই গাছ বা তার ফলের বীজটিকে তুমি যখন মৃত্তিকার অভ্যন্তরে রোপণ কর তখন তাকে মুকুলিত মুঞ্জরিত ও পল্লবিত করার জন্য কে তাকে এসে সহায়তা করে? ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্র তখন আর তোমার আহ্বানের অপেক্ষা রাখে না ; তারা আপনা হতেই এসে তখন বীজটিকে পুষ্টি ও নবজীবন দান করে থাকে ; কেউ স্থূল চোখে দেখতে পায় না, কারো দেখবারও অপেক্ষায় থাকে না, এমনই ভাবে তার পুষ্টি বৃদ্ধি ইত্যাদি সব কাজই নিষ্পন্ন হয়ে যায়। বৈদিক যজ্ঞাদি কর্মের সঙ্গে দেবগণের সম্বন্ধ সম্পর্কেও এই রকম একই ভাব বুঝে নিতে হয়। তোমার বীজ বপন রূপ কর্ম আরম্ভ হলে অর্থাৎ তোমার দেহ মন প্রাণ এক হলে ও তপস্যামুখী হলেই, তখন একে একে সমস্ত দেবতা তাঁদের সূক্ষ্মসত্ত্ব ভাব-বিভূতি, তোমার সকল রকম সদ্বৃত্তি-সদ্ভাবের মধ্য দিয়ে তোমার নিকট প্রকট হয়ে পড়বেন। দেবতার অধিষ্ঠান, দেবতার আবির্ভাব, দেবতার আগমন একেই বলা হয়। হৃদয়ে দেবভাবের বিকাশই – সেই দেবাধিষ্ঠান। মন্ত্রশক্তি ও তপঃশক্তি এ বিষয়কে ত্বরান্বিত করে মাত্র।

মায়ের কথা শেষ হতে না হতেই মন্দিরে ঢং ঢং করে শব্দ হল। মা বললেন – সিদ্ধরুদ্রেশ্বরের আরতি হবে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বোধহয় বাচস্পতিজী মন্দিরে পৌঁছে গেছেন, চল আরতি দেখি গে। বলেই তিনি মন্দিরের দিকে যেতে লাগলেন। আমি রঞ্জনকে জাগাবার জন্য ডাকতে লাগলাম – 'উঠে পড়ুন, কি ঘুম বাবা! সেই দুপুর থেকে ঘুমাচ্ছেন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে।' কিন্তু আমার ডাক তাঁর কানে পৌছালো বলে মনে হল না, তিনি পাশ ফিরে অন্ধকারের মধ্যেই অকাতরে ঘুমাতে লাগলেন। আমি দু'তিনবার তাঁকে ধাক্কাও দিলাম, কিন্তু তাঁর জাগবার কোন লক্ষণ দেখলাম না। অগত্যা একাই আমি মন্দিরে গিয়ে দাঁড়ালাম। আরতি শুরু হয়ে গেছে। মা একেবারে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে চুপ করে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। প্রায় বিশ পঁচিশ জন শিখাসূত্রধারী ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কেউ শিঙ্গা, কেউ ডম্বরু, কেউ বা ঢোলক ইত্যাদি বাজাচ্ছেন। বাচস্পতিজী অপূর্ব সুললিত কণ্ঠে পঞ্চপ্রদীপের শিখা সুবিন্যস্তভাবে ঘুরাতে ঘুরাতে গেয়ে চলেছেন –

ত্বমর্কস্ত্বং সোমস্ত্বমসি পবনস্ত্বং হুতবহ –
স্ত্বমাপস্ত্বং ব্যোম ত্বমু ধরণিরাত্মা ত্বমিতি চ।
পরিচ্ছিন্নাং এবং ত্বয়ি পরিণতা বিভ্রতু গিরং
ন বিদ্মস্তৎ তত্ত্বং বয়মিহ তু যৎ ত্বং ন ভবসি॥

অর্থাৎ হে মহাদেব! তুমি সূর্য, তুমি চন্দ্র, তুমি পবন, তুমি অগ্নি, তুমি জল, তুমি আকাশ, তুমিই পৃথিবী এবং তুমিই আত্মা – জ্ঞান বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ তোমা সম্বন্ধে এই রকম সসীম বাক্য প্রয়োগ করতে থাকুন ; আমরা কিন্তু এ জগতে এমন কোন তত্ত্ব জানি না, যা তুমি নও।

পঞ্চ প্রদীপের আরতি শেষ হতেই তিনি কর্পূরদানীতে এক ডেলা কর্পূর জ্বেলে আরতি করতে করতে গাইতে লাগলেন –

ওঁ ত্রয়ীং তিস্রো বৃত্তীস্ত্রিভুবনমথো ত্রীণপি সুরান্
অকারাদ্যৈর্বর্ণৈস্ত্রিভিঃ অভিদধৎতীর্ণবিকৃতি।
তুরীয়ং তে ধাম ধ্বনিভিঃ অবরুন্ধানম্ অণুভিঃ
সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ গৃণাতি ওম্ ইতি পদম্॥

হে শরণদ! ওম্ এই পদটি অকারাদি তিনবর্ণের দ্বারা (অ + উ + ম), তিন বেদ (সাম + ঋক + যজুঃ), তিন অবস্থা, ত্রিভুবন ও তিন দেবতাকে (ব্রহ্মা + বিষ্ণু + মহেশ্বর) প্রতিপাদন করে এবং সূক্ষ্ম ধ্বনি দ্বারা তোমার বিকারাতীত তুরীয় অবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করে, এক ও বহু রূপে নিত্য বর্তমান – তোমারই বন্দনা করে থাকে।

কর্পূর আরতির পর বাচস্পতিজী চামর দুলিয়ে শিবলিঙ্গের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চতুষ্পার্শ্বে ঘুরে ফিরে গাইতে লাগলেন –

ওঁ ভবঃ শর্বো রুদ্রঃ অথোগ্রঃ সহ-মহান্
তথা ভীম-ঈশানৌ ইতি যৎ অভিধানাষ্টকমিদং ।
অমুষ্মিন্ প্রত্যেকং প্রবিচরতি বেদ শ্রুতিরপি
প্রিয়ায়াস্মৈ ধাম্নে প্রণিহিতনমস্যোঽস্মি ভবতে ॥

হে মহাদেব ! 'ভব, শর্ব, রুদ্র, পশুপতি, উগ্র, মহাদেব, ভীম ও ঈশান' এই যে তোমার আটটি নাম, তাদের অর্থ প্রকাশের জন্য বেদও সম্পূর্ণরূপে সচেষ্ট । আমি কায়মনোবাক্যে সেই আনন্দস্বরূপ এবং অখণ্ডচৈতন্য স্বরূপ তোমাক নমস্কার করি ।

আরতি শেষ হল । 'জয় সিদ্ধরুদ্রেশ্বরজী কি জয়' সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি দিতে দিতে বাচস্পতিজী সহ সকল ভক্তবৃন্দই মন্দির হতে চলে গেলেন । যাওয়ার আগে পুরোহিতজী যুক্তেশ্বরী মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে গেলেন – 'মা ! মন্দিরের দ্বার খোলাই রইল, তোমার যতদিন ইচ্ছা যতক্ষণ ইচ্ছা অবস্থান করো ।' তাঁর কথা মায়ের স্থূল কর্ণে প্রবেশ করল বলে আমার মনে হল না কারণ তখন তিনি গভীর ধ্যানে মগ্না । তবুও তিনি যে বুঝে সুঝেও এই কথাগুলি বলে গেলেন, তাঁর কথা বলার ভঙ্গীতে মনে হল, আমরা যেমন অনেক সময় কোন দেবমন্দির গিয়ে বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে আপন মনে বলে থাকি – 'চললাম ঠাকুর ! তুমি কৃপা করে একটু দেখো,' এও কতকটা সেই রকম । সকলে চলে গেলেও আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম । মায়ের শরীরে কোন স্পন্দন নাই, সেখানে কোন জীবনের চিহ্ন আছে বলেও মনে হল না, চোখে মুখে গভীর প্রশান্তি এবং আনন্দের ছটা ছাড়া আর কিছু প্রত্যক্ষভাবে অনুভবে ফুটছে না ।

আমার গায়ে আলখাল্লা ছাড়া আর কিছু নাই, রাত্রি প্রায় আটটা বাজতে যায় অনুমান করলাম । আমার শীত পাচ্ছে, তাই কম্বলটা গায়ে দিবার জন্য মণ্ডপ গৃহের দিকে গেলাম কম্বল আনতে, গিয়ে দেখি, রঞ্জন বাউল তখনও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন । আমি আবার তাঁকে ঠেলা দিলাম, জোরে জোরে নাম ধরে ডাকলাম । কিন্তু তবুও কোন সাড়া নাই ! আমার বড় ভাবনা হল, ঘুমের ঔষধ খেয়েও বোধ হয় এতক্ষণ কেউ একটানা ঘুমাতে পারে না । তবে কি রঞ্জন বাউলের কোন অসুখ হল ? তাঁর নাকে ও বুকে একবার হাত দিয়ে দেখতে ইচ্ছা হল কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে নিদ্রিত মানুষের মত তাঁর মৃদু নাসিকাধ্বনি শুনে আর তাঁর বুকে হাত দিলাম না । টর্চ টিপে একবার তাঁর শরীরের দিকে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত মনে কম্বল গায়ে দিয়ে আমি মন্দিরে গেলাম যুক্তেশ্বরী মা ব্যুত্থিত হয়েছেন কিনা দেখতে । আজ কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত, চারদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, চারিদিক নির্জন খাঁ খাঁ করছে । আমি মন্দিরের সামনে প্রণাম করে দাঁড়ালাম । মন্দিরের মধ্যে যে ঘি-এর প্রদীপটি জ্বলছিল তা নিভে গেছে । মন্দিরাভ্যন্তরে কোণের দিকে তাকিয়ে দেখি, ঘড়িতে রেডিয়ামের কাঁটা যেমন জ্বল্জ্বল্ করে তেমনি ভাবে মায়ের ধ্যানস্থ শরীরও দ্যুতি মণ্ডিত হয়ে উঠেছে । ওঁঙ্কারেশ্বর-মন্দিরের মধ্যেও তাঁর এই রূপ একদিন দেখেছিলাম । মা এখন কোন্ নন্দন লোকে বিচরণ করছেন তা অনুমান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় । আমি প্রণাম করে ফিরে এলাম আবার সেই মণ্ডপ গৃহে । আমি ভাবতে লাগলাম, এ ত বড় ফাঁপরে পড়লাম, দুজন সঙ্গীর একজন মন্দিরে ধ্যানস্থ, আর একজন এখানে নিদ্রায় হতচেতন । আমি সব ভাবনায় জলাঞ্জলি দিয়ে বিছানায় বসে জপে মন দিলাম । আমার সান্ধ্যক্রিয়া শেষ হয়েছে, এমন সময় যুক্তেশ্বরী মা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন । আমি সঙ্গে সঙ্গে টর্চ টিপে করজোড়ে তাঁকে বসতে বললাম । মৃগচর্ম পাতাই ছিল, তিনি সেখানে বসলেন । বসেই বললেন – ইয়ে

হরবোলাজী আভি তক্ নিদ্ যাতা হৈ। হাতমেঁ নেহি, আভি ইন্‌কা একতারা নাসিকামেঁ বাজ রহে। বাজনে দেও। বলেই খিল খিল করে হেসে উঠলেন।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি কথা বলতে আরম্ভ করলেন। প্রথমেই তিনি বললেন – তোমার বাবার কাছে কিছুটা বেদের স্বাদ পেয়েছ বলে আমি খুব খুশী হয়েছি। বেদ পড়তে গিয়ে তুমি নিশ্চয় সায়ণাচার্যের ভাষ্য পড়েছ। সায়ণাচার্যের ভাষ্য তোমার কেমন লেগেছে? বেদের প্রচলিত ভাষ্য, টীকা টীপ্পনী সম্বন্ধে তোমার বাবার কি মত ছিল?

– বাবা বলতেন, প্রথমতঃ যতদূর সম্ভব সকল পূর্ব সংস্কার বর্জিত হয়ে বেদের মূলের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। বাবার মতে, ভাষ্যকার টীকাকার বৈয়াকরণিক এবং আলঙ্কারিকরা সকলে মিলে বেদের চারিদিকে এতই জাল জঞ্জালের ঘেরাটোপ তুলে দিয়ে গেছেন যে, সেগুলির উপর নির্ভর করে বেদ বুঝবার চেষ্টা করলে, ভিতরের মন্দিরে প্রবেশ লাভ ত দূরের কথা, তা কেবল আমাদেরকে পথ হারিয়ে ঘুরে মরতেই বাধ্য করবে। ভাষ্য টীকার সাহায্যে বেদের মর্মবাণীকে হৃদ্‌গত করতে গেলে, আমরা বেদের যে পরিচয় পাব তা হবে গৌণ পরিচয়, তাতে মূল বস্তুর সঙ্গে কোন সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটবে না। কারণ বেদবাণীর উপলব্ধি তপস্যা ছাড়া সম্ভব নয়। তপস্যা দ্বারা তত্ত্বানুভূতি লাভ করলে তবেই তপস্যাপূত হৃদয়ে বেদজ্ঞানের উদয় হয়। বেদ আর পাঁচটা প্রাচীন পুঁথির মত নয়। বুদ্ধিশক্তির বিজৃম্ভনের দ্বারা বৈদিক সত্য অনুভব করা সম্ভব নয়। ভাষ্যকার টীকাকাররা ব্যাকরণ জ্ঞানের সাহয্যে বৈদিক শব্দের অর্থ বুঝতে গিয়েই বিভ্রাট ঘটিয়েছেন। তাঁর মতে বেদপাঠ বা বেদাভ্যাস হল বেদের সাধনা বিশেষ। যে কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে যে সূচ্যগ্র মেধা, মনঃসংযম, ধ্যাননিষ্ঠা, মনন ও স্বাধ্যায় প্রয়োজন হয়, বেদাধ্যয়নেও সেই রকম মনন ও তীব্র সংবেগ থাকা প্রয়োজন হয়। তাহলে বেদমন্ত্রের অন্তর্নিহিত চৈতন্য শক্তির বলে বেদ বুঝবার মত শুদ্ধাবুদ্ধির উদয় হয়। বাবা বারবার আমাদেরকে বুঝাতেন যে, টীকাকার ও ভাষ্যকাররা সহায় হতে পারেন কিন্তু সহায় মাত্র। সেই সহায়কেই যদি প্রধান করে তুলি, তবে সেটা প্রতিবন্ধকই হয়ে দাঁড়ায়। আগে জানা দরকার বেদের মূল ভাবটা কি, বৈদিক ঋষিদের দৃষ্টিভঙ্গীটা কি ছিল, টীকা ভাষ্যকারদের প্রয়োজন পরে, খুঁটিনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার যখন করতে হবে তখন। মূলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়ার পূর্বেই আমরা যদি আগে হতেই টীকা হাতে করে বসি, মূলকে বাদ দিয়ে সমালোচকদের বাক্‌বিতণ্ডায় যোগদান করি তবে বিভ্রান্ত যে হতে হবে তা অনিবার্য। বাবা একান্তভাবে বিশ্বাস করতেন যে বেদবিদ্যা হল সাক্ষাৎ পরাবিদ্যা, পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম শাস্ত্র। আমাদের দেশে বিদ্যা মাত্রই গুরুমুখী, অধ্যাত্ম শাস্ত্র সম্বন্ধে ত একথাটি বেশী করেই খাটে। কাজেই তাঁর মতে বেদাভ্যাস শুরু করে বেদজ্ঞ গুরুর কাছেই অর্থ জেনে নিতে হয়, সেই সঙ্গে তিনি কোন সাধনার ক্রম দিলে তাও নিষ্ঠার সঙ্গে অভ্যাস করতে হয়।

– তোমার বাবা চমৎকার খাঁটি কথাই বলে গেছেন। তুমি তাহলে কি সায়ণাচার্যের ভাষ্য পড়নি?

– পড়েছি বৈকি! একমাত্র সায়ণাচার্যই সমস্ত ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা করে গেছেন। তাঁর সাহায্য না পেলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা ত দূরের কথা, এদেশের প্রাচীন পন্থী পণ্ডিতরাও বেদের অপ্রচলিত পুরাতন ভাষ্য হতে কিছু অর্থ নিষ্কাশন করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। তাই, আধুনিক বেদবিৎ পণ্ডিত সমাজেও সায়ণাচার্য কৃত ভাষ্যের পঠন পাঠনই বেশী হয়। কিন্তু সায়ণাচার্য বেদকে দেখেছিলেন এবং বুঝেছিলেন যাজ্ঞিক ক্রিয়াকাণ্ডের দিক হতে। তাই তিনি, সর্বত্র বেদমন্ত্রের যাজ্ঞিক অর্থই নিষ্কাষণ করেছেন। তার জন্য স্থানে স্থানে কত যে গোঁজামিল দিয়েছেন, টেনে বুনে অর্থ করেছেন তার ইয়ত্তা নাই। উদাহরণ স্বরূপ, আপনার

কাছে একটি বেদমন্ত্র উদ্ধৃত করে দেখাচ্ছি। মূল মন্ত্রটি হল ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের অন্তর্গত তৃতীয় সূক্তের একাদশ ঋঙ্মন্ত্র। তদ্‌যথা –

চোদয়িত্রী সুনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাং
যজ্ঞং দধে সরস্বতী।
মহোঅর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা
ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি।

এই সহজ সুন্দর শ্লোকে মূল ভাবটি কি খুবই দুর্জ্ঞেয় ? সহজ বোধেই এখানে পাচ্ছি তত্ত্বানুভূতির কথা, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা, মনস্তত্ত্বের কথা। সায়ণাচার্য কিন্তু এই শ্লোকের প্রাকৃতিক ও যাজ্ঞিক ব্যাখ্যা নিষ্কাশন করতে গিয়ে কেমন হাস্যকরভাবে গলদঘর্ম হয়েছেন দেখুন ! সরস্বতীকে আমরা জ্ঞানের দেবী বলেই জানি, সুতরাং ধিয়াবসু (অর্থাৎ ধী হচ্ছে যাঁর সম্পদ), 'ধিয়ো বিশ্বা', 'সুনৃত', 'সুমতি' প্রভৃতি কথা যে তাঁর সম্বন্ধে ব্যবহৃত হবে এটাই ত স্বাভাবিক। 'ধী' শব্দটি সর্বজন পরিচিত কিন্তু সায়ণের এ রকম সহজবোধ্য অর্থ ধরলে ত চলে না, তাই তিনি 'ধী' এর অর্থ টেনে বুনে করেছেন 'কর্ম', তারপর তার সঙ্গে 'অর্থাৎ' দিয়ে যোগ করলেন 'কর্ম' 'বর্ষণ কর্ম' ! আর এক জায়গায় মিত্র ও বরুণের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, এই দুই দেবতা এমন ধী-গড়ে তুলেন যা হচ্ছে 'ঘৃতাচীং' (ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা – ১/২/৭)। এ তবে কি ঘি মাখা ধী অর্থাৎ বৃষ্টি ? না, তাও নয়, সায়ণের মতে ধিয়ং ঘৃতাচীং অর্থ জল ঢালে যে বৃষ্টি – ঘৃত অর্থ জল ! 'ঘৃ' ধাতুর অর্থ যে দীপ্তি করাও হয়, 'ধিয়ং ঘৃতাচীং' বলতে যে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় বুদ্ধি বা অন্তরের জ্যোতিকেই বুঝায়, সে কথা জানলেও ঐ বৈদিক শব্দের প্রকৃত অর্থটি সায়ণের পছন্দ নয়। তার কারণ তা স্বীকার করলে যে মন্ত্রটির যাজ্ঞিক ব্যাখ্যা করতে তার অসুবিধা হয় !

বেদের আর একটি অতি সহজ কথা, অতি সহজ ভাবকে যে কতদূর সায়ণাচার্য বিকৃত করেছেন তার আর একটি উদাহরণ দিলে সায়ণাচার্যের ভাষ্যের উপর শ্রদ্ধা রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। বেদে একটি কথা আছে 'অমৃতস্য বাণী'। ঐ বৈদিক শব্দটির মর্ম ভাবভঙ্গী সবই সকলের কাছে ব্যক্ত হওয়া উচিত কিন্তু সায়ণাচার্য ঐ কথার কষ্টকল্পনা করে অর্থ করেছেন – 'অমৃতস্য বাণী' অর্থাৎ উদকস্য ধারা (১০/১২৩/৩), অমৃতের বাণী কিনা জলের স্রোত !!

এই সব কারণে, আপনি আমার কোন অপরাধ নেবেন না, আপনাকে সরল প্রাণেই বলছি – সায়ণাচার্যের ভাষ্যের উপর আমার কোন শ্রদ্ধা নাই, এক কথায় সায়ণাচার্যের ভাষ্য আমি মানি না। আমার কথা শুনে যুক্তেশ্বরী মা বললেন – না না, অপরাধের কোন প্রশ্নই নাই। তুমি যে সব সায়ণাচার্যের ভাষ্যের ত্রুটি দেখালে সেগুলি আমার চোখেও পড়েছে। তবে আমি কোন মনুষ্যকৃত ভাষ্যের মূল্য দিই না। ভগবান ওঁঙ্কলেশ্বরজীর কৃপায় বুঝেছি বেদের ভাষ্য বেদ নিজে। বেদকে বেদের সাহায্যেই বুঝতে হবে। এ বিষয়ে আমাদের সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারে উপনিষদ। কারণ, উপনিষদ্ বেদের কথা এত ব্যবহার করেছেন এবং বারবার এমন সুসঙ্গত ভাবে ব্যবহার করেছেন যে, সে সব কথার ঔপনিষদিক ব্যঞ্জনা আগে হতেই না থাকলে, সেগুলি এমনভাবে উপনিষদ্ আপন তত্ত্ব ব্যাখ্যানে প্রয়োগ করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। প্রতিপদেই দেখ না কি উপনিষদ্ নিজের সব তত্ত্বানুভূতি বেদের কথার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে চলতে চেষ্টা করেছেন, কোন একটি সিদ্ধান্ত করেই তার প্রমাণের জন্য অনুরূপ সিদ্ধান্ত বেদ হতে হুবহু উদ্ধৃত করেছেন ? যেমন ধর, উপনিষদের সেই বিখ্যাত উক্তি – বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ – মন্ত্রটি ত আমাদের সকলেরই জানা, কিন্তু একথা সকলে জানে কি যে এটি বেদেরই একটি মন্ত্রের প্রতিধ্বনি ? বেদের প্রথম মণ্ডলে ৫০তম সূক্তে দশম ঋকে সেই মন্ত্রটি কণ্ব-পুত্র প্রকণ্ব ঋষির কণ্ঠে কেমন উদ্গীত হয়েছে দেখ –

উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিষ্পশ্যন্ত উত্তরং ।
দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমং ॥

এই ঋকের অর্থ হল, অন্ধকার বা তমসার পরপারে স্বয়ং প্রকটিত সূর্য জ্যোতির পথ ধরে দেবগণের মধ্যে দ্যুতিমান অমৃতস্বরূপ সূর্যের নিকট আমরা গমন করি, তিনিই সর্বোত্তম জ্যোতিঃ । বেদাহমেতৎ পুরুষং মহান্তং ইত্যাদি শ্রুতি মন্ত্রেও একই ভাব ভাষা ও ছন্দ অনুসরণ করে বলা হয়েছে – তমসার পরপারে সেই আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষকে আমরা জেনেছি । ছান্দোগ্য উপনিষদে যে "হৃদি মণীষা মনসাঽভিক্লপ্তো" ইত্যাদি মন্ত্রও ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলান্তর্গত ১২৯ সূক্তের চার নম্বর ঋক, "হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা" ইত্যাদি মন্ত্রেরই অনুরূপ । ভাব ভাষা অর্থ ও ছন্দে কোথাও অমিল নাই । এইরকম সব বিশেষ ভাব ব্যঞ্জনা পরিপূর্ণ একই শব্দ এবং কথা বেদে এবং উপনিষদে যে কত আছে তা গুণে শেষ করা যাবে না । উপনিষদে যেখানে যেখানে পাই 'গুহাহিতং', 'গহ্বরেষ্ঠং', 'হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট', – বেদেও সেই রকমই পাই, এই যেমন – 'অন্তঃসমুদ্রে হৃদ্যন্তর' প্রভৃতি শব্দ । তারপর পরমং পদং, পরমে ব্যোম্নি, পরমে পরাকাৎ, পরমে পরার্ধে, সত্য, ঋতং, অমৃতং, বৃহৎ, ধী, জ্যোতি প্রভৃতি শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ ত উভয় জাতীয় মহাগ্রন্থে ভূরি ভূরি রয়েছে । তাই বলছিলাম যে, বেদের ভাষ্য বেদ নিজে হলেও তা বুঝবার সুবিধার জন্য উপনিষদের কাছেই প্রথমে যাওয়া উচিত । উপনিষদ্ ভালভাবে আয়ত্ত হলেই বেদ বুঝার জন্য প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, তত্ত্বানুভূতি এবং অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মদৃষ্টি আপনা হতেই খুলে যাবে । তখনই বোধে ফুটবে যে, উপনিষদই বেদের জীবন্ত ভাবের প্রথম ব্যাখ্যা, ভাষ্য বা টীকা । আমার এই যুক্তিকে তুমি সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে পারছ কি ?

আমি তাঁকে বললাম – হ্যাঁ মা, তোমার কথাকে খুবই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে । আমি ত একটু আগেই তোমাকে জানালাম যে সায়ণকৃত বেদভাষ্যে আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই । সায়ণাচার্য বা অন্যান্য ভাষ্যকাররা নিজের নিজের বুদ্ধির ঘাটে বসে স্ব স্ব মতবাদের অনুকূলে এমন সব মন্ত্রের অর্থ করেছেন যে, তা পূর্বাপর মিলিয়ে পড়তে বা বুঝতে গেলে প্রত্যেক বেদপাঠীই দিশেহারা হয়ে যায়, কোন সঙ্গতি খুঁজে পায় না । আমি লক্ষ্য করেছি, সায়ণাচার্য কোথাও ঘি-এর অর্থ করেছেন জল, যেমন ১/৮৭/২ নম্বর মন্ত্রে, আবার ১/৩৬/৮ মন্ত্রে অন্তরীক্ষের অর্থ কোথাও পৃথিবী করে বসে আছেন । আর আধুনিক ভাষ্যকারদের ভাষ্যলোকে বেদ বুঝতে গেলে ত বেদের অনেক জায়গাকেই প্রলাপোক্তি ছাড়া আর কিছু মনে হবে না । অথচ হিন্দু মাত্রেই আমরা বিশ্বাস করি যে বেদ অপৌরুষেয়, বেদ তত্ত্বজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার মণিমঞ্জুষা । তাই আমার মনে হচ্ছে, তোমার কথা মত উপনিষদের আলোতে বেদমন্ত্র বুঝতে গেলেই দেখতে পাব, উপনিষদ্ সর্বক্ষেত্রে অতিভক্তি সহকারে অতি সম্ভ্রমে বেদের উল্লেখ করেছেন, কঠিন সমস্যা যেখানে সেখানেই বৈদিক ঋষিদের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, এই কথাই আমাদের পূর্বতন জ্ঞানীদের কাছে শুনেছি – 'ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং ...." ইত্যাদি । আমি বাবার কাছেই বেদের পাঠ নিয়েছিলাম, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পড়তেই অবসর পেলেই ছুটে যেতাম এবং বেদের পাঠ নিয়ে আসতাম, কিন্তু অকালে বাবার দেহান্ত হওয়ায় তাঁর দেহান্তের পরে তাঁরই আদেশে আমি ছুটে এসেছি নর্মদাতটে । পরিক্রমান্তে দেশে ফিরে গিয়েই তোমার সঙ্কেতানুসারে উপনিষদের আলোতেই বেদ বুঝবার চেষ্টা করব ।

– তাই করো বাবা । পরিক্রমার শেষে তুমি কোন মঠ মিশনে ঢুকে যেও না বা নিজেই একটা মঠ স্থাপন করে বস না । নর্মদা পরিক্রমাই ত পরিপূর্ণ তপস্যা । তপস্যার শেষে বেদ হতে রস গ্রহণের চেষ্টা করলেই বেদময়ী নর্মদার কৃপায় বেদের আলো তোমার চোখে ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠবে । তুমি জীবনে শান্তি পাবে রস পাবে । বেদ কখনই প্রাকৃতিক

বুদ্ধির জিনিষ নয়। আধুনিক যুগের মানুষরা যেভাবে সত্যের সন্ধান করেন বা যেভাবে সত্যকে আবিষ্কার করেন, বৈদিক ঋষিরা সেভাবে সত্যকে আবিষ্কার করে যান নি, সেভাবে সে ধরণে তাঁরা সত্য দর্শনের চেষ্টাও করতেন না। তর্ক বুদ্ধি ছাড়াও মানুষের মধ্যে আছে সূক্ষ্মতম গভীরতর ব্যাপকতর জ্ঞানের বৃত্তি, বোধের বৃত্তি। সেই বৃত্তির চর্চা করা, উদ্বোধন করা এবং তারই সহায়ে সত্যকে আবিষ্কার করা – শুধু আবিষ্কার করা নয়, তাকে ধ্যান দৃষ্টিতে গোচরীভূত করে জীবনে জাগ্রত করাই ছিল তাঁদের সাধনা। সত্যকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন এবং প্রত্যক্ষ অনুভব করাই ছিল, তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এই চোখ দিয়ে নয়, এই কান দিয়ে নয়, এই স্পর্শ দিয়ে নয়, এই মন বুদ্ধি দিয়েও নয় কিন্তু এই সকল স্থূল পৃথক পৃথক যন্ত্র যে মূল বৃত্তির অভিব্যক্তি, সমগ্র অন্তরাত্মার সেই একমুখী দৃষ্টি ও অনুভূতিই ছিল তাঁদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানোপলব্ধির প্রধান উপায়। তুমি আমার কাছে এই ধ্রুব সত্যটি জেনে নাও যে, বেদের আছে একটি জীবন্ত চিন্ময় সত্তা, যে দেশে বা যে কালেই হোক না কেন, মানুষকে একটা বৃহত্তর জীবনে উঠে দাঁড়াবার লক্ষ্য ও সাধনা যে বেদ দিয়ে গেছেন, সেইটাই বেদের আসল পরিচয়। অজ্ঞানের অশক্তির নিরানন্দের করতলগত মানুষ চিরকাল যে স্বপ্ন দেখে এসেছে, সকল বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েও সে যে মহান্ আদর্শের পিছনে ছুটে চলেছে, সেই যেনাহং ন অমৃতস্যাম, তেনাহং কিম্ কুর্যাম্ – যাতে আমি অমৃতত্ব পাব না, তা দিয়ে আমি কি করব – মানুষের অন্তরাত্মার এই যে অমৃত-পিপাসা, অমৃতত্বের পিপাসা, তার পূর্ণ-তৃপ্তি যেখানে এবং যে দিয়ে, সেই রসের বৃহৎ আধার – বেদের ভাষায় 'রায়োঃ অবনিঃ' – সেই মহান্ অর্ণব – 'মহোঅর্ণঃ' হচ্ছে বেদ। বেদমন্ত্র পাঠে যার অন্তরে এই দিব্যতৃষ্ণা জেগে ওঠে, তারই বেদপাঠ সার্থক।

মায়ের কথা শেষ হতেই আমি তাঁকে ভক্তিভরে বললাম – মা, তুমি বারবার বলছ – নর্মদা বেদময়ী। সেই বেদময়ী নর্মদার তটাঞ্চলে সিদ্ধরুদ্রেশ্বর মহাদেবের সম্মুখে তোমাকে যে এভাবে প্রসন্ন মূর্তিতে দেখতে পেলাম, এ সুযোগ হয়ত আর আমার জীবনে ঘটবে না। তাই তোমার শ্রীমুখ হতে অন্ততঃ একটি বেদমন্ত্রের পাঠ আমি নিতে চাই। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম ঋঙ্মন্ত্রটি আমাকে বুঝিয়ে দাও। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রে সর্বপ্রথমে অগ্নিকে স্মরণ ও বন্দনা করা হয়েছে। মধুছন্দা ঋষি বলেছেন

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।
হোতারং রত্ন ধাতমং॥

মন্ত্রের স্থূল শব্দার্থ আমি জানি। মন্ত্রে ঋষি বলছেন – অগ্নিম ঈলে অর্থাৎ অগ্নিকে আমি বন্দনা করি। যজ্ঞের সম্মুখে আসীন ইনিই সেই পুরোহিত, যিনি একাধারে দিব্য ঋত্বিক, হোতা এবং পূর্ণ আনন্দের অধিষ্ঠাতা।

আমি বাবার দয়ায় এটুকু বুঝেছি যে এই অগ্নি জড় অগ্নি নয়। বৈদিক ঋষিরা জড় অগ্নির পূজা করতেন না, যজ্ঞকুণ্ডের মধ্যে জড় অগ্নি প্রজ্বলিত করে নিশ্চয়ই মন মন ঘি ঢেলে ব্যর্থ শ্রম তাঁরা করতেন না। আগ্নেয় সূক্তের এই প্রথম মন্ত্রটি যে জড় অগ্নি সম্পর্কে তাঁরা ব্যবহার করেন নি, ঐ মন্ত্রের প্রতিটি শব্দ ও বর্ণে যে অত্যদ্ভুত বিস্ময়কর শক্তি লুকিয়ে আছে, তাতো তুমি আজ জড় অগ্নির সাহায্য ব্যতিরেকেই তা প্রকট করে দেখালে। ঐ মন্ত্রটিরই অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থ এবং ব্যঞ্জনা আজ কৃপা করে আমাকে জানিয়ে দাও।

আমার কথা শুনে তিনি মৃদু হেসে বলতে লাগলেন – তোমার বাবা অগ্নি সম্বন্ধে সঠিক আভাস দিয়ে গেছেন। বৈদিক ঋষিদের বন্দনীয় অগ্নি কখনই জড় নন। আমরা জড়ের উপাসনা করি না, স্থূল সীমাবদ্ধ কোন মূর্তিরও উপাসনা করি না। যদি কেবল মাত্র ঐ যজ্ঞকুণ্ডস্থ অগ্নিকে লক্ষ্য করেই ঐ মন্ত্র প্রযুক্ত হয়ে থাকবে, তাহলে সহজ বুদ্ধিতেই ধরা পড়ে, তাহলে তাঁকে পুরোহিত, ঋত্বিক, ধনাধিকারী, দাতা প্রভৃতি বিশেষণে কেমন করে বিশেষিত

করা যায় ? পুত্র যেমন অনায়াসে পিতার ক্রোড়ে স্থান লাভ করতে পারে, অগ্নির ক্রোড়ে সেরকম ভাবে কি বসা যায় ? জড় অগ্নিই কিভাবেই বা দাতা নামে অভিহিত হতে পারেন। জড় অগ্নির দ্বারা কিভাবেই বা মানুষ ধন পুত্রাদি ঐশ্বর্য লাভ করতে পারেন ? পুরোহিতম্, ঋত্বিজং, হোতারং, রত্নধাতমং প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে মনে হয় না কি, জড় অগ্নির অতীত অপর এক অগ্নি – যাতে সকলই আছে, ঐ মন্ত্রে তাঁরই উপাসনা করা হচ্ছে ? (অঙ্কু গতি পূজনয়োঃ), অগ্, অগ্নি ইন প্রভৃতি গত্যর্থক ধাতু হতে অগ্নি শব্দ সিদ্ধ হয়। 'গতেস্ত্রয়োঽর্থাঃ জ্ঞানং গমনং প্রাপ্তিশ্চেতি, পূজনং নাম সৎকারঃ', যোঽঙ্কতি অচ্যতেঽগত্যঙ্গত্যেতি বা সোঽয়মগ্নিঃ' অর্থাৎ যিনি জ্ঞান স্বরূপ, সর্বজ্ঞ, জানবার, পাবার এবং পূজা করবার যোগ্য, সেই পরমেশ্বরের নাম অগ্নি। পরমেশ্বরের নামের অন্ত নাই, অগ্নি তাই তাঁর একটি নাম। পরমেশ্বরের রূপের অন্ত নাই, দাহিকা শক্তি বিশিষ্ট অগ্নি তাই তাঁর একটি রূপ। তাঁর গুণের অন্ত নাই; তাই তেজ তাঁর একটি গুণ। তাঁর শক্তির অন্ত নাই, তাই দাহিকা তাঁর একটি শক্তি। তাঁর প্রভার অন্ত নাই, তাই দীপ্তি তাঁর একটি প্রভা। তিনি অনলে, অনিলে, সলিলে, ভূলোকে, দ্যুলোকে, গোলকে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। তিনি এক রূপে অনন্ত নামে আবার অনন্ত রূপে এক নামে বিশ্বের সর্বত্র সর্ব বস্তুতেই ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থান করছেন। যখন জ্যোতির্ময় নাম তাঁর, তখন অগ্নিরূপে মর্তলোকে, সূর্যরূপে অন্তরীক্ষে এবং ইন্দ্রাদি দেবতারূপে স্বর্গলোকে বিরাজমান আছেন। জাগ্রতরূপে ব্রহ্মা, স্বপ্নে বিষ্ণু, সুষুপ্তিতে রুদ্র, তুরীয় পরম অক্ষর স্বরূপ। সেই যে তুরীয় অবস্থা, তখন তিনিই আদিত্য, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই পরম পুরুষ, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই প্রাণ, তিনিই অগ্নি।

অগ্নি রূপেই তিনি বিশ্ব প্রকাশক। তাঁর যে বিভা বা দিব্যজ্যোতিঃ, তার দ্বারাই এই সংসার, সংসার রূপে প্রতিভাত হচ্ছে। তিনি আলোকময়, তাই তিনি জগৎ আলো করে আছেন, কোন কোন মানুষ যেমন বৈদিক ঋষিরা এবং এ যুগের সিদ্ধ সাধকরা, তাঁরাও তাঁরই প্রদত্ত আলোর সাহায্যেই তাঁকে দর্শন করেন। তিনি যদি না জ্যোতিঃ বিতরণ করতেন তবে কি মানুষ তাঁকে বা এই জগৎকে কখনও দেখতে পেত ? আমরা মনে করি, চক্ষু দ্বারা দর্শন করি। কিন্তু চক্ষুর কি শক্তি যে সে দর্শন করাতে পারে ? যদি তাঁর প্রদত্ত আলো না থাকত, যদি সেই জ্যোতিষ্মানের সাহায্য না পেত, তাহলে চক্ষু কি কিছু দর্শন করাতে পারত ? কখনই পারত না, সবই ঘোর তমসাচ্ছন্নই থেকে যেত ! সেই জ্যোতির্ময়ই দৃষ্টিশক্তি স্ফুরণ করে দেন। সূর্যদেবকে লক্ষ্য করে তাই ঋষিরা বলেছেন – 'স্বধিষ্ণ্যাং প্রতিপন্ সূর্যো বহিশ্চ প্রতপত্যসৌ।' সূর্য কেবল নিজের মণ্ডলকেই আলোকিত করেন না, জগৎকে তিনি প্রকাশ করেন। সূর্যকে দেখি, সেও তাঁরই প্রভায়; জগৎকে যে দেখি, সেও সূর্যেরই প্রভায়। যেমন বহির্জগতে, তেমনি অন্তর্জগতে। 'অগ্নিমীলে' বলে ঋষি মধুচ্ছন্দা যাঁকে স্মরণ ও বন্দনা করেছেন, এই অগ্নি যাঁর ভাতি বা বিকাশ, তিনি যখন হৃদয়ে উদয় হন, তখনই সব দৃশ্যমান হয়। যখন তাঁকে অন্তরে অনুভব করতে পারি, তখনই অন্তরের আঁধার দূরীভূত হয় – অন্তর অন্তরাত্মার সন্ধান পায়, হৃদয় হৃদয়েশ্বরের দর্শন পায়।

ঋগ্বেদে আগ্নেয় সূক্তের এই প্রথম মন্ত্রটিতে সেই অগ্নিরই স্তব করা হয়েছে, যে অগ্নি বিশ্বপ্রাণরূপে বিশ্বকে ব্যেপে আছেন, এই অগ্নিই বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের আঁধার দূর করছেন। আবার এই অগ্নিই সেই অগ্নি যিনি জ্ঞানাগ্নিরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থেকে অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন।

স্বয়ং শ্রুতি জিজ্ঞাসা করেছেন – যিনি সকলকে জানিয়ে থাকেন তাঁকে জানবে কি ভাবে ? 'যেনৈব জানতে সর্বং তং কেনান্যেন জানতাং' ? উত্তরও দিয়েছেন – 'বিজ্ঞাতারং কেন বিন্দ্যাৎ অরে কেন বিন্দ্যাৎ।' তাঁর দ্বারাই তাঁকে জানা ছাড়া ওরে, অন্য উপায় আর কি আছে ? ঋষি মধুচ্ছন্দা তাঁর পরাবর দৃষ্টিতে অগ্নির তত্ত্ব বুঝে এই মন্ত্রে জগৎবাসীকে

জানাচ্ছেন – অগ্নি সেই পরম প্রভুরই জ্যোতির্ময় মূর্তির বিকাশ। অগ্নিকে জানলেই তাঁর স্বরূপ জানা যাবে। কাজেই অগ্নিম্ ঈলে, অগ্নিকে বন্দনা করি।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি আবার বলতে লাগলেন – আশা করি তুমি একথাটি বুঝতে পারছ যে, সকল সাধনার মূলে, উৎসরূপে, আদি প্রেরণা রূপে রয়েছে যে ঊর্ধ্বমুখী তেজ যে চিন্ময় তপঃশক্তি, যে অগ্নি শক্তি, তারই উদ্বোধন করা হয়েছে ঋগ্বেদোক্ত প্রথম সূক্তের এই প্রথম মন্ত্রে। বৈদিক সাধনার মূল লক্ষ্য হল – 'সত্যং ঋতং বৃহৎ'। এদিকে সাধারণ মানুষের জীবন ইচ্ছে দেহ প্রাণ ও মন নিয়ে। দেহের ক্ষুদ্র কর্ম, প্রাণের ক্ষুদ্র প্রেরণা ও ভোগ, মনের ক্ষুদ্র জ্ঞান – এর বেশী মানুষ জানে না, বুঝে না, ধরতেও পারে না। কিন্তু দেহ প্রাণ মনের উপরে আছে একটা বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান যেখানে উঠতে পারলে মানুষ তার নিজস্ব সত্যস্বরূপ সত্তা, সত্য পূর্ণ কর্ম অর্থাৎ দেবতার স্বভাব ও স্বধর্ম, যাকে বলা হয় দিব্য জন্ম তা লাভ করে। দেবতাদের বা দেবস্বভাবের প্রতিষ্ঠান এই স্বর্লোকে পৌঁছবার অন্তরায় হল, দেহ, প্রাণ ও মন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এই দেহ প্রাণ মন শঙ্করাচার্যপন্থী মায়াবাদীদের মত অস্বীকার করতে হবে বা ধ্বংস করে ফেলতে হবে। এগুলিকে কেবল শুদ্ধ ও সিদ্ধ করে নিতে হবে, এই হল বৈদিক ঋষিদের নির্দেশ। আধারের এই শুদ্ধি ও সিদ্ধির জন্য যজ্ঞাগ্নির পুটপাক প্রভৃত সাহায্য করে। তাই ঋষিরা চির চিন্ময় বেদমন্ত্রে অগ্নিরই প্রথম আবাহন করতেন, উপাসনা করতেন। তাই তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন মুক্ত জীবনকে। যজ্ঞাগ্নি সাধকের আধারকে শুদ্ধ করে সিদ্ধ করে, অন্তর্নিহিত তপঃ শক্তিকে প্রবুদ্ধ ও জাগ্রত করে আলোকের তোরণদ্বার উন্মোচিত করে দেয়। এখন এস, আমরাও সেই অগ্নিদেবকে প্রণাম করে আজকের মত আলোচনা শেষ করি। রাত্রির মধ্যযাম অতিক্রান্ত হয়ে যায়, এখন বিশ্রাম কর। ঘাবড়াও মৎ, আমি সিদ্ধরুদ্রেশ্বর মন্দিরেই থাকব। সকাল সকাল উঠে এখান থেকে পালাতে হবে, সূর্যোদয় হলেই আমার কাছে এতলোক আসতে থাকবে যে, তখন আর যাবার সময় পাব না। তোমাদের মশানিয়া কোটেশ্বর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আমাকে ফিরে যেতে হবে ওঁঙ্কারেশ্বরে। এখন ঘুমিয়ে পড় মা নর্মদাকে স্মরণ করতে করতে। আমি আশীর্বাদ করছি, বেদময়ী মা তোমার মধ্যে বেদজ্ঞান স্ফুরণ করিয়ে দিন। শিবমস্তু।

তিনি চলে যেতেই আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। রঞ্জন বাউলের নাক তখনও ডেকে যাচ্ছে। এক ঘুমেই সকাল। ঘুম ভাঙতেই দেখি, রঞ্জন তার অভ্যাস মত একতারাটি নিয়ে গুণ গুণ করে কোন গানের আলাপ করে চলেছেন। আমি বললাম – বলিহারী আপনার ঘুমকে! বেলা আড়াইটা থেকে একটানা ঘুমে আপনি রাত্রি কাবার করে দিলেন। আপনাকে 'কলির কুম্ভকর্ণ' বললে কোন দোষ হবে না!

– আমিও ঘুম থেকে উঠে অবাক হয়ে সেই কথাই ভাবছি। এতক্ষণ পর্যন্ত কোনদিন জীবনে ঘুমাই নি। আপনি যদি কিছু না মনে করেন ত বলি, আপনাদের ঐ যুক্তেশ্বরী মা ভৈরবী মা, ওঁরই hypnotic influence এ আমি ঘুমিয়ে ছিলাম বলে মনে করি। আপনি যাই মনে করুন, ওঁকে কি জানি কেন প্রথম থেকেই ভাল লাগছে না।

আমি তাঁর কথা শুনে ঝাঁঝিয়ে উঠলাম – কি বলছেন যা তা! যাঁকে বুঝেন না, জানেন না, তাঁর সম্বন্ধে এ ভাবে মন্তব্য করা খুবই অশোভন!

আমার কথা শেষ হতে না হতেই খিল্ খিল্ করে হাসতে হাসতে যুক্তেশ্বরী মা এসে আমাদের ঘরে ঢুকলেন। বললেন – তোমরা গাঁঠরী ঝোলা গুছিয়ে নিয়ে বেড়িয়ে পড়। রাস্তায় প্রাতঃকৃত্য সেরে নর্মদাতে গিয়ে স্নান করবে। আমরা তাঁর নির্দেশে তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে নিয়ে রুদ্রকুণ্ডের জল স্পর্শ করে সিদ্ধরুদ্রেশ্বরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মা-ই আগে আগে আমাদেরকে পথ দেখিয়ে চলেছেন। সাজোত পল্লীর ভিতর

দিয়ে মিনিট পনের হেঁটে আমরা একটি পল্লীতে প্রবেশ করলাম। সেখানে দেখলাম, অধিকাংশ বাড়ী কুঁড়েঘর। যুক্তেশ্বরী মা নিজের মুখে আঙ্গুল চাপা দিয়ে আমাদেরকে নীরবে তাঁর পিছু পিছু হেঁটে যেতে বললেন। পল্লীতে ৬০/৭০ ঘর লোকের বাস। পল্লীটি অতিক্রম করে বললেন – এই পল্লীতে গাঁড়েরিয়া নামে এক্ বন্য নিম্নজাতির লোক বাস করে। তুক্ তাক্ মাদুলি শিকড় বাকড় নিয়ে এদের কারবার। এ অঞ্চলের সকলেই এদেরকে খুবই ভয় করে চলে। এরা ভূত প্রেতের সাধনা করে। এদের কেউ কেউ মন্ত্রের জোরে 'বাণ' মারা বিদ্যা ভাল ভাবেই আয়ত্ত করেছে। ঐ সব বিদ্যা ডাকিনী তন্ত্রের অন্তর্গত। কোন গাছকে বাণ মারা মানে সেই গাছটিকে শুকিয়ে দেওয়া। কোণ গৃহস্থের উপর ক্রুদ্ধ হলে এরা এমন কিছু করে যাতে সেই গৃহস্থের শিশুটি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। এরা দুগ্ধবতী কোন গাভীকে বাণ মারলে তার দুধ শুকিয়ে যায়। তখন দোহন করলে বাঁট দিয়ে দুধ পড়ে না, রক্ত বেরিয়ে আসে। এরা খুবই বিপজ্জনক ব্যক্তি। কেউ ভয়ে এদেরকে লাগায় না, সর্বতোভাবে এড়িয়ে চলে। তাই এরা কোন গৃহস্থের বাড়ীতে প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালে গৃহস্থেরা সাধ্যমত এদেরকে টাকা পয়সা গম জোয়ার ইত্যাদি দিয়ে সন্তুষ্ট করে। এই হল এদের উপজীবিকা, এরা চাষবাস করতে চায় না। আমি নিজের চোখে দেখেছি, এদের একজন মোড়ল, আমার চোখের সামনেই একটা কুসুম গাছের গোড়ায় মন্ত্র পড়ে এক ঘণ্টার মধ্যে গাছটি জ্বালিয়ে দিল। এরা জাদুটোনায় ওস্তাদ। জাদু খেলা দেখিয়েই এরা পয়সা রোজগার করে।

তাঁর কথা শুনেই রঞ্জন মন্তব্য করলেন – এতো black magic! পুলিশ নাই বলেই জংলীরা এত উপদ্রব চালাবার সাহস পেয়েছে।

মা তাঁর কথার কোন উত্তর দিলেন না। আমাদের বোধহয় দু মাইল আড়াই মাইল হাঁটা হয়ে গেল। আকাশে সূর্যোদয় হচ্ছে। ধীরে ধীরে কুয়াশা কেটে গিয়ে চারদিক ঝলমল করে উঠছে। সামনের আকাশে সূর্যের প্রকাশ দেখে বুঝতে পারলাম যে, সাজোত গ্রাম থেকে পূর্বদিকে এগিয়ে যাচ্ছি। রাস্তার প্রকৃতিও ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। পথের দু পাশেই ঘন বন, বড় বড় গাছপালা। যুক্তেশ্বরী মাকে জিজ্ঞাসা করলাম – আমরা কি এবার জঙ্গলে প্রবেশ করছি?

– জঙ্গল ত বটেই। সোজা এই রাস্তা ধরে এগোলেই সাত আট দিন হেঁটেই তোমরা শূলপাণির ঝাড়িতে প্রবেশ করতে পারবে। উত্তরতটেও শূলপাণির ঝাড়ি আছে, তা তুমি অতিক্রম করে এসেছ। কিন্তু দক্ষিণতটের এই ঝাড়ি, আরও ভয়ঙ্কর। দক্ষিণতটের এই ঝাড়ির মধ্যেই বিরাজ করছেন মূল স্বয়ম্ভু লিঙ্গ স্বর্ণোজ্জ্বল কান্তি নিয়ে শূলপাণীশ্বর মহাদেব। ভয় করার কোন কারণ নাই। পরিক্রমাবাসীদের উপর মা নর্মদার সতত করুণা দৃষ্টি থাকে।

পাথুরে রাস্তা কঙ্করময়, দুপাশে জঙ্গল, কোন কোন ছোট ছোট গাছের ডালপালা রাস্তার উপর লুটিয়ে পড়ায় সেগুলি লাঠি দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে খুব সাবধানে হাঁটতে হচ্ছে। এইভাবে প্রায় আরও আধঘণ্টা হাঁটার পর আমরা মা নর্মদার দর্শন পেলাম এবং বলা বাহুল্য, মনে স্বস্তি ফিরে এল। যুক্তেশ্বরী মা জানালেন, এতক্ষণ আমরা নর্মদা হতে দূরে ছিলাম, এখন নর্মদার ধারে এসে গেছি। বোলবোলা কুণ্ড এবং সাজোত গ্রামের সিদ্ধরুদ্রেশ্বর কুণ্ড দর্শনের জন্য প্রত্যেক পরিক্রমাবাসীকেই নর্মদা হতে উপরে উঠে আসতে হয়। এবারে নর্মদাকে চোখে চোখে রেখে হাঁটতে থাক। আর মাইল খানিক হাঁটলেই বীরমগ্রামের বাল্মীকেশ্বর তীর্থে আমরা পৌঁছে যাব। বীরমগ্রামের পাশেই বরাছা মহল্লা। বীরমগ্রামকে অনেকে বেরুগ্রামও বলে থাকেন। কহিয়ে হরবোলাজী, তুমহারা ঘড়িমে কয়ঠো বাজ গিয়া?

– অভি ১০ ঠো বাজ গিয়া – ঘড়ি দেখে উত্তর দিলেন রঞ্জন।

মা নর্মদাতে নেমে স্নান করে নিলেন, আমাদের মাথাতেও জল ছিটিয়ে দিয়ে বললেন – তোমরা বাল্মীকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে গিয়ে স্নান পূজা করবে। পরবর্তী ঘাটটাই হল আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকির তপস্যা ক্ষেত্র। বীরমগ্রামের লোকেরা বুনো হলেও ভীলদের মত বর্বর নয়। ভীলদের মত লুটপাট ত দূরের কথা, এরা পরিক্রমাবাসীদের প্রতি এতই ভক্তিমান যে, মন্দিরে কোন পরিক্রমাবাসী এসেছে জানতে পারলেই এরা সাধু সেবার জন্য দুধ ফল নিয়ে উপস্থিত হয়। মিনিট দশেক হেঁটে চলার পরেই একটি বহু পুরাতন শিব মন্দিরে এসে উপস্থিত হলাম। নর্মদার জলে মন্দিরের বারান্দা ডুবে আছে। জয় বাল্মীকেশ্বর জয় বাল্মীকেশ্বর – জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন যুক্তেশ্বরী মা। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন – গোদাবরী সে লোটকর মহর্ষি বাল্মীকিজী নে য়হাঁ বালুকে শিবলিঙ্গ কো স্থাপনা কী। উহ্ বালুকা লিঙ্গ উন্‌কা তপস্যা কী প্রভাবসে পত্থরকা শিবলিঙ্গ বন্ চুকা। তোমরা ঝোলা গাঁঠরী রেখে এখানেই স্নান পূজা কর। আমি এখান থেকেই বিদায় নিব। আর তোমাদের সঙ্গে যাব না। এখান থেকে মাইল সাতেক এগিয়ে গেলেই তোমরা মশানিয়া কোটেশ্বরে গিয়ে পৌঁছতে পারবে। মশানিয়া কোটেশ্বর বড় ভয়ঙ্কর স্থান, নর্মদা তটের অন্যতম মহা শ্মশান। সেখানে নর্মদা-তটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাযোগী ভূগর্ভে বাস করেন, খুব সাবধানে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করবে। কোন বিশেষ কারণে আমি তাঁর আশ্রমে প্রবেশ করব না। সেখানকার লোকজনের কাপালিক মূর্তি, হাতে কৃপাণ খড়্গ্ প্রভৃতি দেখে তোমরা মোটেই ভয় পাবে না, সেই মহাযোগী যে ভূগর্ভে বাস করেন, তার চারপাশে কাঁটার বেড়া, কেউ বাধা না দিলে তোমরা নির্ভয়ে প্রবেশ করবে। লোকজনের ভিড় এড়াবার জন্যই সেখানে তাঁর শিষ্যরা তাঁরই নির্দেশে ঐ রকম ভয়প্রদ পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে। মহাযোগী নিজে মহা শৈব, শব্দ বিজ্ঞানের চাবি কাঠি তাঁর হাতে। সেই স্থানে শব্দ নিরন্তর প্রকটিত আছে। পরিক্রমাবাসীরাও সেখানে প্রবেশ করতে পারেন না। তাঁর লোকজনের অনুমতিক্রমে যদি সেখানে প্রবেশ করতে পার, তার গুহার কাছে গেলেই শুনতে পাবে, কেউ যেন গুহার মধ্য থেকে গেয়ে চলেছেন –

> গগন মণ্ডল বীচ্ মেঁ, যাঁহা সোহংগম ডোরি।
> শব্দ অনাহত হোত হৈ সুরত লগী তাঁহা মোরি।
> হৃদয় কমল প্রকাশিয়া, উগা নির্মল সুর।
> রৈণ আঁধারী মিটি গই, বাজে অনহদ তূর॥
> শূন্য মণ্ডল মেঁ ঘর কিয়া, বাজৈ শবদ রসাল।
> রোম রোম দীপক ভয়া, প্রগটে দীনদয়াল॥

এই বিচিত্র শব্দ ঝংকার কেবল স্থূল কর্ণেই শুনবে না, অন্তর পটেও 'সোহহং সোহহং' নাদের সঙ্গে উজ্জ্বল জ্যোতির প্রকাশও দেখতে পাবে। সবই মা নর্মদার দয়া! রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে মা বললেন – এবার যাওয়ার আগে হরবোলাজী! তোমার একটি গান শুনে যাই। তাঁর কথা শুনে রঞ্জন বাউল আনন্দে গদ্‌গদ্ হয়ে একতারা বাজিয়ে গাইতে লাগলেন –

> তোমরা কেউ পারবে না গো,
> পারবে না ফুল ফোটাতে।
> যতই বলো, যতই করো,
> যতই তারে তুলে ধরো,
> ব্যগ্র হয়ে রজনী দিন
> আঘাত করো বোঁটাতে।
> তোমরা কেউ পারবে না গো

পারবে না ফুল ফোটাতে ॥
যে পারে সে আপনি পারে,
পারে সে ফুল ফোটাতে।
সে শুধু চায় নয়ন মেলে
দুটি চোখের কিরণ ফেলে
অমনি যেন পূর্ণ প্রাণের মন্ত্র লাগে বোঁটাতে।
যে পারে সে আপনি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে,
আসমান্ হতে নাদের ফুল
আসবে নেমে ধরাতে ॥

রঞ্জনের গান শেষ হল, চোখ বন্ধ করে রঞ্জন আবেগ ভরে একতারাতে ঝঙ্কার তুলছিলেন এতক্ষণ, আমিও চোখ বন্ধ করে তন্ময় হয়ে গান শুনছিলাম। গানে শেষে চোখ খুলতেই সামনে উপবিষ্টা যুক্তেশ্বরী মাকে দেখতে পেলাম না। চমকে উঠে দুজনেই তাঁকে যতদূর দৃষ্টি যায় বিস্তৃত তটরেখা ধরে, নর্মদা গর্ভের বাল্মীকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের ভিতরে এবং মন্দিরের বাইরে চারদিক আঁতিপাতি করে খুঁজলাম। কিন্তু নাঃ, যুক্তেশ্বরী মাকে কোথাও দেখতে পেলাম না। মা চলে গেছেন।

শ্রীশ্রীযুক্তেশ্বরী মা অন্তর্হিতা হতেই আমাদের মন বিষাদে ভরে গেল। আমরা কিছুক্ষণ বাল্মীকেশ্বর মহাদেবের সামনে মনমরা হয়ে চুপ করে বসে থাকলাম। 'জয় ভোলে বাবা, জয় শিব শম্ভু' শব্দ শুনে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, কয়েকজন লোক দুধ মিছরি এবং নানাবিধ ফলমূল নিয়ে মহাদেবের পূজা করতে এসেছেন। তাঁরা মহাদেবের অর্চনা করে আমাদেরকে বললেন – হমলোগ্ বরছা ও বেরুগাঁও সে আ রহে হৈ। আপ্ পরকরমাবাসী বা ? ধন্য হো। মহর্ষি বাল্মীকিজীনে য়হাঁ তপস্যা করকে ইন্ মহাদেও কো প্রতিষ্ঠা কিয়ে থে, উন্‌কা তপকে প্রভাব সে হিঁয়া উনকা কবিত্ব শক্তিকা স্ফুরণ ইয়া জাগৃতি হুয়া থা, উন্‌হোনে আদি কবিকা পদ প্রাপ্ত হুয়া। আপ্ কিরপা করকে হমারা ভেট লেজিয়ে। যদ্যপি ইয়ে শূলপাণি ঝাড়ি কি উপান্ত হ্যায়, তবভি হমলোগ ভরোসা দেতে হেঁ, আপ্ মন্দিরকা অন্দর মেঁ আজ ঠারিয়ে। কাল সুবে সুবে হিঁয়াসে মিলভর যানে সে আসাগ্রামমেঁ যাকর্ কপালেশ্বর মহাদেব ঔর আসাগ্রাম সে মিলভর যানেসে পঞ্চমুখী হনুমানজীকো শ্রীমূর্তিকা দর্শন করনে সেকেগা। শ্রী হনুমানজীকে পাঁচমুহ হৈ, স্থান দর্শনীয় হৈ। কপালেশ্বর ভগবান তো স্বয়ম্ভূলিঙ্গ হৈ। হর পরকরমাবাসী উহ্ দো পাবনতীর্থ মেঁ যাতে হেঁ।

তাঁদের কথা শুনতে শুনতেই আমি রঞ্জনকে বললুম – গ্রামবাসীদের কথা আমার খুবই মনঃপূত হয়েছে। একরাত্রি এই মন্দিরে থেকে গেলে মন্দ হয় না। মা তো আমাদেরকে স্পষ্ট করে কিছু বলে যান নি। তোমার গান শুনতে শুনতে চোখ বন্ধ করে আমরা দুজনেই যখন বিভোর ছিলাম, তখন সহসা তাঁর অন্তর্ধান ঘটেছে। আজ রাত্রিটি এখানে থেকেই দেখি না! মা তো ফিরে আসতে পারেন! তাছাড়া আমরা যখন শূলপাণির ঝাড়িতে প্রায় পৌঁছে গেছি, তখন অপরাহ্ন বেলায় এ পথে বেশী এগিয়ে যাওয়া মোটেই নিরাপদ হবে না।

মিনিট খানিক এভাবে দুজনে শলাপরামর্শ করে নিয়েই তাঁদেরকে জানালাম যে – আপনাদের কথাই শিরোধার্য। আজ আমরা এ মন্দিরেই থাকব। তাঁরা খুশী মনে প্রচুর ফল মিষ্টি আমাদের সেবার জন্য রেখে দিয়ে চলে গেলেন। রঞ্জন জানাল, তার ঘড়িতে তখন বেলা ১টা বেজেছে। আমরা মন্দিরের মধ্যে বাল্মীকেশ্বর লিঙ্গ হতে বেশ কিছুটা দূরে মন্দিরের পূর্ব ও পশ্চিম কোণ ঘেঁসে নিজেদের আসন বিছালাম। নর্মদার ঘাটে নেমে দুজনেই হাত মুখ ধুয়ে এসে ফলাহার করলাম। মন্দিরের দরজা নূতন কাঠে তৈরী করা

হয়েছে বলেই মনে হল। মন্দির যত প্রাচীন, মন্দিরের দরজা তত প্রাচীন নয়। আসন বিছিয়েই আমরা মন্দিরের বারান্দায় এসে বসলাম। সামনেই নর্মদার পুণ্যপ্রবাহ। যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু বন আর বন, মহুয়া, গাব, সেগুন, নিম, মহানিম, অশ্বত্থ, বট আর অর্জুন গাছের জটলা, অদূরে পাহাড়ও দেখা যাচ্ছে। রঞ্জন মন্দিরের দেওয়ালে ঝিমাতে লাগল, আমার চোখ কিন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে, কেবলই মনে হচ্ছে এই হয়ত হঠাৎ কোন দিক দিয়ে যুক্তেশ্বরী মা যে কোন বনান্তরাল হতে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হবেন। বরাছা গ্রামের লোকেরা আমাদেরকে জানিয়ে গেল, আমরা নাকি শূলপাণির ঝাড়ির উপান্তভাগে এসে পৌছে গেছি। এখানকার পরিবেশ এবং দূরে সুউচ্চ পাহাড় শ্রেণী এবং ঘন বনের দৃশ্য দেখে আমার নিজের মনেও বিশ্বাস জন্মেছে, আর 'হয়ত' নয়, সত্য সত্যই আমরা শূলপাণির জঙ্গলের মধ্যে দু'একদিনের মধ্যেই প্রবেশ করতে পারব। আর বাস্তবেই তাই যদি ঘটে, তাহলে ত সামনে আমাদের ভয়ঙ্কর, মহাভয়ঙ্কর জঙ্গল এবং তার ভয়াবহ পরিবেশ, ততোধিক ভীতিপ্রদ অতি হিংস্র জন্তু জানোয়ার তাদের নখ দন্ত বিস্তার করে থাবা উঁচিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। উত্তরতটেও আমি শূলপাণির ঝাড়ির কিয়দংশ অতিক্রম করে এসেছি। সেখানেই আমার সাথী পরিক্রমাবাসীদের মুখে শুনে এসেছি যে, নর্মদার এই দক্ষিণতটের শূলপাণির ঝাড়িই নর্মদাখণ্ডের অন্যান্য সমূহ ঝাড়ির চেয়ে কঠিনতম এবং প্রচণ্ডতম। নর্মদার এই অংশেই হিংস্র জন্তুর উপদ্রব বেশী। জঙ্গলের ভীষণতা, জন্তু জানোয়ারদের অত্যধিক দৌরাত্ম্য ছাড়াও এই ৫০ ক্রোশ দীর্ঘ ঝাড়িপথে ভীলদের বসবাস। এরা গহন অরণ্য এবং পাহাড়ের কোল হতে সহসা বেরিয়ে এসে পরিক্রমাবাসীদের ঝোলায় আটা, জোয়ার ডাল কৌপীন গাত্রবস্ত্রাদি টাকা পয়সা যা পায় সবই নিঃশেষে লুণ্ঠন করে নেয়। তারা অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় বিষাক্ত তীর, ধনুক, কামটা বল্লম কুঠার হস্তে সাধুদের উপর আক্রমণ চালায়, বাধা দিলে সঙ্গে সঙ্গে সাধুদেরকে হত্যা করতেও তাদের হাত কাঁপে না। ওঁঙ্কারের ঝাড়িপথের চেয়ে ভয়ঙ্কর এই পথ! মনে মনে এই সব ভাবতে ভাবতেই আশা করছি, এই রকম কঠিন পথের সামনে রেখে কি, কিছু মাত্র সাবধান না করেই যুক্তেশ্বরী মা না বলে কয়ে চলে যেতে পারেন? নিশ্চয়ই তিনি ফিরে আসবেন। আমরা যে আজ বাল্মীকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরেই রাত কাটাবো সর্বজ্ঞা মা তা জানেন বলেই ঐভাবে সহসা অন্তর্হিতা হয়ে গেছেন। নর্মদাতটের প্রতিটি স্থানই সিদ্ধক্ষেত্র। মা হয়ত কাছাকাছিই কোন স্থানে আছেন। এলেন বলে! আমার দুটো চোখ সতৃষ্ণ নয়নে চারদিকে ঘুরে বেড়াতে থাকল। রঞ্জনের মৃদু নাসিকা গর্জন শুনে আমি নিশ্চিন্ত মনে মন্দির হতে নেমে পূর্বদিকে কিছুটা হেঁটে চললাম। সূর্য অস্তাচলের পাটে বসেছেন দেখে ফিরে এলাম মন্দিরে। কি জানি, মা হয়ত ইতিমধ্যে অন্য কোন পথ দিয়ে মন্দিরে এসে পৌছে গেছেন! মাকে কিন্তু কোথাও দেখতে পেলাম না! মন্দিরে বসে রঞ্জন যথারীতি দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে অকাতরে ঘুমাচ্ছে। মনটা বড় দমে গেল! আদিকবির তপঃক্ষেত্রে বসে তাঁর রচিত রামায়ণে রামচন্দ্রের প্রতীক্ষায় মাতঙ্গ মুনির আশ্রমে বসে শবরীর যেভাবে কাল কেটেছিল, সেই করুণ দৃশ্য আমার চোখে ভেসে উঠল। 'শবরীর প্রতীক্ষা' নাম দিয়ে বাঙালী কবি 'যতীন্দ্র মোহন বাগচী প্রণীত কবিগুরু-নামক একটি চিত্রকাব্য, ম্যাট্রিক পড়ার সময় যা মুখস্থ করেছিলাম তাই আমি গুণগুণ করে আওড়াতে লাগলাম, বাংলাদেশ হতে বহুশত মাইল দূরে নর্মদা তটে বাল্মীকিরই আশ্রমে বসে. দুই চোখে তখন জলের ধারা –

অপেক্ষার একাগ্রতা উগ্রতর করি তাই চোখে,
বনবীথি-তলে তলে ফিরে বালা মুগ্ধ দিবালোকে –
উচ্চকিত অনুক্ষণ; তপস্যার কাল বয়ে যায়!
আসিয়া থাকেন যদি অন্য পথে, ভাবিয়া ত্বরায়

আবার আশ্রমে আসে ! শয্যা রচি কুসুমে-পল্লবে
যাপে দীর্ঘ বিভাবরী পথ চেয়ে, বাঞ্ছিত বল্লভে !
কোথায় সে সীতাপতি, মূর্তিমান্ অখিলের স্বামী ?
অপেক্ষায় কাটে দিন ; অন্ধকার চক্ষে আসে নামি ।

সেদিন শবরী যেমন ভাবে রামচন্দ্রের জন্য উৎকণ্ঠায় কাল কাটিয়ে ছিলেন, ছোটমুখে বড় কথা হবে জেনেও আমি বলতে পারি, যুক্তেশ্বরী মায়ের জন্যও আমি সেদিন প্রায় সেই রকম উৎকণ্ঠিত ও কাতর হয়ে উঠেছিলাম ! সহসা রঞ্জন জেগে উঠতেই আমি দ্রুত চোখ মুছে বললাম – চল নর্মদা স্পর্শ করে আসি । সন্ধ্যা হয়ে গেছে । নর্মদায় সন্ধ্যা করে এসে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে আমি শুয়ে পড়লাম । রঞ্জন তার একতারাটি নিয়ে গান ধরল –

জয় শিবশঙ্কর হর ত্রিপুরারি, পাশী পশুপতি পিণাকধারী ।
শিরে জটাজূট, কণ্ঠে কালকূট, সাধক-জন-গণ-মানস-বিহারী ॥
ত্রিলোক পালক ত্রিলোক নাশক, পরাৎপর প্রভু মোক্ষ বিধায়ক,
করুণানয়নে হের ভকতজনে, লয়েছি-শরণ-চরণে তোমারি ।

রঞ্জনের গান বা গানের মাধ্যমে আরতি শেষ হতেই দরজায় যেন কেউ মৃদু করাঘাত করছে শুনতে পেলাম । আমি একলাফে উঠে গিয়ে তাড়াতাড়ি করে দরজা খুললাম । কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না । বিছানা হতে টর্চটা নিয়ে গিয়ে টর্চের আলোতে এদিক ওদিক দেখতে লাগলাম । সামনে নর্মদার জল চিক্ মিক্ করছে, কাকস্য পরিদেবনা ! রঞ্জন আমার হাত ধরে মন্দিরের ভিতর টেনে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল । আমাকে ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলতে লাগল– আপনার কি হয়েছে বলুন ত ? আজ বিকাল থেকেই আপনাকে বড়ই উদ্‌ভ্রান্ত এবং বিচলিত দেখছি । আমার মনে হয়, আপনি প্রতি মুহূর্তে যুক্তেশ্বরী মায়ের এখানে পুনরায় দর্শনের প্রত্যাশা করছেন । আমার ধারণা যদি ঠিক হয়, তাহলে বলব, আপনি ঘোর ভুলের মধ্যে পড়ে অযথা কষ্ট পাচ্ছেন । আপনিই ত আমাকে মার সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, মা ব্রহ্মময়ী । এই যদি আপনার অনুভব, তাহলে আপনি স্থির জানবেন, তিনি সেই বেলা ১১টার সময়েই এখান হতে অন্তর্হিতা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওঁঙ্কলেশ্বরের মন্দিরে, তাঁর স্বস্থানে পৌছে গেছেন । এখন হয়ত ওঁঙ্কলেশ্বর ভগবানের সামনে ধ্যানানন্দে নিমগ্না আছেন । জীবন্মুক্ত বা জীবযুক্ত যাঁরা, অর্থাৎ তাঁরা এই plane এ চোখ বন্ধ বা মন উঠিয়ে নেওয়া মাত্রই অন্য plane এ গিয়ে চোখ খোলেন । সামনা সামনি থাকলে তাঁদের যে টান লক্ষ্য করা যায়, দূরে সরে গেলেই তাঁরা সব ভুলে যান । আপনার মত জ্ঞানীকে আমি আর বুঝাব কি ? শান্তমনে রাত কাটিয়ে আমাদের সংকল্পিত পরিক্রমা পথে বেরিয়ে পড়াই এখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য । এ পথে sentiment বা ব্যক্তিগত টান অটানের কোন মূল্য নাই । আমি তাঁর কথার কোন জবাব দিলাম না । আসনে বসে জপে মন দিলাম ।

জপ করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়লাম । ঘুম ভাঙতেই দরজা খুলতেই দেখি সকাল হয়ে গেছে । রঞ্জনকে জাগিয়ে দিয়ে নর্মদায় স্নান করতে গেলাম । স্নান করে এসে দেখি, রঞ্জন ইতিমধ্যেই দুজনেরই বিছানা পত্র বেঁধে ফেলেছে । 'নর্মদাকে চোখে চোখে রেখেই ত আমাদেরকে যেতে হবে, নর্মদারই ধার ধরে । কাজেই গ্রামবাসীদের কথিত আসা বা পঞ্চমুখী হনুমান কিংবা ভালোদে গিয়ে স্নান করব । এখন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়াই ভাল,' এই কথা বলে রঞ্জন মহাদেবকে প্রণাম করলেন । আমিও বাল্মীকেশ্বরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বেরিয়ে পড়লাম পথে । তখন পাহাড়ের উপর সূর্যোদয় হচ্ছে । ক্রমে পাহাড় শ্রেণীর শীর্ষদেশ এবং বনান্তরাল হতে ধীরে ধীরে সূর্যরশ্মি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে । যতই এগোচ্ছি, ততই যে বন গভীর হচ্ছে তা বুঝতে পারলাম । উঁচু নিচু পথ, প্রস্তরাকীর্ণ কিন্তু প্রকৃতির

শোভা বড়ই অপরূপ। কখনও উঁচুতে উঠছি, কখনও নিচুতে, এইভাবে প্রায় ৪০ মিনিট হেঁটে আমরা আসা গ্রামে একটি মন্দিরে এসে পৌছলাম। এত সকালেই মন্দিরে পুরোহিত মশাইকে পূজার আয়োজন করতে দেখে আশ্চর্য হলাম। তিনি নিজেই বললেন যে, তাঁর ঐ গ্রামেই বাস। তিনি আমাদেরকে মন্দির এবং মন্দিরস্থ মহাদেবের পরিচয় দিতে গিয়ে জানালেন যে – হমারে শিবজী তো ঔঘড়দানী হৈ। একবার উনোনে কাপালিক ভেষমেঁ কপাল হাত মেঁ লেকর ভিক্ষাকে নিমিত্ত নিকলে। ইঁয়া নর্মদা কিনারে আকর উনকে হাত সে উহ্ নরকপাল গির গয়া। মহাদেবজী উসে উঠানে লগে উহ্ উঠে হী নহীঁ, উধায় হি চিপক গয়া, জম গয়া, অব শিবজী চিন্তিত হুয়ে, উসে খোদকর নিকলেনে কা উদ্যোগ করনে লগে। ইতনেমেঁ হী কহী সে ঘুমতে ঘামতে নারদজী উহাঁ আ পহুঁচে। শিবজীকী ঐসী লীলা দেখকর বহুৎ হঁসে ঔর বলে – মহারাজ ইয়ে ক্যা কৌতুক কর রহে হৈঁ ?

শিবজী নে কহা – হমারা কপাল জম গয়া হৈ, ইসে খোদকর নিকাল রহে হৈঁ।

নারদজীনে কহা – 'অজী, মহারাজ! ক্যা আপ ইসী ছোটী বাত্‌কে লিয়ে পরিশ্রম কর রহে হৈ। আপ্ কৈলাস চলিয়ে সব নিকাল আবেগা।'

পুরোহিতজী এইভাবে সরল হিন্দীতে কপালেশ্বর মহাদেবের উদ্ভবের কাহিনী এমন সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, তাতে আমরা বুঝতে পারলাম যে নারদের কথায় ভোলানাথ সেখান হতে অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এক স্বয়ম্ভু লিঙ্গের আবির্ভাব ঘটে ছিল। আমাদের সামনে বিরাজমান প্রায় ১½ ফুট উঁচু ঘন কৃষ্ণবর্ণের সেই মহাদেবের নামই কপালেশ্বরজী। আমরা দুজনে সেখানে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে পুরোহিতজীর নির্দেশে 'হর হর বম মহাদেও' মন্ত্রে গালবাদ্যি করতে করতে আবার বনপথে পা বাড়ালাম। বনপ্রকৃতির শোভা মনোহারিণী। মিনিট কুড়ি হাঁটার পরেই পথই আমাদেরকে একটা শ্যামশোভা মণ্ডিত ছোট পাহাড়ের উপর টেনে আনল। রঞ্জনের এই মনোরম পরিবেশে প্রকৃতির কোলে বসে কিছুক্ষণ রোদ পোয়াতে ইচ্ছা হল। তাঁর শিল্পী মন এখানে কী যে খুঁজে পেল তা বুঝলাম না, তবে আমরা যেখানে বসলাম; আমাদের পেছনের ঢালুতে আসান অর্জুন, খ, করম, শাল, পিয়াল, আমলকী বনের শোভা দেখে থ মেরে গেলাম। একটু দূরে বনের মাথা ছাড়িয়ে আর একটা পাহাড় ঠেলে উঠেছে দেখতে পেলাম। কি যে অনুভূতি হয় এখানে বসে চুপ করে চোখ বুজে থাকলে! বনের সবুজ গাছপালা থেকে কেমন সুন্দর একটা মিষ্টি গন্ধ। সোনালী রোদ, বনের গাছপালার ডালে ডালে কত সব বিচিত্র পাখীর ডাক। বাংলাদেশের পরিচিত পাখী নয় এরা। এখানে যে সব পাখী ডাকছে [illegible] আমি বা রঞ্জন দুজনেরই কেউ শুনি নি। তবে এই সবু বিচিত্র সুন্দর পাখীদের মধ্যে, বনটিয়া এবং ধনেশ পাখীর ডাক আমরা দুজনেই চিনি। পাহাড় ও বনের পটভূমিতে বুনোপাখীদের সঙ্গীত এই নিস্তব্ধ স্থানে মনকে যে বিরাটের দিকে টেনে নিয়ে যায়, তা আর একবার অনুভব করলাম।

আমি ধ্যান নিবিষ্ট রঞ্জনকে ঠেলা দিয়ে বললাম – ওহে রসিক শিল্পী, এভাবে এখানে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলে চলবে না, বরছা গ্রামের ভক্তদের কথা মনে কর। তাঁরা আমাদেরকে হুঁসিয়ার করে দিয়েছেন যে এখন আমরা ক্রমেই শূলপাণির অভ্যন্তর ভাগের দিকে এগোচ্ছি। তাকে হাত ধরে টেনে তুললাম। পাহাড়ের অপর ঢালের দিকে তাকিয়ে একটি সুস্পষ্ট পথরেখা ধরে আমরা একেবারে নর্মদা কিনারে এসে বেলা প্রায় ৯টার সময় পঞ্চমুখী হনুমানের মন্দিরে পৌছে গেলাম। মন্দিরের দরজা খোলাই ছিল। পঞ্চমুখ বিশিষ্ট হনুমানজীর মূর্তি দেখে আমরা খুবই অবাক হলাম। হনুমানজীর মূর্তিটির এমনই গঠন পরিপাট্য যে সহসা বুঝে উঠা যায় না এটি কোন স্থাপিত মূর্তি না পাথর ভেদ করে হনুমানজীর স্বয়ম্ভু কোন মূর্তি প্রকট হয়েছে ? আমরা দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, হঠাৎ 'শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম' শব্দে চমকে উঠে পিছন ফিরতেই দেখি, একজন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর

বয়স্ক ব্রাহ্মণ নর্মদার ঘাট থেকে এক কলসী জল নিয়ে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি আমাদেরকে জানালেন — এইস্থানে হনুমানজী তপস্যা করেছিলেন। রামায়ণে এবং তুলসীদাসজীর রামচরিতমানসে হনুমানজী যে মহাদেবের অংশে মহাদেবের তেজ হতে উৎপন্ন হয়েছিলেন সে কথার স্পষ্ট আভাস থাকলেও এইখানে তপস্যা করেই মহাবীর শিবত্ব অর্জন করেছিলেন। তাই পঞ্চাননের পঞ্চমুখের আভাস আভাসিত হয়েছে এই মূর্তিতে। আমি মন্দিরে ঢোকার আগে যে ত্রয়োদশাক্ষর রামমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে এসেছিলাম, এখানকার সিদ্ধমন্ত্র ঐ ত্রয়োদশাক্ষর রামবীজ। মহাবীর ঐ মন্ত্র জপেই স্বরূপে স্থিতিলাভ করেছিলেন। এই মন্ত্রই এখানকার পূজার মন্ত্র, জপ্যমন্ত্র।

আমি তাঁকে বিনম্র কণ্ঠে বললাম – পণ্ডিতজী! মারাঠা বীর শিবজী মহারাজের গুরু সমর্থ রামদাস স্বামীও ঐ মন্ত্রের প্রবক্তা, তিনি সকলকেই ঐ মন্ত্রেই দীক্ষা দিতেন। শিবাজীও তাঁর কাছে ঐ ত্রয়োদশাক্ষর অভয় অমৃত রামবীজ প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে শুনেছি।

– হো সকতা হৈ। শুধু সমর্থ রামদাসজী কেন, রামের উপাসক যে কোন সিদ্ধ সাধকই ঐ মন্ত্র হনুমানজীর দয়ায় লাভ করতে পারেন। তবে ঐটাই সারসত্য জানবেন যে হনুমানজীই ঐ মন্ত্রের দ্রষ্টা। সকল রাম সাধকই হনুমানজীর শিষ্য এবং ভক্ত।

আমরা তাঁর কথা মেনে নিয়ে প্রণামান্তে তাঁকে পরবর্তী তীর্থগুলির পথ নির্দেশ চাইলাম। তিনি বললেন – আপনারা আসাগ্রামের কপালেশ্বর মন্দির হতে মাত্র এক মাইল এগিয়ে এসেছেন, এই পঞ্চমুখী হনুমানজীর মন্দির হতে আরও মাইল খানিক বনপথে গেলে পুণ্যতীর্থ তারকেশ্বরে পৌছবেন। এমনিতে নর্মদার ঘাটে ঘাটে তীর্থ। বিভিন্ন দেবতা এবং বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষিরা নর্মদাতটের বিভিন্ন স্থানে তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কিন্তু সব ঘাটের সব তীর্থ কোন পরিক্রমাবাসীর পক্ষেই গন্তব্যস্থল নয়। কারণ, নর্মদাতটবর্তী বিভিন্ন তীর্থে পাহাড়ের উপর থেকে অনেক ঝর্ণা এবং ছোট ছোট নদীর সঙ্গে নর্মদার সঙ্গম হয়েছে। উত্তাল জলস্রোত এবং বড় বড় পাথর অহরহ গড়িয়ে পড়ছে বলে অনেক তীর্থই দুর্গম ও অগম্য হয়েছে। বশিষ্ট সংহিতা, স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত রেবাখণ্ড এবং বায়ুপুরাণের অন্তর্গত রেবাখণ্ডে যে শত শত তীর্থের নাম আছে তা কারও পক্ষে পরিক্রমা করা সম্ভব নয়। আমি নিজেও একবার নর্মদার উভয় তট পরিক্রমা করেছি, তার মধ্যে যেগুলি পরিক্রমা না করলে পরিক্রমা সম্পূর্ণ হয় না, আমি বিশেষ করে সেই গুলির নাম করছি। এখান থেকে মাইল খানিক এগিয়ে গেলে তারকেশ্বর তীর্থে পৌছাবেন। তারকেশ্বর হতে সামনে পাহাড়ের দিকে উঠে নিচের দিকে নামলে যে রাস্তা পাবেন অন্য একটি পাহাড়ের শীর্ষদেশের দিকে, সেখান থেকে পাহাড়ে পদরেখা অঙ্কিত পদচিহ্ন ধরে এগিয়ে গেলে গৌঘাট, কর্সনপুরী তীর্থের দর্শন পাবেন। হাঁটতে হাঁটতে আপনাদের কেবলই মনে হবে, যেখান থেকে আপনারা যাত্রা করেছিলেন, যেন সেই স্থানেই ফিরে যাচ্ছেন। তা হোক, অজানা পথে পরিক্রমা করতে বেরুলে জঙ্গল ও পাহাড়কীর্ণ পথে ২/৪ দিন এরকম প্রায় সকলকেই ঘুরপাক খেতে হয়। পরিক্রমাবাসীদের ত কোন ধরা বাঁধা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিক্রমাবাসীকে স্বস্থানে ফিরতে হবে, এমন কোন নিয়ম নাই। তাঁরা কারও গোলাম নন, কারও অধীনও নন। কাজেই গৌঘাট ও কর্সনপুরী দর্শন করে আপনারা অতি অবশ্যই ভালোদে যাবেন। নর্মদার এই দক্ষিণতটে ভালোদকে মোক্ষপুরী বলা হয়। তাছাড়া ঐটি বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি গৌতমের তপস্যাস্থল। বর্তমানে সেখানে অনামী বাবা নামে এক অর্ধোন্মাদ মুক্তপুরুষ বাস করেন। তাঁর সঙ্গ করেও আপনারা আনন্দ পাবেন। মহাত্মা কবীরজীর একটি কথা কি আপনাদের জানা আছে?

অলখপুরুখ কা আরসী সাধুহি কা দেহ,
মিন্ অলখ কা লখ্ চাহে উনচরণ মেঁ লীন রহো।

অলক্ষ্য পরম পুরুষের আয়না হচ্ছে সাধুরা। আয়নায় যেমন মুখ দেখা যায়, তেমনি সাধুদের দেহে তাঁর প্রকাশ দেখা যায়। কাজেই সেই অলখ পুরুষের দর্শন পেতে হলে সাধুর চরণে লীন হওয়া, তাঁদের দর্শন ও সঙ্গ করা ভগবদ্-ভক্তগণের অবশ্য কর্তব্য।

এই বলে তিনি পথ দেখিয়ে দিলেন। আমরা সেই পথে মাইল খানিক হেঁটে তারকেশ্বর তীর্থে পৌছে গেলাম। নর্মদা তটের এই মহাদেব দেখে আমি চমকে গেলাম। কারণ, আমাদের বাংলাদেশে হুগলী জেলায় অবস্থিত তারকেশ্বর মন্দিরে আমি বহুবার গেছি। সেখানের তারকেশ্বর লিঙ্গের অনুরূপ এখানকার তারকেশ্বরও। তাঁরও যেমন যোনিপীঠ আছে, এঁরও তেমনি যোনিপীঠ আছে, অর্থাৎ উভয়লিঙ্গের কেউই জ্যোতির্লিঙ্গ নন। কেননা, উত্তরতট পরিক্রমাকালে মহাত্মা প্রলয়দাসজী আমাকে একদিন জানিয়েছিলেন যে, যিনি জ্যোতির্লিঙ্গ হন, তাঁর কোন যোনিপীঠ থাকে না। নর্মদার উত্তরতট পরিক্রমাকালে আমি ওঁঙ্কারেশ্বর দর্শন করে এসেছি। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের তিনি অন্যতম, তাঁর কোন যোনিপীঠ নাই, প্রণবপীঠ প্রণবাকৃতি ওঁকারেশ্বর পর্বত ভেদ করে ঐ জ্যোতির্লিঙ্গ প্রকট হয়েছেন। হিমালয় পরিভ্রমণকালে আমি গৌরীকেদারও দর্শন করে এসেছি, তাঁরও কোন যোনিপীঠ নাই, তিনিও জ্যোতির্লিঙ্গ। কাশীতে কেদারঘাটে এর অনুরূপ, যেন একটি ধামা উল্টানো আছে, এইরকম আকৃতির একটি বড় শিবলিঙ্গ আছেন, তাঁর কিন্তু যোনিপীঠ আছে অর্থাৎ কাশীর কেদারনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ নন। কাশীখণ্ডে কিন্তু জ্যোতির্লিঙ্গ স্বয়ম্ভু লিঙ্গ ইত্যাদি বিশেষণে তাঁকে বিশেষিত করা হয়েছে। যাক্ এই সব কথা ভাবতে ভাবতে আমি আর রঞ্জন প্রায় দুই মাইল তটরেখা ধরে হাঁটতে হাঁটতে গৌঘাটে এসে পৌছলাম। বেলা সাড়ে দশটা বেজে গেছে। পথ চলতে চলতেই আমাদের মনে হয়েছিল আমরা যেন বাল্মীকেশ্বর মন্দিরের দিকেই ফিরে যাচ্ছি। কারণ, আমরা যে ছোট্ট পাহাড়টির উপর দিয়ে যাচ্ছি, আজ সকালেই আসাগ্রামে কপালেশ্বর হতে যাত্রা করার সময় যে পাহাড়টির মনোরম শোভা দেখে রঞ্জন কিছুক্ষণ বসে রোদ পোয়াচ্ছিল, সেই পাহাড়টিকে পার্শেই দেখতে পাচ্ছি। আমরা ক্রমে একটি পাকদণ্ডী পেলাম। খুব সাবধানে বনের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে আমরা একজন পথচারীকে জিজ্ঞাসা করতেই গৌঘাটের সন্ধান পেলাম। এখানে গোদাবরী নদীর একটি শাখা এসে নর্মদার সাথে মিলিত হয়েছে। রঞ্জনের ইচ্ছা হল, এই নর্মদা ও গোদাবরীর সঙ্গমস্থলে স্নান করতে। সে স্নান করতে নামল, আমি মাথায় সঙ্গমের জল ছিটিয়ে রেবা মন্ত্র জপ করতে থাকলাম। স্নান ও জপাদির পর তিনজন গ্রামবাসীকে দেখলাম, তাঁরাও সঙ্গমে স্নান করতে এসেছেন। এখানে এই জঙ্গলের মধ্যে গ্রাম কোথায় জিজ্ঞাসা করতেই তাঁরা জানালেন, এই গৌঘাটের পার্শেই সরসাড় গ্রামে আমাদের বাড়ী, এখানকার জঙ্গল ও পাহাড় দেখে আপনারা ঘাবড়াবেন না। শূলপাণির ঝাড়ির উপান্তভাগ হলেও পার্শ্ববর্তী স্থানে ভগবান বিষ্ণুর দয়ায় এখানে কোন হিংস্র জন্তুর উপদ্রব নাই। আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামস্থিত দেবেশ্বর গ্রামকে দেবেশ্বর তীর্থ নামে অভিহিত করা হয়। স্বয়ং বিষ্ণুর তপস্যাস্থল। এখান হতে কিছু দূরেই বড়বানা নামেও একটি তীর্থ আছে। সেখানে তপস্যা করেই ইন্দ্র গৌতম ঋষির অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। শাপমুক্ত ইন্দ্র মনের আনন্দে যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন তাঁর নাম শক্রেশ্বর। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমরা স্নান করেই আপনাদেরকে শক্রেশ্বর মন্দিরে নিয়ে যাব। দেখে মনে হচ্ছে আপনারা পরিক্রমাবাসী। মধ্যাহ্নকাল হতে যাচ্ছে। আমাদের গ্রাম হতে আপনাদেরকে অভুক্ত যেতে দিব না।

এই কথা বলেই তাঁরা স্নান করতে নামলেন। দ্রুত স্নান সেরেই তাঁরা আমাদেরকে উপস্থিত করলেন শক্রেশ্বরের মন্দিরে। এখানে নর্মদাতটের উপরেই একটি প্রাচীন মন্দির। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় মন্দিরে পুরোহিত ছিলেন। তাঁর পূজা সবে মাত্র শেষ হয়েছে, তিনি দরজা বন্ধ করার উপক্রম করছিলেন সেই সময় আমরা উপস্থিত হলাম। মন্দিরের

মধ্যে ঢুকে শক্রেশ্বরের বেগুনী রং-এর শিবলিঙ্গ দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমরা মহাদেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করে উঠতেই পুরোহিতজী জিজ্ঞাসা করলেন – আপ কঁহাসে আ রহে?

– গৌঘাট সে। সুবে হমলোগ যাত্রা কিয়ে থে বাল্মীকেশ্বর তীর্থ সে।

– বহুৎ আচানক বাত হৈ। আপনে জরুর পথ ভুল কিয়ে থে। কাঁহা বীরমগ্রামকা বাল্মীকেশ্বর ঔর কাঁহা ইস্ গৌঘাট কা নজদিগ শক্রেশ্বরজীকা মন্দির। সাথমে অভিজ্ঞ পরিক্রমাবাসী না রহনেসে এ্যায়সা ভুল হবেই করেগা। ইধরকা প্রকৃতিমায়ীকা রূপ দেখিয়ে না। চারো তরফ দেখেনেসে মালুম হোগা ক্যায়েসে সারি সারি পাহাড় লেট রহে। অভিজ্ঞ সাথী না রহনেসে পাহাড়োঁ কা ভুল ভুলায়া মেঁ যাত্রীকো পথ ভ্রম হো যাতা হৈ। পুরোহিতজীর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই সরসাড় গ্রামের সেই তিন জন গ্রামবাসী আমাদের জন্য চারটি বেসনের লাড্ডু এবং ৫টি কলা নিয়ে উপস্থিত হলেন। আমরা শক্রেশ্বর মহাদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে দুজনে তা ভোজন করলাম। গ্রামবাসীদেরকে শিবং ভূয়াৎ বলে তাঁদের কল্যাণ কামনা করতেই তাঁরা স্ব স্ব গৃহে ফিরে গেলেন। পুরোহিতজী আমাদেরকে বললেন – আপ্‌লোগ্ জরুর তারকেশ্বর হোকর, ইধর আয়ে হোঙ্গে। উস্ তারকেশ্বর সে লগভগ দেঢ় মীল আগে ইন্দ্রকেশ্বর তীর্থ হ্যায়। চলিয়ে হামারা সাথ, হম আপলোগকো ইন্দ্রকেশ্বর মন্দির দর্শন করাকে ফিন্ হমারা বড়বানা গাঁওমে আপোষ লে আবেঙ্গে। কৃপা করকে আপকো আজ হমারা কোঠিমেঁ সিরিফ্ রাত্রিকে লিয়ে নিবাস করনে হোগা। হমারা বৃদ্ধা মাতাজী পরিক্রমাবাসীকো উপর বহুৎ শ্রদ্ধা রাখতে হৈঁ। আপ্‌কো দর্শন করনে সে উনকা দিলমেঁ বহুৎ সন্তোষ আবেগা। বিহান মেঁ সুবে সুবে আপকো সাথ মেঁ লেকর কর্সনপুরীকা নাগেশ্বর তীর্থতক লে চলেঙ্গে।

ব্রাহ্মণের মাতৃভক্তি এবং পরিক্রমাবাসীদের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা দেখে আমি এবং রঞ্জন দুজনেই তাঁর কথায় সম্মতি জানালাম। তিনি আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গুণে গুণে তিন নম্বর পাহাড়ে উঠলেন। পাহাড়ের উপর নানা গাছের শোভা, ছোট পাহাড়টা ধীরে ধীরে অতিক্রম করে পাহাড়ের তলদেশ দিয়ে মিনিট দশেক হাঁটতেই আমরা নর্মদা তটের উপরেই একটি শিব মন্দির দেখতে পেলাম। প্রায় ২ ফুট উঁচু পিঙ্গলবর্ণ এই শিবলিঙ্গে লাল নীল সাদা এবং হরিদ্রা বর্ণের অনেক ছিটে আছে। আমরা প্রণাম করে উঠতেই শক্রেশ্বর মন্দিরের পুরোহিতজী আমাদেরকে জানালেন – হিঁয়াসে দেড় মীল আগে তারকেশ্বর মহাদেবের মন্দির। আপ্ লোগ্ ১ নং পাহাড়সে আয়েথে ইসীওয়াস্তে আপনে দু/চার তীর্থ ছোড়কে সিধা কপালেশ্বর হোকর তারকেশ্বর মেঁ পৌছে থে। তিস্‌রা পাহাড়কো চড়কে সিধা ইধর আনেসে বাল্মীকেশ্বর মহাদেবজীকা মন্দিরসে সিরিফ চার মীল রাস্তা হৈ। খ্যার, দুর্গম অজানা পাহাড়ী পথমেঁ এ্যায়সা গোলকধাঁধামেঁ আদমী বিভ্রান্ত হো জাতা হৈ। আভি ইন্দ্রকেশ্বরজীকে কথা শুনিয়ে, পিছলা কোঈ যুগমেঁ, জব দেবগুরু বৃহস্পতিকা ইন্দ্র নে গর্বকে কারণ সম্মান নহী কিয়া তো বৃহস্পতিজী দেবতায়োঁ ছোড়কর চলে গায়ে। পুরোহিত কে বিঁনা কাম কৈসে চলে ইসলিয়ে ভগবান বিষ্ণু কী আজ্ঞা সে ত্বষ্টা ঋষিকে পুত্র বিশ্বরূপ কো দেবতায়োঁ নে আপনা পুরোহিত বনা লিয়া। বিশ্বরূপজী নে ভীতর-হি-ভীতর অসুরোঁ কা ভী ভলা করনে লাগে। এ খবর মিলনে সে ইন্দ্র নে উন্‌কা উপর বহোৎ নারাজ হো গয়ে। উনোনে বিশ্বরূপকো বধ কর্ দিয়া। ইস্ পর ক্রুদ্ধ হোকর ত্বষ্টা মুনিনে যজ্ঞকে দ্বারা বৃত্রাসুরকো উৎপন্ন কিয়া। উহ্ ভী লড়কর ইন্দ্রকে হাথমেঁ মারা গয়া। অব্ ইন্দ্রকো ব্রহ্মহত্যা কী পাপ লাগী। ইয়ে পাপ নিবারণার্থ ইন্দ্র সভী তীর্থ মেঁ গয়ে। কিন্তু উন্‌কা ব্রহ্মহত্যা ছুটী নহী। তব্ উনোনে ইয়ে তপোভূমি নর্মদা কিনারমেঁ হিঁয়া আকর্ সহস্র বর্ষ তক্ তপস্যা কী, তব্ ব্রহ্মাজী য়হাঁ আয়ে ঔর উস্ ব্রহ্মহত্যা পাপকো চারভাগ কিয়ে। একভাগ জলকো দিয়া।

ইসলিয়ে জলকো উঁগলী হিলাকর তব্ স্নান করেঁ। (২) দুস্‌রা ভাগ পৃথ্বীকো দিয়া। ইস্‌লিয়ে পৃথ্বীপর জো ভী শুকার্য করে পহিলে গোবর সে লীপকর করে। (৩) তীসরা ভাগ স্ত্রীয়োঁকো দিয়া। উহ্ মাসিক ধর্মকে রূপমেঁ হৈ, ইসলিয়ে রজস্বলা নারীকো স্পর্শ ন করে। (৪) চৌথা ভাগ ব্রহ্মবন্ধুয়োঁ কো সঁপ দিয়া। যো আদমী ব্রাহ্মণ কুলমেঁ উৎপন্ন হোকর কৃষিকর্ম করকে যজন যাজনাদি এবং প্রতিগ্রহ করকে, ইয়া কিসীকা গোলামী বা ভৃত্য কর্ম করকে আজীবিকা চলাতে হৈ উন্ লোগোঁকা ব্রহ্মবন্ধু পাপী কহা যাতা হৈ। বায়ুপুরাণন্তর্গত রেবাখণ্ডকী ১৩১ অধ্যায়মেঁ ইস্ বিধান কো বিস্তৃত বর্ণনা হৈ। সারী হিন্দু সমাজ ইস্ বিধান কো বহোৎ হি মান্য করতে হৈ।

জব্ ইন্দ্র ইস্ তরিকাসে ব্রহ্মহত্যা দোষ সে মুক্ত হো গয়া তব শিবজী কী আজ্ঞাসে উনোনে হিঁয়া ইন্দ্রকেশ্বর মহাদেবকো স্থাপনা কী, জিনকে দর্শন স্পর্শ পূজন সে ঔর হিঁয়া তপ করনেসে ব্রহ্মহত্যাদি সব পাপোঁ সে ছুটকারা মিলতী হৈ।

পুরোহিতজীর কথা শেষ হতে না হতেই আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছেন। জঙ্গলখণ্ড, কাজেই শীঘ্রই গাছপালায় অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে আশঙ্কা করে আমরা দ্রুত ব্রাহ্মণের সঙ্গে হেঁটে তাঁর বাড়ীর দিকে চলতে লাগলাম। পাহাড় ডিঙ্গিয়ে প্রায় আধঘন্টা হাঁটার পরেই আমরা বড়বানা গ্রামে ব্রাহ্মণের গৃহে এসেই পৌছে গেলাম। ব্রাহ্মণের গৃহে পৌছে তার চতুষ্পাঠী গৃহেই আশ্রয় নিলাম। তাঁর কথা হতেই জানতে পারলাম যে, পাশাপাশি গ্রাম হতে জনা দশেক ছাত্র রোজ সকালে তাঁর গৃহে পাঠ নিতে আসেন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, চারদিক নিস্তব্ধ। দুচারটি গৃহ হতে পল্লীবাসীদের শঙ্খধ্বনি এবং হর নর্মদে আদি স্তোত্র পাঠ শোনা যাচ্ছে। পুরোহিতজীর এক পুত্র আমাদের জন্য একটি পাতকলসীতে নর্মদার জল রেখে গেলেন। দ্বিতীয় পুত্র মুখ হাত ধোওয়ার জন্যও কতকটা জল একটা পৃথক পাত্রে রেখে গেলেন। রাত্রে আমরা খাব না। কাজেই হাত মুখ ধুয়ে নর্মদার জল পান করে আমি এবং রঞ্জন যে যার আসন পাতলাম। আমরা বসে বসে আজকের বিচিত্র পাহাড়ী পথ, তার ভুলভুলাইয়ার মত অদ্ভুত বিন্যাস ও সংস্থানের কথা আলোচনা করছি এমন সময় একটি প্রদীপ হাতে একজন বৃদ্ধা মাতাজী আমাদের ঘরে এসে ঢুকলেন। সঙ্গে পুরোহিতজীও এলেন, এসেই পরিচয় দিলেন – মেরে মাতাজী! আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে যুক্ত করে নমস্কার জানালাম। তিনি আমাদের কাছে বসেই আমাদের চিবুকে হাত দিয়ে আদর করলেন তারপর বললেন যে, তাঁর স্বামী কোন পরিক্রমাবাসী মহাত্মার কাছ হতে ধারণ করার জন্য একটি চতুর্মুখী রুদ্রাক্ষ এনে দিয়েছিলেন। একদিন সূর্যগ্রহণের দিন নর্মদাতে স্নান করতে গিয়ে তিনি চতুর্মুখী রুদ্রাক্ষটি নর্মদার জলে হারিয়ে ফেলেন, সেই থেকে প্রায়ই তিনি ভুগছেন। এই পথ দিয়ে পরিক্রমাবাসীরা খুব কমই যাতায়াত করেন। মাঝে-সাজে গেলেও পথিমধ্যে শ্রেণীবদ্ধ পাহাড়গুলো এমন গোলক ধাঁধার মত যে, কখন যে কোন পাহাড়ের উপর দিয়ে বা নিচের প্রান্তরেখা ধরে যাচ্ছেন, তা আমরা বুঝতে পারি না। একবার চারজন মহাত্মাকে ৩নং পাহাড়ের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে আমার দুই নাতিকে পাঠিয়েছিলাম তাঁদের কাছে। কিন্তু তাঁদের কাছে চতুর্মুখী রুদ্রাক্ষ ছিল না। সেই থেকে আমি খুব উৎকণ্ঠা এবং নৈরাশ্যে দিন কাটাচ্ছি। তোমাদের দুজনের কারও কাছে যদি আমার বাঞ্ছিত রুদ্রাক্ষ থাকে, তাহলে আমাকে একটি দাও। মা নর্মদা তোমাদের মঙ্গল করবেন।

মায়ীর কথা শুনে প্রদীপটি কাছে টেনে নিয়ে আমার ঝোলা ঘেঁটে একটি চতুর্মুখী রুদ্রাক্ষ বের করে মায়ীর হাতে দিলাম। মায়ী আনন্দে আমাদেরকে আর্শীবাদ করতে করতে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। তাঁর ছেলে অর্থাৎ আমাদের সেই সদাশয় পুরোহিতজী আমাদেরকে

বললেন, কাল সুবে হম্ আপলোগকো সাথমেঁ এহি শক্রতীর্থকে তিন মীল আগে কর্সনপুরী গ্রাম মেঁ নাগেশ্বর তীর্থ লে চলুঙ্গা। আপকো আউর কঁহা কাঁহা যানেকা বিচার হৈ ?

– হম্লোগ পরিক্রমাবাসী হৈ। ঐসে তো হমলোগাকা শূলপাণীশ্বর মহাদেবকো দর্শন করকে অমরকন্টক তক্ যানে কা বিচার হৈ। সবসে পহেলে যানে মাংগতা হৈ কোটেশ্বর, যিধর ভূর্গভমেঁ এক মহাযোগী নিবাস করতে হৈ, শুনা হ্যায়।

আমার কথা শুনে তিনি যা বললেন, তার সারমর্ম এই যে, তাহলে আমাদেরকে কর্সনপুরী দর্শন করে ভালোদে আগে পৌছাতে হবে। ভালোদ থেকে এক মাইল আগে নর্মদা তটের মহাশ্মশানে একটি প্রাচীন বটগাছের তলায় শ্মশানেশ্বর মহাদেব বিরাজিত। সেখানেই ভূগর্ভের মধ্যে একজন মহাযোগীও বাস করেন। তিনি সাধারণতঃ কারও সঙ্গে দেখা করেন না। ভালোদেও একজন সাধু বাস করেন, তাঁর কাছে বসে কিছুক্ষণ তাঁর বাণী বচন না শুনলে তিনি কাউকে আর এগোতেই দেন না। তাঁর গুহার সামনে দিয়ে গেলেই তিনি পরিক্রমাবাসীদের উপর বিষ্ঠা নিষ্ঠীবন থেকে আরম্ভ করে পাথর পর্যন্ত নিক্ষেপ করেন। আবার কিছুক্ষণ তাঁর কাছে ধৈর্য সহকারে বসলেই তিনি শুধু পরিক্রমাবাসীদেরকে কেবল সাদরে ভিক্ষাই দেন না, নিরাপদে পথ অতিক্রম করার হদিসও বলে দেন। এইজন্য কেউ তাঁকে উন্মাদ, নাস্তিক আবার কেউ তাঁকে মুক্তপুরুষ হিসাবেও মান্য করেন। যাই হোক কাল কর্সনপুরী হতেও আপনাদেরকে সেই পথের নিশানা দেখিয়ে দিব। হর নর্মদে।

ব্রাহ্মণ চলে গেলেন। আজ সারাদিন পাহাড়ের গোলক ধাঁধায় একই রাস্তায় দুবার করে ঘুরপাক খেয়েছি। খুবই ক্লান্ত ছিলাম, তাই দুজনেই নর্মদার জল ভরপেট খেয়ে শুয়ে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল সকাল ছটায়। সবেমাত্র আমাদের প্রাতঃকৃত্য শেষ হয়েছে, এমন সময় পুরোহিতজী আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে কর্সনপুরী যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসে দাঁড়ালেন। ঘরের বাইরে তাঁর মাতাজী এসে দাঁড়িয়েছেন। আমরা তাড়াতাড়ি ঝোলা গাঁঠরী বেঁধে নিয়ে মায়ীকে নমস্কার জানিয়ে তাঁর পুত্রের সঙ্গে যাত্রা করলাম। তিনি প্রথমেই আমাদেরকে নিয়ে এলেন শক্রেশ্বর মন্দিরে। সেখানে আমাদেরকে প্রণাম করিয়ে ৩ নং পাহাড় অতিক্রম করালেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠতে লাগলেন ২ নং পাহাড়ের শীর্ষদেশে। সোনালি সূর্যরশ্মি তখন ছড়িয়ে পড়েছেন গোটা পাহাড়ে। চারপাশেই অনেক শাল, ধ, কুসুম, মহুয়া ও অশ্বত্থ গাছের সমারোহ। অনেক লতাপাতা এবং বুনো ঝোপ ঝাড়ে গোটা পাহাড়টা সমাকীর্ণ। সূর্যের জবাকুসুম সঙ্কাশ রশ্মি ধীরে ধীরে স্বর্ণময় হয়ে উঠেছে, তার মধ্যেও আছে আদর আপ্যায়নের তাপ। প্রায় দু হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর দিয়েই আমরা হেঁটে চলেছি। পাহাড়ের আকৃতি গুণটানা ধনুর মত। বিশাল অর্ধচন্দ্রাকৃতি যেন ধনুক একটি। সেই ধনুকের একপ্রান্ত বেয়ে আমরা উঠতে আরম্ভ করেছি, ধনুকের পৃষ্ঠদেশ দিয়ে হেঁটে ক্রমে মধ্যদেশে উঠেছি, এমন সময় চোখে পড়ল, পাহাড়ের কোন একটা কোণ থেকে একটা ঝরণা বয়ে চলেছে। পাশের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখতে পেলাম, পাহাড়ের নিম্ন ঢালে পাথরের খাঁজে খাঁজে জল জমে আছে। সেই জলের ধারেই একটা প্রাচীন আমগাছ। কুঁচ লতা বেয়ে উঠেছে সেই আমগাছের ডালে। বিস্মিত দৃষ্টিতে ভাবতে লাগলাম মহাপ্রকৃতিকে কি বিপুল সমারোহ করতে হয়েছে ওর ফুল ফুটাতে, ওর ফল পাকাতে। সূর্যের বিশাল অগ্নিকুণ্ডটা আকাশের দূরপ্রান্তে বসাতে হয়েছে ওর জন্য, কোটি কোটি মাইল ইথারের সমুদ্র ভেদ করে সূর্যরশ্মিকে পৃথিবীতে ছুটে আসতে হয়েছে ঘন বনের মধ্যে ওকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যগ্র আগ্রহে। তবে আজ ওর ফুল ফুটেছে, ওর ফল পেকে লাল টুকটুক করছে। ক্ষর ব্রহ্মের প্রাণময়ী বার্তা বহন করে এনেছে ঐ বন্য লতা লোক লোকান্তরের অসীমতা থেকে। যে মহাশিল্পীর হাতের এটি অতি সুকুমার শিল্প, সেই

শিরীর স্বাক্ষর আছে ওর পাতায় ফুলে লাবণ্যময় দুলুনিতে। ওর মধ্য দিয়েই আজ তাঁকে যেন প্রত্যক্ষ করতে পারছি।

কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে রঞ্জন আর্তনাদ করে উঠতেই সেই শব্দে আমার ধ্যান ভাঙ্গল। আমার লাঠিটি রঞ্জনের হাতে এগিয়ে দিয়ে পুরোহিতজীর পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগলাম। প্রায় একঘণ্টা পরেই সেই পাহাড়ের অর্ধচন্দ্রাকৃতি শেষ প্রান্তের ঢালে নেমে কতকটা সমতলভূমিতে পৌঁছলাম। দূরে দূরে কয়েকটা পাহাড়ের ঘরবাড়ী চোখে পড়ল। আরও দশ মিনিট হাঁটার পর নর্মদার একবারে কিনারা ঘেঁষা একটি মন্দির চোখে পড়ল। পুরোহিতজী বললেন – হমলোগ কর্সনপুরী মেঁ পৌছ গয়া। ইন কা নাগেশ্বর তীর্থ ভি কহা যাতা হৈ। মন্দিরকা অন্দর মেঁ নাগেশ্বর মহাদেব বিরাজমান। ইধর আনেসে আদমীকো জিন্দেগী ভর সর্পভয় নেহি রহতা। নাগপঞ্চমী তিথি মেঁ ইধর বহুৎ বড়া মেলাভি হোতে হৈ। মহাভারত মেঁ আপলোগ জরুর কদ্রু-বিনতা কি বারে মেঁ সব কুছ পড়ে হৈ ?

রঞ্জনের মুখ দেখে মনে হল যে সে সব বৃত্তান্ত জানে না। আমি পুরোহিতজীকে চুপ থাকতে বলে আমিই কদ্রু বিনতার উপাখ্যান শোনাতে লাগলাম। বললাম, আপনি ভারতপূজ্য মহর্ষি কশ্যপের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। তাঁর দুই পত্নী কদ্রু এবং বিনতা। কদ্রু অনন্তনাগ, বাসুকী প্রভৃতি সকল সর্পের জননী, আর বিনতার দুইটি সন্তান অরুণ এবং পক্ষীরাজ গরুড়। একবার অপরাহ্নকালে ইন্দ্রের বাহন উচ্চৈঃশ্রবার রং সাদা না কালো এই নিয়ে তর্ক হয়। কদ্রু বলেন – 'কালো' আর বিনতা বলেন – 'সাদা'। এই নিয়ে উভয় সপত্নীর মধ্যে বাজী ধরা হয়, যিনি হারবেন তাঁকে আজীবন অপরের কাছে 'দাসী' হয়ে থাকতে হবে। সেই রাত্রিতেই মহর্ষি কশ্যপের কাছে কদ্রু যখন জানতে পারলেন যে, উচ্চৈঃশ্রবার রং বাস্তবিক পক্ষে সাদা, কালো কদাপি নয়, তখন পরাজয়ের গ্লানি হতে আত্মরক্ষার জন্য কদ্রু তাঁর সর্প সন্তানদের হুকুম করলেন, উচ্চৈঃশ্রবার গায়ে তারা লেপটে থাকুক যাতে উচ্চৈঃশ্রবাকে কালোই দেখায়। এই হীন ষড়যন্ত্রের ফলে বিনা দোষে বিনতাকে সপত্নীর দাসীত্ব বরণ করতে হয়। পরে অবশ্য বিনতা পুত্র মহাবীর গরুড় বিমাতার দাবীমত সমস্ত দেবতাবর্গ, এমন কি ভগবান বিষ্ণুকেও পরাজিত করে দেবতার বজ্রমুষ্ঠি হতে অমৃতের ভাণ্ড ছিনিয়ে এনে মাকে দাসীত্বের গ্লানি হতে মুক্ত করেন।

আমার কথার জের টেনে পুরোহিতজী বলতে লাগলেন – যব কদ্রুমাতানে এ্যায়সা অন্যায় হুকুম কিয়া, তব কুছ নাগোনেঁ উনকী হুকুম নেহি মানা। তব কদ্রুজী নে 'তুম অগ্নি মেঁ জ্বলকর ভস্ম হো যাও।' – শরাপ দিয়া। তব উস, অভিশপ্ত নাগোনেঁ নর্মদা তটমেঁ ইধর আকর শিবজীকো আরাধনা কী, আপনে নাম সে নাগেশ্বর কী ভি স্থাপনা করকে শাপ মুক্ত হো গয়ে। নাগেশ্বরের মহিমা শুনে আমরা নর্মদাতে নেমে উভয়ে স্নান করে এসে নাগেশ্বরের মাথায় ফুল ও নর্মদার জল অর্পণ করে পূজা ও প্রণাম সারলাম। রঞ্জনের ঘড়িতে তখন বেলা সাড়ে দশটা বেজেছে। ঘড়ি দেখেই রঞ্জন নাগেশ্বর মন্দিরের ঠিক বিপরীত দিকে দৃষ্টিপাত করে পুরোহিতজীকে জিজ্ঞাসা করলেন – নর্মদার ওপারে ঐ বহু সম্পন্ন গৃহবাড়ী সুসজ্জিত পল্লীটির নাম কি ? তিনি উত্তর দিলেন – উহ্ নর্মদাজী কে উত্তরতটপর কোরল নগর হৈ। চৌরংড়া জংসন সে রেলবে ইস নগর তক ভী আই হৈ, ইস্ নগর কে কুছ প্রসিদ্ধ তীর্থ হৈ – কুবেরেশ্বর তীর্থ, আদি বরাহতীর্থ, কোটিতীর্থ, ব্রহ্মপ্রসাদজ তীর্থ, মার্কণ্ডেশ্বর তীর্থ, ভৃগ্বীশ্বর তীর্থ, পিঙ্গলেশ্বর তীর্থ, অযেনিজা তীর্থ ঔর রবিতীর্থ। যহাঁ কুবেরেশ্বর কা মন্দির বহুৎ পুরাণা হৈ। য়হাঁ বরুণেশ্বর, বায়ব্যেশ্বর ঔর যাম্যেশ্বরকে মন্দির ভী হ্যায়। য়হাঁ চারো লোক নে তপ কিয়া থা, ব্রহ্মাজীনে য়হাঁ দশাশ্বমেধ যজ্ঞ কিয়া। য়হাঁ মার্কণ্ডেয় ঋষি, ভৃগু ঋষি ঔর অগ্নিদেবতা নে ভী তপ কিয়ে থে। য়হাঁ পর সূর্য ভগবান

দ্বারা স্থাপিত আদিত্যেশ্বর মহাদেব হৈ। উধার সূর্যগ্রহণ ঔর চন্দ্রগ্রহণ কা বিশেষ মাহাত্ম্য। উস্ বখৎ হাজার হাজার আদমী দূর দূর সে উধর নাহাতে আতে হৈ। আমি জানালাম – আমি উত্তরতট পরিক্রমা করার সময় কোরল নগর দেখে এসেছি। কোরলকে নর্মদাতটের গুপ্তকাশী নামে অভিহিত করা হয়।

– আপনে সচ্ বোলা হুয়া। ভাই সাহেব! আভি হম চলেঙ্গে। হিঁয়াসে সিধে মীলভর যানেসে আপ্ ভালোদ মেঁ পৌছ্ যায়েঙ্গে। এহি এক মিল পর ভী হী আপকো গৌতমেশ্বর, অহল্যেশ্বর, রামেশ্বর ঔর মোক্ষেশ্বর কো ভী দর্শন মিলে গে। ভালোদ ভগবান গৌতম ঋষি কো তপস্যাস্থল। অত্র হি অহল্যাকা উদ্ধার হুয়া থা। উনকী উদ্ধার কি পর রামচন্দ্রজী রামেশ্বর শিবজীকা স্থাপন কিয়ে থে। স্বয়ং স্বায়ম্ভুব মনুনে ইধর তপ করকে মোক্ষলাভ কিয়ে থে। ইস লিয়ে ইসে মোক্ষতীর্থ ভি কহতে হৈ। থোড়া সা হুঁসিয়ার রহে গা অনামী বাবাকে বারে মেঁ। উনকো নারাজ করকে কেয়া ফায়দা। থোড়া বহুৎ উনকা পাশ বৈঠনেসে উন্‌কা দিল্ খুশ হোগা তো উনকো নারাজ করনেমেঁ ক্যা ফায়দা?

আমি তাঁকে বললাম – আপনি বৃথা চিন্তা করবেন না, নর্মদাতটবাসী প্রত্যেক মহাত্মাই, যিনি যে নামে বা যে রূপেই থাকুন, তাঁদের কোন বিরক্তির কারণ আমরা ঘটাবো না। অনেক বেলা হয়েছে, আপনার মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় হয়ে এল, এবার আপনি যান। আর জীবনে কোনদিন এপথে আসব কিনা স্থির নাই, তবে যেভাবে আপনি এই বিদেশে আমাদেরকে রাত্রির আশ্রয় দিয়ে, এতদূর সঙ্গে এসে যেভাবে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিলেন, আপনার এই সহৃদয় ব্যবহার আমরা কোনদিন ভুলব না। উত্তরে তিনি জানালেন – আমি আর আপনারদের জন্য কতটুকু কি করেছি, আপনারা ত আমার একগ্লাস মাত্র জল খেয়েছেন, পরিবর্তে আমার বৃদ্ধামাতার মুখে যেভাবে হাসি ফুটিয়েছেন, তার কোন মূল্য কষা যাবে না। আমার পূজনীয় পিতাঠাকুর প্রদত্ত চতুর্মুখী রুদ্রাক্ষটি হারিয়ে গত কয়েক বছর ধরে মা যে মনঃকষ্টে ভুগছিলেন তা দূর হওয়ায় তিনি সুখী হয়েছেন, তাঁর মুখে হাসি ফুটেছে সেইটাই আমার পরম লাভ। বহুবার বাবার মুখে আমরা শুনেছি –

চতুর্মুখী চ স্যাৎ নরানাং চতুর্বর্গফলপ্রদা।

হর নর্মদে। এই বলে তিনি পিছন ফিরলেন। আমরা ধীরে ধীরে নাগেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করে কর্জনপুরী হতে নিষ্ক্রান্ত হলাম। পুরোহিতজীর প্রদর্শিত রাস্তা ধরে আমি ও রঞ্জন আমাদের ঝোলা গাঁঠরী নিয়ে হাঁটতে লাগলাম দ্রুত। নর্মদার ধারে ধারে রাস্তা। পথ ভালই। দু'চারটি করে পল্লীবাসীরও সাক্ষাৎ মিলছে। মিনিট পনের হাঁটার পরেই একজন গ্রামবাসীই আমাদেরকে চিনিয়ে দিল গৌতমেশ্বর মন্দির। আমরা দুজনে গৌতমেশ্বর মন্দিরে পৌছে প্রণাম করলাম গৌতমেশ্বর মহাদেবকে। তাম্রবর্ণের শিবলিঙ্গ পুষ্প চন্দন ও বিল্বপত্রে আচ্ছাদিত। আমি রঞ্জনকে বললাম – গৌতম গোত্রের অধিপতি বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা স্বয়ং গৌতম ঋষির তপস্যাস্থলে পৌছতে পেরে আমার গাত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। তাঁর রচিত সংহতির নাম 'গৌতম সংহিতা', তাতে মানুষের আচার ও রীতিনীতি বিষয়ক সমূহ তত্ত্ব ও তথ্য বিদ্যমান। তিনি জিতেন্দ্রিয় হয়ে কঠিন তপস্যা ও শাস্ত্রচর্চায় কাল কাটাতেন। শরস্তম্বে জাত এঁর সন্তান কৃপাচার্য এবং কৃপী। ব্রহ্ম তাঁর অলৌকিক ব্রহ্মচর্য দেখে সন্তুষ্ট চিত্তে অহল্যা নামে এক পরমা সুন্দরী কন্যাকে তাঁর কাছে রেখে যান। সুদীর্ঘকাল পরে, গৌতমের জিতেন্দ্রিয়তা ও তপোনিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে অহল্যাকে তাঁরই হস্তে সমর্পণ করেন। পুত্র শতানন্দের জন্ম হয়। একবার গৌতমের গৃহে অনুপস্থিতির সুযোগে ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধারণ করে অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করেন, এর ফলে উভয়কেই মহর্ষির অভিশাপ ভোগ করতে হয়। গৌতম ইন্দ্রকে অভিশাপ দেন যে, ইন্দ্রকে নপুংসক ও সহস্রযোনি হতে হবে, আর অহল্যাকে অদৃশ্য হয়ে অনাহারে ভূমিতলে শয়ন করে, বায়ুমাত্র ভক্ষণ করে ভস্মশয্যায় বহু

বৎসর অতিবাহিত করতে হবে। অহল্যার অনুনয়ে গৌতম বলেন, যখন বিষ্ণুরূপী রামচন্দ্র এই বনে প্রবেশ করবেন, তখন তাঁর পাদবন্দনা করলে অহল্যা শাপমুক্তা হয়ে গৌতমের সঙ্গে পুনর্মিলিতা হতে পারবেন। বাল্মীকির রামায়ণে এই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ নাই। মনে হয়, পরের পর দুটি শিবমন্দিরই সেই অহলেশ্বর ও রামেশ্বরজীর। সাদা রং এর একটি সুবৃহৎ শিবলিঙ্গের মন্দিরকে অহল্যেশ্বর নামে চিহ্নিত দেখে পরের মন্দিরটিতে আমরা গিয়ে সুবর্ণবর্ণের শিবলিঙ্গকে প্রণাম করলাম। মন্দিরে বসে রেবাখণ্ড ঘেঁটে মহামুনি মার্কণ্ডেয় বর্ণিত রামেশ্বরের বর্ণনা পেলাম –

নর্মদা দক্ষিণে কূলে রামেশ্বরমনুত্তমম্।
তীর্থং পাপহরং পুণ্যং সর্বদুঃখঘ্নমুত্তমম্॥
তত্র তীর্থে তু যে স্নাত্বা পূজয়ন্তি মহেশ্বরম্।
মহাদেবং মহাত্মনং মুচ্যন্তে সর্ব কিল্মিষৈঃ॥

(রেবাখণ্ড, ১৩৪ অধ্যায়)

অর্থাৎ নর্মদার দক্ষিণকূলে রামেশ্বর তীর্থ, যা নাকি সর্বপাপহর এবং সর্বদুঃখনাশক। যারা রামেশ্বর তীর্থে স্নান করে মহান্ মহেশ্বরের পূজা করে, তারা অখিল কলুষ হতে মুক্ত হয়।

বর্ণনা শুনেই রঞ্জন বলল, এখন ত দেখছি সবে ২টা বেজেছে। মহামুনি মার্কণ্ডেয় যখন এখানে স্নান ও পূজার বিধান দিয়েছেন, তখন চলুন আমরা এখানে আর একবার নর্মদায় স্নান করে নিই। রঞ্জনের ইচ্ছা মত আমরা দুজনেই নর্মদাতে স্নান করে এসে দুজনেই কমণ্ডলুর জল রামেশ্বর মহাদেবের মাথায় ঢেলে কিছুক্ষণ উভয়ে করতালি দিয়ে গাইতে লাগলাম – শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। প্রণামান্তে তীর ধরে মিনিট পাঁচেক হাঁটতেই মোক্ষতীর্থ অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনুর তপস্যা ক্ষেত্রে পৌছে গেলাম। এখানে কোন শিব প্রতিষ্ঠিত নাই। নর্মদার তটের উপর প্রায় ৫০ ফুট দীর্ঘ এবং ৫০ ফুট প্রশস্ত এক যজ্ঞস্থলী পড়ে আছে। চারদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। উঁকি মেরে দেখলাম, চারদিকে ভস্মস্তূপ। আমরা কৌতূহল ভরা দৃষ্টিতে উঁকি ঝুঁকি মারছি দেখে, দুজন গ্রামবাসী এগিয়ে এসে আমাদেরকে জানালেন – ভগবান মনুর যজ্ঞস্থলী এটি। হাজার বা লক্ষ বৎসরেরও পুরাণো হতে পারে। এই গ্রাম জুড়ে যে কোন স্থানে মাটি খুঁড়লে পাথরের নিচে মুঠো মুঠো যজ্ঞ ভস্ম পাওয়া যায়। এখানে ধ্যান জপ করলে যে কোন লোক সমাধির আনন্দ লাভ করে, প্রায় প্রতিদিনই নির্জন বনজঙ্গলবাসী মহাত্মারাও এখানে সন্ধ্যা হলেই ধ্যান জপ করতে আসেন, দিনের বেলাতেও আসেন। ভাল করে উঁকি মেরে দেখুন, এখনও দু পাঁচ জন মহাত্মাকে ধ্যানস্থ দেখতে পাবেন। রাত্রে সংখ্যা আর বাড়বে। এইজন্য এই স্থানকে মোক্ষতীর্থ বলা হয়।

আমরা পাঁচিলের অভ্যন্তরে সংগোপনে উপবিষ্ট কয়জন ধ্যানী পুরুষদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে পূর্বদিকে হাঁটতে লাগলাম। নর্মদা এখানে পূর্ব দিক হতে পশ্চিমমুখে বয়ে চলেছেন। মিনিট পাঁচেক গ্রাম্য পাহাড়ী পথে হাঁটার পর একটা ছোট্ট টিলার মত পাহাড় আমাদের চোখে পড়ল। টিলার মাথায় সাদা ও হলুদ বর্ণের পতাকা পত্‌পত্ করে উড়ছে। টিলাকে ঘিরে উপরে, ধারে এবং নিচে অনেক গুলি ছোট বড় বাড়ী, কয়েকজন লোক এবং একজন সাহেবকে ঘুরে বেড়াতে দেখলাম। আর একটু কাছাকাছি হতে পতাকার উপরে লেখা আছে পড়তে পারলাম – অনামী বাবা। টিলার উপর এক মুণ্ডিত মস্তক বিশালদেহী প্রবীণ বয়স্ক মানুষকে দেখতে পেলাম, আমাদের দিকেই তিনি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। রঞ্জনকে বললাম – ভেইয়া! এ যে দেখছি, যেখানেই বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। উনিই বুঝি অনামী বাবা। সাবধান, আমরা তাঁর কোন বিরুদ্ধাচারণ করব না। তাঁর কথা যথোচিত শ্রদ্ধা ও ধৈর্য সহকারে শুনব। বেলা প্রায় ৩টা বেজে গেছে। দরকার হলে আমরা

আজ রাতভোর তাঁর অমৃত বচন শুনে সকালে মা নর্মদা যে দিকে নিয়ে যাবেন, সেই দিকেই যাত্রা করব।

আমরা টিলার কাছাকাছি যেতেই দেখলাম, টিলার উপর দাঁড়িয়ে সেই মুণ্ডিত মস্তক, গায়ে হরিদ্রাবর্ণের আলখাল্লা জড়ানো মানুষটি গম্ভীর কণ্ঠে আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে ডাকতে লাগলেন – স্বাগতম্, সুস্বাগতম্, সুখেন আগতম্। রঞ্জনকে চোখ টিপে একদম চুপ থাকতে বলে, তাকে পিছনে নিয়ে আমরা সোজা উঠে গেলাম তাঁর কাছে। আমাদেরকে ঘরে বসিয়ে তিনি ভাঙা ভাঙা ভাবে একটা ঘণ্টা বাজিয়ে একজন লোককে কাছে ডেকে সর্বপ্রথম আমাদেরকে খাবার পরিবেশন করতে বললেন। চাপাটি এবং অড়হর ডাল ভোজন করার পরেই আমরা তাঁদের দেওয়া জলে হাত মুখ ধুতে বাইরে বেরিয়ে আসার সুযোগ পাওয়া মাত্রই চারদিক পরখ করে দেখতে লাগলাম, কোথাও কোন মন্দির দেখতে পাই কিনা। ৭/৮ টা ঘরের মধ্যে কোথাও কোন শিবলিঙ্গ বা অন্য কোন দেবতার সন্ধান না পেয়ে বড়ই আশ্চর্য হলাম। সূর্যাস্ত হয়ে আসছে, ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘিরে আসছে চতুর্দিকে। প্রত্যেক ঘরেই প্রদীপ ও মোমবাতি জ্বালার ব্যবস্থা হল। আবার ঘণ্টা বেজে উঠল। একজন ব্রহ্মচারী (তাঁরও মুণ্ডিত মস্তক) এসে আমাদেরকে ডেকে নিয়ে গেল একটি ঘরে। ঘরে পৌছে দেখি সেই ঘরে আমাদের ঝোলা গাঁঠরী রাখা আছে, দুজনের উপযোগী কম্বল ও শয্যাও পাতা আছে। আমরা আসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে বম্-বম্-ববম্ ধ্বনি করতে করতে অনামী বাবা আমাদের কাছে এসে বসলেন। প্রথমেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন – এখান থেকে তোমাদের কোন স্থানে যাওয়ার মতলব আছে ? আমাদের উত্তর দিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হতেই তিনি নিজের থেকে বলে উঠলেন – যুক্তেশ্বরী মা তোমাদেরকে মশানিয়া কোটেশ্বর যেতে বলেছিলেন না ! মশানিয়া কোটেশ্বর ঠিক কোনস্থানে তা তোমাদের জানা আছে কি ? আমার দিকে তাকিয়ে বললেন – তুমি ত উত্তরতট পরিক্রমা করে এসেছ। সেখানে অন্ততঃ তিন চারটি কোটেশ্বর কি দেখে আসনি ? হাঁসোট থেকে ফিরে এসেছ। হাঁসোটের কাছাকাছি এদিকে মাইল চারেক আগেও একটী কোটেশ্বর তীর্থ আছে। তাকেও কোন কোন পরিক্রমাবাসী ভুল করে মশানিয়া কোটেশ্বর বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন ! তোমরা গত পরশ্ব সকালে ত বাল্মীকেশ্বর হতে আসার পথে একমাইল এগিয়ে এসেই কপালেশ্বর তীর্থের কাছেই এক কোটেশ্বর তীর্থ দেখে এসেছ। তার গল্প এই যে কাপালিকবেশী মহাদেবের হস্তচ্যুত নরকপাল নর্মদাতে পড়ে গিয়ে বালুতে ক্রমে চাপা পড়ে যেতেই সেখান থেকে এক স্বয়ম্ভুলিঙ্গের আবির্ভাব ঘটে, তাঁর সঙ্গে দেবতাদের 'জয়ঢাক' নারদের প্রচারের ফলে কোটি কোটি দেবতা ও ঋষিবর্গ তাঁর পূজা করতে আসেন। স্থানটি সঙ্গে সঙ্গে কোটেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। দক্ষিণতটে সিসোদরা গ্রামের নিকটে অনুসূয়া মাতার সম্মুখে আর একটি কোটেশ্বর, শূলপাণির ঝাড়ি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেও একটি কোটেশ্বর, যেখানে নর্মদা ও কাবেরীর সংগম হয়েছে সেখানেও কোটেশ্বর, চিফলদা হতে ৩/৪ ক্রোশ নিম্নে উত্তরতটে এক কোটেশ্বর যেখানে তোমাকে ভীলরা বেঁধে ফেলেছিল, যেখানে তোমার প্রাণ সংশয় হয়েছিল, মহাত্মা দিগম্বরজী সহসা আবির্ভূত হয়ে তোমাকে রক্ষা না করলে তুমি বাঁচতে না, মনে আছে ত ? নর্মদার এই দক্ষিণতটে ওরি গ্রাম থেকে এক মাইল দূরে কোটিনারেও একটা কোটেশ্বর আছে। পুরাণকাররা প্রত্যেকটি কোটেশ্বরকে কেন্দ্র করে গল্প রচনা করেছেন যেন প্রতিটি তীর্থে অলৌকিক ভাবে শিবের আবির্ভাব বা কোথাও কোন অদ্ভুত কিছুর প্রকাশ ঘটলেই সেখানে কোটি কোটি দেবতা ও ঋষি এসেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানকে কোটেশ্বর তীর্থ নামে প্রচার করা হয়েছে ! একমাত্র মহামুনি মার্কণ্ডেয় ছাড়া আর কোন পুরাণকার নর্মদাতটে আদৌ এসেছিলেন কিনা, সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। তবে যুক্তেশ্বরী মা কথিত মশানিয়া কোটেশ্বরের কাছাকাছি তোমরা পৌছে গেছ, এই জেনে

তোমরা নিশ্চিন্ত হও। এখান থেকে মাত্র মাইল খানিক এগিয়ে গেলেই তোমরা নর্মদার এই দক্ষিণতটেই একটি মহাশ্মশান দেখতে পাবে, সেখানে একটি প্রাচীন বটগাছের তলায় শ্মশানেশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন। ঐ কোটেশ্বরই মশানিয়া কোটেশ্বর।

অনামী বাবার কথা শুনে আমরা দুজনেই বিশেষতঃ আমি দারুণভাবে চমকে উঠলাম। আসার পথে এঁর প্রসঙ্গে যে দু একজনের কাছে শুনেছি, তাতে তাঁর সম্বন্ধে যে কোন নূতন লোকের পক্ষে কোন সৎ ধারণা হওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব হলে আমরাও সুকৌশলে যে কোন ভাবে এঁকে এড়িয়ে যেতে পারতাম। আমরা কতকটা নিজেদের গরজেই এই বিদেশ বিভূঁয়ে তাঁর এখানে রাত্রিবাস করতে এসেছি। কিন্তু এঁর দুচারটি কথা শুনেই বুঝছি, ইনি নিশ্চয়ই কোন অন্তর্যামী মহাপুরুষ; নতুবা আমি যে উত্তরতট পরিক্রমা করেছি, হাঁসোটও পরিক্রমা করে এসেছি, কিংবা গত পরশু এসেছি বাল্মীকেশ্বর হতে, সে কথা ইনি কি করে জানলেন ?

আমি নিজের মনে এই সব কথা ভাবছি, এমন সময় রঞ্জনকে উস্‌খুস্ করতে দেখে, তিনি তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন – হরবোলাজী ! আপ কুছ পুছেঙ্গে ? তুমি গোমড়া মুখে বসে আছ কেন ? আমার এখানকার নিয়ম হল –

হাস বোল, খাপা ন হো কিসিসে
এহি জগকা রীত, নাফা ন হো কিসিসে ॥

অর্থাৎ যা বলবে হেসে বলবে, দিল খোলসা করে বলবে, গোমড়া মুখে বসে থাকবে না, কেবলই কোন মতলব সিদ্ধি বা লাভের তালে বাত্-কী-বাত কোন কথা বলবে না। এইটাই জগতের রীতি।

এই কথা শোনার পর আমি রীতিমত ঘেমে উঠলাম এই শীতের রাত্রেও। রঞ্জনকে কেবল যুক্তেশ্বরী মাই ঠাট্টা করে বলতেন – হরবোলাজী ! সে কথাও দেখছি এই মহাপুরুষের অজানা নাই। বাবার আশীর্বাদে এই ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যেই অনেক মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি কিন্তু এইরকম বিচিত্র ও অলৌকিক অন্তর্যামীত্বের অধিকারী মহাপুরুষের সংখ্যা আঙুলে গুণেই বলা যায়। গম্ভীর ভাবে তাঁকে অপাঙ্গে দেখছি, তিনি নিজেই আমার দৃষ্টিতে দৃষ্টি স্থাপন করে বললেন – প্রলয়দাসজী, দিগম্বরজী, সোমানন্দজী, যুক্তেশ্বরী মা এবং তোমার বাল্য কৈশোরে দেখা পাগলী মা প্রভৃতির নাম আঙুলে গুণে গুণে তাঁদের কয়জনকে অন্তর্যামীর থাকে ফেলতে পার তার হিসাব কষতে থাক, ইত্যবসরে আমি হরবোলাজীর পেটি টিপে প্রশ্ন বের করি। রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে ঘুষি পাকিয়ে বললেন – পেট মেঁ গোস্তা খানেকে কোঈ সাধ না হো, কুছ্ না কুছ্ তো পুছিয়ে জী।

রঞ্জন ঘাবড়ে গিয়ে তাঁকে বলল – ব্রহ্মতত্ত্ব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

রঞ্জনের কথা শুনেই তিনি তাঁর বিশাল কলেবরটি দুলিয়ে দুলিয়ে হো হো করে হাসতে থাকলেন – সে কি গমকে গমকে হাসি ! কি বললে ব্রহ্ম ? ব্রহ্মের কথা জানতে চাও ? ব্রহ্মতত্ত্ব ? ব্রহ্মের কথা জিজ্ঞাসা করতে নাই, বলতেও নাই, এ কথা কি তুমি কখনও শোন নি ? এই বলেই তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন চোখ বন্ধ করে। পরে প্রায় ৫ মিনিট গুম হয়ে বসে থেকে তিনি বলতে শুরু করলেন – সকল বস্তুই ব্রহ্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, নিয়মিত। এই যে তোমার আমার শরীর অর্থাৎ জীবাত্মা মাত্রেই তাঁর শরীর মাত্র, তিনি তারও নিয়ন্তা। তিনি কেবল সাক্ষী, দ্রষ্টা স্বরূপ। তাঁর অপরিবর্তিত নিয়মে বিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে। তিনি আত্মারও আত্মা। তিনি পরমাত্মা। শ্রুতিবাক্যে পাবে,

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া –
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশতি ॥

অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মার কিরূপ সম্বন্ধ ? না, দুটি পাখী যেমন একটি বৃক্ষ আশ্রয় করে বাস করে, সেই রকম জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দেহকে আশ্রয় করে আছেন। তাঁরা সখ্য ভাবে সংযুক্ত হয়ে আছেন। জীবাত্মা স্বাদুফল ভক্ষণ করছেন অর্থাৎ নিজের কর্মফল ভোগ করছেন কিন্তু পরমাত্মা কেবল সাক্ষী স্বরূপে তা দেখেন। তবে তিনি যে কেবল মানবদেহে সংযুক্ত আছেন, তা নয়; তিনি সর্বত্র বর্তমান রয়েছেন এবং সকল পদার্থই তাঁর বিরাট শরীর।

"তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদবায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্মতদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ।
ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চয়সি ত্বং জাতো ভবাসি বিশ্বতো মুখঃ।
নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাঙ্গ স্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ
অনাদিস্তং বিভূত্বেন বর্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা।'

উর্ধ্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাঁর চোখের সামনে যেন কেউ দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে যেন সরাসরি বলছেন, এই ভাবে বলতে লাগলেন – অর্থাৎ তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমারী, তুমিই বৃদ্ধরূপে দণ্ডধারণ করে ভ্রমণ কর। আবার তুমিই বিশ্বতোমুখ হয়ে সর্বত্র বর্তমান। তুমিই নীলবর্ণ ভ্রমর, তুমিই হরিৎ ও লোহিতবর্ণ পক্ষী, তুমিই সমুদ্র, তুমিই অনাদি, তুমিই বিভুরূপে বর্তমান রয়েছ, যাতে বিশ্বভুবনও রয়েছে।

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে ঈশ্বর কি ? না – তিনি বিভু-প্রভু। তাঁর তাহলে স্বরূপ কি ? বিভুত্ব – প্রভুত্ব বা নিয়ন্তৃত্ব। এই বিশ্ব চিৎ ও অচিৎ; চৈতন্য এবং জড় বা জড় শক্তি তাঁর বিরাট দেহ; এটি তাঁর বাহ্য বিকাশ। এটি রূপান্তরিত হয় বটে কিন্তু কখনও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না; অতএব তিনি সৎ বা সত্য। যে নিয়ম দ্বারা এই বিশ্ব পরিচালিত তা স্বতঃই মঙ্গলময়, অতএব তিনি শিব। বিশ্ব সৌন্দর্যময়, অতএব বিশ্বেশ্বর সুন্দর। সুন্দর বললে সাধারণতঃ কি বুঝি ? যেখানে যে রূপ সমাবেশ সাজে, তা থাকলেই আমরা সুন্দর বলি। সুসমাবেশের অভাবই কদর্যতা। প্রকৃতিতে কদর্য কিছু দেখা যায় না, সেখানে খাপছাড়া কিছুই নাই। অতএব ঈশ্বর সত্য শিব এবং সুন্দর।

এ বিশ্ব তাঁর নিয়ম দ্বারা নিয়মিত। তাঁর নিয়মের পরিবর্তন ঘটলে তাঁর স্বরূপকেও পরিবর্তন করতে হয়। যদি একে আর একে দুই, এই নিয়মের পরিবর্তন কিংবা তিনকে তিন দিয়ে গুণ করলে যে নয় হয়, তারও পরিবর্তন ঘটত, তাহলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকত না। এ কি কখনও বিশ্বাস করা যায় যে, ঈশ্বর সৎকে অসৎ এবং অসৎকে সৎ করতে পারেন কিংবা ভালকে মন্দ, মন্দকে ভাল, মিথ্যাকে সত্য, অসরলতাকে সরলতা, বিশ্বাসঘাতকতাকে বিশ্বস্ততায় পরিণত করতে পারেন ? এই ভারতবর্ষ নামে প্রকাণ্ড যে ভূখণ্ড রয়েছে তাতে তো কারও সন্দেহ নাই। এই ভারতবর্ষ যে একদিন ছিল, এ সত্য কি ঈশ্বর লুপ্ত করতে পারেন ? ভারতবর্ষের ভূত অস্তিত্বের লোপ সম্ভবপর হলে, ভারতবর্ষ যে বর্তমানে নাই এ কথা কি সত্য হবে ? ঈশ্বর কি তাঁর নিজের অস্তিত্ব লোপ করতে পারেন ? পরমাত্মা কি আত্মহত্যা করতে পারেন ? অথবা তিনি কি সমগ্র বিশ্বের লোপ ঘটাতে পারবেন ?

– কেন, পুরাণে ত প্রলয়ের কথা আছে। তখন নাকি সমগ্র বিশ্ব লোপ পায় ? তাহলে ত স্বীকার করতে হয় যে প্রতি প্রলয়কালে ঈশ্বর বিশ্বলয়ের খেলায় মেতে উঠেন ?

রঞ্জনের এই উক্তি শুনে অনামী বাবা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন – আরে, ঐ সব ত পুরাণের গল্প। কল্পনাপ্রিয় পুরাণকারদের কল্পকথা ও গল্পকথা ছেড়ে যুক্তিমার্গে এস। ঈশ্বর বিষয়ক কোন তত্ত্ব মীমাংসায় যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা অনুচিত, এই রকম কোন উপদেশ বা অনুশাসন বাক্য যদি শুনে থাক, তাহলে তা অবিলম্বে ভুলে যাও। সনাতন শাস্ত্র বাক্য স্মরণ কর ; 'যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।' যদি কুযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ না কর কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি বা তথাকথিত কোন শাস্ত্রের উপর নির্ভর না কর, তাহলে ক্রমেই এই সত্য

স্বতঃই তোমার মনে উদিত হবে যে পুরাণকারদের কল্পনায় যত বড় শক্তিই কল্পিত হোক না কেন, ভূত কালের কোন ব্যাপার কোনও শক্তি দ্বারা লুপ্ত হতে পারে না। তোমার পিতা পিতামহাদি ছিলেন। এমন কোন কি শক্তি আছে, যার দ্বারা তাঁরা যে ছিলেন, এ সত্যের লোপ হতে পারে। যা তোমার জ্ঞানে সত্য বলে বিবেচনা কর, তাকে তুমি সত্য বলে স্বীকার করতে বাধ্য। হতে পারে তোমার ভ্রম হয়েছে কিন্তু যে ভ্রম বলে তোমার স্থির ধারণা না হয়, সে পর্যন্ত তুমি তাকে সত্য বলেই গ্রহণ করে থাক। এটিই স্বাভাবিক নিয়ম। অতীতে যে সকল ঘটনা ঘটে গেছে, সে ব্যাপারগুলি যে পর্যন্ত ভ্রম বলে তোমার স্থির ধারণা না হয়, সে পর্যন্ত তুমি তা সত্য বলে গ্রহণ করতে বাধ্য। ভূত ব্যাপারগুলি যে ধ্বংস হতে পারে না, এ সত্যটি স্বতঃই প্রতীয়মান এবং সেগুলির ব্যত্যয় হবারও যে কোন সম্ভাবনা নাই, তাতে সন্দেহ মাত্র নাই। সত্যের ভিত্তি সত্য। যা সত্য তা ধ্বংস বিহীন। যেমন ধর তোমার অস্তিত্ব (being & becoming) একটি সত্য, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তার ব্যত্যয় ঘটাতে পারেন না। এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যের উপর দণ্ডায়মান হতে পারলে, তুমি বুঝতে পারবে যে, এক আর এক যে দুই হয়, এ কথা চিরকালই সত্য, ভূতে সত্য, বর্তমানে সত্য, ভবিষ্যতেও সত্য। তুমি বুঝতে পারবে যে, ঐ রকম গণিত শাস্ত্রের অন্যান্য সত্য, ন্যায় অন্যায় বিষয়ক সত্য, বিশ্বের নিয়মাবলী ইত্যাদি বিষয়ক সত্য চিরকালই সত্য ভূতে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে। যদি অতীতে তাদের পরিবর্তন হতে পারত তাহলে ভবিষ্যতেও তাদের পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা ঘটত। যদি অতীতে তাদের ধ্বংস থাকত, তাহলে ভবিষ্যতেও তা ধ্বংস হতে পারত। ঈশ্বর যে বিধান সৃষ্টি করেছেন, তা সার্বজনীন। ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করে তাঁর কোন বিধান রচিত হয় নি। আগুনে পোড়ে, সকলেই আগুনে পোড়ে। পাপী, পুণ্যবান, ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী অজ্ঞানী, বালক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলেই আগুনের সংস্পর্শে গেলে পুড়ে মরবে। এই নিয়মগুলি অনাদি অনন্ত। ঘড়িতে চাবি দিলাম আর ঘড়ি চলল, এ ঘটনা সে রকম নয়। বিশ্বের ঘড়ি চিরকালই একই নিয়মে চলছে, কখনও তার বিরাম নাই, বিরাম হবেও না। বিশ্ব নিয়মের অধীন—ভূতে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে। মানুষের দৈনন্দিন কাজে আমরা কি দেখি ? তুমি ঠিক দিতে ভুল করলে, এ ভুল কার ? তোমার না ঈশ্বরের ? অতিরিক্ত ভোজনে তোমার অজীর্ণ হল, এই কর্ম এবং কর্মফল—তোমার না ঈশ্বরের ? অমুক টাকা পেত, তাকে ফাঁকি দিলে – এ প্রতারণা কার ? তোমার, না, এই জন্য ঈশ্বর দায়ী ? এই রকম সব বিষয়েই বিচার করলে দেখতে পাবে জীবের কর্তৃত্ব, কর্ম ও কর্মফলে ঈশ্বরের কোন হাত নাই। তবে মূল নিয়ন্তৃত্ব অবশ্যই আছে।

> ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ,
> ন কর্মফল সংযোগঃ স্বভাবস্তু প্রবর্ততে।

তোমাদের ত বাঙ্গালী শরীর, বাংলা করলে এই শ্লোকের অর্থ দাঁড়াবে – লোকের কর্তৃত্ব কর্ম আর কর্মফল, ঈশ্বরের সৃষ্ট নয়, ঘটে থাকে স্বভাবে কেবল। তাঁর মুখে সংস্কৃত শ্লোকের প্রাঞ্জল পদ্যানুবাদ শুনে আমি আর রঞ্জন পরস্পরের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করলাম। তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আপন আবেগে বলে যেতে থাকলেন – এর মধ্যে কোন দৈব বা অমানুষিক শক্তির খেলা নাই, এ তোমরা বেশ বুঝতে পারছ। কিন্তু আর একটু বুঝতে হবে, বুঝতে হবে ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ন্তৃত্ব।

কার্যকারণের নিত্য নিয়মাধীন এই বিশ্ব। কার্যকারণের নিয়মাধীনই যদি জগৎ হয়, তাহলে জগদীশ্বরের স্তবস্তুতির স্থান কোথায় ? যতই স্তবস্তুতি কর না কেন, ধানের বীজ হতে গম জন্মাবে না। জ্ঞানী অজ্ঞানী ধনী দরিদ্র সকলকে ধানবীজ হতে ধান উৎপাদন করতে হয়। কারণ ধান উৎপাদনের নিয়মের মধ্যে ধানের সত্তা রয়েছে। যেমন খাদ্যোৎপাদনে তেমনি মনুষ্য উৎপাদনে। এক কথায় – বিশ্বস্থ তাবৎ উৎপাদনেই নিয়মের

থাকলে কঙ্কার থাকে না, দেহ না থাকলে মন থাকে না, তার মানে মনের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, এরই নাম তো আপনারা দিয়েছেন জড়বাদ। তাই না? কিন্তু কখনও ভেবে দেখেছেন কি মন না থাকলে জড় যে আছে এর উপলব্ধিটি কে করবে? অন্ততঃ এ কথাটা ত স্বীকার করবেন যে জড়কে জড় বলে উপলব্ধির জন্য অন্ততঃ একটা মন চাই। মন না থাকলে জড়ও থাকে না। হয়ত আপনারা বলে বসবেন – জড় থাকে, তার উপলব্ধি থাকেন না। তাহলে জড়ের সংজ্ঞাটা (definition) কি? পূর্বে ত,বলা হত বিস্তৃতি (extension) অর্থাৎ একটা পরমাণু যে স্থান জুড়ে আছে, সেখানে অন্য একটি পরমাণু বসতে পারে না, অপরকে সে বাধা দেয়, তার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য করে। বৈজ্ঞানিকগণ এখন আবার পরমাণুকেও ভেঙ্গে ফেলেছেন, তাঁদের মতে পরমাণুও শেষ তত্ত্ব নয়, প্রত্যেকটি পরমাণু ইলেকট্রন ও প্রোটন দ্বারা গঠিত অর্থাৎ একটি প্রোটনের চারদিকে কতকগুলি ইলেকট্রন নেচে বেড়াচ্ছে। আমাদের কোনও পুরাণে একে রাসনৃত্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কিন্তু পরমাণুর স্বরূপ। ইলেকট্রন প্রোটনের কোনও ঘনত্ব নাই। তারা বিদ্যুতের মত একটা শক্তি প্রবাহ মাত্র। একটি ধনাত্মক (Positive), অপরটি ঋণাত্মক (Negative) বিদ্যুৎস্রোত। এরা ঠিক বস্তু নয় শক্তি (energy) মাত্র। বস্তুর স্বরূপ এই যে তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য – চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা তাকে ধরা ছোঁয়া যায়। শক্তি কিন্তু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়। 'নিস্তত্ত্বা কার্যগম্যা' শক্তির স্বরূপ আমাদের জানা নাই, তার ফলটাকে দেখি মাত্র। আমরা অগ্নিও দেখি, দগ্ধ তৃণকে দেখি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করি কিন্তু অগ্নির দাহিকা শক্তিটাকে দেখি না, তা কেবল অনুমান করে নিই। এই অনুমান করবার জন্য মনের প্রয়োজন। মন না থাকলে অনুমান থাকে না। অতএব মন না থাকলে শক্তি যে আছে, সেই সংবাদটি কে বলে দিবে? বস্তুকেই চূড়ান্ত পদার্থ বলে গণ্য না করে শক্তিকে চূড়ান্ত পদার্থ বলে গণ্য করলেও মনকে অস্বীকার করার কোন যুক্তিগ্রাহ্য হেতু নাই। কারণ মনও চিন্তাশক্তি মাত্র – শক্তিরই একটা প্রকার ভেদ। এমনও বলা যেতে পারে যে শক্তিই একমাত্র entity বা তত্ত্ব। তার এক কোটিতে আছে জড় আর অপর কোটিতে আছে চিতি বা চৈতন্য। দেহ ও মন এই দুই তত্ত্ব নিয়ে জগৎ গঠিত। কিন্তু তাদেরও অতিরিক্ত (beyond those) আর একটি তৃতীয় তত্ত্বও আছে তার নাম শক্তি তত্ত্ব, আমাদের শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (১/৭) যার সম্বন্ধে বলা হয়েছে তস্মিন্ ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরং চ।

কাজেই চেষ্টা করেও আমি শ্রুতি উল্লেখিত ঐ শক্তি তত্ত্বকে অস্বীকার করতে পারি নি, তাই জড়বাদী সাজতে পারি নি। আবার ঐ অনন্তশক্তিকে শুধু চিন্ময় বলে মনে করে তৃপ্ত হতে পারি নি, তাঁকে মঙ্গলময় ও আনন্দময় বলেও মনে হয়েছে। মঙ্গল ও আনন্দের উৎস ত খুঁজে পাই না তাই জড়বাদী সাজার চেষ্টা করলেও জড়বাদী হতে পারলাম না। জড়চিতির অন্তরাল হতে ব্রহ্ম সর্বদাই উঁকি দেন।

আমাদের উপনিষদগুলি পড়লে, সুখের কথা ইংরাজ অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার সেগুলি ইংরাজীতে সরলভাবে অনুবাদ করেছেন, জার্মান ভাষাতেও তার অনেক রকম অনুবাদ বেরিয়েছে, আপনি বিশেষ করে বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণ পড়লেই দেখবেন, সেখানে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালক আরুণির প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন –

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৩ ॥

যিনি পৃথিবীতে বাস করছেন, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে রয়েছেন, পৃথিবী যাঁর বিষয় জ্ঞাত নয়, পৃথিবী যাঁর শরীর, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে থেকে পৃথিবীকে নিয়মিত করছেন, তিনিই

তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী অর্থাৎ যিনি সকলের অন্তরে থেকে সকলকে নিয়মিত করেন, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত।

যো অপ্সু তিষ্ঠন্ অদ্ভ্যোঽন্তরো যমাপো ন বিদুর্যস্যাঽপঃ শরীরং যোঽপোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৪ ॥

যিনি জলে বাস করছেন, যিনি জলের অভ্যন্তরে রয়েছেন, জল যাঁর বিষয় জ্ঞাত নয়, জল যাঁর শরীর, যিনি জলের অভ্যন্তরে থেকে জলকে নিয়মিত করছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত ॥

যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নেরন্তরো যমগ্নির্ন বেদ যস্যাগ্নিঃ শরীরং যোঽগ্নিমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৫ ॥

যিনি অগ্নিতে বাস করছেন, যিনি অগ্নির অভ্যন্তরে রয়েছেন, অগ্নি যার বিষয় জ্ঞাত নয়, অগ্নি যাঁর শরীর, যিনি অগ্নির অভ্যন্তরে থেকে অগ্নিকে নিয়মিত করছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অমৃত।

যোঽন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্নন্তরিক্ষাদন্তরো যমন্তরিক্ষং ন বেদ যস্যান্তরিক্ষং শরীরং যোঽন্তরিক্ষমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৬ ॥

যিনি অন্তরীক্ষে বাস করছেন, যিনি অন্তরীক্ষের অভ্যন্তরে রয়েছেন, অন্তরীক্ষ যাঁর বিষয়ে জ্ঞাত নয়, অন্তরীক্ষ যাঁর শরীর, যিনি অন্তরীক্ষের অভ্যন্তরে থেকে অন্তরীক্ষকে নিয়মিত করছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত ॥

যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরো যঃ বায়ু র্ন বেদ যস্য বায়ু শরীরং যো বায়োরন্তরো যং বায়ুরন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৭ ॥

যিনি বায়ুতে বাস করছেন, যিনি বায়ুর অভ্যন্তরে রয়েছেন, বায়ু যাঁর বিষয় জ্ঞাত নয়, বায়ু যাঁর শরীর, যিনি বায়ুর অভ্যন্তরে থেকে বায়ুকে নিয়মিত করছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত।

যো দিবি তিষ্ঠন্দিবোঽন্তরো যং দ্যৌর্ন বেদ যস্য দ্যৌঃ শরীরং যো দিবমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৮ ॥

যিনি স্বর্গে বাস করছেন, যিনি স্বর্গের অভ্যন্তরে রয়েছেন, স্বর্গ যাঁর বিষয় জ্ঞাত নয়, স্বর্গ যাঁর শরীর, যিনি স্বর্গের অভ্যন্তরে থেকে স্বর্গকে নিয়মিত করছেন, তিনি তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত।

য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাঽদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৯ ॥

যিনি আদিত্যে বাস করছেন, যিনি আদিত্যের অভ্যন্তরে রয়েছেন, আদিত্য যাঁর বিষয় জ্ঞাত নয়, আদিত্য যাঁর শরীর, যিনি আদিত্যের অভ্যন্তরে থেকে আদিত্যকে নিয়মিত করছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত।

য দিক্ষু তিষ্ঠন্দিগ্‌ভ্যোঽন্তরো যং দিশো ন বিদুর্যস্য দিশঃ শরীরং যো দিশোঽন্তারো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যামমৃতঃ ॥ ১০ ॥

যিনি দিক সমূহে বাস করছেন, যিনি দিক্‌সমূহের অভ্যন্তরে রয়েছেন, দিক্‌সমূহ যার বিষয়ে জ্ঞাত নয়, দিক্‌সমূহ যাঁর শরীর, যিনি দিক্‌সমূহের অভ্যন্তরে থেকে দিক সমূহকে নিয়মিত করছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত ॥

যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠংশ্চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্রতারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্রতারকমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১১ ॥

যিনি চন্দ্রে ও নক্ষত্রসমূহে বাস করছেন, যিনি চন্দ্র ও নক্ষত্রের অভ্যন্তরে রয়েছেন। চন্দ্র ও নক্ষত্র সমূহ যাঁর বিষয় জ্ঞাত নয়, চন্দ্র ও নক্ষত্র সমূহ যাঁর শরীর, যিনি চন্দ্র ও নক্ষত্র

অভ্যন্তরে থেকে চন্দ্র ও নক্ষত্র সমূহকে নিয়মিত করছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত।

য আকাশে তিষ্ঠন্নাকাশাদন্তরো যমাকাশো ন বেদ যস্যাকাশঃ শরীরং য আকাশমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১২ ॥
যিনি আকাশে বাস করছেন, যিনি আকাশের অভ্যন্তরে রয়েছেন, আকাশ যাঁর বিষয় জ্ঞাত নয়, আকাশ যাঁর শরীর, যিনি আকশের অভ্যন্তরে থেকে আকাশকে নিয়মিত করছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত।

যস্তমসি তিষ্ঠংস্তমসোহন্তরো যং তমো ন বেদ যস্য তমঃ শরীরং যস্তমোহন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৩ ॥
যিনি অন্ধকারে বাস করছেন, যিনি অন্ধকারের অভ্যন্তরে রয়েছেন, অন্ধকার যাঁর বিষয় জ্ঞাত নয়, অন্ধকার যাঁর শরীর, যিনি অন্ধকারের অভ্যন্তরে থেকে অন্ধকারকে নিয়মিত করছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত।

যস্তেমসি তিষ্ঠংস্তেজসোঽন্তরো যং তেজো ন বেদ যস্য তেজঃ শরীরং যস্তেজোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃত ইত্যধিদৈবত যথার্বিভূতম্ ॥ ১৪ ॥
যিনি তেজে বাস করছেন, যিনি তেজের অভ্যন্তরে রয়েছেন, তেজ যাঁর বিষয় জ্ঞাত নয়, তেজ যাঁর শরীর, যিনি তেজের অভ্যন্তরে থেকে তেজকে নিয়মিত করছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত।

এইগুলির দ্বারা ব্রহ্মের আধিদৈবিক সম্বন্ধ অর্থাৎ দেবতাদের সঙ্গে তাঁর যা সম্বন্ধ তা বলা হল। এখন ব্রহ্ম হতে স্তম্ব পর্যন্ত ভূত সমূহের সঙ্গে তাঁর যে সম্বন্ধ অর্থাৎ ভৌতিক সম্বন্ধের কথা বলব।

যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্বানি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃত ইত্যধিভূতমথাধ্যাত্মম্ ॥ ১৫ ॥
যিনি ভূত সমূহে বাস করছেন, যিনি ভূত সমূহের অভ্যন্তরে রয়েছেন, ভূত সমূহ যাঁর বিষয় জ্ঞাত নয়, ভূত সমূহ যাঁর শরীর, যিনি ভূত সমূহের অভ্যন্তরে থেকে ভূত সমূহকে নিয়মিত করছেন, তিনি তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত।

এইগুলির দ্বারা ব্রহ্মের আধিভৌতিক সম্বন্ধের কথা বলা হল। এইবার তার আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের কথা বলব।

যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৬ ॥
যিনি প্রাণে বা জীবাত্মায় বাস করছেন, যিনি প্রাণের অভ্যন্তরে রয়েছেন, প্রাণ যাঁর বিষয় জ্ঞাত নয়, প্রাণ যাঁর শরীর, যিনি প্রাণের অভ্যন্তরে থেকে প্রাণকে নিয়মিত করছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত।

যো বাচি তিষ্ঠন্ বাচোঽন্তরো যং বাঙ্ ন বেদ যস্য বাক্ শরীরং যো বাচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৭ ॥
যিনি বাক্যে বাস করছেন, যিনি বাক্যের অভ্যন্তরে রয়েছেন, বাক্য যাঁর বিষয় জ্ঞাত নয়, বাক্য যাঁর শরীর, যিনি বাক্যের অভ্যন্তরে থেকে বাক্যকে নিয়মিত করছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত।

যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠংশ্চক্ষুষোহন্তরো যং চক্ষুর্নবেদ, যস্য চক্ষুঃ শরীরং যশ্চক্ষুরন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৮ ॥

যিনি চক্ষুতে বাস করছেন, যিনি চক্ষুর অভ্যন্তরে রয়েছেন, চক্ষু যাঁর বিষয় জ্ঞাত নয়, চক্ষু যাঁর শরীর, যিনি চক্ষুর অভ্যন্তরে থেকে চক্ষুকে নিয়মিত করছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত।

যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠং শ্রোত্রাদন্তরো যং শ্রোত্রং ন বেদ যস্য শ্রোত্রং শরীরং যঃ শ্রোত্রমন্তরোঃ যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৯ ॥
যিনি কর্ণে বাস করছেন, যিনি কর্ণের অভ্যন্তরে রয়েছেন, কর্ণ যার বিষয় জ্ঞাত নয়, কর্ণ যাঁর শরীর, যিনি কর্ণের অভ্যন্তরে থেকে কর্ণকে নিয়মিত করছেন তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত।

যো মনসি তিষ্ঠন্ মনসোঽন্তরো যং মনো ন বেদ যস্য মনঃ শরীরং যো মনোঽন্তরোঃ যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ২০ ॥
যিনি তোমার মনের মধ্যে বাস করছেন, যিনি মনের অভ্যন্তরে রয়েছেন, মন যাঁর বিষয় জ্ঞাত নয়, মন যাঁর শরীর, যিনি মনের অভ্যন্তরে থেকে মনকে নিয়মিত করছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত।

যস্ত্বচি তিষ্ঠং সত্বচোঽন্তরো যং ত্বঙ্ ন বেদ যস্য ত্বক্ শরীরং যস্ত্বচমন্তরো যময়ত্যষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ২১ ॥
যিনি ত্বকে বাস করছেন, যিনি ত্বকের অভ্যন্তরে রয়েছেন, ত্বক যাঁর বিষয় জ্ঞাত নয়, ত্বক যাঁর শরীর, যিনি ত্বকের অভ্যন্তরে থেকে ত্বককে নিয়মিত করছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত।

যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃত ঃ ॥ ২২ ॥
যিনি জ্ঞানে বাস করছেন, যিনি জ্ঞানের অভ্যন্তরে রয়েছেন, জ্ঞান যাঁর বিষয় জ্ঞাত নয়, জ্ঞান যাঁর শরীর, যিনি জ্ঞানের অভ্যন্তরে থেকে জ্ঞানকে নিয়মিত করছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত।

যো রেতসি তিষ্ঠন্ রেতমোহন্তরো যং রেতো ন বেদ, যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ২৩ ॥
যিনি রেতে অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের রজোবীর্যে বাস করছেন, যিনি রেতের অভ্যন্তরে রয়েছেন, রেত যাঁর বিষয় জ্ঞাত নয়, রেত যাঁর শরীর, যিনি রেতের অভ্যন্তরে থেকে রেতকে নিয়মিত করছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত।

আমার কথা শুনে সাহেব আমার দিকে কতক্ষণ এক দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, তাহলে আপনার বক্তব্যের সারকথা এই যে, একমাত্র আত্মাই অন্যের দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে দর্শন করেন, শ্রুতির অগ্রাহ্য হয়ে শ্রবণ করেন, মনের অগ্রাহ্য হয়েও মনন করেন, জ্ঞানের অগ্রাহ্য হয়েও জানেন। তাহলে আপনার মতে কি মানুষের দৃষ্টিতে জ্ঞানে ও মনের rangeএ যা কিছুর ছায়া পড়ে সে সব কিছু আত্মাময়? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুই আত্মা দ্বারা নিয়মিত? জীবাত্মা মাত্রেই তাঁর শরীর মাত্র? এবং তিনি জীবাত্মা মাত্রেরই নিয়ন্তা? তাঁর অপরিবর্তনীয় নিয়মে সমগ্র বিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে? তিনি কেবল সাক্ষী ও দ্রষ্টা স্বরূপ হয়ে রয়েছেন?

আমি সাহবকে হাত জোড় করে নিবেদন করলাম, যাজ্ঞবল্ক্য কথিত ঐ সব শ্রুতিবাক্য শুনে উদ্দালক আরুণি তাঁকে আর কোন প্রশ্ন করেন নি — ততো হ উদ্দালকো আরুণিরুপররাম অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ রকম উত্তর শুনে উদ্দালক আরুণি 'উপররাম' অর্থাৎ কিনা প্রশ্ন থেকে ক্ষান্ত হয়েছিলেন, আপনিও দয়া করে এবার ক্ষান্ত হোন। রাত্রি ১টা বেজে গেছে।

— Still then Brahmachariji, where have you brought me ? এ আপনি আমাকে কোথায় এনে ফেললেন ? আমি বললাম, সাহেব ! আমি আপনাকে আনি নি, আপনি নিজেই এসে পড়েছেন ! এক বিশেষ স্থানে আবদ্ধ না থেকে আপনি যখন পর্যটন করতে করতে সুদূর জার্মানী থেকে এত দূরে নর্মদা তটে এসে পৌছে গেছেন, তখন আরও কিছুদিন পর্যটন করুন, নর্মদার মাহাত্ম্য আমি যতটুকু বুঝেছি, অনামী বাবা কথিত কার্যকারণ সম্বন্ধে একদিন দেখবেন, আপনার জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হয়ে যাবে, তাকেই আমরা হিন্দুরা দীক্ষা বলে থাকি। কানে ফুঁ দেওয়ার নাম দীক্ষা নয়, ভগবানের অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে গেলেই বুঝতে হবে দীক্ষা হয়ে গেল। মা নর্মদার কাছে প্রার্থনা করি, আপনার জীবনে সেই শুভলগ্নের আবির্ভাব ঘটুক। amen, শিবমস্তু। অনামী বাবাকে আমাদের প্রণাম জানিয়ে যাচ্ছি, সকালে উঠেই আমরা চলে যাব আমাদের পথে।

একে একে সবাই যে যার ঘরে শুতে গেলেন, আমরাও কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। এক ঘুমেই সকাল সাতটা। আমরা তাড়াতাড়ি বিছানা কম্বল গুছিয়ে টিলা থেকে নামতে লাগলাম। ঠাণ্ডার জন্য সকলেরই ঘর বন্ধ। আমরা নামতে নামতে টিলার উপর দিকে নজর দিতেই দেখলাম, সবেমাত্র সূর্যোদয় হচ্ছে আর সেই উদীয়মান সূর্যের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নগ্নগাত্রে উলঙ্গ অনামী বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা দুজনেই তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালাম। রঞ্জনকে বললাম, বুঝতে চেষ্টা কর, অন্তর্যামীত্বের অধিকারী এই মহাপুরুষ কেমন garb নিয়ে নর্মদা তটে বাস করছেন। লোকে তাঁকে নাস্তিক ও অর্ধোম্মাদ বলে গালি দিচ্ছে, তিনি সাধারণের কাছে খুবই অপ্রিয়, সেদিকে তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। সাধারণের কাছে হাততালি পাবার জন্য তাঁর কোন আগ্রহ নাই উৎসাহও নাই। তিনি ভুলেও কারও কাছে ঈশ্বর ভক্তি প্রচার করেন না। নর্মদাতটের অধিকাংশ উচ্চকোটির মহাত্মাকে দেখেছি, তাঁদের কেউ কেউ একেবারে রহস্যের ঘনীভূত বিগ্রহ !

রঞ্জন বলল, তা আপনি যাই বলুন, অনামী বাবার এইরকম ভাবে লোকের সঙ্গে অদ্ভুত আচরণের কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আমার মগজে ঢোকে না। আপনি হয়ত বলবেন, সাধুদের বিচিত্র আচরণের কোনও ব্যাখ্যা সাধারণের মাথায় ঢুকবে না।

– তা কেন, তুমি একথা ত স্বীকার করবে আমাদের স্কুল বা কলেজ জীবনে যখন শ্লেট বা ব্ল্যাক বোর্ডে কিছু লিখতে হত তখন আগে আমাদেরকে কি করতে হত ? একটা কাপড়ের ডাস্টার (duster) দিয়ে শ্লেট বা ব্ল্যাক বোর্ডটাকে ভাল করে মুছে নিতে হত না কি ? ভাল করে পরিচ্ছন্ন কোন বোর্ড ছাড়া কি তাতে নূতন লেখা ফোটে ? আমি যদি বলি ঐ মহাত্মার কাছে সমাগত ভক্তদের প্রত্যেকের সযত্ন পোষিত বহুদিন হতে সযত্ন লালিত ও অর্জিত সংস্কার ও জ্ঞানে ধাক্কা বা নাড়া দিবার জন্য তিনি প্রথমেই ঐ রকম ভাবে জগতের মূলে শুধু একটা অলঙ্ঘ্য নিয়ম বর্তমান, সেই নিয়মকে মেনে চলা উচিত, নিয়মই প্রত্যেক মনুষ্য জীবনের নিয়তি, এই রকমভাবে বলে ভক্তের মানসিক গঠনকে প্রস্তুত করার প্রয়াস করেন তাতে দোষ কি ? মানুষকে যে ঈশ্বরের কথা বলবেন বা কোন উপাস্য দেবতা বা ইষ্টের কথা বলবেন, সে পথে বিপদ কম নয় ! ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, শিব, শীতলা, কালী তারা, গঙ্গা, গায়ত্রী, গোবিন্দ প্রভৃতি কেউ না কেউ প্রত্যেকেরই এক একটা দেবতা আছে এবং প্রত্যেক মানুষ তাঁর স্ব স্ব কল্পিত দেবতার ঈশ্বরত্বে এমন টেক করে বসে আছেন যে তার বিপরীত দেবতা বা যোগ পদ্ধতির নাম শুনলেই নিজের কল্পিত ইষ্টের অনুকূলে এমন কূটকচালি এবং তর্কের ঝড় বইয়ে দিবেন, তাতে কোন মীমাংসা হবে না; মহাপুরুষ তাঁর জীবনব্যাপী সাধনায় যে সত্য উপলব্ধি করেছেন, সেই সত্যের কথা বলার সুযোগই পাবে না। মহাপুরুষরা সাধারণতঃ এই আজে বাজে লোকের ভিড় পছন্দ করেন না, সাধারণে নিন্দাবন্দনাকেও গ্রাহ্য করেন না। যদি কেউ Colourfree mind-এ তাঁর কথা গ্রহণ করতে

পারে এবং টিকে থাকতে পারে তবেই না তার মনে সত্য জ্ঞান সত্য শিক্ষা সত্য ভাব সঞ্চারিত করা সম্ভব হয় ?

আপনি কি আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা, ভারতবিখ্যাত অদ্বিতীয় বৈদিক পণ্ডিত মহর্ষি দয়ানন্দের নাম শুনেছেন ? তাঁর জীবনী জানেন কি ? তিনি গুজরাটের অন্তর্গত কাথিয়াবাড়ের নিকট টঙ্কার নামক গ্রামে এক ধনাঢ্য উদীচ্য ব্রাহ্মণ রাজকর্মচারী কর্ষণজী ত্রিপাড়ীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে। আট বৎসর বয়সে উপনয়নের পরে একদিন শিবরাত্রির দিনে তিনি পিতার সঙ্গে সারাদিন উপবাসে থেকে প্রহরে প্রহরে শিবপূজা করার সময় একটি ইঁদুরকে শিবলিঙ্গের মাথায় উঠে আতপচাল খেতে দেখে তাঁর মনে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে অনাস্থা দেখা দেয়। তিনি তাঁর এক সহোদরা এবং স্নেহময় কাকার অকালমৃত্যু দেখে জীবনের পরিণাম সম্বন্ধেও বীতরাগ হয়ে পড়েন। তিনি সংসার ত্যাগ করেন। তারপর এই নর্মদার ধারেই চানোদ-কল্যাণী নামক স্থানে শৃঙ্গগিরি মঠ হতে আগত পূর্ণানন্দ সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৪ বৎসর। সন্ন্যাসের পর তাঁর নাম হয়, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। তিনি বাল্যকাল থেকেই খুব মেধাবী ছিলেন। বেদজ্ঞ পিতার শিক্ষাধীনে মাত্র দশ বৎসর বয়সেই তিনি সমগ্র যজুর্বেদ কণ্ঠস্থ করতে পেরেছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি ১৭ বৎসর কাল ধরে পাণিনি ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র, বেদান্ত এবং বেদ অনুশীলন করে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আগ্রা, কানপুর, ঢোলপুর, করোলি, আজমীর, হরিদ্বার, কর্ণবাস, রামঘাট, অনুপনগর লাহোর কাশী প্রভৃতি স্থানে বৈদিক ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি কোলকাতাতেও গিয়ে বেদের প্রকৃত শিক্ষা প্রচার করেন। চন্দ্রশেখর সেন, মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি, সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সিটি কলেজের অধ্যক্ষ কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি কৃতী বাঙ্গালী তাঁর কাছে গিয়ে শাস্ত্রের নানা কূটতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে বেদের প্রকৃত ব্যাখ্যা শুনে অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন। কিন্তু সে সব প্রসঙ্গ ছেড়ে আমি তাঁর যে বিষয়টি তোমাকে বলতে চাচ্ছি, সেটি হল দয়ানন্দজীর বয়স যখন ৩৯, সেই সময় তিনি নানাস্থান পর্যটন করতে করতে মথুরায় দণ্ডীস্বামী ব্রহ্মবিৎ বৃদ্ধ এবং অন্ধ স্বামী বিরজানন্দের নিকট উপস্থিত হন। বিরজানন্দ ছিলেন তৎকালীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদিক পণ্ডিত। তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎকার বড়ই চিত্তাকর্ষক। তিনি দয়ানন্দকে বলেন – 'সামনের ঐ যমুনা নদীতে ডুব দিয়ে এস। জলে যেমন ভাবে গাত্র মার্জনা করে অবগাহন করলে [illegible] এবং গাত্রের ময়লা উঠে যায়, তেমনি ভাবে সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে শুদ্ধ ও শুচি হয়ে, এক কথায় তোমার সকল অধীত বিদ্যা এবং দৃঢ়মূল সংস্কার বিসর্জন দিয়ে আমার কাছে এস এবং নূতনভাবে বেদের পাঠ গ্রহণ কর। আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে – 'সত্য শাস্ত্রের উদ্ধারে আজীবন কৃতসংকল্প থাকবে, অবৈদিক মিথ্যা মতবাদের খণ্ডন করবে এবং বৈদিক ধর্ম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করব।' বলা বাহুল্য, দয়ানন্দজী যমুনাতে ডুব দিয়ে এসে, সংস্কার মুক্ত মনে অর্থাৎ তাঁর জীবনের শ্লেটটিকে ধুয়ে মুছে বিরাজনন্দ জীউর পদ প্রান্তে বসে দীর্ঘ ৬ বৎসর কাল ধরে নূতন করে বেদের পাঠ নিতে থাকেন এবং জীবনে কৃতকৃত্য হয়ে বেদ প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। এইভাবে কল্যাণকামী গুরুরা শিষ্যের জীবনের পট পরিবর্তন ঘটান। অনামী বাবার হয়ত সেই রকম গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। না হলে দেখলে না রাত্রে যাঁর কাছে নিয়মের জয়গান শুনলাম, সকালে নিজেদের চোখেই দেখে এলাম, তিনি নবোদিত জ্যোতির্ময় সূর্যের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বৈদিক ভর্গদেবের উপাসনায় রত।

যাই হোক, এবারে একটু সাবধানে পথ চল রঞ্জনবাবু ! না হলে হোঁচট খাবে ! সামনে বন পথে সারি সারি সাদা সাদা শিমুল গাছ দেখতে পাচ্ছি, কাণ্ডগুলি যেমন কণ্টাকাকীর্ণ তেমনি সাদা সাদা ফুলে শোভিত । সাঁই সাঁই শব্দে কত শকুন উড়ে এসে ঝাঁকে ঝাঁকে বসছে দেখ ! আমার মনে পড়ে গেল প্রিয় কালিয়াড়া গ্রামটির কথা । গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে কংসাবতী নদী বয়ে চলেছে । গ্রামের পশ্চিম পাড়াতে কাঁসাই নদীর ধারে আমাদের প্রিয়তম পিতৃপুরুষের ভিটা । আমাদের দক্ষিণ দুয়ারী ঘর থেকে বেরিয়ে মিনিট খানিক পশ্চিম দিকে হাঁটলে নাপিতদের বাঁশ বাগান, বাঁশ বাগান পেরিয়ে নদীর বাঁধে উঠলেই মাইল খানিক ব্যাপী ডাহি মাঠ নিচেই নদী, নদীর কোল ঘেঁষে ধু ধু করছে শুধু বালি আর কাশবন । নদীর পাড়ে অজস্র কল্‌কে গাছ ঘেরা বুড়ী শীতলার মন্দির ছাড়া যতদূর চোখ যায়, সবই ফাঁকা, নির্জন, কোন বাড়ী ঘর নাই । আষাঢ় শ্রাবণে বন্যা এলে সে সব জায়গা জলে ডুবে যায় বলে বাঁধের এ পারেই যত লোকজনের বসতি । আমাদের এবং নাপিতদের বাড়ী থেকেই পল্লী শুরু হয়েছে । আমরা দিনের বেলাতেই হোক কিংবা সন্ধ্যাকালেই হোক, বাঁধের উপর উঠলেই সারি সারি শিমুলগাছ এবং এইরকম কদাকার শকুন পাখী দেখতে পেতাম, একটা ভুতুড়ে আবহাওয়ায় মন ভরে যেত । কিন্তু নর্মদাতটের এই স্থানটিতে যদিও কাছেই পাহাড় এবং আমাদের গ্রামের নদীপাড়ের মতই শ্মশান, শিমুলগাছ এবং কদাকার শকুনের ভিড়, তবুও মনে কোন ভয় দেখা দিচ্ছে না, গা ছম্ ছম্ করছে না, অতিপ্রাকৃত পরিবেশের পরিবর্তে একটা শান্ত সৌম্য অনুভূতিতে মন ভরে গেল । যুক্তেশ্বরী মা কথিত নির্জন বটগাছের তলায় শ্মশানেশ্বর মহাদেবও নির্জন আকাশের তলায় বিরাজমান আছেন দেখলাম । তাঁর চারদিকেই দেবকাঞ্চন ফুলের মেলা দেখে দু চোখ জুড়িয়ে গেল । আমি রঞ্জনকে বললাম – তোমার কি মনে হচ্ছে না যে, বিশ্বদেবের উপাসনা, এমন স্থানেই সম্ভব ও সার্থক ?

– নিশ্চয়ই, এই দণ্ডেই দূরে মা নর্মদার ধারা দেখতে পেয়েই, আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহলে আমি একটা নূতন গান বেঁধেছি, একতারাটি নিয়ে একটা গান গাই । এখন ত বেলা ৮টাও বাজে নি । আর একটু এগিয়ে চলুন না, বটতলায় শিবের কাছে বসেই শিব-নন্দিনীর গানটা গাই ।

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতেই সে দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল বটগাছের দিকে । বটগাছের ছায়ায় পৌঁছে আমরা উভয়েই ৩ ফুট দীর্ঘ কর্কশ মূর্তি মহাদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জানাবার পর রঞ্জন গান ধরল –

শিব দুহিতে তপোময়ী মাতঃ
বসুধা কণ্ঠহার !
স্বরগ সোপান চরণে তোমার
নিবেদন বারবার –
(যেন) করি গো বসতি মা তোমার তীরে
পান করি তব নির্মল নীরে,
তরঙ্গ তব করি দরশন,
তব নাম মনে করিয়ে স্মরণ
তোমারে আঁখিতে আঁকিতে আঁকিতে
বিসর্জি-তনু-ভার ;
এ মম কামনা – কর মা পূরণ
নর্মদে-জগ-সার !

রঞ্জনের কণ্ঠস্বরে যে একটা মাধুর্য আছে, তার স্বাদ আগেই পেয়েছি। কিন্তু এই মুহূর্তে তার আবেগ কম্পিত ভাব বিহ্বল স্বরচিত কণ্ঠের ব্যঞ্জনা, এই রকম পাহাড়ের কোলে নির্জন নিস্তব্ধ শ্মশানের গম্ভীর পরিবেশে বড়ই অপরূপ শোনাল। আমরা আবার মহাদেবকে প্রণাম করে এক সার শিমুলগাছ ও জংলী গাছের জটলা পেরিয়ে কিছু দূরে নর্মদার খোরে সশস্ত্র একদল মানুষের সমাবেশ দেখে থমকে দাঁড়ালাম। নদীর কোল থেকে কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে দেখে অনুমান করলাম, চারিদিকে শ্মশানের অর্ধদগ্ধ কাঠ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, শুনেও এসেছি এটি মহাশ্মশান তাহলে নিশ্চয়ই ওখানে শবদাহ হচ্ছে। আমাদের বাংলাদেশের শববাহকরা শববহন ও শবদাহ কালে যেমন হরিবোল – বল হরি হরি বোল কিংবা অন্যত্র যেমন রাম নাম সত্য হ্যায় প্রভৃতি ধ্বনি দেয়, এখানে তেমনি ধ্বনি উঠছে – হর নর্মদে হর। আমরা গাঁঠরী কমণ্ডলু ইত্যাদি নিয়ে ধীরে ধীরে নর্মদার ঘাটের দিকে এগোতে লাগলাম। প্রস্তরময় কঠিন উঁচু-নিচু পথ প্রায় দশমিনিট হেঁটে আমরা পৌঁছে গেলাম নর্মদার ঘাটে। যে ঘাটে শবদাহ হচ্ছে, এটি তার পাশের ঘাট। চিতায় শবকে শায়িত করে কয়েকজন শিখাধারী ব্রাহ্মণ চারটি ঘট থেকে জল, দুধ, মধু, দই, ঘৃত ইত্যাদি ছিটিয়ে চিতায় অগ্নি সংযোগ করে উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। আমরা দূর থেকে যে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখেছিলাম, তা হল চিতা থেকে কিছু দূরে মৃত ব্যাক্তির ব্যবহৃত কম্বল তোষক বালিশ কোর্তা, মির্জাই প্রভৃতি পৃথক একটি স্থানে আগুনে দগ্ধীভূত করা হচ্ছে, সেটা তারই ধোঁয়া। তাঁদের উচ্চারিত মন্ত্রের সুর স্বর ছন্দ বিন্যাস শুনে আমি বুঝতে পারলাম যে মন্ত্রটি বেদমন্ত্র। তাঁরা গমকে গমকে মূর্চ্ছনা সহ সমবেত কণ্ঠে উচ্চারণ করছেন –

ওঁ পূষা ত্বা ইতঃ চ্যাবয়তু প্র বিদ্বাননষ্টপশুর্ভুবনস্য গোপাঃ।
স ত্বু এতেভ্যঃ পরিদদৎ পিতৃভ্যঃ অগ্নির্দেবেভ্যঃ সুবিদত্রিয়েভ্যঃ ॥

তাড়াতাড়ি পাথরের উপর বসে পড়ে গাঁঠরী খুলে ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের সপ্তদশ সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রটি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম – এই দেখুন এটি শবদাহনের বেদমন্ত্র। এই মন্ত্রে মৃতদেহকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে, পূষণদেব তোমাকে এখান হতে নিয়ে চলুন। তিনি তোমাকে ইহলোক হতে পিতৃগণের সকাশে বহন করুন। পূষণদেব যিনি জ্ঞানী, ভুবনে যিনি রক্ষা কর্তা, তিনি তোমাকে এ স্থানে হতে উত্তম স্থানে নিয়ে যান। অগ্নি তোমাকে ঋদ্ধিদাতা দয়ালু দেবতাবর্গ ও পিতৃলোকস্থ পিতৃগণের নিকট নিয়ে গিয়ে অর্পণ করুন। শবদাহকারী ব্রাহ্মণগণ আবার একটি মন্ত্র উচ্চারণ করলেন –

অপেত বীত বি চ সর্পতাতঃ অস্মৈ এতম্ পিতরঃ লোকম্ অক্রন্।
অহোভিঃ অদ্ভিঃ অক্তুভিঃ ব্যক্তম্ যমঃ দদাতি অবসানম্ অস্মৈ ॥

আমি সঙ্গে সঙ্গে ঋগ্বেদের ঐ দশম মণ্ডলেরই ১৪ নম্বর সূক্তের ৯ নম্বর মন্ত্রটি আঙুলি দিয়ে রঞ্জনকে দেখালাম এবং বললাম – এই বেদমন্ত্রটিতে কি সুন্দর কথা বলা হয়েছে শুনুন। শবদাহকারীরা শ্মশানস্থ ভূত প্রেতদেরকে সম্বোধন করে বলছেন – যাও, দূর হও, পালাও, পালাও, এখান থেকে সরে যাও, এখন এখানে জল, আলোক ও মন্ত্রের চিৎশক্তির দ্বারা সূক্ষ্ম পিতৃলোক প্রকট হয়েছে, যম ঐ ব্যক্ত পিতৃলোকে এই মৃত ব্যক্তির জন্য আবাস নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

আমি রঞ্জনকে বললাম – এই নর্মদাতটে বৈদিক পদ্ধতিতে শবদাহ এবং আমাদের বাংলাদেশের শহর বা গ্রামের শবদাহ প্রণালীর মধ্যে কতটা যে তফাৎ তা অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। আমাদের দেশে বেদবাহ্য পদ্ধতিতে বেদবাহ্য মন্ত্রে আনাড়ী লোকরা সাপুড়ে ভুতুড়ে যা হোক করে কিছু নমো নমঃ মন্ত্রে শবদাহ করে থাকেন। দেহটা আগুনে পুড়ে ছাই করে ফেলাই যেন কাজ! কোনমতে আপদ বিদায় করে দিয়েই তাঁরা বাঁচেন। মৃত ব্যক্তির অতি ঘনিষ্ট প্রিয় ব্যক্তিরা শোকে আকুল হন ঠিকই কিন্তু শববহনকারী ও

শবদাহকারীদের কর্ণপটহবিদারী উৎকট উল্লাসধ্বনি, যথেচ্ছ মদ্যপান ও ধূমপানের ঘনঘটায় সমস্ত পরিবেশটাই জঘন্য হয়ে উঠে। মহা মহা পণ্ডিতদের ঘরেও স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান মানতে গিয়ে শোচনীয় দৃশ্যের অবতারণা ঘটে! আমি উত্তরতট পরিক্রমাকালে ধাবড়ী কুণ্ডে প্রসিদ্ধ একলিঙ্গস্বামীর আশ্রমে বর্ষার জন্য কিছুকাল আটকে থেকে তাঁর শিষ্য মহাত্মা সচ্চিদানন্দের সঙ্গে যখন ২৪ অবতারে পৌঁছি, সেখানেও একটি শবদাহের দৃশ্য দেখেছিলাম। সেখানে এবং এখানে উভয় স্থানে একই বৈদিক বিধানে বেদমন্ত্রের সাহায্যে এই অনুষ্ঠান হতে দেখলাম। উভয় স্থানেই শবদাহ পুণ্য অনুষ্ঠানের রূপ পেয়েছে, শেষ হয়েছে আকুতি ও প্রার্থনায়। অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া যে দেহধারী লোকটির জীবনের শেষ ক্রিয়া, জীবনের শেষ পুণ্যকৃত্য, শেষ পূজা, তা নর্মদাতটে এসে জীবনে সর্বপ্রথম পূর্বেও অনুভব করেছি, এখনও করলাম।

২/৩ মিনিট চুপচাপ বসে থেকে আমরা নর্মদাতে স্নান করতে নামলাম। তর্পণাদি সেরে কমণ্ডলু ভরা জল নিয়ে আমরা পাহাড়ী পথ বেয়ে আবার উঠে গেলাম সেই দেবকাঞ্চন ফুল গাছে বেষ্টিত ও শোভিত বটগাছের তলায় শ্মশানেশ্বরের মাথায় জল ঢালতে। আমাদের স্নানের বস্ত্র রোদে মিলে, ঝোলা গাঁঠরী রেখে মহাদেবের মাথায় জল ও ফুল দিলাম। পূজা করে শিবের স্থান হতে একটু দূরে দাঁড়িয়ে চারদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করছি, এমন সময়, বেলা তখন প্রায় ১১টা, নর্মদাতট ঘেঁসে বায়ুকোণ হতে তিন জন ত্রিশূলধারী নাগাকে তিনটে তামার কলসী নিয়ে আমাদের দিকেই দৌড়ে আসতে দেখলাম। আমরা কতকটা হতচকিত হয়ে তাঁদের আসার পথের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম, এমন সময় একটা মহিষীকে দেখলাম পাহাড় থেকে ধীরে ধীরে নেমে এসে একটা ঠ্যাং শিবলিঙ্গের উপরে তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল, আর তার দুগ্ধভারে কিঞ্চিৎ স্ফীত বাঁটগুলো থেকে অঝোরে দুধ ঝরে পড়তে লাগল। আমরা দেখলাম সেই দুধ গড়িয়ে পড়ছে একটা পাথরের বাঁধানো কুণ্ডে। সেই দৃশ্য দেখে আমরা দুজন এবং সদ্য আগত তিনজন নাগা থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম একেবারে চিত্রার্পিতবৎ! প্রায় আধঘন্টা ধরে দুধ ঝরে পড়ল, কুণ্ডটা ভরে গেল। দুধ দেওয়া শেষ হতেই মহিষীটা অতি সন্তর্পণে পাটা নামিয়ে নিয়ে শিবলিঙ্গকে প্রদক্ষিণ করে ধীরে ধীরে চলে গেল পাহাড়ের দিকে। ক্রমে বনের মধ্যে অদৃশ্য হল। নাগারা মহাদেবকে প্রণাম করে কুণ্ডে কলসী ডুবিয়ে দুধ নিল। এইরকম অভিনব চিত্তচমৎকারী দৃশ্যে আমাদের বাকরুদ্ধ। নাগাদের কথায় আমাদের ধ্যান ভাঙল।

– আপ্ লোগ কাঁহাসে আ রহে হৈ?

– পরিক্রমাবাসী হৈ। ইধর ভূগর্ভমে কোঈ মহাত্মা বিরাজতে হৈঁ?

তাঁরা যেদিক দিয়ে এসেছিলেন, সেই বায়ু কোণে বেশ কিছুটা দূরে একটা জঙ্গল ঘেরা জায়গা দেখিয়ে বললেন – উস্ ভূগর্ভমেঁ মহাত্মা কৃপানাথ হরবখৎ সমাধি মেঁ হৈ। উনোনে কিসীকা সাথ ভেট নাহি করতা হৈ। হমলোগ কিসীকো উনকা পাশ যানে নেহি দেতা। এ্যায়সাই উনকা আদেশ হৈ। আপ্ পরিক্রমা কর রহা হৈ, আপ্ ভাগ্যবান হৈ, আজ শ্মশানেশ্বর ভগবানকী দুগ্ধস্নান ভি দর্শন কর লিয়া। আভি কুণ্ড সে মহাদেবজী কা খাস প্রসাদী পীকর আগে বাড়িয়ে, সামনে মেঁ শূলপাণিকী ঝাড়িমেঁ ঘুষেগী। বেকার মহাত্মাকো তন্ করনেসে কেয়া ফায়দা? এই বলে তাঁরা দুধ নিয়ে গমনোদ্যত হতেই আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁদের পথ রোধ করা দাঁড়ালাম। করজোড়ে বললাম যুক্তেশ্বরী মাতাজী মহাত্মাকা পাশ ভেজা হৈ। আপ কৃপা করকে উনকা চরণো মেঁ হামার আর্জি পেশ্ করিয়ে, হমলোগ কভী মহাত্মাকো তন করনে নেহি মাংগ্‌তা। উনোনে নারাজ হোনেসে আশ্রমকা বাহারসেই সিধা চল পড়েংগে।

আমার কাকুতি মিনতি দেখে তাঁদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি বললেন – অঙ্কলেশ্বরকী মাতাজী যব্ ক্ষুদ্ ভেজা হ্যায়, দো ঘণ্টা কী বাদ আপ আইয়ে। মহারাজজীকা ব্যখান কী বাদ হম্ উনকা চরণো মেঁ আপ্‌কা আর্জি পেশ করেঙ্গে ঔর ব্যখান নেহি হোগা তো আপকা আজ ঠায়নেই হোগা। রাত মেঁ ঠায়নেকা ইন্তেজাম হম কর দেঙ্গে।

আমি মনের আনন্দে তাঁকে বহুৎ বহুৎ সুক্রিয়া এবং নমস্কার জানালাম। তাঁরা হন্ হন্ করে হেঁটে চললেন তাঁদের সেই গুহাশ্রমের দিকে। আমরা শ্মশানেশ্বরের কুণ্ড হতে কমণ্ডলু ভরে দুধ তুলে পান করলাম। রঞ্জনকে বললাম – আজ দুজনে মা নর্মদার দয়ায় এই মশানিয়া কোটেশ্বর তীর্থে এসে যে দৃশ্য দেখলাম, তার তুলনা নাই। পরিক্রমা করতে করতে অনেক অভিনব দৃশ্যই মা নর্মদা দেখিয়েছেন কিন্তু আজকের ঘটনা লোকের কাছে গল্প করলে তারা বিশ্বাসই করতে পারবে না। হুগলীতে তারকেশ্বর মহাদেব এবং মেদিনীপুর জেলায় ঝাড়েশ্বর মহাদেব সম্বন্ধে এই রকম গল্প প্রচলিত আছে যে, রাখাল বালকরা গরু চরাতে চরাতে হঠাৎ তাদের কোন বিশেষ গাইকে প্রায় প্রতিদিনই দলছুট হতে দেখে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখতে পায় বনের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে গরুটা দাঁড়িয়ে আছে আর তার বাঁট থেকে দুধ ঝরে পড়ছে, পরে সেই স্থানে মাটি খুঁড়ে তারকেশ্বর এবং ঝাড়েশ্বর মহাদেবকে আবিষ্কার করা হয়। একাধিক শিব সম্বন্ধে একই গল্প শুনে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতে পারি নি, কিন্তু আজ নিজের চোখে যা প্রত্যক্ষ দেখলাম, তাতে আর ঐ সব গল্পকে অবিশ্বাস করি কি করে ?

রঞ্জন বলল – আমার জীবনে এই অত্যদ্ভুত দৃশ্য অক্ষয় হয়ে থাকবে।

আমাদের দুজনে এইভাবে গল্প করছি, এমন সময়ে সেই শবদাহকারীদের হর নর্মদে ধ্বনি শুনে বুঝলাম, তাঁদের দাহকার্য শেষ হয়েছে, তাঁরা নর্মদাতে স্নান করে শ্মশানেশ্বরকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করতে আসছেন। তাঁরা মহাদেবকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে সেই কুণ্ড থেকে একটা কুশী ডুবিয়ে দুধ নিয়ে প্রায় প্রত্যেকেই প্রসাদ পেলেন। প্রসাদ শেষ হল। যে ব্রাহ্মণ শবদাহকালে বেদমন্ত্র পাঠ করেছিলেন তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন – হম্ পিতামহকা পাশ শোনা, উনোনে এক দফে দৈব বশাৎ দেখা থা এক মহিষী পাহাড় সে উতার কর মহাদেবকা শির পর দুধ ঢালতা থা। উস্ দৃশ্য দেখনেকে লিয়ে আজ হম্ উধর আয়ে থে। নর্মদাসে সাত মিল দূর মেঁ হম নিবাস করতা হু। শবদাহকা কাম হম্ কভী নাহি করতা হৈ, সিরিফ মশানিয়া কোটেশ্বর মেঁ এহি দৃশ্য দেখনেকা লালচ্ মেঁ হম ইন্‌লোগোঁ কা সাথ আয়ে থে। কুণ্ড মেঁ দুধ দেখনে সে মালুম হোতা হৈ কোঈ মহিষী বনসে আকার দুধ শিউজীকা উপর ঢালকে গিয়া। উহ দিব্যদৃশ্য দেখনেকা মোকা নেহি মিলা। হমারা পিতামহনে এক দফে ভাগসে দর্শন কিয়ে থা। উনকা বিচার ইহ্ থে, স্বয়মেব মাতা নর্মদা হররোজ এক এক মহিষীকা রূপ ধারণ করকে ইসী সুরতসে ভগবান শ্মশানেশ্বরকো অর্চনা করতে হৈ।

আমরা বললাম – মাতা পিতাজীকা আশীর্বাদ কী প্রভাও সে হম্ দোনো আজ প্রত্যক্ষদর্শী বন চুকে।

তাঁরা নমস্কার করে চলে গেলেন। আমি রঞ্জনকে বললাম – ব্রাহ্মণের কথায় বুঝা যাচ্ছে, দীর্ঘকাল, হয়ত আবহমান কাল থেকে এখানে এই ঘটনা ঘটে চলেছে। যাই হোক, এইবার ঘড়ি দেখ, দু ঘণ্টা কেটেছে, কি না। যদি দু ঘণ্টা কেটে গিয়ে থাকে তাহলে আমাদের মহাত্মা কৃপানাথের দর্শনে যাওয়া যাক্।

– চলুন উঠা যাক, দু ঘণ্টা হতে আর মাত্র ৫ মিনিট বাকী।

আমরা মহাদেবকে প্রণাম করে ঝোলা গাঁঠরী বগলে নিয়ে উঠে পড়লাম। কঙ্কর ও প্রস্তরময় প্রান্তরের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে আমরা পৌছে গেলাম গুহাশ্রমের ফটিকে। এক বিশাল প্রান্তরের কিছুটা অংশ, নর্মদার ধার ঘেঁষে ফরদ গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ফরদ গাছগুলি প্রায় সবই জ্যান্ত, তাদের ডালপালা বেশ উঁচু হয়ে বেড়ে যাওয়ায় বেড়ার

আড়ালে কি আছে তা দেখা যায় না। সামনে বেড়ার যে পরিসীমা দেখা যাচ্ছে তা অনুমান করলাম প্রায় দুহাজার ফুট লম্বা। ফরদ গাছের গায়ে কাঁটা থাকায় তা ডিঙিয়ে বা বিদীর্ণ করে কোন হিংস্র বন্যজন্তুর পক্ষেও প্রবেশ করা দুষ্কর। ফাটকের বাইরে একটা পাথরের যূপকাষ্ঠ, যূপকাষ্ঠের গায়ে পাথরের একটা খড়গাকৃতি যন্ত্র। তাতে আবার সিঁদুর মাখানো, দেখলেই ভয় লাগে। গেটের মধ্যে দুজন নাগাকে দুটো খড়গ্ হাতে নিয়ে পাহারা দিতে দেখলাম। মনে মনে ভাবছি এ আবার কাদের আখড়ায় এসে পৌঁছলাম, এরা কাপালিক না অঘোরী। মিনিট খানিক দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই সেই বয়োজ্যেষ্ঠ নাগা, যাঁর সঙ্গে দুঘন্টা আগেই শ্মশানেশ্বরের দুগ্ধ কুণ্ডের কাছে আলাপ হয়েছিল, তিনি এসে ফাটক খুলে দিলেন, আমরা ভিতরে ঢুকলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন — ক্যা শোচতে হো ? হমলোগ কাপালিক ইয়া অঘোরী নেহি। বাহারমেঁ যো যূপকাষ্ঠ দেখতে হো, উহ, বহুৎ পুরাণা হ্যায়। ৭৫ সাল হো গয়ে গুরুজী ইধর আয়া, ম্যায় আয়া ৩৫ সাল পহেলে। হমলোগ আনেকা পহেলে সে উহ্ যূপকাষ্ঠ ঔর পত্থরকা খড়গ্ ইধর বিদ্যমান হৈঁ। উন্‌কা পুরাণা ইতিহাস হমলোগ নেহি জানতা, গুরুজী ভী নেহি জানতা হৈ। হম্ যব আয়া, তব সে উহ যূপকাষ্ঠ ঔর হররোজ এক বন্য মহিষী আকর শ্মশানেশ্বরজী কো দুগ্ধ স্নান করাতা হৈ, ইয়ে দো আজব কাণ্ড হম দেখতা হুঁ। ওহি দুগ্ধ হমলোগ পীতে হেঁ। ইয়ে স্থান বৈদিক শব্দযোগ কা পীঠস্থান হৈ। ইধর পত্থরমেঁ কঙ্করমেঁ ধূলিমেঁ ভী শব্দ কী ধুন হৈ।

গগন গরজ ঘন বরষ হীঁ, বাজে অনহদ তূর।
লৈ লাগি তব্ জানিয়ে সম্মুখ সদা হুজুর ॥

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই মতিশঙ্খের আওয়াজ পেলাম। কোথা থেকে যে সেই গুরুগম্ভীর আওয়াজ ভেসে আসছে তা বুঝতে পারলাম না, কিন্তু সেই শব্দ শুনেই নাগাজী বললেন গুরুজী জাগ গিয়া। সমাধি সে জাগরণ হুয়া। আপ্ ইধর খাড়া রহে, হম আতে হেঁ। এই বলে তিনি পড়ি কি মরি করে দৌড় লাগালেন। প্রায় শতখানিক ফুট দৌড়ে গিয়ে আমাদের মনে হল, একটা কুঁয়ার চারপাশে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। কুঁয়ার যেটুকু অংশ মাটি থেকে উঁচু হয়ে আছে অর্থাৎ কুঁয়ার উঁচু মুখটা পাথর দিয়ে বাঁধানো বলে মনে হল। কুঁয়ার পাড়ে মুখ নিচু করে তাঁকে কিছু কথা বলতেও শুনলাম। পাড়ে মাথা ঠেকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নাগা আমাদের কাছে ফিরে এসে বললেন — আপকো হুকুম মিল গয়া, আপ্ দোনো আদমী আইয়ে। যুক্তেশ্বরী মায়ী ঔর হমারা গুরুজী একই গুরুকা শিষ্ হৈ। মাতাজীনে ভেজা ইসীওয়াস্তে আপকা হুকুম মিল গয়া, নেহি তো গুরুজী কিসীকো সাথ ভেট নাহি করতে হৈ।

আমি তার সঙ্গে যেতে যেতেই ত্রস্তব্যস্ত হয়ে বললাম — গুরুজীকা সাথ বাতচিৎ করনেকে বখৎ আপ্ কৃপা করকে উধার ঠারেঙ্গে, কেঁওকী হমারা ডর আতী হৈ উনকী ভাষা হম্ সমঝে কি নেহি। হো হো করে হাসতে হাসতে নাগাজী বললেন — আপ্ ক্যা যুক্তেশ্বরী মাজী কা পাশ নেহি শোনা, হমারা গুরুজীকা পাশ যো কোঈ আবেঙ্গে হামারা গুরুজী উনিকা ভাষামেঁ বাতচিৎ করতে হৈ। দর্শনার্থীকা ভাষা হিন্দী, খোড়িবলী, ভোজপুরী, ইংরাজী, বাংলা, উর্দু, আরবী, ফ্রেঞ্চ, জাপানী, সাঁওতাল, ভীল, কোল যো কুছ হো উহ্ উনকা জ্যোতির্ময় চিত্তপট মেঁ তুরন্ত প্রকট হো যাতে হৈ।

নিশ্চিন্ত মনে আমরা নাগাজীর সঙ্গে সেই কুঁয়ার কাছে এসে পৌঁছলাম। পৌঁছে আমরা দেখলাম আমরা যেটিকে কুঁয়া বলে ভুল করেছিলাম, আসলে সেটি কুঁয়া নয়, পাথর কেটে ভূগর্ভে একটি গুহা তৈরী করা হয়েছে, কুঁয়ার মত করেই একটি চৌকো বেষ্টনী করা হয়েছে, পাথর দিয়ে বাঁধানোও হয়েছে। আমরা নাগাজীর ইঙ্গিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গুহামুখে নিচের দিকে তাকাতেই প্রায় বিশফুট নিচে মহাপুরুষের জ্যোতির্ময় শরীরের দর্শন পেলাম। ওঠা নামা করার জন্য একটা পাথরের সিঁড়িও আছে। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম এই দেখে যে মহাপুরুষের শরীর হতে যেন জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে। এত উজ্জ্বল কান্তি কোন

মানুষের হয় ? এত মহাপুরুষ ত এই নর্মদাতটেই দর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছে কিন্তু দেহ থেকে আলো ঠিকরে পড়ার মত কান্তি কারও দেখিনি । পরম বৈষ্ণব মহাত্মা মতিচ্ছন্ন মহেন্দ্রনাথ লিখিত প্রভু জগবন্ধুর জীবনীতে পড়েছি, ফরিদপুরের শ্রীঅঙ্গনে একটি কুঁড়েঘরের মধ্যে জানালা দরজা বন্ধ করে স্নানাহার রহিত অবস্থায় জগবন্ধুসুন্দর ১৮ বছর কাটানোর পর তিনি যেদিন রাত্রিবেলা প্রথম বাইরে বেরিয়ে স্নানের জন্য পুকুর ঘাটে নামেন, তখন নিকটস্থ মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁর অঙ্গজ্যোতি দেখে চমকে উঠেছিলেন । একটা পাতলা সাদা কাপড়ে জড়িয়ে ৫ সেলের ব্যাটারী জ্বাললে যেমন দেখায়, তেমনি কিরণ তাঁর প্রতি রোম থেকে সেদিন ঠিকরে পড়ছিল । সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ উঠে এসেই তিনি শুদ্ধ বাংলায় বললেন – যুক্তেশ্বরী মা যখন রঞ্জনকে হরবোলাজী বলে ডাকতেন, তখন আমি বলছি হরবোলাজী, তুমি আমাকে সর্বপ্রথম তোমার সুরেলা কণ্ঠে একটা গান শোনাও ।

মহাপুরুষের আদেশ পেয়েই রঞ্জন তার একতারা বাজিয়ে গান ধরল –

গুরু, তুমি ত পার হয়ে গেলে
(আমার) একলা যেতে ভয় করে –
ক্ষুরের ধার আর চুলের সেতু
পার হব কেমন করে,
গুরু পার হব কেমন করে ।
তরী করছে সদাই টালমাটাল
তুমি কষে হাল ধরিলে
তবেই আমার হবে সামাল
নৈলে বল পার হব কেমন করে ।
গুরু (আমার) একলা যেতে ভয় করে ।

রঞ্জন প্রত্যেকটি আখর এমন দরদ দিয়ে গাইল যে, তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল । মহাত্মা কৃপানাথ তাঁকে 'বাহবা' দিয়ে জানালেন – তোমাকে একলা যেতে হবে না । ওঁকারেশ্বরে মার্কণ্ডেয় শিলার উপর দিকে নর্মদার দক্ষিণ পাড়ে সেগুন গাছের জঙ্গলের মধ্যে তোমার গুরু তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন । তিনি তোমার মতই বাউল, একই রসের রসিক । তুমি আমাকে রেবা মায়ের একটা বন্দনা শোনাও । রঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করলেন –

রেবা মাগো !
তমাল - তাল - সরল - শালে
সুনিবিড় লতাকীর্ণ,
তপন - কিরণ - তট - উপবন
নাহি করে কোথা দীর্ণ ।
প্রচ্ছায় হেন পুলিন - উপল
চুম্বি' উছলে তব পূতজল
শঙ্খ - চক্র - কুন্দ - ধবল
সুন্দর পরিপূর্ণ ।
অবগাহে যবে কিন্নরামর
বণিতানিকর, মৃদু মন্থর
পরশ পীড়নে পড়য়ে লহর

পাপতাপ-হর, মা, তোর সলিলে
স্নান-সুখ যেন অনুদিন মিলে,
আন্তে যেন মা মরি তব কোলে
কামনা কর মা পূর্ণ।

– আমি আশীর্বাদ করছি মা তোমার এই ইচ্ছাও পূর্ণ করবেন, নর্মদার কোলেই তোমার এই মরদেহের ইতি ঘটবে। এখন তুমি অকপটে বল ত, অনামী বাবা তোমার কেমন লাগল ?

মহাত্মা কৃপানাথের প্রশ্ন শুনে রঞ্জন গদগদ হয়ে বলতে লাগল – আমার শ্রদ্ধেয় সাথী (আমাকে দেখিয়ে) আজ সকালে ভালোদে অনামী বাবার আশ্রম হতে আসার সময় তাঁর সূর্য সাধনার অপরূপ ভঙ্গীটি দেখিয়ে আমাকে বুঝাতে চেয়েছেন যে অনামী বাবা একজন গুপ্ত মহাযোগী। তিনি বেদোক্ত ভর্গদেবের মহা তেজস্বী সাধক, বৈদিক ঋষির সমকক্ষ একজন মহাপুরুষ। কিন্তু গতকাল রাত্রে তাঁর মুখে ঈশ্বরের নাম বারেকের জন্যও শুনিনি, ঈশ্বর বিষয়ক একটি কথাও তিনি বলেন নি ; রাত্রি বারটা পর্যন্ত একটানা নিয়মের জয়গানই করে গেলেন। তিনি আমার মনে ঈশ্বর-ভক্ত হিসাবে কোন ছাপই ফেলতে পারেন নি। আমার এই সাথীর কথামত যদি তিনি গায়ত্রীর উদ্দিষ্ট ভর্গদেবেরই উপাসক হবেন, তাহলে ভিতরে তিনি একরকম সাধনা করেন আর বাইরে লোককে অন্য কথা বলেন। সাধুর এইরকম আচরণ হবে কেন ! যদি তাঁর মতানুসারে বিশ্ব কতকগুলি অপরিবর্তনীয় নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়, যদি কার্যকারণের সম্বন্ধ অপরিবর্তনীয় হয়, তাহলে ভক্তির স্থান কোথায় ?

মহাত্মা রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন – এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে, ভক্তি জিনিষটা কি তাই সর্বপ্রথম আলোচনা করা উচিত। সাধারণতঃ পরাণুরক্তিকেই ভক্তি আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, গুরুভক্তি, দেশভক্তি ইত্যাদি স্থলে আমরা ভক্তি শব্দের প্রয়োগ দেখে থাকি। স্থল বিশেষে অনুরক্তিকে আমরা অন্য আখ্যাও দিই। পুত্রের প্রতি মাতাপিতার যে অনুরাগ তাকে আমরা বাৎসল্য বলি, যে আমার চেয়ে বড় তাঁর প্রতি যে অনুরক্তি তাকে আমরা শ্রদ্ধা বা ভক্তি শব্দের দ্বারা সূচিত করি, যে আমার সমান, তার প্রতি অনুরক্তিকে প্রেম শব্দের দ্বারা, যে আমার ছোট, তার প্রতি অনুরক্তিকে আমরা 'স্নেহ' বলি। গুরুজনের প্রতি যে অনুরক্তি তা ভক্তি শব্দ দ্বারা সূচিত হলেও শাস্ত্রকাররা ভক্তি শব্দের দ্বারা ঈশ্বরানুরক্তিকেই লক্ষ্য করেছেন। মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলেছেন – 'মা পরানুরক্তি ঈশ্বরে'। অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি যে পরানুরক্তি তাই হল ভক্তি। পরানুরক্তি কাকে বলে ? যে অনুরক্তি অবিচলিত অর্থাৎ সহজে টলে না, তাকেই পরানুরক্তি বলা যেতে পারে। মনে কর তুমি সর্বদা সত্যবাদী, ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতি যাই ঘটুক না কেন সম্পদে বিপদে তুমি কখনও সত্য হতে ভ্রষ্ট হও না, সত্য ভাষণ এবং সত্য আচরণই তোমার অভীষ্ট দেবতা, বন্ধু ও নেতা ; সত্যই তোমার ঈশ্বর। সর্বস্বান্ত হলেও তুমি কখনই সত্যের আশ্রয় ত্যাগ করবে না, সহস্র বিপদেও সত্যই তোমার একমাত্র শান্তিদাতা। অথচ সত্যের কোন তৈলচিত্র নাই, আলোকচিত্র নাই, কোন প্রস্তর মূর্তি নাই, তবুও তুমি সত্যের সত্তা অনায়াসে উপলব্ধি করতে পার। সত্য পুরুষ বিশেষ না হলেও সত্যের নিকট তোমার মস্তক সর্বদাই অবনত। যাকে আমরা দয়া বলি তারও কোন জড়মূর্তি কোথাও দেখতে পাবে না। অথচ দয়া কি, তা আমরা সকলেই বুঝি এবং দয়ালু হতে চেষ্টাও করি। আর একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে

দেখতে পাবে সত্য দয়া প্রভৃতির যে সত্তা আছে তাই নয় তাদের বাহ্য মূর্তিও আছে। এক ব্যক্তি নৃশংস আর এক ব্যক্তি দয়ালু ; নৃশংস ব্যক্তিকে দেখলেই তার হাবভাব আচার আচরণ বিচার করে তুমি বলতে পারবে যে লোকটা দয়ালু নয়। যদি দয়া ও নৃশংসতার বাহ্য বিকাশ না থাকত, তাহলে কোন ব্যক্তি নৃশংস আর কোন ব্যক্তি দয়ালু তা তাদেরকে দেখে বুঝা যেত না।

ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না। দেখি কি ? না – তাঁর নিয়ম। সেই নিয়ম অপরিবর্তনীয়। সেই নিয়মই তাঁর স্বরূপ, সেই নিয়মই তাঁর বহির্বিকাশ, সেই নিয়মই তাঁর মূর্তি। সেই নিয়মকে আমি সর্বত্র সব সময়ে দেখতে পাই। সেই নিয়মের আমি সর্বত্র সর্বকালেই সেবা করতে পারি। আপদে বিপদে সব সময়েই আমি সেই নিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি। সেই নিয়মের প্রতি অচলা ভক্তিই নিয়ন্তার প্রতি অচলা ভক্তি। দেশের প্রতি যথোচিত কর্তব্য সাধনাই দেশের প্রতি ভক্তি। মাতা পিতা গুরুর আদেশ বা উপদেশ প্রতিপালন করাই পিতৃমাতৃ বা গুরুভক্তি। বৈষ্ণবরা বলেন যে, নামে ও নামীতে কোন ভেদ নাই। যেই কৃষ্ণ সেই কৃষ্ণ নাম। এ কথার অর্থ কি ? এর অর্থ এই যে গুণ ও গুণীতে, নিয়ম ও নিয়মান্তে কোন ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণ নাই – অথচ আছেন। আছেন কোথায় ? গীতাতে। খৃষ্ট নাই ; তবু তিনি আছেন ! কোথায় আছেন ? আছেন বাইবেলে। বুদ্ধদেব নাই ; আছেন কোথায় ? ধম্মপদে। একজন কেবল যদি মুখে বলে যে সে কৃষ্ণকে বা বুদ্ধকে ভক্তি করে, অহরহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুদ্ধ বুদ্ধ জপ করে অথচ দৈনন্দিন জীবনে তাঁদের উপদেশ অমান্য করে তাহলে কি তাকে কৃষ্ণ বা বুদ্ধভক্ত বলবে ! ঈশ্বরের সত্তা কোথায়, গীতা বা বাইবেলের মত কোন পুস্তকের মধ্যে আবদ্ধ নাই, ঈশ্বরের সত্তা আছে তাঁর নিয়মে। সেই নিয়ম বিশ্বজনীন এবং অপরিবর্তনীয়। নিয়মের কথা বলে অনামী বাবা তার নিয়ন্তা ঈশ্বরের কথাই বলেছেন। তুমি তাঁর বাণীর গুঢ়ার্থ্য বুঝতে পারনি। যাক্ এখন তুমি এস। গীর্ণারী বাবা, তুমি রঞ্জনকে থাকবার কুটীরটা দেখিয়ে দাও। সেই বয়োজ্যেষ্ঠ নাগাজী রঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। আমার দিকে তাকিয়ে মহাত্মা বললেন – তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, আমি তলদেশ থেকে আসছি। এই বলে তিনি তর তর করে নেমে গেলেন। আমি নিচের দিকে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না, শুধুই জমাট অন্ধকার, গুহার তলদেশ থেকে ধূপ ধুনার সুরভি ভেসে আসছে।

একটু আগে যাঁর অঙ্গজ্যোতিতে গুহা প্রায় এক রকম উদ্ভাসিতই ছিল, এখন স্বয়ং তিনি গুহার তলদেশে উপস্থিতি থাকলেও তাঁকে এখন দেখতে পাচ্ছি না, সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে তাঁর পক্ষে কি করে ধুনুচীতে ধুনা বা ধূপ জ্বালা সম্ভব হল, তা আমি বুঝতে পারলাম না। হয়ত নিচের দিকে আমার তাকানোটা মহাপুরুষ পছন্দ করছেন না, এই ভেবে আমি গুহা থেকে মুখ ফিরিয়ে চারদিকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। কুঁয়া থেকে প্রায় ১০০ হাত দূরে সারি সারি ৮টা কুটীর দেখতে পেলাম। তারই একটাতে গীর্ণারী বাবা রঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকেছেন। সামনের দিকে তাকিয়ে কুঁয়া থেকে প্রায় ২০০ হাত দূরে নর্মদার গা ঘেঁষে ফরদ গাছের শক্ত বেড়া চোখে পড়ল। নর্মদা গর্ভ হতে কারও পক্ষে ঐ শক্ত ও মজবুত বেড়া পেরিয়ে ভিতরে ঢুকা সম্ভব নয়। মহাত্মা কৃপানাথের এই স্থানটা প্রায় দুহাজার ফুট লম্বা এবং প্রায় পাঁচশ ফুট প্রশস্ত বলে মনে হল। মনে মনে নানা কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে আমার সম্বিৎ ফিরে এল। তিঁনি গুহামুখ পর্যন্ত উঠে এসেছেন। তাঁর হাতে একটা প্রাচীন পুঁথি, অতি পুরাতন ভূর্জপত্রে লেখা। পাতাগুলো লালচে হয়ে উঠেছে। আমাকে পুঁথিটা দেখিয়ে বললেন, এই পুঁথিতে প্রথম পাতাতেই লেখা আছে দেখবে হংসবতী ঋক। তোমার ঋষিকল্প পিতা তোমাকে বেদাধ্যয়ন করিয়েছেন। তিনিই তোমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এই দুর্গম তপোভূমিতে আসতে। নর্মদার ঘাটে

ঘাটে ঘুরে এতদিনে তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছ নর্মদা তটে প্রায় তাবৎ বৈদিক ঋষি এবং দেবতাবৃন্দ তপস্যা করে সিদ্ধকাম হয়েছিলেন। তুমি হরিধাম অতিক্রম করে দক্ষিণতটে পৌঁছানো মাত্রই আমি তোমার উপর নজর রেখেছি। তুমি যেমন মা নর্মদাকে চোখে চোখে রেখে পরিক্রমা করছ আমিও তেমনি তোমাকে চোখে চোখে রেখে আসছি ; এমন কি যুক্তেশ্বরী মাকে বলেও রেখেছিলোম তোমাকে কোটেশ্বর তীর্থে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। আমার সংকল্প ছিল, তুমি এখানে এসে পৌঁছালেই এই পুঁথিটি তোমার হাতে সমর্পণ করব। এতে হংসবতী ঋক্ ছাড়া শ্রীরুদ্র-হৃদয়োপনিষৎ এর সমগ্র অংশ লেখা আছে। হংসবতী ঋক্ এবং শ্রীরুদ্র-হৃদয়োপনিষৎ এই উভয় মিলে শিবযোগের পরম গুহ্যতত্ত্বের আধার পেটিকা এই গ্রন্থ। আমি জানি, মা নর্মদার সাক্ষাৎ প্রেরণায় তুমি একদিন নর্মদার মহিমা নিয়ে একটি গ্রন্থ লিখবে। বইটি হবে যোগের বিশ্বকোষ আমি চাই সেই বিশ্বকোষের অন্তর্ভুক্ত হোক আমার হস্তস্থিত গ্রন্থে বীজকারে নিহিত হংস যোগ ও শিবযোগের কথা। হংসবিদ্যা হল প্রকৃত পরমাত্মা বিদ্যা। 'হংস' মন্ত্রের মূল অনুসন্ধান করতে হলে বৈদিক যুগের ঋষিদের সাধন রহস্যের সন্ধান করতে হয়। এই পুঁথির প্রথম মন্ত্রটি আমাকে পড়ে শোনাও দেখি।

তিনি পুঁথিটি আমার হাতে দিয়ে প্রথম পাতায় হস্তলিখিত হংসবতী ঋকটি যা সন্ধি ভেঙে ভেঙে লেখা আছে, তা পড়ে শোনাতে বললেন। আমি পড়তে লাগলাম –

ওঁ হংসঃ শুচিষৎ বসুঃ অন্তরিক্ষসৎ হোতা বেদিষৎ অতিথিঃ দুরোৎসৎ।
নৃষৎ বরসৎ ঋতসৎ ব্যোমসৎ অব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্ ॥ ওঁ

আমি প্রাচীন ভূর্জপত্রে প্রাচীন দেবনাগরী হরফে লেখা ঐ মন্ত্র পড়তে পারায় তিনি খুশী হলেন বলে মনে হল। প্রতিটি শব্দের অর্থ আমি বুঝতে পেরেছি কিনা জিজ্ঞাসা করায় আমি শব্দার্থ বলতে লাগলাম – (১) হংসঃ = পরমাত্মা (২) শুচিষৎ = শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপ (৩) বসু = সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান (৪) অন্তরিক্ষসৎ = সাক্ষীরূপে জীবমাত্রের অন্তরে অবস্থিত। (৫) হোতা = যজমান স্বরূপ বা সর্বলয়াধার (৬) বেদিষৎ = কেবলমাত্র জ্ঞানগম্য (৭) অতিথিঃ = স্বপ্রকাশ স্বরূপ (৮) দুরোৎসৎ = পূর্ণ ব্রহ্ম হয়েও জীবরূপে এবং ব্রহ্মাণ্ড রূপে প্রতীত বা প্রতিভাত অর্থাৎ বিশ্বাতীত হয়েও বিশ্বরূপ (৯) নৃষৎ = চিতিশক্তি রূপে জীবমাত্রেই অবস্থিত (১০) বরসৎ = সকলের বরণীয় বা পূজ্য (১১) ঋতসৎ = অভেদে ঋতম্ এ অবস্থিত (১২) বোমসৎ = বিশ্বাকাশব্যাপী (১৩) + (১৪) অব্জা গোজা = জলজ ও স্থলজ প্রভৃতি সর্বপ্রাণীরূপে বিরাজিত (১৫) ঋতজা = সর্বত্র সত্যরূপে পরিদৃশ্যমান (১৬) অদ্রিজা = আদিত্য রূপে বিরাজিত (১৭) ঋতম্ = সর্বাধিষ্ঠান সত্য ব্রহ্মতত্ত্ব স্বরূপ।

এইভাবে মুখ্যতঃ ও গৌণতঃ হংসবতী ঋক্ মন্ত্রের সকল পদেরই ভাবার্থ দাঁড়ায় নিরপেক্ষ চরমতত্ত্ব সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম।

শব্দার্থ শুনে মহাত্মা আরও খুশী হলেন বলে মনে হল। আমাকে বললেন দেখ শৈলেন্দ্রনারায়ণ, এই মহা চিন্ময় হংসমন্ত্রের মূলবীজ রয়েছে ঐ হংসবতী ঋকে। সর্বপ্রথম ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের চতুর্থ অনুবাকের ৪০ সূক্তের পঞ্চম ঋকরূপে, তারপর ক্রমশঃ শুক্ল যজুর্বেদের ১০/২৪ ও ১২/১৪ মন্ত্রদ্বয় রূপে, তৈত্তিরীয় সংহিতা বা কৃষ্ণ যর্জুবেদের ১/৮/১৫/১৮ ও ৪/২/১/১৬ মন্ত্রদ্বয়রূপে, কাঠক সংহিতার ১৫/২৫ ও ১৬/৯৫ মন্ত্রদ্বয়রূপে, মৈত্রায়ণী সংহিতার ২/৭/১০৪ মন্ত্ররূপে, কঠোপনিষদের ২/২/২ মন্ত্ররূপে, নৃসিংহ পূর্ব তাপনীয় উপনিষদের ৩/৬ মন্ত্ররূপে, মাধ্যন্দিনী শাখার শতপথ ব্রাহ্মণে ৬/৭/৩/১১, কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে ১৫/৫/১৮,১৯, এমনকি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৬/১৫ মন্ত্রে সরাসরি 'হংস' শব্দ পরমাত্মা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তদ্‌যথা –

একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে, স এবাগ্নি সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায় ॥

অর্থাৎ এই পৃথিবীর মধ্যে এক পরমাত্মাই আছেন, আর কিছু নাই। তিনি প্রত্যেকের দেহে জীব চৈতন্যরূপে স্থিত আছেন। জল ও অগ্নির একত্র স্থিতি যেমন স্বভাব বিরুদ্ধ হয়েও বাড়বানল প্রভৃতিতে দৃষ্ট হয়, তেমনই পরমাত্মারও এই মায়াময় জগতে একত্র অবস্থিতি স্বভাব বিরুদ্ধ হলেও প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। পরমাত্মা তত্ত্বতঃ জীবজগৎ হতে নিরপেক্ষ হলেও জীবজগতের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এই পরমাত্মাকে স্ব স্বরূপ বলে জানতে পারলে তবেই জীব মৃত্যুক অতিক্রম করতে পারে। মুক্তির অপর কোন উপায় নাই।

বৈদিক ঋষিগণ প্রায় প্রত্যেকেই প্রাতঃকালে নবোদিত সূর্যকে অর্থাৎ ভর্গদেবতাকে ঐ হংসবতী ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করতে করতে দর্শন করতেন। মহর্ষি শৌনক তাঁর প্রণীত ঋগ্‌বিধান গ্রন্থে বিধান দিয়েছেন –

হংস শুচিষদিত্যৃচা শুচিরীক্ষেদ্দিবাকরম্।
অন্তঃকালে জপেন্নেতি ব্রাহ্মণঃ সদ্ম শাশ্বতম্॥ (২/১৩)

অর্থাৎ শুচি হয়ে এই হংসবতী ঋক্ মন্ত্র পাঠ করে সূর্য দর্শন করবে। মৃত্যুকালে এই ঋক্ মন্ত্র জপ করলে শাশ্বত ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। শুধু তাই নয়, মহর্ষি শৌনক আরও বিধান দিয়েছেন –

হংসমন্ত্রং জপেদ্ধীমান্ ত্র্যযুতং বিষ্ণুমন্দিরে।
অর্ঘ্যং দদ্যাৎ কুষ্ঠরোগী সুবর্ণ সমতা মিয়াৎ॥ (১/১০২)

অর্থাৎ ধীমান্ কুষ্ঠরোগী বিষ্ণু মন্দিরে এই মন্ত্র জপ করলে এবং এই মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করলে কুষ্ঠরোগ হতে মুক্তিলাভ করে এবং সুবর্ণকান্তি লাভ করে।

এই হংসবতী ঋক্ মন্ত্র হংসযোগ সাধনার প্রাণ হলেও এই মন্ত্রের পরেই যে পুঁথিতে শ্রীরুদ্র-হৃদয়োপনিষৎ আছে, তা নিত্য পাঠ করে হংসযোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হয়। হংস-মন্ত্রের চৈতন্য ঘটে এই রুদ্র-হৃদয়োপনিষদের মন্ত্রগুলিতে। এখন যাও, কুটীরে গিয়ে বিশ্রাম কর। কাল আবার মতিশঙ্খের ধ্বনি বাজলে তুমি সরাসরি একা আমার কাছে চলে আসবে।

– 'গুরুজী, হমলোগভি ইনকা পাশ পাঠ শ্রবণ কর সকতে হৈ ?'

গীর্ণারী বাবার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে পিছন ফিরতেই তাঁকে দেখতে পেলাম। তিনি কখন যে চুপিসারে আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, তা মহাত্মার দৃষ্টিগোচর হলেও আমার চোখে পড়েনি।

– বেশক, খুশীসে শুন সকতে হো। বাত্তিকা ইন্তেজাম কর দেও, তব ত শুনেগা। এই বলে তিনি নিচের দিকে নেমে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে। আমরা উভয়ে গুহার ধারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে রঞ্জন যে কুটীরে অবস্থান করছে, গীর্ণারী বাবার সঙ্গে সেখানে এসে উপস্থিত হলাম। রঞ্জনের ঘড়িতে তখন বেলা ৫টা বেজেছে। সূর্য ক্রমশঃ অস্তাচলগামী। আমি পুঁথিটি আমার ঝোলায় রেখে দিয়ে রঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে অগ্নিকোণের গেট দিয়ে নর্মদার ঘাটে গেলাম সন্ধ্যা করতে। সির্ সির্ করে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ওপারে উত্তরতটে সাতপুরা পর্বতমালা ও তীরস্থ গাছপালায় অস্তগামী সূর্যের শেষ লালরশ্মি এমন এক রক্তরাগ দৃশ্য রচনা করেছে যে মুগ্ধদৃষ্টিতে সেদিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। উত্তরতটের ঐ অংশটি নর্মদার কোন্ অঞ্চল তা কিছু ঠাওর করে উঠতে পারলাম না। গাছপালার আড়াল এবং দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ক্রমবর্ধমান ছায়ান্ধকারে সব গুলিয়ে ফেললাম। যাই হোক, তাড়াতাড়ি আমরা নর্মদাকে প্রণাম করে জল স্পর্শ করে ঠাণ্ডার দৌরাত্ম্যে কোনমতে সন্ধ্যা সেরে ফিরে গেলাম গুহাশ্রমের কুটীরে। কুটীরের মধ্যে ঢুকে দেখি, গীর্ণারী বাবা সেখানে আমার আসনের কাছে একটি রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বেলেছেন, কাঠের আগুন জ্বেলে ঘরটিকে গরম করারও ব্যবস্থা করেছেন। আমরা ঢুকতেই দেখি একে একে গীর্ণারী বাবা সহ ৫ জন নাগা সাধু ঢুকলেন। তাঁরা আমাকে ঘিরে বসলেন। আমার মনে আজ

আনন্দ ধরছে না। যুক্তেশ্বরী মা বর্ণিত কোটেশ্বরের গুহাস্থিত মহাত্মার দর্শন ত পেয়েইছি, তিনি কৃপা করে অতি প্রাচীন একটি পুঁথিও দিয়েছেন, আজ ১৩৬১ সালে ২৮শে পৌষ (১৩/১/১৯৫৫), এই দিনটি আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে থাকবে। যাই হোক আমি গুরুবন্দনা পাঠ করে মহাত্মা কৃপানাথ প্রদত্ত পুঁথিটি নিয়ে পাঠ শুরু করলাম। উদাত্ত কণ্ঠে হংসবতী ঋকটি পাঠ করে পুঁথির অন্যান্য পাতাগুলি পড়তে আরম্ভ করলাম –

ওঁ প্রণম্য শিরসা পাদৌ শুকোব্যাসমুবাচ হ। কো দেবঃ সর্বদেবেষু কস্মিন্ দেবাশ্চ সর্বশঃ। কস্য শুশ্রূষণান্নিত্যং প্রীতা দেবা ভবন্তি মে ॥ ১

অবনত মস্তকে ব্যাসদেবের চরণে প্রণাম পূর্বক শুকদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, দেব! কোন্ দেব সর্বদেবে বিরাজমান, সকল দেবই বা কোন্ দেবে বিরাজিত এবং কোন দেবের সেবা করলে সকল দেবতার প্রীতি জন্মে, দয়া করে আমাকে বলুন।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ পিতা শুকম্। সর্বদেবাত্মকোরুদ্রঃ সর্বদেবাঃ শিবাত্মকাঃ ॥ ২

শুকদেবের এই কথা শুনে পিতা ব্যাসদেব শুককে প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করলেন। বললেন, ভগবান রুদ্র সর্বদেবাত্মক এবং সকল দেবতাই শিবাত্মক।

রুদ্রস্য দক্ষিণে পার্শ্বে রবির্ব্রহ্মা ত্রয়োঽগ্নয়ঃ। বাম পার্শ্বে উমাদেবী বিষ্ণুঃ সোমোঽপি তে ত্রয়ঃ। যা উমা সা স্বয়ং বিষ্ণু র্যো বিষ্ণু স হি চন্দ্রমা ॥ ৩

রুদ্রের দক্ষিণ পার্শ্বে রবি, ব্রহ্মা ও গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি নামক তিন রকমের অগ্নি অধিষ্ঠিত। রুদ্রের বাম পার্শ্বে দ্যোতনশীলা উমা, বিষ্ণু এবং সোম এই ত্রিমূর্তি সমাশ্রিত। যিনি উমা তিনি স্বয়ং বিষ্ণু। যিনি বিষ্ণু তিনিই চন্দ্রমা।

যে নমস্যন্তি গোবিন্দং তে নমস্যন্তি শংকরং। যেঽর্চয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেঽর্চয়ন্তি বৃষধ্বজম্। যে দ্বিষন্তি বিরূপাক্ষং তে দ্বিষন্তি জনার্দনম্। যে রুদ্রং নাভিজানন্তি তে ন জানন্তি কেশবম্ ॥ ৪

যারা গোবিন্দকে নমস্কার করে, তারা শঙ্করকেই নমস্কার করে। যারা ভক্তি সহকারে হরিকে অর্চনা করে, তারা বৃষধ্বজ রুদ্রেরই অর্চনা করে। যারা বিরূপাক্ষ শিবের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তারা জনার্দনকেই বিদ্বেষ করে। যারা রুদ্রকে জানে না, তারা কেশবকে জানে না।৪

রুদ্রাৎ প্রবর্ততে বীজং বীজযোনি জনার্দনঃ। যো রুদ্রঃ সঃ স্বয়ং ব্রহ্মা যো ব্রহ্মা স হুতাশনঃ ॥ ৫

রুদ্র হতে বীজ প্রবর্তিত হয়, জনার্দন সে বীজের যোনি স্বরূপ। যিনি রুদ্র, তিনিই ব্রহ্মা, যিনি ব্রহ্মা তিনিই অগ্নি।

ব্রহ্মাবিষ্ণুময়োরুদ্রঃ অগ্নীষোমাত্মকং জগৎ। পুংলিঙ্গং সর্বমীশানং স্ত্রীলিঙ্গং ভগবত্যুমা। উমারুদ্রাত্মিকাঃ সর্বাঃ প্রজা স্থাবরজঙ্গমাঃ। ব্যক্তং সর্বমুমারূপং অব্যক্তং পরমেশ্বরঃ। উমাশঙ্কর যো র্যোগঃ স যোগো বিষ্ণুরুচ্যতে ॥ ৬

রুদ্র ব্রহ্মাবিষ্ণুময়, জগৎ অগ্নিষোমাত্মক। পুংলিঙ্গ সমস্তই শিব, স্ত্রীলিঙ্গ সকলই উমা স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ সমস্তই শিবশক্ত্যাত্মক। ব্যক্তরূপ সমস্তই উমা, আর অব্যক্ত রূপ মাত্রই পরমেশ্বর রুদ্র। উমা এবং শঙ্করের যে যোগ, সেই যোগই বিষ্ণু নামে কথিত হয়

যস্তু তস্মৈ নমস্কারং কুর্যাদ্ভক্তিসমন্বিতঃ। আত্মানং পরমাত্মানং অন্তরাত্মানমেব চ জ্ঞাত্বা ত্রিবিধমাত্মানং পরমাত্মানমাশ্রয়েৎ ॥ ৭

যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হয়ে রুদ্রকে নমস্কার করে, সে আত্মা, অন্তরাত্মা এবং পরমাত্মাকে অবগত হয়ে পরমাত্মারই আশ্রয় গ্রহণ করে।

অন্তরাত্মা ভবেৎ ব্রহ্মা পরমাত্মা মহেশ্বরঃ। সর্বেষামেব ভূতানাং বিষ্ণুরাত্মা সনাতনঃ ॥ ৮

ব্রহ্মা অন্তরাত্মা, মহেশ্বর পরমাত্মা এবং বিষ্ণুই সর্বভূতের সনাতন আত্মা।

অস্য ত্রৈলোক্যবৃক্ষস্য ভূমৌ বিটপশালিনঃ। অগ্রং মধ্যং তথামূলং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরঃ ॥ ৯

এই বিটপশালী ভূমিশাখ উর্ধ্বমূল সংসার-বৃক্ষের অগ্র মধ্য ও মূল বিষ্ণু ব্রহ্মা ও রুদ্র।

কার্যং বিষ্ণু ক্রিয়া ব্রহ্মা কারণন্তু মহেশ্বরঃ। প্রয়োজনার্থং রুদ্রেণ মূর্তিরেকা ত্রিধাকৃতা ॥ ১০

বিষ্ণু কার্য, ব্রহ্মা ক্রিয়া এবং মহেশ্বর কারণ। প্রয়োজনানুসারে রুদ্র এই ত্রিমূর্তি ধারণ করেছেন। রুদ্র ধর্মস্বরূপ, বিষ্ণু জগদাত্মক, পিতামহ ব্রহ্মা সর্বজ্ঞানাত্মক।

ধর্মোরুদ্রো জগদ্ বিষ্ণুঃ সর্বজ্ঞানং পিতামহঃ। শ্রীরুদ্র রুদ্র রুদ্রেতি যস্তং ব্রুয়াদ্বিচক্ষণং। কীর্তনাদেব শর্বস্য সর্বপাপেঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১১

এই ত্রিমূর্তিস্বরূপ ভগবানকে যে 'শ্রীরুদ্র', 'রুদ্ররুদ্র' নামে অভিহিত করে সে ব্যক্তি বিচক্ষণ, যে ব্যক্তি 'রুদ্র' নাম কীর্তন করে, সে সকল পাপ হতে মুক্ত হয়।

রুদ্রো নর উমা নারী তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ। রুদ্রো ব্রহ্মা উমাবাণী তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ। রুদ্রো বিষ্ণু রমা লক্ষ্মীঃ তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ। রুদ্র সূর্য উমাচ্ছায়া তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ। রুদ্রঃ সোম উমা তারা তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ। রুদ্রো দিবা উমা রাত্রিঃ তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ। রুদ্রো যজ্ঞ উমা বেদিঃ তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ। রুদ্রো বহ্নিঃ উমা স্বাহা তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ। রুদ্রো বেদ উমা বিদ্যা তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ। রুদ্রো বৃক্ষ উমা বল্লী তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ। রুদ্রো গন্ধ উমা পুষ্প তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ। রুদ্রোহর্থ অক্ষরঃ সোমা তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ। রুদ্রো লিঙ্গং উমা পীঠং তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১২

অর্থাৎ রুদ্র নররূপী, উমা নারীরূপা, ; সেই রুদ্র ও উমাকে নমস্কার করি। রুদ্র ব্রহ্মা স্বরূপ এবং উমা বাণীস্বরূপা, সেই ব্রহ্মা ও বাণীরূপ রুদ্র ও উমাকে নমস্কার করি। রুদ্র বিষ্ণু স্বরূপ ও উমা লক্ষ্মীরূপা, সেই বিষ্ণু ও লক্ষ্মীরূপা রুদ্র ও উমাকে নমস্কার করি। রুদ্র সূর্যস্বরূপ, উমা ছায়ারূপা, সূর্য ও ছায়ারূপ রুদ্র ও উমাকে নমস্কার করি। রুদ্র দিবাস্বরূপ উমা রাত্রিরূপা, সেই দিন ও রাত্রিরূপ রুদ্র ও উমাকে নমস্কার করি। রুদ্র যজ্ঞরূপী, উমা বেদিস্বরূপা; সেই যজ্ঞ ও বেদিরূপ রুদ্র ও উমাকে নমস্কার করি। রুদ্র বহ্নিস্বরূপ, উমা স্বাহারূপা, সেই অগ্নি ও স্বাহারূপ রুদ্র ও উমাকে নমস্কার করি। রুদ্র বেদরূপী, উমা বিদ্যারূপা ; সেই বেদ ও বিদ্যারূপ রুদ্র ও উমাকে নমস্কার করি। রুদ্র বৃক্ষস্বরূপ, উমা লতারূপিনী, সেই বৃক্ষ ও বল্লীরূপ রুদ্র ও উমাকে নমস্কার করি। রুদ্র গন্ধস্বরূপ, উমা পুষ্পরূপা, গন্ধ ও পুষ্পরূপ রুদ্র ও উমাকে নমস্কার করি। রুদ্র অর্থস্বরূপ, উমা অক্ষররূপা, সেই অর্থ ও অক্ষররূপ রুদ্র ও উমাকে নমস্কার করি। রুদ্র লিঙ্গরূপী, উমা গৌরী পীঠরূপা, সেই লিঙ্গ ও পীঠরূপ রুদ্র ও উমাকে নমস্কার করি।

সর্বদেবাত্মকং রুদ্রং নমস্কুর্যাৎ পৃথক্ পৃথক্। এভির্মন্ত্রপদৈরেব নমস্যামীশ পার্বতীম্। যত্র যত্র ভবেৎ সার্ধমিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ। ব্রহ্মহা জলমধ্যে তু সর্বপাপৈ প্রমুচ্যতে ॥ ১৩

সর্বদেবাত্মক রুদ্রের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপকে পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রে নমস্কার করবে, কথিত মন্ত্রসমূহ দ্বারা শিবশক্তিকে নমস্কার করি। যে যে স্থানে রুদ্র ও উমার – লিঙ্গমূর্তিসহ গৌরীপীঠের অর্চনা করবে, সেই সেই স্থানে এই মন্ত্র প্রযুক্ত হবে। বিশেষতঃ ব্রহ্মহত্যালিপ্ত ব্যক্তিও যদি জলের মধ্যে অবস্থান করে এই মন্ত্র উচ্চারণ করে, সে সর্ব পাপ হতে মুক্তি লাভ করবে।

সর্বাধিষ্ঠানমদ্বন্দ্বং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্। সচ্চিদানন্দরূপং তৎ অবাঙমানসগোচরম্। তস্মিন্ সুবিদিতে সর্বং বিজ্ঞাতং স্যাদিদং শুক। তদাত্মকত্বাৎ সর্বস্য তস্মাদ্ভিন্নং নহি ক্বচিৎ ॥ ১৪

সকলের অধিষ্ঠানভূত দ্বন্দ্বাতীত সনাতন নিত্যজ্ঞান–সুখস্বরূপ বাক্যমনের অগোচর পরব্রহ্ম সেই রুদ্রই। হে শুক, সেই ব্রহ্মস্বরূপ রুদ্রকে জানলে এ সংসারের সমস্তই পরিজ্ঞাত হয়; কারণ, সেই রুদ্রই বিশ্বাত্মক, রুদ্র ভিন্ন এ সংসারে অপর কিছুই নাই।

দ্বেবিদ্যে বেদিতব্যে হি পরাচৈবাপরা চ তে। তত্রাপরাতু বিদ্যৈষা ঋগ্বেদোযজুরেব চ। সামবেদস্তথাথর্ববেদঃ শিক্ষা মুনীশ্বর। কল্পো ব্যাকরণং চৈব নিরুক্তং ছন্দ এব চ। জ্যোতিষঞ্চ তথানাত্ম বিষয়া অপি বুদ্ধয়ঃ। অথাসৌ পরমাবিদ্যা যয়াত্মা পরমাক্ষরম্॥ ১৫
এ সংসারে বেদিতব্য বিদ্যা দুটি, পরাবিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। তার মধ্যে হে মুনীন্দ্র, ঋগ্বেদ যর্জুবেদ সামবেদ অর্থববেদ শিক্ষাকল্প ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এবং অনাত্মবিষয়ক অপরাপর জ্ঞান সমস্তই অপরা বিদ্যা, আর যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষয় স্বরূপ পরমাত্মা প্রকাশিত হন, সেই ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মবিদ্যাই পরাবিদ্যা।

যত্তদদৃশ্যমগোত্রং রূপ বর্জিতম্। অচক্ষুঃ শ্রোত্রমত্যর্থং তদপাণিপদং তথা। নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মঞ্চ তদব্যয়ং। তদ্ভূতযোনিং পশ্যন্তি ধীরা আত্মানমাত্মনি॥ ১৬
অদৃশ্য অগ্রাহ্য গোত্রহীন রূপ বিহীন চক্ষু কর্ণ হস্তপদ-পরিহীন নিত্য ব্যাপক সর্বগত সূক্ষ্মতম ও ব্যয়রহিত সর্বভূতের উৎপত্তি স্থান-স্বরূপ আত্মাকে ধীরগণ আত্মাতেই অবলোকন করে থাকেন।

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। যস্মাদত্রান্নরূপেণ জায়তে জগদাবলিঃ॥ ১৭
যিনি সামান্যতঃ সর্বজ্ঞ ও বিশেষতঃ সর্ববিৎ, যাঁহার তপ জ্ঞানময় সেই পরম পুরুষ হতে অন্নাদি ভোগ্যরূপে জগৎ আবির্ভূত হয়।

সত্যবদ্ ভাতি তৎসর্বং রজ্জুসর্পবদাস্থিতম্। তদেতৎ অক্ষরং সত্যং। তদবিজ্ঞায় বিমুচ্যতে। ১৮
রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, সেই রকম পরমপুরুষে সর্পভানের মত জগদ্ভান হয়। রজ্জু সর্প বস্তুতঃ মিথ্যা হলেও যেমন সত্য বলে প্রতিভাত হয়, তেমনই জগৎ মিথ্যা হলেও সত্যরূপে আভাসিত হয়। জগতের অধিষ্ঠান স্বরূপ সেই পরমাত্মা সত্য, তাঁকে জানলেই ভবপাশ হতে মুক্ত হওয়া যায়।

জ্ঞানেনৈব হি সংসার-বিনাশো নৈব কর্মণা। শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং স্বং গুরুং গচ্ছেদ্ যথাবিধি। গুরুস্তস্মৈ পরাং বিদ্যা দদ্যাৎ ব্রহ্মাত্মবোধিনীম্॥ ১৯
তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই সংসার ভ্রমের বিনাশ হয়, কর্মের দ্বারা নয়। এ জন্য জ্ঞানার্থী, ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয় অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্রবিদ্ গুরুর নিকট গমন করেন। গুরু সেই জ্ঞানার্থী শিষ্যকে ব্রহ্মাত্মবোধিনী পরাবিদ্যা দান করেন।

গুহায়াং নিহিতং সাক্ষাদক্ষরং বেদ চেন্নরঃ। ছিত্ত্বা হ বিদ্যামহাগ্রন্থিং শিবং গচ্ছেৎ সনাতম্। তদেতদমৃতং সত্যং তদ্বোদ্ধব্যং মুমুক্ষুভিঃ॥ ২০
লোকে যদি সেই গুহা নিহিত পরব্রহ্মকে জানতে পারে, তবে অবিদ্যারূপ মহাগ্রন্থি ছেদ করে সনাতন শিব পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়। এই আত্মা প্রাপ্তি বা আত্মজ্ঞান লাভই অমৃত বা মুক্তি। মুমুক্ষুগণের এইটাই একমাত্র বোদ্ধব্য॥

ধনুস্তারং শরোহাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। লক্ষ্যং সর্বগতং চৈব শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। লক্ষ্যং সর্বগতং চৈব শরঃ সর্বগতোমুখঃ। বেদ্ধা সর্বগতশ্চৈব শিবলক্ষ্যং ন সংশয়ঃ॥ ২১
প্রণব ধনুঃ-স্বরূপ, জীবাত্মা শর বা বানস্বরূপ, ব্রহ্ম লক্ষ্যস্বরূপ। শর যেমন ধনুর সাহাযে লক্ষ্যে ডুবে তন্ময় হয়ে যায়, জীবও সেই রকম অপ্রমত্তভাবে শিবোপাসনার সাহায্যে শি লক্ষ্যে শরবৎ তল্লীন হয়। লক্ষ্য শিব সর্বগত, বেদ্ধা সাধকও সর্বগত, এই লক্ষ্য যে শিব সান্নিধ্য লাভের উপায়, তাতে কোন সংশয় নাই।

ন তত্র চন্দ্রার্কবপুঃ প্রকাশতে ন বান্তি বাতাঃ সকলা দেবতাশ্চ। স এষ দেবঃ কৃত ভাবভূতঃ স্বয়ং বিশুদ্ধো বিরজ প্রকাশতে ॥ ২২
যেখানে চন্দ্র সূর্যের প্রকাশ নাই, বায়ুর প্রবাহ নাই, দেবগণের দীপ্তি নাই, সেই পরম দীপ্তিময় সর্বভাব স্বরূপ বিরজঃ বিশুদ্ধ শিবতত্ত্ব স্বয়ং-ই প্রকাশ পেয়ে থাকেন।

দ্বা সুপার্ণৌ শরীরেহস্মিন্ জীবে শাখ্যৌ সহাস্থিতৌ। তয়োর্জীবঃ ফলং ভুক্তক্তে কর্মণো ন মহেশ্বরঃ কেবলং সাক্ষিরূপেণ বিনা ভোগং মহেশ্বরঃ প্রকাশতে স্বয়ং ভেদঃ কল্পিতো মায়য়া তয়োঃ। ঘটাকাশ মহাকাশৌ যথাকাশ প্রভেদতঃ। কল্পিতৌ পরমৌ জীবশিবরূপেণ কল্পিতৌ ॥ ২৩
দেহ বৃক্ষে দুটি পক্ষী বাস্ করে, একটি জীব, অন্যটি ঈশ। জীব কর্মফল ভোগ করে আর যিনি ঐশী সত্তা তিনি ভোগ করেন না, কেবল সাক্ষিরূপে বিরাজ করেন। ভোগ নিবৃত্ত হলে জীবই ঈশ্বর শিব বা সাক্ষীরূপে প্রকাশ পান। জীব ও ঈশ্বরের যে ভেদ, সেটা যথার্থ নয়, মায়ার দ্বারা তা কল্পিত। যেমন ঘটাকাশ এবং মহাকাশ বস্তুতঃ ভিন্ন নয়, উপাধিবশে ভিন্নরূপে কল্পিত; সেইরূপ জীব ও শিব অভিন্ন, কিন্তু মায়োপাধি দ্বারা ভিন্নরূপে কল্পিত হন।

তত্ত্বতশ্চ শিবঃ সাক্ষাৎ চিৎ জীবশ্চ স্বতঃ সদা। চিৎ চিদাকারতো ভিন্না ন ভিন্না চিত্ত্বহানিতঃ। চিতশ্চিন্ন চিদাকারাদ্ভিদ্যতে জড়রূপতঃ। ভিদ্যতে চিজ্জড়ে ভেদশ্চিদেকো সর্বদা খলু। তর্কতশ্চ প্রমাণাচ্চ চিদেকত্ব ব্যবস্থিতেঃ। চিদেকত্ব-পরি-জ্ঞানে ন শোচতি ন মুহ্যতি ॥ ২৪
যথার্থতঃ অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে শিব সাক্ষাৎ চিৎস্বরূপ, জীবও স্বয়ং স্বরূপতঃ সতত চিন্মাত্র। চিৎ চিদাকার হতে ভিন্ন এরূপ বলা যায় না, কারণ চিতে চিতে ভেদ থাকলে চিতের বা চৈতন্য স্বরূপেরই হানি স্বীকার করতে হয়। অতএব চিৎস্বরূপ শিব চিদাকার জীব হতে স্বরূপতঃ ভিন্ন নয়। চিতে চিদে ভেদ না থাকুক, জড়ে জড়ে ত ভেদ আছে, এ কথাও বলা যায় না। কেননা তাহলে ভেদ জড়েই থাকবে, চিৎ-এ নয়, কারণ চিৎ জড় নয়, জড় অবস্তু ও চিদ্ বস্তু। জড়ে জড়ে ভেদ থাকে থাকুক, কিন্তু চিৎ-এ, চিৎ-এ ভেদ নাই। সব চিৎ-ই এক। সুতরাং এক চিৎ-ই প্রকাশ পায়। তর্ক ও প্রমাণ দ্বারা এইরূপে চিৎ-এর একত্ব ব্যবস্থাপন পূর্বক চিৎ-এর একত্ব সম্যক রূপে অনুভব করতে পারলে শোক মোহ আদি অপগত হয়।

অদ্বৈতং পরমানন্দং শিবং যাতি তু কেবলম্। অধিষ্ঠানং সমস্তস্য জগতঃ চিদঘনম্ ॥ ২৫
চিতের একত্ব অনুভব করতে পারলে সাধক জগতের অধিষ্ঠান-স্বরূপ সত্যজ্ঞানময় পরমানন্দ স্বরূপ অদ্বৈত শিবসুন্দরকে তবেই লাভ করেন পারেন।

অহমস্মীতি নিশ্চিত্য বীতশোকো ভবেন্মুনিঃ। স্বশরীরে স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপং সর্বসাক্ষিণম্। ক্ষীণদোষাঃ প্রপশ্যন্তি নেতরে মায়য়াবৃতাঃ ॥ ২৬
অহমস্মি অর্থাৎ আমি সেই আত্মা হই এইরকম নিশ্চয় করে, মননশীল সাধক শোক হতে মুক্ত হন। নির্দোষ সাধকরা স্বদেহেই জ্যোতিঃস্বরূপ বিশ্বসাক্ষী পরমাত্মাকে দর্শন করে। মায়ামুগ্ধ অজ্ঞ জনগণ দেখতে পায় না।

এবং রূপপরিজ্ঞানং যস্যাস্তি পরযোগিনঃ। কুত্রচিদ্ গমনং নাস্তি তস্য পূর্ণস্বরূপিণঃ। আকাশমেকং সম্পূর্ণং কুত্রচিন্নৈব গচ্ছতি। তদ্বৎ স্বাত্মপরিত্যাগী কুত্রচিন্নৈব গচ্ছতি ॥ স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম যো বৈ বেদ বৈ মুনিঃ। ব্রহ্মৈব ভবতি স্বস্থঃ সচ্চিদানন্দরূপকঃ ॥ ২৭
এইরূপে যে পরমযোগী আত্মদর্শন বা আত্মজ্ঞান লাভ করেন, সেই পূর্ণ স্বরূপের আত্মা গতাগতি বা লোকান্তর গমন অর্থাৎ জন্মগ্রহণাদিতে বিড়ম্বিত হতে বাধ্য হন না। আকাশ যেমন স্বয়ংই সম্পূর্ণ, জ্ঞানীও তেমনি স্বয়ং সম্পূর্ণ। আকাশ যেমন কোথাও গমন করে না। জ্ঞানীও সেইরকম সর্বময়ত্ব লাভ করে কোথাও গমন করেন না। কারণ তিনি সর্বব্যাপক ব্রহ্ম

হয়ে যান। যে মননশীল সাধক পরমব্রহ্মকে অবগত হন, তিনি স্বয়ংই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে আত্মস্থ হন॥

ইতি শ্রীরুদ্রহৃদয়োপনিষৎ সমাপ্ত। ওঁ শান্তিঃ।

পুঁথি পাঠ শেষ হলে আশ্রমের ৫ জন নাগা ধীরে ধীরে নিজ নিজ কুটীরে চলে গেলেন। আমি ও রঞ্জন সেই ঘরের মধ্যে যে যার আসন বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম কম্বল মুড়ি দিয়ে। কাঠের আগুন নিভে এসেছে। তবুও এতক্ষণ যে ঘরটার মধ্যে গন্‌গনে আগুন ছিল, তাতেই গরম হয়ে গেছে ঘরটা। আমি শুয়ে শুয়ে হংসবতী ঋক্ ও শ্রীরুদ্র-হৃদয়োপনিষদের ভাবার্থ মনে মনে ভাবতে লাগলাম; সহসা কোথা হতে সোহহং সোহহং ধ্বনিতে ঘরের মধ্যটা গমগম করতে লাগল। যুক্তেশ্বরী মায়ের কথা মনে পড়ল। তিনি বলেছিলেন বটে সাধুর গুহার কাছে কান পাতলে সোহহং নাদের ধ্বনি শুনতে পাওয়া যাবে! দুই কান ভরে আওয়াজ! ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, এ আওয়াজ মাথার ভিতর থেকে আসছে, না ঘরের মধ্যস্থিত আকাশ পট ভেদ করে জেগে উঠেছে। হঠাৎ কড়-কড়-কড়াৎ শব্দে মেঘ গর্জন করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের চমক। অন্ধকারের মধ্যেই অনুভব করলাম যে, ওধারে রঞ্জনও উঠে বসেছে। আবার কড়-কড়-কড়াৎ শব্দে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল! এই বিদ্যুতের চমক এতই তীব্র যে আমার বন্ধ চোখের সামনেই যেন তা ঝলসে উঠল। আমি এবং রঞ্জন দুজনেই এক সঙ্গে উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকাতেই দেখলাম, আকাশ পরিষ্কার, কোথাও মেঘের লেশ মাত্রই নাই। মৃদু জ্যোৎস্নায় নর্মদার জল চিক্ চিক্ করছে। আমরা জানালা বন্ধ করে যে যার আসনে গিয়ে বসলাম কম্বল মুড়ি দিয়ে। রঞ্জন আমাকে ডেকে বলল – ঘরের মধ্যে একটু আগে 'সোহহং সোহহং' নাদ ধ্বনি শুনেছি; বাল্মীকেশ্বর তীর্থে যুক্তেশ্বরী মা বলেছিলেন মনে আছে, এখানে নাকি –

গগন মণ্ডল বীচমেঁ যাঁহা সোহহংগম ডোরি।
শবদ অনহদ হোতে হৈ সূরত লগী তাঁহা মোরি?

আমি রঞ্জনের কথা শুনতে পেলাম কিন্তু কোন জবাব দিতে পারলাম না, কারণ তখন আমার মাথায় মধ্যে ইঞ্জিন নাদ, ব্যোম্ ব্যোম্ নাদ, ববম নাদ, চিঁ চিঁ নাদ, ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ, সিঁ সিঁ নাদ, ছাদ ভেদ করে ঝম্ ঝম্ শব্দে জল ঝরে পড়ার নাদ, একটানা মেঘনাদ ডম্বরুর ধ্বনি, মধুর বংশীনাদ, পরিশেষে বৃষের গুরু গম্ভীর গর্জন ধ্বনি শুনে আমি জ্ঞান হারালাম।

যখন জ্ঞান হল, তখন সকাল হয়ে আসছে। রঞ্জন উঠে পড়েছেন। আমি জেগেছি দেখেই বললেন – এ বড় বিপজ্জনক জায়গা। গোটা রাত্রি মশাই আমার ঘুম হল না, ভেক ধ্বনি শুনতে শুনতে জলোচ্ছ্বাস ও প্লাবনের শব্দ, জলভরা মেঘ গর্জন এবং কখনও বা সমুদ্র গর্জন শুনতে শুনতে একটা ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন অবস্থায় গোটা রাত্রিটা কেটে গেল। এখানে যদি ৫/৭ দিন থাকেন তাহলে পাগল হয়ে যেতে হবে।

– সেই রকম অভিজ্ঞতাই বা মন্দ কিসের? গোটা রাত্রি ঐ রকম শব্দ ও গর্জনের মধ্যে থেকেও আমাদের কারও ত শারীরিক ক্লান্তি বা কোন অসুস্থতা ত বোধ হচ্ছে না। হয়েছে কি?

– তা অবশ্য হচ্ছে না। মনের স্ফূর্তি এবং তরতাজা ভাব ত অক্ষুণ্ণই আছে দেখছি!

– তা হলে চলুন সকাল সকাল প্রাতঃকৃত্য সেরে নর্মদা স্পর্শ করে আসি।

এই বলে আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে নাগাদের কুটীরের পাশ দিয়ে গেটের দিকে হাঁটতে লাগলাম। নাগাদের ঘরের জানালাগুলো খোলা। উঁকি মেরে দেখলাম, প্রত্যেকেই আপাদমস্তক কম্বলে ঢেকে দুই হাতের দুই আঙুল দিয়ে যে যার কান চেপে উবু হয়ে বসে আছেন। বুঝলাম, তাঁরা নাদ সাধনায় রত আছেন। আশ্রমের চৌহদ্দী পেরিয়ে বেশ

কতকটা দূরে গিয়ে প্রাতঃকৃত্য এবং পবিত্র নর্মদা স্পর্শ করে যখন ফিরলাম, তখন চারদিক ফাঁকা হয়ে গেলেও, তখনও সূর্যোদয়ের কোন আভাস দেখতে পাচ্ছি না। পাঁচজন নাগা ঘরের বাইরে এক লাইনে দাঁড়িয়ে মহাত্মা কৃপানাথের গুহার দিকে মুখ করে করজোড়ে গেয়ে চলেছেন -

সুরত নিরত মন পবন পর সোহং সোহং হোয়।
শিব মন্তর গৌরী কহা অমর ভই হৈ সোয়।
রারংকার তো ধুন লগৈ সোহং সুরত সমায়।
হদ্ বেহদ্ পরবাস হৈ বহুরিন আবৈ জায়॥
গুফ গায়ত্রী নাম হৈ বিন্ রসনা ধুন ধ্যায়।
মহিমা সনকাদিক লহী শিব-শংকর বল জায়॥

পাঁচজন নাগাদের একসুরে সমস্বরে গান শেষ হলেই দেখলাম, মহাত্মা কৃপানাথের গুহার আড়ালে নতজানু হয়েছিলেন আরও পাঁচ জন নাগা, তাঁদেরকে এর আগে দেখিনি, তাঁরা সহসা উঠে দাঁড়িয়ে (প্রকৃত পক্ষে দণ্ডায়মান হতেই তাঁদেরকে দেখতে পেলাম) আমাদের পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন যে সব নাগা, এঁদের দিকে হাত নেড়ে সুর করে সমস্বরে গাইতে লাগলেন -

শুন বিদেশী বস রহা হমারে ত্রিকূটী তীর।
শংখ পরম ছবি চাঁদনী-বাণী-কোকিল কীর॥
শুন বিদেশী বস রহা সহস কমল দল বাগ।
সোহহং ধ্যান সমাধ ধুন ঔর তীব্র বৈরাগ॥
সুমিরণ তবহি জানিয়ে জব রোম রোম ধুনি হোয়।
কুঞ্জ কমল মেঁ বৈঠকর মালা ফেরে সোয়॥
সুরত সুমিরণী হাথ লে নিরত মিলৈ নিরবান।
রারংকার রমতা লখৈ আসল বন্দেগী ধ্যান।
অষ্টকমলদল সুন্ন হৈ বাহর ভিতর সুন্ন।
রোম রোম মেঁ সুন্ন হৈ জুঁহা কালকী ধুন্ ন॥
তুমহী সোহং সুরত হো তুমহী মন ঔ প্রাণ।
মহাসুন্ ভেদ করকে সমাও তাকো ভজন জান॥

এই রকমের বিচিত্র প্রভাতী গান শেষ হতেই গুহার পশ্চিম দিকস্থ নাগারা চলে গেলেন। তাঁদের চলার পথ লক্ষ্য করেই দেখতে পেলাম, গুহা থেকে বেশ কতকটা দূরে, আশ্রমের একেবারে পশ্চিমপ্রান্তে আরও কতকগুলি কুটীরে আছে, তাঁরা সেখানে গিয়ে ঢুকলেন। আমি গীর্ণারী বাবাকে বললাম, বড়ই আশ্চর্যের কথা গতকাল প্রায় বেলা ২টার সময় এসেও ঐ ৫ জন অতি বৃদ্ধ নাগার অস্তিত্ব আমরা আদৌ টের পাই নি। তিনি বললেন– ক্যায়সে মিলেগা। উন্ লোগোনেঁ সিরিফ প্রাতঃকালমেঁ বন্দনা ও দণ্ডবৎ করনেকে লিয়ে গুরুজীকী পাশ আতে হৈঁ। দিন রাত ভোর আপনা ধ্যান কুঠীসে উন্ লোগোনে নিকালতী হী নেহি। নাদ সিদ্ধ মহাজন, হরবখৎ উনোনে নাদানুসন্ধান মেঁ মস্ত রহতে হৈ। দেখিয়ে না উন্ মহাত্মায়োঁ কো কুঠিয়া হর কিসিম কা পেড় মেঁ ঘেরা হ্যায়। ইসীওয়াস্তে কাল আপকা নজরমেঁ নেহি আয়া। এই বলে তাঁরা স্নান করতে যাবার জন্য উদ্যোগী হলেন। আমি রঞ্জন তাড়াতাড়ি গামছা ও কমণ্ডলু নিয়ে তাঁদের সঙ্গে স্নান করতে বেড়িয়ে পড়লাম। নর্মদাতে স্নান ও তর্পণাদি সেরে এসে বসতেই রঞ্জন আমাকে বলল, আমার কাছে একটা ছোট খাতা আছে। এখন সবে আটটা বেজেছে। কাল মহাত্মা কৃপানাথ আপনাকে যে পুঁথিটি দিয়েছেন ঐটি শুধু অমূল্য তত্ত্বেই পূর্ণ নাই, অতি প্রাচীন কালের

বলে ওটি একটি আমাদের দেশের অতীত সম্পদও বটে। এবারে ত যতই সামনে এগুব, ততই বন্ধু শ্রুত সেই ভয়ঙ্কর শূলপাণির ঝাড়িতে প্রবেশ করব। সকলের মুখেই শুনে আসছি, সেখানে ভাগ্যে না ঘটুক ভীলদের লুটপাট ও অত্যাচারের মুখে পড়ার সম্ভাবনা। তাই আমি বলছিলাম, মহাত্মা প্রদত্ত ঐ পুঁথিটি এই খাতাতে কপি করে আমার ছোট্ট বালিশটার মধ্যে ভরে বালিশের মুখ সেলাই করে রাখি আর আসল পুঁথিটা আপনার ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদের মলাটের ভিতর রেখে দিন। তাহলে একেবারে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

– তোমার প্রস্তাব ভাল, তবে এখন আমার সময় নাই। তুমি পার ত টোক আমি গীর্ণারী বাবার কাছে যাচ্ছি, আমার কিছু জ্ঞাতব্য আছে। আজ সকালে দু দল নাগার মুখে যে দুটি হিন্দী দোঁহা গান শুনলাম, তার মূল সহ ভাবার্থটা জেনে নিতে হবে। এই বলে আমার খাতা পেনসিল নিয়ে গীর্ণারী বাবার কুঠিয়াতে ঢুকলাম। তিনি আমার প্রার্থনা শুনে বললেন – আমরা দুদল নাগা গুরুজীর গুহার দু'পাশে দাঁড়িয়ে যে দোঁহা গান করেছিলাম, তা হল আমাদের নাদ সাধনার গুপ্ত সংকেত। পশ্চিমদিকে যাঁরা ছিলেন তাঁরা আমাদের থেকে অনেক অগ্রসর। আমরা আমাদের অগ্রগতি কতটা হয়েছে, তা ছড়ার মাধ্যমে জানাচ্ছিলাম, তাঁরা আমাদেরকে আরও অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ এবং সংকেত জানাচ্ছিলেন। নাদানুসন্ধান অতি সহজ সাধনা। সচরাচর দেখা যায়, কর্ণদ্বয়কে অঙ্গুলী দ্বারা বন্ধ করে রাখলে ভিতর হতে এক রকম হু হু শব্দ অন্তঃকর্ণে শুনতে পাওয়া যায়। ঐ ধ্বনিতে তন্ময়তা আসলে কখনও কাঁসর ঘন্টার ধ্বনি, তাতে তন্ময়তা এলে বাঁশীর শব্দ, 'জয়গুরু জয়গুরু' ধ্বনি, মেঘ ঘর্ঘর, বজ্রনাদ, ওঁকারনাদ, আরও তন্ময়তা এলে সোহহং ধ্বনি ক্রমে প্রকট হয়। নানা অদৃশ্য ও আজব দৃশ্যের দর্শনও ঘটে থাকে। এ গুলি অনাহত ধ্বনির আভাস। ঐ সব শব্দ শ্রুতিগোচর হলেই বুঝতে হবে সিদ্ধির অনুকূল পথে তুমি অগ্রসর হচ্ছ। এইজন্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে –

নিষ্পন্নে শ্রূয়তে নাদঃ প্রত্যাহারস্য সাধনে।
অন্তর্জগৎ প্রবেশায় স স্যাদ রাজপথোপমঃ।

নাদের সঙ্গে তন্ময় হলেই অন্তর রাজ্যের অনেক দিব্যদর্শন অনুভূতি আপনা হতেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকে। নাদই অন্তর্জগতে প্রবেশে রাজপথ সদৃশ।

নাদ সূক্ষ্ম ও স্থূল ভেদে দুই প্রকার ঃ – স্থূলনাদ ধ্বনিবাচক, যা বাইরে শোনা যায়। সূক্ষ্মনাদ হচ্ছে মনের স্পন্দন। প্রথমে স্থূলনাদকে অবলম্বন করে সাধনা আরম্ভ করতে হয়। তাই দক্ষিণ কর্ণের ভিতর দিয়ে যে নানা প্রকার শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, তাকে অনুসরণ করে মনকে ক্রমে হৃদয়ের অধিকতর নিভৃতস্থানে নিয়ে যেতে হবে। এই রকম ভাবে স্থূলনাদকে ত্যাগ করে সূক্ষ্মনাদকে আশ্রয় করতে হয়। এই সূক্ষ্মনাদের পরপারেই বিশ্ব সংসারের বীজ স্বরূপ ব্রহ্ম অবস্থান করেন। আমাদের পাতঞ্জল যোগদর্শনে আছে তস্য বাচক প্রণবঃ – অর্থাৎ তাঁর বাচক হচ্ছে প্রণব। তাহলে 'ব্রহ্মের বাচক' একথার অর্থ দাঁড়াল, যার মাধ্যমে ব্রহ্মকে জানা যায়।

কবীর, নানক, দরিয়া সাহেব, গরীব দাসজী রাধাস্বামী সাহেব (আগ্রার শিব দয়াল সিংজী) প্রভৃতি সূক্ষ্মনাদ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দকেই 'নাম' বলেন। যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ডে ও ব্রহ্মাণ্ডের উপর হতে আসে তাকে 'নাম' বলেন। তাঁদের মতে নাম ধ্বন্যাত্মক। একমাত্র শব্দরহস্যবিৎ গুরুকৃপাতে তা শিষ্যের অন্তঃকর্ণে প্রকট হয় আর আমরা যা লেখাপড়ায় এবং কথাবার্তায় প্রকাশ করি, তা হল বর্ণাত্মক স্থূল শব্দ। সন্তগণ বলেন, সূর্য কিরণ যেমন সূর্যের অংশ, জীবও সেই রকম সত্যপুরুষের অংশ। সন্তদের পরিভাষায় এই সত্যপুরুষ হলেন সৎনাম, অলখ নিরঞ্জন বা রাধাস্বামী। বৈদিক মতে, এই গুলি সবই ব্রহ্মের প্রতিশব্দ। আদিশব্দের নাম স্বামী, জীব চৈতন্যের নাম সুরত, আদি সুরতের নাম রাধা। আরও সহজ

করে বলতে গেলে বলতে হয়, রাধাকে উলটো ভাবে বললে হয় ধারা, সত্যপুরুষ বা ব্রহ্মের ধারা। ব্রহ্ম যখন প্রকট হন অর্থাৎ আদিতে যখন সর্বাধিপতির প্রকাশ হয় তখন সর্বাগ্রে যে যে শব্দের বিকাশ ঘটেছিল সেই শব্দের নাম স্বামী। সেই শব্দ হতে যে ধারা নির্গত, তার নাম সন্তদের পরিভাষায় আদি সুরত।

প্রেমীর নাম রাধা, প্রিয়তম প্রেমাস্পদের নাম স্বামী। স্বামী সিন্ধুরূপ জলরাশি সদৃশ এবং রাধা তার তরঙ্গস্বরূপ। যেমন জল ও জলের ঢেউ-এ কোন তফাৎ নাই, সেই রকম রাধা অর্থাৎ জীবদেহের অন্তঃস্থিত চিৎশক্তি, এক কথায় আমরা যাকে বলি জীব চৈতন্য তাতে এবং স্বামী বা ব্রহ্মচৈতন্যে মূলতঃ কোন ভেদ নাই। সুরতের ধারাই অমৃত ধারা বা শব্দের ধারা। একে নাদ বা গুপ্ত ধ্বনিও বলা হয়। অনাহত চক্র হতে, মণিপুর, বিশুদ্ধাখ্য চক্র পর্যন্ত স্থানকে অণ্ড, ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী স্থানকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়। ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী স্থানে ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মিলনস্থান বলে তাকে ত্রিপুটী বা ত্রিকূটীও বলা হয়। ত্রিকূটীর উপর থেকে সহস্রার পর্যন্ত স্থানকে নির্মল চৈতন্যের দেশ, সন্তদের পরিভাষায় সচ্‌খণ্ড বলা হয়। জাহাজে হয়ে কোন বিদেশী বোম্বাই প্রদেশে পা দিলেই যেমন ভারতবর্ষে অবতরণ করেছে বলা যায়, কিন্তু বোম্বাই ত সমগ্র ভারতভূমি নয়, অনেক প্রদেশ ও ভূভাগ নিয়ে যেমন ভারতবর্ষ তেমনিই নির্মল চৈতন্যদেশ বা সচ্‌খণ্ডের অন্তর্গতও অনেক ঘাট বা মণ্ডল যেমন নিরঞ্জনভূমি, ত্রিকূটী, দশম দুয়ার, সোহংমণ্ডল ও সচ্‌খণ্ড প্রভৃতি চৈতন্যের বিভিন্ন ঘনীভূত স্তর আছে। স্তর ভেদে প্রজ্ঞা, চিদ্‌শক্তির গাঢ়তা অনুসারে এক এক মণ্ডলে জ্যোত্‌নিরঞ্জন, ওঁকার, রারংকার, সোহহং, সৎনাম প্রভৃতি নাম বা শব্দের ধারা সাধকের মস্তিষ্ক কোষে নিরন্তর অনুরণিত হতে থাকে। যেমন স্তরভেদ হবে, যেমন যেমন নাম প্রকট হবে, তেমন সেই মণ্ডলের রূপ ও জ্যোতিও প্রকাশিত হবে। সন্তমতের শব্দযোগীরা তাই উপদেশ দেন –

> পাঁচ নাম কা সুমিরণ করো,
> সুরত শ্বেতশ্যাম মেঁ ধরো।

উপরোক্ত পাঁচটি নাম সুমিরণ অর্থাৎ স্মরণ করতে করতে শ্বেতজ্যোতি ও শ্যামবর্ণের জ্যোতি দিয়ে সেই বিচিত্র চৈতন্যমণ্ডলের নাম বা শব্দের ধারা শুনতে শুনতে তদগত ও তন্ময় হয়ে যাও।

মূল চৈতন্যের ধারা ঘাটে ঘাটে বিভিন্ন মণ্ডল রচনা করতে করতে নিচে অবতরণ করেছে এবং সর্বত্র নিজের প্রকাশ ঘটিয়েছে। সর্বনিম্ন স্তর বা ঘাটের নাম দেহঘট, প্রত্যেকের দেহঘট ছাড়া বাইরের জড় ভূমণ্ডলকে বলা হয় পিণ্ডদেশ।

ঐ শব্দের ধারা চৈতন্যের প্রবাহকে, সন্তরা বলেন 'নাম', কোরাণে বলে বাঙ্‌-ই-আসমানি, বেদ বলেন উদ্গীথ মহানাদ, পরানাম বা ওঁ, বাইবেল বলেন 'ওয়ার্ড' – In the begining was the word and the word was with God and the word was God – অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে শব্দই ছিল, সেই শব্দ পরমেশ্বরে অবস্থিত ছিল এবং সেই শব্দই ঈশ্বর।

সন্তরা এই শব্দ বা নামের মহিমা উপলব্ধি করে গদগদ হয়ে গেয়েছেন –

> সুরত শব্দ মতলে তেরে ভলেকী কহুঁ
> সুরত চড়া নভমাহি তেরে ভলেকী কহুঁ
> গগন ত্রিকূটী যাও তেরে ভলেকী কহুঁ
> দশম দুয়ার সমাও তেরে ভলেকী কহুঁ
> ভ্রমর গুফা চড় আও তেরে ভলেকী কহুঁ
> অলখ আগমকো পাও তেরে ভলেকী কহুঁ॥

সারোপদেশ ২৯ – ৩১ পৃষ্ঠা।

শৈলেন্দ্রনারায়ণজী, আমি দীর্ঘকাল ধরে নানা মত পথে ঠোক্কর খেয়ে, রাজযোগ হঠযোগ ক্রিয়াযোগ সিদ্ধযোগের সমস্ত পদ্ধতি নিষ্ঠার সঙ্গে অভ্যাস করে করে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। অবশেষে নর্মদা তটের এই কোটেশ্বর তীর্থে মহাত্মা কৃপানাথের আশ্রয়ে এসে আমি শান্তি পেয়েছি, চৈতন্যের ধারা ধরে চৈতন্য মণ্ডলের সন্ধান পেয়েছি। এতদিনে বুঝেছি শব্দ বা নাদ সাধনার মত এত দ্রুত সিদ্ধিলাভের আর কোন পন্থা নাই। সাধারণ বুদ্ধিতে বিচার করলে আপনি, শুধু আপনিই বা বলি কেন, যে কেউ বুঝতে পারবেন শব্দযোগের মত পথ প্রদর্শক এবং ঊর্ধ্বস্থ স্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম আর কোন শ্রেষ্ঠ পন্থা নাই। যেমন অন্ধকারময় গভীর রাত্রিতে চন্দ্র সূর্য তারা বিদ্যুৎ বা কোন আলোর সাহায্য না থাকলেও বন জঙ্গলের পথে পথভ্রান্ত যে কোন পথিক দূর হতে কোনও মানুষ বা জীবজন্তুর কণ্ঠস্বর শুনে দূরস্থিত কোন গ্রামে গিয়ে পৌঁছতে পারেন, তেমনি যিনি আদি কর্তার ধামে যেতে ইচ্ছা করেন, তিনি অন্তরস্থ জীব চৈতন্য আত্মা বা শব্দের ধারা অবলম্বন করে নিজের দেহের মধ্যে পর পর ঊর্ধ্বতর ঘাটে পৌঁছতে পারলে ক্রমে সেই ধ্রুবধামে নির্মল চৈতন্যের দেশে পৌঁছতে পারবেন – এ আমার উপলব্ধ সত্য। মনে রাখবে প্রত্যেক স্থানের শব্দ পৃথক পৃথক। নিম্নতর মণ্ডল বা ঘাটের শব্দের চেয়ে উচ্চতর মণ্ডলের ধ্বনি বা শব্দের ক্ষমতা বেশী প্রভাবশালী। বর্ণাত্মক শব্দের স্থূল প্রভাব অহরহ মানুষ প্রত্যক্ষ করছে। আমাদের সাংসারিক যাবতীয় কার্য, শাসনকার্য, বিচারালয়ের কার্য, সবই বর্ণাত্মক শব্দের সাহায্যেই চলছে ; এর এমনই ক্ষমতা যে, এ নিমেষের মধ্যে লোককে হাঁসাচ্ছে, কাঁদাচ্ছে, যুদ্ধে দাঙ্গায় মারামারিতে প্রবৃত্ত করছে, অধীনতা স্বীকার করাচ্ছে, পরস্পরের মধ্যে মিত্রতা ও শত্রুতাও উৎপাদন করাচ্ছে। তাহলেই বিবেচনা করুন, যখন এই স্থূল দেহের অর্থাৎ পিণ্ড দেশের শব্দ এই রকম বিশেষ শক্তিশালী, তখন যে শব্দ উচ্চ ও সূক্ষ্ম স্থান হতে, বিশেষতঃ চৈতন্য মণ্ডল বা চিন্ময়ভূমি হতে উদ্ভূত হচ্ছে তার ক্ষমতা কত অধিক হবে। চিন্ময় শব্দের ধারা ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতর মণ্ডলে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। প্রত্যেক ঘাটের শব্দ ধারা পৃথক পৃথক। তবে তার তত্ত্ব সম্পূর্ণ শব্দভেদী গুরুমুখগম্য। কোন শব্দ অবলম্বনে কোথায় যেতে হয়, তা কেবল তত্ত্ববিদ্ গুরুর কাছ হতেই জানা যায়। ঐ সকল শব্দ সর্বদাই মানুষের দেহে ধ্বনিত হচ্ছে, কোন জীবই ঐ শব্দ বা চৈতন্য ধারা বিহীন নয়। কারণ শব্দই চৈতন্যের স্বরূপ ও নিদর্শন।

এবার আপনার মূল প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। আমার উত্তর যাতে আপনার বোধগম্য হয়, সেই জন্যই এতক্ষণ গৌরচন্দ্রিকা করলাম। এই গুহাশ্রমে গুরুদেবের ধারা হল, আমরা যে নিত্য শব্দ সাধনা করছি, আমরা সাধনায় কতটা অগ্রসর হচ্ছি, সকালেই তা গুরুদেবকে শোনাতে হয়। অভ্যাসের সুফল ছড়ার মাধ্যমে বলি গুহার এপাশে দাঁড়িয়ে, ওপাশে দাঁড়িয়ে যাঁরা আমাদের senior গুরুভাই, তাঁরা আরও উচ্চতর স্তরে যাবার জন্য প্রেরণা দেন। আমরা সকালে বলেছিলাম যে আমরা চৈতন্য মণ্ডলের ত্রিকূটী স্তর পর্যন্ত উঠেছি ত্রিকূটী মণ্ডলের শুদ্ধ চৈতন্য ধারা সোহহং সোহহং নাদ আমাদের কাছে প্রকটিত হয়েছে – সুরত নিরত মন পবন পর সোহং সোহং হোয় অর্থাৎ যে চিতিশক্তি সুরত নামে পরিচিত তা অসাধারণ প্রজ্ঞারও প্রকাশ ঘটিয়েছে আমাদের মধ্যে, অসাধারণ দৃষ্টির বোধর্ন ঘটেছে আমাদের মধ্যে। চৈতন্য জড়িত এই প্রজ্ঞা দৃষ্টির নাম নিরত। সুরত ও নিরত বায়ু ভরে ছুটে চলেছে, আমাদেরকে টেনে নিয়ে চলেছে উপরের দিকে। দশম দুয়ারের রারংকার অমৃতময় ধ্বনিও মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি কিন্তু সেই মণ্ডলে এখনও স্থিতিলাভ করতে পারছি না। তবে এটা বুঝেছি, অদৃশ্য ভাবে কেউ ঐ সূক্ষ্মমণ্ডলে থেকে আমাদেরকে শিবমন্ত্র শোনাচ্ছেন – গৌরীশক্তি শিব মন্তর গৌরী কহা অমর ভই হৈ পায়, আমরা অমর হতে চলেছি ; হদ অর্থাৎ সীমা, বেহদ অর্থাৎ সীমার অতীত অসীম – এই সীমা অসীমের লুকোচুরি খেলায়, প্রবাসের দুঃখ দূর করার জন্য সীমার মধ্যে অসীমের আনাগোনার স্বাদ অনুভব করছি। এক কথায়

গুপ্ত গায়ত্রী আমরা পেতে চলেছি, সনকাদি ঋষিরা শংকর-ধ্যানে নিমগ্ন, সেই দিব্য দৃশ্যও আমরা দেখতে পাচ্ছি। রসনার সাহায্য ব্যতিরেকেই গুপ্ত গায়ত্রীর ধুন আমরা শুনতে পাচ্ছি – মহিমা সনকাদিক নহী শিবশঙ্কর বল জায়।

আমাদের নিত্যকার ধ্যানের ফল শুনে গুরুজীর গুহার পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন যাঁরা, যাদেরকে আমরা নাদসিদ্ধ মহাজন বলেছি, যাঁরা সাধনায় অনেক উন্নত বলে মানি, তাঁরা নির্দেশ দিলেন – এখনও তোমরা নির্মল চৈতন্যদেশের শব্দধারা ধরে তৎক্ষণাৎ ত্রিকূটী মণ্ডলে যেটি তোমাদের স্বধাম, সেখানে স্থিতিলাভ করার সামর্থ অর্জন করতে পার নি, তাই তোমরা এখনও বিদেশী – শুন বিদেশী বস রহা হমরে ত্রিকূটী তীর, তোমরা ত্রিকূটী তীরে গিয়ে এখনই স্থিতি লাভ করার চেষ্টা কর; ত্রিকূটী মণ্ডল মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনির সঙ্গে চন্দ্রালোকে নিত্য উদ্ভাসিত, সেখানে কোকিলের মধুর কুহুধ্বনিও হচ্ছে – শঙ্খ পরমছবি চাঁদনী–বাণী–কোকিল–কীর। বিদেশী ভাই সব, ত্রিকূটী থেকে ক্রমশঃ আরও উর্ধ্বে সহস্রদলকমলে, যোগশাস্ত্রে যাকে 'সহস্রার চক্র' বলা হয় পরমানন্দে চলে যাও, সেখানে সোহং ধ্যানে ধুনে নিমগ্ন হয়ে যাও। তীব্র বৈরাগ্য, গাঢ় ধ্যান ও সমাধির দ্বারা তবেই সোহং ধুনের সঙ্গে তোমার আত্মার ধুন একাত্ম হয়ে যাবে। একথা ভাল করে জেনে রাখ রোমে রোমে যখন সোহং ধ্বনি অবিচ্ছেদে প্রকট হতে থাকবে তখন বুঝবে যে সোহং মণ্ডলে তোমার স্থিতিলাভ ঘটেছে – সুমিরণ তব হি জানিয়ে যব্ রোম রোম ধুনি হোয়।

সোহং ধুনে মন প্রাণ তন্ময় হয়ে গেলেই ররংকার ররংকার ধুনে তোমার সমগ্র মস্তিষ্ক কোষ হতে অমৃতের ধারা সব ভুলানো সব ডুবানো সব চুবানো সব মাতানো মাধুর্য রসে তুমি যখন মাতাল হয়ে যাবে, তখন অষ্টদলকমলের সন্ধান পাবে, তা স্বতঃই প্রকট হয়ে উঠবে। তা প্রকট হবে দক্ষিণ দিকের মস্তিষ্ককোষে। সেই সময় শেষ বারের মত তোমাকে আর একবার হুঁসিয়ার থাকতে হবে, কারণ বাম দিকে তখনও Negative Power অর্থাৎ কালের ধুন তোমাকে নিচে টেনে নামাবার চেষ্টা করবে, তুমি যদি কালশক্তির ঐ বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে পার, তবে অষ্টদলকমলের পথ ধরে তুমি পৌঁছ যাবে সচখণ্ডে অর্থাৎ নির্মল চৈতন্যদেশের মূল কেন্দ্রে – অষ্টকমলদল সুন্ন হৈ বাহর ভিতর সুন্ন, রোম রোম মেঁ সুন্ন হৈ জহাঁ কালকী ধুন ন। অষ্টদলকমলের কোরকে যে শূন্যস্থান সেখানে কালের কোন কারসাজি খাটে না। এই হল মোটমুটি ভাবার্থ। ঐ মহান্ মুক্তি ও আনন্দের পথ সম্পূর্ণ অনুভবগম্য। এই সব গুঢ় রহস্য ব্যাখ্যার বিষয় নয়।

এই বলে গীর্ণারী বাবা নীরব হলেন। আমি তাঁকে পুনরায় প্রশ্ন করলাম – 'অষ্টদলকমল' শব্দটি সাধারণ অর্থ ত বুঝি, এখানে সন্তদের পরিভাষায় নিশ্চয়ই আরো কোন গভীর অর্থ আছে। দয়া করে আমাকে তা আর একটু খোলসা করে বলুন। গীর্ণারী বাবা হেসে বলতে লাগলনে – ঠিকই ধরেছেন আপনি। নাদ সাধনায় নাদানুসন্ধান শুধু দক্ষিণ কর্ণ টিপে গুরুকৃপায় প্রকটিত নিরন্তর শুধু শব্দ শ্রবণ নয়। সেই প্রকটিত ধুনে নিজের জীব চেতনাকে একীভূত করে ক্রমাগত উর্ধ্বতর লোকে যাওয়াও নয়। তাতে সিদ্ধির পথে অনেক বিড়ম্বনা থাকে। তার ফলে সৎপুরুষের সঙ্গে তাদাত্মতা লাভ করতে চার জন্ম পর্যন্ত লেগে যেতে পারে; যেমন একজন সন্ত বলেছেন –

পহেলা জনম মেঁ গুরুভক্তি কর,
দুসরা জনম মেঁ নাম।
তেসরা জনম মেঁ নিজ ঘর বাসা
চৌথা নিজ ধাম।

অর্থাৎ একজন্ম গুরুভক্তিতে কেটে যেতে পারে, দ্বিতীয় জন্মে তার নাম বা ধুন দক্ষিণ কর্ণকুহরে জাগতে পারে। সন্তদের পরিভাষায় 'ভ্রমর গুহা' শব্দে যা বুঝানো হয়, প্রকৃতপক্ষে

সেখানে দৃশ্য কিছুই নাই, বস্তুতঃ তা শূন্যস্থান। তাই একে গুহা বা গুফা বলা হয়। সেখানে হতেই নাদযোগী বিশুদ্ধ শব্দ শুনতে পান। ভ্রমর গুহার শব্দ ধারাই নির্মল চৈতন্যদেশের তান। ঐ তানের প্রভাবে সত্যরাজ্যে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হয়ে থাকে। শূন্য মণ্ডল হতে যে শব্দ শ্রুতিগোচর হয় এবং যাকে শব্দের আলয় বলে বর্ণনা করা হয় তা ব্রহ্মাণ্ডের অতীত ভ্রমর গুহারই অন্তর্গত। সুরত নিরত মন ও প্রাণ এই চারিটির একাগ্রতা হলে শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। সন্তগণ বলেন, ধ্বনি হতে শব্দের উৎপত্তি হয় এবং পুনরায় ধ্বনিতে শব্দ লীন হয়। সদ্‌গুরু অথবা সৎপুরুষের সাকার রূপই তাঁদের মতে ধ্বনি। একথা সবাই জানেন, দুইটি শ্বাসের পরস্পর আঘাতে শব্দের অভিব্যক্তি হয় এবং একাগ্রতার ফলেই তা শ্রুত হয়। দক্ষিণ দিকের অন্তঃকর্ণে নিরন্তর শব্দ শ্রবণের ফলে মন নিয়ন্ত্রিত হয় এবং নিজেকে সৎপুরুষে নিমগ্ন করতে পারা যায়। সদ্‌গুরু প্রদর্শিত পথে নাদানুসন্ধানের ফলে ভিতরে যে শব্দ ধারা প্রকট হয়, তাকে উচ্চারণ করা যায় না, তাই এই ধরণের শব্দ সাধনাকে অজপা জপও বলা হয়। শূন্য হতে উদ্ভূত বলে একে অনহদ বা অনাহত নাদ সাধনা বলেও অভিহিত করা হয়।

দক্ষিণ কর্ণ টিপে মনকে একাগ্র করলে যে শব্দের ধারা শ্রুতিগোচর হয় তা চৈতন্যমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর হতে আসতে পারে। অণ্ড ব্রহ্মাণ্ড নিরঞ্জন ভূমি, ত্রিকূটী, দশম দুয়ার প্রভৃতি যে কোনও ঘাট (region) থেকে আসতে পারে এবং এক এক ঘাটেই এক জন্ম দুজন্মও কেটে যেতে পারে কিন্তু সৎগুরুর সাধন প্রভাবে ভ্রমর গুহা হতে নির্গত শব্দধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে direct নির্মল চৈতন্যদেশের অমৃত ধারার সঙ্গে যুক্ত হতে হলে, অষ্টদলকমল ভেদ করে যেতে হয়। ঐ ধারা সাধককে আকর্ষণ করে সোজাসুজি অলখ অগম লোকে। কান টেপার পথ নয়, অষ্টদলকমল ভেদের পথই অমোঘ ও ধ্রুব।

'অষ্টদলকমল কি ?' আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি মানুষের প্রতিটি চক্ষুতে চারিটি অবয়ব আছে। দুই চক্ষুতে তাহলে আটটি অবয়ব। এই আটটির সমষ্টিকে অষ্টদলকমল বলে, কারণ প্রত্যেকটি অবয়বই কমলের এক একটি দলস্বরূপ। 'চারিটি অবয়ব' এর অর্থ প্রতি চক্ষুতে যে চারিটি অংশ আছে – সেগুলি হল : (১) চক্ষুর উজ্জ্বল তারা (২) তার অন্তঃস্থিত নর্তনকারী অপেক্ষাকৃত কম কালো বর্ণের পুত্তলি (৩) কেন্দ্রস্থিত তারকাবৎ ছোট পুত্তলি (৪) এবং ঐ তারকার অন্তঃস্থিত সূচীছিদ্রের মত অত্যুজ্জ্বল সূক্ষ্মবিন্দু যার নামান্তর অগ্রনখ বা সূচী – এই মোট চারটি। দুই চোখে এই ভাবে আটটি অবয়ব বা দল আছে। সন্তগণ বলেন, এই যে অগ্রনখের কথা বলা হল, তাই অগ্রদৃষ্টি। সুরত বা আত্মচৈতন্যের ধারা অর্থাৎ চিতিশক্তি অগ্রদৃষ্টি বা অগ্রনখরূপে পরিণত হয়ে অষ্টদলকমলকে ভেদ করে তখন ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না প্রভৃতির বিভিন্ন ধারা ত্রিবেণী সঙ্গমে একাকার হয়ে যায়। একাগ্রতা এবং গুরুকৃপার প্রভাবে সুরতকে অগ্রনখের ভিতর দিকে আরও ভিতর দিকে প্রেরণ করতে হয়। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা তা সম্ভব হয়, তার নাম উন্মনী মুদ্রা। যোগশাস্ত্রে বিশেষতঃ হঠযোগ ও রাজযোগে যে উন্মনী মুদ্রার নাম শোনা যায়, অষ্টদলকমল ভেদের উন্মনী মুদ্রা তা হতে সম্পূর্ণ পৃথক। আমরা দীর্ঘকাল ধরে নাদ সাধনায় ব্যাপৃত থাকলেও অষ্টদলকমল ভেদের পথ এখনও গুরুজীর কাছ হতে পাই নি। এই পথ পেলে, ভ্রমর গুফা হতে নির্গত শব্দধারার সঙ্গে যুক্ত হলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে উপর মণ্ডলে চলে যেতে পারতাম। এইজন্য নাদ সাধনার এই বিশেষ পদ্ধতিকে 'বিহঙ্গম যোগ'ও বলা হয়। একটা বিহঙ্গম অর্থাৎ পাখী যেমন এই দেখছি মাটির উপর বা কোন গাছের উপর উড়ে বেড়াচ্ছে, অকস্মাৎ সে যেমন ডানা মিলে সোঁ সোঁ শব্দে উর্ধ্বাকাশে উড়ে যেতে পারে, তেমনি আমাদের আত্মাও ভ্রমর গুফার শব্দধারার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অলখ অগম লোকে, সচখণ্ডে, পরব্রহ্মভূমিতে টানা হয়ে যায়।

এমন সময় মহাত্মা কৃপানাথের গুহার পশ্চিমদিক হতে টং করে ঘড়ির একটা আওয়াজ ভেসে এল। তাই শুনে গীর্ণারী বাবা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। 'ধন সদ্‌গুরু জয় শ্মশানেশ্বর' বলে নিজের কুটীরে ঢুকে একটা বড় তামার কলসী নিয়ে গেটের দিকে ব্যস্তব্যস্ত হয়ে হাঁটতে লাগলেন, তাঁর দেখাদেখি অপর দুজন নাগাও কলসী হাতে ছুটতে লাগলেন। আমি রঞ্জনকে বললাম – চল, আমরাও আমাদের কমণ্ডলু নিয়ে শ্মশানেশ্বর মহাদেবের কাছে যাই, ওঁরা বোধ হয় কালকের মত মহাদেবের কুণ্ড হতে 'দুগ্ধ প্রসাদ' আনতে ছুটছেন। দুজনেই কমণ্ডলু হাতে দ্রুত পদে হাঁটতে লাগলাম। দেবকাঞ্চন ফুলের ঝাড়ের কাছে গিয়ে দেখলাম গীর্ণারী বাবা এবং অপর দুই সাথী সাষ্টাঙ্গে নত হয়ে পড়ে আছেন। রঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হল, আমি typical বাঙালীর মন নিয়ে সাষ্টাঙ্গ হওয়ার পূর্বে ঝোপের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, ঠিক গতকালকার বন্য মহিষীটির মত আজ শ্বেতবর্ণের এক বিশাল গাভী, (বৃহদাকারের ভাগলপুরী গাভীর মত যার কলেবর) একটি ঠ্যাং শ্মশানেশ্বর মহাদেব লিঙ্গের গায়ে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর তার বাঁটগুলি থেকে অঝোরে ঝরে পড়ছে দুধ! শিবলিঙ্গকে প্লাবিত করে গড়িয়ে চলেছে পাথরের কুণ্ডে। গাভী মাতার দুগ্ধদান শেষ হলে কালকের বন্য মহিষীটির মতই শ্মশানেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করে ধীরে ধীরে হেঁটে যেতে লাগল পাহাড়ের উপর দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল বনান্তরালে। প্রণামান্তে আমরা দেবকাঞ্চন ফুল ঝাড়ের আড়াল পেরিয়ে শ্মশানেশ্বরকে প্রণাম করলাম। যে যার কমণ্ডলুতে কুণ্ড হতে দুধ ভরে মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে ফিরতে লাগলাম গুহাশ্রমের পথে। এক সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম গীর্ণারী বাবাকে 'আজ কৃপা করে আমাকে যে অপূর্ব শব্দ সাধন রহস্য শোনালেন, আমি ঐ শব্দ সাধন প্রণালী আপনাদের গুরু মহারাজজীর কাছে প্রার্থনা করলে উনি কি তা আমাকে দিবেন ?'

– ইয়ে উনকা মর্জি ! তবে আমার মনে হয়, উনি আপনাকে এই পথের কথা কদাচ বলবেন না। আপনাকে উনি বৈদিক হংসযোগের কথাই বলবেন। তা না হলে আপনাকে হংসযোগের মূল পুঁথিটি দিতেন না। শুনেছি এই কোটেশ্বর পীঠের আদিগুরু মহাত্মা তুঙ্গনাথ এক সময় যখন সমাধিস্থ ছিলেন, সেই সময় কোন দিব্য পুরুষ তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়ে ঐ রুদ্রহৃদয়োপনিষৎটি দিয়ে যান। মহাত্মা তুঙ্গনাথজী হতে আমাদের গুরুমহারাজ পঞ্চম পীড়ি (fifth generation)। প্রায় দেড়হাজার বছর ধরে ঐ পুঁথি গুরুপরম্পরা সযত্নে অত্যন্ত সংগোপনে রক্ষিত ছিল। আপনার অপার সৌভাগ্য যে এতদিন পরে ঐ মহাগ্রন্থ আপনার মত একজন বহিরাগতের করতলগত হল বিনা চেষ্টায় বিনা প্রার্থনায়। গুরুজী জেনে শুনেই এ কাজ করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে তাঁর কোন গুঢ় উদ্দেশ্য আছে।

কথা বলতে বলতে আমরা গুহাশ্রমের ফাটকে পৌঁছে গেলাম। দেখলাম, কালকের মতই তিন জন নাগা খাঁড়া আর ত্রিশূল হস্তে পাহারা দিচ্ছেন। আমরা ভিতরে ঢুকে 'দুগ্ধ প্রসাদী' পাওয়ার পর মতিশঙ্খের আওয়াজের দিকে কান পেতে বসে রইলাম। গীর্ণারী বাবা তাঁর কুঠিয়াতে ঢোকার আগে আমাকে alert করে দিলেন – 'খবরদার ! ঘুমাবেন না যেন ! যে কোন সময় গুরুজীর ডাক আসতে পারে !'

আমি ভাবতে লাগলাম – যোগীন্দ্র কৃপানাথের ডাক-এর মহেন্দ্রক্ষণ কি আমি কোনমতে হারাতে পারি ? এমনিতে ত আমি নিতান্ত শারীরিক অবসাদ ছাড়া দুপুর বেলা ঘুমাই না। তারপর আজ ত আমি তাঁর ডাকের জন্যই উন্মুখ হয়ে আছি। ঘুমানোর কোন প্রশ্নই আসে না। ডায়েরী খুলে দেখলাম, আজ ১৩৬১ সালের ২৯শে পৌষ শুক্রবার (১৪/১/১৯৫৫) উত্তরায়ণ সংক্রান্তি। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ে গেল বাংলাদেশের কথা, মায়ের কথা। বাংলাদেশে সর্বত্র আজকে পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে মেলা বসেছে, আমাদের বাড়ীতে এসেছেন আমার মাতৃসমা গরীয়সী পরম স্নেহময়ী ছোট মাসীমা, যাঁর কাছ থেকে

আমার অক্ষর পরিচয় হয়েছিল, যাঁর রামায়ণ ও মহাভারত কণ্ঠস্থ ছিল বলে আমাকে সন্ধ্যাবেলা কোলে শুইয়ে শুইয়ে রামায়ণ মহাভারতের সব উপাখ্যান শুনিয়ে তার সারমর্ম হৃদয়গত করে দিয়েছিলেন। আজ সন্ধ্যা হলেই মা মাসীকে নিয়ে পিঠে পুলি করতে বসবেন! আজ জন্মভিটা হতে হাজার হাজার মাইল দূরে নর্মদাতটে বসে মা-মাসীমার চিন্তায় আমার মন যেমন কাতর হয়ে উঠল, আজ পিঠা করতে বসেই তাঁরাও নিশ্চয়ই আমার চিন্তায় চোখের জলে ভাসবেন।

এই সময় হঠাৎ রঞ্জন জিজ্ঞাসা করে বসল – কাল সকাল হলেই ত মাঘ মাস সুরু হবে। আচ্ছা, পাঁজিতে যে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় ইত্যাদি আমরা যে বারমাসের নাম দেখি, বৈদিক যুগেও কি এইরকম নামকরণ ছিল? অর্থাৎ সে সময়ও কি ঋতুচক্রের আবর্তনে ঘূর্ণমান এই শীতকালের ঋতুকে পৌষ ও মাঘ নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল?

আমি অনেক ভেবে চিন্তেও উত্তর দিতে পারলাম না। স্মৃতি রোমন্থনের বেশী অবসরও মিলল না। সহসা মতিশঙ্খের আওয়াজ ধ্বনিত হল যোগীন্দ্রের গুহাভ্যন্তর হতে। আমি লাফ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখি, গীর্ণারী বাবাও তাঁর কুঠিয়া হতে ত্রস্তব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছেন। আমরা দুজনে দ্রুত হেঁটে, এক রকম দৌড়াতে দৌড়াতে বললেই হয়, মহাত্মার গুহার কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে বসলাম। মহাত্মা কৃপানাথ সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে গুহাভ্যন্তর হতেই মুখ বাড়িয়ে গীর্ণারী বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন – ইন লোগোনেঁ মহাদেওকী খাস পরসাদী পা লিয়া?

– জী হাঁ।

– এক দফে হরবোলাজীকো ইধর বুলাইয়ে ত!

আদেশ পাওয়া মাত্রই আমি এবং গীর্ণারী বাবা দুজনেই অর্ধনত অবস্থাতেই রঞ্জনের দিকে তাকালাম। বেচারা আমাদের কুটীরের বাইরের দাঁড়িয়ে সতৃষ্ণ নয়নে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। গীর্ণারী বাবা তাকে হাত নেড়ে এখানে আসার ইঙ্গিত করতেই রঞ্জন পড়ি-কি-মরি করে গুহার কাছে দৌড়ে এসে মহাত্মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

মহাত্মা বললেন – হরবোলাজী! শৈলেন্দ্র নারায়ণজী এখানে ছুটে আসার পূর্ব মুহূর্তে তুমি তাকে বৈদিক যুগে আমাদের ঋতু পরিবর্তনের কালকে কি কি নামে সূচিত করা হত, সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলে। নর্মদা তটে এসে কারও কোন জিজ্ঞাসা অপূর্ণ বা অমীমাংসিত থেকে যায়, এটা মা নর্মদা পছন্দ করেন না। তিনি যে সর্বপ্রকার অভাবের পূরণকারিণী! মহর্ষি গৌতম বিরচিত ন্যায়দর্শনে 'অভাব' বলতে বুঝায় কোন সমস্যার অপূর্তি বা অমীমাংসিত থেকে যাওয়াকে। তোমরা কিছুকাল পূর্বেই তোমাদের পরিক্রমা পথেই কর্সনপুরীতে মহর্ষি গৌতমের সাধন পীঠ দর্শন করে এসেছ! তাই বৈদিক যুগে ঋতু পরিবর্তনের কালকে কি কি নামে অভিহিত করা হত, তা আমি জানিয়ে দিচ্ছি। বেদ ঋতু বিভাগের কারণ নির্দেশ করেছেন এই বলে যে, – সূর্যই ঋতু বিভাগের কর্তা। সূর্যের বার্ষিক গতির ফল হিসাবেই বৎসরে এই ঋতু পরিবর্তন ঘটে। বারটি মাসের নাম এইভাবে ছিল শতপথ ব্রাহ্মণে – মধু-মাধব, শুক্র-শুচি, নভস্-নভস্য, ঈষ-উর্জ, তপস্-তপস্য, সহস-সহস্য।

মধু-মাধব – অর্থাৎ ফাল্গুন চৈত্র, এই দুই বসন্ত ঋতুর মাস। এই সময় গাছে ফুল ফোটে এবং ফল ধরে। বৈদিক যুগে ফাল্গুন মাসকেই বৎসেরর প্রথম মাস হিসাবে গণনা করা হত।

শুক্র-শুচি – অর্থাৎ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস। গ্রীষ্ম ঋতুর মাস। ঐ সময় সূর্যের কিরণ প্রখর ও উজ্জ্বল হয়।

নভস-নভস্য – অর্থাৎ আষাঢ় ও শ্রাবণ, বর্ষা ঋতুর মাস।

ঈষ-উর্জ – অর্থাৎ ভাদ্র ও আশ্বিন, এই দুই শরৎ ঋতুর মাস। এই সময় ফল মূল ও শস্যের সারাংশ খাদ্যে পরিণতি লাভ করে।
তপস্-তপস্য – অর্থাৎ কার্তিক ও অগ্রহায়ণ, হেমন্ত ঋতুর মাস। এই সময় দ্রব্যাদি কঠিনতা লাভ করে।
সহস-সহস্য – অর্থাৎ পৌষ ও মাঘ শীত ঋতুর কাল। শীত সকল প্রাণীকে নিজশক্তির বশীভূত করে। সমগ্র প্রকৃতি, গাছপালা জল আদি হিমের প্রভাবে এই সময় ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

এই ভাবে বৈদিক যুগে বর্তমানে প্রচলিত ঋতু ও মাসগুলিকে কি নামে অভিহিত করা হত, তা বলার পরেই মহাত্মা গীর্ণারী বাবা এবং রঞ্জনকে সেখান থেকে চলে যেতে ইঙ্গিত করলেন। তাঁরা চলে যেতেই আমাকে বললেন – সোজা হয়ে বস। আমার কাছে এসে এভাবে নতজানু হওয়ার প্রয়োজন নাই। ওঁঙ্কারেশ্বরে প্রলয়দাসজীর কৃপালাভের পর তুমি এটুকু অন্ততঃ উপলব্ধি করেছ যে স্বরূপতঃ তোমাতে আমাতে কোন ভেদ নাই। এখন বল, হংসবতী ঋক্ এবং শ্রীরুদ্রহৃদয়োপনিষৎ পাঠ করে তুমি আনন্দ লাভ করেছ ত ? হংসযোগের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে ঐ পুঁথির মন্ত্রগুলিকে নিত্যপাঠ করতে হয়, মন্ত্রের মর্মার্থও প্রতিদিন মনন করতে হয়! হংস অর্থাৎ পরমাত্মা শিব চৈতন্যই প্রত্যেকের পাঞ্চভৌতিক দেহে অবস্থান করে জীব চৈতন্য হংস নামে পরিচিত হয়। 'হন্তি অবিদ্যাং তৎকার্যং চেতি হংসঃ পরমাত্মা' অর্থাৎ অবিদ্যা এবং তার কার্যকে ধ্বংস করেন, এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থে পরমাত্মা হংস নামে কথিত হন। আবার 'হন্তি গচ্ছন্তি কৃৎস্ন–শরীরং ব্যাপ্য বর্ততে ইতি হংসঃ প্রাণঃ জীবচৈতন্যম্' অর্থাৎ সমস্ত শরীর ব্যেপে বর্তমান থাকেন এবং এক শরীর হতে অন্য শরীরে সংসরণ করে এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থেও জীব চৈতন্য হংস নামে সংজ্ঞিত হয়।

হংসবতী ঋকের হংস পদই ক্রমশঃ জপ্য মন্ত্রে পরিণত হয়। যোগশাস্ত্রে এবং শৈবাগম তন্ত্রে হংস মন্ত্রকেই অজপা বলা হয়। হংসবতী ঋক্‌মন্ত্রে 'হংস' পদ এবং আথর্বণী শ্রুতি এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের 'হংস' পদ হল বৈদিক মূল। শৈবাগমের অন্তর্গত সারদা তিলক তন্ত্রে (১৪/৮৩) হংস মন্ত্রের বতাকে অর্ধনারীশ্বর রূপে কল্পনা করা হয়েছে। যথা –

উদ্যদ্‌ভানুস্ফুরিততড়িদাকারমর্ধাম্বিকেশং।
পাশাভীতি বরদ পরশূ সন্দধানং করাব্জৈঃ ॥
দিব্যাকল্পৈর্নবমণি-ময়ৈঃ শোভিতং বিশ্বমূলং।
সৌম্যাগ্নেয়ং বপুরবতু বশ্চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রং ॥

এই মন্ত্রের অর্থ হল – উদীয়মান সূর্য ও বিদ্যুৎ বিকাশের মত প্রভাসম্পন্ন অগ্নিসদৃশ্য অথচ সৌম্যমূর্তি, চন্দ্রসূর্যাগ্নিনেত্র, চন্দ্রশেখর, চারহাতে পাশ, অভয় ও বরদানের মুদ্রা এবং পরশুধারী, দিব্যমণিময় ভূষণে বিভূষিত বিশ্বপ্রসূ অর্ধনারীশ্বর দেবতা, তাঁর সাধকগণকে রক্ষা করুন।

আমি তাঁর কথা শুনতে শুনতে কিছু নোট নিচ্ছিলাম। তাঁর সেদিকে নজর পড়তেই আমাকে দুটুকরো কাগজ এগিয়ে দিয়ে মৃদু ধমকের সুরে বললেন – এই কাগজে আমি এই মন্ত্র সহ আরও যে সব মন্ত্র বলব, তা লিখে দিয়েছি। কাজেই পণ্ডশ্রম না করে তুমি আমার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে কেবল আমার বক্তব্যগুলি শুনে যাও।

শশব্যস্তে আমি ডায়েরী ও পেন্‌সিল সরিয়ে দিলাম। তিনি বলে যেতে লাগলেন – প্রাচীন ভারতে মন্ত্রগুপ্তির উপর খুব জোর দেওয়া হত। এইজন্য মন্ত্রগুলি আভিধানিক পরিভাষার অন্তরালে রাখা হত। তত্ত্ববিদ্ গুরু ছাড়া সেইসব পারিভাষিক শব্দের অর্থোদ্ধার করা সম্ভব হত না। এই হংস মন্ত্রও কেমন পারিভাষিক মন্ত্রের আড়ালে রাখা হয়েছে, তা শুন এবং অবধান কর –

বিয়দর্ধেন্দুললিতং তদাদিঃ সর্গসংযুতঃ ।
অজপাখ্যো মনুঃ প্রোক্তো দ্ব্যক্ষরঃ সুরপাদপঃ ॥

(সারদা তিলক ১৪/৮০)

এই মন্ত্রের অর্থ উদ্ধার করছি শোন – বিয়ৎ = আকশ = 'হ' । অর্ধেন্দু শোভিতং = চন্দ্র বিন্দু সহিতং অর্থাৎ হং । তদাদি = তার আদি অর্থাৎ তার পূর্বাক্ষর অর্থাৎ হ-কারের পূর্বাক্ষর = স । বর্ণমালার পৌর্বাপর্যক্রমে হকারের পূর্বাক্ষর 'স' কার । সর্গসংযুক্ত মানে বিসর্গযুক্ত । বিসর্গযুক্ত স অর্থাৎ সঃ । তাহলে দুই অক্ষরে মন্ত্র দাঁড়াল – হংস । এই মন্ত্র কল্পবৃক্ষ সদৃশ । কল্পবৃক্ষের কাছে যেমন প্রার্থনামত সবই পাওয়া যায়, তেমনি হংস মন্ত্রের সাধনায় সর্বাভীষ্ট লাভ হয় ।

ধ্যানবিন্দু উপনিষদে হংস মন্ত্রোপদিষ্ট দেবতার অন্য আর একটি ধ্যান মন্ত্রও দৃষ্ট হয় । তদ্‌যথা –

গমাগমস্থং গমনাদিশূন্যং চিদ্রূপদীপং রবিকোটিদীপ্তম্‌ ।
পশ্যামি ত্বাং সর্বজনান্তরস্থং নমামি হংসং পরমাত্মরূপম্‌ ॥

অর্থাৎ যিনি গমন ও আগমনের অধিষ্ঠান রূপে স্থিত থেকেও স্বয়ং গমনাগমন হীন, যিনি কোটি সূর্য প্রকাশতুল্য জ্ঞানদীপভাস্বর স্বপ্রকাশ সেই সর্বজনান্তরাত্মা পরমাত্মারূপী হংসকে নমস্কার করি; তাঁর দর্শন পেলে অর্থাৎ তাঁকে অনুভব করতে পারলে জীব বিরজ হন, তাঁর বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপে স্থিতি লাভ ঘটে ।

বেদাধ্যয়নের ফলে তুমি নিশ্চয়ই জান, বৈদিক যুগে আদিত্য অর্থাৎ সূর্য ভগবানই পরমাত্মার প্রতীকরূপে হংসমন্ত্রের দ্বারা পূজিত হতেন । হংসবতী ঋক্‌ মন্ত্রের সায়ণভাষ্য দেখলে একথা স্পষ্টীকৃত হয় । শৈবাগমের ঋষিরা হংস মন্ত্রের দ্বারা অর্ধনারীশ্বরের যে আরাধনা করতেন, কিছুক্ষণ আগে সারদা তিলকের যে মন্ত্রটি উদ্ধার করেছি, তাতে তার স্পষ্ট প্রমাণ মিলে । দুটি মন্ত্রের যে কোন একটিকে ধ্যেয় করা চলে; ফল একই । তবে এইভাবে হংস-সাধনার ক্রম ধরলে হংস মন্ত্র-জপ, হংস দেবতার ধ্যান ইত্যাদি ছাড়া হংস মন্ত্রের গায়ত্রীও জানা চাই । তা হল – হংস হংসায় বিদ্মহে সোহহং হংসায় ধীমহি, তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াৎ ।

এইভাবে হংস মন্ত্রের ধ্যান জপ ও গায়ত্রী পাঠ প্রভৃতি প্রাথমিক স্তরের হংসবিদ্যা সাধনায় তোমার মন ভরবে না, একথা আমি জানি । তাই হংস মন্ত্রের অন্তরঙ্গ সাধন রহস্য আমি তোমাকে বলব সংকল্প করেছি । আগামীকাল ১লা মাঘ, আমার দীক্ষালাভের দিন, গুরুলাভের পুণ্যস্মৃতিতে আগামীকাল আমি গুরুর চিন্তায় বিভোর থাকতে চাই । তাই আগামীকাল আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবে না । ২রা মাঘ তোমাকে আজকের মতই ডেকে পাঠাব এবং এবং হংস মন্ত্রের অন্তরঙ্গ সিদ্ধক্রিয়ার কথা বলব । সেই অন্তরঙ্গ ক্রিয়া জানার আগে আজই আরও দু' একটা বিশেষ কথা তোমাকে জানিয়ে রাখছি । তুমি ত জান, গীতায় (৬/৪৬) ভগবান তাঁর ভক্ত ও শিষ্য অর্জুনকে বলেছিলেন,

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাৎ যোগী ভবার্জুন ॥

যোগী তপস্বিগণ হতেও শ্রেষ্ঠ এমন কি বহু অধীতী জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হন, অতএব হে অর্জুন ! তুমি যোগী হও ।

কিন্তু যোগীগুরুর কৃপা ভিন্ন কেউ কখনও যোগী হতে পারে না । প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে হলে বিষয় বাসনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করে অনুক্ষণ গুরুদত্ত সাধনক্রিয়ার আশ্রয় নিয়ে পড়ে থাকতে হয় । এইভাবে একবার স্বভাবের যোগ পথে পড়তে পারলে আর কোন চিন্তা থাকে না । কোন দ্রব্যকে স্রোতে ভাসিয়ে দিলে তা যেমন আপনা হতেই

স্রোতের বেগে ভেসে যায়, তেমনি গুরু শক্তিই সাধককে পরম বাঞ্ছিত স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়। চাই শুধু গুরুর উপর একান্ত নির্ভরতা এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণ। যাঁরা সামান্য ভাবেও যোগমার্গের কিছু অনুশীলন করেছেন, তাঁরা জানেন, তুমি জান যে, প্রত্যেক মানব দেহে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসরূপে প্রাণবায়ু দিনে রাত্রে চব্বিশ ঘণ্টায় ২১৬০০ বার সঞ্চরণ করে থাকে। নাসিকা পথে বায়ু গ্রহণের নাম প্রশ্বাস এবং বাইরে নির্গমণের নাম নিঃশ্বাস। এই প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুই নাড়ী দ্বারা প্রবহমান থাকেন। ইড়া নাড়ী বামে এবং পিঙ্গলা ডান দিকে অবস্থিত। তাদের যথাক্রমে নাম চন্দ্র ও সূর্যনাড়ী। তুমি তোমার বাবার কাছে নিশ্চয় শুনেছ, এই উভয় নাড়ীর মধ্যে আর একটি অতি সূক্ষ্মনাড়ী আছে, যোগিদের কাছে যা সুষুম্না নাড়ী নামে পরিচিত। মেরুদণ্ডের রন্ধ্রপথে ঠিক মধ্যস্থল দিয়ে অতি সূক্ষ্ম এই সুষুম্না নাড়ী মূলাধার চক্র হতে মস্তিষ্ককোষের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত দেদীপ্যমানা –

ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী পিঙ্গলা দক্ষিণে মতা।
তয়োর্মধ্যগতা নাড়ী সুষুম্না চ সমাহিতা।
ব্রহ্মস্থানং সমাপন্না সোম সূর্যাগ্নিরূপিনী ॥

মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে মায়ের শ্বাস ও প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে গর্ভস্থ শিশুরও নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস এক সঙ্গে একই তালে চলতে থাকে। সন্তান ভূমিষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ্মার দ্বারা এই সুষুম্না মার্গটি রুদ্ধ হয়ে যায়। যোগীর ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় কুণ্ডলিনী মহাভুজঙ্গিনী সুষুম্নার দ্বারে মুখ গুঁজে নিদ্রিতা হয়ে পড়েন। সুষুম্না পথে প্রাণবায়ুর সুষ্ঠু গমনাগমন না হলে কেউ যোগী হতে পারে না। এই পথটি খুলবার অনেক উপায় আছে। কেউ তীব্র ঈশ্বর চিন্তার দ্বারা, কেউ গুরুদত্ত কোন বিশিষ্ট কৌশলে অজপা প্রভৃতি জপের দ্বারা, কেউ প্রাণায়ামের দ্বারা কেউ বা নাদানুসন্ধানের দ্বার সুষুম্না মার্গ উন্মীলিত করে থাকেন। তত্ত্ববিদ্ যোগীগুরু শিষ্যের যোগ্যতা ও আধার বিচার করে বিভিন্ন প্রণালীর নির্দেশ দান করে থাকেন।

তুমি এ কথা ভালভাবেই জান যে, পুরুষ নিষ্ক্রিয় এবং প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা এবং ত্রিগুণাত্মিকা। ত্রিগুণের বৈষম্য হতেই সৃষ্টি। এদের অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ তমঃ – এই তিনের সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি থাকে না। প্রকৃতি ক্ষুব্ধ বা চঞ্চল হলে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের মধ্যে ন্যূনাধিক তারতম্য ঘটে থাকে। এই পুরুষ-প্রকৃতিকে শিব শক্তি বা প্রাণ-অপানও বলা যেতে পারে। প্রতি জীব দেহে প্রাণ ও অপান বিরুদ্ধ অথচ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত দুটি শক্তির প্রকাশ দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রাণ ও অপান উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ করে আবার সাথে সাথে একে অপরকে বিকর্ষণও করে থাকে। আসলে উভয়ে মিলে এক হতে চায় কিন্তু এক হতে পারে না। কারণ প্রাণ যে অনুপাতে জেগে উঠে সেই অনুপাতে অপান সুপ্ত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে অপানের জাগৃতির অনুপাতে প্রাণ নিদ্রিত বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। সুতরাং কোন সময়েই প্রাণ অপান এই উভয় শক্তি সম জাগ্রত না থাকার দরুন পরস্পর মিলিত হতে পারে না। প্রাণ ও অপানকে জাগিয়ে যদি যথাক্রমে প্রাণ বা অপানকে উদ্বুদ্ধ করে তার সঙ্গে মিলিত করা যায় তাহলে অবশ্য উভয়ে সাম্য বা সমতা হতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ তা হয় না। আরও সরলভাবে এই রহস্যকে এ ভাবেও বলা যেতে পারে, নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের গতিদ্বারা প্রাণ যখন নাসাদ্বার দিয়ে নাভিতে পৌছায়, অপান তখন নাভি হতে মূলাধারে নেমে যায়। আবার অপান যখন মূলাধার হতে নাভিতে ওঠে, প্রাণ তখন নাভি হতে নাসাদ্বার দিয়ে বের হয়ে যায়। এইভাবে প্রাণ ও অপানের ক্রিয়া সদা সর্বদা অষ্টপ্রহরই জীব দেহে চলেছে। প্রাণ অপান কখনও মিলিত হতে পারে না। যদি অপানকে মূলাধার হতে নাভিতে উঠিয়ে কোন কৌশলে স্থির রেখে যদি প্রাণকে নাভিতে নামিয়ে আনা যায়, তাহলে অবশ্য উভয়ে

মিলিত হতে পারে। আবার যদি প্রাণকে নাভিতে নামিয়ে এনে কোন কৌশলে স্থির রেখে যদি অপানকে মূলাধার হতে নাভিতে উঠানো যায় তাহলেও উভয়ের মিলন হতে পারে।

এই মিলন কণ্ঠে ও ভ্রূ মধ্যেও হতে পারে। উভয় বায়ু মিলিত না হলে সাম্যাবস্থা লাভ হয় না। যতক্ষণ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলে ততক্ষণ ইড়া-পিঙ্গলা মার্গ ক্রিয়াশীল থাকেন। শ্বাস প্রশ্বাসের মিলন না ঘটলে কখনও সাম্যাবস্থা লাভ হয় না। সাম্যাবস্থা লাভ না হলে সুষুম্না মার্গ খোলে না।

এই প্রাণ অপানের মিলনের সংকেত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ৪র্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে অর্জুনকে দিয়েছিলেন –

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণোঽপানং তথা পরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥

অর্থাৎ যোগিগণ অপানে প্রাণের এবং প্রাণে অপানের হবন করে, প্রাণ ও অপানের গতিরুদ্ধ করে প্রাণায়ামপরায়ণ হন, প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ। মোক্ষপরায়ণ মুনি নাসাভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমভাবাপন্ন বা সমান করবেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিশেষ কথা তোমাকে জানাচ্ছি। সন্তান যখন মাতৃগর্ভে বাস করে তখন সে যোগী হবার দরুণ পূর্ব পূর্ব জন্মের বহু ঘটনা তার স্মৃতিপথে উদিত হতে থাকে। সেই সময় একটি অতি সূক্ষ্মশক্তি তার মেরুদণ্ড পথে মূলাধার হতে আরম্ভ করে স্বাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র ভেদ করে সহস্রার পর্যন্ত একটানা প্রবাহিত হতে থাকেন। এই অবিচ্ছিন্ন শক্তি প্রভাবে জীবের প্রকৃত বিবেক, বৈরাগ্য ও বিচারের উদয় ঘটে। সে তখন উর্ধ্বপদ ও হেঁটমুণ্ডে শ্রীভগবানের কাছে অতি কাতর ভাবে প্রার্থনা করতে থাকেন 'গর্ভবাসে মহৎ-কষ্টং ত্রাহি মাং মধুসূদন! হে ভগবান! আমি পূর্ব পূর্ব জন্মে বহু অপকর্ম করেছি, যার ফলস্বরূপ মাতৃগর্ভের এই ঘোর যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতে হচ্ছে। এই মলমূত্রের ভাণ্ডে অবস্থানের ফলে কৃমি দংশনে আমার সর্বাঙ্গ ব্যথায় জর্জরিত, প্রাণ ওষ্ঠাগত। প্রভু! আমাকে ত্রাণ কর! তোমার দয়ায় যদি এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন মাতৃগর্ভরূপ কারাগার হতে একবার নির্গত হতে পারি, তাহলে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, এমন কুকর্ম আর করব না যার ফলে পুনরায় মাতৃগর্ভে আসতে হয়। হে দয়াল! এবার সর্বতোভাবে আমি তোমারই ভজনা করব।

মাতৃগর্ভস্থ শিশুর এইরকম কাতর প্রার্থনার ফলে ভগবানের দয়ায় মাতৃগর্ভস্থ প্রসূতি নামক বায়ু ধাক্কা দিয়ে গর্ভস্থ শিশুকে বাইরে নিঃসৃত করে দেয়। প্রসূতি বায়ুর ধাক্কার ফলে সেই যে একটানা সূক্ষ্মশক্তি মূলাধার হতে সহস্রার পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল, তা তিন জায়গায় ছিন্ন হয়ে যায়। প্রথম ছিন্ন হয় নাভি স্থানে, দ্বিতীয় কণ্ঠে এবং তৃতীয় ভ্রূ মধ্যে। তিন জায়গায় ছিঁড়ে যাওয়ায় চারিটি খণ্ডে পরিণত হয়। সেই অখণ্ড শক্তির প্রবাহ এইভাবে খণ্ডিত হয়ে যাওয়ায় গর্ভস্থ জীবের কাতর প্রার্থনা, প্রতিজ্ঞা এবং স্মৃতিশক্তি সবই বিলুপ্ত হয়ে যায়। ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় সে মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তবে যদি কেউ ঐ চারিটি ছিন্ন অংশকে সাধনা দ্বারা আবার এক করতে পারে, তাহলে তার মধ্যে পূর্ণজ্ঞানের উদয় এবং নানা যোগজ শক্তির প্রকাশ ঘটে। এই শক্তির প্রভাবেই যোগী নানারকম অসাধ্য সাধন করতে পারেন। তাঁর মধ্যে এমন সব অলৌকিক বিভূতি দেখা যায়, যার কোন যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দেওয়া সাধারণ মনুষ্য বুদ্ধিতে সম্ভব নয়। তখন যোগীর কাছে নিজের কিংবা অপরের মৃত্যুর দিন, সময় ও স্থান প্রভৃতি নির্ণয় করা জলবৎ তরলং হয়। উদাহরণ স্বরূপ, তোমার বাবার কথাই ধরনা কেন। তিনি ১৩৫৭ সালের ২৪ শে ফাল্গুন (৮/৩/১৯৫১) শিবরাত্রির পরে শুক্লা প্রতিপদে বৃহস্পতিবার যে রাত্রি আটটা বেজে পনের মিনিটের সময় দেহরক্ষা করবেন সে কথা পূর্ব থেকেই তিনি জানতে পেরেছিলেন। তাই

বহু আগে থেকেই তোমাকে এবং তাঁর প্রিয় পরিজনদেরকে শিবরাত্রির আগেই অতি অবশ্যই তার কাছে উপস্থিত হতে পত্র লিখেছিলেন। শিবরাত্রির দিন সারাদিন শিবপূজা ও জপে কাটিয়ে তার পরের দিনও আসন ছেড়ে উঠলেন না। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা হতেই সেই একাসনে উপবিষ্ট থেকেই কেবলই তোমাকে এবং তোমাদের গৃহভৃত্যকে মাঝে মাঝেই জিজ্ঞাসা করছিলেন ৮টার ট্রেন চলে গেছে কি না? তোমাদের বাড়ী হতে তিন মাইল দূরেই একটা রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। সেখান হতে কোন ট্রেনের হুইশেল ভেসে এলেই তিনি চমকে চমকে উঠছিলেন। তাঁর আদেশে তুমি কঠোপনিষদ পড়ে তাঁকে শোনাচ্ছিলে। অবশেষে রাত্রি আটটার ট্রেন হুইশেল বাজিয়ে ষ্টেশন ছেড়ে যেতেই তোমাদের গৃহভৃত্য তাঁকে সেই সংবাদ প্রদান করল। উত্তরায়ণ কালে তিনি মাহেন্দ্রযোগে শেষ শ্বাস ঊর্ধ্বপথে টেনে নিয়ে যোগস্থ হলেন। পরম শৈব তোমার পিতাঠাকুরের প্রাণবায়ু চিরকালের জন্য স্থিতিলাভ করল নির্মল চৈতন্যদেশে। তাঁর জীবচেতনা রূপান্তরিত হল শিবচেতনায়। এই পর্যন্ত বলেই তিনি আমাকে স্তব্ধ ও বিস্মিত অবস্থায় ফেলে রেখে পিছন ফিরে নেমে যেতে লাগলেন সিঁড়ি বেয়ে তাঁরই সেই যোগগুহার তলদেশে।

মহাত্মা তাঁর স্বস্থানে ফিরে গেলেও আমি সহসা উঠে দাঁড়িয়ে কুঠিয়াতে ফিরে যেতে পারলাম না। মহাত্মা যেভাবে বাবার মৃত্যুকালীন দৃশ্যের নিখুঁত খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে গেলেন, তাতে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। যোগবলে বলীয়ান কোন মহাযোগেশ্বরের কি কোন কিছুই অজ্ঞাত থাকে না? যে বিষয়ে তাঁরা মন দেন, সে বিষয়ের সব কিছু কি টেলিভিশনের ছবি দেখার মত তাঁদের প্রজ্ঞাচক্ষুতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে? যোগশাস্ত্রে যে আছে, 'তপসা কিং ; ন সিধ্যতি ?' 'ন হি যোগাৎ পরং বলং', এইসব শাস্ত্র বাক্য যে কত সত্য, তা আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম। উপরের আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম সন্ধ্যা হতে আর বেশী দেরী নাই। তখনও চারদিক ফাঁকা থাকলেও আর ৫/৭ মিনিটের মধ্যেই যে সমগ্র আকাশ কালো যবনিকায় ঢাকা পড়বে, আমার এখনই উঠে পড়া প্রয়োজন, তা বুঝতে পারলেও আমি উঠে দাঁড়াতে পারলাম না। কোমর থেকে পায়ের তলদেশ পর্যন্ত একেবারে জড়ীভূত হয়ে গেছে! আমাদের কুঠিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখলাম – নর্মদাতে সান্ধ্যক্রিয়া করতে যাবেন বলে রঞ্জন গীর্ণারী বাবা এবং অন্যান্য নাগারা কমণ্ডলু হাতে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি অতিকষ্টে হাত তুলে তাঁদেরকে আমার কাছে আসতে ইঙ্গিত করলাম। রঞ্জন দৌড়ে এসে আমার পা দুটো দলাইমলাই করতে লাগল। গীর্ণারী বাবা আমাকে বুকের কাছে জাপটে ধরে টেনে তুললেন। আমি রঞ্জন ও গীর্ণারী বাবার উপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে কুঠিয়াতে এসে পৌঁছলাম। গীর্ণারী বাবা বললেন – আজ নর্মদা মেঁ আপকো যানেকা জরুরৎ নেহি। আপ লেট যাইয়ে। আপকা কমণ্ডলু হম্ লে যাতে হেঁ। নর্মদাকী পানি লে আবেঙ্গে। তাঁরা সবাই নর্মদা স্পর্শ করতে গেলেন। আমি শুয়ে শুয়ে নানা ঝঙ্কার শুনতে লাগলাম। সোহহং ও রাররংকার ধ্বনি শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, তা আমি জানতে পারি নি। ঘুমের মধ্যেই বাবার স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, তিনি আমাকে বলছেন –

'এ সংসার অন্ধপুরে সর্বত্র ব্যাপিয়া,
পরম আশ্বাস আছে জাগ্রতের তরে;
সত্যের খুঁজিছে যারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া.
কেহ তারা শূন্য হাতে ফিরে নাই ঘরে।'

দৈববাণীর মত বাবার এই কণ্ঠস্বর শুনে আমার সর্বাঙ্গে আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল। উঠে বসে ভাবতে লাগলাম, বাবা বেদান্ত আলোচনা করার সময় প্রায়ই বলতেন বটে যে, তত্ত্বদর্শীর নিকট অজ্ঞান অনাদি হয়েও সান্ত। সান্ত বলে তা মিথ্যা। জীব তীব্রতম

পুরুষকার বলে তা নাশ করতে পারে। এটাই সাধকের কাছে সান্ত্বনা, পরম ভরসার কথা!' বাবার এই ঋষিবাক্য আমার কাছে সর্বতোভাবে মান্য হলেও তাঁর ঐ কথা মনে মনে আলোচনা করতে করতেই মনে একটা খট্‌কার উদয় হল। এখানে বাবা 'তীব্রতম পুরুষকার' বলতে নিশ্চয়ই তীব্রতম আত্মচেষ্টা অর্থাৎ তীব্রতম সাধনার কথা বলতে চাইছেন। কিন্তু আমি 'তত্ত্বদর্শীও নই 'তীব্রতম' ত দূরের কথা, কোন সাধনাও করিনি। কেবল নর্মদা পরিক্রমার সংকল্প বশে নর্মদার উভয়তটে ঘুরে বেড়াচ্ছি মাত্র। তবুও যে অযাচিত ভাবে আমি অনেক মহাপুরুষের কৃপালাভ করেছি; সে কথা ত অস্বীকার করতে পারি না। তাই বাবা! বাবা গো! আপনি যে একবার 'পুরুষকার' শব্দের অর্থ করতে গিয়ে বলেছিলেন – 'পুরুষেণ আকারিতং যৎ অর্থাৎ পরমপুরুষ যা করে দেন তাই পুরুষকার', তাহলে ত 'পুরুষকার' শব্দে এখানে কৃপা, অহৈতুকী কৃপা বলেই বুঝতে হয়।

বিছানায় বসে বসে এই সব কথাই ভাবছি, এমন সময়, কাশতে কাশতে রঞ্জন উঠে বসল বলে মন হল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম – ঘুম ভেঙ্গেছে? এখন ক'টা বেজেছে বল দেখি? ফস্ করে একটা দেশালাই-এর কাঠি জ্বেলে সে উত্তর দিল – রাত্রি এখন ৪টা। কিছু আগেই আমার ঘুম ভেঙ্গেছে, চুপ করে শুয়ে পড়েছিলাম। মুখে বলছি বটে ঘুম কিন্তু এ কী রকমের ঘুম! কানের মধ্যে অহরহ নানারকম শব্দের নাদ স্বতঃই গুণ্‌গুণ্ করে বেজে চলেছে। আপনি কি আর ঘুমাবেন? যদি না ঘুমান, তাহলে কিছুক্ষণ আগে ঘুম ভাঙ্গার পর হতেই আমার মনে একটি প্রশ্ন জেগেছে। বহু কাল আগে আমি তখন বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের ছাত্র। ঐ সময় মহাত্মা অশ্বিনী দত্তের সভাপতিত্বে কয়েকজন মনীষী কলেজের হলে 'বিশ্ববোধ' ও 'বিশ্বভ্রাতৃত্ব' নিয়ে এক আলোচনার আসর বসিয়েছিলেন। কোলকাতা হতে আগত একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত সেই সভায় বলেছিলেন – ভগবান বুদ্ধদেবই বিশ্ববোধের অগ্রদূত, তিনিই বিশ্ববোধের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য পদ্ধতি দান করে গেছেন – যাতে মানুষের মন অহিংসা থেকে দয়ায়, দয়া থেকে মৈত্রীতে সর্বত্র প্রসার লাভ করে। বৌদ্ধ মতে মৈত্রী কেবল একটি হৃদয়ের ভাব নয় – একটি বিশ্বসত্য। যেমন সত্য এই আকাশের আলোক। সম্রাট অশোক বুদ্ধবাণীতে প্রবুদ্ধ হয়ে বলতে পেরেছিলেন – সৰে মুনিশ পজা মম। পজা অর্থাৎ প্রজার অর্থ সন্তান। সকল মানুষই তাঁর সন্তান। ভুবন ব্যাপ্ত সেই সন্তানদের মধ্যে রাজর্ষি অশোক তৎকালীন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী গুণীদেরকে বিভিন্ন রাজ্যে শান্তি প্রেম আনন্দের বার্তা প্রচারের জন্য দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন। পরবর্তীকালে বাদশাহ আকবার 'দীন-ইলাহি' ধর্ম বিস্তারে যত্নবান হয়ে যে, সুলহ্-এ-বুল্ল্ অর্থাৎ প্রেম সকলের জন্য, এই বার্তা প্রচার করেছিলেন, তারও মূলে রয়েছে বুদ্ধদেবের আদর্শ ইত্যাদি। এখন আমার প্রশ্ন হল, সে সময়ে সেই বুদ্ধভক্ত মনীষীর বক্তৃতা শুনতে শুনতেও যে কথা মনে জেগেছিল, হঠাৎ সে কথা স্মরণ পথে উদিত হতেই সেই একই প্রশ্ন জেগেছে – বুদ্ধদেব বিশ্ববোধের অগ্রদূত একথা কি সত্য? বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী উপনিষদে কি ঐ সারসত্যের কোন আভাস মেলেনি? উপনিষ আমার পড়া নাই, আপনি উপনিষদ্ পড়েছেন, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হল, উপনিষদ বিশ্ববোধ সম্বন্ধে কিছু বলেছেন কি না? আর ঘুমাবেন না যখন তখন সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে কিছু বলুন।

– কে বলল উপনিষদের মধ্যে বিশ্ববোধের কথা নাই? এখন সমগ্র উপনিষদের সরল বাংলায় অনুবাদ সহ বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং ভাবার্থের বহুতর সংস্করণ বেরিয়েছে। পরিক্রমার শেষে যেখানেই থাকুন, সেই সব গ্রন্থ আনিয়ে পড়লেই বুঝবেন যে, ভারতীয় চিন্তায় বিশ্ববোধ চিরকাল ধরে বর্তমান। মানবিক সকল সাধনার মধ্যে উপনিষদ একে প্রধানতঃ বলে আখ্যাত করেছে। আবহমান কাল থেকে ভারতবর্ষ নরশ্রেষ্ঠ বলে বরণ করেছে ঋষিদেরকে। আমাদের শাস্ত্রে ঋষিত্বের প্রধান লক্ষণ হল –

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরাঃ যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

অর্থাৎ তাঁরা পরমাত্মাকে সর্বত্র হতে প্রাপ্ত হয়ে ধীর হয়েছেন, সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, সকলের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। বিশ্বমানবের সঙ্গে অন্তরের যোগ উপলব্ধি করা এবং শত্রু হোক মিত্র হোক উচ্চ হোক নীচ হোক, সকলকে আপন করে নেওয়ার মধ্যেই উপনিষদের মতে মনুষ্যত্বের সার্থকতা। আমাদের প্রতিদিনের ধ্যানমন্ত্র গায়ত্রীর মধ্যে এই সর্বানুভূতিরই চর্চা – ভূলোকের সঙ্গে নক্ষত্রলোক, বাইরের সঙ্গে অন্তর, ঈশ্বরের সঙ্গে সর্বভূত একত্র মিলিয়ে সন্দর্শন।

এর চেয়ে বিশ্ববোধ, বিশ্বমৈত্রী বিশ্বভ্রাতৃত্ব বা বিশ্বপ্রেমের বড় তত্ত্ব আর কোথায় আছে ? এই বলে আমি উঠে গিয়ে জানালা খুলে দিলাম। দেখলাম চারদিক ঘন কুয়াশায় ঢাকা। গাছপালা হতে টপ্ টপ্ করে শিশির পড়ছে। আমি ফিরে এসে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসলাম। রঞ্জন বলল, এত ঠাণ্ডা ও কুয়াশার মধ্যে বেরুবার দরকার কি ? আর একটু কুয়াশা কমুক, ততক্ষণ আমি একতারাটা নিয়ে কসরত করি কি বলেন ? আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই রঞ্জন গান আরম্ভ করল –

(আমি) আল্লা নামের বীজ বুনেছি
এবার মনের মাঠে,
ফলবে ফসল বেচবো তারে
কেয়ামতের হাটে।
ভবের এই পাশা খেলায়
খেলতে এলি হায় আনাড়ি।
হাতে তোর দান পড়ে না –
হাত খোলে না তাড়াতাড়ি।
(হায়) হাতে তোর দান পড়ে না, –
হাত খোলে না তাড়াতাড়ি॥

রঞ্জনের বাউল গান শেষ হতে না হতেই আমাদের কুঠিয়ার দরজায় টোকা পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিতেই গীর্ণারী বাবা ঘরে ঢুকে যা বললেন তার সারমর্ম – আপনারা শুনেছেন, আজ ১লা মাঘ। আমাদের গুরুদেবের দীক্ষালাভের দিন। উনি গুহা থেকে আদৌ বাইরে আসবেন না, কারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বা বাক্যালাপ করবেন না। কিন্তু বহুকাল হতে আমাদের এই রেওয়াজ চলে আসছে যে তাঁর দীক্ষাতিথিতে আমরা নর্মদাতে প্রাতঃস্নান সেরে এসেই গুহার কাছে গিয়ে সেই সময় যার যে স্তুতি বা ভাব মনে উদয় হবে, যে যার মাতৃভাষায় বা সংস্কৃতে তা উচ্চারণ করে প্রাণের প্রণাম নিবেদন করে আসি। আপনারা তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে নর্মদাতে স্নান করতে চলুন। তাঁর কথা শুনেই আমরা দুজন প্রাতঃকৃত্য সারতে বাইরে চলে গেলাম। প্রাতঃকৃত্যের পর নর্মদাতে স্নান করতে নেমে দেখি আমাদের পার্শ্ববর্তী কুঠিয়াগুলিতে যে সব নাগা থাকেন, তাঁরা সবাই এসেছেন নর্মদাতে স্নান করতে। তখনও সূর্যোদয় হয় নি। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে আমরা কোন মতে স্নান সেরে নিলাম। নাগারা স্নানের পরেই আশ্রমের দিকে চলতে লাগলেন। তাড়াতাড়ি কমণ্ডলু ভরে আমরা দুজনও তাঁদেরকে অনুসরণ করলাম।

যোগীন্দ্র কৃপানাথের গুহার কাছাকাছি হতেই দেখতে পেলাম, গুহার পশ্চিমদিকে যাঁরা থাকেন, যাঁদের পরিচয় দিতে গিয়ে গীর্ণারী বাবা বলেছিলেন 'নাদসিদ্ধ মহাজন', তাঁর গুহার এক পাশে দাঁড়িয়ে নতজানু হয়ে যুক্তকরে বলছেন –

ইদং নম ঋষিভ্যঃ পূর্বজেভ্যঃ পূর্বেভ্যঃ পথিকৃদভ্যঃ।

অর্থাৎ আমাদের পূর্বজ সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণকে, পিতৃ পিতামহাদি পূর্বপুরুষদেরকে এবং সত্যপথের দিশারীদেরকে প্রণাম।

যদন্নৈর্পোষিতঃ দেহঃ যদজলৈ জীবনং মম।
যদর্বায়োর্শ্বসীম নিত্যং তং দেশং প্রণমাম্যহং ॥
পিতাপিতামহাদয়ঃ যথা মৎ পূর্ববংশজাঃ।
যত্র জাতা লয়ং জতো তং দেশং প্রণমাম্যহং ॥

অর্থাৎ যেখানকার অন্নজলে আমার এবং পূর্বপুরুষদের দেহ পুষ্টি লাভ করেছে, যে দেশের বায়ু শ্বাস প্রশ্বাসরূপে গ্রহণ করে আমার পূর্বপুরুষরা জীবন ধারণ করেছিলেন এবং আমিও বেঁচে আছি, সেই দেশকে, আমাদের মাতৃভূমিকে প্রণাম করছি। যেখানে আমাদের পূর্বপুরুষরা জন্মগ্রহণ করে অন্তে লয় প্রাপ্ত হয়েছেন, সেই দেশকে আজ প্রণাম করছি। তাঁরা সাষ্টাঙ্গে প্রণত হতেই গীর্ণারী বাবা আমার দিকে তাকালেন। আমি শশব্যস্তে নতজানু হয়ে যুক্তকরে বলতে লাগলাম –

আমি মহান্ তীর্থে দাঁড়ায়ে প্রণমি
মহা মহা মুনিগণে,
জ্বেলেছেন যাঁরা জ্ঞানালোক
নানা যুগের সন্ধিক্ষণে–
ভ্রান্তির পথে সমাজ যখন
সত্য ধর্ম ভুলেছে তখন,
দিশারী তাঁরাই এসেছেন পথ –
– দেখাতে জগৎ জনে।
(আজি) মহান্ তীর্থে দাঁড়ায়ে প্রণমি
মহা মহা মুনিগণে ॥

কবিতাটি পাঠ করে সাষ্টাঙ্গে যখন প্রণাম করছি, তখনই শুনতে পেলাম, গুহার পশ্চিম ও পূর্বদিকস্থিত সকল নাগারা কলকণ্ঠে একসঙ্গে গেয়ে উঠলেন –

ভূয়তাং পরমব্যোম্নি পীয়তাং পরমোরসঃ।
স্থীয়তাং বিগতাশঙ্কং নির্বানানন্দ-নন্দনে ॥

তিনবার একসঙ্গে সকলে মন্ত্রটি উচ্চারণ করে সকলে মিলে আরেকবার সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন গুহার কাছে। নাদ সাধনায় সিদ্ধমহাজন নামে এক বৃদ্ধ সাধু সকলকে উদ্দেশ্য করে জানালেন – এইমাত্র উচ্চারিত মন্ত্রটি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবের উক্তি। এখানে বশিষ্ঠদেব বলছেন – পরম ব্যোমে যে পরম রস নিত্য ক্ষরিত হচ্ছে গুরুদত্ত তীব্র সাধন বলে সেখানে নিঃশঙ্ক চিত্তে স্থিতিলাভ কর। নির্বাণরূপ আনন্দের নন্দনকানন ঐ স্থান। গুরুদেবজীর দীক্ষা দিবসে এই মন্ত্রই তাঁর বাণী। একথা সকলকে জানাবার আদেশ দিয়েছেন আমাকে।

এইবলে তিনি যে যার কুঠিয়াতে ফিরে যাবার কথা বলে নিজেও ফিরে যাবার জন্য উদ্যোগ করছেন, এমন সময় দেখা গেল, 'তিষ্ঠ' 'তিষ্ঠ' বলতে বলতে একজন কৌপনীধারী অতিবৃদ্ধ সাধু নগ্ন গাত্রে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে গুহার কাছে এসে নতমস্তকে বলতে লাগলেন সুর করে –

কামধেনু আছে এক সিদ্ধাদের ঘরে
গগন শিখরে নিয়া বাঁধিয়াছে তারে।
যে জীব প্রবেশে সেই কামধেনু দ্বারে,
কাটিয়াছে সিঁধ সেই নিরঞ্জন পুরে।

অবিরল ঝরে দুগ্ধ – মধু শব্দময়
শব্দের ভাণ্ডার গাভী – ঋষিগণ কয়।
ব্রহ্মমূর্ধ্বা হতে জাত গগনমণ্ডলে,
উদ্গীথ শব্দের ভাণ্ড – তারে গাভী বলে।
সূক্ত, গাথা, শব্দ, গতি – গাভী সমুদ্ভূতা,
সূর্যরশ্মি রাশি – সেই গাভীস্তনজাতা
সেই গাভী দুগ্ধ দোহি সদা জ্ঞানীগণ,
শাস্ত্র গ্রন্থ বেদ আদি করেন রচন ॥

দোঁহাটি শুনিয়েই মহাপুরুষ গুহার কাছে মাথা ঠুকে পূর্ববৎ ঠুক ঠুক করে হাঁটতে লাগলেন গুহার পশ্চিমদিকস্থ বায়ুকোণের দিকে। 'নাদসিদ্ধ মহাজনরা' তাঁকে ঘিরে ধীরে ধীরে হেঁটে চললেন। গীর্ণারী বাবার সঙ্গে আমরা ফিরলাম আমাদের কুঠিয়ায়। পথে আসতে আসতে আমি গীর্ণারী বাবাকে বললাম, সর্বশেষে যে অতিবৃদ্ধ মহাত্মা গুরুজীর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করতে এলেন, তাঁর মুখে বাংলা ভাষা শুনে আমি রীতিমত চমকে গেছি। ওঁর কি বাঙালী শরীর ?

– হ্যাঁ, ম্যায় ভি শোনা, উনোনে আপকা মুলুককা আদমী হ্যায়। লেকিন্ উনোনে বহু ভাষাবিদ্ হৈ। করীব দোশ সাল, উনোনে ইধরই হ্যায়। যোগীন্দ্র কৃপানাথজীকা বড়া গুরুভাই হ্যায়। সাল মেঁ এক দফে গুরুজীকা দীক্ষা দিবস মেঁ উনোনে বাহার নিকলতা হৈ। হরবখৎ আপনা কুঠিয়া মেঁ উনোনে বিরাজতে হৈ। কিসীকা সাথ উনোনে ভেট ভী নেহি করতা হৈ।

এই সময় রঞ্জন তাঁকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল – উন্‌কা খানা পিনা ক্যায়সে চলতা হ্যায়। আপলোগ ক্যা উনকা লিয়ে ভগবান শ্মশানেশ্বরজীকা 'দুগ্ধ পরসাদী' ভেজতে হেঁ ?

রঞ্জনের কথা শুনে গীর্ণারী বাবা হেঁসে গড়িয়ে পড়লেন। বললেন – আপলোগ্ আভি তক্ বাচ্চা হৈ। এ্যায়সা উচ্চকোটিকা মহাত্মাকো কোঈ স্থূল খাদ্য কা বিলকুল জরুরৎ নেহি হোতা। হমারা বাত সচ্ মানিয়ে।

গীর্ণারী বাবা তাঁর কুঠিয়াতে ঢুকে গেলেন, আমরা আমাদের ঘরে গিয়ে বসলাম। আমি রঞ্জনকে বললাম – এ বড় আজব জায়গা ! উত্তরতট পরিক্রমার সময় আমি কিছুদিন একটানা বাস করেছিলাম ধাবড়ীকুণ্ডে একলিঙ্গস্বামীর আশ্রমে। সেখানেও কয়েকজন অলৌকিক বিভূতি সম্পন্ন মহাপুরুষের একত্র সমাবেশ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু এই কোটেশ্বর তীর্থে এসে যেমন রহস্যময় উচ্চকোটির মহাত্মার একত্র সমাবেশ দেখলাম, এমনটি আর কোথাও দেখিনি। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে এঁদের সান্নিধ্যে কয়েকটি দিন কাটিয়ে যেতে পারছি।

– সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? তবে এখন ত মোটে সাড়ে ৮টা বেজেছে। ১১টার আগে ত মহাদেবের দুগ্ধ প্রসাদ মিলবে না, মহাত্মা কৃপানাথও ত আজ আপনাকে কাছে ডাকবেন না ! তাই আমি ভাবছি, আপনি এখন মহাত্মা প্রদত্ত পুঁথিটি বের করে আমাকে পড়ে শোনান, আমি খাতায় টুকতে থাকি।

এই বলে রঞ্জন তার খাতা পেন্সিল নিয়ে বসল। আমি পুঁথি বের করে দেবনাগরী হরফে লেখা পুঁথিটি ধীরে ধীরে পড়তে লাগলাম। রঞ্জনের টোকার সুবিধার জন্য এক এক লাইনই দুবার তিনবার করে উচ্চারণ করতে লাগলাম। রঞ্জন বাংলায় লিখে নিতে লাগল, নিজের খাতায়। এইভাবে আমরা দুজন 'শ্রীরুদ্রহৃদয়োপনিষৎ' টুকতে যখন ব্যস্ত, সবে মাত্র দুটি পাতার শ্লোক টোকা হয়েছে, এমন সময় 'টং' করে একটা ঘড়িতে ঘা দিবার শব্দ

আমাদের কানে ভেসে এল। রঞ্জন তার পকেট ঘড়ি দেখে বলল – ১১টা বেজেছে, শ্মশানেশ্বর মহাদেবের কাছে এসে কোন দুগ্ধবতী ধেনু বা বন্য মহিষী হয়ত এখন মহাদেবকে দুগ্ধ স্নান করাচ্ছেন। চলুন আমরাও যাই। পার্শ্ববর্তী কুঠিয়াগুলি হতে নাগারা কলস নিয়ে হুড়মুড় করে ছুটে চলেছেন, তার আওয়াজও আমরা শুনতে পেলাম। অগত্যা আমরাও কমণ্ডলু হাতে হাঁটতে লাগলাম শ্মশানেশ্বর ভগবানের স্থানে। পুঁথি পত্র একটা চাদর চাপা দিয়ে রেখে দেওয়া হল। গেটের কাছে যথারীতি দুজন নাগা ত্রিশূল ও খড়গ্ হাতে পাহারা দিচ্ছেন। তাঁদেরকে 'জয়গুরু' জানিয়ে গেটের বাইরে এসে দেখলাম, গীর্ণারী বাবা সহ আরও দুজন নাগা দ্রুত পদে হেঁটে চলেছেন পাথর ও কঙ্করময় ডাহি মাঠের উপর দিয়ে বটগাছকে লক্ষ্য করে। আমরা আজ আর হুড়োহুড়ি করে হাঁটলাম না। ধীরে সুস্থে বটতলায় পৌঁছে দেখি গাভীমাতা শ্মশানেশ্বরজীর মাথায় দুধ ঢেলে চলে গেছেন। নাগারা কুণ্ড থেকে দুধ সংগ্রহে ব্যস্ত। কলসীতে দুধ ভরে গীর্ণারী বাবা চলে যাবার উদ্যোগ করতেই আমি তাঁকে জানালাম – আজ ত গুরুজীকো দর্শন নাহি মিলে গা। দুগ্ধ পরসাদী লেনেকা বাদ দো তিন ঘণ্টে এহি বটকা ছায়ামেঁ বীতা কর, হমলোগ আপকা আশ্রম মেঁ যাবেগা।

– 'যো আপকা মর্জি।'

গম্ভীর কণ্ঠে এই কথা বলে গীর্ণারী বাবা চলে গেলেন। রঞ্জন মন্তব্য করল, আমরা গাভীমাতার দুগ্ধদানের দৃশ্য আজ দেখতে পেলাম না, পড়ি-কি-মরি করে দৌড় এলেই সেই পুণ্য দৃশ্য নয়ন গোচর হত, আমাদের এই গড়িমসি স্বভাবের জন্য গীর্ণারী বাবা কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে! আমি কোন উত্তর দিলাম না। মহাদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম এবং প্রদক্ষিণ করে আমরা কুণ্ডে কমণ্ডলু ডুবিয়ে 'দুগ্ধ প্রসাদ' দুজনেই আকণ্ঠ পান করলাম। মহাদেব এবং কুণ্ড হতে কিঞ্চিৎ দূরে যেখানে সূর্যরশ্মি বটগাছের ডালপালা ভেদ করে এসে পড়েছে, সেখানে বসে রোদ পোয়াতে লাগলাম। প্রায় আধঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর কারও ডুকরে কেঁদে ওঠার মত কান্নার রোল আমরা শুনতে পেয়ে চমকে উঠলাম। আমরা আঁতিপাতি করে তাকাতে লাগলাম চারদিকে। কিন্তু অস্বাভাবিক কোন কিছু আমাদের চোখে পড়ল না। কিন্তু আবার কান্নার ফোঁস ফোঁসানি, তার সঙ্গে 'হে দয়াল, মুঝে দয়া কীজিয়ে', বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কেউ যেন বলছেন, তা শুনতে পেয়ে দুজনেই উঠে চারদিক উঁকি মেরে মেরে খুঁজতে আরম্ভ করতেই বিশাল বটবৃক্ষের যেদিকটায় শ্মশানেশ্বর বিরাজমান তার ঠিক বিপরীত দিকে ঝোপঝাড়ের আড়ালে বসে একজন শিখাধারী ব্রাহ্মণকে বটগাছের গুঁড়িতে মাথা ঠুকতে দেখতে পেলাম। অনুমান করলাম, ব্রাহ্মণের বয়স অন্ততঃ ৬০ বৎসরের কম নয়। আমি রঞ্জনকে তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে আমাদের বসার জায়গায় ফিরে গেলাম। বললাম – নর্মদাতটে কে কোথায় কিরূপে থাকেন, তা বুঝা কঠিন। তবে ব্রাহ্মণ যে পূজা ও প্রার্থনায় রত আছেন, সে ত নিজের চোখেই দেখলে। তাঁকে কোন মতেই বিব্রত করা আমাদের উচিত নয়। প্রায় মিনিট পনের পরেই তিনি বটগাছের ডাল এবং দোদুল্যমান ঝুরি প্রভৃতি সরিয়ে আমাদের সামনে এসে শ্মশানেশ্বরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। তখনও তাঁর চোখে জল গড়িয়ে পড়ছে দেখলাম। আমাদের দিকে চোখ পড়তেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন – আরে! এ দো মূর্তি কাঁহা সে আয়া ?

– হমলোগ যোগন্দ্র কৃপানাথজীকি গুহাশ্রম সে আয়া মহাদেওজীকা দুগ্ধ পরসাদী কো লিয়ে। আপ্ কঁহাসে পধারে ?

পণ্ডিতজী নিজের কপালে হাত চাপড়ে বলতে লাগলেন – হম বহোৎ দীনদুঃখী হৈ, পাপাচারী ভি হৈ। হম্ ওঁঙ্কলেশ্বর সে করীব আট মিল দূর মেঁ সাজোত মহল্লা মেঁ নিবাস করতা হুঁ।

— হম্ দোনো পরকরমাবাসী ওঁঙ্কলেশ্বর ঔর সাজোত ঘুমকে আয়া। আমার এই কথা শুনে সেই ব্রাহ্মণ বললেন — তব তো আপ জরুর শোনা হৈ, সাজোত মহল্লাকী সব ব্রাহ্মণো বেদজ্ঞ হ্যায়, বেদপাঠকে কারণ সাজোত মহল্লাকী দুসরা কিসিম কা ইজ্জৎ হৈ। সাজোত মেঁ সিদ্ধরুদ্রেশ্বর মহাদেব বিরাজ করতে হৈ। হমারা পিতাজী ভি বেদজ্ঞ হৈ। বেদ পাঠ ছোড়কে হম্ স্মৃতিশাস্ত্র কী চর্চা কিয়া। পৌরহিত্য কর্ম ভি আচ্ছিতরেসে শিখ লিয়া। এহি মতবিরোধ কি কারণ পিতাজী 'তাজ্যপুত্র' কর দিয়া। হম গুজরাট প্রদেশ কি অন্তর্গত ভারোচ মেঁ যা কর পৌরহিত্য কর্ম সুরু কর দিয়া। আপ্ জরুর জানতে হৈ, গুজরাটি লোক কাফি ধনাঢ্য হৈ। ৫ সাল কি অন্দর মেঁ হমারা বহোৎ যজমান হো গয়া। উধারই মৈনেঁ সাদি ভি কর লিয়া। যজন যাজনকী বৃত্তি সে মৈনেঁ লাখো লাখো রূপেয়া কামাই কিয়া। উধারই ৫টো বড়া বড়া কোঠি ভি বানা লিয়া। জিন্দেগী ভর মাতা-পিতাকী কুছ সেবা নাহি কিয়া কোঈ সংযোগ ভি নেহি রাখা। মাতা পিতাজীনে চোলা ছাড়নে কা বাদ হমারা তিন লেড়কাকো ধন সম্পদ বণ্টন কোরকে হম্ আপনে সাজোত গাঁও মেঁ আপস্ আয়া। আপনা পিতৃপুরুষোঁ কা ভিটামেঁ বড়া কোঠি বানাকর সহধর্মিণী সাথ নিবাস করনে লগা। পশ্চাত্তাপ ঔর মন মেঁ অনুশোচনা আয়ি। পিতাজী কি স্নেহ ও দয়া স্মরণ মনন করতে হুয়ে মন মেঁ এহি ভাবনা উদয় হুয়ি, ম্যায় জরুর বড়া পাপী হুঁ। মাতা পিতাকো বহুৎ দুঃখ দিয়া। হমারা মুক্তি ক্যায়সে হোগা? শোচতে শোচতে এক রোজ হম ওঁঙ্কলেশ্বর মেঁ গিয়া। উধর এক মৌলবী হ্যায়। উনকা ইয়ে বিভূতি হ্যায়, হর আদমী কো দেখ্ কর্ উনকা ভবিষ্যৎ বাতা দে সকতে হৈ। উনোনে মুঝে বোলা —

কোই - এ - নাউমেজি মা মারো, উমেদ হা অস্ত্।
সেই - এ - তারিকি মা রো খুরসেদ হা অস্ত্॥

ইয়ে ফারসী বয়েৎ কা মতলব এহি হ্যায় - জীন্দেগী মেঁ আশা ভি হৈ, নিরাশা ভি হ্যায়। আশা হি ইনসান কা পথ। চারো তরফ দেখিয়ে না ক্যাতনা রোশনী, আকাশ মেঁ সুরয দিনভর প্রকাশ ডালতে হেঁ, রাত মেঁ চন্দ্র ভি প্রকাশ ডালতে হেঁ, এ্যাতনা রোশনী দেখনেসে ভি, আঁধারকো কেঁও সচ্ সমঝেগা? আপ মুর্শিদ কো শরণ লেও, সমুচা গুণা টুট্ যাবেগা, আপকো মুক্তি মিলেগা। ভালোদ মেঁ অনামী বাবাকো পাশ যাকর্ উনকা শরণ লিজিয়ে। পরিত্রাণ কী পথ মিল্ যাবেগা।

উনকা উপদেশ শুনকে আজ সে ৩৩দিন পহেলে হম্ ভালোদ মেঁ পৌছকর অনামী বাবাকো চরণ পাকড় লিয়া। তুরন্ত্ উনোনে আপনা গোড় হঠাকর বোলনে লাগে —

স্থানে সিংহসমা রণে মৃগোপমা স্থানান্তরে জম্বুকাঃ
আহারে বককাক শূকরা সমাশ্ছাগোপমা মৈথুনে॥
রূপে মর্কটবৎ পিশাচবদনাঃ ক্রূরাঃ খলা দুর্মুখাঃ।
'পণ্ডিতাঃ' যদি মানবাঃ হরি! হরি! প্রেতাস্তদা কী দৃশাঃ!

অনামী বাবাকা এতনা নিন্দবাক্য শুনকে মেরা মনমে বহুৎ দুঃখ হুয়া। হমনেঁ প্রশ্ন কিয়া মহারাজ! হমারা কসুর ক্যা? ইস্কা প্রায়শ্চিত্ত কা বিধান ক্যা?

অনামী বাবা নে জবাব দিয়া — প্রতিগ্রহ ঔর যজন যাজন সে আপকো যো অপরাধ হুয়া, উস অপরাধ স্খালন না হোনেসে আপকো দীক্ষা মিলেগা নেহি। আপ্ হিঁয়াসে মিল ভর দূর মেঁ মশানিয়া কোটেশ্বর কী শ্মশানেশ্বর মহাদেও কো স্থান মেঁ যাকর মাহিনাভর পূজা ঔর হর রোজ এক হাজার কোরকে জপ কীজিয়ে উসকা বাদ হম্ আপকো উপদেশ দুঙ্গা।

আজ এক মহিনা হো চুকা। আভি হম্ ভালোদ মেঁ যা রহা হৈ, অনামী বাবাকো পাশ। নমস্তেজী।

এই বলে তিনি শ্মশানেশ্বরকে প্রণাম করে যাবার উদ্যোগ করতেই আমি তাঁকে বিনীত ভাবে প্রশ্ন করলাম – পণ্ডিতজী ! আপকো শুভনাম ক্যা হৈ ?

– ইয়ে শরীর কা নাম – পণ্ডিত তিলকচাঁদ কাব্য স্মৃতি পৌরহিত্য বিশারদ হৈ । এই বলে তিনি আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলেন না । রঞ্জনের ঘড়িতে তখন দুটা বেজেছে । আমরা আরও রোদ ভোগের আশায় বটতলায় মহাদেবের থান থেকে বেরিয়ে গুহাশ্রমের দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে মাঠের মধ্যে যেখানে কড়া রোদ এসে পড়েছিল, সেখানে গিয়ে বসলাম । রঞ্জন আমাকে জিজ্ঞাসা করল পণ্ডিত তিলকচাঁদ সাজোত হতে অনামী বাবার চরণ প্রান্তে পৌঁছতেই তিনি তাঁকে যে মধুর বাক্যে আপ্যায়ন করলেন, আমি সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হলেও তিনি যজন যজনাদি কর্মে লিপ্ত প্রতিগ্রাহী পুরোহিত ব্রাহ্মণদেরকে এমন ভাষায় গালাগালি করেছিলেন, তা মোটেই মহাপুরুষোচিত হয় নি । প্রতিগ্রহ সম্বন্ধে আমাদের ধর্ম শাস্ত্রে কি সত্যই এমন কুৎসিৎ নিন্দাবাক্য আছে ?

– যে ভাষায় অনামী বাবা পণ্ডিত তিলকচাঁদকে ধিক্কার দিয়েছিলেন, ঐ রকম কুৎসিৎ নিন্দাবাক্য শাস্ত্রে কোথাও পড়েছি বলে মনে পড়ছে না । সমাজে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা অতি উচ্চ সম্মানে অধিষ্ঠিত বলে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে সমাজে কোন না কোন সময় ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ খুবই তীব্র হয়ে উঠেছিল । ব্রাহ্মণরা নিম্নজাতির লোককে ঘৃণা করতেন বলে, প্রতি ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হয়ই, কাজেই কোন না কোন সময় ব্রাহ্মণেতর কোন লেখাপড়া জানা লোক সংস্কৃতে ঐ রকম শ্লোক রচনা করেছিলেন, ব্রাহ্মণদেরকে অপদস্থ করে প্রতিশোধ নিতে । অনামী বাবার মুখে তারই প্রতিধ্বনি পণ্ডিত তিলকচাঁদ শুনেছিলেন । অনামী বাবার ঐ বাক্য সুধাকে আমার কোন শাস্ত্র বাক্য বলে মনে হয় না । অবশ্য মানব ধর্মশাস্ত্র নামক গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে একটি শ্লোক দেখেছি, তাতে প্রতিগ্রহ, যজন যাজনাদিকে গর্হিত কর্ম বলে অভিহিত করা হয়েছে । তদ্‌যথা –

প্রতিগ্রহাৎ যাজনাৎ বা তথৈ বাধ্যাপনাদপি ।
প্রতিগ্রহঃ প্রত্যবরঃ প্রেত্য বিপ্রস্য গর্হিতঃ ॥

এখানে যজন যাজন ও অন্য দশকর্ম করে পুরোহিতরা যজমানের কাছ হতে যে দান গ্রহণ করতেন বা আজও করে থাকেন, সেই প্রতিগ্রহ-বৃত্তিকে গর্হিত কর্ম বলে নিন্দা করা হয়েছে । কারণ যাঁরা পৌরহিত্য করেন, তাঁরা ধনী দরিদ্র বিচার না করে সকলের কাছ থেকে মোটা টাকা দক্ষিণা বাবদ আদায় করে থাকেন । যজমান দরিদ্র হলেও মাতৃপিতৃকার্য বা পূজানুষ্ঠান প্রভৃতিতে প্রত্যবায় বা অপরাধের ভয় দেখিয়ে চাপ দিয়ে বেশী টাকা ছলে বলে কৌশলে আদায় করাই পুরোহিত সমাজের বৃত্তি হয়ে উঠে । তাই ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে যাঁরা উচ্চ শিক্ষিত ও বিদ্বান, তাঁরা অধ্যাপনা বৃত্তিকেই সম্মানজনক বলে গ্রহণ করে নিজেরাই যাজন কর্মকে ঘোরতর অপকর্ম বলে ঘোষণা করেন । যথা –

প্রতিগ্রহাৎ শুধ্যতি জপ্য হোমৈঃ
যাজ্যন্তু পাপং ন পুনন্তি বেদাঃ ॥

অর্থাৎ প্রতিগ্রহ জনিত দোষ জপ হোমাদি ক্রিয়া দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু যাজন-কর্মে যে দোষ উৎপন্ন হয় তা দূর করা বেদেরও অসাধ্য ।

পৌরাণিক যুগে দেখি, স্বয়ং মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের মুখ দিয়ে পুরাণকার বলিয়েছেন –

পৌরহিত্যমহং জানে গর্হিতম্ দূষ্যজীবিতম্ ।
অকার্যং গর্হিতমপি তবাচার্যত্ব সিদ্ধয়ে ॥

অর্থাৎ হে রাম ! আমি জানি পৌরহিত্য গর্হিত কর্ম, ঘৃণ্য জীবিকা, তথাপি উপনয়ন সময়ে তোমার আচার্যত্ব লাভ করার প্রত্যাশাতেই ঐ নিন্দনীয় বৃত্তি অবলম্বন করেছিলাম ।

সংস্কৃতে রচিত না হলে কোন গ্রন্থকে বা শ্লোককে শাস্ত্র বা শাস্ত্রোক্ত বলে মানতে আমাদের মন চায় না। তাই প্রতিগ্রহ বা যজন যাজনাদির বিরুদ্ধে আমার যে সব প্রাচীন বা অর্বাচীন পুঁথি পড়া আছে, তার থেকেই তোমাকে এসব কথা শোনাতে পারলাম। তবে আমার নিজের মত হল, রাষ্ট্র যখন নাগরিক মাত্রেরই অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছে না, যে কোন কর্ম করতে উৎসাহী যুবক সমাজে যখন তার যোগ্যতানুসারে কোন বৃত্তি পায় না, আর সমাজে যখন নানা পূজা পালা পার্বণের অনুষ্ঠান আবহমান কাল ধরে চলে আসছে এবং চলতেও থাকবে, তখন সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ সন্তান বেকার থাকার চেয়ে যদি মন্ত্রতন্ত্র শিখে পৌরহিত্য করে নিজেদের জীবিকার সংস্থান করে নেয়, তাতে দোষটা কি ? লোকে কথায় বলে 'পেটের দায় বড় দায়।' পেট চালবার জন্য চুরি ও ছুরিকে বেছে না নিয়ে ব্রাহ্মণরা যদি পৌরহিত্যাদি কর্ম করে সসম্মানে সমাজে বেঁচে থাকতে পারেন, তার মধ্যে আমি কোন 'গর্হিত' খুঁজে পাই না। যজন যাজন বা দশকর্ম করতে হলে যথেষ্ট পড়তে হয়, শিখতে হয়, জানতে হয়, পুরোহিতকে অনেক সময় উদয়াস্ত উপবাস করে থাকতে হয়। ভক্তিমান কৃতজ্ঞ যজমান যদি সে জন্য ব্রাহ্মণকে কিছু দেন তাকে 'প্রতিগ্রহ' বলে নিন্দা করার হেতু কি ? বিনাশ্রমে দান গ্রহণকে প্রতিগ্রহ বলা যায়, কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করে ব্রাহ্মণ যখন ধর্মকার্যের মাধ্যমে উপার্জন করেন, তখন তাঁর সেই শ্রমলব্ধ অর্থকে নিন্দনীয় অর্থে প্রতিগ্রহ বলার মধ্যে যুক্তি কোথায় ?

আমার কথা শুনে রঞ্জন হাসতে হাসতে বলল – তা আপনি যে যুক্তিই দেখান, বর্তমানে পুরোহিত সমাজে যে লোভ, ভড়ং ও ভণ্ডামি দেখা দিয়েছে, জীবনচর্যা আচার আচরণের সঙ্গে বহিরাচার এবং বেশভূষার ফারাক দেখা দিয়েছে নান ছল চাতুরীর আশ্রয়ে যজমানের কাছ হতে পয়সা আদায়ের যে ভাবে নানা ফিকির ধরা পড়ছে, তাতে তাঁদের উপার্জনকে শ্রমলব্ধ উপার্জন না বলে, হীন অর্থে তাঁদের উপাজর্নকে প্রতিগ্রহ বলাই বোধ হয় সঙ্গত। এই অধঃপতন লক্ষ্য করে আমাদের কান্তকবি রজনীকান্ত সেনও বলতে বাধ্য হয়েছেন –

ফেলো না পৈতে কেটো না টিকি-টে, সর্বকর্মে প্রবেশ টিকিটে।
নেহাৎ পক্ষে টাকাটা সিকিটে, মেলেও তো ন্যাকা বুঝিয়ে !
কালিয়া কাবাব চপ্ কাটলেট, টিকি ঝাড় আর খাও ভরপেট,
পৈতেটে কানে তুলে নিয়ে বস নামাবলী কুঁচিয়ে।
আঃ যা কর বাবা আস্তে ধীরে ঘা কর কেন খুঁচিয়ে ?
পাতলা একটা যবনিকা আছে, কাজ কি সেটা ঘুচিয়ে ?

তাঁর চেয়েও মারাত্মক কথা বলেছেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ব্রাহ্মণ হয়েও। তিনি বলে গেছেন – অভিধানে লেখে, পুরোহিত চালকলাভোজী বঞ্চনা-ব্যবসায়ী মনুষ্য বিশেষ; কিন্তু এই ব্যাখ্যা দুষ্ট, কেননা, সকল পুরোহিত চালকলাভোজী নহে। অনেক পুরোহিত মদ্যমাংস খাইয়া থাকেন, অনেকে সর্বভুক্। পক্ষান্তরে চালকলা খাইলেই পুরোহিত হয়, এমন নহে। বারাণসী নামক শহরে অনেকগুলি ষাঁড় আছে, তাহারা চাল কলা খাইয়া থাকে ; কিন্তু তাহারা পুরোহিত নহে, কারণ তাহারা বঞ্চক নহে। বঞ্চকে যদি চাল কলা খায়, তাহা হইলেই পুরোহিত হয় !

উদ্ধৃতি বলেই রঞ্জন নিজেই হেঁসে লুটোপুটি খেতে থাকল। আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, তুমি সখের ভ্রমণ-বিলাসী হতে পার, কিন্তু আমি আনুষ্ঠানিক ভাবে পরিক্রমাবাসী। এই নর্মদা তটে আমাদের সামনে বয়ে চলেছেন নর্মদা, তাঁর তটেই যোগীন্দ্র কৃপানাথের পুণ্য আবাসস্থলী, পিছনে আছেন শ্মশানেশ্বর মহাদেব, এইরকম পুণ্যস্থলে বসে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা পরিক্রমাবাসীর উচিত নয়। শুধু পরিক্রমাবাসী নয়,

কোন বাউলেরও উচিত নয়। বাউলরা ত সর্বোদার ধর্মের ধারক বাহক। বাউল ধর্ম তোমাকে কি এই শিক্ষাই দিয়েছে ?

এই বলে আমি রাগ করে উঠে পড়লাম। হাঁটতে লাগলাম গুহাশ্রমের দিকে। গুহাশ্রমের গেট ঠেলে ঢুকবার সময় দেখলাম, আমার পিছন পিছন রঞ্জনও এসে পৌছে গেছে। ত্রিশূল কৃপাণধারী দুই নাগাকে 'জয়গুরু' বাক্যে অভিবাদন জানিয়ে আমরা আমাদের কুঠিয়াতে ঢুকলাম। রঞ্জনের ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে চারটা বেজেছে। শীতকালের বেলা। একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। আজ বড় ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। নীরবে নিজের শয্যা তথা আসন বিছিয়ে নিচ্ছি, এমন সময় গীর্ণারী বাবা কিছু কাঠ নিয়ে ঢুকলেন, বললেন – আজ কাফি ঠাণ্ডা হৈ। বিনা আঁগ আজ চলেগা নেহি। আভি হমলোগ্ নর্মদা স্পর্শ করনেকে লিয়ে চলেঙ্গে। নর্মদাসে লোটকর আঁগ জ্বালা দুঙ্গা। এই বলে তিনি কুঠিয়ার এক কোণে যে বড় তাম্রকুণ্ড আছে সেখানে কাঠগুলি সাজিয়ে দিলেন। তাঁর পিছনে পিছনে আমি কমণ্ডলুটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। গীর্ণারী বাবার সঙ্গে আরও চারজন নাগা এবং রঞ্জনও কমণ্ডলু হাতে নর্মদার ঘাটে পৌছে গেছে। নর্মদা স্পর্শ করে, হাত মুখ ধুয়ে প্রত্যেকেই কিছুক্ষণ জপ করে ফিরে চললাম কুঠিয়ায়। তখনও সূর্যাস্ত হয় নি, কিন্তু সূর্যাস্তের আর দেরীও নাই। অস্ত যাওয়ার পূর্বে সূর্যের রক্তাভ রশ্মি সমস্ত পশ্চিম আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এত ঠাণ্ডা যে সেই অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করার মন নাই। প্রায় প্রত্যেকেই আমরা শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি। যে যার ঘরে ঢুকে কুঠিয়ার জানালা বন্ধ করে দিলাম। গীর্ণারী বাবা আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন। রঞ্জন তার বিছানা পেতে একতারাটি হাতে নিয়ে আবেগদীপ্ত কণ্ঠে গান সুরু করে দিল –

তাই তো আমি বাউল হৈনু ভাই,
এখন লোকের বেদের ভেদ বিভেদের
আর তো কোন দাবী দাওয়া নাই ॥
কারে বলব কে করবে বা প্রত্যয়,
আছে এই মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময় ॥
যারে আকাশ পাতাল খুঁজে মরিস
এই দেহে সে রয় ॥
সকল ভেদ বিভেদের কালি মুছে,
ও আমি সবার মাঝে দেখব আমার সাঁই
তাইতো আমি বাউল হৈনু ভাই !

গান শেষ করে রঞ্জন একতারাটি মাথায় ঠেকিয়ে বসে আছে দেখে আমি ধীরে ধীরে তার কাছে উঠে গিয়ে হাত ধরে বললাম, আমার কথায় ক্ষুন্ন হয়ো না ভাই, বিধিদত্ত এমন সুরেলা কন্ঠস্বর যার, যে অপার সৌভাগ্য পেয়েছেন নর্মদা তটে সর্বত্র ভগবদ্-বিভূতি দেখে ঘুরে বেড়াবার, তার মধ্যে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করা উচিত নয়। তোমার সঙ্গে এতদিন মিশে আমি বুঝেছি, তুমি জাত-বাউল; বাউলরা সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। আজ বিকেলে তোমার ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে ট্যারা-বাঁকা কথায় আমি ব্যথা অনুভব করেছিলাম। পুরোহিতদের প্রতি তোমার এতই বিদ্বেষ যে, যেখানেই তুমি তাঁদের বিরুদ্ধে কথা পেয়েছ, তা গদ্যই হোক, পদ্যই হোক, সব অক্ষরসঃ মুখস্থ করে রেখেছ !

– আমি আমাদের পুরোহিতের ব্যবহার কিছুতেই ভুলতে পারিনা। অল্প বয়সেই আমি যে আমার মাকে হারিয়েছি, সে কথা আমি আপনাকে পূর্বেই বলেছি। শ্রাদ্ধের ফর্দ করতে বসে বাবাকে তিনি বললেন – মৃত্যু তো আমাদের সকলের অনিবার্য পরিণতি; যে গেছে সে তো আর ফিরে আসবে না। তোমার একটি মাত্র সন্তান, কথায় আছে না – নদীকূলে বাস

ভাবনা বারমাস, কখন যে বন্যা এসে ঘরবাড়ী ভূমিসাৎ করে দেবে, তার ঠিক নাই, তেমনি এক ছেলের আশ, ভাবনা বারমাস, যে কোন সময় মারাত্মক রোগে তার দেহান্ত ঘটতে পারে। তাই আমি বলিকি বাবাজী তুমি পুনরায় দার পরিগ্রহ কর। শাস্ত্রে ত তার বিধান আছে। তোমার বয়সও অল্প, ৪৫ বৎসর বয়স কি আর বয়স! তাই যতটুকু না করলে নয়, অল্প খরচে সেই দায়টুকু সেরে, তুমি পুনরায় দার পরিগ্রহের জন্য প্রস্তুত হও। মাসখানিক কেটে গেলেই আমি পাত্রী দেখতে শুরু করব! ভার্যা হচ্ছে গৃহের লক্ষ্মী, একে তুমি উকিল মানুষ, তোমার কাছে প্রতিদিন মক্কেলদের আনাগোনা আছে, চা জল খাবার দিয়ে তাদের আপ্যায়ন এবং তোমার কোর্টে বেরুনোর আগে, তোমার ছেলের ইস্কুলে যাবার আগে যথাসময় ভাতের ব্যবস্থা করা, এই সব নানান্ ঝামেলা গৃহে লক্ষ্মী না থাকলে পোয়াবে কে?

বাবা নীরবে সব শুনলেন। তারপর শ্রাদ্ধ চুকে যেতেই, মাসখানিক অতিবাহিত হতে না হতেই বাড়ীতে ঘটকের আনাগোনা শুরু হল। বাবাকে দেখতাম, কোন কোন দিন কোর্ট থেকে আসতে রাত্রি হত। সন্ধ্যাবেলা তাঁর মক্কেলরা বাড়ীতে এসে ফিরে যেত। পরে জেনেছি, আমাদের সেই পুরোহিত বাবাকে সঙ্গে নিয়ে পাত্রী দেখিয়ে বেড়াতেন। মায়ের দেহান্তের পর বৎসর খানিকও কাটল না, পুরোহিতদের 'ভাষ'-এর কোনদিন অভাব হয় না। সংস্কৃত শ্লোক আউড়িয়ে ঐ পুরোহিত মায়ের সংক্ষিপ্ত সপিণ্ডকরণ করিয়ে বাবার বিয়ে দিয়ে দিলেন। সৎমা আসার পর থেকে আমার জীবনে বিপর্যয় নেমে এল। শেষ পর্যন্ত আমি ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে গিয়ে বাউলদের আখড়ায় যোগ দিলাম। সেই থেকে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের উপর আমার বিতৃষ্ণা! আপনার কথায় বুঝেছি, নর্মদা তটে এসে কারও উপর এমন বিতৃষ্ণা পোষণ করা অনুচিত।

এই বলে রঞ্জন চুপ করল। আজ অতিরিক্ত কন্‌কনে হাওয়ার জন্য নর্মদার ঘাটে বসে সান্ধ্যক্রিয়া করতে পারিনি। আমি নিজের আসনে গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে সান্ধ্যক্রিয়া করতে বসলাম। সান্ধ্যক্রিয়ান্তে শুয়ে পড়তেই কানের মধ্যে সেই একটানা গুণ্‌গুণ্ শব্দ, নানা রকমের নাদ ধ্বনিত হতে আরম্ভ হল। কি জানি কেন, এই ধ্বনি শ্রবণে আমার রুচি হল না! মনে বিচার জন্মাল, এই নিরন্তর ধ্বনি শ্রবণে আমার আত্মার কি কল্যাণটা হচ্ছে? শব্দের টানে যদি আমার জীবাত্মা বা সুরত ঊর্ধ্বতর মণ্ডলে টানা হয়ে যেত, তাহলে বুঝতাম uplift of the Soul হচ্ছে। তার যখন কোন স্পষ্টানুভূতি জাগছে না, তখন হতে পারে এখানে বর্তমানে এবং পূর্বে যে সব নাদসাধক ছিলেন, তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন নাদ সাধনায় এখানকার ধূলিতে নাদ জেগেছে। অপরের সাধনলব্ধ সেই ফল বা গাথা শুনে আমার কি লাভ? বিরক্ত মনে উঠে বসলাম। ঐ নাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য আমি প্রলয়দাসজীর শ্রীমূর্তি চিন্তা করতে লাগলাম। কি জানি এখন সেই মহাযোগেশ্বর, যোগিরাজাধিরাজ ওঁকারেশ্বরে বসে কি করছেন? তাঁর কথা চিন্তা করতে করতেই আমার মন শান্ত হল, ঘুমে চোখ ভারী হয়ে উঠল। আমি শুয়ে পড়লাম। কতক্ষণ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম জানি না, সহসা স্বপ্নাবেশে দেখতে পেলাম – আমি নর্মদার ঘাটে নেমে স্নান করছি, জলের ধারে মহাত্মা প্রলয়দাসজী এবং বাবা দাঁড়িয়ে আছেন! বাবা আমাকে বলছেন – হাত জোড় করে বল,

পিতৃণ নমস্য দিবি যে চ মূর্তাঃ স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।
প্রদান শক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদা যেহনভিসংহিতেষু॥

অর্থাৎ যাঁরা দিব্যমূর্তি ধারণ করে স্বর্গে বিরাজ করছেন, যাঁরা শ্রাদ্ধান্ন (স্বধা) ভোজন করেন, যাঁরা সন্তানদের সকল বাঞ্ছা পূরণ করতে সমর্থ, অন্য কোন ফলাকাঙ্খী না হলে যাঁরা মুক্তিদান করেন, সেই পিতৃগণকে প্রণাম করি।

গাঢ় ঘুমের মধ্যেই এই অভিনব দৃশ্যপদ ধীরে ধীরে সরে গেল। আমি জেগে উঠে আসনের উপর স্থির হয়ে বসলাম। মনে আমার আনন্দ আর ধরে না। গুরু এবং মহাগুরুর এইভাবে একত্র দর্শন লাভ স্বপ্নেই হোক আর জাগরণেই হোক, এইভাবে কখনও ঘটেনি। স্থান মাহাত্ম্য যে সে কথা স্বীকার করতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে জাগল যে, সর্বত্র নর্মদার ঘাটে ঘাটে এতকাল তর্পণ করে এসেছি, কিন্তু অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্য এখানে এসে এ কয়দিন তর্পণ করতে পারি নি। বাবা এবং প্রলয়দাসজী তাই সে বিষয়ে অবহিত করে গেলেন। আমি বারবার তাঁদের উদ্দেশ্যে মাথা ঠুকে প্রণাম করতে লাগলাম। সহসা চমকে উঠলাম রঞ্জনের গলা শুনে। সে বেশ দরদ দিয়ে আবৃত্তি করছে –

'তুমি আছ অনলে অনিলে চির নভোনীলে
ভূধরে আঁধারে গগনে
আছ বিটপী লতায় জলদের গায়
শশী তারকায় তপনে।'

কান্তকবির রচিত এই পদ্য রঞ্জনের মুখ দিয়ে নির্গত হতে দেখে আমি খুবই চমকে উঠলাম। এ তো বিশ্বানুভূতি, সর্বানুভূতির কথা! ঘুমের মধ্যে যদি রঞ্জনের এই অনুভূতি হয়ে থাকে তাহলে তার চেয়ে আনন্দের সংবাদ কি হতে পারে! কিন্তু আমার এই ঘোর কাটতে বিলম্ব হ'ল না। ফস্ করে একটা দেশলাই-এর কাঠি জ্বেলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল – 'ওহো! আপনি উঠে পড়ছেন? এখন আমার ঘড়িতে বেজেছে পাঁচটা। সকাল হয়ে গেছে।' এই কথা বলতে বলতে কুঠিয়ার জানালাটা খুলেই ঠাণ্ডা বাতাসের দাপটে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে ফেলল। আমাকে বলল – আচ্ছা, কবিরা কি যোগী! কান্তকবির যে কবিতাটা আমি একটু আগে বলছিলাম, ঐটি আমার খুবই প্রিয় কবিতা। আমি প্রতিদিনই সকালে উঠে মনে মনে কবিতাটি পাঠ করি, আজ একটু জোরে আবৃত্তি করা হয়ে গেছে; আপনিও হয়ত শুনে থাকবেন!

– হ্যাঁ, আমি শুনেছি, ভালই করেছেন আবৃত্তি করে। উচ্চকোটির কবি মাত্রেই দার্শনিক হন। বেদে এইজন্য কবির প্রতিশব্দে বলা হয়েছে – 'কবিঃ পরিভূঃ ক্রান্তদর্শীঃ।'

আমরা আসন গুটিয়ে রেখে স্নানের জন্য প্রস্তুত হতে থাকলাম। কিছুক্ষণ পরে গীর্ণারী বাবা এসে দরজায় টোকা দিতেই আমরা, তিনি এবং তাঁর সঙ্গী নাগাদের সঙ্গে প্রাতঃকৃত্যাদির পর নর্মদার ঘাটে গিয়ে পৌঁছলাম। আমি গীর্ণারী বাবাকে বললাম – আপনারা স্নান করে চলে যান, আমার ফিরতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হবে। স্নান করেই আমি নর্মদার জলে বাবা এবং পরমপূজনীয় পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করলাম প্রাণভরে। তর্পণ করে এসে দেখি, পূর্ব পূর্ব দিনের মত গুহার পশ্চিম দিকস্থ নাদসিদ্ধ মহাজন বলে কথিত সাধুবর্গ এবং গীর্ণারী বাবার সাথীরা গুহার উভয় দিকে দাঁড়িয়ে সেই – 'সুরত নিরত মন পবন পর সোহহং সোহহং হোয়' এবং অপর পক্ষ – 'শুন বিদেশী বস রহা হমারে ত্রিকুটী তীর' ইত্যাদি গেয়ে তরজা গান গেয়ে যাচ্ছেন। রঞ্জন আমাদের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে উপভোগ করছে।

আকাশে সূর্যোদয় হয়ে গেছে। তার রশ্মিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে বন জঙ্গল নদী ও পাহাড়। আজ ৩রা মাঘ। আজ কৃপানাথজীর আমাকে কাছে ডাকার কথা আছে। আমি ভিজা গামছা রোদে শুকোতে দিয়ে কুঠিয়ার মধ্যে গিয়ে বসলাম। নাগাদের পারস্পরিক ভাব আদানপ্রদানের পর্ব শেষ হতেই রঞ্জন ঘরের মধ্যে ঢুকে তার খাতা পেন্সিল নিয়ে বসল। আমি তাকে শ্রীরুদ্রহৃদয়োপনিষৎ পড়ে শোনাতে লাগলাম, সে টুকে নিতে আরম্ভ করল। ২৫ পৃষ্ঠা পুঁথিটির প্রায় ১৫ পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে এমন সময় টং করে শব্দ বেজে উঠতেই আমি রঞ্জনকে বললাম – এবার তোমার দ্রুত লেখন ও শ্রুতি লিখনে ছেদ টেনে

উঠে পড়। কাল আমাদের যেতে কিঞ্চিৎ দেরী হয়েছিল বলে গীর্ণারী বাবা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন মনে আছে ত ?

আমার কথা শেষ হতে না হতেই গীর্ণারী বাবা আমাদের ঘরের দরজা ঠেলে উঁকি মারলেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে কমণ্ডলু হাতে তাঁর পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগলাম। অপর দুজন নাগাও কলসী হাতে আমাদের সঙ্গে চলেছেন। বটগাছের তলায় দেবকাঞ্চন ফুলগাছের আবেষ্টনীর মধ্যে স্থিত ভগবান শ্মশানেশ্বরের মাথায় উপরে ঠ্যাং তুলে দিয়ে এক বিশাল কৃষ্ণ বর্ণের গাভী বাঁটগুলো চেপে ধরে আছে, অঝোরে দুধ ঝরছে, পড়ছে মহাদেবের মাথায় আর কুল কুল শব্দে গড়িয়ে গিয়ে পড়ছে সেই কুণ্ডে। দুগ্ধদানের পর অতি সাবধানে অতি সন্তর্পণে পাটি নামিয়ে নিয়ে, শ্মশানেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করে দৌড়ে দৌড়ে উঠে যেতে লাগল অদূরস্থিত পাহাড়ের মাথায়। এতবড় বিশালকায় গাভী নিজের চোখে না দেখলে অপরের বর্ণনায় কিছুতেই আস্থা স্থাপন করতে পারতাম না। গাভী স্থান ত্যাগ করতেই আমরা সকলে শ্মশানেশ্বরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে কুণ্ড থেকে যে যার পাত্র ভরে দুধ নিতে লাগলাম। দুধ নেওয়ার পর হঠাৎ আমার চোখ শ্মশানেশ্বর শিবলিঙ্গের উপর পড়ল। দেখলাম, শিবলিঙ্গটি ঘোর রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। নিজের কমণ্ডলু এবং কুণ্ডের দিকে তাকিয়ে দুধ ত সকলের পাত্রেই ধব্‌ধবে্ সাদা দেখছি! অন্যান্য দিন দুগ্ধ স্নানের পর শ্মশানেশ্বরের গাত্র কুচকুচে কালো রং-এর হতে দেখেছি, কিন্তু এইরকম ঘোর রক্তবর্ণ হতে দেখি নি। গীর্ণারী বাবার দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করতেই তিনি বললেন – ইস্‌কা কারণ মুঝে্ পতা নেহি। আপ গুরুজীকা পুছিয়ে। আজ তো উন্‌কা সাথ আপকো ভেট হোগা।

আমরা সবাই নীরবে ফিরে চললাম গুহাশ্রমে। কুঠিয়াতে পৌঁছে চুপচাপ বসে থাকলাম। রঞ্জন দুগ্ধ পানের পর পুঁথি লেখার খাতাটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে দেখে তাকে বললাম – আজ আর পুঁথি পড়ে dictation দিবার mood নাই। আবার কাল স্নান করে এসে বসা যাবে। সে পুঁথি ও খাতা গুছিয়ে রেখে দিল।

আমি মতিশঙ্খের ধ্বনি শোনার উদগ্র আকাঙ্খা এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে রইলাম। রঞ্জনের নাক ডাকার শব্দ শুনে বুঝলাম, বেচারা ঘুমিয়ে পড়েছে। আমারও চোখে ঘুমের আমেজ, মাঝে মাঝে ঢুলছি, আবার জেগে উঠে রঞ্জনের ঘড়ি দেখছি। বেলা দেড়টা নাগাদ মতিশঙ্খ বেজে উঠল গুহাতে। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে চললাম গুহার কাছে। মহাত্মা গুহার মধ্যে থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে দাঁড়িয়েছেন গুহার মুখে, তাঁর কণ্ঠদেশ এবং মুখমণ্ডল দেখা যাচ্ছে। আমি নতজানু হয়ে প্রণাম করলাম, তাঁর অত্যুজ্জ্বল ললাটে আজ দেখছি অগুরু চন্দনের ত্রিপুণ্ড্র। আমি প্রণাম করেই জিজ্ঞাসা করলাম – আজ ভগবান শ্মশানেশ্বরের দুগ্ধস্নানের পর রক্তিমাভা ফুটে উঠেছে কেন ?

তিনি ঈষৎ হাসিমাখা মুখে বললেন – ভালোদ থেকে এখানে এসে শ্মশানেশ্বরের কর্কশ মূর্তি দর্শন করেই তুমি ভেবেছিলে কর্করাদি প্রলিপ্তন্তু ইদং কর্কশরূপং গার্হস্থে ন সুখপ্রদম্। সদ্যোজাত সাদা গোদুগ্ধে কোন রাসায়নিক ক্রিয়া বা chemical action হয় না। কেবল তোমার সেই প্রথম দিনের ভাবনার উত্তরে শ্মশানেশ্বর রক্তবর্ণ অঘোর রূপ ধারণ করে সংকেতে তোমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তুমি আবাল্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করেও এবং নিজে পরিক্রমবাসী হয়েও গার্হস্থ্য ধর্মে বাস করাই তোমার বিধিলিপি। তোমার ঋষিতুল্য পিতা ঠাকুরও সন্ন্যাস ধর্মকে পছন্দ করতেন না।

যাক্ গে সে কথা। এখন আমরা বৈদিক হংসবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করি এস। তোমাকে পূর্বেই বলেছি যে হন্তি অবিদ্যাং তৎকার্যং চৈতি হংসঃ পরমাত্মা অর্থাৎ অবিদ্যা ও তৎকার্যকে ধ্বংস করেন বলে সাক্ষাৎ পরমাত্মাই হংস নামে কথিত হন। তার মানে সাক্ষাৎ পরমাত্মাই হং নামে কথিত হন। কাজেই হংস সাধনা সাক্ষাৎ পরমাত্মা প্রাপ্তির বিশেষ

সাধনা। প্রাণধর্মী জীব হংস মন্ত্রের প্রথম অক্ষর হং (অর্থাৎ অহং) উচ্চারণ করতে করতে নিঃশ্বাস ত্যাগ এবং শেষাক্ষর সঃ উচ্চারণ করতে করতে উচ্ছ্বাস গ্রহণ করছে। লৌকিক জীবনের আরম্ভ অর্থাৎ দেহ ধারণের সময় হতেই প্রাণধর্মী জীবের এই প্রাণন কার্য চলছে এবং দেহত্যাগ পর্যন্ত চলতেই থাকবে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যেক জীবের ২১৬০০ বার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলে অর্থাৎ ২১৬০০ বার উচ্ছ্বাস ও ২১৬০০ বার নিঃশ্বাসের ক্রিয়া চলে। স্বাস্থ্যের অবস্থা ভেদে, বয়ঃক্রম ভেদে, পরিশ্রমসাধ্য কার্যকারণ ভেদে এই সংখ্যা গণনায় কখন কখন কিছুটা ইতর বিশেষ ঘটলেও, সাধারণত ৬ বার উচ্ছ্বাস ও ৬ বার নিঃশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করতে হিসাব করে যোগীরা দেখেছেন যে মাত্র এক পল সময় লাগে। ১০ বিপল সময়ে একবার উচ্ছ্বাস একবার নিঃশ্বাস হয়। ৬০ বিপলে বা ১ পলে ৬ বার উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। ৬০ পলে বা ১ দণ্ডে ৬০ × ৬ = ৩৬০ বার উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ৬০ দণ্ডে অর্থাৎ এক অহোরাত্রে ৩৬০ × ৬১ = ২১,৬০০ বার উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস ক্রিয়া ঘটে থাকে। যোগের পরিভাষায় বলতে গেলে, একপ্রাণ সময়ে ৬ উচ্ছ্বাস ও ৬ নিঃশ্বাস ক্রিয়া হয়। ৬০ প্রাণ বা এক নাড়ীতে ৬০ × ৬ = ৩৬০ উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। তাহলে ৬০ নাড়ীতে বা এক অহোরাত্রিতে ৩৬০ × ৬০ = ২১৬০০ বার উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য মতে বলতে গেলে বলতে হয় ৪ সেকেণ্ডে এক উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। তাহলে ৬০ সেকেণ্ডে বা এক মিনিটে ৬০ + ৪ = ১৫ বার উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস ক্রিয়া হয়। ৬০ মিনিটে বা এক ঘণ্টায় ১৫ × ৬০ = ৯০০ বার উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস ক্রিয়া হয়। ২৪ ঘণ্টায় বা এক অহোরাত্রে ৯০০ × ২৪ = ২১৬০০ বার উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস ক্রিয়া হয়!

এই পর্যন্ত বলে, মহাত্মা কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে চুপ করে বসে রইলেন। মিনিট তিনেক ঐভাবে থেকে আমাকে বললেন – যোগশিখা উপনিষদ, ধ্যানবিন্দু উপনিষদ এবং শৈবাগমের অন্তর্গত নিরুত্তর তন্ত্রের চতুর্থ পটলে ঐ সব গ্রন্থের দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা ঋষিরা নিজেদের জীবন্ত অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে সামান্য ভাষার হেরফের করে একই কথা বলতে চেয়েছেন যে,

হকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ।
হংসেতি পরমং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্বদা ॥

এই মন্ত্রের তাৎপর্য হল, প্রাণধর্মী জীব হকার উচ্চারণ করতে করতে বাইরে যাচ্ছে এবং সকার উচ্চারণ করতে করতে ভিতরে প্রবেশ করছে অর্থাৎ তার নিঃশ্বাসে হকার এবং উচ্ছ্বাসে সকার ধ্বনিত হচ্ছে। তার মানে প্রতি জীবই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হোক প্রতিনিয়ত হংস মন্ত্র জপ করে চলেছে। যে কোন বীজমন্ত্র বা নাম জপে সাধককে সেই মন্ত্রকে সর্বদা স্মরণে রাখতে হয় কিন্তু হংস মন্ত্রে স্মরণের কোন বালাই নাই। জাগ্রত বা নিদ্রিত যে কোন অবস্থায় হোক শ্বাস প্রশ্বাস চললেই তাতে স্বতঃই হংস মন্ত্রের জপ হয়। মন দিয়ে বা ঠোঁট দিয়ে কিংবা জিহ্বার দ্বারা হংস মন্ত্রকে জপ করতে হয় না কিংবা 'হংস' শব্দটি উচ্চারণও করতে হয় না। আপন স্বভাবের বেগে এই ধ্বনির ধারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বয়ে চলেছে। এই জন্য একে অজপা জপও বলা হয়।

এই হংস মন্ত্র বা অজপ জপ যে কি জিনিষ তা যোগচূড়ামণি উপনিষদ বইটি কোনদিন হাতে পেলে পড়ে দেখো, তাহলেই হংসবিদ্যায় তোমার অবিচল নিষ্ঠা জন্মাবে। যোগচড়ামণি উপনিষদ বলেছেন –

আক্ষিপ্তো ভুজদণ্ডেন যথা চলতি কন্দুকঃ।
প্রাণাপান সমাক্ষিপ্তস্তথা জীবো ন তিষ্ঠতি ॥
প্রাণাপান বশো জীবো হ্যধশ্চোর্ধং চ ধাবতি।

বাম-দক্ষিণ-মার্গাভ্যাং চঞ্চলত্বান্ন দৃশ্যতে ॥
রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনো গতোঽপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ ।
গুণবদ্ধোস্তথা জীবঃ প্রাণাপানেন কর্ষতি ॥
প্রাণাপানবশোজীবো হ্যধশ্চোর্দ্ধং চ গচ্ছতি ।
অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোঽপানং চ কর্ষতি ॥
উর্ধ্বাধঃ সংস্থিতাবেতৌ যো জানাতি স যোগবিৎ ।
হকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ ॥
হংসহংসেত্যমুং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্বদা ।
অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদা সদা ॥
অস্যাঃ সংকল্পমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।
অনয়া সদৃশী বিদ্যা অনয়া সদৃশো জপঃ ।
অনয়া সদৃশং জ্ঞানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥
কুণ্ডলিন্যা সমুদ্ভূতা গায়ত্রী প্রাণধারিণী ।
প্রাণবিদ্যা মহাবিদ্যা যস্তাং বেত্ত স বেদবিৎ ॥

এই মন্ত্রগুলি তিনি একটি কাগজে লিখেই এনেছিলেন । কাগজটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন – এইবার মন্ত্ররাজির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি মন দিয়ে শোন এবং চিত্তে অবধারণ করার চেষ্টা কর । এখানে উপনিষদকার ঋষি বলছেন – হাতের দ্বারা সমাক্ষিপ্ত অর্থাৎ তাড়িত হয়ে কন্দুক (রবার বা চামড়ার বল) যেমন উচ্চলিত হয়, অর্থাৎ একবার নিচের দিকে একবার উপরের দিক প্রধাবিত হয়, ঠিক তেমনি জীবও প্রাণবায়ু ও অপান বায়ু দ্বারা সমাক্ষিপ্ত অর্থাৎ আকর্ষিত ও বিকর্ষিত হয়ে নিয়তই প্রধাবিত হচ্ছে – কোন মতেই স্থির থাকতে পারছে না । প্রাণ ও অপানের পারস্পরিক আকর্ষণ বিকর্ষণের ফলে জীব বাম (ইড়া) ও দক্ষিণ (পিঙ্গলা) মার্গ দ্বারা প্রতিনিয়ত অধঃ ও উর্ধ্বদিকে প্রধাবিত হচ্ছে । কিন্তু নিয়ত চঞ্চল বলে অনুভূত হচ্ছে না । রজ্জুবদ্ধ পাখী যেমন উড্ডীন হয়েও আবার রজ্জু দ্বারা আকৃষ্ট হয়, সেইরকম জীবও প্রাণ ও অপানের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে থাকে । জীবাত্মা প্রাণ ও অপানের অধীন হয়ে অধঃ ও উর্ধ্বদিকে গমনাগমন করে । কারণ অধোমুখী অপানবায়ু উর্ধ্বমুখী প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করে এবং উর্ধ্বমুখগামী প্রাণ অধোমুখী অপানকে আকর্ষণ করে । এই প্রাণ ও অপান উভয়ে যথাক্রমে উর্ধ্ব ও অধোমুখে সংস্থিত । এই তত্ত্ব যিনি অবগত আছেন তিনিই যথার্থ যোগরহস্যবিৎ । একটু লক্ষ্য করলেই যে কেউ বুঝতে পারবে, প্রাণধর্মী জীব যেন হং-কার উচ্চারণ করতে করতে বাইরে যাচ্ছে আবার সঃ-কার উচ্চারণ করতে করতে ভিতরে প্রবেশ করছে । এইভাবে জীব সর্বদা 'হংস' 'হংস' (অহংসঃ অহংসঃ) – অর্থাৎ 'আমিই সেই', 'আমিই সেই' এইরকম জপ করে চলেছে । এই ভাবে জীব প্রতিনিয়ত দিবারাত্রিতে হংস মন্ত্র ২১৬০০ বার জপ করে চলেছে । নিজের কোন চেষ্টা নাই, উদ্যোগ নাই, কেবল উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাসকে অনুগমন ও অনুসরণ করলেই হল । প্রথম প্রথম মনে হবে হং বলতে অহং অর্থাৎ আমিই, সঃ বলতে তিনি অর্থাৎ 'আমিই তিনি' এইভাবে আরোপ করতে হচ্ছে । কিন্তু কিছুদিন স্থির মনে আসনে বসলেই যে কেউ বুঝতে পারবে যে উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাসের ধারার সঙ্গে ঐভাব যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে । এই জন্যই এই মন্ত্রের নাম অজপা । এই বিদ্যা যোগিদের মুক্তিদায়িনী । এই অজপার প্রভাবে জীব সর্বপাপ হতে মুক্ত হয় । এর সমান বিদ্যা, এর সমান জপ এবং এর মত জ্ঞান আর হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না । কুণ্ডলিনী সমুদ্ভূতা এই অপরূপ প্রাণরক্ষিকা অজপা গায়ত্রী প্রাণবিদ্যা ও মহাবিদ্যা নামেও অভিহিত হন । যিনি এই মহাবিদ্যা অবগত আছেন তিনিই প্রকৃত বেদরহস্যবিৎ ।

তাঁর কথা শেষ হলেই আমি হাত জোড় করে নিবেদন করলাম, আপনি এইমাত্র 'যোগচূড়ামণি উপনিষদ' হতে উদ্ধৃতি দিয়ে হংসবিদ্যা ও অজপা গায়ত্রীর সাধনোপদেশ দিতে গিয়ে বললেন – হকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ, কিন্তু আমি শৈবাগম শাস্ত্রের 'শিবসূত্রবিমর্শিনী' নামক মূল গ্রন্থে, এবং তার টীকাকার ক্ষেমরাজ রচিত 'বিজ্ঞান ভৈরব' নামক গ্রন্থে দেখেছি, তাঁরা হংসবিদ্যার আলোচনায় বলেছেন – সকারেণ বহির্যাতি হংকারেণ বিশেৎ পুনঃ। শ্রীমৎ সর্বানন্দ রচিত 'সর্বেশ্বরতন্ত্রে' আছে – কুম্ভকং স্যাৎ হংকারেণ সঃকারেণাপি রেচনম্, সর্বোপরি আমাদের বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক রামপ্রসাদ সেনও বলে গেছেন, যতদূর আমার মনে পড়ছে – হং বর্ণ পূরকে হয়, স বর্ণ রেচকে বয়, কাজেই এই নানা মুনির নানা মতে স্বভাবতই সংশয় জাগে কোন্ ধারাটা ঠিক ? আমার কথা শুনে মহাত্মা কৃপানাথ বললেন, রামপ্রসাদ প্রকৃতপক্ষে কি কথা বলেছিলেন, সে কথা কি আমাকে বলতে পার ? আমি বললাম মাতৃসাধক রামপ্রসাদ যা কিছু বলেছেন সব গানের আকারে, আমি গায়কও নই, তাঁর সমস্ত ভাষাও মুখস্থ নাই, তবে আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহলে আমার সাথী রঞ্জনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে হয়ত সে বলতে পারবে, কারণ সে গায়ক, বাঙালী গায়ক মাত্রেরই সাধারণতঃ রামপ্রসাদের গান মুখস্থ থাকে। তিনি ঘাড় নেড়ে সায় দিতেই আমি হাত নেড়ে রঞ্জনকে একতারা হাতে নিয়ে গুহার কাছে আসতে ইঙ্গিত করলাম। আমাদের কুঠিয়ার বাইরে সে দাঁড়িয়েছিল আমার ইঙ্গিত বুঝতে পেরেই সে একতারা নিয়ে গুহার কাছে ছুটে এল। মহাত্মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠতেই আমি তাকে বললাম, রামপ্রসাদের যে গানে 'হং বর্ণ পূরকে হয়, স বর্ণ রেচকে হয়' প্রভৃতি শব্দগুলি আছে জানা থাকলে সেই গানটি মহারাজকে গেয়ে শোনাও। দু এক মিনিট চিন্তা করে নিয়েই রঞ্জন অত্যন্ত গদগদ কণ্ঠে গাইতে লাগল –

মন কি কর ভবে আসিয়ে।
(ওরে) দিবা অবশেষ, অজপার শেষ,
ক্রমেতে নিঃশ্বাস যায় ফুরিয়ে।
হং বর্ণ পূরকে হয়, স বর্ণ রেচকে বয়।
অহর্নিশি করে জপ, হংস হংস বলিয়ে ॥
অজপা হইলে সাঙ্গ, কোথা তব রবে রঙ্গ,
সকলি হইবে ভঙ্গ, ভবানীরে না ভাবিয়ে ॥
চলনে দ্বিগুণ ক্ষয়, ততোধিক নিদ্রায় হয়,
বিনয়ে রামপ্রসাদ কয় ততোধিক সঙ্গম সময়ে।
মন কি কর ভবে আসিয়ে ॥

গান শেষ হতেই তিনি রঞ্জনকে চলে যেতে ইঙ্গিত করলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন – বুঝলাম, একই মন্ত্রকে তিন রকম ধারায় প্রকাশ করলে জাপকের মন সংশয় দোলায় দুলবে এটা স্বাভাবিক। আমি তো একটু আগেই বললাম যে প্রথম প্রথম সাধনার শুরুতে সাধনার সুবিধার জন্য নানারকম আরোপের সাহায্য নিতে হয়। হংস (অহংসঃ) এইভাবে যে উচ্ছ্বাসে নিঃশ্বাসে ধ্বনিত হয় তা আরোপই বটে। যেমন অনাহত ধ্বনিতে কেউ ওঁকার ধ্বনি, কেউ রাধাস্বামী ধ্বনি, কেউ বা যমুনা-পুলিনে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি, আবার কেউ রামনামের ধ্বনি শ্রবণ করেন, এও ঠিক তেমনি। 'হং+সঃ' শব্দে বা পদে অহং+সঃ বুদ্ধি আরোপ – আবার নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বাসে অহং+সঃ ধ্বনি হচ্ছে এই বুদ্ধি আরোপ-এ সমস্তই উপাসনায় মন নিবিষ্ট করার জন্য। হং+সঃ (অহং + সঃ) ধ্বনি নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বাসে আরোপ না করে উচ্ছ্বাসে নিঃশ্বাসে আরোপ করে উপাসনা করলেও দৃঢ় বিশ্বাস ও অভ্যাসের বলে ফল সমানই দাঁড়াবে।

এক নাগাড়ে অবিচ্ছেদে 'মরা' 'মরা' বলতে বলতে তা যে রাম নাম হয়ে যায় তাতো অনেকেরই উপলব্ধ সত্য। হংসঃ (অহং+সঃ) নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বাসে জপ করতে করতে গুরুশক্তির সহায়তায় বিলোম ক্রমে উচ্ছ্বাসে নিঃশ্বাসে সোহহং জপ হয়ে যায় এবং মেরুদণ্ড পথে সোহহং ধ্বনি জেগে ওঠে।

'আমি হই সে' (অহং সঃ) এবং 'সে হয় আমি' (সোহহং) এই উভয় বাক্যের বোধির দ্বারাই এই উভয়ের অভিন্নত্ব সম্যক নির্ণীত হতে পারে। যেহেতু একটি বাক্য বোধে বিধেয় পদের বোদ্ধব্য অর্থ, উদ্দেশ্য পদের বোদ্ধব্য অর্থের চেয়ে অধিক হৃদয়গ্রাহী হতে পারে কিন্তু বিপরীত ক্রমে আবার বিধেয়কে উদ্দেশ্য করে এবং উদ্দেশ্যকে বিধেয় করে শব্দার্থ মনন করতে করতে তার অর্থবোধ জন্মালে উভয়ের কোন পদেরই অধিক মনোগ্রাহী হবার কোন শঙ্কা থাকে না। অহং+সঃ (হং+সঃ) আর (সঃ + অহং) এই অনুলোম বিলোম ক্রমে ভাবনার ফলে উভয়ের অভিন্নত্ব সম্যক উপলব্ধ হয়। রেচকের উপর আগে দৃষ্টি দিলে অহং+ সঃ (হংস) আর পূরকের উপর আগে দৃষ্টি দিলে সঃ + অহং (সোহহং) হয়ে যায়।

এবং যস্তু বিজানাতি মন্ত্রমাচার্যপূর্বকম্।
সোহজপন্নপি হংসাখ্যাং জপত্যেব ন সংশয়ঃ।

এইভাবে আচার্যের কাছ হতে যিনি এই হংসবিদ্যা জ্ঞাত হন, তিনি গুরুশক্তির বলে জপ না করেও জপ করতে থাকেন, তাতে কোন সন্দেহ নাই। দক্ষিণামূর্তি স্বয়ং মহেশ্বরীকে এই বিদ্যার নিগুঢ় সাধন কৌশল বলতে গিয়ে বলেছিলেন –

বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ।
অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তাভব পাশ নিকৃন্তনী॥

অর্থাৎ হে দেবেশি! হংসবিদ্যা মন্ত্র জাপকের বিনা জপে স্বাভাবিক ভাবে জপ হয়ে যাচ্ছে বলে এই সাধনার অপর নাম অজপা। এই সাধনা জীবের সংসার পাশহন্ত্রী।

স্বয়ং শিব মহেশ্বরীর কাছে এই রহস্য উদ্ঘাটন করেছিলেন বলে এই যোগরহস্যকে শিবযোগও বলা হয়। তিনি এইবার আমাকে নির্দেশ দিলেন – তুমি এইবার স্বস্তিক আসন, পদ্মাসন বা যে কোন সহজ আসনে বসে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাক এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবই প্রাণশক্তি ও প্রাণশক্তিই পরমাত্মা এই সিদ্ধান্তে স্থিত থেকে হং + সঃ (অহং + সঃ = আমিই সেই প্রাণশক্তি রূপ পরমাত্মা) এই দ্বিধা বিভক্ত মন্ত্র প্রাণশক্তি রূপ নিঃশ্বাস ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে অনুলোম ক্রমে জপ হচ্ছে আবার সোহহং = সঃ + অহং (সেই প্রাণশক্তি রূপ পরমাত্মাই আমি) এই দ্বিধা বিভক্ত মন্ত্র প্রাণশক্তি ক্রিয়ারূপ উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিলোম ক্রমে জপ হচ্ছে এইভাব আরোপ করে, আমিই সেই প্রাণশক্তিরূপ পরমাত্মা এই জ্ঞানে অনুলোম ক্রমে নিঃশ্বাসে ও উচ্ছ্বাসে এবং বিলোম ক্রমে উচ্ছ্বাসে নিঃশ্বাসে জপ করতে থাক।

তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে আমি সমকায়শিরোগ্রীব হয়ে তাঁর অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টিতে দৃষ্টি স্থাপন করে অনুলোম ক্রমে নিঃশ্বাস ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে হংস বিলোম ক্রমে উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাসের সঙ্গে সোহহং জপ করতে থাকলাম। মিনিট তিনেক এইভাবে নিঃশ্বাস ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে মন্ত্র মিলিয়ে জপ করার পর, আমার মনে হল মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে একটা প্রবাহ অনুলোম বিলোম, বিলোম অনুলোম ক্রমে একবার উচ্ছ্বাস, একবার নিঃশ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে। মিনিট পনের এইভাবে কেটে যাবার পর তিনি প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন – এইবার স্থিরো ভব। চক্ষু উন্মীলন কর। সন্ধ্যা হতে আর বেশী দেরী নাই। ধীরে ধীরে উঠে মা নর্মদাকে স্পর্শ ও প্রণাম করে এসে কুঠিয়াতে নিজের আসনে বসে আচমনাদি সেরে মনে মনে হংসবতী ঋক্ সহ শ্রীরুদ্রহৃদয়োপনিষদ্ পাঠ করে যে ভাবে এখানে জপ করলে সেইভাবে যতক্ষণ পার হংস মন্ত্র জপ কর। আগামীকালও তোমাকে যথাসময়ে ডাক দিব। নমো ভগবতে শ্মশানেশ্বরায় মহাদেবায় নমঃ।

তিনি নেমে গেলেন তাঁর গুহায়। আমি গুহার কাছে প্রণাম করে ফিরে গেলাম নিজের কুঠিয়াতে। সূর্যাস্ত হতে আর দেরী নাই। গীর্ণারী বাবা অন্যান্য নাগা এবং রঞ্জনকে নিয়ে নর্মদার ঘাটে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাড়িয়ে আছেন। আমি কুঠিয়াতে ঢুকে তাড়াতাড়ি গামছা ও কমণ্ডলু নিয়ে তাঁদের সঙ্গে নর্মদা স্পর্শ করতে গেলাম।

জল কনকনে ঠাণ্ডা। কালকের চেয়েও আজ শীত বেশী বলে মনে হল। তাড়াতাড়ি সংক্ষেপে কাজ সেরে ফিরে এলাম কুঠিয়াতে। গীর্ণারী বাবা এসে অগ্নিকুণ্ড সাজিয়ে দিয়ে গেলেন কাঠে। একটা রেড়ির তেলের প্রদীপও জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন। উত্তর পশ্চিম দুই দিক দিয়েই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস বইছে বলে মনে হল। আগুনের তাপে ঘর গরম হয়ে উঠতেই কম্বল গা থেকে ফেলে দিয়ে কাঠের কৌপীনও খুলে রেখে আসনে বসলাম শুধু আলখাল্লাটা গায়ে চাপিয়ে। আজ যে জপে বসবার আগে মহাত্মা প্রদত্ত পুঁথিটা পড়তে হবে, সে কথা গীর্ণারী বাবা জানলেন কি করে ? মহাত্মা কি তাঁকে আজ যে প্রদীপের প্রয়োজন হবে, সে সম্বন্ধে কিছু বলেছেন ? এই প্রশ্ন মনে জাগল কিন্তু এই রহস্যময় স্থানের রহস্যভেদে আমি মাথা ঘামানো নিরর্থক মনে করে নিজের সুবিধামত সহজাসনে মেরুদণ্ড খাড়া রেখে 'হর নর্মদে হর, হর নর্মদে হর' এই মন্ত্রে আচমন ক্রিয়া সেরে নিয়ে পুঁথিটি হাতে নিয়ে শ্রীরুদ্রহৃদয়োপনিষৎ মনে মনে পড়তে লাগলাম। পাঠ শেষ হতেই মনে হল আপনা হতেই নাসিকা পথেই হংসঃ – হং+সঃ এই দ্বিধাবিভক্ত মন্ত্র নিঃশ্বাস ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আপনা হতেই জপ হতে শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই অনুভব করলাম শুধু অনুলোম ক্রমে হংসঃ অর্থাৎ আমিই সেই পরমাত্মা, শুধু এই বোধ নয়, বিলোম ক্রমে উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাসের সঙ্গে সোহহং = সঃ + অহং অর্থাৎ সেই পরমাত্মাই আমি, এইরূপ বোধেরও স্ফুরণ হচ্ছে। এইভাবে বহুক্ষণ জপ করতে করতে ক্রমে স্পষ্ট অনুভব করতে পারলাম অনুলোম ক্রমে নিঃশ্বাস ও উচ্ছ্বাস এবং বিলোম ক্রমে উচ্ছ্বাস নিঃশ্বাস শুধু প্রাণবায়ুর যাতায়াত নয়, ঐ পথে অতি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম আসলে এক-জ্যোতির রেখাই কেবল ওঠানামা করছে। আমার যেন দেহ নাই, দেহের কোন স্বাভাবিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গও নাই, কোন বোধ শক্তিও নাই, আমার নাকের দুই ফুটো যেখানে সেই পথে যেন একটা শুধু ইংরেজী অক্ষরের উল্টানো 'ইউ', সেই 'ইউ'এর দুই নল দিয়ে জ্যোতির ধারা ঝিলিক মেরে যাতায়াত করছে। ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী স্থানে ঐ জ্যোতির্ময় ইউর দুই নলের সন্ধি স্থলে গিয়ে যেন মনে হচ্ছে মুহূর্তের জন্য ঐ জ্যোতির রেখা, চিতিশক্তির নর্তন ক্রিয়া বা গতি স্তব্ধ হচ্ছে!

মনে হল – এ তো বড় অদ্ভুত অবস্থা ! মনে হওয়া মাত্রই উচ্ছ্বাস নিঃশ্বাসে হংস এবং নিঃশ্বাস উচ্ছ্বাসে সোহহং এর মূর্চ্ছনা জেগে উঠল। মেরুদণ্ডটা থর থর করে কাঁপতে লাগল। দেখতে পেলাম যোগীন্দ্র কৃপানাথকে। তাঁর গা দিয়ে জ্যোতিঃ যেন ঠিকরে পড়ছে। আমাকে বলছেন – ঐ যে চিতির ধারা ছোটাছুটি করছে, ঐ প্রাণোপহিত চৈতন্যই তোমার স্বরূপ। প্রতি জীবের স্বরূপ। হং = অহং = ব্যষ্টি - প্রাণোপহিত চৈতন্য বা জীব। ব্যষ্টি ভাবে জীব। সমষ্টি ভাবে ঈশ্বর। হংসবতী ঋক্ সহ শ্রীরুদ্রহৃদয়োপনিষৎ পাঠ করে জপে বসলেই হংস বিদ্যার স্ফূর্তি ঘটে। দেহের মধ্যে নিহিত চৈতন্য শক্তি স্ফুরিত হয়। গোম্ব যেমন সমস্ত গরুতে সমভাবে বিরাজমান, তেমনি মহাপ্রাণোপহিত চৈতন্যও সমভাবে সর্বজীবে বিরাজমান। হংসযোগের অনুষ্ঠান করলেই এইভাবে ক্রমে ব্যষ্টি প্রাণোপহিত চৈতন্যের সঙ্গে সমষ্টি প্রাণোপহিত চৈতন্যের অভেদ বোধ জন্মাবে। প্রাণময়কোষের স্তরে চিতিশক্তি অর্থাৎ জীবচৈতন্যের এইভাবে নর্তনলীলা অনুভব করা যায়। বৈখরী স্তরে 'হংস সোহহং' জপক্রিয়ার শুরু। ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী দ্বিদলে প্রাণশক্তিরূপ পরমাত্মার উপলব্ধি। তিনিই ধ্যেয়। ইংরাজী অক্ষরের সোজা 'ইউ' এবং উল্টানো 'ইউ' দুটোই যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সেই পথে চিতিশক্তির নর্তনলীলা দেখলে তারই প্রভাবে প্রাণোপানের পরস্পর আকর্ষণ বিকর্ষণ হয় এবং তার ফলেই উচ্ছ্বাস নিঃশ্বাস, নিঃশ্বাস উচ্ছ্বাস

চলে, সোঽহং ও হংস মন্ত্র স্বতঃই জপ হতে থাকে। ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী স্থানে জ্যোতির্ময় ইউর দুই নলের সন্ধিস্থলে গিয়ে যে ঐ চিতিশক্তির যাতায়াত পলককাল মাত্র স্তব্ধীভূত হল ; ঐ বিরতি ক্ষণ বা স্থিতি ক্ষণেই জীব প্রাণশক্তি স্বরূপে স্থিত হয়। ঐ বিরতি ক্ষণই স্বাভাবিক কুম্ভক ক্ষণ। হংসবিদ্যার সাধক, যোগিগণ ঐ বিরতি ক্ষণকে তীব্র সাধন প্রভাবে বাড়িয়ে নিয়ে প্রাণশক্তি স্বরূপে স্থিত থাকতে আকাঙ্খা করেন। তুমিও চেষ্টা কর।

এই বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন। আমার মেরুদণ্ড কয়েকবার দোল খেয়ে কাঁপতে কাঁপতে স্থির হল। আমি জেগে উঠলাম। অতিকষ্টে চোখ খুলে আমি কাউকে দেখতে পেলাম না। ঘরের একমাত্র দরজা যথারীতি বন্ধ আছে। রঞ্জনের নাক ডাকছে। আমি তাকে ডাক দিতেই সে ধড়মড় করে উঠে বসতেই জিজ্ঞাসা করলাম — যোগীন্দ্র কৃপানাথ কি এসেছিলেন ? সারা ঘরে এত সুগন্ধি কিসের ?

— আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? না কোন স্বপ্ন দেখলেন ? আপনার চোখ এত লাল কেন ? জ্বর হয়েছে নাকি ? জিন্দেগী ভর যিনি গুহাবন্দীর জীবন স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছেন, গেটের কাছে যিনি সশস্ত্র পাহারা বসিয়েছেন, যাতে কেউ না দেখতে পায়, তিনি আসবেন আপনার কাছে ? কোন দুঃখে শুনি ? দিন ভর তো তাঁর কাছে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করেন। মাথাটা ঠিক থাকবে কি করে ? একথা ভুললে চলবে না যে, আপনি পরিক্রমার শপথ নিয়েছেন, শূলপাণির ঝাড়ি পেড়িয়ে অমরকন্টক পর্যন্ত আপনাকে যেতে হবে, তবে আপনার ছুটি !

এই বলে রঞ্জন আমাকে ধরে শুইয়ে দিল আমার আসন তথা শয্যার উপর। বলল, এখন রাত্রি ৪টা। আমরা সাড়ে ছটায় স্নান করতে যাব। আড়াই ঘণ্টা ধরে ঘুমোতে পারবেন, ঘুমিয়ে নিন। শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম। ঘুম যখন ভাঙল, তখন বেলা ১০টা বেজে গেছে। রঞ্জন জানালো তাদের স্নান হয়ে গেছে। দেহে মনে যেন আনন্দের জোয়ার বইছে। আমি রঞ্জনকে বললাম, এখন আমি নর্মদাতে স্নান করতে যাচ্ছি, তর্পণাদি সেরে ফিরতে হয়ত আমার দেরী হতে পারে। এর মধ্যে বেলা ১১টার সময় যদি 'টং' করে ঘড়ির শব্দ হয়, তাহলে আমার জন্য অপেক্ষা করার দরকার নাই। তুমি গীর্ণারী বাবাদের সঙ্গে আমার কমণ্ডলুটাও সঙ্গে নিয়ে যাবে শ্মশানেশ্বর শিবতলায়, কমণ্ডলু ভরে আমার জন্যও দুগ্ধ প্রসাদ নিয়ে আসবে।

গামছা ও লাঠি নিয়ে স্নান করতে চলে গেলাম। নর্মদার জল যেন বরফ গোলা জল। তবুও এক কোমর জলে নেমে স্নান করলাম। তর্পণাদি সেরে কুঠিয়াতে ফিরে দেখলাম, রঞ্জন ঘরে নাই। গীর্ণারী বাবা এবং অন্যান্য নাগাদেরকেও তাঁদের কুঠিয়াতে দেখতে পেলাম না, বুঝলাম সঙ্কেত ধ্বনি হতেই তাঁরা দুগ্ধ প্রসাদ সংগ্রহ করতে চলে গেছেন। প্রায় ঘন্টাখানিক পরেই সকলেই ফিরে এলেন, রঞ্জন আমার জন্যও দুগ্ধ প্রসাদ নিয়ে এসেছে। এসেই গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগল — আজ এক অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম। আজ একটা কৃষ্ণবর্ণের গাভী, ললাটে একটা সাদা রেখা ঠিক তিলকের মত, দুই শিংএ জড়িয়ে আছে একটা পুষ্প স্তবক, গাভীটি এসেই শিবলিঙ্গের কাছে মাথা নেড়ে সেই পুষ্প স্তবকটা ফেলল, তারপর অন্যান্য দিনের মত অন্যান্য গাভী বা মহিষীর মত বাঁদিকের একটা ঠ্যাং তুলে বাঁটটা শিবের গায়ে ঠেকিয়ে গল্‌গল্‌ করে দুধ ঢালল। দুগ্ধদানের পর প্রদক্ষিণের পরিবর্তে শিবলিঙ্গের কাছে প্রণামের ভঙ্গিতে মাথা ঠেকিয়ে এমন একটা চাপা কণ্ঠে 'হাম্বা' রব তুলল, শুধু আমি নয়, আমার সাথীদেরও মনে হল গাভীটা শ্মশানেশ্বরকে 'বাবা' বলে ডাকল। তারপর যথারীতি চলে গেলে দৌড়ে দৌড়ে পাহাড়ের দিকে !

আমাদের সকলেরই গাত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। আমার দুঃখ হল, আজকের দিনেই আপনি যেতে পারলেন না ! এ এমন ঘটনা যে কারও কাছে বিবরণ দিবারও

উপায় নাই। যেই শুনবে, সেই একে আজগুবি গল্প ভেবে উপহাস করবে। নিন, দুধ খেয়ে নিন! আর এখানে থাকবার প্রয়োজন কি? কাল সকালে উঠেই চলুন নিজেদের চলার পথ দেখি, সত্যি কথা বলতে কি, শুধু দুধ খেয়ে এখানে আর পড়ে থাকতে ভাল লাগছে না! অন্যত্র গেলে কোন solid খাদ্য হয়ত ভাগ্যে জুটলেও জুটতে পারে!

আমি কোন জবাব দিলাম না। দুধ পান করে বেদগ্রন্থগুলির উপর ঠেকা দিয়ে আধ শোওয়া অবস্থায় তাঁর মতিশঙ্খের ডাক শোনার জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকলাম। ডাক আর আসে না, মনে মনে অধীর হয়ে উঠেছি। অবশেষে বেলা আড়াইটার সময় মতিশঙ্খ বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে দ্রুত হাঁটতে লাগলাম মহাত্মার গুহার দিকে। মহাত্মা গুহার তলদেশ হতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছেন সিঁড়ির শেষ মাথায়, সিঁড়ির শেষ ধাপে হাসিমুখে বসেছেন। আমি নতজানু হয়ে প্রণাম করতেই তিনি বললেন – বল কাল রুদ্রহৃদয়োপনিষৎ পাঠ করে ক্রিয়া করতে বসতেই তোমার অনুভব কেমন হল। বিলোম ক্রমে উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস এবং অনুলোম ক্রমে নিঃশ্বাস ও উচ্ছ্বাস এবং তার সঙ্গে সোহহং ও হংসঃ মন্ত্র জেগেছিল কি না?

আমি হাঁ সূচক মাথা নেড়ে বললাম – আপনার দয়ায় তা তো হয়েছিলই উপরন্তু ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী স্থানে ইংরেজী অক্ষর 'ইউ' এর মত একটা পথও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। সেই পথে সোজা এবং উল্টা পথে অতি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম একটা জ্যোতির রেখাও দ্রুত ছুটাছুটি করছিল বলে মনে হল। ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী স্থানে ঐ জ্যোতির্ময় ইউ-র দুই দিকের দুই নলের সন্ধিস্থলে গিয়ে মনে হচ্ছিল মুহূর্তের জন্য যেন ঐ চিতিশক্তির নর্তন লীলা স্তব্ধীভূত হয়ে যাচ্ছে!

– তা আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি। প্রাণোপানের পরস্পর আকর্ষণে বিকর্ষণে উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস ক্রিয়া হয়ে থাক। ঐ আকর্ষণ বিকর্ষণের সন্ধিস্থলে ক্ষণেকের জন্য যে স্তব্ধীভূত অবস্থা তোমার অনুভূতিতে ফুটেছে, ঐ বিরতি ক্ষণই স্বাভাবিক কুম্ভক ক্ষণ। যোগী মাত্রেই ঐ কুম্ভক ক্ষণে স্থিতিকে দীর্ঘায়িত করতে চান। তাতেই পরমাত্মার সঙ্গে সাযুজ্য ঘটে। একথা তুমি নিশ্চয় জান যে, প্রাণ ও অপান মুখ্যপ্রাণের পঞ্চবৃত্তির দুই প্রধান বৃত্তি। এই দুই বৃত্তির ক্রিয়াকালই প্রাণোপহিত চৈতন্যের দেহবাস কাল। এই দুই বৃত্তির ক্রিয়ার পূর্ণ বিরতিতেই প্রাণোপহিত চৈতন্যের দেহবাসের অন্তিমদশা। শৈবাগমের দক্ষিণমূর্তি সংহিতাতে শিব জানিয়েছেন –

এক বিংশতি সাহস্রাং ষটশতাধিকমীশরি।
জপতে প্রত্যহং প্রাণী সান্দ্রানন্দময়ীং পরাম্॥
উৎপত্তিস্ত জপারম্ভো মৃত্যুস্তস্য নিবেদনম্।

অর্থাৎ শিব শিবানীকে সম্বোধন করে বলছেন – ঈশ্বরিঃ! প্রাণী প্রত্যহই ২১৬০০ বার পরম-শান্ত ঘনানন্দময়ী অজপা জপ করে চলেছে শ্বাসে প্রশ্বাসে। ঐ জপারম্ভেই দেহবাসের আরম্ভ ও জপ নিবেদনেই অর্থাৎ জপাবসানেই দেহবাসের অবসান।

মহাপুরুষ চোখ বন্ধ করলেন। চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় তাঁর স্থূল দেহের গাত্রবর্ণে কখনও রক্তিমাভা, কখনও বা হরিদ্রাভা ফুটে উঠতে লাগল। কখনও তাঁর নাসারন্ধ্র স্বাভাবিক কখনও বা তা বিস্ফারিত হতে থাকল। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকলাম। তাঁর দেহকে আশ্রয় করে স্বেদ অশ্রু পুলক শিহরণ কম্প প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিকী বিকার প্রকাশ হতে থাকল। এইভাবে প্রায় আধঘণ্টা কেটে যাবার পর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন – হরবোলাজী এখান থেকে চলে যেতে অস্থির হয়েছে। কলিতে সাধারণ জীবের অন্নগত প্রাণ, প্রতিদিন দুগ্ধাহার করে করে বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছে সে। আমারই উচিত ছিল এ দিকটায় নজর দেওয়া। তোমরা সবাই আমার অতিথি, গত পরশু আমার দীক্ষা দিবস ছিল। প্রতি বৎসর এই উপলক্ষ্যে আশ্রমস্থ সকলকেই আমি পুষ্পান্ন ভোজন

করিয়ে থাকি। আগামীকাল আমি সবাইকে তা ভোজন করাব। আজ ৩রা মাঘ, ৫ই মাঘ পর্যন্ত তুমি এখানে থেকে যাও। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের হংস সাধনার ধারা তোমার কাছে প্রকট করেছি। তৃতীয় ও ৪র্থ স্তরের হংস সাধনার তত্ত্ব তোমার কাছে প্রকাশ করার পর, আগামী পরশু একদল পরিক্রমাবাসী আসবেন এই কোটেশ্বর তীর্থে। তাঁদের সঙ্গ ধরে তোমরা চলে যেও। সামনে তোমাদের গহন গম্ভীর ভয়াবহ বিপদ সঙ্কুল পথ। এই পথে অনেক সঙ্গী থাকা প্রয়োজন। কথা বলতে বলতেই তিনি কুঠিয়ার সামনে দণ্ডায়মান গীর্ণারী বাবাকে হাত নেড়ে ডাকলেন। তিনি কাছে আসতেই বললেন — ত্র্যম্বক বাবাকে জানাবে, আগামীকাল তিনি যেন পুষ্পান্নাদির ব্যবস্থা করেন, এই আমার তাঁর কাছে নিবেদন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন সন্ধ্যা হতে দেরী নাই। এখন তুমি যাও। কাল সকাল সকাল তোমাকে ডাক দিব। প্রণাম করে আমি ফিরে গেলাম কুঠিয়ায়। মহাত্মা গুহাতে অবতরণ করতেই আমরা গুহার কাছে প্রণত হয়েই দুজনে নিজেদের কুঠিয়ার দিকে হাঁটতে লাগলাম। তার কাছে ত্র্যম্বক বাবার পরিচয় জানতে চাইলেই তিনি বললেন — ১লা মাঘ গুরুজীর দীক্ষা দিবসে যিনি সবার শেষে একটি বাংলা কবিতা বলে গুহার কাছে প্রণাম জানিয়েছিলেন, সেই অতিবৃদ্ধ নাদসিদ্ধ মহাজনই আমাদের কাছে ত্র্যম্বক বাবা নামে পরিচিতি। উনি গুরুজীর জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা, শুনেছি তাঁর বয়স ৩০০ বৎসর পেরিয়ে গেছে। নানা অলৌকিক শক্তির অধিকারী। বিভূতির প্রভাবে উনি প্রতি বৎসরই গুরুজীর দীক্ষা দিবসের পরদিন অর্থাৎ ২রা মাঘ আশ্রমস্থ সকলকে পুষ্পান্ন ভোজন করিয়ে থাকেন। কোথা থেকে যে কি হয়, তা আমরা জানি না। তবে প্রত্যেকেই স্নান পূজাদির পর বেলা ৯টা নাগাদ নিজ নিজ আসনে বসেই ভরপেট পুষ্পান্ন ভোজন করতে পারেন। আর অধিক কিছু আমার কাছে জানতে চেয়ো না।

কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। নর্মদা স্পর্শ করে এসেই যে যার সান্ধ্যক্রিয়া শেষ করার পর শুয়ে পড়লাম। ঘুম কিন্তু হল না। ব্যক্তিগত ভাবে আমি অনুভব করলাম, কেউ যেন আমাকে ঠেলে উঠিয়ে দিল। আমি স্থির হয়ে বসে লক্ষ্য করলাম, ভিতরে উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস ক্রমে হংস মন্ত্রের জপ হয়ে যাচ্ছে। হং ধ্বনি এবং সঃ ধ্বনির সঙ্গে মনে হল একটা জ্যোতির রেখা ধীরে ধীরে আমাকে গোলাকারে ঘিরে ফেলল, ক্রমে মনে হল, আমি যেন জ্যোতির গোলকের মধ্যেই বসে আছি! কেউ যেন আমাকে বলছেন — অথবা প্রাণসঞ্চারঃ সকারঃ পরিকীর্তিতঃ। হকারোহপান সঞ্চারো দেহে দেহভৃতো সদা॥ স্পষ্টাক্ষরে এই মন্ত্র দ্বিদল পদ্মে ঝঙ্কৃত হতে শুনে, কে বললেন এই কথা তা দেখার জন্য সূচ্যগ্র দৃষ্টিতে যেমন চেষ্টা করছি, তেমনি সেইমাত্র উচ্চারিত মন্ত্রের অর্থটির তাৎপর্য অনুধাবন করতেই মন্ত্রটির অর্থবোধও জেগে উঠল মনে। বুঝলাম কেউ যেন অদৃশ্যভাবে নেপথ্যে থেকে আমাকে বলছেন — সকার হল প্রাণ-সঞ্চার এবং হকার হল অপান সঞ্চার। মুহূর্তকাল পরে আবার মন্ত্র ধ্বনিত হল — মুখ্যপ্রাণস্য পরাঙমুখবৃত্তি রপানস্তথা সতি 'সঃ' ইত্যোৎপদং পরাগর্থবাচকম্ তস্য প্রাণবৃত্তেশ্চ পরাকৃত্বসম্বন্ধাৎ প্রাণবৃত্ত্যাত্মক এব 'সঃ' ইতি মন্ত্রভাগঃ। হং শব্দস্য চ প্রত্যগর্থত্বাৎ অপানবৃত্তেশ্চ প্রত্যঙমুখত্বাৎ প্রত্যক্‌ত্বসাম্যেন অপানবৃত্ত্যাত্মক এব 'হম্' — ইতি মন্ত্রভাগঃ এবম্ এতৌ মন্ত্রভাগৌ প্রাণাপানবৃত্ত্যাত্মনা সর্বদা অনুবর্ত্ততে ইত্যনুসন্ধেয়ম্।

এই মন্ত্র শুনেই আমি জ্ঞান হারালাম। রঞ্জনের টানাটানি এবং বকুনিতে আমার ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে এল। সে আমার হাত পা দলতে দলতে বকে চলেছে — আপনি যদি এখানে বসে থেকে রোজই ঐ উন্মাদ সাধুর কথামত গুহ্য ক্রিয়াদি করে চলেন, তাহলে এইখানেই আপনার পরিক্রমা শেষ। আসন থেকে কতদূর এসে পড়ে আছেন দেখুন। আর ইঞ্চি চারেক ঠেলা হয়ে গেলে আপনি পুড়ে মরতেন। সে আঁকড়ে ধরে আমাকে সোজা করে বসিয়ে দিল। আমি নিজেই শিউরে উঠলাম এই দেখে যে, আমি সত্যিই অগ্নিকুণ্ডের

অতি নিকট এসে গেছি ! আমি তার হাত ধরে আসনে গিয়ে বসলাম । রঞ্জন বলল – সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে । বাইরে ভীষণ হিমেল বাতাস বইছে । এখনও কুয়াসায় ঢেকে আছে চারদিক । আকাশে সূর্যোদয়ের আভাস ফুটলে তবে আমরা বাইরে বেরোব । সূর্যোদয়ের পর স্নান করতে গেলেই বা দোষ কি ?

আমি তার কথার কোন জবাব দিলাম না । অপরাধীর মত মুখ নীচু করে বসে রইলাম । বসে বসে ভাবতে লাগলাম গত রাত্রির অদ্ভুত রহস্যময় দৈববাণীর কথা । হংস মন্ত্রের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে কে বললেন ঐ সব সংস্কৃত কথা । বক্তা দেখতে পাইনি, কিন্তু তাঁর উচ্চারিত শব্দগুলি ধীরে ধীরে স্মরণে আসছে । মনে মনে অর্থোদ্ধার করার চেষ্টা করছি, এমন সময় গীর্ণারী বাবা এসে দরজাতে টোকা দিয়েই সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়ে বললেন – সুবে সাড়ে ছয় বাজ গিয়া । হমলোগ সব তৈয়ার হ্যায় । নাহানে কো লিয়ে চলিয়ে । উঠে দাঁড়াতে গিয়ে কিঞ্চিৎ টলে গেলাম । রঞ্জন তাড়াতাড়ি করে আমাকে ধরে ফেলেই গীর্ণারী বাবাকে বলল – ভাই সাহেবকো তবিয়ৎ মেঁ থোড়া সা গড়বড়ি হুয়া ! আপ চলিয়ে, হম থোড়া দের মেঁ যা রহা হুঁ । গীর্ণারী বাবা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে বার কয়েক তাকিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেলেন । কিছু পরে আমি কতকটা ধাতস্থ হয়ে স্নান করতে গেলাম । নর্মদার ঘাটে যখন পৌঁছলাম, তখন অন্যান্য নাগাদের স্নান হয়ে গেছে । তাঁরা উঠে আসার উদ্যোগ করছেন । গীর্ণারী বাবা রঞ্জনকে বললেন – হরবোলাজী ! আপ্ নাহাকর সাথীকো সাথ মেঁ লেকর সিধা শ্মশানেশ্বরজীকা পাশ আ যাবে গা । আজ ত পুষ্পান্ন মিলবেহি করেগা । দুগ্ধ পরসাদীকো লিয়ে এগারহ/বারহ্ তক্ উধার বৈঠনেকে লিয়ে কোঈ জরুরৎ নেহি । শ্মশানেশ্বর কা উপর হমলোগ ফুল ফল চড়ায়েগা ।

এই বলে তাঁরা চলে যাবার পর আমরা ধীরে সুস্থে স্নান সেরে গুহাশ্রমের ভিতর দিয়ে সোজা চলে গেলাম শ্মশানেশ্বরের কাছে । সেখানে গিয়ে দেখি, কোথা হতে বহু বিল্বপত্র সংগ্রহ করেছেন নাগারা, তাঁদের পূজা হয়ে গেছে । আমাদের জন্যও কিছু বেলপাতা রয়েছে । আমি ও রঞ্জন শ্মশানেশ্বরের মাথায় জল ঢেলে মহাদেবের পূজা করলাম । 'হর নর্মদে হর', 'হর নর্মদে হর' বলে প্রণাম করে যখন উঠলাম, তখন ৯টা বেজে গেছে । সকলে এক সঙ্গে গুহাশ্রমে ফিরে যেতে যেতে গীর্ণারী বাবা বলতে লাগলেন – হরবোলাজী ! বহুৎ বহুৎ সুক্রিয়া । কেঁওকী আপকা বচনকা প্রতাপ সে আজ হম্‌লোগকী পুষ্পান্ন মিলেগা !

আমি নীরবেই হাঁটতে লাগলাম । গুহাশ্রমে ঢুকে নিজেদের ভিজা গামছা রোদে মেলে দিয়ে কুঠিয়ার ভিতরে ঢুকেই দেখি, শাল পাতায় ঢাকা দুটি পৃথক পাত্রে আমাদের দুজনের জন্য কেউ যেন কোন খাবার রেখে গেছে । ভুর ভুর করে সুগন্ধ উঠছে ! অবাক কাণ্ড ! এখানে ত কেউ ছিলেন না । যে যার পাতার ঢাকনা খুলে দেখি, শাল পাতাতেই ঘৃতপক্ব অন্ন রয়েছে । তখনও তাতে গরম ভাপ্ উঠছে । আঙুর, পেস্তা, কিস্‌মিস্ ও খেজুরও তাতে মেশান আছে । 'প্রাপ্তি মাত্রেন ভোক্তব্যং ন বিলম্বং কদাচনম্' – এই কথা বলতে বলতেই রঞ্জন খাওয়া শুরু করে দিল । খেতে খেতে বলল বড়ই সুস্বাদু ! বড়ই উপাদেয় ! কোথা থেকে এই খাদ্য এল, সে রহস্য নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই । মহাত্মা কৃপানাথের জয় হোক ! আমিও আচমনাদি করে খেতে আরম্ভ করলাম । মনে মনে [illegible] – এই তাহলে পুষ্পান্ন ! খেতে ঠিক পোলাওর মত । নিঃশেষে ভোজন করে উচ্ছিষ্ট পাতাগুলো নিয়ে গেটের বাইরে ফেলে কমণ্ডলুর জলে হাত ধুয়ে এলাম । গেটের দিকে [illegible] গীর্ণারী বাবার ঘরের দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম, তাঁরাও ভোজনে রত আছেন । ঘরে ফিরে আসনে বসে রঞ্জনের খাওয়া দেখতে লাগলাম । গোগ্রাসে সে দ্রুত খেয়ে চলেছে । রীতিমত ঘেমে উঠেছে সে ! খেতে খেতেই আমাকে বলছে – কী আশ্চর্য, আমি যতই খাচ্ছি, ততই মনে হচ্ছে পুষ্পান্নের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে । এ কী যাদু

গুহায় বসে সাধু কোন আজগুবি খেল খেলছেন না কি ? আমি বললাম পাতা পুছে খেয়ে ফেল, চেটে পুঁটে খেয়ে ফেল। একটি দানাও ফেলা চলবে না। তুমি দ্রৌপদী নও যে, 'প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষ' বলে রেহাই পাবে! পোড়া পেটের দায়ে তুমি মহাত্মার নামে কটু মন্তব্য করেছিলে, এবার তার ঠেলাটা বোঝ। ক্রমে বেলা ১১টা বাজল। তখনও তার খাওয়া শেষ হল না। নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি, তার পেট ফুলে গেছে। এই প্রচণ্ড শীতের দেশে মাঘ মাসের ঠাণ্ডাতেও তার গা দিয়ে দরদর করে ঘাম বেরুচ্ছে। আমার ভয় হল, বহুদিন অভুক্ত বা অর্দ্ধভুক্ত থেকে এত বিপুল পরিমাণে খেয়ে সে না অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই বাধ্য হয়েই বললাম – তুমি মহাত্মার উদ্দেশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং মাথা ঠোক, তবে যদি রেহাই পাও। আমার কথা শুনেই সে এঁটো হাতেই তিনবার প্রণাম ঠুকলো মাটিতে। ঠিক ঐ সময়ে মতিশঙ্খ বেজে উঠল। আমি কুটিয়া থেকে বেরিয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগলাম গুহার দিকে, রঞ্জনের ভোজন পর্বের কৌতুকবহ পরিণতি দেখবার জন্য বসে থাকতে পারলাম না।

গুহার কাছে পৌছে, গুহার মুখে মহাত্মা কৃপানাথকে দেখতে পেয়ে আভূমি নত হতেই সেই শান্ত সৌম্য প্রসন্ন মূর্তি মহাত্মা আমাকে বলতে লাগলেন -- গত রাত্রিতে সাধন কালে যে দিব্যমন্ত্র শুনেছ, তার অর্থ হচ্ছে – মুখ্য প্রাণের পরাঙ্‌মুখ বৃত্তিই অপান তাই 'সঃ' এই পদ পরাগর্থবাচক। সেই প্রাণবৃত্তির পরাকত্ব সম্বন্ধবশতঃ 'স' এই মন্ত্রভাগ প্রাণবৃত্ত্যাত্মক – তস্য প্রাণবৃত্তেশ্চ পরাকত্ব সম্বন্ধাৎ প্রাণবৃত্ত্যাত্মক এব 'সঃ' ইতি মন্ত্রভাগঃ। কি তুমি এই মন্ত্রধ্বনিই শুনেছিলে ত ? আমি হাঁ বলতেই তিনি অতি প্রসন্ন বদনে বলতে লাগলেন, হং শব্দের প্রত্যগর্থত্ববশতঃ এবং অপানবৃত্তির সাম্যবশতঃ 'হং' এই মন্ত্রভাগ অপানবৃত্ত্যাত্মক। এই দুই মন্ত্রভাগ প্রত্যঙ্‌মুখ-বৃত্ত্যাত্মক ও পরাঙ্‌মুখ-বৃত্ত্যাত্মক হয়ে সর্বদা আত্মাকে অনুবর্তন করে চলেছে! এইরকম ভাবনাই জীবের করা কর্তব্য। ভাল করে মনে রাখবে যে, জীব চিত্তের যে বহির্মুখ বৃত্তি তাই হল 'সঃ', আর যা অর্ন্তমুখ বৃত্তি তা হল 'হং'। পূর্ণ পরমানন্দ রসস্বরূপ প্রত্যগাত্মার উপলব্ধির অভাবে বাইরের বিষয় রসকে আহরণ করে উপভোগ করার যে বৃত্তি তারই নাম বহির্মুখ বৃত্তি, পরাঙ্‌মুখবৃত্তি বা প্রাণবৃত্তি। আর বিষয় রসকে তুচ্ছ বোধে পূর্ণ পরমানন্দ রস স্বরূপ প্রত্যগাত্মা - রসবোধে তৃপ্ত থাকার যে বৃত্তি তারই নাম প্রত্যঙ্‌মুখ, অন্তর্মুখ বৃত্তি। সার কথা 'স' কার দ্বারা বাইরের জগৎকে গ্রহণ করা হয় আর 'হ' কার দ্বারা বাইরের জগৎকে ত্যাগ করা হয়।

এইরকম ভাবনার ভাবার্থ এই যে, হ = অহং অর্থাৎ আমি। এক কথায় বিষয়ী, চেতনা, দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা ইত্যাদি। আর সঃ হল সে = তুমি + সে = জগৎ। বিষয়ী বর্তমানে যার সঙ্গে ব্যবহার করে সে তুমি স্থানীয় আর অতীতে এবং যার সঙ্গে ব্যবহার করেছে এবং করবে তারা 'সে' স্থানীয়। এখানে 'জগৎ' বলতে জগতের ভিতর জীবের দেহ চিত্ত প্রভৃতিকেও ধরতে হবে। চিদাভাস রূপ জীবই অহং বা আমি অর্থাৎ বিষয়ী। অহংবোধ সাধারণতঃ দেহ চিত্ত প্রভৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করে আরম্ভ হয়। নিরন্তর তত্ত্ববিচারের ফলে অহংবোধ যতই পরিশুদ্ধ হতে থাকবে, ততই ক্রমশঃ বুদ্ধি পর্যন্ত সব কিছুই জগতের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকবে। একথা নিশ্চয় বোঝ যে জগৎ হল জড় = অচেতন = বিষয়। আর ঈশ্বর জগন্নিয়ন্তা, জীবের কর্মফল দাতা এবং জগদ্রূপ বা বিশ্বরূপ হয়েও অহংরূপী বিষয়ীর বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে জগতেরই অন্তর্ভুক্ত। এই বিষয়ী ও বিষয়ের সম্বন্ধই, এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধই ব্যবহারিক জীবন। এই সম্বন্ধের আরম্ভেই জীবত্বের আরম্ভ। আর এই সম্বন্ধের বিনাশে অর্থাৎ এই সম্বন্ধের মিথ্যাত্বের দৃঢ় উপলব্ধিতেই ব্যবহারিক জীবনের অন্ত – জীবত্বের অবসান। জীবত্বের বিনাশে 'আমি–তুমি' (তুমি =

তুমি + সে) এই বোধের বিনাশ, তার মানে আমিত্ব বর্জিত শুদ্ধ আমি অর্থাৎ পূর্ণ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ-মাত্র-শেষ স্থিতি । এরই নাম ব্রাহ্মীস্থিতি - ব্রহ্মনির্বাণ - চিরবিশ্রান্তি - চিরশান্তি - অপবর্গ - অমৃতত্ব বা শিবত্ব । অপুনর্ভবত্ব এবং নিঃশ্রেয়স্ লাভের শ্রেষ্ঠ সাধনা এই হংস সাধনা ।

জীবচিত্ত নিত্যই প্রত্যঙ্‌মুখ বৃত্তি ও পরাঙ্‌মুখ বৃত্তি পরায়ণ হয়ে জগৎ গ্রহণ ও জগৎ বর্জন ক্রিয়া পর্যায় ক্রমে করে চলেছে । হংস সাধনা করতে করতেই এই উপলব্ধি তোমার অনিবার্যভাবে ফুটে উঠবে । ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে, যখন 'সঃ' – মন্ত্রাত্মক জগৎ গ্রহণ কার্য সংঘটিত হয়, তখন সে যেন কাম্যবস্তু প্রাপ্তির আশায় পরাঙ্‌মুখবৃত্তিপরায়ণ হয়ে, নিজের অংশ বিশেষকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে, তাকে নাম রূপ দিয়ে জগৎ সৃষ্টি করে এবং জগতের সঙ্গে তার ভোগ প্রবণাত্মক ব্যবহার কার্য নিষ্পন্ন করতে যেয়ে, কখনও অনুকূল বিষয় আহরণের অক্ষমতায়, কখনও বা প্রতিকূল বিষয় আহরণের ফলে দুঃখ ভোগ করে আর কখনও অনুকূল বিষয় আহরণের ফলে তার চিত্ত সাময়িক ভাবে অকামহত হয় এবং নূতন কামনা জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত সে সুখ ভোগ করে । আবার নূতন কামনা জাগ্রত হলে কাম্য প্রাপ্তির আশায় পরাঙ্‌মুখ হয়ে পূর্বোক্তবৎ ভোগ প্রবণাত্মক ব্যবহার নিষ্পন্ন করে । আবার হয়ত অনুকূল কাম্যবস্তু আহরণের পর চিত্ত অকামহত হয় । অকামহত চিত্ত চাঞ্চল্যরহিত হয়, সমাহিত হয় । সমাহিত ও শান্ত হলেই ব্রহ্মানন্দ চিত্তে প্রতিবিম্বিত হওয়ার সুযোগ পায় । তখন জীব আনন্দের রস পায় । কিন্তু এই সুখ ভোগ্য বিষয় হতেই পাচ্ছে মনে করে প্রতারিত হয় । তাই আবার সে নূতন কামনা বসে নূতন বিষয়ের সন্ধানে ধাবিত হয় । অকামহত অবস্থাই তার কথঞ্চিৎ প্রত্যঙ্‌মুখত্ব । এই অকামহত অবস্থাই জগতের অগ্রহণ বা জগৎ বর্জন বা জগৎ সংহার করে ক্ষণকালের জন্য জীবচিত্ত যেন আত্মাতেই সমাহিত হয় । পরাঙ্‌মুখ হয়ে জগৎ সৃষ্টি এবং প্রত্যঙ্‌মুখ হয়ে জগৎ সংহার এবং আত্মাতে চিত্ত সমাধান যথাক্রমে পূরক রেচক ও কুম্ভকের মত জীব চিত্তে নিত্য সংঘটিত হয়ে চলেছে ।

আমি ভক্তি বিনম্র কণ্ঠে মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করলাম – আপনি ইতিপূর্বেই প্রত্যঙ্‌মুখ বৃত্তি এবং পরাঙ্‌মুখ বৃত্তি, এই দুটি শব্দ বারবার উচ্চারণ করেছেন । এখানেও বললেন – 'পরাঙ্‌মুখ হয়ে জগৎ সৃষ্টি এবং প্রত্যঙ্‌মুখ হয়ে জগৎ সংহার' এই দার্শনিক পরিভাষার সরল অর্থ আরও সহজতর ভাষায় দয়া করে বুঝিয়ে দিন ।

– প্রত্যঙ্‌মুখ বৃত্তি বলতে বুঝায় ঈশ্বরমুখীন্ বৃত্তি, ভগবৎ চেতনা; আর পরাঙ্‌মুখ বৃত্তি বলতে বুঝায় বাহ্য জগৎমুখী অর্থাৎ বিষয়মুখীন্ চিত্তবৃত্তি । মানুষের মন বুদ্ধি চিত্ত যখন ভগবৎ চিন্তাতেই বিভোর হয়ে থাকে, তখন সেই তদ্‌গতচিত্ত সাধকের মনে জগৎ সংসার, বিষয়, বস্তু, ইদং বা অদস, অর্থাৎ এই আমার স্ত্রীপুত্র প্রিয় পরিজন, ঐ টা ঘরবাড়ী বিষয় সম্পত্তি প্রিয় বস্তু অপ্রিয় বস্তুর জ্ঞান ভাসে না । এই অবস্থায় জগৎবোধ থাকে না, কাজেই বলা হচ্ছে 'জগৎ সংহার' বা জগতের বিলয় । আর পরাঙ্‌মুখী বৃত্তি বলতে বুঝায় বাহ্য জগতের বোধ, চোখের সামনে যে বাহ্যবস্তু তা জেগে উঠা, ভেসে উঠা, তাই এইরকম অবস্থাকে বলা হচ্ছে, যেন জগতের সৃষ্টি হচ্ছে । শ্বাস প্রশ্বাসকে আমাদের প্রাণচেতনার বাহ্যবিকাশ বলা যেতে পারে । সাধারণ যোগীরা শ্বাস প্রশ্বাসকে নাসাভ্যন্তর দিয়ে বাইরে যখন উৎক্ষেপ করে তখন সেই অবস্থাকে রেচক বলে, নাসাপথে যখন ভিতরে টেনে নেয় তখন তার নাম দেয় পূরক আর যখন শ্বাস টানা ফেলা রদ্ করে রুদ্ধ করে রাখে তখন তার নাম দেয় কুম্ভক । বৈদিক বা বৈদান্তিক দৃষ্টিতে কেবল মাত্র শ্বাস টানা ফেলা এবং আটকে রাখাকে কখনই পূরক রেচক কুম্ভক বলা হত না । তাঁরা যখন, সাধকের যদ্ যদ্ বস্তুতে দৃষ্টি পড়ত, তৎ তৎ বস্তুতেই যখন ব্রহ্মের প্রকাশ বিকাশ বলে অনুভব করতেন তখন [illegible] নাম দিতেন রেচক অবস্থা, যখন অন্তরাজ্যে দ্বিদল হতে সহস্রার পথে ধ্যানের বলে সেই

আলোকসামান্য আলোক পুরুষের অনুভূতি লাভ হত, তখন তাকে পূরক বলে বুঝাতেন, এবং যখন চৈতন্য স্বরূপের সঙ্গে দ্বৈতবোধ লয় প্রাপ্ত হত, তখন তাকে কুম্ভক অবস্থা বলতেন।

হংস সাধনায় কেবল শ্বাসের খেলা নয়, প্রাণের বেলায় পূরক রেচক কুম্ভকের মত চিত্তের বেলায়ও রেচক পূরক কুম্ভক কল্পনা করে 'সঃ' কারে প্রাণবৃত্ত্যাত্মক পরাঙ্‌মুখবৃত্তি সম্পন্ন চিত্ত জগৎ গ্রহণ অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি ও জগদ্‌ভোগরূপ পূরক ও 'হং' কার অপানবৃত্ত্যাত্মক প্রত্যঙ্‌মুখ বৃত্তি সম্পন্ন অকামহত চিত্ত জগৎ বর্জন অর্থাৎ জগৎ সংহার ও জগৎ ত্যাগরূপ রেচক করে সমাধিরূপ কুম্ভক নিত্যই নিষ্পন্ন করছে, এই রকম ভাবনার ধারা প্রবাহিত করতে হয়।

তুমি জেনে রাখ, এইরকম সমাধি জীবের অজ্ঞাতসারে নিত্যই সংঘটিত হচ্ছে। জীবের যদি নিত্যই অজ্ঞাতসারে এইরকম তত্ত্বতঃ সমাধি না হত, তবে জীব কখনই জ্ঞাতসারে সমাধির আনন্দ লাভ করতে পারত না। চিত্তে একটা জ্ঞানবৃত্তি ভেসে উঠে বিলীন হবার পর অপর একটি জ্ঞান বৃত্তি জেগে উঠবার পূর্বে, সেই মধ্যক্ষণটিতে চিত্ত নির্বিকল্প সমাধিস্থ হয়। প্রাণের বেলায় যেমন স্বাভাবিক রেচক পূরকের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে অতি অল্প সময়ের জন্য হলেও কুম্ভক হয় ঠিক তেমনই চিত্তের বেলাতেও জগৎ সৃষ্টি অর্থাৎ জগৎ ভোগরূপ পূরক এবং জগৎ সংহার অর্থাৎ জগৎ ত্যাগ রূপ রেচকের পর পুনরায় জগৎ সৃষ্টির পূর্বের সেই মধ্যক্ষণটিতে কুম্ভকরূপ নির্বিকল্প সমাধি হয়ে থাকে। এই সমাধি-বিবেকজ্ঞানে সাধক কৃতকৃত্য হয়ে থাকেন। তুমি আমার বক্তব্য ভাল করে বুঝতে পারলে ত ? না হয়, তুমি আবার আমাকে অকপটে প্রশ্ন কর, কোন সংকোচ করো না। জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোথাও কোন অস্পষ্টতা বা গোঁজামিল থাকলে হংস সাধনার রহস্য তুমি ধরতে পারবে না।

আশ্বাস পেয়ে আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম – এইমাত্র আপনি যা কিছু বললেন, তা বুঝতে পেরেছি বলে মনে হচ্ছে। তবে আমি ত যথার্থ যোগী নয়, পরিক্রমায় এসে অনেক মহাত্মার দর্শন পেয়েছি। বাবার আশীর্বাদে প্রায় প্রত্যেকেই আমার কাছে অনেক গুহ্যতত্ত্ব প্রকাশ করেছেন; হংস সাধনার কথা কেউ বলেন নি। আপনার কাছেই প্রথম শুনছি বলে কোথাও কোথাও দুর্বোধ্য ঠেকছে। তাই পুনরায় নিবেদন করছি – পরাঙ্‌মুখ বৃত্তিতে জগৎ গ্রহণ আর প্রত্যঙ্‌মুখ বৃত্তিতে জগৎবর্জন, এই দুটি কথার উপর আপনি দয়া করে আরও কিঞ্চিৎ আলোকপাত করুন, যাতে ঐ দুই শব্দের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আরও স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারি।

– তোমার অসঙ্কোচ প্রশ্নে আমি খুশী হয়েছি। পরাঙ্‌মুখ বৃত্তিতে জগৎ গ্রহণের অর্থ হল – আত্মাকে আত্মস্বরূপে গ্রহণ করতে না পেরে অন্যরূপে অর্থাৎ জগৎকে জগৎরূপেই গ্রহণ। ফলে দাঁড়াল আত্মাকে আত্মারূপে অগ্রহণ এবং অন্যরূপে গ্রহণ, জগৎ রূপে গ্রহণ। এই জগৎরূপে গ্রহণই হল জ্ঞেয় জ্ঞান, বা দৃশ্যদর্শন, আরও সহজ করে বলতে গেলে ভোগ্য ভোগ।

আর প্রত্যঙ্‌মুখ বৃত্তিতে জগৎ বর্জন অর্থাৎ জগতের অগ্রহণ। জগৎ বর্জনের তাৎপর্য আত্মাকে অন্যরূপে অর্থাৎ জগৎরূপে গ্রহণের অভাব। একেই বলে জ্ঞেয় বর্জন, দৃশ্যবর্জন অর্থাৎ ভোগ ত্যাগ। মনে দৃঢ়রূপে গেঁথে নেবে যে, জগৎ গ্রহণ ও জগৎ বর্জন, এই দুই বৃত্তির বিকাশ সঙ্কোচকাল পর্যন্তই জীবত্ব। এক সঙ্কোচ বিকাশ এবং অপর সঙ্কোচ বিকাশের মধ্যবর্তী ক্ষণটাই সমাধিক্ষণ বা নির্বিকল্প স্থিতি অর্থাৎ স্বাভাবিক আত্মস্থিতি। অবিবেকীদের পক্ষে এ বিষয় অজ্ঞাত। কিন্তু যিনি বিবেকী তিনি এর গুরুত্ব বুঝেন বলেই সাধনাভ্যাসে নিরত থাকেন। মনে রাখতে হবে জগৎবর্জনও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে একটা বৃত্তিজ্ঞান মাত্র, কেননা জগতের অভাব জ্ঞানও ত একটা বৃত্তিজ্ঞান মাত্র। নির্বিকল্প সমাধিস্থিতির সাধনাভ্যাসে দৃঢ়মূল হয়ে গেলেই বিবেকী পুরুষের দৃশ্য দর্শন, দৃশ্য বর্জন, এক কথায় দ্রষ্টৃবোধ ও দৃশ্যবোধ

বাধিত হয়ে যায় অর্থাৎ মিথ্যাত্বে পর্যবসিত হয়। তখন সে নিত্য নির্বিকল্পাত্ম স্বরূপে স্থিত হয়।

এই স্তরে ক্রিয়াশক্তি বা তদ্বৃত্তির উপর দৃষ্টি থাকবে না। তখন জ্ঞানশক্তি বা তদ্বৃত্তির উপর দৃষ্টি থাকবে, প্রাণক্রিয়ার উপর হতে দৃষ্টি চলে যাবে। এই স্তর মনোময় + বিজ্ঞানময় + আনন্দময় কোশের স্তর। এক কথায় পশ্যন্তীস্তর বা জ্যোতিঃস্তর বা কারণস্তরও বলা যেতে পারে। এই স্তরে হংস সাধনার সাধক স্পষ্টতঃ অনুভব করতে পারে যে, জীবের সঙ্গে জগতের, চেতনের সঙ্গে অচেতনের সম্বন্ধই জীবন। যে অনুভব করে সে চেতন এবং যে বা যা অনুভূত হয় সে বা তা অচেতন। চেতন আমি = বিষয়ী আমি = জ্ঞাত আমি = দ্রষ্টা আমি = বোদ্ধা আমি = অহং = হং। আর অচেতন তুমি = তুমি + সে = বিষয় = জ্ঞেয় = দৃশ্য = জ্ঞেয় জগৎ + ঈশ্বর = সঃ। চেতন ও অচেতনের দার্শনিক পরিভাষা এইরকম ভাবে জানতে বুঝতে এবং দৃঢ়রূপে ধারণা করতে হবে। তা না হলে সবই গোলমাল হয়ে যাবে।

সাধারণতঃ জীব মনে করে যে, সে বাইরের জগৎ হতে সুখ আহরণ করে। কিন্তু সে আত্মবিস্মৃত বলে জানে না ও বুঝতে পারে না যে প্রকৃতপক্ষে 'বাহির' বলে কিছু নেই। আত্মবিস্মৃতি হেতু সে নিজেকেই দ্বিধা বিভক্ত করে, বাহির-ভিতর কল্পনা করে বাইরে বিষয় সৃষ্টি করেছে এবং তার সঙ্গে নিজের ভোগ প্রবণতাকে সম্বন্ধ স্থাপন করে নিজেই বিষয়ী সেজে বসেছে। এই বিষয়ত্ব ও বিষয়িত্ব উপাধিদ্বয় সে নিজেই নিজের উপর আরোপ করে এই বিরাট সংসার নাট্যের অভিনয় করে চলেছে মাত্র। কিন্তু জীব জানে না যে সে নিজেই এই অভিনয় করে চলেছে। এই না জানারই অপর নাম অজ্ঞান, মায়া, অবিদ্যা ইত্যাদি। এই অবিদ্যা অনির্বচনীয়া সদসদ্বিলক্ষণা। অজ্ঞান আবরণ সহ সমাহিত হয়ে যে আনন্দ ভোগ অর্থাৎ বিষয়ানন্দ ভোগ হয়, তা ব্রহ্মানন্দের লেশ বা প্রতিবিম্ব মাত্র। সুষুপ্তিতেও জীবের আনন্দানুভূতি হয় বা থাকে অথচ বিষয় থাকে না অর্থাৎ জগৎ বর্জন ঘটে। জীব অন্তর্মুখ হয়ে সমাহিত হয়। কিন্তু সুষুপ্তিতে চিত্ত বা চিত্তবৃত্তি অজ্ঞান কারণে লীন থাকে বলে তখন ব্রহ্মানন্দ চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় না, অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত হয় সেইজন্য জীব তাকে ব্রহ্মানন্দ বলে জানে না, সুষুপ্তি জনিত অর্থাৎ জগতের অগ্রহণ জনিত আনন্দ বলে মনে করে আর শান্ত চিত্তে বিষয় উপভোগের স্মৃতির রেশ থাকে বলে শান্ত চিত্তে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মানন্দকে সে বিষয়ানন্দ (অর্থাৎ জগৎ হতে অনুকূল বিষয় আহরণ ও উপভোগ জনিত আনন্দ) বলে মনে করে। এই উভয় অজ্ঞানী জীবের ভ্রান্তি। বিবেকী জীবের এই ভ্রান্তি হয় না। হংস সাধনার দ্বারা জীবের বিবেক জাগে। ক্রমে ক্রমে সকল রকম ভ্রান্তি তার অপনোদন হয়। তবে যদি তুমি প্রশ্ন কর, এই বিষয়ী বিষয় — ভাবাতীত তত্ত্ব কেন বিষয়ী ও বিষয় সেজে সংসার রচনা করল, এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। দার্শনিক ও যোগিগণ এখানে মূক। যারা মূকত্ব পরিহার করে উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন তারা বাচালতাই করেছেন মাত্র। বস্তুতঃ এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। উত্তর অজ্ঞাত, কোন উত্তর দেওয়া যায় না। এই সত্যি কথাটাকে নানারকমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয় যে অজ্ঞানই সংসার রচনার হেতু। এই অজ্ঞানের অপর নাম দেওয়া হয়েছে মায়া অবিদ্যা প্রকৃতি শক্তি প্রভৃতি। সংসারাভিনয়ের আত্যন্তিক বিনাশেই মুক্তি। মৃত্যুতে আত্যন্তিক বিনাশ হয় না। নূতন উদ্যম নূতন পরিবেশে সংসারাভিনয়ের পুনরারম্ভ হয় মাত্র। জ্ঞানে বাধিত হলেই আত্যন্তিক বিনাশ হয়। দেহ নষ্ট হলে, সৃষ্টি প্রলয় হলেই যদি মুক্তি হত তবে মুক্তি প্রচেষ্টা বা মুক্তি সাধনা বাতুলতা মাত্র বলে পরিগণিত হত।

মিনিট খানিক চুপ করে থেকে তিনি আমাকে আরও কাছে ডেকে চিবুকে হাত দিয়ে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে বলতে লাগলেন — বাবা, তুমি বেদপাঠ করেছ, বেদান্ত গ্রন্থও অনেক

অধ্যয়ন করেছ, সর্বোপরি মহাত্মা প্রলয়দাসজীর মত ত্রিকালজ্ঞপুরুষেরও তুমি কৃপালাভ, অনেক মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছ, অগ্রবয়স, সারা জীবন ধরে আরও অনেক মহাপুরুষের তুমি সাক্ষাৎ পাবে, তুমি যাঁর কাছে যে রকম সাধনার উপদেশ পাও না কেন, তুমি হংসবিদ্যার সাধনা কখনও ছেড়ো না। এ বিদ্যা মহাবিদ্যা, আমার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্যা। তুমি নিশ্চিত জেনে রাখো, হংস সাধনার পথে যতই তুমি অগ্রসর হতে থাকবে, ততই এক স্তর হতে অন্য উচ্চতর স্তরে উন্নীত হতে থাকবে। বহির্দৃষ্টিতে প্রতি উচ্চতর স্তরের সঙ্গে নিম্নতর সম্বন্ধ আপাত দৃষ্টিতে স্পষ্টভাবে ধরা না পড়লেও অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর অন্তঃপ্রবাহের মত এক নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে তা ক্রমেই বুঝতে পারবে। অভ্যুদয়ের পথে একে অপরকে সাহায্য করে। সেগুলি আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন প্রতিভাত হলেও বস্তুতঃ বিচ্ছিন্ন নয়। অবশ্য সাধনার চরম স্তরে চরম পরিণতিতে পূর্ণ সিদ্ধাবস্থায় অর্থাৎ তুরীয় বা তুরীয়াতীত অবস্থায় পৌঁছলে সাধনার সমস্ত স্তরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কারণ পূর্ণ সিদ্ধাবস্থায় কোন সাধনা করতে হয় না। একমাত্র হংস সাধনাতেই সেই পরম বাঞ্ছিত স্তর লাভ করা যায়।

শৈবাগম গ্রন্থমালার শ্রীলক্ষণ দেশীকেন্দ্র প্রণীত শ্রীসারদা তিলক নামক গ্রন্থে হংস বিদ্যার তৃতীয় ও তুরীয় স্তরের সাধনার কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে –

এবমভ্যস্যতঃ পুংসঃ সংসারধ্বান্তনাশনম্ ॥ ৪৯.২
জ্ঞানমুৎপদ্যতে পূর্বং হংসলক্ষণমব্যয়ম্।
পুং প্রকৃত্যাত্মকৌ প্রোক্তৌ বিন্দুসর্গৌ মনীষীভিঃ ॥ ৫০
তাভ্যাং ক্রমাৎ সমুদ্ভূতে বিন্দুসর্গাবসানকৌ।
হংসৌ তৌ পুং-প্রকৃত্যাখ্যৌ হং পুমান্ প্রকৃতিস্তু সঃ ॥ ৫১
অজপা কথিতা তাভ্যাং জীবো যামুপতিষ্ঠতি।
পুরুষং স্বাশ্রয়ং মত্বা প্রকৃতিরাত্মস্থিতা ॥ ৫২
যদা তদ্ভাবমাপ্নোতি তদা সোঽহময়ং ভবেৎ।
সকারার্ণং হকারার্ণং লোপয়িত্বা ততঃ পরম্।
সন্ধিং কুর্যাৎ পূর্বরূপাত্মকো প্রণবো ভবেৎ ॥ ৫৩

এই শ্লোকের সরল অর্থ হল, এই রকম অভ্যাসের সংসারধ্বান্ত অর্থাৎ জীবত্ব ও ঈশ্বরের ভিন্নতা রূপ অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত এবং হংস লক্ষণ অব্যয় জ্ঞান প্রকাশ পেয়ে থাকে। বিন্দু ও বিসর্গ (হং এর বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বার এবং সঃ এর বিসর্গ) পুরুষ ও প্রকৃতি স্বরূপ অর্থাৎ বিষয়ী ও বিষয় স্বরূপ। হং = পুরুষ। সঃ = প্রকৃতি। হং = বিষয়ী। সঃ = বিষয় = বিশ্বরূপ ঈশ্বর। এই হংসমন্ত্রের নাম অজপা। জীব জগৎ বর্জন ও জগৎ গ্রহণ রূপে নিত্যই এর আরাধনা করে চলেছে। বৃত্তিজ্ঞানের উদ্ভব জগৎ গ্রহণ; বৃত্তি জ্ঞানের বিলয় জগৎ বর্জন। যখন প্রকৃতি পুরুষকে আপনার নিত্য আশ্রয় মনে করে নিজের প্রতিষ্ঠা লোপ করে বিষয়ীর বা পুরুষের স্বরূপে লীন হয়, তখনই 'হংস' 'সোঽহম্' পরিণত বিষয়ী ও বিষয়ের বিষয়িত্ব ও বিষয়ত্ব উপাধিদ্বয়ের অবসানে অর্থাৎ জীব ও বিশ্বরূপ ঈশ্বরের জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব উপাধির অবসানে উভয়ের শুদ্ধ চৈতন্য স্ফূর্ত হয়। হংসঃ অর্থাৎ অহং সঃ ব্যতিহার ক্রমে সোহম্ হওয়ার জন্য পূর্ণ ঐক্য স্থাপিত হয়। সোহহং মন্ত্রাক্ষরস্থ হকার এবং সকার নামক ব্যঞ্জন দ্বয়ের লোপের ওঁকার মাত্র অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা মাত্র থাকে। আরও সরল করে বলতে হয় 'সো' এর স্ যায় এবং 'হম্' এর 'হ' যায়। থাকেন ওম্।

আদিগুরু শংকরাচার্য যিনি এই নর্মদা তটে ওঁকারেশ্বরে গুরু গোবিন্দপাদের কাছে হংসবিদ্যা লাভ করে কৃতকৃত্য হয়েছিলেন তিনিও তাঁর উপলব্ধ সত্যকে প্রপঞ্চসার তন্ত্র নামক গ্রন্থে এইভাবে বলে গেছেন –

স হংকারঃ পুমান্ প্রোক্তঃ স ইতি প্রকৃতিঃ স্মৃতা।
অজপেয়ং মহাশক্তিস্তথা দক্ষিণ-বামতঃ ॥
বিন্দুর্দক্ষিণভাগস্তু বামভাগো বিসর্গকঃ।
তেন দক্ষিণ-বামাখ্যৌ ভাগৌ পুংস্ত্রী বিশেষতৌ ॥
বিন্দুঃ পুরুষ ইত্যুক্তো বিসর্গঃ প্রকৃতির্মতা।
পুং প্রকৃত্যাত্মকো হংসস্তদাত্মকোমিদং জগৎ ॥
পুংরূপং সা বিদিত্বা স্বং সোহহম্ ভাবমুপাগতা।
স এব পরমাত্মাখ্যো মনুরস্য মহামনোঃ ॥
স-কারঞ্চ হ-কারঞ্চ লোপয়িত্বা প্রযোজয়েৎ।
সন্ধিং বৈ পূর্বরূপাখ্যাং ততোহসৌ প্রণবো ভবেৎ ॥ ৪/১৭-২৯

এই শ্লোকের তাৎপর্য হল, 'হং'-কার পুরুষ অর্থাৎ বিষয়ী। 'সঃ'-কার প্রকৃতি অর্থাৎ বিষয়। দক্ষিণভাগে ('হং' কারের অনুস্বারকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে) বিন্দু ও বামভাগে ('সঃ' এর বিসর্গকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে) বিসর্গ দ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতিকে অর্থাৎ বিষয়ী ও বিষয়কে বুঝানো হচ্ছে। এই মন্ত্রের নাম অজপা। এই বিষয়ী ও বিষয়ের সম্বন্ধই জগৎ। 'হংসঃ' পুং প্রকৃত্যাত্মক অর্থাৎ বিষয়ী বিষয়াত্মক, তাই হংস মন্ত্রাত্মকই এই জগৎ সংসার। বিষয়িত্ব উপাধিযুক্ত জীব চৈতন্য বিষয়িত্ব উপাধিহীন স্বস্বরূপ আত্মার ও বিষয়ত্ব উপাধিযুক্ত স্বভিন্ন জীবজগতের বিষয়ত্ব উপাধিহীন স্বরূপের অর্থাৎ ব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি করে সোহহম্ ভাব প্রাপ্ত হয়।

এই হংস সোহহং মন্ত্রই পরমাত্মার মন্ত্র, মহামন্ত্র। এই (হংসঃ) মন্ত্রের পাদদ্বয় ব্যতিহার ক্রমে সঃ এবং অহং হয়। এই সঃ ও অহং পদদ্বয়ের সন্ধি করলে হয় সোহহং। 'সোহহম্' পদের স্-কার ও হ্-কার লোপ করলে ওম্ অর্থাৎ প্রণব থাকে। হকার হল বিষয়িত্ব উপাধিঃ সকার হল বিষয়ত্ব উপাধি। জীব ও ঈশ্বরের বিষয়িত্ব ও বিষয়ত্ব উপাধি গেলে উভয়ত্র শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র থাকে। শুদ্ধ চৈতন্যের বাচকই হল প্রণব অর্থাৎ ওম্।

এই প্রসঙ্গে কঠোপনিষদের পর পর তিনটি মন্ত্র স্মরণ কর –

সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি,
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥ ১/২/১৫

সমস্ত বেদ যাঁকে একমাত্র প্রাপ্তব্য বস্তু বলে নির্দেশ করে, সমস্ত রকমের তপস্যা যাঁকে পাবার জন্য অনুষ্ঠিত হয়, সাধকগণ যাঁকে পাবার অর্থাৎ উপলব্ধি করার জন্য ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন, সেই প্রাপ্তব্য তত্ত্ববস্তুরই বাচক ওঁ।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্যতৎ ॥
এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং এতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ কঠ ১/২/১৬-১৭

এই ওঁকারই অক্ষরব্রহ্ম স্বরূপ ও পরব্রহ্ম স্বরূপ। এই ওঁকারকে জানলে যে যা ইচ্ছা করে তার সেই অভীষ্টই সিদ্ধ হয় অর্থাৎ অপর ব্রহ্মবোধে উপসনায় অপর ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও পরব্রহ্মবোধে উপাসনায় পরব্রহ্ম প্রাপ্তি ঘটে। এই ওঁকারই অপর ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং পরব্রহ্মানুভূতির শ্রেষ্ঠ আলম্বন। এই আলম্বনকে জ্ঞাত হয়ে সাধক মহীয়ান অর্থাৎ পূজ্য হন।

শ্রুতি যে একাধিক শ্লোকে ওঁকারের এত মহত্ত্ব প্রকাশ করেছেন, সেই ওঁকার সাধনায় সিদ্ধিলাভের শ্রেষ্ঠ আলম্বন বা উপায় হচ্ছে হংসবিদ্যার সাধনা। হংসবিদ্যায় যিনি পারঙ্গম

হন, তিনি গৃহেই থাকুন বা গিরিগুহাতেই থাকুন, সহস্র সহস্র যাগযজ্ঞের তিনি অনুষ্ঠান করুন আর না করুন, ষটচক্রাদিভেদ, কুণ্ডলিনী জাগরণ, নাদানুসন্ধান বা নিস্পন্দ পরাবাক্-এর সাধনা তিনি করুন আর নাই করুন, অগ্রসূচী দ্বারা অষ্টকমল তাঁর ভেদ হোক আর নাই হোক, তিনি শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে দণ্ডধারণ করে গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী হোন আর না হোন, হংস সাধনা যিনি করেন, তাঁর এই জগতে অপ্রাপ্তব্য কিছু থাকে না। সেই আত্মজ্ঞ মহাপুরুষের সমগ্র জীবনটাই যজ্ঞে পরিণত হয়। তাঁর জীবনধারা এবং সমগ্র জীবনচর্যাই সম্পূর্ণ ভাগবত জীবনে পরিণত হয়ে যায়। তিনি স্থূলদৃষ্টিতে গৃহীর বেশে থাকলেও তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। আমাদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম প্রপাঠককে যাজ্ঞিকী উপনিষদ বা মহানারায়ণ উপনিষদ্ বলা হয়। সেখানে হংসবিদ্যায় সিদ্ধ আত্মজ্ঞানীর জীবন-যজ্ঞের এই রূপক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ; তদ্‌যথা –

তস্যৈবং বিদুষঃ যজ্ঞস্য আত্মা যজমানঃ, শ্রদ্ধা পত্নী, শরীরম্ ইধ্মম্, উরো বেদিঃ, লোমানি বর্হির্বেদঃ, শিখা হৃদয়ং, যূপঃ কামঃ, আজ্যং মন্যুঃ, পশুস্তপো, ইগ্নির্দমঃ, শময়িতা দক্ষিণা, বাক্ হোতা, প্রাণ উদ্গাতা, চক্ষুরধ্বর্যুঃ, মনো ব্রহ্মা, শোত্রমগ্নীৎ, যাবদ্ধ্রিয়তে সা দীক্ষা, যদশ্নাতি তদ্‌হবিঃ, যৎ পিবতি তদস্য সোমপানম্, যদ্ রমতে তদুপসদঃ, যৎ সঞ্চরতি উপবিশতি উত্তিষ্ঠতে চ স প্রবর্গ্যঃ, যন্মুখং তদাহবনীয়ো, যা ব্যাহৃতিরাহুতিঃ, যদস্য বিজ্ঞানং তজ্জুহোতি, যৎ সায়ং প্রাতরত্তি তৎ সমিধং, যৎ প্রাতর্মধ্যন্দিনং সায়ং চ তানি সবনানি, যে অহরাত্রে তে দর্শপূর্ণমাসৌ, যেহর্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চ তে চাতুর্মাস্যানি, য ঋতবস্তে পশুবন্ধাঃ, যে সম্বৎসরাশ্চ পরিবৎসরাশ্চে তেহহর্গণাঃ, সর্ববেদসং বা এতৎ সত্রং, যন্মরণং তদবভৃথঃ এতদ্ বৈ জরামর্যমগ্নিহোত্রং সত্রম্ ।

অর্থাৎ আত্মা – এ যজ্ঞের যজমান, শ্রদ্ধা – পত্নীস্থানীয়া, শরীর – কাষ্ঠ, বক্ষ – বেদি, লোম – বর্হির্বেদ, শিখা – হৃদয়, যূপ – কাম, ঘৃত – ক্রোধ, পশু – তপঃ, অগ্নি – দমঃ, সর্বেন্দ্রিয়োপশমকারী চিত্তবৃত্তি বিশেষরূপ শময়িতা – দক্ষিণা, বাগিন্দ্রিয় – হোতা, প্রাণ – উদ্গাতা, চক্ষু – অধ্বর্যু, মন – ব্রহ্মা, শ্রোত্র – অগ্নীৎ, বিদ্বৎব্যক্তি যাবৎকাল ভোজন না করে ধৈর্য ধারণ করে থাকেন সেই ধৃতি হচ্ছে যজ্ঞদীক্ষা নামক সংস্কার, তিনি যা ভোজন করেন তা হল হবিঃ, যা পান করেন – তা সোমপান, যে ক্রিয়া করেন – তা উপসদ্ তাঁর সঞ্চরণ উপবেশন ও উত্থান – প্রবর্গ্য, মুখ–আহবনীয়, ব্যাহৃতি, আহুতি ও বিজ্ঞান হোমস্থানীয়, সায়ং ও প্রাতঃকালীন ভোজন – সমিধ, প্রাতঃকালীন, মধ্যাহ্নকালীন ও সায়ংকালীন স্নান হচ্ছে – সবনত্রয়, দিবা ও রাত্রি – দর্শ ও পূর্ণমাস স্থানীয়, পক্ষ ও মাস – চাতুর্মাস্য যাগস্থানীয়, ঋতু সমূহ – পশুবন্ধ, সম্বৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর ও উদাবৎসর – এই পাঁচটি হচ্ছে – দ্বিরাত্র ত্রিরাত্রাদি অহর্গণযাগ, তাঁর পূর্ণ আয়ুষ্কাল পর্যন্ত এই জীবন যজ্ঞ সর্বস্ব দক্ষিণাক যজ্ঞ, তাঁর দেহত্যাগ অবভৃথ স্নান, জরামরণাবধি জ্ঞানীর সমস্ত আচরণ – বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি ও সহস্র সম্বৎসর সাধ্য যত্ররূপ অর্থাৎ যজ্ঞরূপ কর্ম স্বরূপ।

মহাত্মা ৪ খানা কাগজ আমার হাতে দিয়ে বললেন – আজ তোমাকে হংসবিদ্যা বিশদ ভাবে বুঝাতে গিয়ে যে সংস্কৃত শ্লোক গদ্য ও পদ্যে বলেছি, সে সমস্তই এই কাগজে লেখা আছে। তুমি এগুলি লিখে রেখ। আজ মাঘ মাসের চার তারিখ, মঙ্গলবার। মহাত্মা গোরক্ষনাথের শুভ আবির্ভাব দিবস। তিনি নিজেও দীর্ঘকাল এই মশানিয়া কোটেশ্বরে তপস্যা করেছিলেন বলে শুনেছি। এই পুণ্য দিনে তোমাকে হংসবিদ্যার গুহ্য তত্ত্ব বলতে পেরে খুব খুশী হয়েছি। জানি তোমার সাথী এ স্থান হতে চলে যাবার জন্য অস্থির হয়েছে। কিন্তু আগামীকালও তোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করার আছে। আর ত তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। অবশ্য তুমি সততই আমার দৃষ্টিপথে থাকবে। তাই বলছি, কালও তুমি আমার কাছে আসবে। আজ যেমন তাড়াতাড়ি ডেকেছি, কালও তোমাকে বেলা ১২টা

নাগাদ্ ডাক দিব ! পরশু বৃহস্পতিবার ৬ই মাঘ একদল পরিক্রমাবাসী শ্মশানেশ্বর মহাদেবের স্থানে আসবেন, তুমি সেদিন এখানে নর্মদা স্নান করে সাথীকে সঙ্গে নিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হবে । তাঁরা সবাই দণ্ডী সন্ন্যাসী, নিষ্ঠাবান সাধক, তাঁদের সঙ্গে গেলে হিংস্র পশু সমাকীর্ণ গহন গভীর অরণ্য পথে অনেক সহায়তা মিলবে । এখন এস, সূর্য অস্তমিত হতে আর দেরী নাই, কাল আবার দেখা হবে । শিবমস্তু ।

এই বলে তিনি গুহার পথে নেমে গেলেন । আমি তাড়াতাড়ি ফিরতে লাগলাম কুঠিয়ার দিকে । অন্যান্য দিন কুঠিয়ার বাইরে রঞ্জনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি, আজ কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না, ভাবলাম হয়ত সে ফিরতে আমার দেরী হচ্ছে দেখে অন্যান্য নাগাদের সঙ্গে নর্মদার ঘাটে গেছে সান্ধ্যক্রিয়া করতে । কুঠিয়ায় পৌঁছে নাগাদেরকে দেখতে পেলাম না । তারা নর্মদার ঘাটেই গেছেন, এই সিদ্ধান্ত করে মনে মনে নিশ্চিন্ত হলাম । কিন্তু ওমা ! একি ! আমাদের ঘরে ঢুকতে গিয়ে রঞ্জনের গায়ে পা লেগে ঠোক্কর খেলাম । দরজা ধরে সামলে নিয়ে অন্ধকার ঘরে কোন মতে রঞ্জনের ঝুলি কম্বল হাতড়ে তার টর্চটা খুঁজে পেলাম । টর্চ টিপতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তাতে হৃদকম্প সুরু হল । দেখলাম রঞ্জন লম্বালম্বি শুয়ে আছে, সে অসাড়ে ঘুমাচ্ছে, না অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, তা সহসা বুঝতে পারলাম না, তার একটা হাত পড়ে আছে তারই এঁটো পাতের উপর ! আমি আর্তনাদ করে উঠলাম । ঠিক সেই সময় গীর্ণারী বাবা এবং অন্যান্য নাগারা নর্মদা থেকে ফিরছিলেন । আমার আর্তনাদ শুনে তাঁরা রঞ্জনের এই অবস্থা দেখে অবাক্ । গীর্ণারী বাবা তাড়াতাড়ি তার বুকে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে বললেন — কোঈ ফিকরকা বাত নেহি । উহ্ বেহোঁস হোকর নিদ্ যাতে হৈ । মহারাজ উনকো বহোৎ খানা খিলায়া । দেখিয়ে না, উনকা পেট জয়ঢাক হো গয়া । এই বলে হো হো করে হাসতে লাগলেন । সকলে ধরাধরি করে রঞ্জনকে তার বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল । ভিজা গামছায় তার হাত মুখ মুছিয়ে বৃদ্ধ নিজেই সেই সব এঁটো পাতা নিয়ে গেলেন ফেলতে । আমি রঞ্জনের গায়ে কম্বলটা চাপা দিয়ে দিলাম । একটু পরেই গীর্ণারী বাবা কিছু কাঠ নিয়ে এসে ঘরের কোণে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করে গেলেন । রেড়ির তেলের প্রদীপটা জ্বেলে দিয়ে গেলেন ।

আজ নর্মদার ঘাটে অপরাহ্নকালে যেতে পারি নি । তাই কমণ্ডলুর জলে হাত মুখ ধুয়ে আমি সান্ধ্যক্রিয়া সেরে নিলাম । রঞ্জন তখনও অঘোরে ঘুমাচ্ছে, তার নাসিকা গর্জনও উত্তরোত্তর বাড়ছে । আমি বসে বসে ডায়েরী লিখতে লাগলাম । আজ বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মহাত্মা হংসবিদ্যা সম্বন্ধে যা কিছু বলেছিলেন, তা ভেবে ভেবে একটা খাতায় লিখতে লাগলাম । রঞ্জনের ঘড়িটা সামনে নিয়ে বসেছি । রাত্রি যখন দুটা, তখন তার হুঁস এল বলে মনে হল । 'হর নর্মদে হর নর্মদে' বলতে বলতে সে ধড়ফড় করে উঠে বসল । আমি হাসতে হাসতে টিপ্পনী কাটলাম — কি হে ভায়া ! পুষ্পান্ন ভোজন এবং তদন্তে নিদ্রাসুখটা কেমন হল ?

আমার কথা শুনেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল রঞ্জন । বলল — সকাল হলেই আপনি যান আর নাই যান, আমি এখান থেকে পালাব । এ বড় বিপজ্জনক জায়গা । এরা যোগবিদ্যা জানুক আর না জানুক, mesmerism বা কুহক বিদ্যাটা খুব লাভ করেই আয়ত্ত করেছে । দেখলেন ত আমার পাতের খাবার কি ভাবে বেড়ে যেতে লাগল ! এদিকে আবার আপনি ফরমান জারি করলেন — মহাত্মাদের দৈব বিদ্যার দান এই খাদ্য মহাপ্রসাদের তুল্য, এর একটা দানাও ফেলে রাখা চলবে না । সব চেঁটে পুটে খেতে হবে । যতই খাই, ততই বেড়ে যেতে লাগল । শিশুকালে বিদ্যা সম্বন্ধে একটা কবিতা পড়েছিলাম — যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে । দানেন ন ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্ন মহাধনম্ । এখানে আমার কপাল গুণে দেখলাম, আমার পাতার খাবারও ভুক্তেন ন ক্ষয়ং যাতি পুষ্পান্নং তু মহাধনম্ !

— সকাল হোক, তখন যা হয় করবেন, এখন আমাকে ঘুমাতে দিন, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। এই বলে আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল, তখন ৯টা বেজে গেছে। রঞ্জনের প্রাতঃকৃত্য হয়ে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি গামছা ও কমণ্ডলুটা হাতে নিয়ে বললাম — আমি প্রাতঃকৃত্য সারতে যাচ্ছি, স্নানের ঘাটে গিয়ে অপেক্ষা করুন, আমি গেলে দুজনে একসঙ্গে স্নান করব। ঘাটেই সব কথাবার্তা হবে। এইবলে আমি এক মিনিটও অপেক্ষা করলাম না। প্রাতঃকৃত্য সেরে ঘাটে পৌঁছেই রঞ্জনকে খুব দৃঢ় কণ্ঠেই বললাম — আজ আমি এখান হতে কিছুতেই যাব না। আগামীকাল শ্মশানেশ্বর শিবতলায় একদল দণ্ডী সন্ন্যাসী আসবেন বলে মহাত্মা কৃপানাথ আমাকে বলেছেন। আমি তাঁদের সঙ্গ ধরে তাঁদের সঙ্গেই শূলপাণীশ্বর মহাদেবের স্থানে যাব। আপনার ইচ্ছা হয়, আপনি একা চলে যান। দুজনে মিলে এই ব্যাঘ্র সঙ্কুল ঘন ঘোর জঙ্গলে পথ পরিক্রমা করতে আমার সাহসে কুলোচ্ছে না।

আমি স্নান করে সূর্যবন্দনা এবং তর্পণের মন্ত্র পাঠ করতে লাগলাম। আড়চোখে রঞ্জনের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখলাম, সে কিছুক্ষণ কি যেন ভেবে, স্নান করতে নামল। স্নানের পর শান্ত ছেলের মত আমার পিছনে পিছনেই ফিরে এল কুঠিয়ায়, একতারাটা হাতে নিয়ে 'টুং টুং' আওয়াজ করতে করতেই আমাকে বলল — বেশ আপনার কথাই মানছি, একা একা কোথাও যাচ্ছি না, বিদেশে বিভূঁয়ে এই জঙ্গলের পথে একা একা হাঁটলে সেটা ঘোর হঠকারিতা হবে। কাল একসঙ্গেই যাবো, তবে আজ আর ঐ পুল্পান্নের প্যাঁচে পড়ছি না। শ্মশানেশ্বরের দুগ্ধপ্রসাদ খেয়েই আজকের দিনটা কাটিয়ে দিব। আমি তার কথার কোন জবাব দিলাম না। খাতাটা নিয়ে লিখতে বসলাম। খাতা বলতে কতকগুলো পুরাতন ক্যালেণ্ডারের পাতা, সঙ্গে যে দুটো বড ডায়েরী এনেছিলাম, তা অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে, উত্তরতটে আদিত্যেশ্বর তীর্থে এক গৃহস্থ বাড়ী হতে কয়েকটা পুরাতন ক্যালেণ্ডার চেয়ে নিয়ে ভাঁজ করে সেলাই করে খাতার মত করে নিয়েছিলাম। ক্যালেণ্ডারের উল্টো পিঠের সাদা অংশটাতে ডায়েরী লেখার কাজ চলছে। বেলা ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত লিখলাম। সেই সময় দুগ্ধপ্রসাদ আনার সঙ্কেত ধ্বনি হল। সব গুছিয়ে রেখে ছুটলাম, শ্মশানেশ্বর মহাদেবের কাছে। গিয়ে শুনলাম, যথারীতি একটা 'ভৈসী' এসে মহাদেবকে দুগ্ধ স্নান করিয়ে গেছে। কুণ্ড থেকে গীর্ণারী বাবা ও তাঁর দল দুগ্ধ সংগ্রহ করেছেন, রঞ্জন এবং আমিও কমণ্ডলু ভরে দুধ নিয়ে ফিরে এলাম কুঠিয়ায়। দুগ্ধ পানের পর চুপ করে বসে আছি, রঞ্জনের ঘড়িতে ১২টা বেজে কুড়ি মিনিট হয়েছে, এমন সময় গুহা থেকে মতিশঙ্খ গর্জে উঠল, আমি খাতাটা হাতে নিয়ে ছুটে গেলাম গুহার দিকে। মহাত্মা যথারীতি গুহার মুখে এসে বসেছেন। প্রথমদিন গুহার মধ্যে উঁকি মেরে তাঁর দেহে অলৌকিক দিব্যচ্ছটা দেখে যেমন স্তম্ভিত হয়ে গেছলাম, আজও দেখলাম তাঁর দেহ থেকে রক্তিমাভা যেন ফুটে বেরুচ্ছে! তাঁর আনন্দ-ঢলঢল শ্রীমূর্তি দেখে প্রাণে বড় প্রশান্তি এল। নতজানু হয়ে প্রণাম করতেই আমি তাঁর হাতে ক্যালেণ্ডারের খাতাটা এগিয়ে দিলাম। তিনি খাতাটা আদ্যপান্ত বারবার উলটিয়ে দেখে আমাকে হাসিমুখে বললেন — হংসবিদ্যা সম্বন্ধে যা যা বলেছি, তা যথাযথভাবে লিখতে পেরেছ বলে আমি খুশী হয়েছি। এখন আমাকে দক্ষিণা দাও, দক্ষিণান্ত না হলে কর্মে সিদ্ধি আসে না, একথা জান ত?

তাঁর কথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম — ইনি ত ভালভাবেই জানেন, আমি নিঃসম্বল পরিক্রমাবাসী, কাজেই অর্থ দক্ষিণা দেওয়া আমার সাধ্যের বাইরে। এঁর মত উচ্চকোটির মহাত্মা এইরকম স্থূল যাচ্ঞা নিশ্চয়ই করবেন না, — এই বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। ইনি কি আমাকে এখানেই থেকে যেতে বলবেন? এখানে যেমন এঁর একদল নাগা শিষ্য সতত এঁর দৃষ্টি পথে থেকে নাদ সাধনাতে ব্যাপৃত আছেন, সেই

রকমভাবে এখানে থেকে হংসবিদ্যার সাধনাতে ডুবে থাকতে বলবেন কি ? তা যদি বলেন তাও তো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ আমি নর্মদার জল স্পর্শ করে অমরকণ্টকে কোটি তীর্থের ঘাটে মা নর্মদার উৎস স্থলেই জলেহরি পরিক্রমার শপথ নিয়েছি। উত্তরতট পরিক্রমা সমাপ্ত করেছি, এই সম্পূর্ণ দক্ষিণতট পরিক্রমা করে পুনরায় অমরকণ্টকের সেই কোটিতীর্থের ঘাটে পৌছলে তবেই ত আমার পরিক্রমা সমাপ্ত হবে। আচ্ছা, ইনি যদি পরিক্রমা শেষ করে এখানে পুনরায় ফিরে এসে সাধনা করতে বলেন, তাহলে কি করব ! অন্তর্যামী মহাত্মা নিশ্চয়ই আমার বাবার শেষ ইচ্ছা জানেন। এইরকম সাত পাঁচ ভাবছি, হঠাৎ তিনি হেসে বললেন – না, না, আমি সে সব কিছু দাবী করব না। তোমার ভয় নাই, তোমার সঙ্গে বেদার্থ নিয়ে আলোচনা করব। তুমি যথাজ্ঞান বেদ প্রসঙ্গে কিছু বলবে, সেই হবে আমার দক্ষিণা। আচ্ছা, প্রথমেই বল দেখি, বেদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বেদাধ্যায়ীদের মধ্যে কোন মতভেদ আছে কি না ?

তাঁর কথা শুনে মন চিন্তামুক্ত হল। আমি হাতজোড় করে বলতে থাকলাম – বেদের ব্যাখ্যা নিয়ে বেদাধ্যায়ী এবং বেদমার্গানুসারীদের মধ্যে নানা মত প্রচলিত আছে। এক পক্ষের মত এই যে, বেদের ব্যাখ্যার বা বেদার্থ জানার কোন প্রয়োজন নাই। বেদের মন্ত্রই চিন্ময়, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, মন্ত্র যথাযথ সুর স্বর ও ব্যঞ্জনা সহ উচ্চারিত হলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীতে এখনও ঐ মত প্রবল আছে। সেখানকার বেদজ্ঞ পণ্ডিতরা মন্ত্র উচ্চারণ করে কিন্তু বেদার্থ নিয়ে মাথা ঘামান না। আমি বছর সাতেক আগে কাঞ্চী-কামকোটিতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানকার জগৎগুরু শঙ্করাচার্যের আশ্রমে একটানা অনাবৃষ্টির কারণে জনসাধারণ জগৎগুরুর শরণাপন্ন হন। জগদ্‌গুরু তাঁরই আশ্রমের চত্বরে চারজন সুনির্বাচিত বেদজ্ঞকে আবাহন করে বেদোক্ত 'কারীরী যজ্ঞের' অনুষ্ঠান করান। যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিবার এক ঘণ্টার মধ্যেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে প্রবল বারিবর্ষণ হতে থাকে। এই দৃশ্য দেখে আমি বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। ঐ রকম আর একটি ঘটনা দেখেছিলাম পুষ্করে ; সেখানে নারায়ণ তীর্থ নামে এক দণ্ডী সন্ন্যাসী বেদমন্ত্র পাঠ করে বৃষ্টি আনয়ন করতে পেরেছিলেন। আবার এ ঘটনাও শুনেছি, সর্বক্ষেত্রে 'কারীরী যজ্ঞ' করলেই বৃষ্টি হয় না। সেই ব্যর্থতার কারণ আমি মনে করি উচ্চারণের দোষ। দাক্ষিণাত্যে বেদপাঠীদের মধ্যে মন্ত্রার্থ না বুঝে মন্ত্রোচ্চারণের প্রথাই প্রবল আছে। সায়ণাচার্যের ভাষ্য ভালভাবে অনুশীলন করলেও বুঝা যায়, মন্ত্রের অর্থোদ্ধার পক্ষে যত না হোক, বৈদিক স্বর প্রণালীর প্রতি তাঁর অধিক মনোযোগ ছিল। উচ্চারণের যাতে কোন ব্যত্যয় না ঘটে, সে দিকেই তাঁর দৃঢ় লক্ষ্য ছিল।

আবার অন্য পক্ষের মত এই যে, বেদমন্ত্রের অর্থবোধ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। অর্থবোধ ছাড়া মন্ত্র উচ্চারণ বিড়ম্বনা মাত্র, তাতে উচ্চারণের দোষ আসে। গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ জেনে গায়ত্রী উচ্চারণ বিধেয় – শাস্ত্রে নানাস্থানে তার ইঙ্গিত আছে। মহর্ষি মনুও নির্দেশ দিয়ে গেছেন – বেদার্থ-জ্ঞান লাভ করে কর্মে প্রবৃত্ত হবে।

এইভাবে বেদের ব্যাখ্যাদি সম্বন্ধে যেমন মতবিরোধ, বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধেও সেই রকম মতানৈক্য আছে। এক শ্রেণীর বেদাধ্যায়ীর ধারণা – বেদে কেবল কর্মকাণ্ডেরই কথা আছে, বেদে ভক্তি ও জ্ঞানকাণ্ডের বিষয় নাই বললেই চলে। বলা বাহুল্য, এই মত পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের। তাঁদের বক্তব্য হল – সেই প্রাচীনতম যুগে অর্থাৎ বৈদিক যুগে ভক্তিজ্ঞানাদির স্ফূর্তি আদৌ হয় নি। তাঁদের এই অসঙ্গত উক্তি মানতে হলে ত জ্ঞানের জাগ্রত ভাস্কর স্বরূপ বৈদিক ঋষিদেরকে ত অবজ্ঞাই করতে হয় ! সুখের কথা, আধুনিক কালে কিছু কিছু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বেদের মধ্যে জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি; এই তিনের বিকাশ দেখতে পেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন। আসল কথা, বেদে সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের বীজ নিহিত আছে।

কর্মকাণ্ডে কর্মরূপে, ভক্তিকাণ্ডে ভক্তিরূপে এবং জ্ঞানকাণ্ডে জ্ঞানরূপে সেই বীজ অঙ্কুরিত, মুকুলিত ও পল্লবিত হয়ে পড়েছে। বেদে নাই – এমন বস্তু কোনও শাস্ত্রে কোথাও নাই। বেদই নিখিল শাস্ত্রের মূল। আমার বাবা বলতেন – বেদমন্ত্র চিন্ময়, তার প্রতিটি মন্ত্রই সিদ্ধ, সকল জ্ঞানের আকর হল বেদ। সংশয়ান্বিত হয়ো না। একান্ত চিত্তে বেদমন্ত্রের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব অনুসন্ধান কর। বেদমন্ত্র নিত্য অনুশীলন করলে, যে দিব্যদৃষ্টির উন্মীলনে সত্য প্রতিভাত হয়, সেই সত্যের উদ্ঘাটন অনিবার্য।

মহাত্মা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন – সাধু! সাধু! তোমার বাবা তোমাকে খাঁটি কথাই বলে গেছেন দেখছি। এইবার বলত –

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥

এই মন্ত্রটি কোথায় আছে? অর্থ এবং ভাবার্থই বা কি?

– এই বিখ্যাত মন্ত্রটি কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরো উপনিষদ এর চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ নম্বর মন্ত্র। মন্ত্রের সরল অর্থ হল – সর্বদা সংযুক্ত এবং তুল্য নাম বিশিষ্ট দুটি পাখী একই বৃক্ষকে আশ্রয় করে অবস্থান করে। তাদের মধ্যে একটি পাখী বিচিত্র আস্বাদযুক্ত ফল ভক্ষণ করে, অন্য পাখীটি ভক্ষণ না করে কেবল দর্শন করে।

এক বৃক্ষে দুটি পাখী নিবসয়ে সুখে,
একে ফলভোগ করে, অন্যে মাত্র দেখে॥

যে পাখীটি বৃক্ষের ডালে বসে বিচিত্র আস্বাদযুক্ত ফল ভক্ষণ করে চলেছে, সে হল জীব, আর যে পাখীটি ফল ভক্ষণ না করে নিরন্তর দর্শন করছেন, ভোক্তা ও ভুক্তদ্রব্যকে, ভক্ষণ ক্রিয়াকেও, তিনি হলেন পরমেশ্বর।

এই শ্রুতিবাক্যের ভাবার্থ ও সারকথা হল – তিনি দেখছেন। সতত পরত দেখছেন আমাদেরকে, তাঁর নির্নিমেষ দৃষ্টিতে আমাদের প্রতিটি কর্ম, ভাব ভাবনা এষণা সবই ফুটে রয়েছে। তিনি বিশ্বতোচক্ষুঃ, তাঁর বিশ্বব্যাপী সেই পরাবর দৃষ্টির বাইরে যাবার বা কোন কিছু করার সাধ্য জীবের নাই। তিনি সবই সবসময় দেখছেন। তিনি দেখছেন, আমরা কর্মফল ভোগ করছি, তাঁরই অঙ্গীভূত ও অংশগত হয়ে আমরা ঘোর কর্মে আবদ্ধ হচ্ছি, তিনি কেবল লক্ষ্য করছেন। আমরা জীবরা বুঝতে পারছি না – নিজেদের অজ্ঞাতসারে মোহ মরীচিকায় বিভ্রান্ত হয়ে, অপকর্মের পর অপকর্ম করে চলেছি, ভ্রমেও একবার মনে করছি না যে, একজন উপর হতে আমাদের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন।

কিন্তু বারেকের জন্যও হায়, তাঁর প্রতি যদি আমাদের দৃষ্টি পড়ত। যদি জীবের একবারও দৃষ্টি পড়ত তাঁর দিকে, যদি একটিবার বুঝতে পারত, অনুভব করতে পারত যে, আর একজনের দৃষ্টি তার উপর ন্যস্ত আছে, তাহলে কি কোন অপকর্মে কেউ প্রবৃত্ত হতে পারত? নিজের ঘরে স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিত হতে গিয়ে যদি দেখে পাশের বাড়ী হতে জানালা দিয়ে কোন বয়স্ক পুরুষ মহিলা এমন কি একটি ফুটফুটে কচি শিশুও তাদের দিকে তাকিয়ে আছে, তাহলে লজ্জা ও সঙ্কোচ বশে নিজের ঘরের জানালাটা বন্ধ করে দেয়, আলো জ্বললে অন্ততঃ আলোটা নিভিয়ে দেয়, সেই রকম জীবের যদি বোধ জাগে যে, সব কাজেই সাক্ষী রয়েছেন একজন, তাহলে কারও পক্ষে কোন অসৎ ভাবনা বা অসৎ কাজ করা কোন মতেই সম্ভব হত না। দ্রষ্টার প্রতি দৃষ্টি পড়লে, তিনি আছেন, সর্বত্র আছেন, তাঁর জ্যোতিষ্মান দৃষ্টি অহরহ জাগ্রত আছে, এই বোধ দৃঢ় হলেই কর্মের বিপাক কেটে যায়। সেই দৃষ্টিই – পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিই দ্রষ্টার নিকটে দর্শিতকে নিয়ে যায়। সেই দৃষ্টির প্রভাবেই জীব মুক্তি লাভ করে, ব্যষ্টি মিলে যায় সমষ্টিতে, জীব চৈতন্যের নির্বাণ ঘটে অনন্ত চৈতন্যে।

— ব্যাস্ ব্যাস্ ভাবার্থটি সংক্ষেপে অতিসুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছ। এ বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে বলছি শোন। একবার এক ব্রহ্মবিৎ আচার্যের কাছে একজন ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ বালক গিয়ে তাঁর পাদ বন্দনা করে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন — 'অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি' — ভগবন্! আপনি দয়া করে আমাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিন। আচার্য তাঁর দেশ ও মাতা পিতার পরিচয় জানতে চাইলেন। আচার্য প্রসন্ন মনে তার সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। উভয়ে যখন এইভাবে কথোপকথনে রত, সেই সময় 'অধীহি ভগবো ইতি আচার্যং ব্রহ্মচারীমেকং আচার্যং উপপসাদ হ' অর্থাৎ হে ভগবন! আপনি আমাকে অধ্যাপন করুন, এই বলে আরও একজন ব্রহ্মচারী সেই আচার্যের কাছে উপস্থিত হলেন। আচার্য উভয় ব্রহ্মচারীকে বললেন — আমি যথা নিয়মে পরীক্ষা না করে কাউকে উপদেশ দিই না। তোমরা উভয়ে পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছ কি? উভয় ব্রহ্মচারী তাঁদের সম্মতি জ্ঞাপন করলে আচার্য তাঁদের দুজনের হাতে দুটি পায়রা দিয়ে বললেন — তোমরা এমন জায়গায় গিয়ে যে যার পায়রা মেরে আন, যাতে কেউ তোমাদের দেখতে না পায়, দ্বিতীয় ব্রহ্মচারী সোৎসাহে আচার্যের হাত হতে পায়রাটি নিয়ে জনবহুল রাস্তার মধ্য দিয়ে হেঁটে চলল। প্রথম ব্রহ্মচারী তার পায়রাটি হাতে নিয়ে অন্য একটি পথ ধরে হেঁটে যেতে লাগল। তার হাবভাবে কোন উৎসাহ প্রকাশ পেল না। বরং ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ নিতে এসে প্রথমেই একটি নিরীহ জীব হত্যা করতে হবে, এই ভেবে তার মনে দুঃখ দেখা দিল। কিন্তু উপায় তো কোন নাই, গুরুর আদেশ পালনে প্রথমেই যদি ব্যর্থ হন, তাহলে ত কিছুই শিখাবেন না, ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হবে! তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও হেঁটে যেতে লাগলেন, একটি নির্জন জঙ্গলকে লক্ষ্য করে।

২য় ব্রহ্মচারী জনবহুল রাস্তা ধরে যেতে যেতে দেখল, কত লোকই ত আসছে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে নির্জনস্থান কোথাও খুঁজে পেল না! অবশেষে ক্লান্ত হয়ে রাস্তায় অপেক্ষাকৃত কম লোক যেখানে, সেখানে লোকের দিকে পিছন ফিরে, একটা কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে পায়রাটার চট্পট্ মুণ্ডটা ছিঁড়ে এনে সে আচার্যের কাছে এসে উপস্থিত হল। আচার্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন — পায়রাটা মারবার সময় কেউ তোমাকে বা পায়রাটাকে দেখতে পায় নি ত? — না, না, কেউ দেখতে পায়নি। কাপড়ে ঢেকে জাপটে ধরে ওর মুণ্ডুটা ছিঁড়ে ফেলেছি গায়ের জোরে, কাউকে আমি দেখতে দিই নি, সেই দৃশ্য'। আচার্য বললেন — বেশ, প্রথম আমার কাছে যে এসেছিল, তাকে ফিরে আসতে দাও, সে কি করেছে দেখি। তুমি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর।'

ওদিকে সেই তার অপর সঙ্গীটি — এক গভীর জঙ্গলে ঢুকে, চতুর্দিক নির্জন দেখে, যেই পায়রাটার ঘাড় মটকাতে যাবে, অমনি দেখতে পেল, নিরীহ পায়রাটির টলটলে চোখ দুটি যে তারই পানে তাকিয়ে আছে। সেই চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে তার মনে যুগপৎ ভয়ের এবং বেদনার সঞ্চার হল! সে বুঝতে পারল যে, আচার্য তাকে নেহাৎ সোজা কাজ দেন নি। সাক্ষী যে, দ্রষ্টা যে, জীবন্ত কেউ যেন, পায়রার টলটলে চোখ দুটির মধ্য দিয়ে তারই দিকে বেদনা কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে! তার মনে বিচার দেখা দিল — 'আমি তো একা নই — এ জায়গা তো এমন নয় যে, কেউ আমাকে দেখতে পাবে না! কোথায় যাই — কি করি?' এই কথা ভাবতে ভাবতে সে আর একটা নির্জনতর জঙ্গলে গিয়ে, সেখানেও যে পায়রাটাকে মারতে যাবে, অমনি পায়রাটার চোখ দুটোর উপর দৃষ্টি পড়ল — পায়রাটা যে দেখছে তাকে! দ্রষ্টা যে পায়রার চোখ দুটিতে বসে দেখছেন তাকে। পায়রার মধ্যেই যেন বসে দেখছে তাকে! তার আচার্য যে ভাবে পায়রাটাকে সকলের দৃষ্টির অগোচরে মারতে বলেছিলে, তাতো কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না।

অগত্যা সে হতাশ মনে ধীরে ধীরে ফিরে এল আচার্যের কাছে। তাঁর পায়ের কাছে পায়রাটা রেখে সে কেঁদে বলল – প্রভুঁ, আপনি যে আদেশ করেছিলেন, তা পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। এমন করে আর পরীক্ষা করবেন না। আমি আপনার পরীক্ষার যোগ্য নই। ব্রহ্মবিদ্যা লাভের বড় আশা নিয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছিলাম। ইচ্ছা করলে আপনি অবিলম্বে আমায় তাড়িয়ে দিতে পারেন। আচার্য বললেন – না, না, তোমাক আমি তাড়িয়ে দিব কেন ? তুমি ত ব্রহ্মবিদ্যা লাভের যথার্থ অধিকারী। এই ২য় ব্রহ্মচারীটি বরং সর্বতোভাবে বিতাড়নের যোগ্য। এই বলে তিনি অপর ব্রহ্মচারীকে বললেন – তুমি ব্রহ্মচারী নামেরই যোগ্য নও, তুমি নৃশংস খুনী। অবিলম্বে এই স্থান ত্যাগ কর। সে বিমর্ষ চিত্তে স্থান ত্যাগ করতেই তিনি প্রথম ব্রহ্মচারীকে কাছে বসিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বললেন – বৎস! আজ যেমন তুমি পাখীটাকে মারতে গিয়ে তার চোখেও যেমন দ্রষ্টাকে দেখতে পেলে, তেমনি যেখানেই যাও না কেন, যে যে বস্তুরই উপর তোমার চোখ পড়ুক না, যদি কখনও কোন প্রলোভনও আসে, কোন অসৎকর্মে প্রবৃত্তি জাগে, অমনই তখনই ভগবান যে তোমার সামনে, সে কথা স্মরণে রেখো। যদি কোন নারীর দিকে তোমার মন যায়, তবে তার দেহে, তার চোখ দুটিতে সেই দ্রষ্টাকেই দেখতে শিখো। জেনো তোমার প্রভু, তারই চোখ দিয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে আছেন। প্রভু সব সময় তোমাকে দেখছেন। এমন ভাব নিয়ে তুমি তোমার জীবন যাত্রা নির্বাহ কর, যেন তুমি প্রভুর চোখের সামনেই দাঁড়িয়ে আছ, মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছ – প্রিয়তমের দৃষ্টি তোমাকে এক পলকের জন্য ছেড়ে যায় নি। এই ভাবনা তোমার মনে নিবিড় ভাবে জাগ্রত হলেই তোমার ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হবে। সংসারে যিনি যে কর্মেই প্রবৃত্ত হোন, প্রতি কর্মেই প্রতিক্ষণেই তাঁর মনে করা উচিত যে, তাঁর অলক্ষ্যে একজন তাঁর সব কর্ম প্রত্যক্ষ করছেন, তাঁর চোখকে কারও ফাঁকি দেওয়ার উপায় নাই। এইটাই ব্রহ্মবিদ্যা লাভের আদি কথা।

এই পর্যন্ত বলে মহাত্মা কৃপানাথ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। তারপর চোখ খুলেই আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন – কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের একটি শ্লোক (চতুর্থ অধ্যায়ের ছয় নম্বর মন্ত্র) প্রশ্নোত্তর ক্রমে এতক্ষণ আমরা উভয়ে আলোচনা করলাম, ঐ অধ্যায়েই পরবর্তী মন্ত্রে আছে –

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তং ন বেদ কিম্ ঋচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥ ৮

অর্থাৎ যে পরমাকাশরূপ অক্ষর ব্রহ্মে ঋগাদি বেদ এবং সকল দেবতা আশ্রিত আছেন, সেই অক্ষরকে যে জানে না, সে বেদের দ্বারা কি করবে ? পরন্তু যাঁরা তাঁকে এইরূপ জানেন, তাঁরাই কৃতার্থ হন।

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি
ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ ॥ ৯

– বেদ সমূহ, যজ্ঞ, ক্রতু, ব্রত, ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান অপর যা কিছু বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়েছে, তৎ সমুদয়ই এই অক্ষর ব্রহ্ম হতে উৎপন্ন হয়েছে। ব্রহ্ম মায়া শক্তি অবলম্বনে এই জগৎকে সৃজন করেন এবং সেই সৃষ্ট জগতে অবিদ্যা দ্বারা জীব রূপে আবদ্ধ হন।

উপরোক্ত দুটি শ্রুতিমন্ত্রেই যে অক্ষর ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে, সেই অক্ষর ব্রহ্মের পরিচয়ও তোমাকে হংসবিদ্যা আলোচনা কালে বলেছি। আমার গতকালকার সেই বক্তব্য তোমার খাতায় যে নোট করে এনে দেখালে, তার পাতা উল্টালেই দেখতে পাবে, সেখানে হংসবিদ্যার কথা বলতে গিয়ে বলেছি – হংস মন্ত্রের পাদদ্বয় ব্যতিহার ক্রমে অর্থাৎ অদলবদল করে সঃ এবং অহং হয়। এই সঃ এবং অহং পদদ্বয়ের সন্ধি করলে হয় সোহহং। সোহহং পদের সকার ও হকার লোপ করলে ওম্ অর্থাৎ প্রণব থাকে।

সকারঞ্চ হ-কারঞ্চ লোপয়িত্বা প্রযোজয়েৎ।
সন্ধিং বৈ পূর্বরূপাখ্যাং ততোহসৌ প্রণবো ভবেৎ॥

এই প্রণব বা ওঁকারই অক্ষর ব্রহ্ম, পরমাকাশরূপ পরব্রহ্ম। হংসবিদ্যা সাধনাই পরব্রহ্মেরই উপাসনা। জীবনে তুমি যাঁর কাছে যত গুহ্য বিদ্যাই লাভ করে থাক, হংসবিদ্যার অভ্যাস তুমি ছেড়ো না। অলম্ ইতি।

আমি তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উঠে পড়লাম। তিনি সিঁড়ি বেয়ে গুহার তলদেশে নেমে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। কুঠিয়ায় ফিরবার জন্য কয়েক পাপড়ি এগিয়েছি, আবার তিনি হাততালি দিয়ে কাছে ডাকলেন। বললেন – দেখ, জীবনে হয়ত আর তোমার সঙ্গে স্থূলে দেখা হবে না, কাল সকালেই নর্মদা স্নান করে শ্মশানেশ্বর মহাদেবের পীঠে গিয়ে শূলপাণির ঝাড়ি অতিক্রম করার একদল সঙ্গী তুমি পাবে একথা আগেই আমি বলেছি। সেই ভয়ঙ্কর পথে হিংস্র জন্তুর হাত থেকে এবং ততোধিক হিংস্র ও নৃশংস ভীলদের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য তোমাকে এই করপুটিয়াটি দিচ্ছি। তোমার আলখাল্লার পকেটে এটি সযত্নে রেখে দাও। এটি কাছে থাকলে তোমাকে সরাসরি আক্রমণ করার সাধ্য কারও হবে না। ভীলরা এ জিনিষ একবার চোখে দেখলে তদ্দণ্ডে সেই স্থান ছেড়ে পালাবে। এটি মন্ত্রপূত, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। আমি নিজেই বহুবার পরীক্ষা করে দেখেছি এর অলঙ্ঘ্য প্রভাব। একটি বিচিত্র ত্র্যক্ষর শব্দ বলে বললেন – এই মন্ত্র জপ করতে করতে এটি হাতে নিয়ে নাচালে সে-বাঘ ভালুক বা বিষধর সাপই হোক কিংবা ভীল দস্যুই হোক বা সংসার জীবনে তোমার কোন ঘোরতর শত্রুই হোক, তারাই তোমার কাছে নতশির হতে বাধ্য হবে। এটির প্রভাবে সকলেই করপুটে হাতজোড় করে বলে এর নাম করপুটিয়া বা হাতাজোড়ি। যাও সন্ধ্যা হয়ে আসছে। শিবং ভূয়াৎ, শিবং ভূয়াৎ। আমি তাঁর হাত হতে করপুটিয়া নামক সিদ্ধ যন্ত্রটি হাতে নিয়ে পুনরায় প্রণাম করে ফিরতে লাগলাম কুঠিয়ার দিকে।

কুঠিয়ায় ফিরে এসে রঞ্জনকে দেখতে পেলাম না। অন্যান্য ঘরে গীর্ণারী বাবা সহ নাগাদেরকে না দেখতে পেয়ে বুঝতে পারলাম যে সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে তাঁরা সকলেই নিশ্চয়ই নর্মদার ঘাটে সান্ধ্যক্রিয়া করতে গেছেন। আমিও তাড়াতাড়ি কমণ্ডলুটা হাতে নিয়ে চলে গেলাম নর্মদার ঘাটে। অস্তগামী সূর্যের শেষ রক্তিমাভ রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে নিকটস্থ পাহাড় ও গাছপালায়। বহমানা নর্মদায় সেই রশ্মিচ্ছটা পড়ে এক অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা করেছে। ইচ্ছে হল ঘাটে দাঁড়িয়ে সেই অপরূপ দৃশ্য প্রাণভরে দেখি, কিন্তু পশ্চিম দিক হতে কনকনে ঠাণ্ডা হু হু করে বয়ে আসছে, ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে শুরু করেছি। কোন কোন নাগার সান্ধ্যক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে, তাঁরা উঠে পড়ছেন। রঞ্জনও কমণ্ডলুতে জল ভরে আশ্রমে ফিরে যাবার উদ্যোগ করছে, আমি তাড়াতাড়ি নর্মদাকে স্পর্শ ও প্রণাম করে কমণ্ডলু ভরে আর একবার তাকালাম নদীর ওপারে, উত্তর প্রান্তের দিকে। সেখানে পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে অস্তগামী সূর্যের ক্ষীণতম রশ্মি নর্মদার জলে পড়ে চারিদিকে একটি ম্লান ছবির সৃষ্টি করেছে। সেই ম্লান ছবি দেখে মনে হল, সূর্যরশ্মি যেন মা নর্মদাকে ছেড়ে যেতে কাতর হয়ে পড়েছে! আমাকেও ত সকাল হলেই চলে যেতে হবে এই পুণ্য তীর্থ ছেড়ে।

আজকের রাতটাই এখানকার শেষ রাত। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মা নর্মদাকে প্রণাম করতে করতে মনে পড়ে গেল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কয়েক পংক্তি কবিতা –

কূলে-কূলে-পূর্ণ নিটোল গভীর ঘন কালো
শীতল জল রাশি,
নিবিড় হয়ে নেমেছে তায় তীরের তরু হতে
সকল ছায়া আসি।
দিনের শেষে শেষ আলোটি পড়েছে ওই পারে
জলের কিনারায়,
পথ চলতে বধূ যেমন নয়ন রাঙা করে
বাপের ঘরে চায়॥ (সঞ্চয়িতা)

সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমি রঞ্জনের সঙ্গে নর্মদার ঘাট হতে উঠে ফিরে এলাম কুঠিয়ায়। কুঠিয়ায় ঢুকে দেখি গীর্ণারী বাবা ইতিমধ্যেই আমাদের ঘরে অগ্নিকুণ্ডে কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রেখে গেছেন। ঘরের জানালাটা বন্ধ করে আসনে বসলাম সান্ধ্যক্রিয়া করতে। সন্ধ্যা যখন শেষ হল, রঞ্জন তখন প্রশ্ন করল, কাল সকালেই এখান থেকে যাবেন ত? আমি জানালাম – হ্যাঁ হ্যাঁ, কাল সকালে এখানে নর্মদায় স্নান করে এসে এখান থেকে বিদায় নিব। মহাত্মার কাছে অনুমতি পেয়েছি। আর তোমার তিতিবিরক্ত হওয়ার প্রয়োজন নাই। আমার দুঃখ রয়ে গেল যে, এই পুণ্যতীর্থে কতবড় মহাত্মার যে সান্নিধ্যে কয়েকটা দিন কাটাবার সুযোগ পেলাম, তা তুমি অনুভব করতে পারলে না!

– হয়ত সেটা আমার দুর্ভাগ্য! এখানে গত ২৮শে পৌষ বৃহস্পতিবার এসে পৌঁছে ছিলাম। আজ ৫ই মাঘ বুধবার, রাত পোয়ালেই বৃহস্পতিবার ৬ই মাঘ, এখান থেকে যাবো। বৃহস্পতিবার হতে বৃহস্পতিবার, পুরা সাতটা দিন এখানে কাটিয়ে যাচ্ছি। পুরা সাতদিন ধরে এক ঠাঁই বসে থাকতে আমার অসহ্য লাগে। আপনি আমার অপরাধ নেবেন না।

আমি তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। মা নর্মদাকে স্মরণ করে প্রার্থনা করলাম – মাগো! গত ১৬ই পৌষ, ইং ১৯৫৪ সাল গত হয়ে ১৯৫৫ সালের ১লা জানুয়ারী আরম্ভ হয়েছে। ১৯৫২, ১৯৫৩ এবং ১৯৫৪, এই তিন বছর ধরে তোমার কূলে কূলে ঘুড়ে বেড়াচ্ছি। তোমার কৃপায় অনেক মহাপুরুষের অযাচিত করুণা লাভ করে অনেক কিছুই শিখলাম মা, অনেক ঘটনাতেই দেখেছি, তুমি নেপথ্যে থেকেই তোমার অকৃতী সন্তানকে পদে পদে সাহায্য করেছ, ক্ষুধার অন্ন মুখে তুলে দিয়েছ, কিন্তু এইভাবে কি তুমি নেপথ্যেই থেকে যাবে? কবে, কবে তোমার দিব্যরূপের দর্শন পাবো? অবোধ, অধম, অযোগ্য হলেও সন্তান যেমন ভাবে মায়ের দর্শন পায় এবং নির্গুণ হলেও মায়ের সঙ্গে কথা বলতে পায়, আমি সে ভাবে কি তোমাকে পাবো না? তোমার মানসপুত্র মহামুনি মার্কণ্ডেয় যে বলে গেছেন –

নর্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা রুদ্রদেহাদ্বিনিঃসৃতা।
তারয়েৎ সর্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
সর্বদেবাধিদেবেন ঈশ্বরেণ মহাত্মনা॥
লোকানাঞ্চ হিতার্থায় মহাপুণ্যাবতারিতা।
মানসং বাচিকং পাপং স্নানন্নেশ্যতি কর্মজম্॥
রুদ্রদেহাদ্বিনিষ্ক্রান্তা তেন পুণ্যতমা হি সা॥

অর্থাৎ রুদ্রদেহাত্তব সরিদ্বরা নর্মদা স্থাবর জঙ্গম অখিল প্রাণীর উদ্ধার সাধন করেন। সর্বদেবাধিদেব স্বয়ং ভগবান অখিল লোকের হিত কামনায় মহাপুণ্যা নর্মদাকে অবতারিত

করেছেন, নর্মদা রুদ্রদেহোদ্ভবা বলে পূততমা হয়েছেন। নর্মদার জলে স্নান মাত্রেই মানুষের মানস বাচিক ও কর্মজ সকল রকম কলুষই সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়। মাগো। মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের এই সকল বাক্য কি তাঁর অনুভূত ধ্রুব সত্য ? না – কেবলই বাগাড়ম্বর ? এই সব কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল ভোর ৫টায়। কিছু পরে রঞ্জনও জেগে গেল। সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ্ গীর্ণারী বাবা এসে আমাদেরকে ডাক দিলেন। ঘর থেকে বেরিয়েই প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে লাগলাম। সেই অবস্থাতেই প্রাতঃকৃত্য সেরে যখন নর্মদার ঘাটে স্নান করতে গেলাম, তখন আকাশে অরুণোদয় হচ্ছে। গীর্ণারী বাবা আমাকে আজ একটি নূতন কথা শোনালেন। তিনি বললেন – আজ স্নান কে বাদ আপ্‌লোগকা হিঁয়াসে যানে পড়েগা। মহারাজকী এ্যায়সাই হুকুম হৈ। আপ্‌কা একঠো ভুল সংশোধনকো ভি আদেশ হৈ। পতা নেহি আপ্‌কো কোন্ বাতায়া, ইহ্ স্থানকা নাম মশানিয়া কোটেশ্বর হৈ ? ইধর মশান তো হ্যায়ই হ্যায়, ইস্‌লিয়ে ইস্‌কো মশানিয়া কহনে সে কোঈ হরজা নেহি, লেকিন, বহুৎসা আদমী হাঁসোট সে ওঁকলেশ্বরকা বীচ মে আউর এক কোটেশ্বর তীর্থ হ্যায়, উধার ভি মশান হৈ, উস্ ক্ষেত্রকো মশানিয়া কোটেশ্বর বোলকে পুকারতা হৈ। ইস্ ক্ষেত্রকো আসলি নাম কোটিনার হৈ। হিঁয়া সে এক মিল আগে যিধর অনামী বাবা বিরাজতে হৈ, উস্ গ্রাম কা নাম ঔরীগ্রাম হৈ। প্রাচীনকাল মেঁ জব একবার ঘোর অকাল পড়া, তব লোগ ভাগ কর হিঁয়া আয়ে, হিঁয়া উনকী রক্ষা হুয়ি। উসী বখৎ শ্মশানেশ্বরজী প্রগট্ হুয়ে। কোটি দেওতা ইধর আবির্ভূত হোকর শ্মশানেশ্বর মহাদেবকো অর্চনা কিয়ে। ইয়ে কোটেশ্বর তীর্থকো স্থাপনা হো গয়ি।

ইয়ে কোটিনারকা সামনে উধর উত্তরতটমেঁ দেখিয়ে নর্মদাজীকে বীচ ছোটাসা এক দ্বীপমেঁ অনুসূয়া মাইকা স্থান হৈ। অনুসূয়া মায়ীকি পাশমেঁ সূর্যশিলা গ্রামমেঁ এরণ্ডী নদীকা সাথ নর্মদা মায়ী কা সংগম হৈ। এরণ্ডী সংগমকো হত্যাহরণ তীর্থভী কহা যাতা হৈ।

গীর্ণারী বাবার কথা শেষ হতে না হতেই আমি বললাম – উত্তরতট পরিক্রমা কালে আমি ঐ অনুসূয়া মাই-এর স্থান, এরণ্ডী সংগম এবং মহাদেবের স্থাপিত সুবর্ণশিলাও দেখে এসেছি।

– তব্ তো বহুৎ আচ্ছা হ্যায়। হমলোগোকা এহি কোটিনার কোটেশ্বর, মহাত্মা কৃপানাথ ঔর ইয়ে অকিঞ্চন আদমীয়োঁকো ভুলো মৎ।

এই বলে তিনি হাসতে হাসতে স্নান করতে নেমে পড়লেন। সবাই স্নান করলাম। স্নান তর্পণাদি সেরে কুঠিয়াতে গিয়ে নিজেদের ঝোলাঝুলি আদি সব কিছু গুছিয়ে বেঁধে ফেলে আমি গেলাম মহাত্মার গুহার কাছে প্রণাম করতে। মহাত্মা কৃপানাথের দর্শন তো দূরের কথা তাঁর কোন সাড়া শব্দও পেলাম না। মনে পড়ল বাবার কথা। বাবা বলতেন – সাচ্চা মহাত্মা মাত্রেই নির্বিকার। সাধারণ মানুষের মধ্যে যে স্নেহ ভালবাসা বা আত্মিক টান, পারস্পরিক প্রীতির আকর্ষণ দেখা যায়, সেই সব বালাই তাঁদের থাকে না। মহাত্মা প্রদত্ত মন্ত্রবীজ বা সাধন পদ্ধতির অনুশীলন করলে তবেই তাঁদের টনক নড়ে, তখন সেই সাধকের উপর তাঁদের দৃষ্টি পড়ে ; হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব, দেশকালের ব্যবধান, তাঁরা দেহেই থাকুন কিংবা দেহাতীত অবস্থাতেই থাকুন, সেই সব কোনও অন্তরায়ই তাঁদর কাছে অন্তরায় নয়। স্মরণ করলেই তাঁরা বরণ করেন।' এই মহাত্মার উদ্দেশ্যে প্রণাম ও প্রার্থনা জানিয়ে ফিরে এলাম কুঠিয়ায়। নিজেদের জিনিষপত্র নিয়ে গীর্ণারী বাবা এবং অন্যান্য নাগাদেরকে নমস্কার ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা গুহাশ্রমের ফাটক পেরিয়ে 'হর নর্মদে' ধ্বনি দিতে দিতে আমি এবং রঞ্জন শ্মশানেশ্বর শিবতলায় এসে পৌছলাম। রঞ্জনের ঘড়িতে তখন বেলা ১০টা। শ্মশানেশ্বরকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে জপ করতে বসলাম। কিছুক্ষণ জপ করে আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। লক্ষ্য করলাম, রঞ্জন কেবল

উস্‌খুস্ করছে। আমি প্রণাম করে উঠতেই সে বলল — আর এখানে বসে থেকে কি হবে ? বেলা ক্রমশঃ বাড়ছে, এবারে ত এগিয়ে গেলেই হয়। আমি বললাম — মহাত্মা কৃপানাথ আমাকে বলেছেন, এই শিবতলাতেই একদল পরিক্রমাবাসীর আমরা সাক্ষাৎ পাবো। তিনি তাঁদের সঙ্গেই যেতে বলেছেন। এবার সামনে পড়বে শূলপাণির ঝাড়ি, ৫০ ক্রোশ অর্থাৎ ১০০ মাইল লম্বা এই ঝাড়ি, নর্মদা খণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে মহা ভয়ঙ্কর, বাঘ ভালুক বুনো হাতি প্রভৃতি হিংস্র জন্তুদের ভয় পদে পদে। ইচ্ছা হয়, তুমি একাই যাও, আমি পথ চিনি না ! কাজেই এই মহা ভয়ঙ্কর জঙ্গলে অভিজ্ঞ সাথী ছাড়া এক পাও এগুবো না।

আমার কথা শুনে রঞ্জন তাঁর গাঁঠরী নিয়ে দেবকাঞ্চন গাছের ঝোপ পেরিয়ে রোদে গিয়ে গুম্ হয়ে বসে থাকল। আমিও আমার গাঁঠরী নিয়ে তার কাছে গিয়ে বসলাম। তাকিয়ে আছি গুহাশ্রমের দিকে। মনের মধ্যে মহাত্মা কৃপানাথের কথা তোলপাড় করছে। হংসবিদ্যার গুহ্যতত্ত্ব মনে মনে পর্যালোচনা করতে করতে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। হঠাৎ রঞ্জন বলে উঠল — ঐ দেখুন, গীর্ণরী বাবা এবং আরও দুজন 'দুগ্ধ প্রসাদ' নেবার জন্য দৌড়ে আসছেন। যেন সম্বিৎ ফিরে এল। ফুল গাছের ফাঁক দিয়ে দুজনেই উঁকি মেরে দেখলাম, একটা কৃষ্ণবর্ণা গাভী এসে শ্মশানেশ্বরকে দুগ্ধ স্নান করিয়ে ধীরে ধীরে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কখন যে সে এসে দুগ্ধ দান করল, তা আমরা খেয়াল করি নি।

গীর্ণারী বাবা বললেন — আপলোগ্ আভি তক্ ইধর বৈঠল বা ? আইয়ে, পহেলে আপ্ দো আদমী দুগ্ধ পরসাদী পা লিজিয়ে ! আপকা কমণ্ডলু মেঁ যো নর্মদাজীকা পানি হ্যায় ইস্‌কো রহনে দো। এই বলে কুণ্ড থেকে দুধ এনে আমাদের দুজনেরই গলায় ধীরে ধীরে ঢেলে দিতে লাগলেন। তারপর আবার কুণ্ড থেকে দুধ ভরে নিয়ে হাসি মুখে বিদায় নিয়ে তাঁরা চলে গেলেন গুহাশ্রমের দিকে। আমরা পেট ভরে দুধ পান করে চুপ করে বসে রইলাম।

মিনিট পনের দূর হতে যেন বহু লোকের কণ্ঠে স্তোত্র পাঠের শব্দ ভেসে আসতে লাগল। আমরা চমকে উঠে দুজনেই শব্দের গতি লক্ষ্য করে তাকিয়ে রইলাম রাস্তার দিকে। মিনিট পাঁচেক পরে আগন্তুকদের কণ্ঠে শঙ্খনাদ এবং স্তোত্র পাঠের স্পষ্ট শব্দ শুনতে পেলাম। প্রত্যেকের হাতে হাতে দণ্ড এবং পরিধানে গৈরিক বস্ত্র দেখে বুঝলাম — এঁরাই মহাত্মা কৃপানাথ কথিত দণ্ডীধারী পরিক্রমাবাসীর দল। এঁদের সঙ্গেই আমাদেরকে যেতে হবে। দেখলাম তাঁরা এই শ্মশানেশ্বর শিবতলাতেই আসছেন গাইতে গাইতে —

নমঃ পুণ্যজলে দেবী ! নমঃ সাগরগামিনী।
নমোঽস্তুতে পাপনির্মোচে নমো দেবী বরাননে ॥
নমোঽস্তুতে ঋষিবরসঙ্ঘসেবিতে, নমোঽস্তুতে ত্রিনয়নদেহ-নিঃসৃতে।
নমোঽস্তুতে সুকৃতবতা সদাবরে নমোঽস্তুতে সতত পবিত্র পাবনি ॥

অর্থাৎ এই গৈরিক বস্ত্র ও দণ্ড কমণ্ডলুধারী, ভস্ম ও ত্রিপুণ্ড শোভিত সন্ন্যাসীর দল মা নর্মদার উদ্দেশ্যে বলতে বলতে আসছেন —

হে দেবী ! তুমি সাগরগামিনী, তোমাকে প্রণাম। ঐয়ি বরাণনে ! তোমার জল অত পবিত্র, তুমি সকল মানুষের পাপ বিনষ্ট করে থাক, তোমাকে প্রণাম। হে সরিদবরে ? সমস্ত ঋষিসঙ্ঘ তোমাকে সেবা করে, তুমি স্বয়ং ত্রিলোচনের গাত্র হতে নিঃসৃতা হয়েছ, তোমাকে প্রণাম। হে দেবী ! তুমি সুকৃতকারীদের, শ্রেষ্ঠ তপস্বীবৃন্দের সতত প্রণম্য, পবিত্র হতে পবিত্রতরা, তোমাকে প্রণাম। শ্মশানেশ্বর মহাদেবের গাত্রে সকলেই দণ্ড ঠেকিয়ে হর হর বম্ বম্ ধ্বনি দিতে থাকলেন। সন্ন্যাসীদের মধ্যে যিনি প্রধান তিনি শিবস্তোত্র পাঠ করতে

করতে কর্পূর জ্বেলে আরতি করলেন। আরতির শেষে তাঁরা বটতলা থেকে বেরিয়ে এসে রোদে বসলেন।

আমি গুণে দেখলাম, এঁদের দলে মোট ১৭ জন আছেন; তার মধ্যে ৪ জন সাদা কাপড় পরা ব্রহ্মচারী আর বাকি ১৩ জন গৈরিক বস্ত্র পরিহিত সন্ন্যাসী, তাঁদের প্রত্যেকের হাতে দণ্ড ; ব্রহ্মচারীদের হাতে ত্রিশূল। সন্ন্যাসীদেরকে 'নমো নারায়ণায়' বলে অভিবাদন করতে হয়। তাঁদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁকে 'নমো নারায়ণায়' বলে আমি বিনম্র কণ্ঠে বললাম – ভগবন্! আপ কাঁহাসে পধারেঁ ? তিনি হেসে বললেন – তোমাদেরকে দেখেই বুঝেছি, তোমাদের বাঙালী শরীর। হিন্দিতে কথা বলার দরকার নাই। আমরা কাশী হতে এসেছি, ৪ জন ব্রহ্মচারী এবং স্বামী হিরন্ময়ানন্দ তীর্থ এই ৫ জন ছাড়া আমরা সকলেই বাংলা বুঝি। কাশীতে কামরূপ মঠের কথা শুনে থাকবে। দণ্ডী সন্ন্যাসীদের প্রধান মঠ। আমাদের প্রধান আচার্যের নাম স্বামী ভোলানন্দ তীর্থজী মহারাজ। পরম ত্যাগী, পরম নৈষ্ঠিক এবং পরম যোগী। তাঁরই আদেশে আমরা নর্মদা পরিক্রমাতে এসেছি। অমরকন্টকের কোটিতীর্থের ঘাটে রুণ্ডা পরিক্রমার শপথ নিয়ে আমরা বিমলেশ্বর পেরিয়ে ওঁঙ্কারেশ্বর পর্যন্ত গিয়েছিলাম এই পথ দিয়েই। আবার এই পথেই অমরকন্টকে ফিরে যাচ্ছি। এই শরীরের নাম বাসবানন্দ। আদিগুরু শঙ্করাচার্য যে অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীদের মধ্যে দশনামী সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেছিলেন, তার মধ্যে পরবর্তীকালে গিরি, পুরী, ভারতী, বন, পর্বত, আরণ্য, সাগর এই সাত সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা বুদ্ধি ফুটে উঠায় বা অন্যকোন কারণে তিনি তাঁদের দণ্ড ধারণের অধিকার কেড়ে নেন। সরস্বতী, তীর্থ ও আশ্রম নামা সন্ন্যাসীদেরই কেবল দণ্ড ধারণের অধিকার দিয়ে যান। ব্রাহ্মণ শরীর ছাড়া আর কোন জাতির লোকের দণ্ড ধারণের অধিকার নাই বলে এই তিন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বিশ্বাস করেন। তাই তীর্থ, আশ্রম এবং সরস্বতী উপাধিকারী সন্ন্যাসী দেখলেই বুঝতে হবে পূর্বাশ্রমে তাঁরা ব্রাহ্মণ কুলেই জন্মেছিলেন। যাইহোক, আমরা গতরাত্রিতে শুকদেব তীর্থে ছিলাম। বেদব্যাসের পুত্র শুকদেব ৮ বছর বয়সে এখানে এসে কঠোর তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সেখানে শুকদেবেশ্বর মহাদেব ছাড়াও কর্ণেশ্বর, মার্কণ্ডেশ্বর, রণছোড়জী প্রভৃতি তীর্থ আছে। গুজরাট প্রদেশের বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সেখানে বিশেষ বিধিমতে মহাদেবের পূজা করেন। শুকদেবেশ্বর তীর্থে নাদোদের রাজার সদাব্রত আছে। স্থান মনোরম, তাই বহু যাত্রীও আসে। এখান থেকে মাত্র ৫ মাইল দূর। সকালে সেখানে স্নান পূজা সেরে মাত্র ৫ মাইল রাস্তা আসতেই এত দেরী হয়ে গেল। ভাল কথা, তোমাদের পরিচয় নেওয়া হয় নি। তোমরা কোথা থেকে এখানে এসে পৌঁছেছ।

– আমরা ওঁঙ্কারেশ্বর হয়ে সাজোত গ্রাম হয়ে এখানে পৌঁছেছি।

– তবে ত তোমরা শুকদেবেশ্বর হয়েই এসেছ।

– আজ্ঞে না আমরা শুকদেবেশ্বরে যাই নি। বরাছা, বেরুগ্রামের বাল্মীকেশ্বর মহাদেব দর্শন করে একজন ব্রাহ্মণ পথ দেখিয়ে দেওয়ায় শক্রেশ্বর, ইন্দ্রকেশ্বর, পঞ্চমুখী হনুমান, কপালেশ্বর স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, তারকেশ্বর প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করে ভালোদ হয়ে এখানে পৌঁছেছি। আমাদের পথ প্রদর্শক ব্রাহ্মণ যেমনভাবে পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন আমরা সেইভাবে এসেছি, [illegible] অধিকতর সোজা পথে এসেছি, আমাদের আসার পথে শুকদেবেশ্বরের মন্দির পড়ে নি, সেই তীর্থ দর্শন [illegible] নি।

– নারায়ণ! নারায়ণ! তাহলে ত তোমাদের পরিক্রমাতে ত্রুটি রয়ে গেল।

তাঁর কথা শুনে তাঁদের দলেরই একজন দণ্ডীস্বামী বয়স আন্দাজ ৪০, ঝাঁঝিয়ে উঠে স্বামী বাসবানন্দকে বললেন – একথা আপনি বলতে পারেন না। নর্মদাতটে অনন্ত কোটি তীর্থ, কোন পরিক্রমাবাসী বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন না যে তিনি সব তীর্থই দর্শন করেছেন।

মা নর্মদা যাকে যেমনভাবে যে পথ দিয়ে পরিচালিত করেছেন, তিনি সেইপথ দিয়েই যেতে বাধ্য হন। সবই মা নর্মদার ইচ্ছা। পাহাড়ী পথ, বন জঙ্গলে ঢাকা। কোন একটা আধটা তীর্থ গাছের আড়ালে থেকে যেতে পারে। নর্মদার তট ধরে, মাকে চোখে চোখে রেখে, কোনমতে নর্মদার ধারা লঙ্ঘন না হয়ে যায়, সেদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে পরিক্রমা করলেই হল। পরিক্রমার জন্য কোন নির্দিষ্ট পথ কেউ ত বানিয়ে রাখেনি।

আমি বিনীত ভাবে বললাম – আমি উত্তরতট পরিক্রমা করার সময় ওঁর সঙ্গমের সামনে এই দক্ষিণতট স্থিত আপনাদের বর্ণিত ঐ শুকদেবেশ্বরের মন্দির ওপার থেকে দেখেছি। তাঁর মহিমার কথাও বিস্তারিত ভাবে শুনেওছি। শুকদেব তীর্থের সম্মুখেই উত্তরতটে নর্মদার ব্যাস আছে।

পূর্বোক্ত দণ্ডীস্বামী এবার স্বামী বাসবানন্দকে কটাক্ষ করে বললেন – এইবার কি করবেন স্বামীজী। আপনি ত উত্তরতট পরিক্রমা করেন নি, ওঁর সঙ্গমেও যান নি, নর্মদার ব্যাসও দেখেন নি। তাহলে কি আপনার পরিক্রমাতে কোন ত্রুটি হয়েছে?

– তা কেন, আমরা তো রুণ্ডা পরিক্রমার শপথ নিয়েছি। অমরকণ্টক হতে ওঁঙ্কলেশ্বর, ওঁঙ্কলেশ্বর হতে আবার অমরকণ্টকে পৌছে নর্মদার উৎস স্থানে জল সমর্পণ করতে পারলেই আমাদের পরিক্রমা সম্পূর্ণ হবে, সার্থক হবে। উনি হয়ত জলেহরি পরিক্রমার শপথ নিয়েছেন, তাই উত্তরতট ঘুরে উনি দক্ষিণতট পরিক্রমা করছেন।

এই সময় স্বামী প্রেমানন্দ তীর্থ নামে দণ্ডী সন্ন্যাসী বললেন – বৃথা তর্ক করে লাভ নাই। বেলা দেড়টা বেজে গেছে, এইবার উঠা যাক। আরও তিন মাইল হেঁটে গেলে তবে আমরা সিসোদরাতে পৌছতে পারব। সেখানেই আজ রাত কাটাবো। তাঁর কথায় আমরা সবাই যে যার ঝোলা গাঁঠরী নিয়ে উঠে পড়লাম। শ্মশানেশ্বর মহাদেব এবং সম্মুখস্থিত মা নর্মদাকে প্রণাম করে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে আমরা চলতে থাকলাম পাহাড়ী পথে। আমি পরিক্রমা আরম্ভ করেই মহাত্মা কৃপানাথজীর উদ্দেশ্যে যুক্তকরে প্রণাম জানালাম। পথ কর্করময়, উঁচু নীচু প্রায় প্রত্যেকেই মাঝে মাঝে ঠোকর খেতে খেতে হাঁটতে লাগলাম। প্রায় মাইল খানিক ডাহি প্রস্তরময় পথ হেঁটে যে পথ পেলাম, সেই পথের দুধারে শাল সেগুন ছাড়াও বট অশ্বত্থ অর্জুন কাঁঠাল এবং জামীর গাছ প্রভৃতি চোখে পড়তে লাগল। দূরে দূরে ঘর বাড়ী চোখে পড়তে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে আমরা কখনও এগিয়ে পিছিয়ে পড়ছি। এক সময় আমি স্বামী বাসবানন্দের কাছাকাছি হতেই তিনি আমার এবং রঞ্জনের পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি সংক্ষেপে আমার এবং রঞ্জনের নাম ধাম বললাম। বিমলেশ্বর হতে যে রঞ্জন আমার সঙ্গী হয়েছে এবং সে যে একজন বাউল সঙ্গীতে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন সে কথাও জানালাম। পিছন ফিরে তাকাতেই দেখলাম, যিনি আমাকে সমর্থন করে স্বামী বাসবানন্দের সঙ্গে কিঞ্চিৎ তর্ক করেছিলেন, সেই দণ্ডী সন্ন্যাসী এবং রঞ্জন পরস্পর কথা বলতে বলতে আসছেন। সেই দিকে নজর পড়তেই বাসবানন্দজী বললেন – ঐ দণ্ডী সন্ন্যাসীর নাম হরানন্দ তীর্থ। উনি আমার চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও উনি দুর্মুখ ও কটুভাষী বলে আমরা সবাই ওঁকে ভয় করে চলি। দুর্মুখ হলেও উনি খুব প্রেমিক সন্ন্যাসী, ওঁর দিলের কোন তুলনা হয় না। পান থেকে চুণ খসলেই অর্থাৎ শাস্ত্র বিগর্হিত কিংবা অযৌক্তিক কোন কথাবার্তা শুনলেই উনি ক্ষেপে উঠেন, কিন্তু পর মুহূর্তেই সব ভুলে যান।

এই সময় গাছপালার আড়াল সরে যেতেই নর্মদার ধারা আমাদের চোখে পড়ল। সূর্যরশ্মি জলের উপর পড়ায় আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম নর্মদার ধারা উপর থেকে নিচের দিকে বয়ে চলেছে। আমরা জানি নর্মদা পশ্চিমগামিনী। আমাদের গন্তব্যস্থল পূর্বদিকে অমরকণ্টক। তাহলে আমরা ত উজান পথে চলব। কিন্তু এ যে দেখছি আমরা স্রোতের দিকেই এগোচ্ছি। মনে খট্‌কা দেখা দিল। কিন্তু আমার মনের কথা বলি বলি

করেও বলা হল না, ঐ সময় স্বামী হিরন্ময়ানন্দ উচ্চৈঃস্বরে মহাদেবের স্তোত্র পাঠ সুরু করেছেন, আমরা তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়ে পথ চলতে চলতেই গাইতে লাগলাম –

ওঁ নমোহস্তু সর্বায় সুশান্তমূর্তয়ে হ্যঘোর রূপায় নমো নমোস্তে।
সর্বাত্মনে সর্ব নমো নমস্তে মহাত্মনে ভূতপতে নমস্তে॥
ওঁঙ্কার হুঙ্কার পরিষ্কৃতায় স্বধাবষট্‌কার নমো নমস্তে।
গুণত্রয়েশায় মহেশ্বরায় তে ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মনে নমঃ॥
ত্বং শঙ্করস্ত্বং হি মহেশ্বরোহসি প্রধানমগ্র্যং ত্বমসি প্রবিষ্টঃ।
ত্বং বিষ্ণুরীশঃ প্রপিতামহশ্চ ত্বং সপ্তজিহ্বস্ত্বমনন্তজিহ্বঃ॥
স্রষ্টাসি সৃষ্টিশ্চ বিভো ত্বমেব বিশ্বস্য বেদ্যং চ পরাং নিধানম্।
আহুর্দ্বিজা বেদবিদো বরেণ্যং পরাৎ পরস্ত্বং পরতো পরোঽসি॥
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং প্রবদন্তি যচ্চ বাচো নিবর্ত্তন্তি মনো যতোশ্চ॥

স্তোত্রের ভাবার্থ হল – হে সর্ব ! তোমার মূর্তি অতি শান্ত এবং সৌম্য, তুমি মূর্তিমান অঘোর, হে ভূতপতে। হে সর্বভূতান্তরাত্মা ! তোমাকে প্রণাম। হে শিব সুন্দর ! তুমি ওঁকার ও হুঙ্কার ভূষিত, তুমি স্বধা ও বষট্‌কার স্বরূপ ! তোমাকে প্রণাম। হে সর্বাত্মন ! তুমি সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের অধীশ্বর, মহেশ্বর, ত্রয়ীময় ও ত্রিগুণাত্মা – তোমাকে প্রণাম। হে বিভো ! তুমি মঙ্গলকারী মহান্ ঈশ্বর, প্রধান অগ্রণী, বিষ্ণু, ইশ, প্রপিতামহ, সপ্তজিহ্ব, অনন্ত জিহ্ব, একাধারে স্রষ্টা ও সৃষ্টি, বিশ্বের একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়, পরম আশ্রয় স্বরূপ। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ তোমাকে পরাৎপর বরেণ্য, শ্রেষ্ঠ হতেও শ্রেষ্ঠতর এবং সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্মতর বলে বর্ণনা করে থাকেন। হে দেব ! আপনা হতেই বাক্য ও মন নিবর্তিত হয়।

স্বামী হিরন্ময়ানন্দজীর সঙ্গে সকলেই আবেগদীপ্ত কণ্ঠে দু'দুবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই স্তোত্র পাঠ করতে করতে আমরা মনোরম এক পল্লীতে এসে পৌঁছে গেলাম। কাছাকাছি কোন পাহাড় নাই, চারদিকেই অনেক ঘরবাড়ী, ৩ জন রাখাল বালক এক পাল গরু মহিষ মাঠে চরিয়ে নিয়ে তাদের পাহাড়ী ভাষায় গান গাইতে গাইতে বাড়ী ফিরছে। আমি এই ভেবে আশ্চর্য হলাম যে, মহা ভয়ঙ্কর ঝাড়ি শূলপাণির দিকে যতই এগুবো, ততই জঙ্গল ও হিংস্র জন্তুর পরিবর্তে এ যে দেখছি সমতলভূমির মত শান্ত, নিরুপদ্রব স্থানে এসে পৌঁছলাম। এ আমরা কোথায় এলাম। আমি এবং হরানন্দজী একজন রাখাল বালককে এই স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করতেই সামনে নর্মদাতটের উপর একটি মন্দির দেখিয়ে বললেন – হুঁই মুকুটেশ্বরজীকা মন্দর্। মহল্লে কে নাম সিসোদরা।

হিরন্ময়ানন্দজী তাদের কথা শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তাঁর পরামর্শে আমরা সকলেই মুকুটেশ্বর মন্দিরে এসে পৌঁছলাম। মন্দিরের দরজার পাশেই বসেছিলেন এক গেরুয়াধারী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। আমরা মন্দিরের মধ্যে মুকুটেশ্বর মহাদেবের অপরূপ সুন্দর প্রায় তিন ফুট উঁচু লিঙ্গমূর্তি দর্শন করে প্রণাম করলাম। মন্দিরের মধ্যে প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপের শিখা কৃষ্ণবর্ণের লিঙ্গগাত্রে পড়ায় তা চিকচিক্ করছে, মনে হল যেন জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে। মন্দিরের পূজারী নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন – ইয়ে শরীর কা নাম সিরিফ বোধসানন্দ, কোঈ 'শ্রী' নেহি, ১০৮, ১০০৮ ভি নেহি, গিরি, পুরী, সরস্বতী আদি কোঈ উপাধি ভি নেহি। মুকুটেশ্বর ভগবানজীকে গোলাম হৈ' আপলোগ কাঁহা জায়েঙ্গে, কাঁহাসে পধারেঁ ? স্বামী বাসবানন্দজী বললেন – হমলোগ ওঁঙ্কলেশ্বর সে আরহাঁ হৈ। আজ সুবেসে আঁতে হৈ শুকদেবশ্বের তীর্থ সে। চলেঙ্গে শূলপাণি।

তাঁর কথা শুনে বেধসানন্দজী ঠোঁটে আপশোষমূলক 'চু-চু-চু' শব্দ করে বললেন – ইধর শূলপাণি কাঁহা হ্যায় ? আপনে ভুল কিয়া। আপ শুকদেবেশ্বর সে আট মিল ঔর ওঁকারেশ্বর সে ৫০ মিল পথ অতিক্রম কিয়া। নিশানা ভুল হো গয়ে। অভি বেলা চার বাজ গিয়া হোঙ্গে। কোঈ হরজা নেহি। ম্যঁয় নাটমন্দিরকা দরজা খুল দেতে হেঁ। আজ রাতমেঁ ইধারই ঠারিয়ে কাল সুবে মুকুটেশ্বর মহাদেওজী কো আশীর্বাদ লেকর ফিন আপোষ যাইয়ে শুকেশ্বর তথা শুকদেবেশ্বর তীর্থমেঁ। উহাঁ রেবামায়ীকী কৃপাসে কোঈ না কোঈ আপ্‌কো শূলপাণিজীকা পথ জরুর বাতা দেঙ্গে। বহুৎ বহুৎ ভাগ্‌ সে, পূরব জনমকা তপস্যা কী প্রভাব সে আদমী শূলপাণীশ্বর মহাদেবজী কো দর্শন পাতে হৈ। নর্মদাতট মেঁ এ্যায়সা গোলকধাঁধা মহামায়া সৃষ্টি করতে হৈ, পরিক্রমা মেঁ বিঘ্ন ডালতে হৈ, কেঁও কী পরিক্রমা ক্ষুদ্‌ শ্রেষ্ঠ তপস্যা হৈ। পরিক্রমা সফল হোনে সে তপস্যা মেঁ সিদ্ধি মিলতি হৈ। আপ্‌ ত জানতে হেঁ – শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।

এই বলে তিনি নাটমন্দিরের দরজা খুলে দিলেন। বিশাল নাটমন্দির, সেখানে কেবল ১৯ জন কেন ৫০ জন সন্ন্যাসী হেসে খেলে শুয়ে থাকতে পারবে। যে যার আসনে শয্যা বিছিয়ে আমরা বেধসানন্দজীর সঙ্গে নর্মদা স্পর্শ করতে ঘাটে চললাম। আজ যেন শীত কালকের চেয়েও বেশী। যেতে যেতে স্বামী হরানন্দজী বাসবানন্দজীকে টিপ্পনী কেটে বললেন – শৈলেন্দ্রনারায়ণজী এবং তাঁর সাথী শুকদেবেশ্বর তীর্থ এড়িয়ে এসেছিলেন বলে বড় যে তখন দম্ভভরে বলেছিলেন তাঁদের পরিক্রমার ত্রুটি হয়েছে, এখন মহাপুরুষদের কি হল ? আমি আগেই আপনাকে বলেছিলাম – হিরণ্ময়ানন্দজীর উপর ভরসা করে পরিক্রমা করা চলে না। একে বয়সের ভারে অর্থব, তার উপর কবে সেই বিশ বছর আগে একবার মাত্র দক্ষিণতটে পরিক্রমা করেছিলেন। বয়সের ভারে মানুষের স্মৃতিভ্রংশও ত হয়! বাসবানন্দজী চুপ করে তাঁর ব্যঙ্গোক্তি হজম করলেন। বেধসানন্দজী কি বুঝলেন জানিনা, তিনি কেবল বললেন – এ্যায়সা ভ্রম আচ্ছা আচ্ছা অভিজ্ঞ পরিক্রমাবাসীয়োঁ কো ভি হোতেই হ্যায়। খ্যার, আপ শোচিয়ে আপ্‌ নর্মদামায়ীকা গোদমেঁই তো হ্যায়।

কথা বলতে বলতে ঘাটে পৌঁছে গেলাম। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বেধসানন্দজী ওপারের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন – সামনে মেঁ উধার নর্মদাজীকে উত্তরতট পর সিনোর নগর হৈ। পশ্চিম রেল পর সিনোর এক ষ্টেশন হৈ। চীরণ্ডা জংশন সে রেল কী এক শাখা মালসর তক্‌ গই হৈ। উসী শাখাপর সিনোর হৈ। উসে সেনাপুর ঔর শিবপুরী ভি কহতে হৈ। আপলোগোঁকা কোঈ উধর গয়া হৈ ?

রঞ্জন আঙুল বাড়িয়ে আমাকে দেখিয়ে দিতে হরানন্দজীর নির্দেশে আমি বলতে বাধ্য হলাম যে – হ্যাঁ, সিনোর দর্শন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। উত্তরতটের ঐ পুণ্যস্থানে মহামতি বিদুর এবং স্কন্দ অর্থাৎ কুমার কার্তিকেয়ও তপস্যা করে সিদ্ধকাম হয়েছিলেন। ওখানে ধূতপাপেশ্বর, মার্কণ্ডেশ্বর, কেদারেশ্বর, ভোগেশ্বর, উত্তরেশ্বর, রোহিনেশ্বর প্রভৃতির মন্দির ছাড়াও চক্রতীর্থ আছে। ওখানে পরশুরাম তপস্যা করে নিষ্কলঙ্ক মহেশ্বর স্থাপন করে গেছেন।

নর্মদার জলে হাত মুখ ধুয়ে আমরা সন্ধ্যা সেরে নিলাম। আমরা সন্ধ্যা করতে বসতেই মুকুটেশ্বরের সন্ধ্যারতি করার জন্য বেধসানন্দজী মন্দিরে চলে গেলেন। নর্মদার ঘাটে বসেই আমরা আরতির ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেলাম। আমরা সকলে যখন সান্ধ্যক্রিয়া সেরে মন্দিরে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন আরতি শেষ হয়ে গেছে। বেধসানন্দজী সমাগত ভক্তদেরকে কুশীতে করে স্নান জল দিচ্ছেন। আমরাও মুকুটেশ্বরজীকে প্রণাম করে তাঁর হাত হতে স্নান জল নিলাম। ২০/২৫ জন ভক্তরা চলে যেতেই তিনি আমাদেরকে মুকুটেশ্বরের কাহিনী শোনাতে লাগলেন – দক্ষ প্রজাপতি নে আপনে যজ্ঞ মেঁ শিবজীকো

নিমন্ত্রণ নাহি দিয়া ঔর শিবজী কী বহুৎ নিন্দা কী। পার্বতীজী নে ইস্ অপমানকে কারণ যজ্ঞকুণ্ড মেঁ আপনী দেহ ত্যাগ দী। উস্ সময় শ্রীশঙ্করজী কী জটা সে উৎপন্ন বীরভদ্র নে যজ্ঞকা নাশ কিয়া। ভগবান শঙ্কর তব শ্রীনর্মদাকে কিনারে ইধর চলে আয়ে। আপনা মুকুট উনোনে কৈলাশ মেঁ ছোড় আয়ে থে। জব উনকে গণ মুকুট লেকর ইহাঁ আয়ে তব ভগবান শঙ্কর কো ইহাঁ লিঙ্গরূপ মেঁ পায়া। সব দেওতা ঔর ঋষিনে উনকী পূজা কী ঔর মুকুট চড়ায়া। তব সে উনোনে হিঁয়া মুকুটেশ্বর মহাদেবকে নাম সে প্রসিদ্ধ হুয়ে।

ভগবান মুকুটেশ্বরের পরিচিতি জানিয়ে দিয়ে তিনি হ্যারিকেনের আলো দেখিয়ে আমাদেরকে নাটমন্দিরে পৌছিয়ে দিলেন, একটি ছোট্ট মোমবাতি জ্বেলে দিয়ে তিনি তাঁর বাড়ীতে চলে গেলেন সন্ন্যাসীদেরকে নমো নারায়ণায় জানিয়ে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, সদর দরজা বন্ধ করে দিয়েও অন্ন বিস্তর সবাই শীতে কাঁপতে লাগলাম। যে যার আসনে বসে আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়েও কিছুতেই গা গরম হচ্ছে না। হরানন্দজী হি হি করে কাঁপতে কাঁপতেই মন্তব্য করলেন – বাবা! এ যা শীত, মাঘের শীত বাঘে খায়, বড় খাঁটি কথা, স্বামীজী (বোধানন্দজী) আমাদের প্রতি খুবই সদয় ব্যবহার করলেন সন্দেহ নাই, শুধু যদি কতকগুলি কাঠ জোগাড় করে দিতেন, তাহলে আগুন জ্বেলে বাঁচতাম! ওদিকে হিরন্ময়ানন্দজী, বেচারার তেষ্টা পেয়েছে, থরথর করে তাঁর হাত কাঁপছে, নিজের কমণ্ডলু হতে নর্মদার জল গলায় ঢালতে গিয়ে 'ওরে বাবাঁ!' বলে ঠক করে কমণ্ডলুটা রেখে দিলেন। বললেন – বাবা! এতো জল নয় বরফ! বাসবানন্দজী জপে বসেছিলেন – জপের মালা রেখে দিয়ে শুয়ে পড়লেন। কম্বলের তলায় কুকুরকুণ্ডলী হয়ে শুতে শুতে পরিহাসের সুরে বললেন – এখন ভগবান তো দূরের কথা গুরুর নাম, এমন কি বাবার নামও ভুলে গেছি!' কী জবর ঠাণ্ডা রে বাবা! সকলেই যখন এমনভাবে শীতে কাবু হয়ে পড়েছি, তখন একমাত্র রঞ্জনকেই দেখলাম, কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে বসে গুণ্‌গুণ্ করছে, তার একতারাটি নিয়ে। হরানন্দজী তার দিকে তাকিয়ে বললেন – ছোকরার যে রস উথলে উঠেছে! 'ছোকরা' বললুম বলে কিছু মনে করো না ভাই, আমার আবার বদ রোগ আছে, জ্বর, সর্দি, মাথা ধরা, গায়ে হাতে কোন ব্যথা হলে, যে কোন দৈহিক কষ্টে আমি অদৃশ্য সেই শত্রুকে যা-ইচ্ছা-তা ভাষায় চিৎকার করে গালাগালি করে থাকি। একসঙ্গে যখন অমরকণ্টক পর্যন্ত যেতে হবে, তখন আমার এই স্বভাবের দোষ বলে রাখাই ভাল। আচ্ছা ভাই এমন একটা গান শোনাতে পার, যাতে শীতের কামড় ভুলে যেতে পারি? আমি বললাম, রঞ্জনভাই-এর কণ্ঠে সে যাদু যে আছে, তা আমি জানি। আমি এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে একতারাটা পাশে রেখে দিয়ে রঞ্জন বেশ আবেগের সঙ্গে গলা ছেড়ে একটা গজল গান গাইতে লাগল –

মন বুঝে না খুঁজে বেড়াই তুমি কোথায় নাইকো গো,
নয়ন মেলে দেখতে গেলে কেন বল লুকাও গো।
কতকাল আর অন্ধকারে রাখবে জীবে বন্ধ করে,
আলোর সীমা নাইতে তোমার জানি না গো কার তরে,
পিয়াস আকুল কাতর জনে হতাশ করা কি বিধান গো?
নয়ন মেলে দেখতে গেলে কেন বল লুকাও গো।

রঞ্জন গানের প্রতিটি আখর বেশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতে লাগল বেশ দরদ দিয়ে। তালে লয়ে সুরে স্বরে এমন মাধুর্য ঝরে পড়তে লাগল কণ্ঠ দিয়ে যে, সেই মধুর তানের টানেই দেখলাম, প্রায় সকল সন্ন্যাসীই কম্বল হতে মুখ তুলে রঞ্জনের দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। রঞ্জন ভাব-রসে মত্ত হয়ে গেয়ে চলেছে। হঠাৎ মোমবাতিটা নিভে গেল। সূচীভেদ্য অন্ধকার কিন্তু রঞ্জনকে নিরস্ত করতে পারল না। সে একই রকম আবেগে দরদ দিয়ে গাইতে লাগল –

মন বুঝে না খুঁজে বেড়াই তুমি কোথায় নাইকো গো,
আশার আমার নাই সীমানা, দেখ্‌বো কোথাও পাই কিনা
শূন্যে জলে সর্বস্থলে তোমায় হেরি এই বাসনা মাগো।
খুঁজে শেষ হিয়ার মাঝে দেখ্‌বো কোথায় লুকাও গো॥

অন্ধকারের মধ্যেই আমি অনুভব করতে পারছি, সন্ন্যাসীরা সব উঠে বসেছেন। রঞ্জনের কণ্ঠ নীরব হতেই তাঁরা কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলেন – হর নর্মদে, হর নর্মদে।

রঞ্জনের মিষ্টি গানের রেশ যেন কানে এখনও গুণ্‌গুণ্ করছে। গানের মধ্যেই 'মাগো'। বলে রঞ্জন কাকে সম্বোধন করেছে বুঝতে পারছি না। যদি নর্মদাকে করে থাকে, তাহলে বড় খাঁটি কথাই বলেছে – 'মন বুঝে না খুঁজে বেড়াই তুমি কোথায় নাইকো গো।' 'নয়ন মেলে দেখতে গেলে কেন বল লুকাও গো', গানের এই কলিটি ধাঁধায় ফেলেছে, মা নর্মদা তো লুকিয়ে নাই, অমরকন্টক হতে ভারোচের সমুদ্র পর্যন্ত তো মা নিজের মহিমা এবং স্বরূপ প্রকাশ করে নিজেকে সকলের দৃশ্যমানা করে রেখেছেন। 'খুঁজে শেষে হিয়ার মাঝে দেখ্‌বো কোথায় লুকাও গো,' গানের এই শেষ কথাটি এক কথায় অপূর্ব! অতুলনীয়! মাকে যদি চোখ বন্ধ করলেই নিজের বুকের মধ্যেই দেখতে পাই, তাহলে নর্মদাতট হতে পরিক্রমান্তে যে যার স্বদেশের বা স্বস্থানে ফিরে গেলেও কোনও পরিক্রমাবাসীই মায়ের দর্শন হতে বঞ্চিত হবে না। এইটাই ভক্ত মাত্রেরই পরম অভীষ্ট বস্তু।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল, একেবারে ৬টায়। সন্ন্যাসীরা তখন প্রায় সকলেই জেগে উঠেছেন। প্রত্যেকেই স্তব পাঠ করছেন, কেউ মহাদেবের, কেউ নারায়ণের, কেউ মহেশ্বরী পার্বতীর কেউ বা নর্মদার। স্বামী হরানন্দজী যে আমার শয্যার পাশেই আসন বিছিয়ে ছিলেন, তিনি 'হর নর্মদে' বলতে বলতে দরজা খুলেই সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন, বললেন কী হিমেল বাতাস, চারদিক ঘন কুয়াশায় ঢাকা, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, যা কনকনে ঠাণ্ডা, এখন বাইরে বেরুনো যাবে না। আর ঘণ্টা খানিক সবাই বিছানায় পড়ে থাকুন, রোদের আভাস আকাশে না দেখা গেলে বাইরে বেরুবার চেষ্টা করে বৃথা।' বলেই তিনি নিজের আসনে ফিরে এসে পুনরায় কম্বল মুড়ি দিলেন।

আরও ঘন্টাখানিক পরে প্রাতঃকৃত্যের টানে সবাইকেই উঠে পড়তে হল। ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, গাছপালা হতে টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে; মুকুটেশ্বরের গোটা মন্দিরটাকেই মনে হচ্ছে এক বিশাল শিবলিঙ্গ, স্বচ্ছ সাদা বরফের একটা পাতলা আস্তরণে মন্দির যেন পাথরের মন্দির নয়, কাশ্মীরের অমরনাথ শিবলিঙ্গের মত একটা বিশাল তুষারলিঙ্গের রূপ নিয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এক নজরে মন্দিরটাকে আমার অন্ততঃ এই রকমই মনে হল। মন্দিরের চত্বরেই বেধসানন্দজী আরও ২ জনকে সঙ্গে নিয়ে কাঠকুঠো শুকনো ডালপালা দিয়ে আগুন জ্বেলেছেন। আগুন দেখে আমরা প্রত্যেকেই তাঁর অগ্নিকুণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে আগুন পোয়াতে লাগলাম। হাত পা সেঁকে নিয়ে একে একে প্রাতঃকৃত্য সারতে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে হিরন্ময়ানন্দজী এসে হরানন্দজীকে বললেন – যাইয়ে প্রাতঃকৃত্য কর লিজিয়ে, আভি যাত্রা করনে হোগা। আভি করীব সাড়ে সাত বাজ গিয়া হোগে। তাঁর কথায় হরানন্দজী খাঁকরে উঠে বললেন – শালা ঠাণ্ডার চোটে পঁদের গু মাথায় উঠেছে। প্রাতঃকৃত্য যে করব, জল শৌচ করব কি করে? নর্মদার জল ত এখন বরফ গোলা জল! তোমরা খোট্টারা এক লোটা জল নিয়ে ছোঁচানো, মুখ ধোয়া, দাঁত মাজা সব সারতে পারো, আমরা তা করতে পারব না। ভাল করে রোদ উঠুক তার পর সব সারা যাবে। পরিক্রমা করতে বেরিয়েছি, যেখানে যতক্ষণ ইচ্ছা থাকব, ঘুরব তারপর গন্তব্যস্থানে যাবো। এ কি শালা অফিসের চাকরী নাকি যে punctuality maintain করতে হবে? কারও

সঙ্গে contract করে time limit বেঁধে আসি নি যে একটা particular সময়ের মধ্যে পড়ি মরি করে দৌড়াতে হবে ? বেচারা হিরন্ময়ানন্দজী তাঁর কথা বুঝতে না পেরে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন – উনোনে ক্যা বোল রহা হ্যায় ? আমি বললাম – উনোনে প্রাতঃকৃত্য নাহি করেঙ্গে, উনকা টাট্রিকা বেগ আভিতক নাহি আতা হৈ। উনোনে চাহতা হৈ আউর থোড়া ধুপ হোনেসে যাত্রা করেঙ্গে।

নিরীহ স্বামীজী আমার কৃত অর্থ বা কদর্থকে মেনে নিয়ে মন্তব্য করলেন – যো আপলোগকা ইচ্ছা। ক্রমে রোদ ছড়িয়ে পড়তে লাগল গাছে পালায়, মন্দিরের উপরের আস্তরণ গলে গেল। আমরা নাটমন্দিরে ঢুকে যে যার ঝোলা গাঁঠরী লাঠি কমণ্ডলু ইত্যাদি হাতে নিয়ে মন্দিরে এসে মুকুটেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করে বেধসানন্দজীকে সবাই 'নমো নারায়ণ' জানালাম। হিরন্ময়ানন্দজী আমাদের তরফ হতে বেধসানন্দজীকে জানালেন – আপকো শিষ্ট ঔর স্বাগত সৎকারকো লিয়ে হার্দিক ধন্যবাদ। আভি হমলোগ চল পড়ে। বেধসানন্দজী বললেন – হিঁয়া সে কোটেশ্বর হোকর সিধা চলা যাইয়ে শুকদেবেশ্বর তীর্থ মেঁ। উহাসে সিধা উত্তর দিশা কা মার্গ মেঁ আপলোগ আয়া, ইসী ওয়াস্তে বিভ্রাট হো গয়া। অগ্নিকোণ কা মার্গ পাকড়াতে তো আপলোগ সিধা শূলপাণিকা ঝাড়ি মেঁ প্রবেশ করতা থা। লেকিন, ইসমে কোঈ নুকসান তো নেহি হুঁয়া, মুকুটেশ্বর তীর্থকো দর্শন হো গয়া। শুকদেবেশ্বর সে দণ্ড, নারবাড়ী হোকর পয়চা তক্ পৌছনে মেঁ সিরিফ ছয় ঘণ্টা লাগেগা ঔর কেয়া। বাস্তব মেঁ মার্গ অত্যন্ত হী ঘন জঙ্গলোঁ ঔর সঘন বনো মেঁ হৈ। দৃশ্য অত্যন্ত হী সুন্দর লেকিন্ কোঈ কোঈ গাঁও কা নাম ভী নেহি হৈ। ইসী ওয়াস্তে পরিক্রমাবাসীয়োঁ নে এ্যায়সা বিভ্রাট মেঁ গিরতা হৈ। মা নর্মদা আপলোগোকা ভালা করেঁ।

আমরা যাত্রা সুরু করলাম। যে পথে এসেছিলাম সে পথেই ফিরে যেতে লাগলাম, একই প্রস্তরাকীর্ণ পথে। পার্থক্যের মধ্যে এখানে আসার সময় নর্মদার প্রবাহ আমাদের ডান দিকে ছিল, এখন আছে বাম দিকে। নর্মদার উপর কুয়াশার যে আস্তরণ ছিল তা ধীরে ধীরে সরে গিয়ে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল সূর্যরশ্মির তেজ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে। হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে আমরা চলেছি। বেলা প্রায় ১০টার সময় আমরা ঘণ্টা দেড়েক হেঁটে পৌছে গেলাম কোটিনারের সেই বিখ্যাত কোটেশ্বর তীর্থে। সামনে সেই ফরদ গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা মহাত্মা কৃপানাথের সেই গুহাশ্রম। আমি মনে মনে কৃপানাথকে স্মরণ করে সভক্তি প্রণাম জানালাম – হে বৈদিক হংসবিদ্যার মহাচার্য। তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম। তুমি আমাকে শক্তি দাও, যেন আমি নির্বিঘ্নে পরিক্রমা শেষ করে দেশে ফিরে হংসবিদ্যার খবর জীবনের কোন-না-কোন সময়ে যেন দেশবাসীকে জানাতে পারি। সন্ন্যাসীরা গায়ের কম্বল খুলে ফেলে যে যার গাঁঠরীতে বেঁধে ফেললেন, তারপর সবাই মিলে একসঙ্গে 'হর-হর-বম্-ববম্-বম্' ধ্বনি দিতে দিতে শ্মশানেশ্বর মহাদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম।

প্রণাম করে উঠেই স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী নেতৃত্বে হাঁটতে লাগলাম নর্মদার ধারে ধারে। চারদিকে শুধু তাল আর শিমূল গাছ, আমি আর রঞ্জন প্রথম দিন এখানে এসে যেমন শকুনের ভিড় দেখেছিলাম আকাশ পথে এবং তাল শিমূলের গাছে, আজও তেমনি তাদের জটলা লেগেই আছে। পথের মধ্যে স্থানে স্থানে নর্মদার কোরে কোরে অনেক চিতার দগ্ধ এবং অর্ধদগ্ধ কাঠ ছড়িয়ে আছে। হরানন্দজী সাবধান করে দিলেন – 'দেখে হাঁটো, দেখে হাঁটো, কোন পবিত্র চিতা বা চির যেন কোন মতেই লঙ্ঘন না হয়।' পথের ধারে ধারে অনেক বড় বড় পাথরের চাঙড়। অতি কষ্টে সেই সব পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে মাইল খানিক হাঁটার পর বুনো গাছপালার ভিড় দেখলাম। অন্যান্য নদী বা সমুদ্রের যেমন তটরেখা থাকে, নর্মদার তটরেখা বলতে কোথাও কিছু নাই। মা পাহাড় পর্বত ভেদ করে

কখনও সোজা কখনও বা আঁকা বাঁকা পথে ছুটে চলেছেন, কোথাও বা পাহাড়ের মধ্যে গুপ্ত হয়েছেন বলে চিহ্নিত তটরেখা নর্মদার নাই বললেও চলে। জলের ধার হতে গাছ উঠে এসেছে বলে কোন কোন অংশ শুধু জঙ্গলেই ঢাকা। এই রকম জঙ্গলাকীর্ণ দৃশ্য শুধু এখানে নয়, উত্তরতটেও এইরকম দেখেছি। নর্মদার এই রকম বিচিত্র তটরেখাহীন বিচিত্র গতিপথের জন্য অন্যান্য নদী হতে তার একটা পৃথক বৈশিষ্ট্য সকলেরই চোখে পড়ে।

কোটিনার থেকে ঘণ্টাখানিক হেঁটেই আমরা উরি গ্রামে এসে পৌছলাম। এখানে পৌছেই হরানন্দজী প্রাতঃকৃত্য করতে ছুটলেন, আমরা তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। রঞ্জন মৃদুস্বরে চুপি চুপি আমাকে জানাল, এ তো বড় আশ্চর্যের ব্যাপার নর্মদার তটে কোটেশ্বর পৌছবার যে এমন একটা পথ আছে, তাতো আমরা কল্পনাই করতে পারি নি। যে পাহাড়ে অনামী বাবা থাকেন কিংবা ভালোদ প্রভৃতি জায়গা তো এই রাস্তায় পড়লই না। অনামী বাবার মত একজন যোগী বা ভালোদের গৌতম মুনির তপস্যা ক্ষেত্রের কোন সন্ধানই এঁরা পেলেন না।

– তা আর কি করা যাবে! রাজ্য সরকার ত নর্মদার তীরে পাকা রাজপথ বানিয়ে কিছু দূরে দূরে মাইল ষ্টোন পুঁতে গ্রাম ও তীর্থের নাম সাইন বোর্ডে লিখে রাখে নি, কাজেই হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত নর্মদার উভয় তটের সব তীর্থের কথা কমলভারতীজী, গৌরীশংকরজী এমন কি মায়ানন্দ সরস্বতীর মত বিখ্যাত নর্মদা প্রেমিক বিশেষজ্ঞ পরিক্রমাবাসীদের পক্ষেও লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয় নি। সেইজন্য দুবার তিনবার ধরে কিংবা সারাজীবন ধরে নর্মদা পরিক্রমাতেই জীবন কাটিয়ে গেছেন তাঁরাও বুক ঠুকে বলতে পারবেন না যে, নর্মদার সব তীর্থের দর্শন তাঁদের হয়ে গেছে। নর্মদার মহিমাজ্ঞাপক যে সব পুস্তককে authentic বলে ধরা হয়, সেই বশিষ্ঠ সংহিতা, বায়ুপুরাণের অন্তর্গত রেবাখণ্ড এবং স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত বেরাখণ্ডে উল্লেখিত তীর্থগুলির মধ্যে এইজন্য অনেক তীর্থের মিল নাই। বশিষ্ঠ সংহিতায় যে সব তীর্থের উল্লেখ আছে, তার সবগুলির বর্ণনা স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে পাওয়া যাবে না। বায়ুপুরাণ এবং বশিষ্ঠ সংহিতা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য।

প্রাতঃকৃত্য এবং স্নান সেরে হরানন্দজী ফিরতেই আমরা মিনিট দশেক হেঁটেই ঔরি গ্রামের শৈবতীর্থ মার্কণ্ডেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে এসে পৌছলাম। প্রাচীন মন্দির, পুরোহিত পূজা করছিলেন। আমরা মহাদেবকে প্রণাম করে উঠতেই পুরোহিতজী জানালেন – এক সময় এক মৃগয়ারত রাজা মৃগবেশধারী এক ঋষিকে মৃগভ্রমে তীরবিদ্ধ করেছিলেন। সেই পাপের অনুশোচনায় কাতর হয়ে যখন তিনি কাঁদতে কাঁদতে পাথরের উপর মাথা ঠুকছিলেন, তখন সেখানে সহসা মহামুনি মার্কণ্ডেয় আবির্ভূত হয়ে বৃথা ক্রন্দন না করে, চিত্তশুদ্ধির জন্য তপস্যা করতে বলেন। মহামুনির অনুজ্ঞা মত তপস্যা করে রাজার চিত্তশুদ্ধি ঘটলে তিনিই এখানে মহাদেব স্থাপন করে এই মন্দির নির্মাণ করে দেন। বায়ুপুরাণের অন্তর্গত রেবাখণ্ডের ১১৭-১১৮তম অধ্যায়ে মার্কণ্ডেশ্বর মহাদেবের বিশদ বর্ণনা আছে। পুরাহিতজীর কথা শুনতে শুনতেই আমি নর্মদার উত্তরতটের দিকে বারবার তাকাচ্ছিলাম, হরানন্দজী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন – মার্কণ্ডেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করতে করতে নদীর ওপারের দিকে বারবার তাকাচ্ছেন কেন? আমি পুরোহিতজীকে জিজ্ঞাসা করলাম – ঐ তটে একটা সুউচ্চ প্রাচীন মন্দির দেখতে পাচ্ছি। তার শতছিন্ন ঝাণ্ডাটা দেখে খুব পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। ঐ মহল্লার নাম কি?

তিনি বললেন, এই ঔরি গ্রামের বিপরীত দিকে উত্তরতটস্থ ঐ মহল্লার নাম ঝাঁঝর। ঐ শিবমন্দিরের নাম জনকেশ্বর তীর্থ। রাজা জনক ঐখানে এক বিশাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে জনকেশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উসী গ্রাম কী অন্দর মেঁ মদনেশ্বর মহাদেব কা মন্দির ভী হ্যায়। যহাঁ কামদেব নে তপ করকে মহাদেব জী কো প্রসন্ন কিয়া থা।

আমরা ঔরিতে আর দাঁড়ালাম না, আমরা মার্কণ্ডেশ্বরের মন্দির হতে অগ্নিকোণ অর্থাৎ উত্তর পূর্ব কোণের রাস্তা ধরে হাঁটিতে লাগলাম। একই পাহাড়ী রাস্তা, সামনে দু দুটো ছোট পাহাড় পড়ল, কড়া রোদ উঠেছে, কনকনে ঠাণ্ডা ভাব আর নাই, মাঝে মাঝে নর্মদার দিক হতে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপ্‌টা এসে লাগছে। অনেক ঝোপঝাড় আর পাথরের চাঙড় ডিঙ্গিয়ে শাল সেগুনের তলা দিয়ে প্রায় মাইল চারেক হেঁটে আসার পর বেলা ২টা নাগাদ এসে পৌছলাম শুকেশ্বর মন্দিরে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম – এই কি সেই শুকদেবের তপস্যা ক্ষেত্র, যা দেখি নি বলে আপনারা আমার এবং রঞ্জনের পরিক্রমায় ত্রুটি হয়েছে বলেছিলেন ?

স্বামী বাসবানন্দজী বললেন – হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই সেই শুকদেবেশ্বরের মন্দির, সাধারণের মধ্যে শুকেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। এই জঙ্গলী গ্রামের নামও শুকেশ্বর। 'ত্রুটির' কথা বলে আর লজ্জা দিবেন না। আমাদেরও ভুল হয়েছে, নতুবা আমরা ভুল পথে গিয়ে আবার এখানেই ফিরে আসতে বাধ্য হলুম। এবার আমরা চলুন নর্মদাতে স্নান তর্পণ সেরে নিই। স্নানের পর মহাদেবের মন্দিরে ঢুকবো সবাই একসঙ্গে। তিনি মন্দিরের নিকটে একটা বড় টিনের চালা দেখিয়ে বললেন – আপনাদেরকে নাদোদের সদাবর্তের কথা বলেছিলাম না, ঐ সেই সদাবর্ত। আমাদের আসতে বেলা ২টা বেজে গেল, সদাবর্ত বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা প্রথম যখন আসি, তখন সদাবর্তেই ভিক্ষা পেয়েছিলাম। হরানন্দজী কাজের লোক, তিনি ৪জন ব্রহ্মচারীকে বললেন – তোমাদের দুজন কিছু লকড়ী কুড়িয়ে আন আর দুজন প্রত্যেকের ঝুলি ঝেড়ে খান চল্লিশেক লিট্টি পাকানোর উপযোগী আটা মাখিয়ে দেবে দাও। তারপর ফাঁক পেলেই একজন করে গিয়ে স্নান করে আসবে। মন্দিরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম মন্দিরটি একটি ছোট পাহাড়ের উপর। সিঁড়ি চড়ে মন্দিরে যেতে হবে। মন্দিরের অপূর্ব গঠন পারিপাট্য দেখে মুগ্ধ হলাম। মন্দিরের চারটি ভাগ, প্রথম ভাগে চারটি স্তম্ভ বিশিষ্ট মাথার উপর ছোট গম্বুজ সহ একটি ভাগ, তার গায়েই মসজিদের ঢং এ একটি বড় গম্বুজ, তার গায়ে প্রথমটির মত অপেক্ষাকৃত ছোট গম্বুজ সহ আর একটি ভাগ। তিনটি ভাগ এক সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সর্বশেষ অংশে একটি সর্বোচ্চ মন্দিরের সঙ্গে। সেই মন্দিরাকৃতি অংশের মধ্যেই যোগিরাজ শুকদেব প্রতিষ্ঠিত শুকেশ্বর মহাদেব বিরাজমান বলে বাসবানন্দজী জানালেন। পাহাড়ের তলা থেকে মন্দিরের দৃশ্য এইভাবে আমার চোখে প্রতিভাত হল। অন্যান্য সন্ন্যাসীরা নর্মদার ঘাটে নেমে স্নান তর্পণ করতে লেগে গেছেন। আমিও স্নান করতে নামলাম। ঘাটে বড্ড বেশী ঠাণ্ডা হাওয়া। কোনমতে স্নান সেরে গরম জামা (সোয়েটার) ও আলখাল্লা পরে নিলাম। তারপর কমণ্ডলু ভরা জল নিয়ে সবাই উঠতে লাগলাম সিঁড়ি ভেঙে। স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী আমাদের আগে যেতে যেতে বললেন – চলিয়ে, ক্যা কিয়া জাবেগা, উধর সিঁড়িয়া চড়কর জানা হোতে হৈ। মন্দিরকা পাশ মে মার্কণ্ডেয় স্থাপিত মার্কণ্ডেশ্বরজীকো এক ছোটা সা মন্দির ভী হৈ। মূল মন্দিরকা ডাহিনা তরফ, বাঁয়া তরফ দেখিয়ে শুকেশ্বরজীকা ভোগঘর, উস্‌কা নীচা মেঁ এক গুফা ভী হৈ।

সিঁড়ি ভেঙে মূল মন্দিরে ঢুকতে গিয়ে দেখি, প্রবেশ পথেই দুটি মর্মর মূর্তি, একটি শুকদেবের, আর একটি স্বয়ং ব্যাসদেবের। শুকদেবের বালক মূর্তি কিন্তু ব্যাসদেবের মূর্তি জটাজুট। ব্যাসদেবের নিচেই একটি বেদির উপর আর একটি মূর্তি, দীর্ঘ শ্মশ্রু, তারও মাথায় জটাভার, তিনি পায়ের উপর পা তুলে বসে নর্মদা প্রবাহের দিকে তাকিয়ে আছেন। হিরন্ময়ানন্দজী বললেন – ঐ মূর্তি মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের। আমরা জলভরা কমণ্ডলু হাতে, প্রথমাংশের হল পেরিয়ে দ্বিতীয় অংশে প্রবেশ করে দেখি, মন্দির গাত্র বেয়ে একটি বেলগাছ তার ডালপালা সহ মন্দিরের হলকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। বেলগাছের ডাল সরিয়ে সরিয়ে তৃতীয় অংশের হল অতিক্রম করে শুকেশ্বরের মূল মন্দিরে প্রবেশ করলাম। শুকদে

প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ। আমরা শিবের মাথায় জল ঢালবার উপক্রম করতেই আমাদের কানে ঢুকল, কেউ যেন আমাদের কানে মন্ত্র শোনাচ্ছেন –

ওঁ সর্বায় ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ ঈশানায় সূর্যমূর্তয়ে নমঃ। মন্ত্রের অর্থ থেকেই বুঝা যায় মন্ত্রগুলি মহাদেবের অষ্টমূর্তির প্রণাম মন্ত্র। আমরা ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করেই মহাদেবের মাথায় জল ঢাললাম এবং প্রণাম করলাম। কিন্তু এই মন্ত্রোচ্চারণ করলেন কে? তাঁকে ত কেউ দেখতে পেলাম না। প্রত্যেকেই পূজা করে বেরিয়ে আসবার পথে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। কিন্তু কারও দর্শন পাওয়া গেল না। আমরা মন্দিরের চাথালের উপর দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় দেখতে পেলাম হরানন্দজী কমণ্ডলু নিয়ে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছেন শুকেশ্বর মহাদেবের পূজা করতে। তিনি মন্দিরে গিয়ে দ্রুত মহাদেবের মাথায় জল ঢেলে ফিরে এলেন। ফিরে আসতেই হিরন্ময়ানন্দজী তাঁকে ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন – আপনে কোঈ মন্ত্রবাণী শোনা? কোঈ দৈববাণী? হরানন্দজী তাঁর কথায় হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকতেই আমি সংক্ষেপে ঘটনাটি তাঁকে খুলে বললাম। তিনি হো হো করে হাসতে হাসতে বললেন – না, আমাকে কেউ মন্ত্র শোনায় নি। আপনারা সব বড় সাধক ত? তাই স্বয়ং মার্কণ্ডেয় মুনি বা শুকদেবজী আপনাদেরকে পূজার মন্ত্র শুনিয়ে গেছেন! দেরি হয়েছে, এখন নিচে গিয়ে লিট্টি ভোজন করে আমাকে ধন্য করবেন চলুন। তাঁর সঙ্গে নিচে নেমে আমরা লিট্টি ভোজন করে যে যার গাঁঠরী নিয়ে আবার সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠে গেলাম। মন্দিরের চাথালে ঝোলা গাঁঠরী রেখে পাহাড়ের উপর থেকে চারদিকের অপরূপ শোভা উপভোগ করছি, এমন সময় সন্ধ্যারতি করার উদ্দেশ্যে পুরোহিত মশাই এসে উপস্থিত হলেন। তিনি দণ্ডী সন্ন্যাসীর দলকে দেখেই প্রশ্ন করলেন – ফিন্ আপলোগ এত্না তুরন্ত আপস্ আ গয়া কৈ সে? বাসবানন্দজী পথের বিভ্রাটের কথা তাঁকে জানালেন। তিনি বললেন – নর্মদামেঁ এ্যায়সা হোতাই হ্যায়। তাঁর কথা শুনে বুকটা আমার গুর্ গুর্ করে উঠল ব্যথায়। আমার মনে পড়ে গেল পূজনীয় শোভানন্দজীর কথা। হায়! সেই স্নেহময় মানুষটার সঙ্গে হয়ত আর এ জীবনে দেখাই হবে না। তিনিও কথায় কথায় বলতেন – নর্মদামেঁ এ্যায়সা হোতাই হ্যায়!

পুরোহিতজীকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম – এই শুকেশ্বরের সোজাসুজি উত্তরতটে যে কয়েকটি মন্দির দেখা যাচ্ছে দয়া করে তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিন। নর্মদার মধ্যে যে একটি ছোট্ট দ্বীপের মত স্থান দেখা যাচ্ছে, ওটাই বা কি? যদিও মা নর্মদার দয়ায় আমি উত্তরতট পরিক্রমা করে এসেছি, তবুও গাছপালায় ঘেরা পাহাড়ী জায়গায় সঠিক পরিচয় এপার থেকে চিনতে পারছি না। হয়ত বা আবার ওপারে গেলেও এ পারকে ওপার থেকে ঠিকভাবে চিনতে পারব না।

তিনি বললেন – নর্মদা মায়ীকা চারোতরফ পাহাড় ঔর জঙ্গল মেঁ ঘেরা হুয়া হ্যায়। ইসীওয়াস্তে নয়া আদমীকা এ্যায়সা বিভ্রাট হো সক্তা হৈ। হমলোগ হরবখত দেখতা হৈ, ইসীওয়াস্তে বেসক্ পহচান লেতা হৈ। খ্যার্ উস্ পার উত্তরতটমেঁ বরকাল গ্রাম হৈ। উধার সংকর্ষণ তীর্থ হৈ। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে ভাই শ্রীবলরামজীনে উস্ স্থান তপ কিয়া থা। যহাঁ যজ্ঞবট ভী হৈ। যহাঁ সে কুছ দূর মেঁ প্রেমতীর্থ হৈ, যহাঁ সূর্যনারায়ণকে পত্নী প্রভা নে তপ করকে প্রেমেশ্বর মহাদেবকী স্থাপনা কী থী, উসী মন্দর্ কা চূড়া ইধারসে দেখাই দেতি। নর্মদাকা বীচ মেঁ যো ছোটা সা দ্বীপ দেখাই দেতি, উহ ব্যাস তীর্থ হৈ। উহাঁ বেদব্যাস নে তপ করকে চারো বেদো মেঁ পারঙ্গম হুয়ে। উনকা স্থাপিত ব্যাসেশ্বর মহাদেব কো মন্দির ভী দেখাই দেতি হৈ। উত্তরতট মেঁ পিতাজী ঔর হিঁয়া দক্ষিণ তটমেঁ উনকা লেড়কা তপ করকে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হুয়ে থে।

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই বাসবানন্দজী বলে উঠলেন – উত্তরতটে ত আমরা যাচ্ছি না। কাজেই ওপারের সম্বন্ধে মেলা কথা শুনে আমরা কি করব ? আমরা গুরুদেবের মুখে শুনেছিলাম, এইখানে শুকদেব নাকি মাত্র ৮ বছর বয়সে এসেছিলেন এবং ১০০ বছর ধরে তপস্যা করায় মহাদেব প্রসন্ন হন, বর দিতে চাইলে তিনি নিজের মুক্তি চান এবং এই তীর্থে থেকে নিরন্তর ভক্তের অভীষ্ট পূরণের বর প্রার্থনা করেন। এখানে নাকি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সর্বদা থাকেন। এ সব কথা কি সত্য ? যদি এ সব কথা সত্য হয়, তাহলে আপনাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করছি, আপনার তো জন্ম কর্ম এইখানেই, গতবারে আপনি বলেছিলেন, কিশোর বয়স হতেই ভগবান শুকদেবেশ্বরের পূজায় রত আছেন। শুকদেব, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নিরন্তর বিদ্যামানতা সম্বন্ধে যে সব কথা শোনা যায়, সে সম্বন্ধে আপনার কি কোন প্রত্যক্ষ অনুভব আছে ?

তাঁকে আর জবাব দিতে হল না। তার পূর্বেই মন্দির থেকে কেউ যেন বলে উঠল – হাঁা হাঁা, যে কেউ কায়মনোবাক্যে এখানে শিবগতপ্রাণ হয়ে পড়ে থাকলে শুকদেব এবং মহাদেবের সহজেই দর্শন লাভ করতে পারবেন, এ কথা ধ্রুব সত্য।

আমরা সকলেই চমকে উঠলাম। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আমাদের চোখ মুখে বিহ্বলতা লক্ষ্য করে পুরোহিতজী বললেন – আপনারা ঘাবড়াবেন না। আপনারা পরশু এখান থেকে চলে যাবার পরেই একজন নাঙ্গা অবধূত এখানে এসে পৌছেছেন, তিনি মন্দিরের পিছনেই একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যেই আসন পেতেছেন। এই প্রচণ্ড শীতেও তাঁর আপাদমস্তক নগ্ন। তিনি থেকে থেকেই মহাদেবের অষ্টমূর্তির প্রণাম মন্ত্র আওড়ান। এই বলে তিনি মন্দিরের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে বললেন, 'ভগবন ! আপনি বাইরে বেরিয়ে এসে এঁদেরকে দর্শন দিন।' তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই মহাত্মা মন্দিরের ভিতর থেকে বাইরের চাথালে এসে দাঁড়ালেন। প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, দীর্ঘদেহী মহাত্মার সর্বাঙ্গে কোথাও কোন গাত্রাবরণ নাই। অস্ফুট কণ্ঠে বলে চলেছেন – 'রেবা রেবা রেবা'। পুরোহিতজী বললেন – ইনি শূলপাণীশ্বর মহাদেবের স্থানে যেতে চান। পথ ঘাট এঁর নখদর্পণে। চোখে ভাল দেখতে পান না, তাই একদল সাথীর সঙ্গে যেতে চান। আপনারাও তো শূলভেদ তীর্থে যাবেন। এঁকে সঙ্গে নিলে পথের বিভ্রাট ঘটবে না। ইনিও আপনাদের কারও না কারও হাত ধরে নিরাপদে সেই মহাতীর্থে যেতে পারবেন। সঙ্গে সঙ্গে হরানন্দজী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন – না, না, আমরা কাউকে সঙ্গে নিতে পারব না। পথের ভুল হলেও ভুলের জন্য এইরকম পথে ঘুরপাক খেতে হলেও আমরা কোন কানা খোঁড়ার দায়িত্ব নিতে পারব না। এই বলে নিজের ঝোলা গাঁঠরী তুলে নিয়ে পুরোহিতজীকে বললেন – আমরা আগের বারে মন্দিরের তৃতীয় অংশের যে হলঘরে ছিলাম, আমরা সেই ঘরেই তাহলে আসন পাতছি ?

– জরুর, ইয়ে আপকা হি আস্তান হৈ। এই বলে পুরোহিতজী আরতির জন্য মন্দিরের মধ্যে ঢুকলেন। আমরা তাঁর পিছনে পিছনে গিয়ে হরানন্দজীর ইঙ্গিত হলঘরে গিয়ে যে যার ঝোলা গাঁঠরী রেখে, মহাদেবের সামনে এসে দাঁড়ালাম আরতি দেখতে। মন্দিরের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে বড় বড় মোমবাতি জ্বলছে। শুনলাম, এ সবই নাদোদের রাজার ব্যবস্থা। তাঁর রাজ এস্টেট থেকে সদাবর্ত এবং এই সবের খরচা বহন করা হয়। এ জন্য ৭ জন বেতনভুক কর্মচারীও আছে। পুরোহিতজী আচমনাদি সেরে আরতি সুরু করলেন। তিনি পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাতেই তাঁকে আর কোন স্তব বন্দনা করতে হল না, সেই নাঙ্গা অবধূত গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করতে লাগলেন – ওঁ সর্বায় ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ ঈশানায়

সূর্যমূর্তয়ে নমঃ। মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে, কখনও অর্ধনত মস্তকে প্রণামের মুদ্রাও দেখাতে লাগলেন। আমি মহাদেব এবং তাঁর আরতি দেখার পরিবর্তে নাঙ্গা সাধুর নাচ বা প্রণামের মুদ্রাই নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। আমার মনে তখনও জেগেছে – মহাত্মা প্রলয়দাসজীর শ্রীমূর্তিটি। ইনি তিনি নন ত। সেই রকমই দীর্ঘদেহী, সেই রকমই চোখের ভঙ্গী। সেই রকমই চোখে দোষ আছে বলছেন। হতে পারে, মহাত্মা প্রলয়দাসজী ত যে কোন মূর্তিই পরিগ্রহ করতে পারেন। এই কথা মনে উদয় হওয়া মাত্রই আমার গা থরথর করে কাঁপতে সুরু করেছে। ঘন্টা ডম্বরু এবং মৃদঙ্গের বাজনা শেষ হতেই আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণামের অজুহাতে শুয়ে পড়লাম মেঝেতে। আরতি শেষ হতেই সেই নাঙ্গা অবধূতকে আর দেখতে পেলাম না। তিনি তাঁর নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে চলে গেছেন। সেখান থেকে তিনি বলে চলেছেন, আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি – ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূত, চন্দ্র, সূর্য ও যজমান – শিবের অষ্ট মূর্তি। মায়াযুক্ত জীব হল পশু, যজমান যার প্রতীক। তার পতি পশুপতি – তিনিই পাশ ছেদন করে যজমানকে উদ্ধার করে থাকেন। সেই জন্য পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ।

পুরোহিত এবং মন্দিরের বাদকের দল চলে যেতেই আমরা আমাদের নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে মোমবাতির আলোতে যে যার মনোমত জায়গায় আসন শয্যা পেতে নিলাম। বাসবানন্দজীকে খোঁচা মেরে হরানন্দজী মন্তব্য করলেন – কি হে দোস্ত! সামনা সামনি দাঁড়িয়ে তো নাঙ্গা সাধুর কণ্ঠস্বর শুনলে। একই কণ্ঠস্বর কি না। অথচ তোমরা তো মনে করলে দৈববাণী শুনছ, ভক্তদের এই ভাব গদগদানি অবস্থার জন্যই ধর্মরাজ্যে ভণ্ডামি প্রশ্রয় পেয়েছে, সেই রন্ধ্রপথেই এত অলৌকিকত্বের গল্প দানা বেঁধে উঠতে পেরেছে। মনে হয়, বেটা ventroloquism জানে। কৌশল করে তীর্থপথে আমাদের ঘাড়ে চাপতে চায়।

– তুমি ক্ষেপেছ নাকি ? আমরা কিছুতেই ও বেটাকে সঙ্গে নেব না। কানা আবার পথ দেখাবে কি ? কামরূপ মঠের দণ্ডীকে এভাবে ধোঁকা দেওয়া যায় না, এক সঙ্গে বলে উঠলেন বাসবানন্দজী এবং হিরন্ময়ানন্দজী।

এইবার শুরু হল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা নিয়ে হা হা হু হু। ঘরের দুদিকে দুটো জানালা। কিন্তু কোনটাতেই দরজা নাই, হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে, নর্মদার দিক থেকে। যার কাছে যা ছিল, কম্বল সোয়েটার সব চাপিয়েও সবাই কাঁপতে লাগলাম। হরানন্দজী বললেন – শীত কালকের মতই, কিছুমাত্র কম নয়। এই জবর ঠাণ্ডাই পাহাড় পর্বতবাসী সাধুদেরকে গঞ্জিকাসেবী হতে বাধ্য করে। গত তিন চারদিনের মধ্যেই ঠাণ্ডার প্রকোপে আমার হাত পা ফেটে গেছে। শূলপাণিতে যখন পৌঁছাবো তখন হয়ত পা ফেটে রক্ত ঝরবে।

হরানন্দজীকে দেখছি তিনিই যেন শীতে বড় বেশী কাবু হয়ে পড়েছেন। রঞ্জনকে ঠেলা দিয়ে বললেন – ভায়া, কালকের মত মনমাতানো গান আজও একটা কষ্ট করে গাও, গান শুনতে শুনতে যদি ঘুম এসে যায়, তাহলে বাঁচি।

রঞ্জন কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে গান সুরু করল –

একলা ফেলে রেখো না প্রিয়তম
তুমি জাগো – তুমি জাগো
আঁধার মানস মন্দির মোর
তুমি জাগো – তুমি জাগো।
নিশিদিন মরি ঘুরে
তোমা হতে দূরে দূরে
ব্যথা ভরা হৃদি পুরে
তুমি জাগো – তুমি জাগো।

গান শেষ হল, সকলেই শুয়ে শুয়ে নিদ্রার সাধনা করছেন। অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্য কেউ ঘুমাতে পারছেন না। হরানন্দজী উহুঁ কুঁ কুঁ করতে করতে বলে উঠলেন – শীতে দাঁত কপাটি লেগে যাচ্ছে। একটু বুদ্ধি করে ব্রহ্মচারীদেরকে দিয়ে কিছু কাঠ কুড়িয়ে এখানে আগুন জ্বালাতে পারলে ঘর গরম হত। কাল যদি এখানে থাকতে হয়, এই ঘরে আগুন জ্বালবই। শীতে দাঁত কপাটি লেগে যাচ্ছে। মোমবাতিটা নিভু নিভু হয়ে আসছে দেখে, আমি তাড়াতাড়ি ঝোলা হাতড়ে কিঞ্চিৎ শঙ্খিয়া মুখে ঢাললাম, হরানন্দজীকেও হাঁ করতে বললাম। তাঁর মুখে দিতেই তিনি বলে উঠলেন – এই পরমাণু পরিমাণ কি জিনিষটা মুখে দিলেন ? এ কি কোনও হোমিওপ্যাথিক পাওডার ? স্বাদ কিন্তু মিষ্টি নয়, মুখে দিতেই মিলিয়ে গেল। বললাম– চুপ করে ঘুড়ঘাড় হয়ে শুয়ে থাকুন। কিছুক্ষণ পরেই ঐ পরমাণু পরিমাণ জিনিষের প্রভাব অনুভব করতে পারবেন। তিনি কমণ্ডলু হতে কিঞ্চিৎ জল মুখে ঢেলেই শুয়ে পড়লেন। অল্পক্ষণ পরেই তাঁর নাক ডাকতে লাগল। আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম। অঘোরে ঘুমিয়ে ছিলাম, হঠাৎ আমাকে ঠেলা মেরে বললেন, আপনার পরমাণু-পরিমাণ সেই কিঞ্চিৎ দ্রব্যের কি প্রভাব রে ভাই, আমার আর এখন শীতই লাগছে না। কি জিনিষ ভাই, নামটা বলুন।

– সকালে কোন এক সময় একান্তে বলব'খন, এখন ঘুমাতে দেন। এখনকার বৈজ্ঞানিকরা এবং পূর্বকালের কোন কোন ঋষি কি সাধে বলেছেন– পরমাণু অনন্তবীর্য, অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ! নাগাসিকি হিরোসিমাতে এই পরমাণুর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আমেরিকা দুর্ধর্ষ শক্তি সম্পন্ন জাপানকে কাবু করে দিল ! গত মহাযুদ্ধের সময় সেই সব বিবরণ তো কাগজে নিশ্চয়ই পড়েছেন।

আমাদের এই পরমাণু বিষয়ক কথা বলতে বলতে দুচারবার যে পরমাণু শব্দ উচ্চারণ করলাম, তার জের শেষ হতে না হতেই আমরা শুকেশ্বর মন্দিরের দিকে হতে সেই নাগা অবধূতের কথা শুনতে পেলাম। তিনি সশব্দে বলে চলেছেন– পরমাণুর পাশ্চাত্ত্য নাম অ্যাটম্ (Atom)। অ্যাটম্ একটি গ্রীক শব্দ – A-tom , যাকে টম্ বা ছেদ করা যায় না (a = not and temion = to cut) অর্থাৎ 'a particle of matter so small that it cannot be cut or divided'। প্রাচীনকালে গ্রীক দার্শনিকদের ধারণা ছিল যে, বস্তুর বিশ্লেষ বা tom করতে করতে চরমে এমন একটি সূক্ষ্ম অবয়বে উপনীত হওয়া যায়, যে অবয়ব আর বিশ্লেষ্য, বিচ্ছেদ্য ও বিভাজ্য নয়, সেই বস্তুই Atom। এক কথায় An Atom is the minutest part in which matter is divisible — জড়ের যে ক্ষুদ্রতম অবয়ব, তাই Atom। গ্রীক দার্শনিকরা বলতেন ঐ অ্যাটম নিত্য – তার ক্ষয় ব্যয় নাই। এ ধারণা আমাদের দেশের ন্যায় বৈশেষিকের সিদ্ধান্তের অনুরূপ। মহর্ষি গৌতমের সূত্রে আছে– ন, অণুনিত্যত্বাৎ। অর্থাৎ পরমাণু নিরবয়ব ও নিত্য। পৃথিবী আদি চতুর্ভূতের যা সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম অংশ – যে সূক্ষ্ম অংশের উৎপত্তি বিনাশ, বিকার পরিণাম নাই, তাই হল কণাদ ও গৌতম সম্মত পরমাণু, তার ক্ষয় ব্যয় নাই, তা নিত্য। প্রত্যেক সাবয়ব দ্রব্য, তা সে দ্রব্য পর্বতের মত বৃহৎই হোক কিংবা সরষের দানার মত ক্ষুদ্রই হোক – তার অবয়ব পরম্পরার বিভাগ করতে করতে এমন কোন সূক্ষ্ম অংশে ঐ বিভাগের বিশ্রাম হয়, যার আর বিভাগ বা অংশ হয় না, সেই অতি ক্ষুদ্র অংশই পরমাণু। বাৎসায়নের মতে ঐ চরম বিভাগ নিরাশ্রয় নয় অলীক নয়– বিভাগস্য বিভাজ্যমানহানির্নোপদ্যতে। যে দুটি দ্রব্য ঐ চরম বিভাগের আধার বা আশ্রয় তাকেই পরমাণু বলা যায়। ন্যাংটা সাধুর কণ্ঠস্বর নীরব হল। হরানন্দজী মৃদু কণ্ঠে মন্তব্য করলেন, বেটা ventriloquism* ই শুধু জানে না, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাতেও সুপণ্ডিত। সে যাই হোক, আপনি আমাকে যা খেতে দিয়েছিলেন, যার ফলে আর শীত লাগছে না। নামটা কি বলুন না ভাই !

* Ventriloquism — কথা বলার যে কৌশলে মনে হয় বক্তা যেন তার প্রকৃত অবস্থান ছাড়া অন্যত্র হতে কথা বলছে বা অন্য কোন বক্তা কথা বলছে। কথা বলার এই technique যিনি জানেন, তাঁকে Ventriloquist বলা হয়।

তাঁর পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, ওর নাম শঙ্খিয়া ভস্ম, এক কথায় সেঁকো বিষ। সাধু সন্ন্যাসীদের কেউ কেউ নানাবিধ রাসায়নিক ক্রিয়ায় সেঁকো সাপের প্রাণঘাতী বিষকে প্রাণপ্রদ রসায়নে পরিণত করতে পারেন। তারই তিল পরিমাণ মুখে ফেলে প্রচণ্ডতম শীতকেও কাবু করেন, ঐ শঙ্খিয়ার প্রভাবে ক্ষুধা তৃষ্ণার হাত থেকেও রক্ষা পান। হিমালয়ে বরফের রাজ্যে যে সাধুরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন, আমি অনেক অনুসন্ধান করে দেখেছি, তা কোন যোগবল নয়, তার মূলে আছে এই শঙ্খিয়া। উত্তরতট পরিক্রমা করার সময় এক মহাত্মা আমাকে দয়া করে এই শঙ্খিয়ার ভস্ম একটুখানি দিয়েছিলেন। তারই অবশেষ পড়েছিল। আপনাকে শীতে অত্যন্ত কাতর দেখে তিল পরিমাণ দিয়েছিলাম। আপনি সকলকে বলবেন না। যা আছে তাতে সকলের কুলাবেও না। আমার মনে হয়, ঐ উলঙ্গ মহাত্মার কাছে নিশ্চয়ই শঙ্খিয়া আছে, তা না হলে দেখছেন না, তাঁর কাছে একখানা কম্বলও নাই। আপনারা কেন যে ঐ বিদ্বান সাধুকে সঙ্গে নিতে চাচ্ছেন না, তা বুঝে উঠতে পারছি না। উনি আপনাদের কাছে কি দোষ করলেন। যদি ওঁর কাছ হতে শঙ্খিয়া সংগ্রহ করতে পারি, তাহলে ত আজ মোটে মাঘ মাসের সাত তারিখ, বাকি ২৩ দিনের মধ্যে আমরা শূলপাণির ঝাড়ি নিরুপদ্রবে পেরিয়ে যেতে পারব, কনকনে ঠাণ্ডার জ্বালা আর ভোগ করতে হবে না।

আমার কথা শুনে হরানন্দজী কতকটা নরম হলেন বলে মনে হল। বললেন, সকাল হোক, হিরণ্ময়ানন্দজী এবং বাসবানন্দজীর সঙ্গে কথা বলে দেখি।

চারদিকে গাছপালায় কাক কোকিলের ডাক শুনে বুঝলাম, চারদিক কুয়াশার জন্য অন্ধকারে ঢেকে থাকলেও সকাল হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে সকলেই জেগে উঠে যে যার অভীষ্ট দেবতার স্তুতি পাঠ করতে লাগলেন বিছানাতে বসে বসেই। ক্রমে সূর্যোদয়ের আভাস ফুটে উঠল। রঞ্জনের ঘড়িতে সাড়ে ছয়টা বাজতে আমরা সবাই যে যার আসন শয্যা গুটিয়ে পাহাড় হতে নেমে গেলাম প্রাতঃকৃত্য সারতে।

নর্মদাতে স্নান তর্পণাদি সেরে হরানন্দজী রণছোড়জীর মন্দির দেখিয়ে আনলেন। শুকেশ্বর মন্দিরে পৌঁছেই দেখি গুজরাট থেকে একদল যাত্রী এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে আছেন চারজন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ। পুরোহিতজী আমাদেরকে দেখেই বললেন— আজ ভী আপকো ইধারই রহনে হোগা। ইয়ে লোগনে চার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ লেকর আয়া, যজ্ঞ করেঙ্গে। নর্মদা তটমেঁ বৈদিক যজ্ঞ ক্যায়সা হোতা হৈ, মোকা যব মিল গয়া দেখ লিজিয়ে। আপকো সাথীয়োঁকা সাথ বাতচিৎ হো চুকা উনোনে আজ ঠারেঙ্গে হামারা সাথ ওয়াদা হো চুকা। আজ সদাবর্ত চালু হ্যায়, আপকো ক্ষুদ্ রসুই ভি করনে নেহি হোগা, কাঁহি ভিক্ষা ভি নেহি।

তাঁর কথায় বুঝা গেল, আমরা আজ এখানে থেকে যজ্ঞ দেখি এই বিষয়ে তাঁর প্রবল আগ্রহ। আমরা শুকেশ্বরের মাথায় জল ঢেলে এলাম। হিরণ্ময়ানন্দজী বাসবানন্দজী প্রেমানন্দ প্রভৃতি সকলের সঙ্গে মন্দিরের চত্বরে এসে দাঁড়ালাম। মুক্ত আকাশের তলে যজ্ঞকুণ্ড খুলে ৪ জন ব্রাহ্মণ যজ্ঞের আয়োজন করছেন। কি উদ্দেশ্য জানি না, গুজরাটের একজন শেঠজী এই যজ্ঞের আয়োজন কর্তা। বেলা ১০ টা নাগাদ যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নি প্রজ্বলন করা হল। তাঁরা ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মা অমৃতাৎ। এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে করতে কয়েকবার অগ্নিতে আহুতি দিলেন। নূতন যাত্রীর দল সহ মন্দিরের পরিচারকবর্গ, আমাদের ১৭ জন দণ্ডী সন্ন্যাসীও কেউ শঙ্খ, কেউ ডম্বরু প্রভৃতি বাজিয়ে হর হর বম্ বম্ ধ্বনি দিতে থাকলেন। নর্মদা তটে এই পাহাড়ের উপর কিছুক্ষণের মধ্যে অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেল। ঘৃতাহুতির ফলে সুগন্ধিতে ভরে গেল চারদিক। সহসা শেঠজী আমাদের দণ্ডী সন্ন্যাসীদের কাছে যুক্তকরে নিবেদন করলেন

বাদ্যভাণ্ড এবং হর হর বম্ বম্ ধ্বনি বন্ধ করতে । পরিবেশ শান্ত এবং স্থির হতেই যজ্ঞকারী বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ অতি সুললিত ছন্দে গমকে গমকে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন –

ওঁ জজ্ঞানঃ সপ্তমাতৃভিঃ র্মেধা মাশাসত শ্রিয়ে ।
অয়ং ধ্রুবো রয়ীণাঞ্চিকেতদা ॥ ১
ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ॥
ওঁ উত স্যা নো দিবা মতি রদিতি রুত্যাগমৎ ।
সা শন্তাতা ময়স্করদপ– স্রিধঃ ॥ ২
ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ॥

এই রকম বৈদিক যজ্ঞ এর আগেও আমি দেখেছি । সেই সব যজ্ঞে যে বিধি এবং ক্রম দেখেছি, এখানেও ব্রাহ্মণরা সেই বিধি এবং ক্রম অক্ষরে অক্ষরে মেনে যজ্ঞ করলেন । কিন্তু সেটা বড় কথা নয় । সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, এঁদের বেদমন্ত্র উচ্চারণের কৌশল । বেদের মন্ত্র শুনলাম না বেদের গান শুনলাম, এ কি সংস্কৃত মন্ত্র না কোন সংস্কৃত গান তা নির্ণয় করতে পারলাম না । পূর্ণাহুতির পর ব্রাহ্মণরা বসেই ছিলেন, আমি তাঁদের কাছে গিয়ে সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে মন্ত্রের উৎস এবং মন্ত্রার্থ জানতে চাইলাম । আমার আকুতি এবং আকুলতা দেখে, তাঁদের মধ্যে একজন আমার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য বলতে আরম্ভ করলেন – আমাদের উচ্চারিত মন্ত্রগুলি সামবেদের অন্তর্গত । সামবেদ সঙ্গীতমূলক । আজ আপনারা নর্মদা তটে এসে সামগান বা সামধ্বনি শুনলেন । আমাদের গীত বা উচ্চারিত প্রথম মন্ত্রটি আপ্ত্যত্রিত নামক ঋষি প্রাপ্ত হয়েছিলেন । ঐ মন্ত্রের ছন্দ উষ্ণিক । মন্ত্রের দেবতা পবমান সোম । মন্ত্রের অন্বয় শুনলেই মন্ত্রটি বুঝতে সুবিধা হবে । অস্য অন্বয়ঃ– ধ্রুবঃ অয়ং (অগ্নিঃ) রয়ীণাং আচিকেত্যৎ, (অয়ং) সপ্তমাতৃভিঃ জজ্ঞানঃ ; (সোঽগ্নি) মেধাং শ্রিয়ে আশাসত ।

অস্যার্থ – স্থির মূর্তি দেবদেব অগ্নি ধন সমূহ কি ভাবে রক্ষণ করতে হয়, তার সমস্ত অনুশাসন অবগত আছেন । ইনি অর্থাৎ অগ্নি যজ্ঞসম্পত্তি সমূহ দেবতাদের সঙ্গে উপভোগ করার জন্য যজ্ঞে কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, বিশ্বরুচী এই সাতটি লেলিহমান জিহ্বা সহ সমুদ্ভূত হয়েছেন । ইনি এখন কর্ম সম্পাদক সোম উপভোগ করার জন্য আমাদেরকে অনুজ্ঞা করছেন ।

আমাদের গীত দ্বিতীয় সাম মন্ত্রটির অন্বয় হল– উত স্যা মতিঃ অদিতিঃ উত্যা দিবা নঃ অগমৎ (আগত্য চ) সা শন্ততো ময়ঃ করৎ, স্রিধঃ অপ অর্থাৎ অপগময়ৎ । তাহলে অর্থ দাঁড়াল – অপি চ সেই স্তুত্য অদিতি রূপী দেবতা দিবারাত্রি সর্বদাই আমাদেরকে সর্বতোভাবে রক্ষা করতে প্রবৃত্ত থাকুন এবং শান্তি সুখ প্রদান করুন ।

পণ্ডিতজীর ব্যাখ্যা শেষ হলে আমি প্রশ্ন করলাম, প্রথম মন্ত্রে সপ্তমাতৃভিঃ বলতে লোক প্রসিদ্ধ সপ্তমাতৃকা, যথা গর্ভধারিনী, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী, গাভী, ধাত্রী এবং পৃথ্বীকে না বুঝিয়ে সপ্তজিহ্বাকে বুঝাচ্ছে, এ আপনি কোন্ যুক্তিতে বলছেন ?

– পণ্ডিতজী উত্তর দিলেন, শাস্ত্র প্রমাণের জোরেই আমি একথা বলতে পারছি । উপনিষদে যজ্ঞাগ্নির সপ্তজিহ্বা বা লেলিহমান সপ্তশিখার কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে – কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা চাথ সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ ।

অপর একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত আমার দিকে তাকিয়ে বললেন – প্রসঙ্গতঃ তোমাকে বলে রাখি, মন্ত্রের ঐ 'কালী' শব্দটি তোমাদের বাংলাদেশে মহাবিভ্রাট ঘটিয়েছে । আমি ২৫ বছর কোলকাতাতে বড়বাজারে কাটিয়ে এসেছি । আমি জানি বাংলাদেশ তন্ত্রের দেশ । তান্ত্রিকরা মন্ত্রটির কালী শব্দটিকে বৈদিক প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন । তান্ত্রিকরা কালীর উলঙ্গ খড়গধারিণী, নরমালাবিভূষণা, অতিবিস্তার বদনা জিহ্বা ললনা ভীষণা এক দেবী ।

কল্পনা করে কালীর হাজার হাজার স্তব স্তোত্র পূজার মন্ত্র অনেক বীভৎস গুহ্য ক্রিয়াকলাপের আবিষ্কার করেছে। বাংলাদেশের সর্বত্র ঐ কালীর দাপটই বেশী। তোমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সাধক রূপে মান্য হয়েছেন রামপ্রসাদ রামকৃষ্ণ প্রভৃতি কালী সাধকরা। বাংলাদেশে বেদের চর্চা খুবই কম। ফলে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত অনেক তর্কতীর্থ ন্যায়ালঙ্কাররাও কালীপূজাকে তাঁদের শেষ আধ্যাত্মিক সম্পদ রূপে গ্রহণ করেছেন। এর চেয়ে Spiritual bankrapsy আর কি হতে পারে। বাঙ্গালী খুবই প্রতিভাধর জাত, ভারতবরেণ্য বহু মনীষীই বাংলাদেশে জন্মেছেন কিন্তু তাঁরা বৈদিক ঋষিদের ধ্যান ধারণা এবং আধ্যাত্মিক সাধনার রহস্য মোটেই জানেন না বলেই মনে করি।

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই সদাবর্তের খাবার ঘণ্টা পড়ল। চারজন ব্রহ্মচারী ও ১৩ জন দণ্ডী সন্ন্যাসী সহ ৪ জন যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক পংক্তিতে আমি এবং রঞ্জনও বসলাম। অন্য পংক্তিতে বসলেন শেঠজীর সঙ্গী নারী পুরুষ সকলেই। সেই উলঙ্গ মহাত্মাকে ধারে কাছে কোথাও দেখতে পেলাম না। তাঁর কথা হরানন্দজী পুরোহিতমশায়কে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন – গত তিন দিন যাবৎ ওঁকে কোন কিছুই গ্রহণ করতে দেখছি না। দণ্ডী সন্ন্যাসীরা 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে সদাবর্তের রুটি ডাল গ্রহণ করলেন। খাওয়া শেষ হতেই দণ্ডীদের রীতি অনুসারে নর্মদায় গেলেন হাত মুখ ও কৌপীন ধুয়ে নিতে। আমি ও রঞ্জনও তাদের সঙ্গে গেলাম। আমাকে দেখেই বাসবানন্দজী বলতে লাগলেন – বিদেশে আমরা আমাদের আচরিত নিয়ম কানন কিঞ্চিৎ শিথিল করতে বাধ্য হয়েছি। দণ্ডীদের ভিক্ষান্ন ভোজনই নিয়ম। পরিক্রমাবাসীদের পক্ষেও একই নিয়ম ভিক্ষা করে খাওয়া কিম্বা স্বপাক আহার করা। এইজন্য প্রত্যেক পরিক্রমাবাসীকে তাঁর ঝুলিতে কিছু না কিছু গম বা বজরার আটা রেখে দিতে হয়। আপনি কাশীতে গেলে আমাদের গুরুজীর জীবনচর্যা দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হবে। রাত্রি তিনটা বাজলেই তিনি নারায়ণ নারায়ণ বা শিবম্ শিবম্ বলতে বলতে গঙ্গার ঘাটে যান। স্নান করে এসেই যান বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢালতে। রাত্রি ৪ টার মধ্যেই মঠে ঢুকে সেই যে তাঁর সাধন প্রকোষ্ঠে ঢোকেন, আর তিনি বেরোন না। মঠের নিচের তলায় শিবমন্দির, দিনে রাত্রিতে মঠের দরজা কখনও বন্ধ হয় না। সকাল থেকে ভক্তরা আসেন। মন্দিরের মহাদেবকে প্রণাম করে কিছু না কিছু খাবার রেখে যান। ভোরেই হয়ত কেউ দিয়ে গেছেন একটি শঁশা, কেউ হয়ত রুটি, কেউ হয়ত লুচি পুরী, কেউ হয়ত ছানা পোলাও বা কোন সুস্বাদু ফলমূল। প্রথম যে দ্রব্য মন্দিরে অর্পিত হল, সেটিতে আর কোন দণ্ডী সন্ন্যাসী ভুলেও তা স্পর্শ করবে না। সেটি রাখা হয় গুরুজীর জন্য। সন্ধ্যা হওয়া মাত্রই তিনি 'নারায়ণ নারায়ণ ' বলতে বলতে নিচে নেমে সেই প্রথম অর্পিত দ্রব্য ধরা যাক্ সেটি শঁশা, তাই হাতে নিয়ে তিনি চলে গেলেন গঙ্গায়। গঙ্গায় ডুব দিয়ে তিনি সেই শঁশাটি পাথর দিয়ে থেঁতো করে, রুটি হলে তা টুকরো টুকরো করে জলে বোর ডুবিয়ে উঠিয়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে বলেন – প্রভো, কলিতে অনুগত প্রাণ, এক গ্রাস মুখে না দিলে শরীর থাকবে না, শরীর না থাকলে তোমাকে ডাকবো কি করে দয়াল, তুমি এই খাদ্যের দাতা যিনি তাঁর মঙ্গল কর। এই বলে কিঞ্চিৎ সেই দলা পাকানো খাদ্য মুখে ফেলে আর একবার গঙ্গায় ডুব দিয়ে মঠে ফিরে আসেন।

এইভাবে নর্মদার ধারে গল্পগুজব করে রোদ পুইয়ে যখন শুকেশ্বর মন্দিরে ফিরে এলাম, তখন বেলা ৪টা বেজে গেছে। কিছু পরেই পুরোহিতজী এলেন আরতি করতে। আমরা এসে যজ্ঞকারী যাত্রীর দলকে দেখতে পেলাম না। পুরোহিতজী বললেন – তাঁরা চলে গেছেন অনেকক্ষণ।

প্রাচীন মন্দির হৈ। য়হাঁ পর বাসুকী নাগ তপস্যা কর শ্রী নাগেশ্বর মহাদেবকী স্থাপনা কী থী। নাগেশ্বর মহাদেবকা মন্দিরকা পাশ শ্রী নর্মদাজী মেঁ রুদ্রকুণ্ড হৈ। মিনিট দশেক হেঁটেই আমরা নাগেশ্বর মহাদেবের কাছে পৌছে গেলাম। কোথা থেকে জানি না, একটা ছোট নদী ঝিরঝির করে বয়ে এসে নর্মদার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। অদূরেই রুদ্রকুণ্ড। নাগেশ্বর মহাদেবের মন্দির যে অতি প্রাচীন, তা দেখলেই বুঝা যায়। মন্দিরের মুখ নর্মদার দিকে। পাথরে হোঁচট খেতে খেতে মন্দিরের পেছন দিক হতে মন্দিরের সামনে গিয়ে দেখি, যাঁকে শুকদেবেশ্বর মন্দিরে একা ফেলে রেখে আমরা চলে এসেছিলাম, হিরন্ময়ানন্দজীর সেই নিষিদ্ধ ব্যক্তিটি, অর্থাৎ সেই উলঙ্গ সাধু মন্দিরের শেওলা পড়া সিঁড়ির উপর বসে আছেন। তাঁকে দেখে আমরা খুবই অবাক হলাম। তাঁর সঙ্গে কেউ কথা বললেন না কিন্তু আমি, হরানন্দজী এবং রঞ্জন নমো নারায়ণায় বলে নমস্কার জানালাম। এই শেওলা ধরা অতি প্রাচীন মন্দিরের দরজা কবেই জীর্ণ হয়ে ক্ষয়ে গেছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মহাদেবকে দেখে চমকে উঠলাম। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় একটা সাপই খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সর্বাঙ্গে সাপের পেটের দিকে যেমন সাদা সাদা ডোরা টানা থাকে, সমস্ত শিবলিঙ্গটাই তেমনি। এতদিন নর্মদা তটে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সর্পবর্ণ সর্পাকৃতি শিবলিঙ্গ আর কোথাও দেখিনি। আমরা কেউ এখনও স্নান করি নি বলে শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢেলে পূজা করলাম না। সবাই মন্দিরের দরজার সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে চলতে লাগলাম। নাঙ্গা সাধু হরানন্দজীকে ডেকে বললেন – হিঁয়াসে তিন মিল যানেসে নলখৈড়ী ইয়া নলবাড়ী গ্রাম পড়ে গা। নলখেড়ীসে ঔর তিন মিল যানে সে পোয়চা ইয়া পৈচা গ্রাম মেঁ পহুঁচ যাবেগী। হরানন্দজী তাঁকে পুনরায় সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আমাদের সঙ্গে নলখেড়ীর উদ্দেশ্যে হাঁটতে লাগলেন। পথ ভয়ানক দুর্গম। পথে শুধু পাথর আর পাথর। সেই সব ছোট বড় পাথর এমনভাবে রাস্তায় পড়ে আছে যে, ইচ্ছা করলেও কারও পক্ষে দ্রুত হাঁটা সম্ভব হচ্ছে না। পাথরের উপর পা দিলে তা হড়কে গড়িয়ে যাচ্ছে। বেলা সাড়ে আটটায় রোদ খুব মিষ্টি লাগছে, আমাদের চারপাশের গাছপালাতেও সবুজের সমারোহ। কিন্তু ক্রমাগত পা পিছলে পিছলে যাওয়ায় আমরা কেউ বেশী পথ পেরোতে পারলাম না। শেষকালে এমন একস্থানে এলাম যে, শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে লাগলাম। এইসময় দণ্ডী সন্ন্যাসীদের একজন বললেন – 'যখন চলি চলি ধীরি ধীরি হাঁটি হাঁটি পা পা করে – এইভাবে হাঁটতে হবে, তখন গল্প করতে করতে হাঁটা যাক, তাহলে পথের ক্লান্তি অনেক কম হবে।' এইমাত্র রুণ্ড গ্রামে যে প্রাচীন নাগেশ্বর মন্দির দেখে এলাম যাকে বাসুকীর তপস্যা ক্ষেত্র বলে শুনে এলাম, সেই বাসুকী সম্বন্ধে কারও কিছু জানা থাকলে বলুন, আমরা গল্প শুনতে শুনতে যাই। হিরন্ময়ানন্দজী বললেন – বাসুকী নাগজাতি কা রাজা থা। পুরাণ মেঁ উনকা বহুৎ বর্ণনা হৈ। হরানন্দজী বললেন – কোন পুরাণ মেঁ বাসুকীজী কা কথা হৈ, বাতাইয়ে ত ? প্রথম থেকেই দেখছি, হিরন্ময়ানন্দজীর সঙ্গে হরানন্দজীর খিটিমিটি লেগেই আছে। এই দুর্গম পথে সেই দ্বন্দ্ব আবার বেড়ে না যায়, তাই আমিই বললাম, রামায়ণেই ত আছে, নাগরাজ বাসুকী দক্ষকন্যা কদ্রুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁর পিতা ছিলেন মহর্ষি কশ্যপ। বাসুকী, শেষনাগ ও অনন্তনাগ নামেও অভিহিত। দেবতারা সমুদ্র মন্থনকালে বাসুকীকে মন্থনরজ্জু রূপে ব্যবহার করেছিলেন। একবার কদ্রূণ বিনতার সঙ্গে ইন্দ্রের বাহন উচ্চৈঃশ্রবার গায়ের রং কি, এই নিয়ে তর্ক করেন। বিনতা বলেন সাদা, আর কদ্রু বলেন কাল। যিনি হারবেন, তাঁকে অপরের কাছে দাসীবৃত্তি করতে হবে। এই পণ নিয়ে তাঁদের মধ্যে ঘোর বিতর্কের পর, কদ্রু কশ্যপের কাছে উচ্চৈঃশ্রবার প্রকৃত বর্ণ সাদা জানতে পেরে পরাজয়ের গ্লানি এড়াবার জন্য নিজের নাগ পুত্রগণকে বলেন, উচ্চৈঃশ্রবার অঙ্গবর্ণ ঢেকে দিতে। বাসুকী প্রভৃতি কয়েকজন

মায়ের এই কপটাচারকে সমর্থন করতে পারলেন না। মায়ের অভিশাপ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাসুকী হয়ত সেই সময় নর্মদাতটের রুণ্ড গ্রামে তপস্যা করেছিলেন। আমাদের প্রাচীন ভারতে তপস্যাকেই সকল আপদবিপদের Remedy ভাবা হত – তপস্যা সর্বমাপ্নোতি তপো হি দুরতিক্রমঃ।

গল্প শেষ হতে না হতেই আমরা সেই প্রস্তরাকীর্ণ গড়ানে পথ অতিক্রম করে অপেক্ষাকৃত ভালো পথের সন্ধান পেলাম। আমাদের প্রত্যেকের পায়ের নখ কিছু না কিছু ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে। রক্ত ঝরছে। বাসবানন্দজীর কাছে একটা আয়োডিনের শিশি ছিল, তিনি তুলা ভিজিয়ে ক্ষতস্থানে দিয়ে নেকড়া দিয়ে বেঁধে দিলেন প্রত্যেকের পায়ের আঙুল। আমরা প্রত্যেকেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই হাঁটিতে লাগলাম। সেই সময় কেউ আমাদেরকে দেখলে একদল কুষ্ঠ রোগী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারত না। অতিকষ্টে আমরা নলখেড়ীতে এসে পৌছলাম। বাসবানন্দজী আমাদেরকে জানালেন– এই তীর্থ বানর জাতির শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনীয়ার নলের তপস্যাক্ষেত্র। এঁরই অধ্যক্ষতায় রামচন্দ্র সমুদ্র বন্ধন করতে পেরেছিলেন অর্থাৎ রামচন্দ্র সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করে বানর কটককে লঙ্কায় নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। আমরা হাত জোড় করে এই তীর্থকে প্রণাম করে আবার জঙ্গল পথে হাঁটিতে লাগলাম।

হাঁটা মানে ক্ষত বিক্ষত পটি বাঁধা আঙুল নিয়ে কি হাঁটার মত হাঁটা যায়? লাঠির উপর ভর দিয়ে কোন মতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোচ্ছি। নর্মদার উজান পথে যেমন হাঁটছি তেমনি পথেও পাহাড়ী ঢাল বেয়ে মনে হল যেন জঙ্গলের মধ্যেও উজান বাইছি। দু পাশের গাছপালা যেন আরও ঘন হয়ে আসছে। এতক্ষণ রোদের মধ্যে ছিলাম, এখন আকাশে সূর্যের তেজ প্রখরতর হলেও বনে ঢাকা পথ বড্ড ছায়াশীতল বলে মনে হতে লাগল। এমন ভাবে ক্রমে গাছপালায় ঢাকা হয়ে গেলাম যে আমাদের সকলের মনেই ভয়ের সঞ্চার হল, ভয় জন্তু জানোয়ারের। এই ছায়া ঘেরা জঙ্গলে যে কোন দিক দিয়ে কোন হিংস্র জন্তু আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। জঙ্গলের বাঘের চেয়ে মনের বাঘ আরও ভয়ংকর। জঙ্গলের বাঘ ঝাঁপিয়ে তার প্রকাণ্ড থ্যাবার ঝাপ্টায় ঘাড় মটকায়, কিন্তু মনের বাঘ নিঃশব্দে শরীরের সমস্ত স্নায়ু শিথিল করে দিয়ে মানুষকে ধরাশায়ী করে। হিরন্ময়ানন্দজী ভীত কণ্ঠে উচ্চারণ করতে চাইলেন হর নর্মদে, কিন্তু তাঁর কণ্ঠ হতে বেরিয়ে এল হ-র মদে। বাসবানন্দজী তখন অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে বলতে লাগলেন– শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। জঙ্গলের মধ্যে সড়াৎ করে একটা শব্দ হতেই চমকে উঠে হিরন্ময়ানন্দজী টলে পড়লেন। তাঁর পাশেই ছিলেন প্রেমানন্দ। তিনি হিরন্ময়ানন্দজীকে কোন মতে জড়িয়ে ধরতেই তিনি কেঁদে উঠে শের শে-র-র বলতে বলতেই প্রেমানন্দের জামার মধ্যে মুখ লুকালেন। আমরা সবাই কি ঘটল বুঝতে না পেরে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়িয়ে পড়লাম। এই দুর্দৈবের মধ্যেও হরানন্দজী চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই ঝাঁঝিয়ে উঠলেন – গুরুদেব ভাল লোকটিকেই আমাদের নেতা করে পাঠিয়েছেন। আপনার ত দেখছি মশাই টুটু পাখীর জান। জোরে হাত তালি দিলেই মারা পড়বেন। এর পরে প্রকৃত শূলপাণির ঝাড়িতে ঢুকলে ত আপনি ভয়েই মারা যাবেন, আপনার হার্টফেল করবে। নিজে ভাল করে পথ ঘাট চেনেন না। ফালতু দেমাক আছে শুধু। সেই নাঙ্গা সাধুটাকে সঙ্গে আনলে আমরা নির্বিঘ্নে যেতে পারতাম।

আমি হরানন্দজীর হাত দুটো চেপে ধরে অনুরোধ করলাম, কি হবে বুড়ো মানুষকে বকে। নর্মদাতটে মেজাজ হারান ভাল নয়। বকলেন বটে আবার নিজেই হিরন্ময়ানন্দজীকে নিজের কমণ্ডলু হতে কতকটা জল খাইয়ে নিজেরই খোঁড়া পা সত্ত্বেও তাঁর হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চললেন। প্রায় একঘণ্টা এইভাবে ঘোর জঙ্গল পথে হাঁটার পর আমরা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম। পথ কঙ্কর ও কণ্টকময় হলেও গাছপালা এখানে কম। মাথার উপর সূর্যকে এবং অদূরে নর্মদাকে দেখে সকলের মনে স্বস্তি ফিরে এল। কিছুদূরে একটি প্রাচীন

শিব মন্দির দেখতে পেয়ে হিরন্ময়ানন্দজী উচ্ছ্বাস ভরে বলে উঠলেন আভি হমারা স্মরণ মেঁ আতা হৈ, উহ হ্যায় পুতিকেশ্বর মহাদেবজীকে মন্দির। বায়ু পুরাণকা রেবাখন্ডমেঁ ১০৭ অধ্যায় মেঁ জিকর আয়া ইয়ে স্থান মেঁ শ্রীরামচন্দ্রজীকা অনুচর জাম্বুবান, সুষেণ ঔর নীল নে তপ কিয়া থা। যঁহা নিবাস করনে সে রোগ দূর হো জাতা হৈঁ। এহি গ্রাম কা নাম পৈচা পোয়চা ।। রাজপীপলা কা প্রসিদ্ধ নগর নাদোদ সে এহি পোয়চা তক পক্কী সড়ক ভী হৈ। আপলোগোঁনে সহমত হোগা ত আজ হম্‌লোগ ইধরই ঠারেঙ্গে।

রঞ্জন তার ঘড়ি দেখে বলল, বেলা পৌনে একটা বেজেছে। মিনিট পাঁচেক হেঁটে আমরা পুতিকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে পৌছে গেলাম। গিয়ে দেখি মন্দিরের দরজায় হেলান দিয়ে সেই ন্যাংটা সাধু বসে আছেন। তাঁর সামনে কতকগুলি ফল। গোটা পাঁচেক নারকেলও আছে। হিরন্ময়ানন্দজী ফলগুলোর নাম জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন ডোঁসা। দেখতে ঠিক পেয়ারার মত কিন্তু গায়ে গাবফলের মত অত্যন্ত নরম কাঁটা আছে। হিরন্ময়ানন্দজী আজ নিজে উপযাচক হয়ে ন্যাংটা সাধুর সঙ্গে কথা বললেন দেখে সকলেই খুব বিস্মিত হয়েছেন। আমার আর হরানন্দজীর মনে খুব আনন্দ হল। আমরা মন্দিরের গায়ে ঝোলা গাঁঠরী রেখে স্নান করতে নামলাম নর্মদায়। স্নান তর্পণাদি সেরে মন্দিরে এসে দেখি সেই ন্যাংটা সাধু মন্দিরের চাথালের উপর একটা ছোট পাথর দিয়ে জঙ্গল থেকে কতকগুলো লতাপাতা এনে থেঁতো করছেন। ৫ টা নারকেলও ছাড়িয়ে ভেঙ্গে ফেলেছেন। পুতিকেশ্বর মহাদেবের মাথায় জল ঢেলে পূজা ও প্রণাম করে বেরিয়ে আসতেই তিনি প্রত্যেকের হাতে নারকেল ও ডোঁসা দিলেন। ডোঁসা খুব মিষ্টি ফল। একটুখানি চিবালেই মুখ রসে ভরে যায়। স্নান করতে গিয়ে নর্মদার জলে আমাদের পায়ের ব্যান্ডেজ সব ভেসে গেছল। আমরা যখন ফলাহারে রত সে সময় ন্যাংটা সাধু সকলের পায়ে কারও বাধা না শুনে সেই থেঁতো করা লতাপাতার রস নিংড়ে নিংড়ে লাগিয়ে দিলেন। মন্তব্য করলেন – একঘণ্টা কী অন্দর মেঁ আপকা দরদ বিলকুল আরাম হো জাবেগা। আভি তিন বাজা। চার বাজে হিঁয়াসে যাত্রা করনেসে সিরিফ দো মিল দূর কটোরা গ্রাম মেঁ হনুমন্তেশ্বর মহাদেব কা মন্দির হ্যায়। উধর রহনেকে লিয়ে জাগা ভি হ্যায়। হরানন্দজী বললেন – আঙুলের ব্যথা যদি না থাকে, তাহলে দু মাইল রাস্তা হাঁটতে কতটুকু সময়ই বা লাগবে ? দুর্গম পথের যাত্রী আমরা যতটা এগোতে পারব, ততই ভাল।

গায়ে রোদ এসে পড়েছে। আমি উত্তরতটের দিকে তাকিয়ে আছি। ধীরে ধীরে স্মরণে এল, উত্তরতটের বাড়ী ঘর মন্দির এবং রেলের ধোঁয়া দেখে সোজাসুজি উত্তরতটকে চাঁদোদ শহর বলে চিনতে পারলাম। মনে পড়ল যে, উত্তরতট পরিক্রমার সময় আমি ওখানে চণ্ডাদিত্য, চণ্ডিকাদেবী, চক্রতীর্থ, কপিলেশ্বর, ঋণমুক্তেশ্বর, পিঙ্গলেশ্বর, নন্দাহ্রদ প্রভৃতি দেখে এসেছি। একথা হরানন্দজীকে চুপি চুপি বলতেই সেই ন্যাংটা সাধু বলে উঠলেন–উস পার মেঁ বেসক্ চাঁদোদ হৈ। বরোদা সে চাঁদোদ ডাভাই হোতে হুয়ে রেললাইন হ্যায়। চাঁদোদ রেলবে কা ষ্টেশন হৈ। হরানন্দজী তাঁকে বললেন– আপনার মুখে বাংলা ইংরাজী এবং শুদ্ধ হিন্দী শুনে বুঝেছি আপনি তিন ভাষাতেই সমান কৃতবিদ্য। আপনার পূর্বাশ্রমের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলে আমরা খুশী হব। আপনি কি নামে পরিচিত। আপনার নিবাস কোথায় ছিল ? আপনি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ? আপনাকে এত দিনের মধ্যে একবারও খেতে দেখি নি। সব কিছু একটু খোলসা করে বলবেন কি দয়া করে ?

– আপনারা তো দণ্ডী সন্ন্যাসী। আপনারা কি একথা জানেন না যে, সন্ন্যাসীর পক্ষে পূর্বাশ্রম স্মরণ করতে নাই ? অওঘড় যোগীর আবার নাম ধাম কি। যদি কোন নাম ধরে ডাকলে আপনাদের সুখ হয় তাহলে এই দেহটাকে অলখ্ নিরঞ্জন পুরুষের বান্দা গুরুদাস বলে অভিহিত করবেন। আর এই শরীরের কোন খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। উপরের দিকে তাকিয়ে তিনি ভাব গদগদ কণ্ঠে বলে উঠলেন–

দাদূ ইয়ে সব কিস্কে পন্থ মেঁ ধরতি অরু অস্মান,
পানি পবন দিন রাতকা চন্দ সূরয্ বহিমান।
ব্রহ্মা বিষন্ - মহেশকা, কৌন পন্থ গুরুদেব ?
সাঁই ! সিরজন হায় তু, কহিয়ে অলখ অভেব।

– হে দয়াল ! বল এই যে ধরিত্রী এবং আকাশ, এই যে জল বায়ু দিন রাত্রি, ঐ যে চন্দ্র সূর্য তোমার আদেশ মাথায় নিয়ে নিরন্তর সেবা করে চলেছে সকলের, এঁরা কোন্ সম্প্রদায়ী ? ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নামেই যদি বৈষ্ণব শৈব সৌর গাণপত্য ইত্যাদি বহু সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে বল গুরুদেব, এই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররা কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন ? তুমি প্রভু, স্রষ্টা তুমি, ভেদাতীত জ্ঞানাতীত, অলখ পুরুষ তুমি, তুমিই পারো এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে।

মহম্মদ কিসকে দীনমেঁ ? জব্রাইল কিস্ রাহ্ ?
ইনকে মুর্শীদ পীর কো ? কহিয়ে এক অলাহ্।
দাদূ যে সব কিসকে হবৈ রহে, যহু মেরে মন মাঁহি,
অলখ ইলাহি জগদ্গুরু, দূজা কোঙ্গ নাহিঁ।

হে আল্লা, তোমারই কাছে জানতে চাই– তুমি বল, মহম্মদ ছিলেন কোন্ ধর্মে ? জেব্রাইল ছিলেন কোন্ পথাবলম্বী ? এঁদের মুর্শীদ অর্থাৎ গুরু বা ইষ্টই বা কে ? দাদূর মনে প্রশ্ন – যাঁদের নাম নিয়ে এত দল-উপদল, মারামারি কলহ-কোলাহল, তাঁরা নিজেরা ছিলেন কোন্ দলভুক্ত, বুদ্ধ ত আর বৌদ্ধ ছিলেন না ? খ্রীষ্টও তো ছিলেন না খ্রীষ্টান ? মহম্মদও ইসলামী বা মহম্মদীয় ছিলেন না ! তাঁরা ছিলেন একই ভগবানের সেবক। দাদূ বলছেন– সেই অলখ ইলাহীই একমাত্র জগদ্গুরু– দ্বিতীয় আর কেউ নাই।

উলঙ্গ মহাত্মার কথা শেষ হতেই সবাই উচ্ছাস ভরে বলে উঠলেন – হর নর্মদে। হর নর্মদে !

কথা বলতে বলতে রঞ্জন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল – ৪ টা বেজে গেছে। সকলেই নিজেদের পায়ের আঙ্গুল টিপে টিপে দেখলাম, আঙ্গুলে বিন্দু মাত্র ব্যথা নাই। হিরন্ময়ানন্দজী বললেন– This is miracle। ভারতীয় লতাপাতাকী ক্যায়সা আশ্চর্য ভেষজ গুণ ! ন্যাংটা সাধুকে বললেন – গুরুদাস ভেইয়া, হমারা কসুর মাফ্ কিয়া জায়। আপ্ লে চলিয়ে যিধর আপকা মর্জি হ্যায়।

আমি এবং হরানন্দজী পরস্পর মুখ টিপে হাসাহাসি করলাম। ঝোলা গাঁঠরী তুলে নিয়ে ন্যাংটা সাধুর পিছনে পিছনে দ্রুত হাঁটিতে লাগলাম।

একই পাহাড়ী পথ, কিন্তু গড়ানে পাথর বা কাঁটা নাই, তাল খেজুর, কলা, ফলসা গাছ, অশ্বত্থ এবং বেল গাছের সারিবদ্ধ জঙ্গল ছাড়া এ পথে আর কিছু চোখে পড়ল না। সূর্য তখন পাটে বসেছেন, আমরা পৌঁছে গেলাম পৈচা থেকে কটোরা গ্রামের হনুমন্তেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে। নর্মদাতটের উপরেই উঁচু পাথরের ঢিপির মত একটা স্থানে এই মন্দির। মন্দিরের ডানদিকে একটি আম ও পিয়াশাল গাছকে জড়িয়ে আছে ১০/১২টা কলাগাছ। বামদিকে আছে একটি তাল, পেছনে পাথরের গাঁথুনির উপর টিনের পরচালা নামিয়ে দুখানা প্রশস্ত ঘর পরবর্তী কালে হয়ত মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। নাঙ্গা মহাত্মা বললেন – পাশের গ্রামের নাম কপিস্থিতাপুর। সেইখানেই পুরোহিত ঠাকুর থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আরতি করতে এসে পড়বেন। এ স্থান শূলপাণির ঝাড়ির উপান্তে হলেও হনুমন্তেশ্বরের প্রভাবে এখানে বাঘের ভয় নাই। পুরোহিতজীর সঙ্গে তিন চারজন ভক্ত অবশ্যই আসবেন।

এই সময় রঞ্জন হঠাৎ তাঁকে বলে বসল, এখানে যদি বাঘের ভয় না থাকে, সেটা হনুমন্তেশ্বরের প্রভাব নয়, বরং বলুন রামগতপ্রাণ মহাবীর হনুমানের তপঃশক্তির প্রভাবে ভক্তরা এখানে নিরাপদ। হিরন্ময়ানন্দজী বললেন — ইয়ে আপ্‌নে সচ্ বোলা। ভগবানসে ভক্ত কা প্রভাব জ্যাদা হোতাই হ্যায়। শিউজীকা প্রভাও সে এ্যায়সা হোতা থা, তো নর্মদা তট মেঁ কাহিঁ বাঘকা উপদ্রব হোনে নেহি সকতা। কেঁও কী নর্মদাতটমেঁ কোণে কোণে সর্বত্র হি মহাদেব বিদ্যমান হৈ।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমরা এক সঙ্গে সকলে গিয়ে নর্মদা স্পর্শ করে এলাম। মন্দিরে ফিরে এসে দেখি, পুরোহিতজী হ্যারিকেন হাতে মন্দিরে হনুমন্তেশ্বরের আরতি করতে এসে গেছেন। সঙ্গে চারজন লোক। হনুমন্তেশ্বরের আগে পিছে দুখানা ঘরই তিনি জানালেন পরিক্রমাবাসীদের রাত্রিবাসের জন্য। পিছনের ঘরখানি ছোট সেখানে কোনমতে দুজনের থাকার মত স্থান। সেই ঘরে নাঙ্গা সাধু থাকলেন! তাঁর কোন আসন শয্যা নাই, গায়ে একখণ্ড কম্বলও নাই। কিভাবে যে তিনি এই মাঘ মাসের কনকনে ঠাণ্ডায় হাসিমুখে কাটিয়ে যাচ্ছেন, তা তিনিই জানেন। মন্দিরের সামনের ঘরখানি যথেষ্ট প্রশস্ত। আমরা সেই ঘরে নিজের আসন শয্যা বিছিয়ে নিলাম। আমাদেরকে আলো দেখিয়ে পুরোহিতজী মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকলেন আরতি করতে। হনুমন্তেশ্বরের স্বরূপ দেখে আমরা সবাই মুগ্ধ হলাম। প্রায় ৬ ইঞ্চি দীর্ঘ স্ফটিক লিঙ্গ। কর্পূরদানিতে কর্পূর জ্বেলে পুরোহিতজী আরতি করলেন। আমরা হর হর বম্ বম্ ববম্ ববম্, হর নর্মদে হর, হর নর্মদে হর, ধ্বনি দিতে লাগলাম। আরতির শেষে তিনি আমাদেরকে জানালেন — ইধর হনুমানজী নে তপস্যা করকে শংকরজীকো প্রসন্ন কিয়া ঔর রাবণকে লেড়কা কো মারনে কী ব্রহ্মহত্যা কে দোষ সে ছুটকারা পায়া থা। ইধর হনুমান কবচ ইত্যাদি পাঠ করনেসে বিশেষ ফল হোতা হৈ।

তিনি আমাদের ঘরের মধ্যে একটি মোমবাতি জ্বেলে রেখে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমি রঞ্জনকে বললাম আজ ৯ই মাঘ, ঘোর অমাবস্যার রাত্রি। ১৯৫৫ সালের ২৩শে জানুয়ারী। ভেবে দেখ, আজ সারা ভারতজুড়ে বিশেষতঃ বাংলাদেশে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে কত উৎসবই না হয়ে গেল। এই জঙ্গল খণ্ডের লোকরা সে বিষয়ে কোন চিন্তাই করতে পারবে না। সবাই সান্ধ্যক্রিয়াতে বসেছেন, আমিও কমণ্ডলুর জলে আচমন করে স্মরণ মননে রত হলাম। আজ সারাদিনই হেঁটেছি, কিন্তু কী আশ্চর্য ঔষধ দিলেন ন্যাংটা সাধু, সেই লতা পাতার রসে শুধু পায়ের আঙ্গুলের ক্ষতই সারে নি, গায়ে পায়ে কোমরের ব্যাথাও সেরে গেছে সকলের। আজও শীতের দাপট প্রচণ্ড, অন্ততঃ এই ঘরটার মধ্যে খুব কমই মনে হচ্ছে।

সবাই চুপচাপ কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে থাকতে থাকতে রঞ্জন প্রস্তাব করলো দণ্ডী সন্ন্যাসীদের কাছে — সকলে মিলে কিছুক্ষণ সৎপ্রসঙ্গ করা যাক ঘুম না আসা পর্যন্ত। আপনাদের গুরুদেব নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসী দণ্ডীস্বামী ভোলানন্দ তীর্থজী সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে ইচ্ছা হয়। যে কেউ তাঁর সম্বন্ধে ঘরোয়াভাবে কিছু আলোচনা করুন। কি গুণে তিনি এতগুলি লোকের চিত্ত হরণ করলেন?

দণ্ডী সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেউ কিছু বলার আগেই হরানন্দজী বলে উঠলেন — জয় গুরু! জয় গুরু! আমার পক্ষে গুরুদেবের অনন্ত মহিমা বর্ণনা করা বাচালতা মাত্র! তিনি কি গুণে আমাদের চিত্তহরণ করলেন সে সম্বন্ধেও কিছু বলা আমার সাধ্যাতীত। তবে সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর নিত্য সান্নিধ্যে আমাকে থাকতে হয় বলে তাঁর লৌকিক ব্যবহার এবং কথোপকথনের ধারা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারি। সেই রকম দু-একটি ঘটনা আমি বলছি। যেমন, একদিন কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণের পুত্র ...ত বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী তাঁর কাছে এসে বলেছিলেন — 'স্বামীজী! আমি এই বৃদ্ধ বয়সে ভগবানকে এত ত ডাকছি, সাধ্যমত ধ্যান ধারণাও করছি, কিন্তু অনুভূতিতে ফুটছে না কেন'

গুরুদেব উত্তর দিলেন – কে বলল, হচ্ছে না, হয়েছে তো ! কেবল ঐ 'ডাকছি'টা ছ'য়া ফেলেছে, আড়াল করে রেখেছে । 'ডাকছি'টা মানে তো আমি ডাকছি, এই উহ্য 'আমির' আমিষ গন্ধটা উবে গেলেই মকরন্দ মধুগন্ধে মাতোয়ারা হয়ে যাবেন । আপনার মত পণ্ডিতকে এই মুখ্যু আর কি বলতে পারবে ভগবন ! সামনে ঘটের ঐ কলাগাছটা তুলে নিয়ে গিয়ে যদি কোথাও মাটিতে লাগিয়ে দেন, সঙ্গে সঙ্গে কি কলা ফলবে ? গাছ বড় হবে, মোছা পড়বে, কাঁদি নাববে, তবে ত কলা ? পণ্ডিতদের বেলায় বুঝি গাছে না উঠতেই এক কাঁদি । ন্যায়ের ফাঁকি ঝেড়ে মায়াকেও বুঝি চটপট কলা দেখাতে চান !

আর একটা ঘটনা বলি । কাশীর দেবনাথপুরা মহল্লাতে উপেন্দ্র বিশ্বাস নামে এক ভদ্রলোক বাস করেন । ইনি হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়াতে 'হংসেশ্বরীর' সেবক বিখ্যাত বিশ্বাস পরিবারের সন্তান । বাল্যকাল থেকেই ইনি কাশীবাসী । মাঝে মাঝে কামরূপ মঠে এসে থাকেন । ভারতধর্ম মহামণ্ডলের বিখ্যাত স্বামী দয়ানন্দ ছিলেন তাঁর গুরু । মঠে এলেই ইনি স্বামী দয়ানন্দের অনেক অলৌকিক বিভূতির গল্প আমাদের কাছে করতেন । তাঁর বাড়ীর বারান্দা বৈঠকখানা, শোবার ঘর এমন কি তাঁর রান্নাঘরেও দয়ানন্দের ফটো ঝোলানো থাকতো । আমাদের এই এঁদেরকে অর্থাৎ সন্ন্যাসীদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে ভদ্রলোক প্রায়ই মন্তব্য করতেন – আরে এগুলো কি সন্ন্যাসী ? ওরা সব ভিখ্-মাংগা ! এদের কোন যোগ বিভূতি নাই । নিজের রুটিটা এরা জোগাড় করতে পারে না । সন্ন্যাসী দেখতে হয় তো দেখে এসো আমার গুরুকে । যেমন বাগ্মী তেমনি শাস্ত্রজ্ঞ । কাশীর এই সন্ন্যাসীগুলোকে কেউ পোছে না কিন্তু আমার গুরুর কাছে কত রাজা মহারাজা শেঠজীর দল নানা মূল্যবান উপকরণ নিয়ে সব সময় ভিড় করে আছে ।'

একদিন বাসুদেবানন্দ নামে মঠের এক সন্ন্যাসী সেই উপেন বিশ্বাসের বাড়ীতে মাধুকরী করতে গিয়েছিলেন । ফিরে এসে গুরুদেবকে বললেন – ভগবন ! আজ একটা মজার জিনিষ দেখে এলাম । উপেন বিশ্বাসের বারান্দা বা বৈঠকখানায় দয়ানন্দের একটা ফটোও দেখলাম না । কারণ জিজ্ঞেস করতে উপেনবাবু বললেন – 'আরে সে সব ফটো ঝেঁটিয়ে ফেলে দিয়েছি । লোকটা কেবল বচন-সর্বস্ব ! বড়লোক শিষ্য ছাড়া কাউকে মানুষ বলেই জ্ঞান করে না । আর অত ভোগ রাগ মান প্রতিষ্ঠার মধ্যে কি মশাই তপস্যা হয় ? এই যে আপনাদেরকে দেখছি, আপনাদের গুরুদেবকে দেখছি, আপনারা কত বড় ত্যাগী । কোনমতে দু টুকরো রুটি মাধুকরী করে সারা দিনমান ভগবানের নাম নিয়েই পড়ে আছেন । আপনাদেরকে দর্শন করলেও পুণ্য হয় ।'

গুরুদেব সব শুনে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন – তা তুমি কি মাধুকরী করতে গিয়ে ঐ সব বৃত্তি আহরণ করে ফিরলে ? মনে রাখবে সন্ন্যাসীর মাধুকরী কোন পেটের জোগাড় নয় । মাধুকরী আর ভিক্ষাতে তফাৎ আছে । দণ্ডী সন্ন্যাসীর মাধুকরী একটা ব্রত, তপস্যার অঙ্গ । চোখ আছে দেখবে না, কান আছে শুনবে না । মনে মনে বিশ্বনাথের কাছে প্রার্থনা করতে করতে যাবে – 'প্রভু ! কলিতে অন্নগত প্রাণ । সন্ন্যাসী হয়েও অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি ন্যাস করার ব্রত নিয়েও আজ যে অন্নময় খাঁচাটার জন্য গৃহীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াতে যাচ্ছি, তার জন্য অপরাধ মার্জনা কর । দণ্ডী সন্ন্যাসীর পক্ষে গৃহীর বাড়ীতে গিয়েও দাঁড়াতে নাই, তাহলে তো ভিখারী হয়ে গেলে । বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে রাস্তা দিয়ে যাবে, বেদমন্ত্রের চিন্ময় প্রভাবে আকাশ বাতাস শুদ্ধ হবে, সন্ন্যাসী দর্শনে গৃহীদের মঙ্গল হবে । এটা সমাজ ও দেশের প্রতি তাঁর ঋণশোধ । সন্ন্যাসী সমস্ত ঋণ আহুতি দিলেও যেহেতু দেহে থাকতে দেশের ভাত জল এবং শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য বায়ু গ্রহণ করে, এ জন্য মাধুকরীর মাধ্যমে সন্ন্যাসীকে এটুকু করতেই হয় । তুমি যদি তা না করে, কার বাড়ীতে কি ঘটছে, সেই সব এমন কি হেঁসেলেরও খবর আহরণ কর তাহলে তোমার ব্রত ভঙ্গ হবে । কারও বাড়ীতে তো তোমার যাওয়ার কথা নয় । রাস্তায় তোমায় দেখে যদি কোন স্বধর্মনিষ্ঠ গৃহী

কিছু খাদ্য শ্রদ্ধাভরে তোমার করঙ্গাতে ঢেলে দেয়, তাই নিয়ে সোজা গঙ্গাতে যাবে। সন্ন্যাসীর কোন স্বাদ গ্রহণ করতে নাই। তাই সব খাবার গৈরিক নেকড়াতে জড়িয়ে ৫ বার জলে ডুবিয়ে ৫ গ্রাস খাবে, স্নান করবে। যে গৃহী খাদ্য দান করেছিল, তার কল্যাণ কামনায় ১০৮ বার প্রণব জপ করে সোজা মঠে ফিরে আসবে। এই মঠের এই ধারা।

আজ এই মঠে আমার মত অপদার্থকে দেখছো, কিন্তু পূর্ব পূর্ব মঠাধীশদের কথা ভাবো। অদ্বৈতবাদের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়ে স্বয়ং আচার্য শংকর যখন কাশীতে উপস্থিত হন, তখন তিনি কিছুকাল এই মঠে অতিবাহিত করেছিলেন, একথা গুরুপরম্পরায় শুনে আসছি। তিনি ছাড়া মধুসূদন তীর্থ, সদানন্দ যতি, মহাযোগী মহাদেবানন্দ, মাধবানন্দ তীর্থের মত মহাপুরুষরা এই মঠের আচার্য ছিলেন। শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর মত যোগীন্দ্রও কিছুদিন এই মঠে বাস করেছিলেন। তাঁর ব্যবহৃত মাটির কমণ্ডলুটিও এখনও এই মঠে সযত্নে রক্ষিত আছে। সুদূর দাক্ষিণাত্য হতে পঞ্চদশীকার ভারতপূজ্য বিদ্যারণ্য মনীশ্বর যখন কাশীতে এসেছিলেন, তখন তাঁর মত মহাযোগীও এই মঠকে চাতুর্মাস্য ব্রত পালনের যোগ্য স্থান হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন, একথাও গুরুমুখে শুনেছি। কাজেই ভগবন! এ সব কথা বিচার করে এই মঠের মর্যাদা রক্ষা করার চেষ্টা করবে, এই আমার প্রার্থনা। যদি তা না পারো, তাহলে অজগর বৃত্তি অবলম্বন করে মঠেই পড়ে থাকো। মাধুকরীতে আর বেরিয়ো না।

স্বামীজীর এই ভর্ৎসনা বাক্য শুনে বাসুদেবানন্দ পুনঃপুনঃ দণ্ডী* দিতে দিতে বলেছিলাম – আর কখনও গৃহীর বাড়ীতে যাবো না প্রভু! উপেন বিশ্বাস আগে দয়ানন্দকে কত ভক্তি করত, এখন নাম করলেও জ্বলে ওঠে! সংসারী লোক কি রকম কামী এবং স্বার্থী হয় তারই গল্প করছিলাম মাত্র!

গুরুদেব বললেন – এ আর নূতন কথা কি! সংসারী লোকেরা পান থেকে চুন খসলেই চটে যায়। তাদের আবার ভক্তি! তাদের আবার গুরুজ্ঞান! সংসারী লোক, যারা পাই পয়সার মাপকাঠিতে ধর্ম করে, তারা প্রত্যেকেই এক একজন উপেন্দ্র বিশ্বাস। তাদের দৃষ্টিতে,

কইলে কথা বচন বাগীশ, স্বার্থ পূরলে যোগী!
মৌন থাকলে ভণ্ড বলে, খেলে পরেই ভোগী!

এই পর্যন্ত বলে হরানন্দজী রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন – এই হল আমাদের গুরুদেবের কথাবার্তার ধরণ-ধারণ। তুমি বুদ্ধিমান, এই সামান্য ঘটনা থেকেই আশা করি গুরুজী সম্বন্ধে কিছু ধারণা করতে পারবে। আমার মান্য গুরুভ্রাতারা তোমাকে তাঁর সম্বন্ধে আরও গভীরতর কথা বলতে পারবেন। ওঁরা আমার অনেক আগে থেকেই সঙ্গ করছেন, পরে কোনদিন ওঁদেরকে জিজ্ঞাসা করবে। এই বলে তিনি শুয়ে পড়লেন। মোমবাতি নিভে গেছে। কথায় কথায় রাত্রি বেশী হয়ে গেছে, তাই আমরাও 'হর নর্মদে, হর নর্মদে' বলতে বলতে শুয়ে পড়লাম। ভোর ৬টায় আমরা জেগে উঠলাম। পাখীর কলকাকলিতে ভরে গেছে চারদিক। ঘরের একটা জানালা খুলতেই দেখলাম, চারদিকে ঘন কুয়াশা। সামনেই নর্মদার জলে শিশিরের আস্তরণ পড়েছে। সাদা সাদা বাষ্প ধোঁয়ার মত ভেসে বেড়াচ্ছে নর্মদার জলে। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস ঝিরঝির করে বইলেও আমি হরানন্দজীকে ডেকে বললাম, এক সেকেণ্ড আমার কাছে আসুন, দেখে যান, একটা জিনিষ, তিনি কম্বল জড়িয়ে আমার কাছে আসতেই আঙুল বাড়িয়ে দেখালাম, ঐ দেখুন ন্যাংটা সাধু নর্মদাতে ডুব দিয়ে স্নান করছেন। 'কী আশ্চর্য, লোকটা কি শীত জয়ী! দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় পৌঁছলে তবেই এটা সম্ভব,' এই বলে হরানন্দজী জানালাটা বন্ধ করে দিলেন।

* দণ্ডী দেওয়া – গুরু সমীপে দণ্ডী সন্ন্যাসীদের দণ্ড দেওয়ার পদ্ধতি বিশেষ।

সকাল সাতটা নাগাদ আকাশে সূর্যোদয়ের আভাস ফুটে উঠল। সকলে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি ৫টা বড় বড় হনুমান আমাদের দরজার কাছে বসে ছিল। দরজা খোলার শব্দ পেয়ে তারা দুড়দাড় শব্দে দৌড়ে পালিয়ে গেল নিকটস্থ কলা বনে। গতকাল মন্দিরে পৌঁছেই মন্দিরের ডান দিকে ঐ কলা ঝাড় আমাদের চোখে পড়ে ছিল। বাইরে বেরিয়ে দেখি দরজার দুদিকেই দেওয়াল ঘেঁষে প্রায় ১০টা বড় বড় পাকা কলার কেনা পড়ে আছে। রঞ্জন বলে উঠল, আহারে! হনুমানগুলো এখানে কলাগুলো পেড়ে এনেছিল খাবার জন্য। আমরা আচম্বিতে এতগুলো লোক ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতেই তারা কলাগুলো ফেলে রেখে পালিয়ে গেল, তাদের খাওয়া আর হল না। হিরন্ময়ানন্দজী বললেন – শেষ রাত্রে আমার মনে হয়েছে, হনুমন্তেশ্বর মহাদেবের স্থানে আমরা রাত্রিবাস করে গেলাম, তাঁরই আশ্রয়ে থেকে তাঁর পূজা না করে গেলে মন আমার খুঁৎখুঁৎ করবে। প্রাতঃকৃত্য সেরে স্নান করে চল অন্ততঃ এক কমণ্ডলু করে নর্মদার জল তাঁর মাথায় ঢেলে যাই। নিদারুণ ঠাণ্ডা সন্দেহ নাই, তবুও ঐ নাঙ্গা সাধু যদি ভোরে স্নান করে ভিজা গায়েই থাকতে পারেন, তাহলে আমরাই বা স্নান করতে পারব না কেন? স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে হনুমন্তেশ্বর তীর্থের যে কাহিনী পড়েছি, যতদূর মনে পড়ছে, তাতে লেখা আছে, মহাবীর হনুমান লঙ্কা যুদ্ধের পর কৈলাশ শিখরে গিয়েছিলেন মহাদেবের শ্রীচরণ দর্শন করতে। নন্দী তাঁর পথ রোধ করে বলল – মহর্ষি পুলস্ত্যের পৌত্র ছিলেন রাবণ। লঙ্কার রাক্ষসরা সকলেই পুলস্ত্যেরই বংশধর, তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। তুমি তাদের অনেককেই হত্যা করেছ। সেই ব্রহ্মহত্যার পাপে ভৈরবদের দরবারে তোমার প্রবেশাধিকার নাই – ব্রহ্মহত্যাযুতস্তুং হি রাক্ষসানাং বধেন হি, ভৈরবস্য সভা নূনং ন দ্রষ্টব্যা ত্বয়া কপে॥ সেই পাপের প্রায়শ্চিত্য কিসে হবে, জিজ্ঞাসা করায় নন্দী বলেন – রুদ্রদেহোদ্ভবা কিং তে ন শ্রুতা ভূতলে স্থিতা। শ্রবণাজ্জন্মজনিতং দ্বিগুণং কীর্তনাদ্ ব্রজেৎ। ত্রিংশ জন্মার্জিতং পাপং নশ্যেৎ রেবাবগহনাৎ। তস্মাত্ত্বং নর্মদাতীরং গত্বা চরতপো মহৎ॥ অর্থাৎ নন্দী হনুমানকে বললেন, যাঁর নাম শ্রবণে এক জন্মার্জিত, কীর্তনে দুই জন্মার্জিত এবং যাঁতে অবগাহন স্নান করলে ত্রিশ জন্মের অর্জিত পাপ বিনষ্ট হয়, তুমি কি ভূতলে সেই রুদ্র দেহোদ্ভূতা পুণ্য নদী নর্মদার নাম শোন নি? অতএব সেই নর্মদা তটে গিয়ে তুমি তপস্যা কর।

নন্দীর নির্দেশে তাই মহাবীর এখানে এসে তপস্যা করেন, মহাদেবের দর্শন পান। সেই তপস্যার প্রভাবে ঐ অপূর্ব সুন্দর স্ফটিক লিঙ্গের আবির্ভাব ঘটেছে। তাই যত কষ্টই হোক, চল স্নান করে বাবার মাথায় জল ঢেলে যাই।

হিরন্ময়ানন্দজীর কথায় সকলেই সহমত হয়ে স্নান করে হনুমন্তেশ্বরের মাথায় জল ঢাললাম। আমাদের জল ঢালার সময় শুকদেবেশ্বর মন্দিরে নাঙ্গা সাধু যেমন করেছিলেন সেই ভাবে সেই একই মহাদেবের অষ্টমূর্তির প্রণাম মন্ত্র আওড়াতে লাগলেন। তাতে লক্ষ্য করলাম, স্পষ্টতই হিরন্ময়ানন্দজীর চোখে মুখে আবার বিরক্তি ফুটে উঠল। তিনি হনুমন্তেশ্বরকে প্রণাম করে এসেই নাঙ্গা সাধুর সামনে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন – এ্যায়সা মৎ কিয়া করো। হমলোগ মহাদেবজীকা বীজ মন্ত্র জানতে হেঁ। পূজা কা বখৎ আপকো কোঈ মন্ত্র শোনানেকা জরুরৎ নেহি। হরানন্দজী আমাকে চুপি চুপি বললেন, আবার বুড়ো বিগড়েছে। অনেক কষ্টে শান্ত ছিল, আবার কি হয় দেখ! কিন্তু না, অন্য তরফে কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ না হওয়ায় বুড়ো শান্ত হয়ে গেলেন। হনুমন্তেশ্বরকে প্রণাম করে যাত্রা করার পূর্বে হিরন্ময়ানন্দজী বললেন – গর্ভগৃহে ঢুকে আমাদের পূজা করার অবকাশে হনুমানরা কলাগুলো না খাওয়ায় আমি ধরে নিচ্ছি, চিরজীবী হনুমানজী তাঁর তপোক্ষেত্রে দণ্ডী সন্ন্যাসীদেরকে অতিথি দেখে এই কলাগুলি ভিক্ষা দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। হাসতে হাসতে এই কথা বলে সকলকে যে যার প্রয়োজন মত কলাগুলি তিনচারটা করে ঝোলায় পুরে নিতে বললেন। তখন রোদ এই বনভূমিতে ভালভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

সাড়ে আটটা বা পৌনে নটা নাগাদ আমাদের আবার যাত্রা সুরু হয়ে গেল। সেই ন্যাংটা সাধু আমাদেরকে পথ দেখিয়ে আগে আগে চলতে লাগলেন। একই পাহাড়ী পথ, উঁচু নিচু পাথরের টিপি ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে আমরা এগিয়ে চললাম। রাস্তায় এক অদ্ভুত ধরণের গাছ দেখলাম, সারি সারি অজস্র। সেই সুন্দর গাছগুলির ন্যাংটা সাধু নাম বললেন 'চিঞ্চিনী পেড়'। সেই সব গাছের ফাঁকে অগুনতি কদম্ব, পলাশ, জামীর, খদির, পাটল, খেজুর, তাল, তিন্দুক ও শমীবৃক্ষের ভিড় অদ্ভুত এক মনোরম দৃশ্যের রচনা করেছে। পাশেই বয়ে চলেছেন কলকলনাদিনী নর্মদা। মাঝে মাঝে ময়ূরের ভিড় দেখছি। তাদের কেকা রব সমগ্র পরিবেশকে আরও সুন্দর করে তুলেছে। হিংস্র জন্তুর ভয় মনকে ব্যাকুল না করলে প্রকৃতি প্রেমিক কবি-প্রকৃতির লোকের পক্ষে এই জঙ্গল অপার প্রেরণা দিতে পারে। এইভাবে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক হেঁটে হনুমন্তেশ্বরের চারমাইল ব্যাপী জঙ্গল অতিক্রম করে আমরা এমন এক স্থানে পৌঁছলাম, যেটি সমৃদ্ধ পল্লী। অনেক লোকজনের বাস। কতকগুলি মন্দির চোখে পড়ল। আমরা সেখানে চিঞ্চনী গাছের তলায় কিছুক্ষণের জন্য বসলাম। হিরন্ময়ানন্দজীকে এই স্থানের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, ইধারকা আদমীকো পুছনে হোগা, ২০ সাল পহেলে এক দফে আদেখে। স্মরণ মেঁ নাহি আতা। ন্যাংটা সাধুর দিকে তাকিয়ে বললেন – গুরুদাসজী ইয়া নাঙ্গা বাবা, আপ্ বাতাইয়ে। কিঞ্চিৎ হেসে নাঙ্গা বাবা বলতে লাগলেন – ইয়ে হ্যায় জীগোর গ্রাম। ইসে জীওর আউর জিমুতপুর ভী কহতে হৈ। য়হাঁ পর প্রাচীন কালমেঁ ব্রহ্মাজী নে তপ করকে ব্রহ্মেশ্বর মহাদেব কী স্থাপনা কী। য়হাঁ পর মার্কণ্ডেয় ঋষিনে তপ করকে বেদকা পারায়ণ ষষ্ঠ দিন মেঁ করকে কলস কা পূজন কিয়া। উস্ কলস মেঁ সর্ব তীর্থকা বারি থা। বেদমন্ত্রমেঁ উস্ কলসকো পূজা করনে কা হি সময়মেঁ কলস সে লিঙ্গ প্রকট হুয়া জিসে কুম্ভেশ্বর কহতে হৈ। শ্রী কুম্ভেশ্বর কা মন্দির বহুৎ প্রাচীন হৈ। য়হাঁ মার্কণ্ডেশ্বর কা ভী মন্দির হৈ। য়হাঁ পর শনি নে তপ করকে শান্তি প্রাপ্ত কী থী। জব কুম্ভরাশি পর শনি আতে হৈ, তব য়হাঁ নিবাস কর দান জপ ইত্যাদি করনে কা বড়া মাহাত্ম্য হৈ। সিংহরাশি পর জব্ বৃহস্পতি আতে হৈ তব ভী য়হাঁ দান তপস্যা কা বিশেষ ফল হোতে হৈ। ইস্ স্থান সে থোড়ী দূর রামেশ্বর তীর্থ ভী হৈ, শ্রীরামচন্দ্রজী উনকো স্থাপনা কিয়া। লক্ষ্মণেশ্বর, মেঘেশ্বর ঔর মচ্ছকেশ্বর কে মন্দির ভী আস-পাস হৈ। য়হাঁ অপ্সরা তীর্থ ভী হৈ। ইস্ তীর্থ মেঁ অপ্সরায়োঁ নে সিদ্ধি পাই থী। তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই হরানন্দজী তাঁকে বললেন – আপনি তো বাংলা ভাষা ভালই জানেন। ২/৩ জন ছাড়া এই দলে হিন্দীভাষী কেউ নাই, কাজেই হিঁয়া হুঁয়া না করে আপনি ত সব কথা বাংলাতেই বলতে পারেন, তাহলে স্বরগ্রামের উপর তো অহেতুক কোন চাপ পড়ে না।

– প্রশ্ন তো আমাকে হিন্দীতেই করা হয়েছিল। তাই হিন্দীতেই উত্তর দিয়েছি। ঠিক আছে, অতঃপর বাংলাতেই জবাব দিব। আমরা যেখানে বসেছিলাম, সেখান হতে কি দূরেই একটা বাঁধানো ঘাটে কিছু লোক স্নান করছিল, হঠাৎ তাদের মধ্যে হৈ হৈ রব উঠল, চারদিকে ছোটাছুটি আর্তনাদ, কান্নার রোল, পল্লী থেকে স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে ছুটে আসছে কাঁদতে কাঁদতে। আহা! মেরে হনুমন্তিয়া! মেরে জান্! বলতে বলতে একটি মেয়েছেলে দৌড়তে দৌড়তে এসে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ল। সকলে তাকে ঘিরে কাঁদছে। আমরা সকলে উঠে এসে ঘাটের কাছে এসে শুনলাম, একটি ১৮/২০ বৎসরের যুবক নর্মদাতে স্নান করছিল তাকে কিছু আগেই কুমীর কাপ্টা মেরে টেনে নিয়ে গেছে জলের মধ্যে। হরানন্দজী হনুমন্তিয়ার মায়ের কান্না এবং মূর্চ্ছিতা অবস্থা দেখে কেঁদেই ফেললেন। হিরন্ময়ানন্দজী হরানন্দজীকে বললেন – আপ্ রোতে হেঁ কেঁও ? যব্ যিন্‌কা বখৎ পূরা হোগা, উন্‌কে যানেই পড়ে গা। হরানন্দজী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন তাঁর কথা শুনে। বললেন – আপনাকে

আর বাণী বচন ঝাড়তে হবে না। কথার ধরণ দেখ, 'আপ্ রোতে হেঁ কেঁও' ? আরে সন্ন্যাসী হয়েছি বলে কি বুকটাকে পাষাণ করেছি। কত বড় pathetic ঘটনা ঘটে গেল, একজন মায়ের ঘর অন্ধকার হয়ে গেল, তার বুক শূন্য হয়ে গেল। হনুমন্তিয়া যদি ঐ মায়ীর এক মাত্র সন্তান হয়, তাহলে ত তাঁর জীবনই শেষ হয়ে গেল, এদিকে উনি বক্তৃতা মারছেন – তুমি কাঁদছ কেন ?

উত্তেজিত হরানন্দজীকে আমি টেনে নিয়ে গেলাম, সেই চিঞ্চিনী গাছের তলায়, সেখানেই আমাদের ঝোলা গাঁঠরী পড়েছিল। সেখান থেকে সকলে ঝোলা গাঁঠরী তুলে নিয়ে অত্যন্ত বিষণ্ণ হৃদয়ে নীরবে সেই অভিশপ্ত স্থান ছেড়ে হেঁটে যেতে থাকলাম সামনের দিকে। কথা বলতে জানতে পারলাম, কুমীরের ভয়ে সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। দুঃখও হয়েছে খুব। নাঙ্গা সাধুকে আমাদের দলের একাধিক লোক বললেন – কুন্তেশ্বর মন্দির দর্শন করিয়ে আমাদেরকে জীগোর হতে পরের তীর্থে নিয়ে চলুন। কুন্তেশ্বরের মাথায় জল ঢেলে আর কোন মন্দিরে শিবপূজা করার জল, এমন কি খাবার জলও থাকবে না কমণ্ডলুতে। এখানের কোন ঘাটেই নেমে জল ভরতে আমাদের প্রবৃত্তি বা সাহস হবে না। ক্ষীণ ও করুণ কণ্ঠে হর নর্মদে বলতে বলতে আমরা কুন্তেশ্বর বা কুন্তনাথ মন্দিরে এসে পৌছলাম। সুপ্রাচীন পাথরের মন্দির। স্থানে স্থানে পাথর খসে পড়েছে। মন্দিরে পুরোহিত মশায় পূজা করছিলেন। অদ্ভুত ধরণের শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গকে ঘিরে রয়েছে পাথরের কলস, কলস ভেদ করেই সে লিঙ্গের আবির্ভাব ঘটেছে, তা দেখলেই বুঝা যায়। শিব এবং কলস দুই পাঁশুটে রং এর। তাঁর পূজা শেষ হতেই আমাদেরকে জায়গা ছেড়ে দিলেন পূজা করতে। ওঁ নমো ভগবতে কুন্তনাথায়, কেউ বা ওঁ নমো ভগবতে কুন্তেশ্বরায় বলে সকলেই আমরা শিবের মাথায় জল ঢেলে প্রণাম করলাম। নাঙ্গা সাধু সবার শেষে তাঁর সেই একই মহাদেবের অষ্টমূর্তির মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রণাম করলেন।

একটু আগে যে মর্মন্তুদ দৃশ্য আমরা দেখে এসেছি, সেই হনুমন্তিয়া নামক হতভাগ্য যুবকের কুমীরে টেনে নিয়ে যাবার গল্প মন্দিরে বসেই পুরোহিতজী শুনেছেন। তাই তিনি বললেন – মন্দিরের এককোণে দুটি বড় বড় পাথরের কলসে নর্মদার জল আছে। আপনাদের শূন্য কমণ্ডলু ঐ জলে ভরে নিয়ে যান। এখান থেকে আরও একমাইল দূরে বাঁদরিয়ার ঘাট পর্যন্ত আপনাদের ঘাটে নামার প্রয়োজন নাই। বৎসরে ২/৩ বার এই জীগোর থেকে বাঁদরিয়া পর্যন্ত কুমীরের উপদ্রব দেখা যায়। এর কার্যকারণ আমাদের জানা নাই। তবে প্রতি বৎসরই জীগোর থেকে বাঁদরিয়া পর্যন্ত ২/৩টি প্রাণহানি ঘটে। যেদিন কুমীরের আবির্ভাব ঘটে, সেদিন থেকে ২/৩ দিন যাবৎ এখানে কোন লোকই নর্মদায় নামে না। বাঁদরিয়া গ্রামে তেজোনাথ (তেজোনাথকে কেউ কেউ বৈদ্যনাথ মহাদেবও বলে থাকেন) মহাদেব বিরাজমান। যহাঁ পর গরুড়জী ঔর অশ্বিনীকুমার নে প্রাচীন কাল মেঁ তপ কিয়ে থে। যহাঁ তপ করনেবালে কে সব রোগ ভগবান শংকরকী কৃপা সে দূর হো জাতে হৈ। ইসলিয়ে ইধর বহুৎ যাত্রীয়োঁ কো সমাগম হোতা হৈ। যহাঁ সুগ্রীব নে তপ করকে বানরেশ্বর মহাদেব কো মন্দির স্থাপন কী থী।

আমরা তাঁকে 'নমো নারায়ণ' জানিয়ে সেখানকার অন্যান্য তীর্থ বা মন্দিরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে সোজা বাদরিয়ার পথ ধরলাম। আধ ঘন্টার মধ্যে বৈদ্যনাথ বা তেজোনাথ মন্দিরে পৌঁছে বহু লোকের ভিড় দেখলাম। দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত স্ত্রী পুরুষ বালক নির্বিশেষে অনেককেই নীরোগ হওয়ার কামনায় হত্যা দিয়ে পড়ে থাকতে দেখলাম মন্দিরে। তেজোনাথকে প্রণাম করে সুগ্রীবের তপস্যাস্থল বানরেশ্বর মন্দিরের মহাদেবকে দেখে আমি হরানন্দজীকে লক্ষ্য করে বললাম – একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছেন কি শুকদেবেশ্বর হতে এই বাঁদরিয়া পর্যন্ত ২৫/৩০ মাইল ব্যাপী পথের মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্রের

অনুচরবর্গ যথা হনুমান সুগ্রীব নল নীল সুষেণ প্রভৃতির তপস্যাস্থল দেখে এলাম। তাঁরা সকলে মিলে নর্মদার দক্ষিণতটের এই স্থানগুলি তপস্যার জন্য বিশেষ করে কেন বেছে নিয়েছিলেন বলতে পারেন ? হরানন্দজী রসিক, তিনি চোখ মটকে আমাকে মৃদুকণ্ঠে বললেন – বাঁদরদের মন মতি বা মর্জির কথা আমি বলতে পারব না। আপনি ঐ বুড়োকে (অর্থাৎ হিরন্ময়ানন্দজীকে) জিজ্ঞাসা করুন। আমাকে আর জিজ্ঞাসা করতে হল না। হিরণ্ময়ানন্দজী হরানন্দজীর ভ্রূকুঞ্চন - দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি নিজেই উত্তর দিলেন – মুঝে পতা নেহি। বাঁদরকো মর্জি বাঁদর সমঝেগা, হমারা দলমেঁ তো কোঈ বাঁদর নেহি হ্যায়। আমরা আর কথা বাড়ালাম না ; সবাই হাসাহাসি করে চুপ করে গেলাম।

একই ধরণের পাহাড় ও জঙ্গলের পথ, জঙ্গল ক্রমে যেন ঘন হয়ে নর্মদার তীর পর্যন্ত ঘেঁষে গেছে। আমরা নর্মদাকে দর্শন করতে করতে হাঁটছি। পথ বড় বড় পাথরে ভর্তি। পাছে ঠোক্কর খাই, এজন্য লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটছি। লাঠির সাহায্যে ছোট ছোট পাথর হটিয়ে চলেছি। একটা বৈশিষ্ট্য, চিক্কিনী এবং কিংশুক ফুলের গাছ এ অঞ্চলে বেশী দেখছি। চিক্কিনী গাছ দেখতে বড় বড় ঝাউ গাছের মত। কিন্তু সাধারণ ঝাউ নয়, খুব উঁচু গাছ, কাণ্ডও মোটা, কলাপাতার মত বড় বড় ডাল ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে, পাতা ঠিক ঝাউপাতার মত, খাঁজ কাটা খাঁজ কাটা। শোভা অপূর্ব। বাসবানন্দজী বললেন, লক্ষ্ণৌতে একবার এক সাহেবের বাগানে আর্কিরিওকুকি নামক বিলাতি ঝাউগাছ দেখেছিলাম, চিক্কনীর ধরণধারণ কতকটা সেই রকম। হিরন্ময়ানন্দজী হঠাৎ গান ধরলেন – নমো নর্মদে দেব গন্ধর্ব সেব্যা, নরা কিন্নরা যক্ষ আরাধ্যা দেব্যা। বারবার তিনি এই দুলাইন একা একা গুণগুণ করতে গাইতে লাগলেন। বাঁদরিয়া থেকে প্রায় দুমাইল হেঁটে এসে আমরা তুমড়ী নামক গ্রামে এসে পৌছে গেলাম। নর্মদার গা ঘেঁসে এই গ্রাম ; গ্রামের মধ্যে এক বিশাল মন্দির দেখে আর তার সুন্দর বাঁধানো ঘাট দেখে নাঙ্গা সাধু বললেন – এই মন্দিরের নাম ভীমেশ্বর তীর্থ। এই সুপ্রাচীন মন্দিরের মধ্যে ভীমেশ্বর মহাদেব আছেন। আমি একবার এখানে বাস করে গেছলাম। মন্দিরের পৈঠার উপর যত্রতত্র অনেক পোড়া কাঠ আছে বলে বুঝলাম যে, এখানে কিছুকাল আগে নিশ্চয়ই একদল পরিক্রমাবাসী বাস করে গেছেন। মন্দিরের দরজা খুলে ভীমেশ্বরকে দর্শন করে প্রণাম করলাম সকলে। সুপ্রাচীন বিশাল মন্দিরের ভিতরে প্রশস্ত জায়গা দেখে প্রেমানন্দ প্রস্তাব করলেন – বেলা ২টা বেজে গেছে। এখানেই আজ রাত্রিবাস করে আবার সকালে যাত্রা করলে কেমন হয় ? হনুমন্তেশ্বরের দয়ায় খাবার ত আমাদের সঙ্গেই আছে।

নাঙ্গা সাধু বললেন – এ স্থল মুদ্গল ঋষির তপস্যাক্ষেত্র। এখানে ওঁকার ধ্যান এবং গায়ত্রী জপের অশেষ ফল। তাঁর কথা সকলেই লুফে নিলেন। সকলেই সিদ্ধান্ত করলেন – গোটা রাত্রি আমরা গায়ত্রী জপ করেই কাটাবো।

এই সিদ্ধান্তের পর ঝোলা গাঁঠরী রেখে নর্মদার ঘাটে এসে হাত মুখ ধুয়ে হনুমন্তেশ্বর মন্দিরে সেই হনুমান বাহিত সুপক্ক কলা মা নর্মদাকে স্মরণ করে ভোজন করলাম। সন্ধ্যা হয়ে আসতেই রঞ্জনের টর্চ জ্বেলে আমরা মন্দিরের মধ্যে ঢুকলাম। মন্দিরের মধ্যে দিনের বেলাতেই অন্ধকার, সন্ধ্যা হয়ে আসতে তো আর কথা নাই। আমরা টর্চ জ্বেলে যে যার আসন শয্যা পেতে নিলাম। ব্রহ্মচারীরা মন্দিরের বাইরে যে সব পোড়া কাঠ পড়েছিল, সেগুলো জ্বেলে আগুন জ্বালার ব্যবস্থা করলেন। এ সবই হল, হরানন্দজীর ব্যবস্থাপনায়। একে কনকনে ঠাণ্ডা তার উপর পাথরের মন্দির, মেঝেতে পা রাখাই দায়। আগুন জ্বালালে সুবিধাই হবে। হরানন্দজী নাঙ্গা সাধুকে আমাদের সঙ্গেই মন্দিরের মধ্যে থাকবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই আমাদের সঙ্গে থাকতে রাজী হলেন না। তিনি জানালেন – 'সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ আপনাদের সঙ্গেই থাকব। এ স্থানের মাহাত্ম্য

বর্ণনা করে মন্দিরের গায়ে ছোটমত যে গুহা আছে, দেখেছেন, আমি তার মধ্যেই থাকব, বেশ আরামেই থাকব। আমার জন্য কিছু চিন্তা করবেন না।'

সূর্যাস্ত হয়ে যেতেই সকলেই নর্মদার ঘাটে গেলাম নর্মদা স্পর্শ করতে। নর্মদাকে প্রণাম করে এসে মন্দিরের মধ্যে ঢুকতেই নাঙ্গা সাধু বললেন – আমি আগেই বলেছি, এই স্থান ঋষি মুদ্গল, যিনি মৌদ্গল্য গোত্রধারী ব্রাহ্মণদের আদি পুরুষ, তাঁর তপস্যাক্ষেত্র। মুদ্গল ঋষির আদিস্থান কুরুক্ষেত্র, তিনি স্ত্রী পুত্রদের সঙ্গে প্রতিপক্ষে একদিন আহার করতেন এবং প্রতি অমাবস্যায় এবং পূর্ণিমায় যজ্ঞ করতেন। অতিথিদেরকে এক দ্রোণ করে অন্ন দিতেন। তাঁর অবশিষ্ট অন্ন অতিথি দেখলেই বৃদ্ধি পেত। একবার দুর্বাসা তাঁর অতিথি হয়ে সব অন্ন খেয়ে ফেলেন। মুদ্গল নির্বিকার ভাবে অনাহারে থাকেন। এতে তুষ্ট হয়ে দুর্বাসা বলে যান মুদ্গল সশরীরে স্বর্গে যাবেন। সত্য সত্যই একদিন যখন দেবদূত তাঁকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য এলেন, তখন মুদ্গল দেবদূতকে স্বর্গবাসের দোষগুণ বর্ণনা করতে বলেন। দেবদূত স্বর্গবাসের বিবিধ সুখের কথা বলে দোষ হিসাবে বলেন, স্বর্গে কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয় কিন্তু নূতন কর্ম করা যায় না। অপরের সম্পদ ও শ্রীবৃদ্ধি দেখলে মনে অসন্তোষ জন্মে এবং কর্মক্ষয় হলেই পৃথিবীতে আবার পতন হয়, জন্মগ্রহণ করতে হয়। মুদ্গল তখন দেবদূতকে বিদায় দিয়ে বলেন – যে অবস্থায় লোকে সুখদুঃখ পায় না, হর্ষশোকের কোন অনুভূতিই থাকে না, সেই কৈবল্যই তাঁর কাম্য। দেবদূত তখন তাঁকে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য নর্মদাতটে এসে তপস্যা করতে বলে যান। মুদ্গল এইখানেই এসে রৌদ্রব্রত বা ভীমব্রত পালন করে মা নর্মদার দয়ায় কৈবল্য প্রাপ্ত হন। সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত গ্রীষ্মকালে প্রখর রৌদ্রে বসে শিবের উপাসনাকেই রৌদ্রব্রত বলা হয়। তিনি প্রখর রৌদ্রে বসে ধ্যান করেছিলেন, আপনারা রাত্রিকালে ঠাণ্ডায় নিরাপদ শিব মন্দিরে বসে ওঁকার বা গায়ত্রী জপে মন নিবিষ্ট করুন। তাঁর এই কথা বলার পরেই সমগ্র বনভূমিকে প্রকম্পিত করে বাঘের গর্জন উঠল। আমরা সকলেই ভয়ে কেঁপে উঠলাম। নাগা সাধু বললেন – ও কিছু নয়। বাঘ বহুদূর থেকে গর্জন করছে। শিকার পেলেই বাঘ আনন্দে হুঙ্কার তুলে। আপনারা দরজা বন্ধ করে জপে বসুন। আমি চললাম। সকালে আবার দেখা হবে। তিনি চলে যেতেই হিরন্ময়ানন্দজী বললেন, তাঁর ঝুলিতে কর্পূর আছে, কর্পূর জ্বেলে সবাই মিলে আগে ভীমেশ্বরের আরতি করি এস, তারপর জপে বসব। একটা রেকাবীতে কর্পূর জ্বেলে হিরন্ময়ানন্দজী আরতি করতে লাগলেন। আমরা সকলেই স্তব করতে লাগলাম –

ওঁ ব্রহ্ম-মুরারি-সমর্চিত-লিঙ্গং, নির্মল-ভাসিত-শোভিত লিঙ্গম্।
জন্মজ দুঃখ-বিনাশক-লিঙ্গং, তং প্রণমামি-সদাশিব-লিঙ্গম্॥
কনক-মহামণি-ভূষিত-লিঙ্গং, ফণিপতি বেষ্টিত-শোভিত-লিঙ্গং।
সিদ্ধমুনীশ্বর-সেবিত-লিঙ্গং, তং প্রণমামি-সদাশিব-লিঙ্গং॥

আরতি শেষে সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে যে যার আসনে বসে গেলাম জপের উদ্দেশ্যে। মন্দিরের প্রধান দরজায় ভিতর থেকে বন্ধ করার জন্য কোন খিল বা তাড়ার ব্যবস্থা নাই। মন্দিরের এক কোণে একটা বড় পাথরের চাঙড় ছিল, ৪জন ব্রহ্মচারী অতি কষ্টে ঠেলে নিয়ে গিয়ে দরজায় ঠেকা দিল। দস্যু বা বাঘের মত বলশালী কোন হিংস্র জন্তুর পক্ষে এটা কোন বাধাই নয়, কেবল মন ভুলানো একটা ঠেকা। একমাত্র ভীমেশ্বর ভরসা। রঞ্জন হিরন্ময়ানন্দজীকে বলল – অনেকক্ষণ বসে জপ করার অভ্যাস নাই। আপনি যদি অনুমতি করেন, মা নর্মদাকে প্রণাম জানিয়ে শুয়ে পড়ি। আমি স্বভাবে বাউল, গান গাইতেই শিখেছি, আর কিছু শিখি নি। আপনাদের জপের শেষে কাল সকালে এখান হতে যাওয়ার আগে ভগবান ভীমেশ্বরকে একটা গান শুনিয়ে যাব। সেই হবে আমার জপ ও প্রণাম। দুজন ব্রহ্মচারীও জপের অক্ষমতা জানালেন। স্বামীজী তাঁদেরকে বললেন – এখানে প্রণব

গায়ত্রী জপ করার মাহাত্ম্য বেশী, একথাই আমাদেরকে মহাত্মা শুনিয়েছেন। যার ইচ্ছা জপ করবে, যার ইচ্ছা হবে না, জপ করবে না। এর মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা নাই। আমার পাশেই হরানন্দজীর আসন, তিনি আমার কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন – একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে! উনি তাহলে নাঙ্গা বাবাকে 'মহাত্মা' বলে স্বীকার করছেন! আমি কোন জবাব না দিয়ে জপে মনোনিবেশ করলাম। এখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বেজেছে। সকলে সমকায়শিরোগ্রীব হয়ে জপ করতে বসে গেছেন। এখানকার স্থান মাহাত্ম্য কিনা জানি না, ব্যক্তিগত ভাবে আমার মন কিছুক্ষণের মধ্যেই জপে নিবিষ্ট হয়ে গেল, অন্তরে অনাস্বাদিত পূর্ব রস ও আনন্দ আপ্লুত হয়ে পড়লাম। এইভাবে কতক্ষণ যে কেটে গেছে জানি না, সহসা একটা অট্টাট্ট হাসির শব্দে মনসংযোগ ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হল, আমি জেগে উঠলাম। জাগার পরেও শুনতে লাগলাম সেই অট্টাট্ট হুঙ্কার। মনে হচ্ছে যেন মন্দিরের বাইরে কেউ দুপ্‌ দাপ্‌ শব্দে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে আর অট্টাট্ট হাসিতে ফেটে পড়ছে। ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে কোনমতে ঝোলা হাতড়ে নিজের টর্চটা খুঁজে পেয়ে টিপলাম। টর্চের আলোতে দেখলাম, সকলেই জেগে উঠেছেন। সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সকলেরই মুখ ভয়ে কালো হয়ে গেছে। এই মাঘ মাসের প্রচণ্ড কনকনে ঠাণ্ডায় সকলেই ঘেমে উঠেছেন ভয়ে। কারও মুখে কোন 'রা' নাই। রঞ্জন শুকনো গলায় আমাকে ফিস্‌ফিস্‌ করে জানালো এখন যে রকম অট্টাট্ট হাসি এবং হুঙ্কারে ধ্বনি শুনছেন, ঠিক এই একই রকম শব্দ রাত্রি ৩টা থেকে আরম্ভ হয়েছে। এখন আমার ঘড়িতে সাড়ে তিনটা। ভয়ে সকলেরই গলা শুকিয়ে গেছে, প্রায় প্রত্যেকের কমণ্ডলুর জল নিঃশেষ হয়ে গেছে। সবাই ঘন ঘন ঢক্‌ ঢক্‌ করে জল গিলছেন। আমি নিজেও কতকটা জল গিললাম। তখনও সমানে হুঙ্কার ধ্বনি উঠছে। রাত্রি প্রায় ৪টা নাগাদ হুঙ্কার ধ্বনি থামল। সকলে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। কম্বল মুড়ি দিয়ে চুপ করে বসে থাকলাম সকলে, এই কালরাত্রির কখন অবসান হয় তারই ব্যাকুল প্রতীক্ষায়। ৫টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বনভূমি মুখরিত হয়ে উঠল নানা জাতীয় পাখীর কলকাকলিতে।

সকাল ছটা বাজতেই দরজায় ঠেকা দেওয়া হয়েছিল, যে পাথরটা, সেটা ব্রহ্মচারীরা ঠেলে সরিয়ে দিতেই আমরা হুড়মুড় করে সকলেই এক সঙ্গে বেরিয়ে এলাম মন্দির থেকে যে যার ঝোলা গাঁঠরী নিয়ে। পথে ঘাটে গাছপালা সব কুয়াশায় ঢাকা, টুপ্‌ টুপ্‌ করে শিশির পড়ছে, ঝড়ো হাওয়া বইছে। সামনেই নর্মদা বয়ে চলেছে। সেদিকে তাকিয়ে দেখি, যথারীতি অত ভোরেই নাঙ্গা সাধু স্নান করে আসছেন। তাঁর গা থেকে জল ঝরছে। তিনি কাছাকাছি হতেই হরানন্দজী তাঁর স্বভাব অনুযায়ী ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন – আচ্ছা জায়গায় আমাদেরকে রাত্রিবাস করালেন। ভুতুড়ে জায়গা, রাত্রি ৩টা থেকে এখানে এমন অট্টাট্ট হাসির শব্দ যে ভয়ে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হওয়ার জোগাড়। আপনার মতলবটা কি? নাঙ্গা সাধু হেসে জবাব দিলেন, আপনারা জপ করেছিলেন ত? নর্মদাতটে শিব সাধনা করলে সিদ্ধি আসার পূর্বমুহূর্তে ভৈরব ঐ রকম বাধা সৃষ্টি করে থাকেন। তা নিয়ে ঘাবড়াবার কিছু নাই। ভূতনাথের মন্দিরে ভূত আসবে কোথা হতে? বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের খররৌদ্রে, লাভা স্রোতের মত 'লু'-এর গরম ঝাপটা যখন বয়, তখন মুক্ত আকাশের তলে গরম পাথরের উপর বসে সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পাঁচটা অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে তার মধ্যে বসে জপ করলে তাকে পঞ্চাগ্নি ক্রিয়া, রৌদ্র ব্রত বা ভীমব্রত বলা হয়। মুদ্গল ঋষি ঐ রকম ভাবে ভীমব্রতের অনুষ্ঠান করায় তবে না এখানে ভীমেশ্বর মহাদেবের আবির্ভাব ঘটেছিল। আর আপনারা একটি মাত্র শীতের রাত্রি মন্দিরের ছাদের তলায় বসে কম্বল মুড়ি দিয়ে কাটিয়েছেন তাতেই কাহিল। আপনারা কি রকম দণ্ডী সন্ন্যাসী! আপনারা কি কখনও শোনেন নি যে জপরত অবস্থায় ভয়প্রদ বিভীষিকার আবির্ভাব ঘটেছিল যখন, সেটা

সিদ্ধিরই পূর্ব লক্ষণ। ভয়ে জড়সড় না হয়ে তন্ময় হয়ে জপ করে গেলেই আপনারা দিব্যবস্তুর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করতে পারতেন। পারলেন না, সেটা আপনাদের দুর্ভাগ্য। এই বলে তিনি তাঁর গুহাতে গেলেন ছোট্ট ঝুলিটা আনতে। সকলেই নত মুখে বসে রইলাম, তাঁকে দোষারোপ করতে গিয়ে নিজেরাই দোষী প্রতিপন্ন হলাম! নাঙ্গা মহাত্মা তাঁর ছোট্ট ঝুলিটি নিয়ে তক্ষুণি ফিরে এসেই বললেন – আকাশে অরুণাভাস ফুটে উঠেছে, আপনারা স্নান করতে চাইলে এখানেই স্নান করে নিন, মুখ টিপে টিপ্পনী কাটলেন – এখানে কুমীরের ভয় নাই। উদ্বেগাকুল চিত্তে রাত্রি জাগরণ এবং ভয়ের চোটে আপনাদের সকলের চোখে কালি পড়ে গেছে! রঞ্জন মহাত্মাকে বললেন – আমি জপ করিনি, গান শুনিয়ে ভীমেশ্বরের পূজা করব, এই সংকল্প করেছিলাম। এঁদের স্নান করতে করতে আমাকে ভীমব্রতের পরিবর্তে গানের মাধ্যমে নর্মদা ও ভীমেশ্বরের পূজা করার সুযোগ দিন। এই বলে রঞ্জন নর্মদার দিকে তাকিয়ে গান গাইতে লাগল –

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা!
আমি তোমায় ছাড়ব না –
মাগো, আমি তোমার চরণ করব শরণ
আর কারও ধার ধারব না মা,
আর কারও ধার ধারব না।
যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না।

পূর্বেই বলেছি, রঞ্জনের কণ্ঠস্বরে যাদু আছে। এমন দরদ দিয়ে ঐ কয় লাইন সে গাইল যে, সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলাম। সূর্যোদয় হয়ে গেছে। সকালের মিষ্টি রোদ গায়ে পড়ায় বড়ই আরাম লাগছে। সূর্যরশ্মিতে নর্মদার জল চিক্‌চিক্ করছে। রঞ্জনের গান শেষ হতেই আমরা সবাই স্নান করতে গেলাম। কোন মতে নর্মদায় একটা ডুব দিয়ে এসে গা মুছে নেংটি এবং আলখাল্লা চাপা দিলাম গায়ে। স্নান করে বেশ আরাম বোধই হল। ভীমেশ্বরকে প্রণাম করে সোজা পূর্বদিকে রওনা হলাম, যে যার ঝোলা গাঁঠরী নিয়ে। সোজা পূর্বদিকে হাঁটছি। সেই একই চিঙ্কিনী, জামির, যজ্ঞ ডুমুর অশ্বত্থ পাকুড় শাল ও সেগুন গাছের জটলা। পথের উপর মাঝে মাঝে কাঁটার ঝোপ। নাঙ্গা মহাত্মা আমাদেরকে হাঁটতে হাঁটতেই বলতে লাগলেন – এখান থেকে একমাইল হেঁটে গেলেই নর্মদার এই দক্ষিণ তটেই সহরাও (সহরাব) গ্রাম পড়বে। ঐ গ্রামের পশ্চিম দিকে কিছু দূরেই শঙ্খচূড় নাগ তপস্যা করে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিল। কারও পূর্বপুরুষের যদি সর্প দংশনে মৃত্যু হয়ে থাকে, তাঁর উদ্দেশ্যে সেখানে তর্পণ করলে তাঁর মুক্তিলাভ ঘটে। শঙ্খচূড়ের স্থান হতে কিঞ্চিৎ দূরে বদরীকেদার তীর্থ। সেখানে প্রাচীনকালে বিভাণ্ডক, কপিল চ্যবন ইত্যাদি ঋষির কঠিন তপস্যার ফলে কেদারনাথ প্রকট হয়েছিলেন। হরানন্দজী তাঁকে বলে উঠলেন – যে বংশে কারও অপঘাত মৃত্যু হয়, সে বংশে দণ্ডী সন্ন্যাসী জন্মায় না কি? কাজেই আপনি আমাদেরকে পথ দেখিয়ে সোজা কেদারনাথ মন্দিরে নিয়ে চলুন। আমি নাঙ্গা সাধুর কখনও পাশে, কখনও পিছনে পিছনে হাঁটতে হাঁটতে বললাম – আচ্ছা ভগবন্! কাল যে ভীমেশ্বর মন্দিরে আমরা অট্টাট্ট হাসি শুনলাম, হনুমন্তেশ্বর মন্দিরে হনুমান আমাদের খাবার জন্য কলা এনে রেখে গেল, উত্তরতটেও অনেক অলৌকিক কাণ্ড যত্র তত্র দেখে এলাম, যদি কখনও আমি বা কোন পরিক্রমাবাসী এই সম্বন্ধে বই লেখেন, তাহলে কি এইসব কাহিনী লেখা যাবে? এই বিজ্ঞানের যুগে কেউ কি তা বিশ্বাস করবে?

– কেউ বিশ্বাস করল বা না করল, তাতে আপনার যায় আসে কি? আপনারা এতগুলো লোক যা প্রত্যক্ষ করলেন, তা চেপে যাবেন কেন? নর্মদা তটে মিথ্যা কথা ত দূরের কথা, মিথ্যা চিন্তা করাও পাপ। তাহলেই পরিক্রমা ভঙ্গ হয়ে যাবে। পরিক্রমাকালে

এবং পরিক্রমার শেষে বহু বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও মা নর্মদার বিষয়ে কোন রকম অতিরঞ্জন অনুরঞ্জন চলবে না। পরিক্রমার শপথ নিয়ে যে সব সত্যনিষ্ঠ পরিক্রমাবাসী এই দুর্গম পথ বহু কষ্ট সহ্য করে পরিক্রমা সমাপ্ত করলেন, তাঁদের কথা যদি কোন দুর্ভাগা অবিশ্বাস করে, তাদের কথায় কি আসে যায় ? আর বিজ্ঞানের কথা বলছেন ! হ্যাঁ এক সময় ছিল বটে, যখন বিজ্ঞান বলতে আরম্ভ করেছিল – ভূত (জড় Matter) ও ভৌতিক শক্তি (Physical energy) – বিশ্ব রচনার পক্ষে যথেষ্ট – Matter and energy are sufficient in themselves to explain all the phenomena of the visible Universe. বিজ্ঞান প্রথমের দিকে বলেছিল – অদৃশ্য জগৎ বলে কোন কিছু নাই অর্থাৎ পরলোক নাই, আত্মা নাই, ঈশ্বর নাই, কোন অদৃশ্য দিব্যশক্তির খেলাও নাই – আছে কেবল জড় পরমাণুর যদৃচ্ছাজাত সংঘাত — Fortuitous concourse of Atoms ! আছে কেবল Almighty Atom energised by blind Force ! কিন্তু প্রাণ ? প্রাণও ত একটা দৃশ্য জগতের ব্যাপার – প্রাণশক্তি কোথা হতে এল ? বিজ্ঞান উত্তর দিল – প্রাণ ? প্রাণ ত জড়ের পরিস্পন্দ মাত্র। Why ? Protoplasm, the very seat of life, would someday be synthesised in the laboratory from its constituents — Carbon, Hydrogen, Nitrogen and Oxygen. তাহলে প্রশ্ন জাগে চিন্তা, চেতনা, Mind ? বিজ্ঞানের সদম্ভ উত্তর – কেন ও তো মস্তিষ্কের স্পন্দন মাত্র — As the liver secretes bile so the brain exudes throught — যেমন যকৃত হতে পিত্ত নিঃসৃত হয়, সেই রকম মস্তিষ্ক হতে চিন্তা ক্ষরিত হয়। অতএব জড় ও জড়শক্তি এরাই সর্বেসর্বা !

কিন্তু ক্রমে বিজ্ঞানের সেই অপরিপক্ক শৈশব অবস্থা কেটে গেছে। বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হচ্ছে, ততই বিজ্ঞান পরিণতির দিকে এগোচ্ছে, ততই বিজ্ঞানে জড়বাদের স্থলে আধ্যাত্মিকতার উদয় হচ্ছে। স্যার অলিভার লজের মত উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এখন বলতে পারছেন যে Modern science seems to be rediscovering some of the truths of ancient science which had been lost sight of-and-forgotten অর্থাৎ নব্যবিজ্ঞান প্রাচীন বিজ্ঞানের, আমরা যাকে অধ্যাত্ম বিজ্ঞান বলি, অনেক বিলুপ্ত ও বিস্মৃত সত্য সকল পুনরাবিষ্কার করছে মাত্র ! যে আসনে বসে একদিন অধ্যাপক টিনডল জড়বাদের মহিমা ঘোষণা করেছিলেন, সেই আসন হতেই মনীষী স্যার উইলিয়াম ক্রুকস্ অধ্যাত্মবাদ প্রচার করছেন। তিনি বলছেন — In life, I see the promise and potency of all forms of matter, যে মুখে বিজ্ঞান একদিন বলেছিলেন – কামনা, ভাবনা, চেষ্টনা — Feeling, Thinking, Willing এ সমস্তই মস্তিষ্কের পরিস্পন্দ মাত্র অর্থাৎ vibrations of the brain-cells, সেই মুখেই শোনা গেল 'conciousness is the absolute world – enigma (James) অর্থাৎ সম্বিৎ (চৈতন্য) বিশ্বের বিশিষ্টতম প্রহেলিকা ! যে বিজ্ঞান একদিন প্রচার করেছিল যে Survival of man বাজে কথা, দেহের নাশের সঙ্গে দেহীর উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, সেই বিজ্ঞানই স্যার অলিভার লজের মুখ দিয়ে বলাচ্ছে We are each of us larger than we know অর্থাৎ মস্তিষ্কের বাহনে ব্যাকৃত সম্বিৎ ব্যাপক বিশ্ব সম্বিতের ভগ্নাংশ মাত্র ; অর্থাৎ মানুষের জড় দেহই শেষ কথা নয়, এই জড় দেহের অন্তরালে মানুষের একটা বৃহত্তর দৈবী বা শৈবীসত্তাও আছে। স্যার অলিভার লজের Making of Man, স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর Response in the living and non-living, স্যার জেমস্ জিনসের Mysterious Universe প্রফেসর এডিংটনের The Expanding Mysterious Universe প্রভৃতি গ্রন্থ পড়লেই তা জানা যাবে। কাজেই আপনারা কেউ যদি মা নর্মদার মহিমা জ্ঞাপক কোন বই লেখেন, তাতে অবশ্যই কে কি ভাবল, না ভাবল অগ্রাহ্য করে অকপটে যা দেখেছেন তা লিখে দিবেন।

কথা শেষ হতে না হতেই তিনি একটি সুপ্রাচীন মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সেখানে কিছু যাত্রী এসেছেন পূজা করতে। তাঁরা মা নর্মদা এবং কেদারনাথের স্তব পাঠ করছেন। বুঝলাম এইটাই সহরাব গ্রামের কেদারনাথ মন্দির। পুরোহিতজী আগে আমাদের দলকে প্রবেশাধিকার দিলেন। মহাত্মা শিবের অষ্টমূর্তির প্রণাম মন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন, আমরা কেদারনাথের মাথায় কমণ্ডলুর জল ঢেলে প্রণাম করলাম। হিমালয়ে কেদারনাথের দর্শন আমি এবং আমাদের দলের আরও দুচার জন সন্ন্যাসী করেছি। আমরা সকলেই দেখে অবাক হলাম, হিমালয়ে গৌরী কেদারনাথের মতই এই শিবলিঙ্গটি একটি উল্টানো ধামার মত। মাঝখানে একটি উপবীতের টানা দাগ থাকায় গৌরী কেদারের অনুরূপ দুটি ভাগ স্পষ্ট হয়েছে।

মন্দিরের বাইরে আসতেই মহাত্মা আমাদেরকে বললেন – মহর্ষি পরাশর এখানে সন্তান কামনায় উগ্র তপস্যা করায় অভাললোচন স্বয়ং শম্ভু স্বয়ং বেদব্যাস রূপে তাঁর পুত্র হয়ে জন্মেছিলেন। মন্দির হতে কিছু দূরেই নর্মদা বয়ে যাচ্ছে। নর্মদার তীরে দাঁড় করিয়ে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন – ঐ পারের উত্তরতটকে চিনতে পারেন ? আমি সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখলাম অনেক বড় বড় নৌকা বোঝাই বাঁশ এবং কাঠ বোঝাই নৌকা দাঁড়িয়ে আছে। ওপারে একটি লাল পাথরের চৌকো পাথরের একতলা বাড়ী দেখে আমার স্মৃতিতে ভাসল যে ঐটা তিলকবাড়ার ডাকঘর হতে পারে। সে কথা জানাতেই তিনি বললেন – ঠিকই বলেছেন ঐ পারের ঐ গ্রামের নাম তিলকবাড়া। ঐখানে রামচন্দ্র কর্তৃক অহল্যা উদ্ধার পর্যন্ত গৌতম ঋষি তপস্যা করেছিলেন এবং গৌতমেশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বায়ুপুরাণের রেবাখণ্ডে ৬২-তম অধ্যায়ে গৌতমেশ্বর মহাদেবের বর্ণনা আছে। ঐ তিলকবাড়াতেই বৈবস্বত মনুর পুত্র তিলক তপস্যা করে তিলকেশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে মন্দির এখনও আছে। ভারোচ থেকে তিলকবাড়া পর্যন্ত ব্যবসায়ীরা বাঁশ ও মূল্যবান কাঠ বয়ে নিয়ে গিয়ে ব্যবসা করে। তাঁদেরই নৌকা দাঁড়িয়ে আছে। চলুন এবার যাওয়া যাক।

আমরা নর্মদাতে নেমে কমণ্ডলু ভরে নিয়ে আবার হাঁটতে লাগলাম। এদিকের পথ তত জঙ্গলাকীর্ণ নয়। পথ ঘাটও অপেক্ষাকৃত ভাল। দূরে দূরে দু-একটা পল্লীও দেখা যাচ্ছে। কাঁধে উপবীত ঝুলিয়ে অনেক ব্রাহ্মণকেও নর্মদা হতে স্নান করে আসতে দেখলাম। সকলের মুখে শিব বা নর্মদার কোন না কোন স্তব পাঠও শুনতে পেলাম। মাইল দেড়েক হাঁটার পরেই এক স্থানে মুক্ত আকাশের তলায় একটি অশ্বত্থ গাছের নিচে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত দেখে সেখানে প্রণাম করে হিরন্ময়ানন্দজী মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন – ইয়ে নানা বর্ণমেঁ রঞ্জিত মহাদেব কৌন হ্যায়। মহাত্মা উত্তর দিলেন – প্রাচীন কালমেঁ কামধেনু নে আপনে দুধসে ভগবান শংকরকা ইস্ স্থান পর অভিষেক কিয়া থা। য়হাঁ কার্তিক মাসমেঁ গোদান করনেকা বিশেষ পুণ্য হৈ। লোগোনে বোলতে হেঁ, হর শিবচতুর্দশী মেঁ ঘোর রাত্রি মেঁ কোঈ না কোঈ গোমাতা আকর আভিতক ইশ্বর মহাদেবকো দুগ্ধ স্নান করাতে হৈ॥ ইয়ে হ্যায় গুবার গ্রাম। ইয়ে গোপারেশ্বর তীর্থ কা নাম মেঁ প্রসিদ্ধ হ্যায়।

গোপারেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করে গুবার গ্রাম হতে আবার ঝাড়ি পথে এগিয়ে যেতে লাগলাম। দক্ষিণতটে চলছি ঝাড়ি পথে, চারদিকেই গাছপালার ভীড়, উত্তরতটেও সবুজ গাছপালা, মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছেন স্বচ্ছতোয়া নর্মদা। দৃশ্য মনোরম সন্দেহ নাই। এদিকে পথঘাটও ভাল। পথ দেখেই বুঝা যায়, এ দিকে লোক চলাচল আছে দূরে দূরে কিছু কিছু লোকের পল্লীও গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ছে। এইভাবে প্রায় মাইলখানিক হাঁটবার পর নাঙ্গা সাধু আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এক প্রাচীন মন্দিরের সামনে দাঁড়ালেন। বললেন – এই স্থান মঙ্গলেশ্বর তীর্থ নামে পরিচিত। এই মহল্লার নাম

মাঙ্গরোল। মন্দিরের মধ্যে রয়েছেন মঙ্গলেশ্বর মহাদেব। এখানে মঙ্গল কঠোর তপস্যা করেছিলেন। এই তীর্থ যাঁরা দর্শন করেন, তাঁদের জীবনে মঙ্গল গ্রহের যাবতীয় অশুভ ফল কেটে যায়। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, আপনি কি মঙ্গলকে মঙ্গলগ্রহ রূপেই ভাবেন নাকি?

– হ্যাঁ, নবগ্রহের অন্যতম মঙ্গল, যাঁর প্রণাম মন্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি ধরনীগর্ভসম্ভূত, বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভ, লোহিতাঙ্গ, আমি তাঁকে সেই রকম গ্রহ বলেই মানি। বৈজ্ঞানিকরা দূরবীক্ষণ যন্ত্রে অন্যান্য গ্রহের অস্তিত্ব যেমন প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনি ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন আমাদের এই পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ মঙ্গলকেও। স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে ৬৭তম অধ্যায়ে এবং বায়ুপুরাণের রেবাখণ্ডের ৬৩-তম অধ্যায়ে মঙ্গল গ্রহের তপস্যার কথা আছে।

আমি তাঁকে বললাম, মাপ করবেন এখানে আমি আপনার কথা মানতে পারলাম না। পুরাণ দুটিতে মঙ্গল গ্রহের তপস্যার যে বিবরণই থাক, তাকে অস্বীকার না করেও এখানে মঙ্গলগ্রহের তপস্যা এবং মন্দির প্রতিষ্ঠার পুরাবৃত্তের চেয়েও মন্দিরে যে মঙ্গলেশ্বর মহাদেব আছেন, তাঁর অস্তিত্বকেই আমি বেশী করে মানব। যিনি এই মহাদেবের নামকরণ করেছিলেন, বৈদিক ব্যাকরণে যে তাঁর অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল, এই নামকরণই তার প্রমাণ। আমি বাবার কাছে শিখেছি, মেগি) গত্যর্থক ধাতু হতে 'মঙ্গেরলচ্' এই সূত্রানুসারে 'মঙ্গল' শব্দ সিদ্ধ হয়। 'যো মঙ্গতি মঙ্গয়তি বা স মঙ্গলঃ' যিনি স্বয়ং মঙ্গলস্বরূপ এবং সর্বজীবের মঙ্গলের কারণ, সেই পরমেশ্বরের নাম 'মঙ্গল'। মহাদেব ত স্বয়ং মঙ্গলস্বরূপ বটেই। 'মঙ্গেরলচ্' সূত্রটির উচ্চারণ সংকেত থেকে এই গ্রামের মাঙ্গরোল নামকরণের তাৎপর্যও বুঝা যায়।

– তাহলে এর আগে জীগোর বা জিমুতপুর মহল্লায় যে শনি এবং বৃহস্পতির তপস্যাক্ষেত্র দেখে এলাম, সেই স্থানগুলির মাহাত্ম্যও তাহলে আপনি মানতে প্রস্তুত নন?

– মানব না কেন, তবে যদি শনি বা বৃহস্পতি বলতে যদি কোন দেবযোনি বা কোন ঋষিপুত্রকে বুঝায়, তাহলে তা মানতে বাধ্য, নতুবা নয়। যেমন ধরুন, দেবতাদের গুরুরূপে বৃহস্পতি সর্বজনমান্য। তিনি মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র, হিরণ্যবর্ণ পুরুষ, যোগ ও জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ। দৈত্যদের গুরু শুক্রাচার্য ছিলেন মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যায় পারঙ্গম। যুদ্ধে দেবতাদের দ্বারা কোন দৈত্যের মৃত্যু ঘটলে, তিনি মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা প্রভাবে তাঁকে বাঁচিয়ে তুলতেন। সেই জন্য বৃহস্পতি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কচকে শুক্রাচার্যের কাছে যে কোন কৌশলে ঐ সঞ্জীবনী বিদ্যা আয়ত্ত করতে পাঠিয়েছিলেন। এই বৃত্তান্ত বেদব্যাস প্রণীত মহাভারতে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। বিষ্ণুপুরাণে আছে, বৈবস্বত মন্বন্তরে, চতুর্থ দ্বাপরে বৃহস্পতি ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করে বেদবিভাগ করেছিলেন। যে কোন মন্বন্তরে, যে কোন যুগে সেই ঋষি, ঋষিপুত্র বা দেবগুরু জীগোরের নর্মদাতটে এসে তপস্যা করতে পারেন। কারণ শিবভূমি নর্মদার তট ছাড়া তপস্যার শ্রেষ্ঠ সিদ্ধিপ্রদ স্থান আর কোথায় আছে? তাই বলে বায়ুপুরাণের গ্রন্থকার লিখেছেন বলে আমাকে মেনে নিতে হবে যে আকাশমণ্ডলে অবস্থিত বৃহস্পতি নামক গ্রহ যা বৈজ্ঞানিকদের দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে সেই স্থূল গ্রহ তার কেন্দ্র ছেড়ে জীগোর মহল্লায় বসে তপস্যা করেছিলেন, এ হল বায়ু পুরাণ-রচয়িতার স্বকপোলকল্পিত অবাস্তব কল্পনা মাত্র। সিংহরাশিতে বৃহস্পতির যখন সঞ্চার হয়, সে সময় জীগোরের ঐ নির্দিষ্ট তটে দান তপ করলে অনেক পুণ্য কিংবা কুম্ভরাশিতে শনির প্রবেশ ঘটলে সে সময় দান ধ্যানে অনেক পুণ্য, এ সব কথা শুনলে সহজেই বুঝা যায়, ঐ পুরাণ লেখক নিশ্চয়ই কোন জ্যোতিষী মহারাজ ছিলেন। তিনি কোন বেদবিৎ তপস্বী হলে নিশ্চয়ই কল্পনার দ্বারা এক সুবিশাল আয়তনের গ্রহকে তপস্যার জন্য টেনে নামাতেন না! বেদাধ্যয়নের প্রভাবে তাহলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝতেন যে, 'বৃহৎ' শব্দ পূর্বক (পা রক্ষণে) এই ধাতুর উত্তর 'ডতি' প্রত্যয়, 'বৃহৎ' শব্দের ত কারের লোপ এবং সুডাগম হওয়াতে 'বৃহস্পতি' শব্দ সিদ্ধ হয়।

যো বৃহতামাকাশাদীনাং পতিঃ স্বামী পালয়িতা স বৃহস্পতিঃ, যিনি মহানদের চেয়েও মহান এবং যিনি আকাশাদি ব্রহ্মাণ্ড সমূহের অধিপতি, সেই পরমেশ্বরের নাম বৃহস্পতি।

শনি সম্বন্ধেও আমার একই কথা। পুরাণকারের জ্যোতিষজ্ঞানে শনি বলতে জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রহরাজ শনিগ্রহের কথা মনে পড়ছে। কিন্তু বৃহস্পতি গ্রহের মত শনিগ্রহও ঐখানে নেমে এসে তপস্যা করেছিলেন, এইরকম অবাস্তব কথা মানতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। বৃহস্পতি যেমন মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র এবং দেবতার গুরু ছিলেন, তেমনি শনিও ছিলেন সূর্যের পুত্র। সূর্যপত্নী ছায়ার গর্ভে দুইপুত্র শনি এবং সাবর্ণি মনুর জন্ম হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে, একসময় শনি ধ্যানমগ্ন এবং পূজারত ছিলেন, সেইসময় তাঁর স্ত্রী ঋতুস্নান করে সুন্দর বেশভূষা করে তাঁর কাছে এসে নিজের মনোভাব প্রকাশ করেন, কিন্তু ধ্যানমগ্ন শনি স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন না, তাঁর ঋতুরক্ষা করলেন না। এতে স্ত্রী ক্রুদ্ধা হয়ে স্বামীকে শাপ দেন – তুমি যার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে, তারই মুণ্ড উড়ে যাবে। পার্বতীর পুত্র গণেশ জন্মগ্রহণ করলে দেবতারা নবজাতককে দেখতে গিয়েছিলেন। শনিও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি পার্বতী-তনয়ের দিকে তাকালেন না। মা পার্বতী এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান যে স্ত্রীর অভিশাপ আছে, তিনি যার দিকেই তাকাবেন, তারই মুণ্ড উড়ে যাবে। কিন্তু একথা অবিশ্বাস করে তাঁর পুত্র মুখ সন্দর্শনের জন্য পীড়াপীড়ি করলে শনি বাধ্য হয়ে গণেশের দিকে দৃষ্টিপাত করা মাত্র গণেশের মাথা ছিন্ন হয়ে যায়। পুত্রকে মস্তকহীন দেখে ক্রুদ্ধা পার্বতী শাপ দিলেন। এর ফলে শনি খোঁড়া হয়ে গেলেন।

পুরাণের এই গল্প অক্ষরশঃ বিশ্বাস না করতে পারলেও এর থেকে এটা অন্ততঃ প্রমাণিত হয় যে শনি mere a planet নন, তিনি ছিলেন একজন Sentient being.

পাণিনি ব্যাকরণানুসারে শনি শব্দের ব্যুৎপত্তি করলেও দেখা যায়, (চরগতিভক্ষণয়োঃ) এই ধাতুর সঙ্গে 'শনৈস্' অব্যয় উপপদ যোগে 'শনৈশ্চর' শব্দ সিদ্ধ হয়। 'যঃ শনৈশ্চরতি স শনৈশ্চরঃ' যিনি সকলের মধ্যে সহজেই প্রাপ্ত এবং ধৈর্যবান, সেই পরমেশ্বরের নাম শনৈশ্চর বা শনি।

মাঙ্গরোল গ্রামে মঙ্গলেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করে ঝাড়ি পথে হাঁটতে হাঁটতেই আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম, পথের উপর পাথরে ঠোকর খেয়ে পাছে না কেউ পড়ে যাই, এজন্য মুখে কথা বললেও আমাদের চোখ ছিল পথের দিকে। প্রায় এক বা দেড় মাইল হাঁটার পড়েই চোখে পড়ল পূর্ব দিক থেকে যেমন নর্মদা বয়ে চলেছেন পশ্চিম সমুদ্রের দিকে, তেমনি নর্মদার পাশে পাশে পূর্ব দিক থেকে আর একটি ছোট নদী এসে মিশেছে নর্মদার সঙ্গে। নাঙ্গা মহাত্মাকে এই নদীর কথা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন – 'এই নদীর নাম অনভবাহী নদী। এই নদীর পশ্চিমদিকে তাকিয়ে দেখুন, একটি প্রাচীন মন্দির দেখা যাচ্ছে। চন্দ্রবংশীয় ভীম নামক এক রাজা ঐ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। মন্দির জীর্ণ হয়ে পড়েছে। ঐখানকার প্রতিষ্ঠিত মহাদেব ভীমেশ্বর। ইতিপূর্বে আমরা মৃগাল ঋষির তপোবনে আবির্ভূত আর একটি ভীমেশ্বর মন্দির দেখে এসেছি। মনে পড়ে কি, যেখানে রাত্রিবাস করতে গিয়ে আপনারা সকলেই ভৈরবের হুঙ্কার ধ্বনি শুনতে পেয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন ? ভীমেশ্বর মন্দিরের পাশেই যে আর একটি মন্দির দেখা যাচ্ছে ঐ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সহস্রার্জুন। ঐ মন্দিরে চলুন, ঐখানে নর্মদার ঘাট বাঁধানো আছে। আমরা তাঁর নির্দেশে সহস্রার্জুনের শিবমন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। এই শিবের নাম অর্জুনেশ্বর। তিনি জঙ্গলপথে হাঁটতে হাঁটতেই অর্জুনেশ্বরের গল্প প্রসঙ্গে বললেন – হৈহয় বংশের নরপতি সহস্রার্জুন ছিলেন প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা। নর্মদাতটেই মাহিষ্মতী নগরী ছিল তাঁর রাজধানী। তাঁর গুরুদেব দত্তাত্রেয়ের আশীর্বাদে তিনি বহু ঋদ্ধি সিদ্ধি আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি মহা শৈব ছিলেন। তিনি একবার কিছুদিনের জন্য শিব তপস্যায় ব্রতী

হন। সেইসময় লঙ্কাপতি রাক্ষসরাজ রাবণ এসে তাঁর যুদ্ধ প্রার্থী হন। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর মহাবাহু সহস্রার্জুন তাঁকে বগলদাবা করে রেখে দেন। আপনাদের বাংলা রামায়ণে এই প্রসঙ্গে অনেক সরস কাহিনী আছে। রাবণ কাতর হয়ে ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করলে সহস্রার্জুন তাঁর আজ্ঞায় রাবণকে মুক্তি দিয়েছিলেন। রাবণকে মুক্তি দিবার পর তিনি এখানে অর্জুনেশ্বর মহাদেবকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কথা বলতে বলতে আমরা অর্জুনেশ্বর ঘাটে পৌছে গেছি। রঞ্জন বলল তার ঘড়িতে সাড়ে ১১টা বেজেছে। আমি নাঙ্গা মহাত্মাকে বললাম – আমি উত্তরতট পরিক্রমার সময় মান্দালাতেও এক অর্জুনেশ্বর মহাদেব দর্শন করে এসেছি। শুনেছি সেই মন্দিরস্থ মহাদেবও নাকি মাহিষ্মতীরাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। নাঙ্গা মহাত্মা বললেন – তা হতেই পারে, অবিশ্বাস করার কিছু নাই। প্রাচীন যুগে ধার্মিক রাজারা শিবভূমি নর্মদার তটে তটে একাধিক শিব প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। স্বামী বাসবানন্দজী নাঙ্গা মহাত্মাকে বললেন, এইমাত্র অনভবাহী নদীর নর্মদার সঙ্গে যে সঙ্গমস্থল দেখে এলাম, সেই অনভবাহী নদীর উৎসস্থল সম্বন্ধে কিছু শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে। অনভবাহী নদী কোন্ পাহাড় থেকে বেরিয়েছে ? নাগাজী মুখ খোলার আগেই হিরন্ময়ানন্দজী বললেন – ম্যায় শুনাতি হুঁ। ইস সম্বন্ধ কী কথা ইস্ প্রকার হৈ – শিবজী ঔর পার্বতীজী ইধর আকর শয়ন কর রহে থে। দ্বারপর নন্দীশ্বর পাহারা দে রহে থে। উসী সময় দৈত্যোঁ নে উহাঁ আকর উপদ্রব আরম্ভ করা দিয়া। নন্দীশ্বর নে বহুত সমঝায়া – 'ভগবান ইস সময় আরাম কর রহে হৈ, তুমলোগ উপদ্রব মত করো'। কিন্তু উহ্ মানে হী নহিঁ। দোনো মেঁ তব্ যুদ্ধ ছিড় গয়া। নন্দীশ্বর অন্তমেঁ উন্ দৈত্যোঁ কো মার ডালা। নন্দীশ্বর কে খুরোঁ সে উহাঁ ভারী গাড্ডা হো গয়া। উসী গাড্ডা মেঁ সে য়হ্ অনভবাহী নদী নিকল পড়ী। রাত্রিভর যুদ্ধ করনে সে নন্দীশ্বরকে শরীরসে জো স্বেদ (পসীনা) নিকলা উহ্ ইস্ নদীকে জলকে সাথ বহকর নর্মদাজী মেঁ মিল গয়া। ইয়ে হম্ বোলতা হৈ বায়ুপুরাণ ঔর স্কন্দপুরাণোঁ কা রেবাখণ্ডসে। পতা নেই, শৈলেন্দ্রনারায়ণজী ইয়ে কহানী বিশ্বাস করেগা কি নেহি।

আমি বললাম – আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কি যায় আসে ? আপনি ঐ দুটি পুস্তকে যেমন পড়েছেন, তেমনি ত বলবেন। প্রাচীন কাহিনী সবই ত আমাদের দেশে লেখা আছে পুরাণে। পুরাবৃত্ত লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে আমাদের দেশের লেখকরা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সময়ে অনেক সংযোজন করে থাকতে পারেন, তার কতটা গ্রহণযোগ্য তা নিজের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগে নির্ণয় করতে হয়, তার অক্ষরশঃ গ্রহণ করতে হবে এমন কোন কথা নাই, তবে পুরাণের পুরাবৃত্তকে একেবারে নস্যাৎ করে সত্য উদ্ধার যে করা যাবে না, একথা আমি জানি এবং মানি।

আমার কথা শেষ হতে হতেই দড়াম করে এক প্রচণ্ড শব্দে অর্জুনেশ্বরের মন্দিরের দরজা খুলে গেল। আমরা সকলেই চমকে উঠলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম হয়ত নর্মদার দিক হতে উত্তরের ঝাপ্টা বাতাসের ধাক্কায় দরজাটা খুলে গেল। কিন্তু পরে দেখলাম, না ! দমকা বাতাসের ঝাপটায় নয়, মন্দিরের অভ্যন্তর হতে একটা কালো রং-এর কলস হাতে নিয়ে এক শুভ্রবসনা শুক্লকেশা এক বৃদ্ধামায়ী বেরিয়ে এসে আমাদের সামনে বসলেন। কলসীভরা দুধ এবং একটি তামার গ্লাস রাখলেন আমাদের সামনে। বললেন – হম অগল বগল মেঁ হি নিবাস করতা হুঁ। ইধর ভগবান কা পাশ মে বৈঠকর জপ করতা থা। কোঈ জানোয়ার আকর তন্ না করে, ইসীওয়াস্তে হম্ কেয়াড়ী বন্ধ কিয়া থা। দণ্ডী সন্ন্যাসীয়োঁকে দুধ পিলানেকে লিয়ে হমারা বহুৎ দিনোঁ সে সংকল্প থা, আজ ভগবান অর্জুনেশ্বরকী কৃপা সে মুঝে মোকা মিলা। লেও দুধ পিজিয়ে। এই বলে তিনি কলসীতে তামার গ্লাস ডুবিয়ে ডুবিয়ে আমাদেরকে দুধ দিতে থাকলেন প্রত্যেকের কমণ্ডলুতে। আমরা দুধ পান করতে লাগলাম। সবার শেষে নাগাজীকে তামার গ্লাস ভর্তি দুধ দিয়ে বললেন – আপকা পাশ ত তনিকভর কুছ নেহি, না লোটা, না কমণ্ডলু। আপ্ ইসীমেঁ দুধ পিকর ইয়ে পাত্র নর্মদামেঁ

বিক দেনা। হমারা পাশ দুসরা পাত্র হ্যায়। মাতাজী যখন দুধের পাত্রটি নাগা বাবাকে এগিয়ে দিলেন, তখনই নাগাজীর উপর দৃষ্টি পড়ল। দেখলাম, তিনি থরথর করে কাঁপছেন। যাঁকে এতদিনের মধ্যে একবারও খেতে দেখিনি, না দুধ না ফল, এমন কি জলও নয়, আজ দেখলাম, তিনি সাগ্রহে মায়ীর হাত থেকে দুধের গ্লাস নিয়ে এক চুমুকেই শেষ করে ফেললেন। মায়ী দুধের কলস হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেলেন, নিকটস্থ ভীমেশ্বর মন্দিরের দিকে। যেতে যেতে পিছন ফিরে বলে গেলেন – আজ আপলোগো নেঁ ইধার ঠার সকতে হৈ। জন্তু জানোয়ার বগেরাঁ কো কোঈ ডর নেহি। নাগাজীর কাঁপুনি আর থামে না। তিনি কাঁপতে কাঁপতেই শুয়ে পড়লেন, মন্দিরের দাওয়ায়।

বাসবানন্দজী বললেন – আমাদেরকে আজ যখন এখানে থাকতেই হবে, তখন নাগাজী এখানে শুয়ে থাকুন, আমরা পাশাপাশি যে তীর্থগুলি আছে, যেমন ভীমেশ্বর, ধর্মরাজ প্রতিষ্ঠিত ধর্মেশ্বর মন্দির, কিছুদূরেই যে লুঙ্কেশ্বর তীর্থ, জটেশ্বর তীর্থ সেগুলি দর্শন করে আসি চলুন। তাঁর প্রস্তাবে হিরন্ময়ানন্দজী রাজী হলেন। প্রথমেই আমরা গেলাম ভীমেশ্বর মন্দিরে। অনভবাহী নদীর পশ্চিমভাগে এই মন্দির অবস্থিত। মন্দিরে কোন দরজা নাই, ভেঙ্গে গেছে মন্দিরেরও জীর্ণ দশা। মন্দিরের অভ্যন্তর জলে পরিপূর্ণ। দরজার বাইরে থেকে ভীমেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করে গেলাম ধর্মেশ্বর মন্দিরে। ধর্মরাজ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অর্জুনেশ্বর মন্দির অতিক্রম করে যাবার সময় দেখলাম, নাঙ্গা মহাত্মা একই রকমভাবে পড়ে আছেন মন্দিরের চাতালে। তাঁর কোন হুঁস আছে বলে মনে হল না। ধর্মেশ্বর মন্দির হতে কিছুটা হেঁটে আমরা লুঙ্কেশ্বর তীর্থে গিয়ে পৌছলাম। এখানে কোন মন্দির নাই। হিরন্ময়ানন্দজী বললেন – কশ্যপ ঋষির এক পুত্র কালপৃষ্ঠ বা ভস্মাসুর নামক দৈত্য এখানে কঠোর তপস্যা করে শিবের কাছে এই বর প্রার্থনা করেন যে দেব দৈত্য গন্ধর্ব যাঁরই মাথায় সে হাত দিবে তার হস্তস্পর্শে যেন স্পৃষ্ট ব্যক্তির মাথা উড়ে যায়। দৈত্যের কাতর প্রার্থনায় বিগলিত হয়ে আত্মভোলা ভাঙ্গড়ভোলা সদাশিব দৈত্যকে সেই বরই দিয়ে ফেলেন। বর প্রাপ্তির পরেই স্বভাব-দুর্বৃত্ত দৈত্য তার নিজ মূর্তি ধারণ করে। সে মহাদেবের মাথায় হাত দিয়ে তার প্রাপ্ত বরের সত্যতা পরীক্ষা করতে চায়। শিব চারদিকে ইতস্ততঃ দৌড়াতে থাকেন। অবশেষে তিনি ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হয়ে বলেন – আপনি তাড়াতাড়ি নর্মদার জলে লুক্কায়িত হোন, আমি দৈত্যের মহড়া নিচ্ছি। এই বলে তিনি অসামান্য রূপ লাবণ্যবতী এক মোহিনীর মূর্তি ধারণ করে দৈত্যের কাছে আবির্ভূত হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে বলেন – ছিঃ ছিঃ! ইতনে বড়ে দৈত্যরাজ হোকর উন্ ভূতপেতোঁ কি স্বামী কী বাতোঁ মেঁ কেঁও দৌড়াতা হৈ? ফির তুমহারে পাস শিব নহী হৈ ক্যা? পহিলে পরীক্ষা কর লো। আও মেরে সাথ নৃত্য করো। বিষ্ণুর বিষ্ণু মায়ায় মোহিত হয়ে দৈত্য যখন রভস্ আনন্দে কামচঞ্চল হয়ে পড়ল, তখন সেই মোহিনীরূপী বিষ্ণু তাকে বলল, তুমি আমাকে বিবাহ না করলে ত তোমাকে দেহদান করতে পারি না। আমি গোপকন্যা। গোপকুলে বরেরা বিবাহকালে মাথায় হাত দিয়ে শপথ করে থাকে। তুমিও সেইভাবে শপথ করে আমার পাণিগ্রহণ কর, তাহলে তোমাকে আমার দেহদান করতে আর কোন বাধা থাকবে না। কামান্ধ দানব তখনই শপথ করার উদ্দেশ্যে নিজের মাথায় হাত দিল। মাথায় হাত স্পর্শ করা মাত্রই আগুনে যেমন শুকনো ঘাস পড়লে তা পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তেমনিভাবে দানবও সঙ্গে সঙ্গে ভস্মীভূত হয়ে গেল,

> কামান্ধেনৈব রাজেন্দ্র নিক্ষিপ্তো মস্তকে করঃ।
> তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎভূতো দগ্ধস্তৃণচয়ো যথা॥
>
> (রেবাখণ্ডম্, ৬৭তম অধ্যায়)

ভগবান বিষ্ণু মহাদেবকে বললেন – 'ভোলেবাবা ! এ্যায়সা বর কিসিকো মত দিয়া করো ।' এইখানে নর্মদার জল মধ্যে মহাদেব লুকিয়ে ছিলেন বলে, এই তীর্থের নাম লুক্কেশ্বর । এখানে জপ করলে জপ সিদ্ধি হয় । আমরা এখানে নর্মদার জল স্পর্শ করে লুক্কেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করলাম ।

আমি হিরন্ময়ানন্দজীকে বললাম – উত্তরতট পরিক্রমার সময় মাণ্ডালার কাছে আমি আর এক লুকেশ্বর তীর্থ দর্শন করেছি । সেখানেও জলের মধ্যে মণিময় জ্যোতির্লিঙ্গ । তাঁর নাম লুক্কেশ্বরের অনুরূপ লুকেশ্বর । হিরন্ময়ানন্দজী বললেন – আমিও সেই তীর্থ দর্শন করেছি । নর্মদাতটের প্রসিদ্ধ মহাযোগী মহর্ষি মধুমঙ্গলের ধর্মপত্নী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন বলে মহাদেবের উপর ক্রোধ ও অভিমান বশে সেই মহর্ষি মহাদেবকে নর্মদায় জলে নিক্ষেপ করেছিলেন । সেই লুকেশ্বর তীর্থও মহাজাগ্রত স্থান ।

যাই হোক, রামপুরাস্থিত আজকের এই লুক্কেশ্বর তীর্থ এবং লুকেশ্বর ভগবানকে প্রণাম করে নর্মদাতট ধরে আরও কিছুটা নীচের দিকে এগিয়ে যেতেই আমরা আর একটি শিবমন্দিরে পৌঁছলাম । মন্দিরের পাশেই কতকগুলি যজ্ঞকুণ্ডের চিহ্ন পড়ে আছে । হিরন্ময়ানন্দজী বললেন – এই মন্দিরস্থ মহাদেবের নাম ধনেশ্বর । ধনপতি কুবেরের তপস্যাস্থল । ধনেশ্বর শিব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত । সমগ্র শিবমন্দিরটি কালো পাথরের তৈরী । হিরন্ময়ানন্দজী যজ্ঞকুণ্ডের চিহ্নগুলি দেখিয়ে বললেন - এর নাম ইন্দ্রদ্রোণ । এখানে প্রাচীন রাজা এবং রাজর্ষিরা পূর্বে বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন । এখানে মাটি খুঁড়লে এখনও সুগন্ধিত যজ্ঞভস্ম পাওয়া যাবে ।

ইন্দ্রদ্রোণ হতে মিনিট তিনেক হেঁটে আমরা জটেশ্বর তীর্থে এসে পৌঁছলাম । হিরন্ময়ানন্দজী বললেন – ভস্মাসুর কা তড়না সে যব শিবজী দৌড়তে থে, তব শিবজী কী জটা খুল গয়ী, ইসী কারণ ইহ্ জটেশ্বর তীর্থ পার্বতীজী দ্বারা নির্মিত হুয়া ।

মাত্র আধ মাইল পরিসরের মধ্যে এতগুলি তীর্থ পরপর দেখতে দেখতে সাড়ে ৪টা বাজতে যায় । ঠাণ্ডা বাতাসও বইছে । আমরা দ্রুত ফিরে চললাম নর্মদার তট ধরে অর্জুনেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে । সেখানে পৌঁছে দেখি, নাঙ্গা মহাত্মা উঠে বসেছেন । তাঁর সর্বাঙ্গ অস্বাভাবিক ভাবে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে । হরানন্দজী তাঁকে দেখেই বললেন – কী ব্যাপার ! আজ যে দেখছি, সর্বাঙ্গে স্ফুরিছে জ্যোতি, আঁখিপাতে প্রশান্তির ছায়া ।

তিনি সলজ্জভাবে উত্তর দিলেন – 'আজ খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ।'

– ঘুম না সমাধি ! দেখুন মশাই আমাদের গুরুদেবের সবিকল্প আনন্দ সমাধি দর্শনের বহুবার সুযোগ হয়েছে । কামরূপ মঠের সন্ন্যাসীকে ও জিনিষ লুকাতে পারবেন না । যাক্‌গে, আপনার মত সাথী পেয়ে আমরা খুশী ।'

নাগাজী হরানন্দজীউকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন । বললেন – আমি অদূরে ধর্মেশ্বর মন্দিরে আজ রাত কাটাবো । আপনারা সকলেই এই মন্দিরে প্রবেশ করুন । ভোরেই আমি আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবো । এই বলে তিনি চলে গেলেন ধর্মেশ্বর মন্দিরের দিকে । আমরা টর্চ টিপে ঢুকে পড়লাম মন্দিরে । মন্দিরের দরজা বন্ধ করে আমরা যে যার আসনশয্যা পেতে নিলাম । মহাদেব অর্জুনেশ্বরকে প্রণাম করে আমরা বসে গেলাম সান্ধ্যক্রিয়ায় । ঘণ্টা দুই ধরে সকলে জপ ধ্যান করে সকলেই শুয়ে পড়লাম, কম্বল মুড়ি দিয়ে । আমার একপাশে হরানন্দজী এবং অন্যপাশে রঞ্জন শুয়েছেন । হরানন্দজী আমাকে ফিস্ ফিস্ করে জানালেন – আশ্চর্য বাইরে যথেষ্ট কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস ঝড়ের মত বইলেও এই মন্দিরের মধ্যে তেমন ঠাণ্ডা লাগছে না । আমি মতলব করে রেখেছিলাম, তিনদিন আগে আপনার দেওয়া এক রেণু শঙ্খিনী খেয়েছিলাম, আজও ঐ নাগা বাবার দেওয়া একমাত্রা খাবো, কিন্তু মন্দিরের মধ্যে

ততো শীত অনুভব না হওয়ায় আর খেতে ইচ্ছা করছে না। কী ব্যাপার বলুন তো, যিনি আমাদেরকে দুধ খাইয়ে গেলেন, তাঁর কথামত আমরা আজ মন্দিরে থেকেছি বলে কি, ঐ শুদ্ধসত্ত্ব মায়ীর বাক্যবলেই শীত আজ কম বলে অনুভূত হচ্ছে ? আমি ফিস্‌ফিস্ করেই বললাম – হতে পারে। ঐ মায়ী যদি তপস্বিনী হন, তাহলে তাঁর বাক্যবলে সবই সম্ভব। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে, পরে কথা হবে। এই বলে ঘুমিয়ে পড়লাম। চোখ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে এক অপরূপ দৃশ্য ফুটে উঠল। ফুটে উঠল এই মন্দির। আমরা হর নর্মদে বলতে বলতে অর্জুনেশ্বর মন্দিরে এসে পৌঁছেছি, দড়াম করে মন্দিরের দরজা খুলে গেল। সেই শুক্লবসনা শুভ্রকেশী বৃদ্ধা গলায় রুদ্রাক্ষমালা, দুধের কলসী হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। অপলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। ধীরে ধীরে তাঁর দেহাভ্যন্তর থেকে প্রকটিত হল, আর এক দিব্যাঙ্গনা, জ্যোতির্মণ্ডিতা মায়ী, সেই মায়ের ডান হাতে ত্রিশূল, বামহাতের চেটোয় এক অপূর্ব সুন্দর জ্যোতির্লিঙ্গ, লিঙ্গ হতে জ্যোতির কণা ঠিকরে পড়ছে। এখন আর সেই দুগ্ধদানরতা মাতৃমূর্তি চোখে ভাসছে না, সামনে ভাসছেন তাঁর নূতন পরিবর্তিত দিব্যরূপ ; যাঁর দেহের প্রতিটি রোমকূপ হতে যেন স্বর্গীয় সুষমা ঝরে পড়ছে। তাঁকে ঘিরে তাঁর সামনে পিছনে জটাজুট বহু মহাত্মা নতজানু হয়ে কৃতাঞ্জলি পুটে গাইছেন –

ওঁ সুখদাং সমুদাং সুরনরবন্দিতাং সর্বকামদাং শর্মদাং ॥
বন্দে নর্মদাং ॥ বন্দে নর্মদাম্ ॥
ওঁ উজ্জ্বলাঙ্গীং নতজনতারিণীম্ তূর্ণগামিনীং জনবনচারিণীং।
তরঙ্গিণীং তত্তটশোভিনীম্ শুভদাং বরদাং কর্মদাম্ ॥
বন্দে নর্মদাম্ ॥ বন্দে নর্মদাম্ ॥

বিহ্বল ও বিভোর হয়ে এই দৃশ্য দেখতে লাগলাম। মনে আর আনন্দ ধরে না। তারপর ধীরে ধীরে সেই দৃশ্য অন্তর্হিত হয়ে গেল। আমি জেগে উঠলাম। ঘর অন্ধকার, চোখ খুলেও কিছু দেখতে পাচ্ছি না, পাখীর কলরব শুনে বুঝতে পারছি, সকাল হয়ে গেছে। উঠে বসলাম। হাতের কাছে টর্চটা টিপে দেখলাম, একমাত্র বাসবানন্দজী এবং তুরীয় চৈতন্য নামক ব্রহ্মচারী ছাড়া আর সকলেই উঠে বসেছেন। হরানন্দজী, প্রেমানন্দ প্রভৃতি দণ্ডী সন্ন্যাসীরা নীরবে কাঁদছেন। আমি উঠে বসেছি দেখে হিরণ্ময়ানন্দজী অশ্রুসজল কণ্ঠে বলে উঠলেন – হম্ সচ্ কহতা হুঁ, দুপহরমেঁ যো মায়ী হম্ লোগোঁকো দুধ দিয়া থা, উনোনে স্বয়মেব নর্মদা। হরানন্দজী কাঁদতে কাঁদতেই বললেন – সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই। তবে দুঃখ এই স্বপ্নে মা তাঁর পরিচয় দিয়ে গেলেন, জাগ্রতাবস্থায় মাকে চিনতে পারলাম না। তখনই আমার হাতদুটো নিস্ পিস্ করছিল পা দুটো জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু দণ্ডী সন্ন্যাসীর ফালতু মর্যাদাবোধ আমাকে সে কাজ হতে বিরত করেছে। প্রেমানন্দ এবং আরও দুজন সন্ন্যাসী একসঙ্গে বলে উঠলেন – আমরা স্পষ্টাস্পষ্টি বলছি, স্বপ্নে দেখলাম, সেই বৃদ্ধামায়ীর শরীর ধীরে ধীরে রূপান্তরিতা হয়ে মা নর্মদার যে ধ্যানমূর্তির বর্ণনা মহর্ষি মার্কণ্ডেয়, জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য এবং মহর্ষি কপিল প্রভৃতি দিয়ে গেছেন, সেইরকম শ্বেতাম্বরা শিবকন্যার দিব্যরূপ ফুটে উঠেছিল। হরানন্দজী আবার বললেন – নাঙ্গা সাধু ঠিকই মায়ের প্রকৃতস্বরূপ বুঝতে পেরেছিল, তাই তাঁর দেহে মনে অস্বাভাবিক স্ফূর্তির প্রকাশ ঘটেছিল। বেটা, বিন্দুমাত্র আভাষ দিলেন না, একা একা সমাধির আনন্দ ভোগ করলেন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে রঞ্জন গেয়ে উঠলেন –

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়বো না মা।
আমি তোমায় ছাড়বো না।
মাগো! আমি তোমার চরণ করব শরণ
আর কারও ধার ধারব না।

কে বলে তোর দরিদ্র ঘর, হৃদয়ে তোর রতনরাশি –
আমি জানি গো তার মূল্য জানি।
পরের আদর কাড়ব না মা, পরের আদর কাড়ব না।
মানের আশে দেশবিদেশে, যে মরে সে মরুক ঘুরে –
তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা –
ভুলতে সে যে পারব না, ভুলতে সে যে পারব না।
ধনে মানে লোকের টানে, ভুলিয়ে নিতে চায় যে আমায় –
ওমা, ভয় যে জাগে শিয়র - বাগে –
কারও কাছেই হারব না মা, কারও কাছেই হারব না।
যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়বো না মা!
আমি তোমায় ছাড়বো না।

গান শেষ করে একতারাটি মাথায় ঠেকিয়ে রঞ্জন অঝোরে কেঁদে চলেছে। শুধু রঞ্জনই নয়, তার এই সময়োপযোগী গান শুনে আমাদের সকলেরই চোখে জল। ধীরে ধীরে মন্দিরের প্রকাণ্ড দরজা খুলে গেল। মুগ্দল ঋষির তপস্যাক্ষেত্রে সেখানকার ভীমেশ্বর মন্দিরে দরজায় যেমন বড় একটা পাথর ঠেকা দেওয়া হয়েছিল, এইখানে সেইরকম কোন ঠেকা দিতে আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। নাঙ্গা মহাত্মা তাঁর অভ্যাস মত নর্মদাতে ডুব দিয়ে এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর গা হতে জল ঝরে পড়ছে। দরজা খুলে যেতেই দেখতে পেলাম, চারদিক ফাঁকা হয়ে গেছে। নর্মদার জল কুয়াশায় ঢেকে থাকলেও স্পষ্টতঃ দিনের আভাষ ফুটে উঠেছে চারদিকে, আমরা যে যার ঝোলা গাঁঠরী গুছিয়ে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। তখনও বাসবানন্দজী এবং তুরীয় চৈতন্য ঘুমিয়ে ছিলেন। হরানন্দজী তাঁদেরকে ধাক্কা দিয়ে তুললেন। তাঁরা দুজনে ধড়মড় করে উঠেই তাঁদের ঝোলা গাঁঠরী বাঁধতে বাঁধতে বললেন – এমন ঘুম অনেকদিন ঘুমাইনি। হরানন্দজী টিপ্পনী কাটলেন – মোহান্ত হবার জন্য গুরুদেবের মৃত্যু টেকে বসে আছেন। আপনি যে কামরূপ মঠের পবিত্র গদীতে বসে কোনদিন মোহান্তাই ফলাতে পারবেন না, এ সম্বন্ধে আজ আমি নিশ্চিন্ত হলাম। মা নর্মদা শেষরাত্রে আমাদের কাছে এসেছিলেন। আপনাকে অঘোরে ঘুমাতে দেখে বলে গেলেন, বেচারার মোহান্ত হবার খুব লোভ, কিন্তু এর ভাগ্যে শিকা ছিঁড়বে না।

কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী!
সে যে কাছে এসে বসেছিল, তবুও জাগিনি!

হরানন্দজীর কথা শুনে বাসবানন্দের চোখে মুখে খুবই বিরক্তি এবং রাগ ফুটে উঠল। এই সময় হিরন্ময়ানন্দজী হেঁকে উঠলেন – হরানন্দ! অর্জুনেশ্বর আমাদেরকে খুবই দয়া করেছেন, চল নর্মদায় স্নান করে বাবার মাথায় এক কমণ্ডলু করে জল ঢেলে যাই। তাঁর কথা শুনে আমরা সকলেই দল বেঁধে গেলাম নর্মদায় স্নান করতে। দলনেতার হুকুম অমান্য করতে বাসবানন্দজীর সাহস হল না। তিনিও ব্যাজার মুখে স্নান করতে নামলেন। বাইরে কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা থাকলেও নর্মদায় স্নান করে উঠতেই গা গরম হয়ে উঠল। আমরা প্রত্যেকেই কমণ্ডলু ভরে জল নিয়ে এসে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে অর্জুনেশ্বরের মাথায় জল ঢাললাম। মহাদেবকে প্রণাম করেই কৌপীন এঁটে যে যার জামা সোয়েটার পরে নিয়ে পুনরায় কমণ্ডলু ভরে পূর্ব-দক্ষিণ কোণ অর্থাৎ অগ্নিকোণ ধরে হাঁটতে লাগলাম। তখন সাড়ে সাতটা বেজেছে। আকাশে সূর্যোদয় হচ্ছে। নাঙ্গাজী রামপুরার বিপরীত দিকে অর্থাৎ উত্তরতট দেখিয়ে বললেন – ওপারের নাম রেঙ্গন। সেখানে কামেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে বলে ওখানের নাম কামেশ্বর তীর্থ। গণেশজীর তপস্যাক্ষেত্র। তাই ওখানে সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং পার্বতীজীর পূজা করলে সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। আমরা পথ চলতে চলতেই কামেশ্বর, গণেশ ও পার্বতীজীকে প্রণাম করলাম।

ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ। কোথাও কোথাও এই ঝাড়ি পথে গাছের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হলেও পথ বড় প্রস্তরময়। উঁচু নিচু পথ দিয়ে উঠা নামা করতে করতে 'হর নর্মদে' ধ্বনি দিতে দিতে প্রায় দুই মাইল যাবার পর সূরযবর গ্রামে পৌছে গেলাম। গ্রামে ঢুকে গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে এক প্রাচীন মন্দিরের সামনে দাঁড় করিয়ে নাঙ্গা মহাত্মা বললেন – এখানে মহাদেবেরই মুণ্ড নামক এক গণ সেবাপরাধে অভিশপ্ত হয়ে মনুষ্য যোনিতে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হন। জন্মান্তর হলেও মহাদেবের দয়ায় তাঁর স্মৃতি লোপ হয় নি। জাতিস্মর এক ব্রাহ্মণ বালক হয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং পূর্বজন্মের সংস্কারবশে নর্মদাতটের এইখানে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হন। সিদ্ধিলাভের পর এখানে মুণ্ডেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করে যোগস্থ হয়ে দেহরক্ষা করেন; মহাদেবের কৃপায় তিনি পুনরায় গণ রূপে গৃহীত হন। মুণ্ডেশ্বরকে প্রণাম করার পর তিনি আমাদেরকে কিংশুক, কাঁঠাল, পাটল, অগস্তি এবং শালবনের ভিতর দিয়ে উঁচু নিচু পথে প্রায় একমাইল পূর্বদিকে হাঁটিয়ে নর্মদাতটে নিয়ে গিয়ে বললেন – এই তীর্থের নাম মাতৃতীর্থ। এখানে সপ্তমাতৃকা তপস্যা করেছিলেন। তাঁদের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে উমার্ধশরীর নাগযজ্ঞোপবীতধারী মহাদেব তাঁদের কাছে আবির্ভূত হয়ে বলেন – তোমরা এখানে থেকে সর্বজীবের দুঃখহরণ কর, উমার্ধধারীর্দেবেশো ব্যালযজ্ঞোপবীত ধৃক্। উবাচ যোগিনীবৃন্দং কষ্টস্কষ্টমহো হর॥ আপনারা ইচ্ছা করলে এখানে কিছুক্ষণ জপ বা তর্পণ করুন।

তাঁর নির্দেশ এবং ঐকান্তিক ইচ্ছা দেখে আমি ছাড়া সকলেই নর্মদা স্পর্শ করে জপ করলেন। আমি নর্মদায় নেমে পিতৃতর্পণ করলাম।

এই মাতৃতীর্থের পাশেই কিছু দূরে নর্মদার তীরেই এক বিশাল নর্মদা মায়ের প্রস্তরমূর্তি স্থাপিত আছে দেখলাম। চতুর্ভুজা মূর্তি, বামপাশের উপরের হাতে পূর্ণকুম্ভ, নিচের হাতে করতলে একটি শিবলিঙ্গ, ডানদিকের নিচের হাতে অভয়মুদ্রা, উর্দ্ধে উত্তোলিতা অপর হস্তে জ্যোতির শিখা। শিল্পীর গঠন পরিপাট্য এমনই যে কতশত বৎসর পূর্বে এই মূর্তি গড়া হয়েছিল তা নির্ণয় করা কঠিন, কিন্তু এখনও মূর্তিটিকে জীবন্ত বলে মনে হচ্ছে। নাঙ্গা সাধু বললেন– সূর্যবংশীয় কোন রাজা এখানে তপস্যা করে মা নর্মদার দর্শন পেয়েছিলেন। তিনিই সাধনায় কৃতকৃত্য হয়ে মায়ের এই বিশাল মূর্তি স্থাপন করে গেছেন। এই তীর্থ নর্মদাতীর্থ নামে বিখ্যাত।

আমরা সেখানে প্রণাম করে আবার এগিয়ে চললাম। একই ঝাড়ি পথ প্রস্তর এবং কঙ্করময়। এই পথে একটা বৈশিষ্ট্য দেখলাম, পথের চারদিকে শাল অর্জুন বিল্ববৃক্ষ ত আছেই, তাছাড়াও আছে তিন্দুক পাটল শমী পুন্নগে, নারকেল এবং খদির গাছ। প্রায় এক মাইলেরও কিছু কম রাস্তা হাঁটার পরেই এক জায়গায় পৌঁছেই নাঙ্গা সাধু জানালেন– এই স্থানের নাম সাঁজরোলী। সূর্যের তপস্যা ক্ষেত্র। একটি জীর্ণ প্রাচীন মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বারবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে লাগলেন। প্রণাম করতে করতেই আমাদেরকে বললেন– এই মন্দিরের ভিতরে রবীশ্বর শিবলিঙ্গ স্বয়ং রবি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের মুখ উত্তরদিকে অর্থাৎ নর্মদার দিকে। মন্দিরের সামনের কিছুটা অংশ ধ্বসে যাওয়ায়, মন্দিরে প্রবেশ করে প্রণাম করা দুরূহ। নাঙ্গা সাধু একবার উঠছেন, একবার পড়ছেন, বারবার গোড়ালুটি খাচ্ছেন এখানকার পাথরের উপরে। মুখে অবিরত গেয়ে চলেছেন–

ভাস্বৎ রত্নাঢ্যমৌলিঃ স্ফুরদধররুচা রঞ্জিতশ্চারুকেশো
ভাস্বান্ যো দিব্যতেজাঃ করকমলযুতঃ স্বর্ণবর্ণঃপ্রভাভিঃ।
বিশ্বাকাশাবকাশ গ্রহপতি শিখরে ভাতি যশ্চোদয়াদ্রৌ
সর্বানন্দপ্রদাতা হরিহরনমিতঃ পাতু মাং বিশ্বচক্ষুঃ॥

তিনি প্রণাম শেষ করতেই হরানন্দজী ভক্তিভরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন– এতদূর আমরা আপনার সঙ্গে আসছি। নর্মদার এই দক্ষিণতটস্থ বহু পুণ্যতীর্থ অতিক্রম করে এলাম। আপনাকে ত আর কোথাও এইরকমভাবে পথের ধুলিতে গোড়ালুটি খেতে দেখলাম না! এখানে এত উচ্ছ্বাসের কারণ কি ? এই রবীশ্বর শিবলিঙ্গের কি বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য আছে ?

তিনি মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলেন– নর্মদার উভয়তটই শিবভূমি। অমরকন্টক হতে ভারোচ পর্যন্ত সর্বত্র শিব সমানভাবে বিরাজমান। তবুও আমি পারলে এই সাঁজরোলী গ্রামের সবটাই গোড়ালুটি খেতে খেতে যেতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। কারণ, আমার গুরুদেবের মুখে শুনেছিলাম, সুদূর অতীতে কোন এক সময় তীর্থ যাত্রার উদ্দেশ্যে নর্মদাতটে এসে উদ্দালক, বশিষ্ঠ, মান্ডব্য, গৌতম, যাজ্ঞবল্ক্য, গর্গ, শান্ডিল্য, গালব, নাচিকেত, বিভাণ্ডক, বালখিল্যগণ, শতাতপ, জৈমিনি, গোভিল, জৈগীষব্য এবং শতানীক – এতগুলি ঋষি এই সাঁজরোলী গ্রামে এসে বাস করেছিলেন। তাই আমার চোখে এখানকার প্রতিটি ধূলিকণাই পবিত্র। তাঁর কথা শুনে আমরা সকলেই সেখানে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলাম এবং কিছু ধূলা হাতে নিয়ে কপালে তিলক টানলাম।

রবীশ্বর তীর্থ থেকে সোজা পূর্বদিকে আধঘণ্টা হেঁটেই আমরা পৌছে গেলাম আনন্দেশ্বর তীর্থে। এখানে এক প্রকান্ড শিবমন্দিরে পৌছে নাঙ্গা সাধু বললেন– আপনাদের কাছে ত স্কন্দপুরাণের রেবাখন্ড আছে। তাতে মার্কণ্ডেয় মুনিকৃত আনন্দেশ্বরের বর্ণনা পড়ে নিন। আমি এখানে চুপ করে বসে একটু জিরিয়ে নিই। বাসবানন্দজী সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঝোলা থেকে রেবাখন্ড বের করে ৬৫ তম অধ্যায়টি পড়তে লাগলেন। একবার চন্দ্রাপীড়, জৃম্ভাসুর এবং সুরান্তক প্রভৃতি দুষ্ট দৈত্যগণ এই নর্মদাতটে মহাদেব যখন মা পার্বতীসহ বিশ্রাম করছিলেন, তখন মা পার্বতীকে অপহরণ করার জন্য মহাদেবকে আক্রমণ করেন। মহাদেব ঘোরতর যুদ্ধ করে সমস্ত দৈত্যকুলকে নিহত করলে দেবতারা আনন্দে তাঁর পূজা করেন। তাঁদের পূজায় তৃপ্ত হয়ে,

> আনন্দ সংযুতো দেবো ননর্ত বৃষবাহনঃ।
> ভৈরবং রূপমাস্থায় গৌর্য্যা চার্ধাঙ্গসংস্থিতঃ।।
> ভূত বেতাল কঙ্কালৈর্ভৈরবৈর্ভৈরবো বৃতঃ।
> তুষ্টৈর্মরুদগণৈঃ সর্বৈঃ স্থাপিত কমলাসনঃ
> তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থমানন্দমেশ্বরমুচ্যতে।।

(রেবাখন্ড ৬৫-তম অধ্যায়)

অর্থাৎ দৈত্যেরা নিহত হলে বৃষবাহন মহেশ্বর ভৈরবরূপ ধারণপূর্বক গৌরীর অর্ধাঙ্গে অবস্থিত হয়ে অর্থাৎ অর্ধনারীশ্বর রূপে আনন্দে নৃত্য করতে থাকেন। ভৈরবমূর্তি মহেশ্বর ভীষণ ভূত-বেতাল-কঙ্কালে পরিবেষ্টিত হয়ে নর্মদার দক্ষিণকূলে এইস্থানে নৃত্য করতে থাকলে মরুদগণ আনন্দিত হয়ে কমলাসনে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। তদাবধি এই তীর্থ আনন্দেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বাসবানন্দজীর পাঠ শেষ হলেই আমরা মন্দিরে ঢুকলাম আনন্দেশ্বরকে দর্শন করতে। মন্দিরের পার্শ্বস্থিত একটি অশোকগাছে হেলান দিয়ে নাঙ্গাজী চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। মন্দিরস্থ বিশাল প্রায় সাড়ে তিন ফুট দীর্ঘ এবং প্রায় দু'ফুট প্রশস্ত শিবলিঙ্গকে দেখে মনে হল, মূর্তিটি কালো কষ্টি পাথরের। মন্দিরে কেউ পূজা করতে আসেন বলে মনে হল না। কিন্তু মন্দিরের ভিতরটা অপূর্ব সুগন্ধিতে ভরপুর। আমরা প্রায় একসঙ্গে আনন্দেশ্বরের মাথায় জল ঢেলে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম।

নাঙ্গাজী আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আবার হাঁটা সুরু করলেন। একই ঝাড়ি পথ। পথ বলতে কিছু নাই। উঁচু নীচু পাথর ডিঙ্গিয়ে লাঠির সাহায্যে হেঁটে চলেছি। হঠাৎ নাঙ্গাজী আমাকে বললেন– শৈলেন্দ্রনারায়ণজী! এই ঝাড়িপথের ভীষণতা আশাকরি হাড়ে হাড়ে টের

পাচ্ছ ! আরও টের পাবে যখন শূলপাণির ঝাড়িতে ঢুকবে। এই দুর্গমস্থানে সর্বত্র লোকবসতি থাকার কথাও নয়। অথচ নর্মদাতটের সর্বত্রই শিব। কাজেই সর্বত্র কোন পুরোহিত দিয়ে সব শিবের যে নিত্যপূজা হবে, এ আশা করা যায় না। তুমি ত উত্তরতটে দেখেই এসেছ, সেখানে মাইলের পর মাইল কোথাও কোন লোকবসতিই নাই। মাইলের পর মাইল কেবল গহন অরণ্য। কিন্তু নর্মদাতটের কোথাও কোন শিব অপূজিত থাকেন না। মানুষের দ্বারা পূজিত না হলে যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব দেবতা, কিন্নর বা কোন গুপ্তযোগী দ্বারা যে কোন ভাবে প্রতিটি শিবেরই নিত্যপূজা হয়ে থাকে। তা না হলে কোন শিবমন্দির অকস্মাৎ বিচিত্র সুরভিতে সুরভিত হয় না। আমার পিছনেই ছিলেন হরানন্দজী। তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি চোখ টিপলেন অর্থাৎ মহাত্মার এই উক্তির গূঢ় সংকেত আমরা দুজনেই বুঝতে পারলাম। অনেকক্ষণ আমরা কেউ কোন কথা বললাম না। নীরবেই হাঁটতে লাগলাম, নীরবে না হেঁটে কোন উপায়ও ছিল না। পথের মধ্যে এত নুড়ি পাথর যে একটু অসতর্ক হলেই ঠোক্কর খাবার সম্ভাবনা পদে পদে। কোথাও কোথাও পথের উপর আবার কাঁটা ঝোপ। লাঠি দিয়ে ঠেলে ঠেলে এগোতে হচ্ছে। এইভাবে প্রায় দু মাইল হেঁটে বেলা প্রায় পৌনে দুটার সময় রাবের নামক এক গ্রামে এসে পৌছলাম। এখানে মাঝে মাঝে কিছু লোকবসতি চোখে পড়ল। গ্রামের মধ্যস্থলে একটি শিবমন্দির চোখে পড়ল। মন্দিরে পৌঁছে দেখি, ৪জন কিশোর এবং একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত চরক সংহিতা অধ্যয়ন ও আলোচনা করছেন। আমরা পৌঁছতেই, আমাদের দলে দণ্ডী সন্ন্যাসী দেখে তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন। মন্দিরের দরজা খুলে দিয়ে বললেন – ইয়ে ব্যাসেশ্বর তথা বৈদ্যনাথ কে মন্দির হৈ। যঁহা পর ব্যাসজীনে তপস্যা কী থী ঔর অশ্বিনীকুমারোঁ যঁহা তপ করকে বৈদ্যবিদ্যা প্রাপ্ত কী থী। বৈদ্যবিদ্যা তথা আয়ুর্বেদ শিখনেবালোঁ কী ইস্ তীর্থ কা দর্শন অবশ্য করনা চাহিয়ে। যঁহা ঔষধি-দান কা বড়া ফল হৈ। বায়ুপুরাণকা অন্তর্গত রেবাখণ্ডকা ৮৩ ঔর ৮৫ অধ্যায় মেঁ ইয়ে বৈদ্যনাথকা প্রসঙ্গ আয়া।

আমরা মন্দিরে ঢুকে বৈদ্যনাথ তথা ব্যাসেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এসে নাঙ্গা সাধু আমাকে ডেকে বললেন– ওপারে উত্তরতটের দিকে তাকিয়ে দেখ চিনতে পার কিনা। ওপারের মহল্লার নাম অকতেশ্বর। মহর্ষি অগস্ত্যের তপস্যাক্ষেত্র। তাঁর প্রতিষ্ঠিত অগস্ত্যেশ্বর মহাদেবের প্রাচীন মন্দিরও ওখানে আছে। আমার মনে হয়, অগস্ত্যেশ্বর শব্দ গ্রাম্য লোকের উচ্চারণের দোষে অপভ্রংশে অকতেশ্বর হয়েছে। বিন্ধ্যাচল পর্বত যখন নিজের দেহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করে সূর্যের গতি রোধ করতে যায়, তখন এইখানেই তিনি শিষ্য বিন্ধ্যাচলকে নতমস্তকে অবস্থান করতে বলে দক্ষিণাপথে চলে যান্ আর ফিরে আসেন নি। এইভাবে বিন্ধ্যের আরও ঊর্ধ্বাকাশে উন্নিত হওয়ার ইচ্ছা দমিত হয়। ঐ অকতেশ্বর মহল্লার মধ্যেই কেদারেশ্বর নামে মহাদেবের মন্দির আছে। ঐ মন্দির সম্বন্ধে কিংবদন্তী এই যে, অন্ধ্রদেশ হতে শাণ্ডিল্য নামে কোন ব্রাহ্মণ উপবাসী থেকে হিমালয়ের কেদারনাথকে দর্শন করতে যাত্রা করেন। উপবাস করতে করতে পথ হাঁটার ফলে ঐখানে এসে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। স্বপ্নে কেদারনাথ তাঁকে দর্শন দিয়ে বলেন– মৈঁ তেরে লিয়ে যহাঁ পর হী আ গয়া হুঁ, তু ভোজন কর। জ্ঞান হওয়ার পর শাণ্ডিল্য দেখেন যে তাঁর সামনেই নর্মদাতটে এক শিবলিঙ্গের আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি ঐ শিবলিঙ্গের বিধিবৎ পূজা করেন। সেইদিন থেকে ঐ শিবলিঙ্গ কেদারেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। আমি তাঁকে বললাম, কাশীতে কেদারঘাটের কেদারনাথের উৎপত্তি সম্বন্ধেও ঐ একই ধরনের কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

–'কিন্তু এতগুলি দণ্ডীস্বামী যে এখনও অভুক্ত আছি, সে সম্বন্ধে নিরুম্ব-উপবাসী নাগা বাবার কি খেয়াল আছে ? আর উত্তরতটের কোন গল্প না করে এই দক্ষিণতটের আর কোন

চুলোয় নিয়ে যাবেন, নিয়ে চলুন। দেখি, সেখানে গিয়ে যদি কোথাও দিনান্তের একমুষ্টি ভিক্ষা অদৃষ্টে মিলে কি না। আপনার মত আমাদের ত আর যোগাগ্নি পরিপক্ক দেহ নয়।' হরানন্দজীর কথায় নাগা বাবার টনক নড়ল। সলজ্জ কণ্ঠে তিনি বললেন – চলুন, চলুন, এখান থেকে প্রায় মাইল খানিক গেলেই আমরা ইন্দ্রবাণী গ্রামে পৌছে যাবো।

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই 'সর্বেভ্যঃ দণ্ডী সন্ন্যাসীভ্যো নমঃ' বলে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হরানন্দজীর পা দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন– এই অধমের ইন্দ্রবাণী মহল্লাতেই কুটীর। এই চারজন ছাত্রও ঐ একই গ্রামের। আমরা মাঝে মাঝে এই বৈদ্যনাথের স্থানে আসি, আয়ুর্বেদ চর্চার জন্য। আপনারা দয়া করে যদি আমার গরীবখানায় পদার্পণ করেন, তাহলে আমি আপনাদের ভিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারব। দণ্ডী সন্ন্যাসীর সেবা স্বয়ং নারায়ণের সেবা।

আমরা জয় ব্যাসেশ্বরের জয়, জয় বৈদ্যনাথের জয় বলে 'হর নর্মদে' ধ্বনি দিতে দিতে রওনা হলাম ইন্দ্রবাণীর পথে। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর চারজন ছাত্রকে আগে ভাগে রওনা করে দিলেন। তারা দ্রুত হেঁটে বনান্তরালে শীঘ্রই অদৃশ্য হয়ে গেল। নর্মদার ধার ধরেই আমরা হাঁটছি। এই পথটা দেখছি অপেক্ষাকৃত ভাল। গাছপালার ভীড় থাকলেও পথের উপর নুড়ি পাথর কম। পথের উপর এক জায়গায় পরপর অনেকগুলি বেলগাছ এবং আতাগাছের ঝোপ দেখলাম। এইপথে বাঘ বা অন্য কোন হিংস্রজন্তু আছে কিনা হরানন্দজী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, এমনিতে তো কোনদিন চোখে পড়ে নি, সন্ধ্যার পর তাঁদের আবির্ভাব ঘটে কিনা বলতে পারব না। মহা ভয়ঙ্কর শূলপাণি ঝাড়ির উপান্তভাগ এই অঞ্চল, কাজেই সন্ধ্যার পর বাঘের উপদ্রব হতেই পারে। আর একটা দুটো দিন অপেক্ষা করুন, তারপর শূলপাণির ঝাড়িতে প্রবেশ করলেই তাঁদের দর্শন পাবেন! মা নর্মদার বিশেষ কৃপা ছাড়া কেউ শূলপাণীশ্বর মহাদেবের দর্শন পায় না কিংবা শূলপাণির ১০০ মাইল দীর্ঘ ঝাড়ি কেউ অতিক্রম করতে পারে না। পরিক্রমাবাসীদের অধিকাংশই হিংস্র জন্তুর হাতে প্রাণ হারায়। আমরা কেউ ওমুখো হই না। দূর থেকেই শূলপাণীশ্বরকে নিত্য প্রণাম জানাই।

হরানন্দজী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলেন যে, ব্রাহ্মণের নাম নর্মদাদাস ত্রিবেদী। আয়ুর্বেদাচার্য। কবিরাজী তাঁর পৈত্রিক বৃত্তি। উত্তরতট এবং দক্ষিণতট উভয় অঞ্চল হতে তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্য রোগীরা আসে।

আমরা উভয়ের কথোপকথন শুনতে শুনতে যখন ইন্দ্রবানী মহল্লাতে পৌছালাম, তখন রঞ্জন তার ঘড়ি দেখে জানাল যে ৩ টা বাজতে ১০ মিনিট বাকী। কবিরাজ মশাই এর সঙ্গে তাঁর গৃহে গিয়ে পৌছতেই তাঁর বাড়ীর মহিলারা শঙ্খধ্বনি করলেন। আমাদের পায়ে জোর করে জল ঢেলে দিলেন। আমরা পা মুছে কাঠের ৪ টা বেঞ্চিতে বসলাম। একদল মহিলা দেহাতি ভাষায় ভজন গেয়ে চলেছেন, কবিরাজ মশাই-এর চার পুত্র চারটি পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে আরতি করতে লাগলেন। আরতি শেষ হলে কবিরাজ মশাই ভক্তিভরে আমাদেরকে আবাহন করে নিয়ে গেলেন তাঁর সংস্কৃত পাঠশালার ঘরে। সেখানে আমরা আসনে বসে কলাপাতা এবং পাথরের থালায় মাখন, মিছরী, কলা এবং নারকেল ভিক্ষা গ্রহণ করলাম। নাঙ্গা বাবা যে কিছু গ্রহণ করবেন না, সে কথা হরানন্দজী আগেই বলে দিয়েছিলেন। ভোজনান্তে যখন আমরা বেঞ্চিতে বসলাম, তখন কবিরাজ মশাই তাঁর বড় ছেলেকে এনে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন – তাঁর ত্রিশ বৎসর বয়স্ক বড় ছেলের নাম রেবন্ত ত্রিবেদী, সেও আয়ুর্বেদের ছাত্র। এই ইন্দ্রবাণী গ্রামের অপর নাম শক্রতীর্থ। 'যহাঁ স্বয়ং ইন্দ্রনে তপস্যা করকে শক্রেশ্বর মহাদেব কী স্থাপনা কী থী। য়হাঁ বৈকুণ্ঠ চতুর্দশী কা বড়া মাহাত্ম্য হৈ।'

তিনি আরও জানালেন যে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রেবন্তই শক্রেশ্বর মন্দিরের পুরোহিত। এখান হতে তিন মাইল ঝাড়ি পথে হেঁটে গেলে তবে পরবর্তী তীর্থ পিপ্পলাদ আশ্রমে পৌঁছাতে পারবেন। সেই মহল্লার নাম পিপরিয়া। এখন প্রায় ৪টা বাজতে যায়। দয়া করে আজ রাত্রিটা এখানে কাটিয়ে সকালে রওনা হলে আমরা ধন্য হই। হিরন্ময়ানন্দজী তাঁর কথাতেই সায় দিলেন।

কবিরাজ মশাই এর বাড়ীঘর, ঠাকুরমন্দির, গম মকাই রাখার মরাই, পাঠশালা এবং কবিরাজী ঔষধের পৃথক পৃথক ঘর গোয়াল ইত্যাদি দেখে তাঁকে নর্মদাতটের একজন সম্পন্ন গৃহস্থ বলেই মনে হল। কবিরাজ মশাই এর বাড়ী হতে মিনিট তিনেক হেঁটে গেলেই নর্মদা। সূর্য তখন পাটে বসেছেন। আমরা দলবেঁধে সবাই গেলাম নর্মদা স্পর্শ করতে। এখানে নর্মদা খুবই প্রশস্তা। অস্তগামী সূর্যের রক্তরাগ রশ্মি নর্মদার জলে পড়ে এক বিচিত্র ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে। ঝোড়ো বাতাস বইছে। আমরা অবশ্যি কম্বল গায়ে দিয়ে উত্তরতটের দিকে তাকিয়ে আছি। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওপারে একটি সমাধি মন্দির দেখে আমি চিনতে পারলাম। আমি নাঙ্গা সাধু এবং হরানন্দজীকে লক্ষ্য করে বললাম উত্তরতটের ঐ পাশের ঘাটের নাম নিশ্চয়ই গরুড়েশ্বর। ব্রহ্মলীন মহাত্মা বাসুদেবানন্দ সরস্বতীজীর সমাধি মন্দিরটি চিনতে পারছি। ঐখানে ভগবান কার্তিকেয় তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এইজন্য ঐ স্থানকে কুমারেশ্বর তীর্থও বলা হয়। গরুড়েশ্বর খুব বড় মহল্লা। ওখানে করোটেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। ডাকঘর আছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, ঐখানে বাসুদেবানন্দজী দত্তাত্রেয় মন্দির স্থাপন করে গেছেন। এই মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হল, মন্দিরের দেওয়ালে ভগবান দত্তাত্রেয়ের সমগ্র জীবনের ঘটনার চিত্র অঙ্কিত আছে। নাঙ্গা সাধু বললেন– আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি উত্তরতট পরিক্রমাকালে গরুড়েশ্বরে কিছুকাল বাস করেছিলাম।

সূর্যাস্ত হয়ে গেল। এইবার আমরা নর্মদা স্পর্শ করে কিছুক্ষণ জপ করলাম। কবিরাজ মশাই এর একছেলে সঙ্গে এসেছিল। সে পথ দেখিয়ে আমাদেরকে শক্রেশ্বর মন্দিরে নিয়ে গেল। মন্দিরে গিয়ে দেখলাম, কবিরাজ মশাই এর বড়ছেলে রেবন্তজী আরতির আয়োজন করছেন। গ্রামের ৫/৬ জন লোকও উপস্থিত হয়েছেন। আমরা ভক্তিভরে শক্রেশ্বর মহাদেবের আরতি দেখে ফিরে এলাম কবিরাজ মশাই এর বাড়ীতে। তিনি তাঁর সংস্কৃত পাঠশালার বড় বড় দুখানা ঘরে আমাদের থাকার জন্য ব্যবস্থা করেছেন। দুখানা ঘরের মাঝখানে একটা বড় দরজা বসানোর মত ফাঁক আছে, দরজা নাই। সেই দুখানা ঘরে যে যার সুবিধা মত আসন শয্যা পেতে নিলাম। হরানন্দজী কবিরাজ মশাইকে অনুরোধ করলেন– 'আমাদের সঙ্গী নাঙ্গা মহাত্মার জন্য একটা কোন ছোট ঘরের ব্যবস্থা করতে পারেন ? উনি কারও সঙ্গে থাকেন না।' তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর ঔষধ বানানোর ঘরটি খুলে দিয়ে সেইখানে তাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে এলেন। তিনি ২টা হ্যারিকেন জ্বেলে দিয়েছেন, একটা ঘরের ভিতরে এবং একটা বাইরে। আমাদের কাছে বসে তিনি কিছুক্ষণ গল্প করতে লাগলেন। বললেন– পহেলে রাজ্য কী ঔর সে (দেশীয় রাজ্যের রাজার তরফ থেকে) নর্মদা পরিক্রমা করনেবালে যাত্রীয়োঁ কী সমুচিত সেবা হোতী থী। পিপরিয়া সে ৮০ ক্রোশ কঠিন ঝাড়ি পথ হ্যায়। জহাঁ অন্ন কা অভাব হৈ। নর্মদা কিনারে রহনেবালী বনবাসী কোল ভীল যাত্রীয়োঁ কো লুট লেতে হৈঁ। ইসলিয়ে যাত্রী য়হাঁ সে অন্নাদি কা প্রবন্ধ করকে বড়ী সাবধানী সে চলতে হৈঁ, হমনে তো এ্যায়সা শুনা থা কি কিসী শেঠ কী ঔর সে এ্যায়সা প্রবন্ধ হৈ কি উহ্ যাত্রীয়ো কে সব সামান কো অপনী নৌকা পর রাখ লেতে হৈ আউর জহাঁ শূলপাণি কী কঠিন ঝাড়ি সমাপ্ত হোতী হৈ, যাত্রী ঘুমকর য়হাঁ আতে হৈঁ, তব উনকা সামান উহ্ পহুচা দেতে হৈ। পতা নহীঁ অব এ্যায়সী ব্যবস্থা হৈ ইয়া নহীঁ।

এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলে তিনি এই উপসংহার টানলেন যে ভীলরা পরিক্রমাবাসীদেরকে গাছের আড়ালে থেকে অনুসরণ করে কায়ার পিছনে ছায়ার মত। তারপর সহসা আবির্ভূত হয়ে যাত্রীদের মাথার উপর সোজাসুজি টাঙ্গি বা কামটা তুলে দাঁড়ায়। সব লুটপাট করে নেয়। তাদের সঙ্গে বিষাক্ত তীরের বাণ্ডিল এবং একটি করে ধনুকও থাকে। তীর ছুঁড়তে তারা ওস্তাদ, যেন প্রত্যেকেই এক একজন লক্ষ্যভেদী তীরন্দাজ। তারা যখন আক্রমণ করে, তখন মুখে কেবল বলতে থাকে – মুক্ মুক্ অর্থাৎ যা আছে সব রেখে দাও। যার যা আছে, বিশেষতঃ কাপড় গামছা বা যে কোন খাদ্যদ্রব্য, টাকাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে দিলে, তাহলে তারা কোন নির্যাতন করে না। কোন বাধা দিলে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। সুঁচ তাদের খুব প্রিয়। সুঁচ পেলে তারা তুষ্ট হয়ে চলে যায়। আমি আপনাদেরকে কয়েক বাণ্ডিল সুঁচ দিব। দয়া করে গ্রহণ করবেন। এক বাণ্ডিল সুঁচ একটি মূল্যবান জীবন্ রক্ষা করতে পারে। মা নর্মদাকে সর্বদা স্মরণ করে চলবেন, তিনিই পরিক্রমাবাসীকে রক্ষা করে থাকেন। আমার গুরুদেব মারাঠী ভাষায় একখানি রোচক পুস্তক লিখেছেন। শূলপাণির ঝাড়ি পরিক্রমাকালে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গিয়ে এক ভীলের বিবরণ লিখেছেন, সেই ভীল তাঁর যথাসর্বস্ব লুটে নিলে, তিনি দলছাড়া হয়ে ভীলের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন – ভাই! তুমলোগ পরিক্রমাবালে যাত্রীয়োঁ কো লুটতে কেঁও হো?

ভীল তাঁকে উত্তর দেয় 'হম্ য়হাঁ জঙ্গলোঁ মেঁ, বন পর্বতে মেঁ রহতে হৈ। খায়েঁ ক্যা? নর্মদা মাইয়া ভেজ দেতী হৈ, ইসলিয়ে হম লুটপাটকর আপনে কাম চালাতে হৈঁ। আপ লোগ তো নীচে যাকর ঔর সামান প্রাপ্ত কর লেঙ্গে। নর্মদা মাইয়া হমারা হী লিয়ে ভেজতী হৈ। জিন পর কুছ নহী হোতা, উন্‌হে হম যথাশক্তি কুছভী দেতে হৈ।'

তখন গুরুদেব তাকে বলেন – হমেঁ ভুখ লগী হৈ, কুছ খানে কো দোগে?

তখন ভীল তাঁকে বলে – হম তো মাংস খাতে হৈঁ, ক্যা আপ মাংস খাওগে?

গুরুদেব যখন বললেন যে তিনি মাংস খান না, তখন সে তাঁকে তার গ্রামে নিয়ে গিয়ে 'ভুট্রে ভুনকর দিয়ে।'

রঞ্জন এই সময় ঘড়ি দেখে বলল – রাত্রি আটটা বেজে গেছে। তিনি আর বসলেন না। লজ্জিত হয়ে বারবার ক্ষমা ভিক্ষা করে উঠে পড়লেন। তিনি চলে যেতেই হরানন্দজী মন্তব্য করলেন, 'কবিরাজ মশাই যা শুনিয়ে গেলেন, তাতে পিলে চমকাবার জোগাড়। যা করেন মা নর্মদা!' আমরা সান্ধ্যক্রিয়া করতে বসে গেলাম। রাত্রি দশটা নাগাদ জপ শেষ হতেই কম্বল মুড়ি দিয়ে লুটিয়ে পড়লাম, যে যার বিছানায়। শুয়ে পড়েও আমার অনেকক্ষণ পর্যন্ত চোখে ঘুম এল না। নানা দুশ্চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। বাবাকে স্মরণ করতে করতে শেষ পর্যন্ত মন শান্ত হল, ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমার যখন ঘুম ভাঙল, সময় জানতে চাইতে, রঞ্জন জানাল সকাল সাড়ে ৬টা বেজে গেছে। আজ খুব ঘুমিয়েছেন আপনি। আমরা ৫টা নাগাদ সবাই উঠে পড়েছি, আমাদের জিনিসপত্রও বাঁধা ছাঁদা হয়ে গেছে। বাইরে ভীষণ কুয়াশা, তাই কেউ বাইরে বেরোতে পারি নি। নাঙ্গা বাবা আমাদেরকে বলে গেছেন, তিনি স্নান করে শক্রেশ্বর মন্দিরে বসে থাকবেন, আমাদের অপেক্ষায়। শক্রেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করে সেখান থেকেই আমরা পিপরিয়ার পথে এগোব। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে নিজের ঝুলি গাঁঠরী বেঁধে নিলাম। যাঁরা প্রাতঃকৃত্য করতে গেছলেন, তাঁরা একে একে সবাই ফিরে এলেন। সওয়া সাতটা নাগাদ, তখন আকাশে সূর্যোদয় হয়ে গেছে, আমরা হর হর বম্ মহাদেও, হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে সবাই বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম কবিরাজ মশাই এর প্রশস্ত প্রাঙ্গনে। কবিরাজ

২ স্বয়ং তাঁর পরিবারবর্গ সহ করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে। সামনে থামাতে

কোনটায় যবের ছাতু কোনটাতে আটা এবং কোনটাতে ছোলার ছাতু ভরে রেখেছেন। প্রায় ডজন খানিক সূঁচ এবং ডজন খানিক দিয়াশালাইও রেখেছেন। তাঁর পরিবারস্থ সকল স্ত্রীপুরুষ সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়েছেন আমাদের সামনে, নতজানু হয়ে কবিরাজ মশাই আমাদের দলনেতা হিরন্ময়ানন্দজীকে বলতে লাগলেন – ভগবান! আপ্ তো জানতে হেঁ পিপরিয়া সে শূলপাণি কী ভীষণ ঝাড়ি আরম্ভ হো জাতী হৈ, ইয়ে সভী স্থান, পাহাড়ো তথা ঘোর জঙ্গলোঁ কে বীচ মেঁ হৈঁ। পরিক্রমাবালোঁ কা কহনা হৈ কি এ্যায়সা কঠিন মার্গ নর্মদা যাত্রা মেঁ কহী ভী নহী হৈ। কঠোর ঝাড়িয়াঁ, পত্থরোঁ কে দুকড়ে, কাঁকরোলী পথরোলী ভূমি পরিক্রমাবাসী নর্মদে হর করতে হুয়ে কঠিনতা সে ইস মার্গকো পার করতে। এক দানা খাদ্য, টুকরা ভর রোটি কাঁহি না মিলেগী। ইয়ে সব চীজ হম ভিক্ষা দেতে হেঁ। কৃপয়া গ্রহণ করেঁ। এই বলে তিনি হিরন্ময়ানন্দজীর পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন। তিনি বিপন্ন চোখে বাসবানন্দজী এবং হরানন্দজীর দিকে তাকালেন। তাঁরা উভয়ে বললেন – আমরা সন্ন্যাসী, আকাশবৃত্তিধারী, তবুও এইরকম ধার্মিক অতিথিবৎসল পরিবারের মনে ব্যাথা দেওয়া উচিত হবে না। এই বলে সকলেই প্রত্যেক ঝুলিতে কিছু কিছু করে সবই ভরে নিলেন। খুশী মনে কবিরাজ মশাই বলতে লাগলেন – ভগবান শূলপাণি আপকো পরিক্রমা সফল করেঁ ঔর সদৈব রক্ষা করেঁ। যদি ধার্মিক ভাবনা না হোতী তো কোঈ ভী পুরুষ শূলপাণি কা ঝাড়ি মেঁ পৈদল জানে কা সাহস ন করতা। কিন্তু ন জানে কিতনে বর্ষো সে, নর্মদা পরিক্রমা কী যাত্রী ইন্ স্থানোঁ কী ধূলি ঝাঁকতে হুয়ে আপনে কো কৃতকৃত্য সমঝতে হৈঁ।

আমরা তাঁদের সকলের কাছে বিদায় নিয়ে হাঁটতে লাগলাম শক্রেশ্বর মান্দিরের দিকে। কবিরাজ মশাইও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। মন্দিরে এসে দেখি নাঙ্গা বাবা সেখানে বসে আছেন। শক্রেশ্বরকে প্রণাম করার পর কবিরাজ মশাই-ই আমাদেরকে নর্মদার তট ধরে কতকটা পথ এগিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন। বেলা প্রায় সাড়ে আটটা বাজতে যায়, আকাশে সূর্যের তেজ ক্রমশঃ প্রখর হচ্ছে, কেবল প্রবল শীতের জন্য এ রোদ খুবই মিষ্টি লাগছে, আমরা ঝাড়ি পথে হেঁটে যাচ্ছি, তা রাস্তার দুপাশে গাছপালার ক্রমাধিক্য দেখে বুঝা যাচ্ছে। তবে পথের উপর বড় বড় পাথরের আধিক্য কম। হাঁটতে বেশী কষ্ট হচ্ছে না। দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। আমি এবং রঞ্জন দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কবিরাজ মশাই-এর আতিথেয়তা এবং স্বধর্মনিষ্ঠার প্রশংসা করছি। শাস্ত্রে আছে, অশ্বিনীকুমারের তপস্থলী বৈদ্যনাথের মন্দিরে পঠন পাঠন করলে দুরূহ চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি জন্মে, এইজন্য তিনি মাঝে মাঝেই নিয়ম করে সেই মন্দিরে ছাত্রদেরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আয়ুর্বেদের চর্চা করেন। পরিক্রমাবাসীদেরকে ভিক্ষা দিতে পারলে এবং সেবা করার সুযোগ পেলে নিজের এবং পরিবারের কল্যাণ হয়, এই সংস্কার তাঁর এতই দৃঢ় যে, তিনি বৈদ্যনাথের মন্দির থেকে আমাদেরকে একরকম জোর করেই সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং সপরিবারে সেবা করলেন। গীতায় আছে – 'শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ', শ্রদ্ধায় গঠিত মানুষের জীবন, যার যে রকম শ্রদ্ধা, তার জীবনবৃত্ত সেইরকম ভাবেই গড়ে উঠে। নাঙ্গা মহাত্মা যে হাঁটতে হাঁটতেই আমাদের কথা মন দিয়ে শুনছিলেন, তা বুঝতে পারলাম তাঁর একটি মন্তব্যে। তিনি বলে উঠলেন – পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে স্বধা নিবেদনের পর তাই আমরা আর্য সন্তানরা প্রার্থনা করে থাকি – 'শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগম্' অর্থাৎ অন্তরের শ্রদ্ধা যেন আমাদের কখনও অপগত না হয়। ধৃতি ও বুদ্ধি শ্রদ্ধার অনুচর। ধৃতি ও বুদ্ধির সূত্রে অনুস্যূত হয়ে মানবসত্তা সুষমা ও সংহতি লাভ করে। এরফলেই সর্বাংশে যোজনাময় একতান জীবন রচিত হয়। আপনারা ঐ কবিরাজ মশাই এর পরিবারবর্গের অতিথি ও সন্ন্যাসীদের সেবানুরক্তি ও শ্রদ্ধার কথা চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন যে কবিরাজ মশাই এর আদর্শনিষ্ঠা ধর্মপ্রাণতা এবং অতিথিবৎসলতা তাঁর পরিবারবর্গের সকলের মধ্যেই

একতানতা এনে পরিবারটিকে সুখী এবং সচ্ছল করেছে। আশীর্বাদ করি, তারা আরও সুখী হোক।

হরানন্দজী আমাদের কাছে সরে এসে মৃদু কণ্ঠে বললেন, কবিরাজ মশাই এর ধার্মিক পরিবার, ধার্মিক পরিবার সুখী হয় এতো জানা কথা। কিন্তু মশাইরা নিজেদের গল্পেই ত মশগুল আছেন. ওদিকে বাসবানন্দজী মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছেন কি, গতকাল সন্ধ্যাবেলা কবি[illegible] এর মুখে শূলপাণি-ঝাড়ির ভয়ঙ্করতার কথা শোনার পর থেকে বেচারার মুখ [illegible]ছে ভয়ে এবং দুশ্চিন্তায়। এখনও তাঁর মুখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন. বেচারাকে যেন আমরা ধরে বেঁধে যমের দক্ষিণ দুয়ারে নিয়ে যাচ্ছি, কিংবা মশানে বলি দিতে।

এই সময় হিরন্ময়ানন্দজী হঠাৎ বনের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। বাসবানন্দজী তাঁকে বলে উঠলেন – কি স্বামীজী, শীঘ্র বলুন, দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন। কী-ই বা এত উঁকিঝুঁকি মেরে দেখছেন ? আমার বুক টিপ্ টিপ্ করছে।

– না, না, ও কিছু নয়, একটা বনমোরগকে বনশিয়ালে তাড়া করছে।

স্বামীজীর কথা শুনে বাসবানন্দজী বললেন – ধড়ে প্রাণ এল যেন। চলুন, চলুন বনমোরগ এবং শিয়াল দেখে এখন কাজ নাই। সামনের ঐ সুনিবিড় অরণ্যে বুনো হাতী বাঘ হায়েনা চলাফেরা করছে, মানুষ মারছে, তার গল্প কাল কবিরাজ মশাই-এর কাছে শুনে এলাম, এর আগেও অনেকের কাছে শুনেছি, কিছু আগে এই পথেই বড় বাঘের থাবার দাগ দেখলুম বলে মনে হল। হাতীর বাইসনের আর সম্বরের দাগ ত সর্বত্র – ওর হিসাব কে রাখে। এখনত তাড়াতাড়ি পিপরিয়া গ্রামে পৌছে যাওয়াই ভাল। তাঁর কথা শুনে নাঙ্গা বাবা বলে উঠলেন – আপ্ এতনা ডরতে হেঁ কেঁও ? পথ আর জঙ্গলের দিকে না তাকিয়ে সুপ্রশস্তা স্বচ্ছতোয়া নর্মদার দুধারে সুনিবিড় অরণ্যানি কেমন সুন্দরভাবে নর্মদার বুকের উপর শ্রদ্ধায় মাথা নত করে আছে, তাই দেখবার চেষ্টা করুন। এই বলে তিনি গান ধরলেন –

নাথজী হম তব কে বৈরাগী।
হমরী সুরতি রাম সোঁ লাগী ॥
ব্রহ্মা নহিঁ জব টোপী দীনহাঁ বিষ্ণু নহী জব টীকা।
শিব শকতি হৈ জনমহুঁ নাঁহী জবৈ যোগ হম শিখা ॥
সতযুগ মৈঁ হঁম পহিরি পাঁরবী ত্রেতা ঝোরি ডণ্ডা।
দ্বাপর মৈঁ হঁম অড়বন্দ পহিরা কলউ ফিরোঁ ন খণ্ডা ॥
গুর পরতাপ সাধ কী সঙ্গতি জ্যোতি অমরগড় আয়া।
কহৈ কবীর সুনৌ হো অবধূ মৈঁ অভৈ নিরন্তরী পায়া ॥

অর্থাৎ নাথজী, আমি সেইদিনের বৈরাগী যে দিন থেকে রামের প্রতি আমার ধ্যান নিবদ্ধ হয়েছে। ব্রহ্মা যখন টুপী মাথায় দেন নি, বিষ্ণু পরেন নি তিলক, যখন শিব শক্তির জন্মও হয় নি, তখন আমি যোগ শিক্ষা করি। সত্যযুগে আমি খড়ম পড়েছিলাম, ত্রেতা যুগে নিয়েছিলাম ঝুলি ও দণ্ড। দ্বাপর যুগে আমি পরেছিলাম যোগপট্ট (অড়বন্ধ) আর এই কলিযুগে নবখণ্ড ঘুরে বেড়িয়েছি। গুরুপ্রতাপ আর সাধুসঙ্গ এই দিয়ে অমরগড় জয় করে এসেছি। কবীর বলছে, ওহে অবধূত শোন, আমি নিরন্তর অভয় পেয়েছি।

নাঙ্গা সাধুর মুখে গান এর পূর্বে কখনও শুনিনি। গানের ছন্দ সুর তান কিছু বুঝি না, কিন্তু তিনি যে খুব দরদ দিয়ে গানটি গাইলেন, তা বেশ বুঝতে পারলাম। দোঁহার অর্থটিও মনকে [illegible] স্পর্শ করল। হরানন্দজীও আমাকে ফিস্ ফিস্ করে জানালেন – বেটার কিছু পরিচয় ত আজ পর্যন্ত পেলাম না, বেটা ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। আজ বুঝতে পারছি উনি অবধূত সম্প্রদায়ের একজন অবধূত।

– তন্ত্রেও তো এক ধরণের যোগীকে অবধূত বলা হয়। তাহলে কি আপনার মনে হয়, উনি একজন তান্ত্রিক ?

– না, না, উনি তান্ত্রিক নন। তান্ত্রিকরা ম্লেচ্ছ ও অনাচারী হয়, তারা আচার ভ্রষ্ট হয়। আমার মনে হয়, আমাদের শাস্ত্রে যে কুটীচক, বহূদক, হংস, পরমহংস এই চার সম্প্রদায়ের যোগী সন্ন্যাসীর লক্ষণ বর্ণনা আছে, 'অবধূত' ঐ চার সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে। আমাদের গুরুদেব স্বামী ভোলানন্দ তীর্থজীর মুখে নারদ পরিব্রাজক উপনিষদের একটি শ্লোক শুনেছি 'কুটীচক–বহূদকয়োর্মানুষঃ প্রণবঃ, হংস পরমহংসয়োরান্তর প্রণবঃ, তুরীয়াতীতাবধূতয়োঃ ব্রহ্মপ্রণবঃ ॥' অর্থাৎ কুটীচক ও বহূদক সন্ন্যাসীর পক্ষে উচ্চারণ করে প্রণব জপ প্রশস্ত, হংস ও পরমহংস যোগীর পক্ষে প্রণবের আন্তর জপ প্রশস্ত আর অবধূতের পক্ষে ব্রহ্ম প্রণব অর্থাৎ প্রণবের শেষ অংশ ধারণা করা প্রশস্ত। এই প্রণব জপের বিভিন্ন বিধান দেখেই অনুমান করা যায় যে, অবধূত অন্য চার সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীর চেয়ে উর্ধ্বতর অবস্থায় উন্নীত।

কথা বলতে বলতেই চলেছি। পথ দুর্গম হলেও পথের দুধারে অরণ্যানীর মনোরম শোভা এবং পাহাড় ঘেরা পরিবেশের মধ্যে হাঁটতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হচ্ছে না। হঠাৎ হিরন্ময়ানন্দজী হর নর্মদে ধ্বনি দিয়ে বলে উঠলেন পিপরিয়া মহল্লামেঁ হমলোগ পহুঁছ গয়া। ইস মহল্লাকে পাশ মেঁ পিপ্পলাদ ঘাট, বনের মধ্যে দূরে দূরে কতকগুলি ঘর দেখা যাচ্ছে। সবই জংলী লোকের বাস। তাদের বিচিত্র বেশভূষা দেখে তাদেরকে জংলী বলেই মনে হল। দুতিন ,মিনিট হাঁটার পরেই শাল অশ্বত্থ পাকুড় এবং শিমূলগাছের ঘেরা একটা উঁচু বড় পোতায় এসে উঠলাম। ধার দিয়ে নর্মদা বয়ে যাচ্ছেন, পাথর দিয়ে বাঁধানো একটা প্রশস্ত ঘাটও আছে। একটা ছোট শিব মন্দির, পাথরের তৈরী, পোতার উপর একটা বড় পাথরের হলঘর। হলটা দেখলেই বুঝা যায় বেশ পুরাতন। দরজা জানালাও কোথাও নাই। থাকলেও তা খসে পড়ে জীর্ণ হয়ে নষ্ট হয়েছে। হিরন্ময়ানন্দজী বললেন – ইয়ে হ্যায় পিপ্পলাদ আশ্রম। য়হাঁ পর পিপ্পলাদ ঋষিনে প্রাচীনকাল মেঁ তপ কিয়া থা। ভগবান শংকর নে প্রসন্ন হোকর ঋষিকে ইচ্ছানুসার য়হাঁ সদৈব রহনে কা বচন দিয়া। অষ্টমী ঔর চতুর্দশী কো য়হাঁ স্নান দান ভজন পূজন ইত্যাদিকা বড়া মাহাত্ম্য হৈ। হিঁয়াসে শূলপাণি ঝাড়িকা সরু হোতা হৈ। দেখিয়ে ত পঞ্চাঙ্গ, আজ কৌন তিথি হৈ ?

বাসবানন্দজী তাঁকে পঞ্চাঙ্গ দেখে জানালেন – আজ আপনার বাঞ্ছিত অষ্টমী বা চর্তুদশী তিথি নয়। আজ শুক্লা চতুর্থী, ৯ই মাঘ আমরা শুকদেবেশ্বর তীর্থ থেকে যাত্রারম্ভ করে একরাত্রি কটোরার হনুমন্তেশ্বর মন্দিরে, দ্বিতীয় রাত্রি ভীমেশ্বর মন্দিরে, তৃতীয় রাত্রি অর্জুনেশ্বর মন্দিরে, আর গতকাল চতুর্থ রাত্রি কাটিয়ে এলাম শক্রতীর্থে কবিরাজ মশাই-এর বাড়ীতে। আজ ১৩ই মাঘ, বৃহস্পতিবার। এখন বেলা সাড়ে দশটা বাজতে যায়। এখানে আজ রাত কাটাতে হলে এই পরিত্যক্ত আশ্রম বাড়ীটা সর্বাগ্রে সকলে হাত লাগিয়ে সাফ করতে হবে। এই বলে তিনি নিজেই হাত লাগালেন। আমাদের ঝোলা গাঁঠরী একস্থানে রেখে দিয়ে হলঘরের পাথর, পোড়া কাঠ, হাঁড়ি কলসী ইত্যাদি পরিক্রমাবাসীদের পরিত্যক্ত সকল কিছু আমরা দূরীভূত করে নিজেদের আসন শয্যা রেখে দিলাম। যাঁরা অমরকন্টক হতে শূলপাণির ঝাড়ি অতিক্রম করেন, তাঁদের এখানে এসে শূলপাণি ঝাড়ি শেষ হয় আর আমাদের মত যাঁরা ওঁঙ্কলেশ্বর হতে আসেন, তাঁদের এখান হতেই শূলপাণি ঝাড়ির যাত্রা আরম্ভ হয়।

বসে বিশ্রাম করতে করতে হরানন্দজী বললেন – স্কন্দপুরাণ এবং বায়ুপরাণের রেবাখণ্ডে (অধ্যায় ৮০-৮২) পিপ্পলাদ ঋষির প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের কংসারী নামে এক বোন ছিল। একবার কংসারী তাঁর ভাই-এর রেতঃপ্লুত বস্ত্র পরিধান

করে স্নান করেন। স্নান করবার সময় রেতোদক তাঁর উদরে প্রবেশ করায় তিনি গর্ভবতী হন এবং একটি পুত্র প্রসব করেন। লোকলজ্জার ভয়ে তিনি সেই পুত্রকে একটি পিপ্পল বৃক্ষ মূলে ত্যাগ করে চলে যান। সেইজন্য সেই শিশুর নাম হয় পিপ্পলাদ। লক্ষ্য করেছেন এখানে চারপাশে কত পিপ্পল গাছের ভীড়। আমি তাঁর কথার প্রতিবাদ করে বললাম, এইজন্যই আমি পুরাণের উপর মাঝে মাঝে বিরক্তি প্রকাশ করি। পুরাণকাররা গঞ্জিকাসেবীর মত গাঁজায় দম দিয়ে গল্প রচনা করে গেছেন। পুরাণকারদের এ গল্প আমি বিশ্বাস করি না। আমি বাবার কাছে শুনেছি, পিপ্পলাদ ছিলেন একজন ব্রহ্মবাদী ঋষি। সুকেশ, সত্যকাম, গার্গ্য, কৌশল্য প্রভৃতি তাঁর শিষ্য ছিলেন। তাঁর জন্মরহস্য ঐ রকম ন্যক্কারজনক নয়।

আমার প্রতিবাদ শুনে কেউ কিছু বললেন না। হিরন্ময়ানন্দজী বললেন – তোমার কথাকেই সত্য বলে মনে করি। যাই হোক এব্যর চল, ঘাটে গিয়ে স্নান তর্পণাদি করে আসি। সবাই ঘাটে গিয়ে স্নান তর্পণাদি করতে গেলাম। নাঙ্গাজী ভোরেই তাঁর অভ্যাসমত স্নান করে নিয়েছেন। তিনি বসে রইলেন আমাদের জিনিসপত্রের কাছে। এক একজন স্নান তর্পণাদি সেরে মন্দিরস্থ শিবের মাথায় জল ঢাললেন। সবার শেষে আমি এবং হরানন্দজী ঘাট থেকে উঠে এসে যখন পিপ্পলাদেশ্বর শিবের মাথায় জল ঢালছি, তখন নাঙ্গা বাবার গানের সুর ভেসে এল। তিনি হল ঘরে একা একা বসে সুর করে গাইছেন –

অবধূ যোগী জগ সে ন্যারা, মুদ্রা নিরতি সুরতি করি সীংগী, নাদ ষণ্ডে ধারা ॥
বসৈ গগন মেঁ দুনী ন দেখৈ চেতনী চৌকী বৈঠা।
চঢ়ি আকাশ আসন নহী ছাড়ে, পীবৈ মহারস মীঠা ॥
পরগট কন্থা মাহৈ যোগী, দিল মেঁ দরপন জোবৈ।
সহঁস ইকীশ ছ সৈ ধাগা, নিচল নাকৈ পৌরৈ ॥
ব্রহ্ম অগনি মেঁ কায়া জারৈ, ত্রিকুটী সঙ্গম জাগৈ।
কহৈ কবীর সোঈ যোগেশ্বর, সহজ সুনি ল্যৌ লাগৈ ॥

(কবীর গ্রন্থবলী, পদ ৬৯)

অর্থাৎ অবধূত যোগী জগৎ থেকে আলাদা। অবধূত যোগী যোগির চিহ্নমুদ্রা, সুরতি, নিরতি আর শিঙ্গা, তিলক, মালা আদি কিছুই ধারণ করেন না। নাদ বা কোন শব্দ সৃষ্টি করে হৃদয় বা মস্তিষ্ককোষ নিঃসৃত অশ্রুত চৈতন্যধারাকেও খণ্ডন করেন না, গগনমণ্ডলে এঁর বাস, দুনিয়ার দিকে তিনি তাকানও না। চৈতন্যের চৌকির উপর ইনি বসে আছেন। আকাশে উঠেও ইনি আসন ছাড়েন না আর নিরন্তর পান করে চলেছেন মধুর মহারস। যদিও প্রকাশ্যভাবে ইনি কাঁথা জড়িয়ে থাকেন বা না থাকেন, তবুও নিজের হৃদয় দর্পণে ইনি সব কিছু দেখেন ; নিশ্চল নাকে একুশ হাজার ছ'শ তাগাতে গিঁঠ দেন। ইনি ব্রহ্মাগ্নিতে নিজ কায়া আহুতি দেন আর জেগে থাকেন ত্রিকূটী-সঙ্গমে। কবীর বলছেন, এই যোগেশ্বর সহজ এবং শূন্যের ধ্যানে মগ্ন থাকেন।

নাঙ্গা মহাত্মার গানের মধ্যে 'সহঁশ ইকীশ ছসৈ ধাগা নিচল নাকৈ পৌরৈ' অর্থাৎ তিনি নিশ্চল নাকে একুশ হাজার ছ'শ তাগাতে গিঁঠ দেন কথাগুলি শুনে আমি চমকে উঠলাম। মনে হল, ইনি কি তাহলে কোটেশ্বরের মহাত্মা কৃপানাথ কথিত হংসবিদ্যার রহস্যও জানেন ? হরানন্দজী বললেন, এঁর গানের মধ্যে নিজেই আত্মপরিচয় দিচ্ছেন যে ইনি একজন উচ্চকোটির অবধূত ! আমাদের অপার সৌভাগ্য যে মহাভয়ঙ্কর শূলপাণির ঝাড়ি অতিক্রম কালে আমরা এইরকম একজন মহাযোগীকে সঙ্গে পেয়েছি। স্নানের পর সকলেই রোদে বসেছিলেন, রোদে বসেই সকলের আজ ছাতু মাখিয়ে এক গৌড়া করে ছাতু খাওয়া হল। হিরন্ময়ানন্দজী চারজন ব্রহ্মচারীকে আদেশ করলেন – তোমরা রাত্রি কাটানোর জন্য পার

ত কিছু শুকনো কাঠ সংগ্রহ করো। আজ আগুন না জ্বালালে এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ফাঁকা জায়গায় এই জঙ্গম রাত্রি কাটানো খুবই কষ্টকর হবে। নাঙ্গা সাধু বললেন যে, তিনি পিপ্পলাদেশ্বর মহাদেবের ঘরের এক কোণেই পড়ে থাকবেন। তাতে তিনি আরামেই থাকবেন। তাঁর শরীরে রেবামায়ীর দয়ায় ঠাণ্ডা বা গরম কিছুই কষ্ট দেয় না। স্বামীজীর আদেশে কুড়াল হাতে ব্রহ্মচারীরা কাঠ সংগ্রহে উদ্যোগী হলে আমরাও তাঁদের সঙ্গে গাছ তলায় ঘুরে ফিরে শুকনো কাঠ কুড়োতে মন দিলাম। বেলা তখন প্রায় ৩টা, এমন সময় পূর্বদিকের জঙ্গল হতে শিঙ্গা ডম্বরু এবং শঙ্খের তূর্যনিনাদ ভেসে আসল। একজন ব্রহ্মচারী একটা আমগাছের মাথায় উঠে বললেন, গৈরিক পতাকা হাতে নিয়ে একদল সন্ন্যাসী আসছেন এই পথে। বোধহয় পরিক্রমাবাসীর দল। হরানন্দজী ব্রহ্মচারীকে ধীরে সুস্থে গাছ থেকে নেমে আসতে বললেন। তিনি একটা বড় শুকনো ডাল কেটে নেমে এলেন। বেশ মোটা ডালটা নীচে পড়তেই অন্য একজন ব্রহ্মচারী তা কাটতে আরম্ভ করলেন। বহুলোকের মিলিত কণ্ঠে 'হর নর্মদে' ধ্বনি ক্রমশঃ নিকটতর হচ্ছে। মিনিট পাঁচেক পরেই যাত্রীবেশে পনের জন ভদ্রলোক এসে পৌছলেন, তাঁদের পিছনে জনা দশেক কুলি এল গোটা পাঁচেক তাঁবু বয়ে নিয়ে। হরানন্দজী এবং আমি তাঁদের কাছে এগিয়ে গেলাম তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করতে। আমরা যাঁর সঙ্গে কথা বললাম, তিনি জানালেন যে তাঁর নাম নওল নারায়ণ সপ্রে, তিনি বরোদা জেলার অন্তর্গত এই নর্মদাতীরস্থ চাঁদোদের বি, এন, হাইস্কুলের অধ্যক্ষ। তাঁদের গুরুদেব আজীবন নর্মদাসেবী বীতরাগী মহাত্মা মহেশ্বরানন্দ সরস্বতী মহারাজ, তাঁর সঙ্গে কাশীর সংকটাঘাটস্থিত জানী মঠের অচ্যুতানন্দ সরস্বতী এবং বরোদার প্রসিদ্ধ মগরস্বামী মঠ তথা নারায়ণ মঠের বহু দণ্ডী সন্ন্যাসী এবং দত্তাত্রয় নারায়ণ হাণ্ডিকর বৈদ্য প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ গৃহীভক্তকে নিয়ে শূলপাণি ঝাড়ি অতিক্রম করে ওঁঙ্কারেশ্বরের পথে যাচ্ছেন। আজ আমরা এইখানেই পিপ্পলাদ আশ্রমেই রাত্রি বাস করব। এই বলেই তিনি তাড়াতাড়ি তাঁবু খাটাবার বন্দোবস্ত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। হরানন্দজী বললেন – সংকটাঘাটের জানী মঠের ঐ অচ্যুতানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিব। ওঁদের এখানে এসে শূলপাণির ঝাড়ি শেষ হবে, আর আমাদের সুরু হবে। জয় মা নর্মদা। ওঁদের এই বাদ্যভাণ্ড আনন্দোচ্ছ্বাস স্বাভাবিক। ভালই হল, ওঁদের কাছে সদ্য অভিজ্ঞতার ফল পথঘাটের বর্তমান অবস্থা সবই জেনে নিব।

ব্রহ্মচারীরা কাঠ সংগ্রহ করে এনে অগ্নিকুণ্ড সাজাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন, আমরা ঘাটে এসে দাঁড়ালাম। সঙ্গে বাসবানন্দজী এবং রঞ্জনও আছে। উত্তরতটের দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম – স্নানের সময় ঐ দিকে তাকিয়ে আমি উত্তরতটের ঐ মহল্লাটি চিনতে পেরেছি। ঐ গ্রামের নাম গমোনা। ওখানে ভীমকুল্লা নামে একটি পাহাড়ী নদী নর্মদার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সংগমস্থলে রয়েছে সংগমেশ্বর মহাদেবের মন্দির। ঐ মন্দিরের সুউচ্চ চূড়া দেখা যাচ্ছে, দেখুন। উত্তরতট দিয়ে পরিক্রমাকালে ঐখানে এসে ঐপারের শূলপাণির ঝাড়ি শেষ হয় কিন্তু এইপারে এইখানে এসে দক্ষিণতটের শূলপাণির ঝাড়ি কিছুদূর পর হতেই আরম্ভ হবে।

এইভাবে ঘাটে দাঁড়িয়ে আমরা যখন কথা বলছি, সে সময় খুব কোলাহল, হর নর্মদে এবং বাদ্যভাণ্ড শুনে আমরা আমাদের বিশ্রামস্থলীতে দ্রুত ফিরে এলাম। এসে দেখি, প্রায় ষাটজন দণ্ডী সন্ন্যাসীর দল এসে পৌছলেন পিপ্পলাদ আশ্রমে। তাঁরা এসেই পিপ্পলাদেশ্বর শিবকে প্রণাম করেই নর্মদার ঘাটে এসে দাঁড়ালেন। তাঁদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি কর্পূর জ্বালিয়ে আরতি করলেন মন্ত্র পাঠ করতে করতে। তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে অপরাপর সন্ন্যাসীরাও গাইলেন –

নমঃ প্রণতপালিন্যৈ প্রণতার্তি বিনাশিনী।
পাহিনো দেবি দুষ্প্রেক্ষ শরণাগত বৎসলে॥ হর নর্মদে হর॥

আরতি শেষে তাঁরা সবাই তাঁদের নির্দিষ্ট ক্যাম্পের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। তাঁদের সঙ্গে চারটি কার্বাইড গ্যাসের বাতি ছিল। বড় বড় জলভর্তি ডিবায় কার্বাইড ভরে তাঁরা আলো জ্বালালেন। বনভূমি আলোকিত হয়ে গেল। তাঁদের সঙ্গে দুজন বন্দুকধারী ছিল। তারা ক্যাম্পের চারদিক ঘুরে পাহারায় রত হল। আমাদের সান্ধ্যক্রিয়া সেরে আগুন জ্বেলে বসে আছি, এমন সময় সপ্রেজী এবং অচ্যুতানন্দজী এসে বিনীত কণ্ঠে বললেন – গুরুদেব আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হতে চান। সারাদিন হেঁটে এসে তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, নতুবা তিনি নিজেই আসতেন। অচ্যুতানন্দজী হরানন্দজীকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, এই দুর্গম অরণ্যে যে কামরূপ মঠের সন্ন্যাসীদের দর্শন পাবো, তা কল্পনা করি নি। আমাদের গুরুজীর পূর্বাশ্রমের নাম নানুভাই হাণ্ডিকর বৈদ্য। বৈদ্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। উনোনে সংকল্প কিয়া জীবন কী অন্তিম শ্বাস তক বৈদ্য ক্রিয়া দ্বারা নর্মদাতট পর আর্ত জনো কী সেবা করনে কা। সন্ন্যাস লেনে কা বাদ ভী উন্হোনে রোগার্ত কো দাবা করতে হেঁ।

হরানন্দজী হিরণ্ময়ানন্দজীর দিকে তাকাতেই তিন মাথা নেড়ে অনুমতি দিলেন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে হরানন্দজী ঢুকলেন গিয়ে মহেশ্বরানন্দজীর ক্যাম্পে। বৃদ্ধ সাধু সর্বাঙ্গে কম্বল মুড়ি দিয়ে রুদ্রাক্ষমালা জপ করছিলেন। নমো নারায়ণায় শব্দে উভয়ের অভিবাদন প্রত্যাভিবাদনের পর অচ্যুতানন্দ হরানন্দজীর পরিচয় তাঁর গুরুদেবের কাছে পেশ করে আমার দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করছেন দেখে হরানন্দজীই আমার পরিচয় দিলেন এই বলে – শৈলেন্দ্রনারায়ণজী উত্তরতট পরিক্রমান্তে দক্ষিণতট পরিক্রমা করতে করতে কোটিনারের কোটেশ্বর তীর্থে যখন বিশ্রাম করছিলেন, তখন আমাদের সঙ্গে দেখা হয়, সেই থেকে আমরা একসঙ্গেই আছি। এঁর বেদবিৎ পিতাঠাকুরের আদেশেই তাঁর দেহান্তের পর জলেহরি পরিক্রমার শপথ নিয়ে ইনি পরিক্রমা করছেন। কাল সকালেই আমরা এখান থেকে শূলভেদ তীর্থের দিকে এগিয়ে যাব।

– কাল নেহি, কাল নেহি, বিহানমেঁ দণ্ডীসন্ন্যাসীওকোঁ হমলোগ ভিক্ষা দেঙ্গে। সবেরে আপকোঁ গুরুজীকা পাশ যাকৃর হাতজোড় করকে বিনতি করেঙ্গে।

মহেশ্বরানন্দজীর কথা শুনে হরানন্দজী উত্তর দিলেন – আমাদের গুরুদেব সঙ্গে আসেন নি। যিনি আমাদের দলনেতা হয়ে এসেছেন, উনি আমাদের 'বড়া গুরুভাই'।

– আপনি তাহলে তাঁকে গিয়ে আমার হার্দিক বিনতি নিবেদন করবেন। বলবেন, এই শরীরের ভিক্ষা গ্রহণের আমন্ত্রণ ছাড়াও আর একটি কারণে আপনাদের এইস্থান ছেড়ে শুধু একদিন কেন আগামী রবিবার পর্যন্ত যাওয়া উচিত হবে না। কারণ, আজ ১৩ই মাঘ, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী তিথি। আগামী রবিবার সপ্তমী তিথি। বশিষ্ঠ সংহিতা, বায়ুপুরাণ এবং স্কন্দপুরাণ, এই তিন প্রামাণিক নর্মদা সাহিত্যের রেবাখণ্ডে নর্মদার উৎপত্তি সম্বন্ধে একবাক্যে ঘোষণা করা হয়েছে যে –

মাঘে চ সিত সপ্তম্যাং দাস্রভেচ রবের্দিনে।
মাধ্যাহ্ন সময়ে রাম ভাস্করেপক্রমাগতে॥

অর্থাৎ মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে অশ্বিনী নক্ষত্রযুক্ত রবিবার, মকররাশিগত সূর্য যখন মধ্য গগনে সেই শুভক্ষণে মাতা নর্মদা পৃথিবীতে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। আমাদের সৌভাগ্যবশে এই বৎসর রবিবার, বার, তিথি, নক্ষত্র, পক্ষ এবং ক্ষণ সবকিছুর অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। সেই দিনটি আমরা সকলে মিলে একসঙ্গে পালন করতে পারলে চরিতার্থ হব।

তাঁর কথা শুনে আমি হেসে বললাম – স্বামীজী! এটা কি কোন যুক্তি হল! এইখানে থেকে মা নর্মদার জন্মতিথি পালন করতে হবে, মহর্ষি বশিষ্ঠ এমন কোন বিধান দিয়ে যান নি। আমরা কাল এখান থেকে চলে গেলেও নর্মদাতট তো ছেড়ে যাচ্ছি না। আমরা তো নর্মদা তটেরই কোন না কোন এক তীর্থে থাকব। তাছাড়া, আগামী রবিবার তো সিত পক্ষীয় সপ্তমী তিথি নয়, অসিত পক্ষীয় অর্থাৎ শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি।

আমরা নমো নারায়ণায় জানিয়ে ফিরে আসার পূর্বে হরানন্দজী মহেশ্বরানন্দজীকে বললেন – আমাদের সঙ্গে একজন নাঙ্গা মহাযোগী আছেন। তিনি শিবমন্দিরে আশ্রয় নিয়েছেন। দয়া করে আপনার পাহারাদারদেরকে বলে দিবেন, তাঁকে যেন কোনমতেই বিরক্ত করা না হয়। ক্যাম্প থেকে ফিরে আসার পর হরানন্দজীর সব কথা শুনে হিরন্ময়ানন্দজী মন্তব্য করলেন – শৈলেন্দ্রনারায়ণজী ঠিক জবাবই দিয়ে এসেছেন, রবিবার পর্যন্ত থাকার কোন মানেই হয় না, তবে কালের দিনটা থাকলেও থাকা যায়, কেন না, তাহলে ওঁদের সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনে নিতে পারব। যাই হোক, কাল যখন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হবে, তখন যেমন ইচ্ছা হবে তাই করা যাবে।

আমরা মা নর্মদাকে প্রণাম করে শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে পড়েছি, রাত্রি তখন কত আন্দাজ করতে পারলাম না, সহসা কানে ভেসে এল নাঙ্গা মহাত্মার কণ্ঠস্বর। আমি রঞ্জন হরানন্দজী প্রেমানন্দ প্রভৃতি জেগে উঠলাম। আমরা হলঘরের যে দিকটায় শুয়েছিলাম, শিবমন্দিরটা সেখান থেকে কাছে, আমরা দুটো অগ্নিকুণ্ডে আর চারটি কাঠ ফেলে আগুনটা ভাল করে উসকে দিয়ে শুনতে লাগলাম তাঁর কথা। তিনি বলে চলেছেন – আমাদের দেহে প্রাণের সঞ্চার হল কোথা হতে ? কুতঃ এষ প্রাণ আয়াতি অস্মিন্ শরীরে ? প্রশ্ন উপনিষদের ঋষি এর উত্তর দিয়েছেন – 'সূর্য হতে।' সূর্যই প্রাণের উৎস – আদিত্যো হ বৈ প্রাণঃ – সেইজন্যই ঋগ্বেদের ঋষি বলেছেন – প্রাণঃ প্রজানাম্ উদয়ত্যেষ সূর্যঃ, সূর্য হতেই প্রাণের ধারা পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়; অথাদিত্য উদয়ন্ যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি, তেন প্রাচ্যান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে। যদ্ দক্ষিণাং যদ্ প্রতীচীং যদ্ উদীচীং যদ্ অধো যদ্ উর্ধ্বং যদন্তরো দিশো, যৎ সর্বং প্রকাশয়তি, তেন সর্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে।

সূর্য হতে বিচ্ছুরিত ঐ প্রাণ আমরা প্লীহা-যন্ত্রের সাহায্যে সংগ্রহ করে আত্মসাৎ পূর্বক স্বকীয় করে নিই। এইভাবে সমষ্টি সৌর প্রাণ ব্যষ্টি জৈব প্রাণে রূপান্তরিত হয়। পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক Godfrey Hodson এর লেখা Science of Seership গ্রন্থে আছে — The Prana from the Sun is absorbed by the spleen – centre, which is the vital receiving and transmitting station of the body.

প্লীহার দ্বারা ঐভাবে স্বী-করণের পর, ঐ জৈব প্রাণ, স্নায়ু প্রণালীর বাহনে সর্ব শরীরে সঞ্চালিত হয়। আমাদের এই স্থূল ভাণ্ডদেহের ইথিরীয় প্রতিকৃতি (Etheric double) আছে। তাকে বলি পিন্ডদেহ। দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই ঐ পিন্ডদেহে প্রাণের স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ প্রত্যক্ষ করতে পারেন। ঐ পিন্ডদেহই জৈব প্রাণের বাহন। জীব শরীরে এই প্রাণের প্রবাহ যদি মন্থর হয়, আংশিকভাবেও স্থগিত বা স্তম্ভিত হয় অর্থাৎ সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়, তবে স্বাস্থ্যহানি সুনিশ্চিত। এইবার সংক্ষেপে আপনাদেরকে কুন্ডলিনীর জাগরণের কথা শোনাতে চাই। ষট্‌চক্রের কথা এইজন্য শোনাতে চাই যে, কুন্ডলিনী জাগ্রত হয়ে ষট্‌চক্র ভেদপূর্বক মস্তিষ্কস্থ সহস্রারে উপনীত হলে আমাদের দেহস্থিত প্রাণশক্তি সতেজ হয়, দীপ্ত হয়, স্ফূর্ত হয়। কুন্ডলিনীর রহস্য হল, প্রজ্ঞানসম্মত দেহ বিজ্ঞান। পাশ্চাত্ত্য পন্ডিতরা যতদিন না এই কুন্ডলিনীর ব্যাপার অবগত হবেন, ততদিন তাঁদের আয়ুর্বিজ্ঞান অপূর্ণ থেকে যাবে। কিছুদিন হল, তাঁরা Ductless glands বা অন্তর্মুখ গন্ডের কথা অবগত হয়েছেন– যেমন, Thyroid gland, Pincal Gland, Pituilary Gland এবং তার ফলে কত অভিনব তত্ত্বই না তাঁরা আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানকে এই কুণ্ডলিনীর জাগরণ এবং ষট্‌চক্রভেদের কথাও জানতে হবে।

এই পর্যন্ত বলার পরেই তাঁর কণ্ঠস্বর নীরব হল। আমরা নিজেদের মধ্যে নিম্নস্বরে আলোচনা করতে লাগলাম, হঠাৎ তাঁর এই ধরণের প্রসঙ্গ Ventroloquism এর সাহায্যে আমাদেরকে শোনানোর হেতু কি ? এর আগে আমরা দেখেছি, আমরা কোন কথা বা

বিশেষ কোন শব্দ কথা প্রসঙ্গে যখন আলোচনা করছি, তখনই সেই বিষয়ে কোন গুরুগম্ভীর তত্ত্ব তিনি আমাদেরকে শুনিয়েছেন তাঁর নিবাসস্থল থেকে। কিন্তু আজ ত আমরা ঘুমিয়েই ছিলাম। তাঁর কণ্ঠস্বর এই হলের মধ্যে নিনাদিত হতে তবে ত আমাদের ঘুম ভাঙল। তবে কি মহেশ্বরানন্দজীর ক্যাম্পের মধ্যে এই প্রসঙ্গে কোন আলোচনার সূত্র উত্থাপিত হয়েছে? রঞ্জন আগুনের দীপ্তিতে ঘড়ি দেখে বলল রাত্রি চারটায় আমরা জেগেছি, এখন সাড়ে চারটা বেজেছে। ভীষণ কুয়াশা জমাট বেঁধেছে, ঠাণ্ডা বাতাসের কন্‌কনে ঠাণ্ডায় আমরা কাতর হয়ে পড়েছি। সকলেই অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে বসে আছি।

আবার তাঁর কণ্ঠস্বর শূন্যে ভেসে এল। 'এর আগে আপনাদের কাছে পিণ্ডদেহের উল্লেখ করেছি। ঐ পিণ্ডদেহে স্থূল ভাণ্ডদেহের বিশেষ বিশেষ প্রত্যঙ্গের সংসৃষ্ট ছ'টি শক্তি কেন্দ্র আছে – তাদের এককথায় ষট্‌চক্র বলে। চক্র বলতে বুঝায় ঘূর্ণ্যমান শক্তিকেন্দ্র, বৈজ্ঞানিক Hodson-এর ভাষায় — They are the force - centres in the human body and are so called, because to clairvoint sight they have the appearance of spinning vortices. They are six plexuses. এই ষট্‌চক্র কি কি? মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র।

মূলাধারাং স্বাধিষ্ঠানং মণিপুরম্ অনাহতম্।
বিশুদ্ধঞ্চ তথাজ্ঞাং চ ষট্‌চক্রাণি বিভাবয়েৎ॥

আপনাদের মনে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগতে পারে ঐ সকল চক্রের স্থান কোথায়? মূলাধারের স্থান মেরুদণ্ডের অধস্থলে — at the base of the spine. এই চক্র হতে প্রাণ প্রসৃত হয়ে জননযন্ত্রকে (Generative System কে) অনুপ্রাণিত করে। এই চক্রের অভ্যন্তরে কুণ্ডলিনী শক্তি (Serpent Power) ত্রি-বলি আকারে সুষুপ্ত থাকে। বৈজ্ঞানিক Hodson বলেছেন – In the heart of this chakram, lies the 'serpent fire', Kundalini and there it sleeps through out the ages until the time is ripe for it to be aroused.

মূলাধারের পর স্বাধিষ্ঠান চক্র। এর স্থান প্লীহার সন্নিকটে। আমরা দেখেছি যে, এই চক্রই সমষ্টি সৌরপ্রাণকে আত্মসাৎ করে বিশিষ্ট জৈব প্রাণে পরিণত করে। এই চক্রের ক্রিয়া স্তিমিত হলে প্রাণের স্বচ্ছন্দ গতি স্তম্ভিত হয়, স্নায়বিক দুর্বলতার (Nervous debility) প্রকাশ ঘটে।

স্বাধিষ্ঠানের ঊর্ধ্বে মণিপুর। মণিপুর চক্রের স্থান নাভি (Naval)। মণিপুরের ইংরাজী নাম Solar plexus. এই চক্রের function সম্বন্ধে Hodson লক্ষ্য করেছেন — It is the receiving station for all sub-conscious emotional vibrations, which are conveyed by it to the physical nerve ganglion of the same name etc.

মণিপুরের উপরে অনাহত চক্র (Cardiac plexus)। এই চক্রের স্থান হৃদয় (Heart)। এই হৃদপদ্মের কথা আমাদের শাস্ত্রে বহুভাবে বর্ণিত আছে – 'হৃৎপদ্ম কোষে বিলসৎ তড়িৎপ্রভম্।' শংকরাচার্যের মতে, সাধারণ মানুষের মধ্যে এই পদ্ম অধোমুখ হয়ে নিমীলিত থাকে – সাধনবলে ঐ পদ্ম ঊর্ধ্বমুখে বিকশিত হয়। খৃষ্টান Mysticরা এই পদ্মকে Mystic Rose বলেন — The petals of which open only after the christ child has been born in the heart. চৈনিক যোগীরা একেই বলেন 'আইচিন' – কনক-কমল (The Golden flower) which is the light of heaven–যোগদীপ্তিতে যার বিকাশ ঘটে।

অনাহত চক্রের উপর বিশুদ্ধ চক্র। স্থান কণ্ঠ (Throat)। বিজ্ঞান সম্প্রতি Thyroid Gland-এর যে সকল ব্যাপার আবিষ্কার করেছেন, সেগুলি এই চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই

চক্রের সঙ্গে মূলাধারের ঘনিষ্ট সম্পর্ক। কারণ বিজ্ঞান লক্ষ্য করেছেন — It is not unusual to find that disturbances of the creative organs and functions produce corresponding disorders of the throat, which is the higher creative centre.

বিশুদ্ধ চক্রের উপর আজ্ঞাচক্র। ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী স্থান। গীতাতে তারই ইঙ্গিত 'ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণম্ আবেশ্য সম্যক।' এই চক্র দ্বিদল -- একটি দল পাশ্চাত্য শরীর-বিজ্ঞানের Pineal Gland, এর শাস্ত্রীয় নাম 'ইন্দ্র-যোনি' এবং অপর দলটি Pituitary Body, যার শাস্ত্রীয় নাম শৈবাগম-তন্ত্রের পরিভাষায় 'তারা-যন্ত্র'। সাধারণ Physiology গ্রন্থে এই দুটি গ্ল্যাণ্ডকে 'two insignificant execrescences in man's cranial cavity' বলা হয়। অধ্যাপক বিচে (Bichat) ঐ দুটিকে 'two horny warts covered with grey sand acervulus cerebri' বলে অবজ্ঞা করেছেন। কিন্তু যোগিনী ম্যাডাম ব্লাভাস্কি তাঁর বিখ্যাত Secret Doctrine গ্রন্থে ঐ বালুকাকে লক্ষ্য করে বলেছেন — This sand is very mysterious and baffles the enquiry of every materialist. In the cavity on the anterior surface of this gland (Conarium), is found a yellowish substance semi-transparent, brilliant and hard, the diameter of which does not exceed half a line (one line is equal to one - twelveth part of an inch). Such is the acervulus cerebri.

এই আজ্ঞাচক্রের উপর ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রার। এর স্থান মস্তিষ্কের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখলে এই পদ্মের এক হাজার দল দেখতে পাওয়া যায়। সেইজন্যই এর নাম সহস্রার — Thousand petalled lotus.

সাধারণতঃ সহজ অবস্থায় কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধারে সুষুপ্ত থাকেন। বিশেষ বিশেষ যোগক্রিয়া দ্বারা ঐ শক্তিকে জাগরিত করা হয়। এই সেই উপনিষদের 'নাচিকেত অগ্নি' - যম ঋষি বালক নচিকেতাকে ঐ অগ্নিরই উপদেশ দিয়েছিলেন। ঐ অগ্নি প্রজ্বলিত হলে জীব অমরত্বের অধিকারী হয় - তরতি জন্মমৃত্যু - কারণ, ঐ অগ্নির সংস্পর্শে শোধিত হয়ে যোগীর যোগাগ্নিময় শরীর হয় - তিনি জরা, রোগ ও মৃত্যুর অতীত হন।

ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ॥ (শ্বেতাশ্বর উপনিষদ)

এখন আপনাদের মত তপস্বী দণ্ডী সন্ন্যাসীদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে শৈলেন্দ্র নারায়ণের মনে প্রশ্ন ত জেগেই গেছে - কুণ্ডলিনী কি ? ভারতীয় যোগীদের মতে কুণ্ডলিনী হল বিশ্বতাড়িত শক্তি, the cosmic electricity. প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক যোগী স্বামী রামতীর্থ ইংলণ্ডে গিয়ে যখন সুন্দরবনের জঙ্গল হতে সদ্যধৃত ক্ষুধার্ত রয়াল বেঙ্গল টাইগারকে 'আ মেরি আত্ম হৈ' বলে জড়িয়ে ধরেন, মহাভয়ঙ্কর বাঘ ঐ দণ্ডী সন্ন্যাসীকে হিংস্র নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন না করে স্বামীজীর পদতলে লুণ্ঠিত হয়ে তাঁর চরণকমল চুম্বন করতে থাকে, তখন বিস্ময়ে হতবাক্ সমবেত বিশিষ্ট ইংরাজদেরকে বলেন, তাঁর প্রবুদ্ধা কুণ্ডলিনী শক্তি প্রভাবেই তাঁর পক্ষে এই কাজ সম্ভব হয়েছে। স্বামীজী বলেন — Kundalini is called the serpentine or annular power, on account of its spiral like working or progress in the body of the ascetic, developing the power in himself. It is an electric fiery occult or fohatic power, the great pristine force which underlies all organic and inorganic matter. তিনি আরও জানিয়েছিলেন যে, আলোর গতি যেখানে সেকেণ্ডে ১৮৫০০০ মাইল, সেখানে কুণ্ডলিনী শক্তির গতি সেকেণ্ডে ৩৪৫০০০ মাইল।

যাই হোক, কুণ্ডলিনী যখন বিশ্বতাড়িত শক্তি, তখন মূলাধার চক্র তার উৎপত্তিস্থান হতে পারে না। আমি জানি, যৌগিক উপায়ে মূলাধার বিকশিত হলে ঐ চক্র বিশ্ববাহী সমষ্টি কুণ্ডলিনী শক্তি আত্মসাৎ করবার ক্ষমতা লাভ করে – যেমন জলস্তম্ভে জলচ জলধিকে absorb করে আত্মসাৎ করে, এও সেই ধরণের ব্যাপার। এইভাবে কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে মেরুদণ্ডের সুষি সুষুম্নামার্গে উর্ধ্বমুখে প্রবাহিত হয়। সূর্য নাড়ী (ঈড়া) ও চন্দ্রনাড়ী (পিঙ্গলা) এবং সুষুম্না এই তিন নাড়ীর মধ্য দিয়ে উর্ধ্বমুখে উত্থিত হয়ে কুণ্ডলিনী শক্তি পরপর ঐ মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্রকে উজ্জ্বলিত ও অনুপ্রাণিত করে অবশেষে সহস্রার সদাশিবের সঙ্গে সঙ্গতা হন। কুণ্ডলিনী শক্তি উদ্দীপনে শরীর নব রসায়ন দ্বারা নবীকৃত হয়।

এহ বাহ্য। এতক্ষণে ধরে যা কিছু বললাম, তা হল কুণ্ডলিনী জাগরণের আধিভৌতিক ফল। কিন্তু ষট্চক্র সম্বন্ধে এ জাগরণের একটা আধ্যাত্মিক সার্থকতা আছে। সে সার্থকতা এই যে, কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে ঐ ষট্চক্র অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ে (Super physical sense organs-এ) পরিণত হয়। মূলাধার উজ্জ্বলিত হলে যেমন বিশ্বতাড়িত কুণ্ডলিনীকে সংগ্রহ করার যোগ্যতা লাভ করে, তেমনি স্বাধিষ্ঠান–চক্র উজ্জ্বলিত হলে মানুষ সূক্ষ্মতরলোকে স্বচ্ছন্দ-বিহারের ক্ষমতা লাভ করে। মণিপুর উজ্জ্বলনের ফলে সাধকের আত্মরক্ষার ক্ষমতা সমধিক বর্ধিত হয় আর অনাহত-চক্রের উজ্জ্বলনের ফলে মানুষের মধ্যে বুদ্ধির উপর যে বোধি (intuition) আছে তার উন্মেষ ঘটে। বিশুদ্ধ-চক্রের উজ্জ্বলনে মানুষের দিব্যশ্রুতির (Clair audience) ক্ষমতা বিকাশ লাভ করে।

কিন্তু আজ্ঞা-চক্র সম্পর্কেই জাগরিত কুণ্ডলিনীর বিশেষ কার্যকারিতা উপলব্ধ হয়। আজ্ঞাচক্রের দ্বিদলের কথা আমি পূর্বেই আপনাদেরকে জানিয়েছি – একদল (Pituitary body) অর্থাৎ যৌগিক পরিভাষায় তারা যন্ত্র এবং অন্যদল Pineal Gland বা ইন্দ্রযোনি। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই আজ্ঞাচক্র অব্যক্ত (undeveloped) থাকে এবং জৈব প্রাণের প্রবাহ তার অন্তরালে প্রবাহিত হয়ে ভ্রূমধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়। কিন্তু আজ্ঞাচক্র যখন বিকশিত হয়, তখন শিবনেত্রের উন্মীলন ঘটে। বিকশিত আজ্ঞাচক্রই যোগিদের পরিভাষায় শিবনেত্র। শিবনেত্রের উন্মীলনে জীব ত্রি-অম্বক – ত্রি-অম্বকং সংযমিনং দদর্শ। এই আজ্ঞাচক্রই দিব্যদৃষ্টির যন্ত্র। এরই সাহায্যে অনিমাদি যোগসিদ্ধি।

আজ্ঞাচক্রকে উজ্জ্বলিত করে কুণ্ডলিনী যখন সহস্রারে উপনীত হয়, তখনই কুণ্ডলিনী সাধনার চরম অবস্থা। কুণ্ডলিনী শক্তি সহস্রার সদাশিবের সঙ্গে সঙ্গতা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধক শুধু ব্রহ্মানন্দেই বিভোর হন না, তাঁর সর্বত্র ত্রিলোকে স্বচ্ছন্দ বিহারের পূর্ণ ক্ষমতা জন্মে ; উপনিষদ এই অবস্থাকে 'কামচার' বলে বর্ণনা করেছেন – তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। শুধু তাই নয়, পাতঞ্জল যোগদর্শনের ৩/৫৪ সূত্রে যাকে সর্বজ্ঞতা সিদ্ধি বলা হয়েছে, সেই সর্বজ্ঞতা-সিদ্ধিও সাধকের লাভ হয় – তারকং সর্ববিষয়ং সর্বথাবিষয়ম্ অক্রমঞ্চ ইতি বিবেকজজ্ঞানম্ ॥

রঞ্জনের ঘড়িতে দেখলাম, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। চারদিক ঘন কুয়াশা কুজ্ঝটিকাময়। সমগ্র বনস্থলী পাখীর কলরবে মুখর হয়ে উঠলেও যে কণ্ঠস্বর এতক্ষণ reverberated বা প্রতিধ্বনিত হয়ে আমাদের এই হলঘরটাকে নিনাদিত করে রেখেছিল এবং আমরাও যে স্বর এতক্ষণ ধরে তন্ময় হয়ে শুনছিলাম, তা বন্ধ হয়ে গেছে। বাসবানন্দজী বললেন – এমন ঘন কুয়াশা যে কাছের মানুষকে এখনও ভাল করে চেনা যাচ্ছে না। অগ্নিকুণ্ডে আরও কিছু কাঠ দেওয়া হোক, অরুণোদয় না হওয়া পর্যন্ত এখন বাইরে বেরুবি না। তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই সপ্রেজী এবং অচ্যুতানন্দজী তাঁদের ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসে সোজা আমাদের হলঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন – আপনাদের কারও কাছে

amplifier আছে ? আপনাদের এখান থেকে যেন মাইকে করে কিছু বাজিয়ে শোনান হচ্ছে বলে আমাদের গুরুদেবের মনে হয়েছে। প্রতিদিনই সকল ঋতুতেই গুরুদেব রাত্রি চারটায় শয্যা ত্যাগ করে চা পান করেন। এ তাঁর বহুদিনের অভ্যাস। তিনি এবং স্বামী বেদানন্দ, যিনি পূর্বাশ্রমে প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন, তাঁরা ষ্টোভ জ্বেলে যখন চা তৈরী করে খাচ্ছিলেন, চা খেতে খেতে আয়ুর্বেদ এবং আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র মতে প্রাণের উৎস কোথা থেকে এল, এ বিষয়ে দুজনে যখন আলোচনা করছিলেন, তখন তাঁদের কথার সূত্র ধরেই কেউ যেন কিছু জবাব দিচ্ছেন, এইরকম তাঁরা স্পষ্ট কারও কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছেন, তাই আমাদের গুরুদেব পাঠিয়েছেন খোঁজ নিতে আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমার দিকে ঈঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে হরানন্দজী তাঁদেরকে বললেন – আমাদের কাছে amplifier, mike বা কোন কলের গান নাই। বিজলী ছাড়া কি amplifier বা মাইক বাজে ?

– শিবের ঘরে যিনি আছেন, তাঁর কাছে কি কোন যন্ত্র আছে ?

– তিনি একজন নাঙ্গা সাধু, ঐ সব বস্তু ত দূরের কথা, তাঁর পরিধানে এক টুকরো নেংটি পর্যন্ত নাই। সম্পূর্ণ নিরাবরণ ও নিরাভরণ। রোদ উঠুক, ফাঁকা হোক, দেখলেই বুঝতে পারবেন।

হরানন্দজীর জবাব শুনে তাঁরা ফিরে গেলেন তাঁদের ক্যাম্পে। আমরা চোখ টিপাটিপি করে হাসাহাসি করতে লাগলাম। হরানন্দজী বললেন – দেখলেন ত, মহেশ্বরানন্দজী এবং বেদানন্দ দুজনে প্রাণের উৎস সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন, তাই আমার বেশ মনে আছে, নাঙ্গা মহাত্মার দীর্ঘ ভাষণের প্রথম কথাটাই ছিল – মানুষের দেহে প্রাণের সঞ্চার হল কোথা থেকে ? কুতঃ এষ প্রাণ আয়াতি অস্মিন্ শরীরে ?'

ক্রমে চারদিক ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে আসছে। তখনও কিন্তু গাছপালা হতে টুপটুপ্ করে শিশির পড়ছে। আমরা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সকলেই উঁকি মেরে মা নর্মদাকে দর্শন করে প্রণাম করলাম। দেখলাম, নাঙ্গা সাধু নর্মদাতে ডুব দিয়ে উঠে আসছেন। তাঁর গা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তিনি সোজা এসে ঢুকলেন আমাদের ঘরে। আমরা সকলেই তাঁকে নমো নারায়ণায় জানালাম, তিনিও মৃদু হেসে বললেন – নমো নারায়ণায়। এবার সকলে প্রাতঃকৃত্য করতে গেলেন। নাঙ্গা সাধু চুপ করে বসে থাকলেন নর্মদার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে রওনা হওয়ার উদ্দেশ্যে যে যার ঝোলা গাঁঠরী বাঁধার উদ্যোগ করছি, এমন সময় স্বয়ং মহেশ্বরানন্দজী তাঁর দুজন সহচরকে সঙ্গে নিয়ে হিরন্ময়ানন্দজী সহ সকলকে নমো নারায়ণায় জানিয়ে আজ ১৪ই মাঘ তাঁর কাছে ভিক্ষা গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। হিরন্ময়ানন্দজী তাঁর বিনয় বচনে আপ্যায়িত হয়ে এক কথাতেই রাজী হয়ে গেলেন। বুঝলাম আজকের দিনটাও পিপ্পলাদ আশ্রমে কাটাতে হবে। ঝোলা গাঁঠরী যথাস্থানে রেখে কেউ কেউ রোদ পোয়াবার জন্য নর্মদাতটে গিয়ে বসলেন, কেউ বা স্নান করে শিবপূজা সারতে উদ্যোগী হলেন। নাঙ্গা বাবাকে বসে থাকতে দেখে আমিও বসে থাকলাম তাঁর কাছে। ঘর ফাঁকা দেখে আমি তাঁকে বললাম – ভগবন ! কাল শেষরাত্রে আপনার শ্রীমুখ থেকে বিজ্ঞানতত্ত্ব প্রজ্ঞানতত্ত্ব বিশেষতঃ ষট্‌চক্র তত্ত্ব সম্বন্ধে যে সব নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটিত হল, তার উপসংহার টানতে গিয়ে পাতঞ্জল যোগদর্শনের সমাধিপাদের ৫৪ নম্বর সূত্রটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে তারকজ্ঞান এবং সর্বজ্ঞতাসিদ্ধি সম্বন্ধে যে সব কথা বললেন, তা আর একটু স্পষ্ট করলে আমি কৃতার্থ বোধ করব।

আমার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে তিনি বলতে লাগলেন – ঐ সূত্রে বিবেকজ্ঞানের স্বরূপ নিরূপণ করা হয়েছে। ঋষি বলছেন - সর্ব বিষয়ক সর্বথা বিষয়ক এবং অক্রমে প্রাদুর্ভূত যে তারকজ্ঞান, তাই বিবেকজ্ঞান নামে অভিহিত হয়।

তারকজ্ঞানেরই অন্য নাম বিবেকজজ্ঞান। প্রতিভাগম্য অনৌপদেশিক জ্ঞানই তারকজ্ঞান। সাধনার বিভিন্ন স্তরে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তা সর্ববিষয়ক নয়, অধিকাংশ বিষয়ক মাত্র; কিন্তু এইক্ষেত্রে অর্থাৎ সহস্রারে এসে যে বিবেকজ্ঞান প্রকাশিত হয়, তা সর্ববিষয়ক অর্থাৎ কোন একটি বিষয়ও সে জ্ঞানের কাছে অপ্রকাশিত থাকতে পারে না। কেবল তাই নয় ঐ জ্ঞান সর্বথাবিষয়কও বটে। যে কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে যত রকমে যা কিছু জানবার যোগ্য থাকেন, সে সকলের সঙ্গে অর্থাৎ অবান্তর যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয়ের সঙ্গে সেই বিষয়ের যে পূর্ণ জ্ঞান তাই সর্বথাবিষয়ক। ঐ সূত্রে আর একটি বিশেষণ আছে – 'অক্রম।' সাধারণতঃ যে জ্ঞান প্রকাশ পায় তা ক্রমে ক্রমে বস্তুর সর্বথা বিষয়কে গ্রহণ করে ; কিন্তু এই তারকজ্ঞান অক্রমে অর্থাৎ যুগপৎ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এই যে একক্ষণে উপারূঢ় জ্ঞান তাকে লক্ষ্য করেই সূত্রে অক্রম শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে। এইরকম ভাবে, সর্ববিষয়ক, সর্বথাবিষয়ক এবং অক্রমে প্রাদুর্ভূত যে তারকজ্ঞান, তাই বিবেকজজ্ঞান নামে যোগশাস্ত্রে উপদিষ্ট হয়েছে।

শৈলেন্দ্রনারায়ণজী, তুমি এই যোগ মার্গে অগ্রসর হতে গিয়ে তিনবার তারকজ্ঞানের সাক্ষাৎ পাবে। প্রথম যে তারকজ্ঞান প্রকটিত হবে, তা তোমাকে মাত্র স্থূল পদার্থের স্বরূপ প্রকাশ করে দিবে। দ্বিতীয়বারে তা তোমাকে সূক্ষ্মপদার্থ সমূহের স্বরূপ দেখিয়ে দিবে আর এই তৃতীয় স্তরে পৌছে তোমার কাছে যে তারকজ্ঞান উপস্থিত হবে, তা তোমাকে কারণ অর্থাৎ প্রকৃতি পর্যন্তের স্বরূপ উদ্ভাসিত করে দিবে। অতি সূক্ষ্ম কালের স্বরূপ পর্যন্ত এই জ্ঞান প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এই জন্যই পতঞ্জলিদেব এই শাস্ত্রে তিন স্থানে তিন প্রকারে প্রাতিভ-জ্ঞানের উল্লেখ করেছেন। এই তৃতীয়স্তরের তারকজ্ঞান – একক্ষণে উপারূঢ় সর্বথা বিষয়ক বলেই কৈবল্যের একান্ত সন্নিহিত প্রজ্ঞাস্বরূপও বটে।

প্রাতঃকৃত্য সেরে সন্ন্যাসীরা একে একে ফিরে আসছেন দেখে নাগা বাবা চুপ করে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে এবার আমি গেলাম নর্মদাতটে। সেখানে হরানন্দজী এবং রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হল। তাঁর রোদ পোয়াচ্ছিলেন। প্রাতঃকৃত্য সেরে আমি স্নান করতে নামতেই তাঁরাও দৌড়ে গেলেন গামছা ও ল্যাঙ্গট আনতে, তাঁরাও স্নান করবেন। জল এত ঠাণ্ডা যে, জলে হাত দেওয়াই প্রাণান্তকর অবস্থা। কিন্তু আজ বহুলোকের ভীড়, তাড়াতাড়ি স্নান করে শিবের মাথায় জল ঢালতে না পারলে পরে হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে। আমি স্নান তর্পণাদি সারতে সারতেই হরানন্দজী এবং রঞ্জনও স্নান তর্পণ সেরে নিলেন। আমরা তিনজনে একসঙ্গে শিবমন্দিরে ঢুকলাম। সেখানে পূজাপাঠ সেরে যখন হলঘরে এসে ঢুকলাম, তখন বেলা সাড়ে ন'টা। আমাদের দলের প্রায় প্রত্যেকেই স্নানপূজা সেরে রোদে বসেছেন। হিরন্ময়ানন্দজীও স্নান পূজা সেরে মহেশ্বরানন্দজীর কাছে গেছেন। সেদিকটায় খুবই হৈ রৈ পড়ে গেছে। রান্নার আয়োজন চলছে। আমি এই দেখে আশ্চর্য হলাম যে হাঁড়ি তাবা চাটু বেলনী বড় বড় আটার বস্তা ঘি এর টিন কী নেই মহেশ্বরানন্দজীর সঙ্গে এত বড় দল সঙ্গে নিয়ে তিনি পরিক্রমায় বেড়িয়েছেন, তাই সব আয়োজনই তাঁর সঙ্গে আছে। হলঘরের এক কোণে নাঙ্গা সাধু বসে আছেন চুপ করে। কোনদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই। তদ্‌গত চিত্তে তিনি কি বা কার কথা ভাবছেন, তা তিনিই জানেন। আমি খাতা বের করে তাঁর কাছে যা যা শুনেছি, তা লিখতে বসলাম। চিন্তা করে লিখতে লিখতে যেখানে আটকে যাচ্ছিল, সেইখানে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে শুধরে নিচ্ছিলাম। এককাঁকে হরানন্দজী ঢুকে আমাকে বলে গেলেন – সকলকে আমি বাইরেই আটকে রাখছি, রোদে বসে আড্ডাতে মাতিয়ে রাখছি, আপনি নিশ্চিন্তমনে বসে লিখে নিন, এমন সুযোগ আর পাবেন না। এই দরদী সন্ন্যাসীকে মনে মনে নমস্কার জানিয়ে আমি এক মনে লিখে যেতে লাগলাম। হনুমন্তেশ্বরের মন্দিরে ভীমেশ্বর এবং অর্জুনেশ্বরের মন্দিরে নাগা বাবার মু

দিয়ে যে সব বাণী বচন গভীর রাত্রে স্বতঃই উৎসারিত হয়েছিল, আমি সেইগুলিই একে একে লিখে তাঁকে দিয়ে সংশোধন করে নিলাম। ষট্‌চক্রের বিবরণগুলি যথাযথ লিখতে পারলেও তিনি যে সব ইংরাজী ভাষায় উদ্ধৃতি শুনিয়েছিলেন, সেইগুলি হুবহু লিখতে গিয়ে একটু বেশী মাত্রায় হোঁচট খাচ্ছিলাম অর্থাৎ ভুল করছিলাম, তাঁকে জানাতেই তিনি হাসতে হাসতে বললেন, তুমি আমার প্রতিটি ইংরাজী উদ্ধৃতির প্রথম লাইন লিখে নাও, তারপর পরিক্রমার শেষে কোথাও স্থির হয়ে বসে Godfrey Hodson এর Science of Seership, ম্যাডাম ব্লাভাস্কির Secret Doctrine, স্যার অলিভার লজের Making of man, স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর Response in the living and the non-living, স্যার জেমস্ জিনস্ এর Mysterious Universe, প্রফেসর এডিংটনের The Expanding Universe প্রভৃতি বই সংগ্রহ করে পড়ে নিবে। সর্বোপরি মা নর্মদাকে সর্বদা স্মরণ করবে। তোমার পরিক্রমা সফল হলে মার দয়াতেই তোমার স্মৃতিশক্তির উজ্জ্বলন ঘটবে এবং প্রয়োজনীয় সকল তত্ত্ব ও তথ্যের আকর গ্রন্থ মা নর্মদাই তোমাকে জুটিয়ে দিবেন।

.. বেলা একটা পর্যন্ত আমি লিখে গেলাম। কিন্তু ঐ সময় হরানন্দজী এসে বললেন – রান্নার কাজ শেষ, এইবার ভিক্ষা গ্রহণের ডাক পড়বে। মন্দিরে মহাদেবের পূজা শেষ হয়েছে, এখন মন্দির ফাঁকা, কাজেই নাগা বাবা আপনি শিবমন্দিরে গিয়ে একান্তে নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকুন। তাঁর কথায় নাঙ্গা সাধু চলে গেলেন মন্দিরে, আমরা মহেশ্বরানন্দজীর ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে গেলাম। সেখানে বেলা দুটা নাগাদ আমাদের ভিক্ষা গ্রহণ পর্ব শেষ হল। ভিক্ষার উপাদান পুরী এবং গুড়। ভয়ংকর জঙ্গলখণ্ডে এই যথেষ্ট।

ভিক্ষা গ্রহণের পর আমি হরানন্দজীকে সঙ্গে নিয়ে পিপরিয়া মহল্লাতে গেলাম সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপ করতে। জংলী লোকের প্রকৃতি হিংস্র হয়, যদি তারা ভীল হয় তাহলে ত সমূহ বিপদ, এইজন্য স্বামীজী প্রথমে ঘোরতর আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু এই পিপ্পলাদ আশ্রমে আসার সময় তাদের মুখ চোখ দেখে এবং যে ভাবে তারা ভদ্র ও বিনীতভাবে আমাদেরকে পথ দেখিয়ে দিয়েছিল, তাতে তাদেরকে দেখে হিংস্র প্রকৃতির বলে মনে হয় নি। তাই শূলপাণির ঝাড়ির বহুশ্রুত ভয়ঙ্কর সম্বন্ধে আরও কিছু জেনে নেবার জন্য তাদের কাছে গেলাম। প্রায় ষাট ঘরের বস্তি, যথার্থ পর্ণকুটীর বলতে যা বুঝায়, তাদের বসতবাড়ী সেইরকম। প্রত্যেকটি কুটীর এবং স্ত্রীপুরুষদের বেশবাসও সেই রকম দারিদ্র্য লাঞ্ছিত। আমরা বস্তীতে ঢুকতেই একজন বৃদ্ধ আমাদেরকে হাসিমুখে একটি খাটিয়া পেতে দিল বসতে। বস্তির মধ্যে এবং তার বাইরে শুধু ভুট্টা গাছ, বজরা গাছ। তাদের ভাষা আমরা জানিনা। তবু ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে কথা বলতে বলতে আমরা অতিকষ্টে জানতে পারলাম যে কাঠ কেটে এবং বাজরা মকাই খেয়েই তারা জীবনধারণ করে। নাদোদ থেকে গোরাঘাট পর্যন্ত নর্মদা যোজনার পরিকল্পনানুসারে পাথর কেলে অতি সম্প্রতি যে বাঁধ বাঁধার চেষ্টা হচ্ছে, তাদের জোয়ান ছেলেরা সেখানে কাজ করতে গেছে। গোরাঘাট থেকে সঘন জঙ্গল এবং পাথর, শুধু পাথর। শূলপানির ঝাড়িতে অজস্র হিংস্র জন্তু, তাদের চেয়েও ভয়ঙ্কর হচ্ছে ভীলরা। তারা সহসা আক্রমণ করে যাত্রীদের সব লুটেপুটে নেয়। না দিলে খুন করে ফেলবে। হরানন্দজীর হাতে একটি ছোট্ট ঝুলি ছিল, হাতে সেলাই করা ঝুলি। সেই ঝুলির সেলাই করা সুতোতে হাত বুলাতে বুলাতে সেই বৃদ্ধ যে সব কথা বলল, তার এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না, কেবল 'মাউসী' এবং 'সিঁয়াই' এই দুটি শব্দের বারবার উচ্চারণ শুনে হরানন্দজী অনুমান করলেন, হয়ত বুড়ো সূঁচ চাইছে এই বলে যে আমাদের 'মাউসী' অর্থাৎ বুড়োর স্ত্রী কাঁথা সেলাই করবে। হরানন্দজী তাঁর ঝুলি থেকে এক বাণ্ডিল সূঁচ বের করে বুড়োর হাতে দিলেন। তাদের আনন্দ আর ধরে না। প্রায় দশটা সূঁচ ছিল বাণ্ডিলে, তা পেয়ে বুড়ো ৫/৬ জন মেয়ে পুরুষকে ডেকে তাদেরকে

ভাগ করে দিল। মেয়ে পুরুষরা এমন কলরব করতে লাগল, মনে হল, তাদের হাতে কোন মহারত্ন দান করা হয়েছে।

বিদায় নেবার আগে বুড়োকে জিজ্ঞাসা করলাম – তোমরা ভীলদের এত নিন্দা করছ দেখে বুঝতে পারছি তোমরা ভীল নও। তোমাদের জাত কি ? বুড়ো বলল – আমরা ওয়াঙ্কি। আমাদের আদি নিবাস ছিল অকলবাড়াতে। ওপারের অর্থাৎ উত্তরতটের শূলপাণির ঝাড়িতে। অকলবাড়া নামটি শুনেই আমি চমকে উঠলাম। আমার মনে পড়ে গেল সেই দীর্ঘদেহী অবধূত করপাত্রীজীর কথা। আমার বুকের ভিতরটা ব্যথায় গুড়গুড় করে উঠল। হায় ! তাঁর সঙ্গে হয়ত আর জীবনে কোনদিন দেখাই হবে না। উত্তরতটে কোটেশ্বর মন্দিরে ভীলরা অতর্কিত আক্রমণে যখন আমাকে এবং মতীন্দ্রকে সহসা বেঁধে ফেলে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন সেই মহাযোগী মন্দিরে সহসা আবির্ভূত হয়ে আমাদের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। যোগবলে তিনি কিভাবে ভীলদের প্রতিটি movement স্তব্ধীভূত করে তাদেরকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন, তা আমার একে একে মনে পড়তে লাগল।

আমরা ওয়াঙ্কি সর্দারের কাছে বিদায় নিয়ে পিপ্পলাদ আশ্রমে ফিরে এলাম। আমাদের দলের দণ্ডী সন্ন্যাসীরা তখন নর্মদার তটে বসেছিলেন। বেলা চারটা বাজতে যায়, পশ্চিম আকাশে থেকে সূর্য তখনও বেশ তেজের সঙ্গে রোদ ঢালছেন। নর্মদার দিকে তাকিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম করপাত্রীজীর কথা। তখন আমার মনকে ঢেকে রেখেছেন করপাত্রীজী। তাঁরই পুণ্যস্মৃতি রোমন্থন করতে করতে মনে পড়ল, কোটেশ্বরের মন্দিরে ভীলরা আমাকে এবং মতীন্দ্রকে মন্দিরের থাম্বাতে বেঁধে ফেলে যখন কেটে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল, মৃত্যু সন্নিকট জেনে আমি যখন চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলাম, তদ্দণ্ডে মন্দিরের ভিতরটা এমন প্রবল হুঙ্কার এবং অট্টাট্ট হাসিতে ফেটে পড়েছিল যে, আমি ত কেঁপে উঠে চোখ খুলে ফেলেছিলাম, আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন ঘাতকও এমন কেঁপে উঠেছিল যে তাদের হাত থেকে টাঙ্গিও খসে পড়েছিল। সেই সময় দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সেই সাড়ে ছ' ফুট দীর্ঘদেহী দিগম্বর করপাত্রীজী। তাঁর বিরাট কলেবর তখন ক্রোধে রক্তবর্ণ, হুঙ্কার দিচ্ছিলেন – অ-মুক্ রগড়্যা, অ-মুক্ রগড়্যা ! চক্‌মকি ঠুকলে যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরোয়, তেমনি তাঁর চোখ থেকে অগ্ন্যুদ্গীরণ হচ্ছিল। তিনি দরজার চৌকাঠ পেরিয়েই দড়াম্ শব্দে বসে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে ভীলরাও যে যেখানে যে যে অবস্থায় ছিল, দড়াম দড়াম শব্দে তারাও পড়ে গেছল। ভীলরা পড়েই ছিল, মহাত্মা উঠে দাঁড়িয়ে একটি হাত ঊর্ধ্বে তুলে হুকুম দিবার ভঙ্গীতে গর্জন করে বলেছিলেন– 'অকাতে ভাগ্ বাকেকানা'। ভীলরা তখন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে লুণ্ঠিত সকল দ্রব্য ফেলে রেখে পালিয়ে গেছল সেখান থেকে। তারা পালিয়ে যেতেই মহাত্মা আমার এবং মতীন্দ্রের বন্ধন খুলে দিয়েছিলেন। তিনি সেদিন প্রাণরক্ষা না করলে আজ এই দক্ষিণতটের পিপ্পলাদ আশ্রমে আসা হত না। ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় চোখ দুটো আমার সজল হয়ে উঠল।

মনে পড়ল মহাত্মা করপাত্রীজীই আমাদেরকে শিখিয়েছিলেন – 'নারদজীকে সুমধুর সঙ্গীতকো শুনকর স্বয়ং সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম হী পিঘলকর দ্রবীভূত রূপমেঁ গঙ্গাজী যৈসী বন গয়ী উসী প্রকার স্বয়ং সাক্ষাৎ শ্রংকর ভগবান যব্ তাণ্ডব নৃত্যমেঁ লবলীন হো গয়ে ত উনকে শ্রীঅঙ্গসে স্বেদ (পসীনা) রূপমেঁ ভগবতী নর্মদাজী প্রগট্ হো গয়ী। অতঃ নর্মদাজীমেঁ ঔর শংকর ভগবান মেঁ কোঈ ভী ভেদ নেহী। নর্মদাজীকো উপাসনা হি শংকরজী কী উপাসন হৈ। যিধর নর্মদাজী হ্যায় তো সমঝ লো শংকর ভগবান ভী বিরাজমান হৈ।'

আমি প্রবহমানা নর্মদাকে মহাদেব জ্ঞানে প্রণাম করলাম। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আমিও মা নর্মদাকে স্পর্শ করে ফিরে এলাম সেই হলঘরে শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে আসতে আসতে দেখে এলাম নাঙ্গাজী শিবের ঘরের এককোণে আপনমনে বসে আছেন। আজ শীত বেশী বলে চারটে অগ্নিকুণ্ডের ব্যবস্থা হয়েছে

বাসবানন্দজীর তত্ত্বাবধানে। কম্বল মুড়ি দিয়ে আসনে বসার উদ্যোগ করছি এমন সময় হিরন্ময়ানন্দজী বাসবানন্দজী হরানন্দজী এবং আমাকে অনুরোধ করলেন, চলিয়ে হমারা সাথ মহেশ্বরানন্দজীকা ছাউনীমেঁ। কাল সবেরে হমলোগ যাত্রা করেঙ্গে, উনকা পাশ এক দফে বিদা লে লেনা জরুরী হ্যায়। উহ্ স্বামীজী বহুৎ বড়া বৈদ্য ভী হ্যায়।

হরানন্দজী তাঁর স্বভাব অনুযায়ী বলে বসলেন – ওহো এতক্ষণে বুঝলাম, সাধুর সঙ্গে এত মাখামাখি ভাব আপনার কি করে হল। পেটের রোগী, আসল আঁঠা আপনার হজমী গোলি। হিরন্ময়ানন্দজী তাঁর ব্যঙ্গ গায়ে না মেখে ছাউনীর দিকে পা বাড়ালেন, আমরা তিনজনও তাঁর পিছনে গেলাম। গিয়ে পৌঁছতেই মহেশ্বরানন্দজী উঠে দাঁড়িয়ে নমো নারায়ণায় বলে অভিবাদন জানালেন। হিরন্ময়ানন্দজীর দিকে একটি শিশি এগিয়ে দিয়ে বললেন – 'আপকো লিয়ে গোলি।' হিরন্ময়ানন্দজী সাগ্রহে হজমী গুলির শিশিটা হাতে নিয়ে খাবার নিয়ম জেনে নিলেন। হঠাৎ আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে মহেশ্বরানন্দজী হিরন্ময়ানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করলেন – ইনকা ভেষ দেখকর মালুম হোতা হ্যায়, ইনোনে দণ্ডী সন্ন্যাসী নেহি। হিরন্ময়ানন্দজী উত্তর দিবার আগেই আমি নিজেই উত্তর দিলাম – আমি দণ্ডী অদণ্ডী কোন সন্ন্যাসী দলের অন্তর্ভুক্ত নই। এমন কি সন্ন্যাসীই নই। বাবার আদেশে আমি পরিক্রমায় এসেছি।

– আপ্‌কা গুরু কোন্ হো ?

– আমার বাবাই আমার দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু সব কিছু।

– হর আদমীকা পিতাজী মান্য হ্যায়, পূজ্য হ্যায়। তবভি দীক্ষাকা জরুরৎ হৈ। জনম মরণকা সাথী এক গুরু নির্বাচন করনা হর ইন্‌সান কা ফরজ হ্যায়।

আমি তাঁর কথার জবাব দিলাম এই বলে যে, হর ইন্‌সানের কি ফরজ বা ফরজ নয়, সে সম্বন্ধে আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না, তবে আমার কাছে আমার বাবাই নিত্যকালের সাথী। তাঁর চেয়ে আর কেউ আমার কাছে বড় নন। তিনিই আমার একমাত্র ইষ্ট এবং উপাস্য। এই সম্বন্ধে আমার অনুকূলে অনেক শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত আমি পেয়েছি। যেমন,

পিতরৌ জনয়ন্তীহ পিতরৌ পালয়ন্তি চ।
পিতরৌ ব্রহ্মরূপা হি তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ।।

মাতাপিতাই জন্মদান করেছেন, তাঁরাই পালনকর্তা, সন্তানের কাছে তাঁরাই ব্রহ্মস্বরূপ। অতএব তাঁদেরকেই প্রণাম করি, তাঁদেরই পূজা করি।

দৃষ্ট দেববরং হিত্বা অদৃষ্টঞ্চ নিষেবতে।
পাপাত্মা পরলোকে স তির্যগ্‌যোনিঞ্চ গচ্ছতি ।।

শাস্ত্রের সুস্পষ্ট ঘোষণা, সাক্ষাৎ দেবতাকে পরিত্যাগ করে যে ব্যক্তি অসাক্ষাৎ অদৃশ্য দেবতার সেবা করে সেই পাপাত্মা পরলোকে তির্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়।

পিতা মেরুর্বরিষ্ঠঃ স্যাৎ ধর্মমূর্তি সনাতনঃ।
তস্য পাদোদক স্নানাদ্ গঙ্গা নার্হতি বৈ কলাং ।।

অর্থাৎ পিতা সর্বদেবের আবাসভূত সুমেরু পর্বত হতে শ্রেষ্ঠ, তিনি সাক্ষাৎ সনাতন ধর্মের মূর্তিস্বরূপ, অতএব তাঁর পাদোদক স্নানের যে ফল, তার ষোড়শাংশও গঙ্গা স্নানে হয় না।

তথাবলোকনাৎ তস্য জ্যোতির্লিঙ্গশতৈশ্চ কিং।
দ্বাত্রিংশৎ গণ্ডক শিলাস্পর্শনে যাদৃশং ফলং।
তাদৃশং কোটিগুণিতং মাতাপিত্রোঃ প্রদক্ষিণে ।।

কাশী ওঁকারেশ্বর প্রভৃতি মুক্তিক্ষেত্রাদিতে শতশত জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনে যে ফল হয়, পিতামাতা দর্শনের ফল তার কোটিগুণের অধিক। দ্বাত্রিংশৎ সংখ্যক শালগ্রাম শিলা স্পর্শে যে ফল, পিতামাতাকে প্রদক্ষিণ করলে তার কোটিগুণ ফললাভ হয়।

এই বলে নমো নারায়ণায় জানিয়ে আমি তাঁর ছাউনি থেকে বেরিয়ে এলাম। বিদায় নিয়ে অপর তিনজনও বেরিয়ে এলেন আমার পিছনে পিছনে। ঘরের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলেও প্রচণ্ড ঠাণ্ডার সঙ্গে আমরা যুঝে উঠতে পারছি না। কম্বল মুড়ি দিয়ে হাত পা ঢেকে কিছুক্ষণ সান্ধ্যক্রিয়া করে শুয়ে পড়লাম। হরানন্দজী বললেন, আজ তো তবুও মাথার উপর ছাদ আছে। সোজাসুজি মাথার উপর শিশির পড়ছে না, কাল থেকে শূলপাণির ঝাড়িতে থেকে কোথায় কিভাবে কাটাতে হবে কে জানে! যা করেন মা নর্মদা।

অল্পক্ষণের মধ্যে সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল, তখন রঞ্জন জানালো ৬টা বেজে গেছে। আমরা যে যার বিছানা ঝোলা প্রভৃতি গুছিয়ে বাঁধতে লেগে গেলাম। সবে মাত্র আমাদের সকলের ঝোলা গাঁঠরী বাঁধা শেষ হয়েছে, এমন সময় নাঙ্গা বাবা আমাদের ঘরে এসে ঢুকলেন। সদ্য স্নান করে এসেছেন নর্মদায়, গা থেকে তখনও জল ঝরছে, কাঁধে আছে তাঁর ছোট্ট পুটলিটি, তিনি গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করতে থাকলেন –

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবতু অর্যমা।
শং নো ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ॥

প্রাণের দেবতা মিত্র, দিনের দেবতা তিনিই – কল্যাণ করুন আমাদের সকলের। অপানবৃত্তির দেবতা বরুণ, রাত্রিরও তিনিই দেবতা; তিনি হোন সুখকৃৎ আমাদের। অর্যমা-দেব, চক্ষুঃ আর সূর্যমণ্ডলের অভিমানী দেবতা – আমাদের করুন কল্যাণ। কল্যাণ করুন ইন্দ্র; বাহুর দেবতা তিনি, বলেরও দেবতা তিনি। কল্যাণ করুন বৃহস্পতি; বাক্যের দেবতা তিনি, তিনি বুদ্ধিরও দেবতা। সর্বব্যাপী বিষ্ণু, সুখকৃৎ হউন আমাদের।

নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ব্রহ্মকে প্রণাম। হে বায়ো, ক্রিয়াফল সমুদয় তোমারি অধীন, তোমারে প্রণাম। হে দেব, তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। হে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, তোমাকে আমরা স্বীকার করব, আমরা তোমারি মহিমা বলব। যা ঋত শাস্ত্র সংগত এবং সুবুদ্ধি-নিশ্চিত, শুধু তাই বলব। যা সত্য, শুধু তাই ব্যক্ত করব। রক্ষা কর তুমি দেব; শ্রোতা-বক্তা, শিষ্য-গুরু, সকলকেই রক্ষা কর তুমি। শান্তি হোক, শান্তি হোক, শান্তি হোক।

এই বৈদিক স্বস্তিবচনের মন্ত্র পাঠ করেই তিনি পিপ্পলাদেশ্বর শিব মন্দিরের দিকে পা বাড়ালেন, সেখানে প্রণাম করিয়ে তিনি আমাদের নর্মদার ঘাটে দাঁড়িয়ে যুক্তকরে প্রণাম করতে বললেন মা নর্মদাকে। আমাদের সকলের মাথায় জল ছিটিয়ে দিয়ে আওয়াজ তুললেন – হর নর্মদে হর। তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও 'হর নর্মদে হর' ধ্বনি দিতে দিতে চলতে লাগলাম পূর্বদিকে। আমাদেরকে যাত্রা করতে দেখে মহেশ্বরানন্দজী অচ্যুতানন্দজী বেদানন্দজী প্রভৃতি সন্ন্যাসীরাও ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে ধ্বনি দিতে থাকলেন – হর নর্মদে হর। আমরা ক্রমে ঢুকে যেতে থাকলাম ঘন বনের মধ্যে। প্রস্তরময় রাস্তা সারারাত্রি শিশির পড়ে পিচ্ছিল হয়ে রয়েছে। খালি পায়ে শিশির সিক্ত পিচ্ছিল পথে আমাদের হাঁটতে যে কষ্ট হচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য। প্রত্যেকেই লাঠি ঠুকে ঠুকে হাঁটছি। আমি হরানন্দজীকে বললাম, আজ ১৫ই মাঘ, শনিবার, ১৩৬১ সাল। ইংরাজী ১৯৫৫ সালের ২৯শে জানুয়ারী। আজকের দিনটি আমাদের জীবনে এইজন্য স্মরণীয় যে, দক্ষিণতটের শূলপাণির ঝাড়িতে যেখানে জ্যোতির্লিঙ্গরূপে স্বয়ং শূলপাণি-বিরাজিত, সেই পথে আমরা আজ প্রবেশ করছি। মা নর্মদার দয়ায় ভাগ্য ভাল থাকলে আজ শূলপাণির মন্দিরে পৌঁছে যেতে পারব, কারণ এখান থেকে শূলপাণীশ্বর মহাদেবের মন্দির, শুনেছি মাত্র আট মাইল। বট অশ্বত্থ শাল শিমুল বাবলা এবং কেন্দু কি গাছ নেই এই বনে। হঠাৎ খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করে আওয়াজ হতেই

বাসবানন্দজী চমকে উঠে পড়ে যাচ্ছিলেন। রঞ্জন তাঁর পিছনেই ছিলেন, তিনি তাঁকে জাপটে ধরে কোনমতে আসন্ন পতন থেকে রক্ষা করলেন। তিনি থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠলেন – ডান দিক দিয়ে একটা বড় শিয়ালকে ছুটে যেতে দেখলাম। অন্যান্য কয়েকজন সাধু বনের দিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করে বললেন, কৈ আমরা ত দেখতে পেলাম না! তাঁদের কথা শুনেই বাসবানন্দজীর মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। বললেন – জ্যোতিষশাস্ত্রে আছে শেয়াল 'লাভদা বামভাগে চ', কিন্তু ডান দিকে 'সর্ব অকল্যাণকারিণী'। আমি তাঁকে বললাম, এ সব কথা আপনি বিশ্বাস করেন নাকি ? মা নর্মদাকে স্মরণ করে এগিয়ে চলুন ত; নর্মদাতটে জ্যোতিষশাস্ত্র আর খনার বচন অচল। মা নর্মদা যা করবেন, তাই ঘটবে। পাহাড়ী পথ তো বটেই, তবে ক্রমশঃ মনে হচ্ছে আমরা কোন ছোট পাহাড়ের পথে উঠছি। কিছু পরে পাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে যেন নীচের দিকে নামছি। সমগ্র পাহাড়ী রাস্তাটা বনে ঢাকা। কত যে ঝোপ ঝাড় তার ইয়ত্তা নাই। এই ভাবে প্রায় দেড়ঘণ্টা হাঁটার পর বেলা প্রায় সাড়ে ৮টা নাগাদ গোরাগ্রামে বা গোরাঘাটে এসে পৌছে গেলাম। আকাশে এখন সূর্যদেব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। নর্মদার ধারাও চোখে দেখতে পাচ্ছি। নর্মদার ধারে সারি সারি অনেক বেল ও পিপ্পল গাছ। পিপ্পলাদ আশ্রম থেকে গোরাঘাট মাত্র এক মাইল। কিন্তু এই এক মাইল এগিয়ে আসতে আমাদের দেড় ঘণ্টা সময় লাগল। আরও মিনিট দশেক হাঁটবার পরেই আমাদের চোখে পড়ল কিছুদূরে বহু পাথর ফেলে রাস্তা বানানোর উদ্যোগ চলছে। নানাস্থান হতে পাথর এনে ডাঁই করে স্থানে স্থানে রাখা হয়েছে। সেখানে অনেক পাহাড়ী কুলির ভীড়। নাঙ্গা বাবা বললেন – রাজ্য সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে নাদোদ থেকে নর্মদাতটে এই রাস্তা বানাচ্ছেন। রাস্তা শেষ হলে হয়ত একদিন এই রাস্তা দিয়ে মোটর ট্যাক্সি যাতায়াত করবে, লোকের বসতিও বাড়বে।*

এই সময় সন্ন্যাসীরা নাঙ্গা বাবাকে বললেন – আপনার বৈদিক স্বস্তিবচন পাঠ শুনেই আমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছিলাম, স্নান এবং প্রাতঃকৃত্যাদি হয় নি। এখানে একটা বাঁধানো ঘাট দেখছি, যদি অনুমতি দেন, তাহলে এখানে আমরা স্নানাদি কাজ সেরে নিই। নাঙ্গা বাবা মত দিতেই তাঁরা ঝটপট ঝুলি গাঁঠরী রেখে দিয়েই ছুটলেন কাজ সারতে। আমি তাঁর কাছে থাকলাম। তিনি উত্তরতটের দিকে তাকিয়ে আমাকে বলতে লাগলেন – উত্তরতটের ঐ মহল্লার নাম বাগড়িয়া। ঐখানে আদিত্যেশ্বর এবং কম্বলেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। আদিত্যেশ্বর সূর্যের তপস্যাস্থল। আমি তাঁকে বললাম, উত্তরতট পরিক্রমার সময় আমি আদিত্যেশ্বর মন্দির দেখে এসেছি, তবে কম্বলেশ্বর মন্দিরে যাবার কোন সুযোগ পাই নি। কারণ, ঐ সময় আদিত্যেশ্বর মন্দিরে, একজন অসাধারণ গায়ক এসেছিলেন। তাঁর কণ্ঠসঙ্গীত যে কোন গন্ধর্বকেও হার মানাবে। মীরাবাঈ-এর ভজন তিনি এমন গাইতেন যে স্বয়ং মীরাও হয়ত অত সুন্দর গাইতে পারতেন না। যে কেউ তাঁর গান শুনলে তিনি তন্ময় হয়ে যেতে বাধ্য। আদিত্যেশ্বর মন্দির আরও এই কারণে আমার মনে অক্ষয় থাকবে, ঐখানে দ্বিতীয় বারের জন্য আমরা মহাযোগী দিগম্বর করপাত্রীজীর দর্শন পেয়েছিলাম। আমার কথা শুনেই তিনি কয়েক সেকেণ্ড বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন, তারপর আমার চিবুক ধরে চুমু খেয়ে ধপ্ করে বসে পড়লেন পাথরের উপর। তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। কার্যকারণ কিছু বুঝলাম না। সাধুদের রহস্যময় আচরণ কেই বা বুঝে উঠতে

---

* ১৯৮৪ সালে শ্রীমান আনন্দমোহন এবং দেবাশিষ বসুকে সঙ্গে নিয়ে ওঁকারেশ্বর গিয়েছিলাম। সেখানে শুনে এসেছি যে, গোরাঘাট পর্যন্ত নর্মদাতটের সেই রাস্তা তৈরীর কাজ শেষ হয়ে গেছে। যে সব ভীল কুলিরা কাজ করেছিল, তাদের গভর্ণমেন্ট থেকে ছোট ছোট ঘর করে দিয়ে চাষবাস করার জন্য তাদেরকে দশ বিঘা, পাঁচ বিঘা করে জমিও দেওয়া হয়েছে। তাদের বস্তির নাম দেওয়া হয়েছে 'গোরা কলোনী'।

পেয়েছে ? আমি অপেক্ষা না করে সেই ফাঁকে চলে গেলাম ঘাটে স্নান করতে। কনকনে ঠাণ্ডা জলে কোনমতে একটা ডুব দিয়েই উঠে এলাম তাড়াতাড়ি। ইতিমধ্যে দণ্ডী সন্ন্যাসীরাও স্নানান্তে উঠে এসে বেশভূষা করছেন। স্নান করে উঠে আসতেই শীতের জড়তা কেটে গেল। কৌপীন এঁটে আলখাল্লা গায়ে দিয়ে সবাই একসঙ্গে ধ্বনি দিলাম হর নর্মদে, হর নর্মদে। আমাদের জয়ধ্বনি শুনেই নাঙ্গা বাবা চোখ খুললেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ঈষৎ অগ্নিকোণের পথ ধরে হাঁটতে লাগলেন। পথ বলছি বটে কিন্তু প্রস্তরাকীর্ণ এবং জঙ্গলাকীর্ণ এই পথকে সঠিক অর্থে পথ বলা যায় না। শব্দে প্রকাশ করতে গিয়ে 'হাঁটা' শব্দটা প্রয়োগ করছি বটে, আসলে আমরা হাঁটছি না, হোঁচট খেতে খেতে চলছি, প্রায় সকলেই ঠোক্কর খাচ্ছি বারবার। বেলা সাড়ে ন'টা বাজতে যায়।

নাঙ্গা বাবা বললেন – আপনারা ভাল করে লক্ষ্য করুন ঘাটের কাছের ঐ পাহাড়টাকে। অনেক পুণ্যকামী ব্যক্তি সংস্কার বশে ঐ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে নর্মদায় ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ করে; তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এইভাবে নর্মদার জলে ঝাঁপ দিয়ে মরলে তাদের মুক্তি হবে। এইজন্য এই স্থানটাকে ভৈরব ঝাঁপ বলে। পূর্বে ত প্রতি বৎসরই একজন দুজন করে ঝাঁপ দিত। এখন আর সেরকম ঘটে বলে মনে হয় না। যাক্, এখন আমাদের লক্ষ্য উলুক তীর্থ। এই গোরাঘাট থেকে উলুক তীর্থ চার মাইল। আঁকাবাঁকা ঘন জঙ্গলে ঢাকা এই পথের পাথরগুলো রাস্তার উপর এমনভাবে সেঁটে আছে যে, মনে হচ্ছে কেউ বা কারা যেন লক্ষ লক্ষ উর্ধ্বমুখী শিবলিঙ্গ ঘনভাবে বসিয়ে তার উপর নানা ঝোপঝাড় বসিয়ে রাস্তাকে ঢেকে দিয়েছে। কাঁটা গাছও বহু। কিঞ্চিৎ অসাবধানে পা পড়লেই পায়ে মোচড় লাগছে, কখনও বা কাঁটা বিঁধে আমরা কমবেশী সকলেই 'উহু, আহাঃ' করে আর্তনাদ করছি। আমাদের হাতের লাঠি বারবার ঝুপ্ ঝপ্ শব্দে কেবলই উঠেছে এবং পড়ছে। ঝোপের নিচে যেখানে লতাগুল্ম কম, সোজাসুজি পাথরের উপর লাঠির ঘা লাগলেই ঠকাস্ ঠকাস্ শব্দ উঠছে। ক্রমশঃ জঙ্গল আরও গভীরতর হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। এতক্ষণ সূর্য-কিরণ গাছপালার জঙ্গল ভেদ করে কখনও সোজাভাবে কখনও বা ট্যারছাভাবে এসে পড়ছিল, এবার তাও বন্ধ হল। অর্থাৎ ঘন সন্নিবিষ্ট এই ঘোর জঙ্গলে আর সূর্যকিরণ প্রবেশ করতে পারছে না। আমরা প্রায় গায়ে ঠেসাঠেসি করে হাঁটছি। আধঘণ্টা এইভাবে হাঁটার পর আমরা দুটো পাশাপাশি পাহাড়ের মধ্যস্থল স্থিত একটা চট্টানে এসে পৌছলাম। জঙ্গল এখানটাতে একটু কম। এখানে দ্রুত হাঁটবার সুযোগ প্রকৃতি করে দিলেও আমাদের প্রত্যেকেরই পায়ে কোন-না-কোন ভাবে চোট লেগেছে। দশবারো মিনিট বসে জিরিয়ে নেবার জন্য আমরা কতকগুলো গাছের তলায় বসলাম। কিন্তু ৩/৪ মিনিট গত না হতেই উপর দিকে তাকিয়ে একজন সন্ন্যাসী ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল। তার দেখাদেখি সকলেই উপরে তাকাতেই দেখতে পেলাম, দশ বারো হাত লম্বা একটা অজগর সাপ গাছের ডালে ঝুলে আছে আমাদের ঠিক মাথার উপরে। বিরাট অজগর সাপ, এতগুলো শিকার তার গ্রাসের সামনে দেখে মৃদু মৃদু দোল খেতে খেতে একটা মোটা কেঁদ গাছের গুঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে, তার বিরাট লম্বা লেজের কিয়দংশ কেঁদগাছের গায়ে লাগা একটা শিমুল গাছের উপরে আছে। দেখামাত্রই আমরা এলোপাতাড়ী দৌড়তে গিয়ে জড়াজড়ি করে পড়ে গেলাম। কারও কারও হাতের কমণ্ডলু ছিটকে পড়ল পাথরের উপর। আমাদের চাঞ্চল্য ও দৌড়ের শব্দ পেয়ে সাপটা গাছ থেকে ঝপাস্ শব্দে নিচে পড়েই সেখানে বিরাট ফণা বিস্তার করে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। নাঙ্গা সাধু আমাদের সকলকে পিছনে রেখে সাপের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন। এই শীতের মধ্যেই আমরা সব ঘেমে উঠেছি। মৃত্যুভয়ে আমরা কাতরাচ্ছি, করুণ ও ক্ষীণকণ্ঠে কোনমতে আমাদের গলা থেকে ফিসফিস্ করে বেরোচ্ছে হর নর্মদে, হর নর্মদে! নাঙ্গা বাবা তাঁর ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আমাদেরকে

স্থির হয়ে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করেই নিজের ডান হাতটা সামনের দিকে এগিয়ে একটা আঙুলকে কুণ্ডলাকারে ঘোরাতে লাগলেন। উত্তরতট পরিক্রমার সময় অগস্তি গুহা হতে নেমে আসার পথে মহাত্মা প্রলয়দাসজী জীবজন্তু ও পশুপাখীর গতি মুহূর্তে স্তব্ধ করে দিবার এক বৈদিক মন্ত্র শিখিয়েছিলেন। এত নার্ভাস হয়ে গেছি যে, সে মন্ত্র কিছুতেই আমার মনে পড়ল না। সাপটা গাছ থেকে যেখানে পড়ে ফণা উঁচিয়ে ফোঁস্ ফোঁস করছিল, লক্লক্ করছিল তার জিহ্বা, কুতকুতে কালো চোখ দুটো থেকে যেন আগুন ঝরে পড়ছিল, নাঙ্গা বাবা তাঁর আঙুল ঘুরাতেই তার উদ্যত ফণা নামিয়ে মোচড় খেতে লাগল। তাঁর আঙুল যতই চক্রাকারে ঘুরে যতই পাক খেতে লাগল, ভয়ঙ্কর বিষধরও ততই মোচড় খেতে লাগল, একই স্থানে থেকে কেবলই তালগোল পাকিয়ে আছাড় খেতে লাগল। আমাদের সকলেরই মনে হল, কেউ যেন সাপটার ফণা এবং লেজকে দুহাতে টেনে ধরে পাক দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে সাপটা নির্জীব হয়ে গেল। নাঙ্গা বাবা বললেন – এখন ঘন্টাখানিক সর্পমহারাজের কোন নড়নচড়ন থাকবে না, চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ে থাকবে। এই ফাঁকে চলুন আমরা যতটা দূর এগিয়ে যেতে পারি। ক্ষতবিক্ষত পা নিয়ে আমরা দ্রুত হাঁটবার চেষ্টা করলেও হাঁটতে পারছি না। তবে বুঝতে পারছি, আমরা ক্রমশঃ উপরের দিকে কোন পাহাড়ে উঠছি। হিরন্ময়ানন্দজী হঠাৎ দাঁড়িয়ে নাঙ্গা সাধুকো নমো নারায়ণায় জানিয়ে মাথা নুইয়ে নুইয়ে বলতে লাগলেন – আপ্ সাথ মেঁ না রহেনেসে হমলোগ অজগর কা পেট মেঁ জরুর ঘুষ যাতা থা। আপনে হমলোগকো বাঁচায়। এই বলে বৃদ্ধ এমনভাবে হাত আর মাথা নাড়তে লাগলেন যে মনে হল কমণ্ডলু লাঠি এবং গাঁঠরী প্রভৃতি না থাকলে বুড়ো তাঁর পাদুটো জড়িয়ে ধরে কৃতজ্ঞতাবশে নিশ্চয়ই মাথা ঠুকতেন। অন্যান্য দণ্ডী সন্ন্যাসীরাও গদগদ কণ্ঠে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। তিনি বললেন – মা নর্মদাই আপনাদের রক্ষা করলেন, আমার এতে কোন কেরামতি বা বাহাদুরী নেই, এখন পাহাড়ে উঠছি। সাবধানে চলুন, যত কষ্ট হোক তাড়াতাড়ি এই পাহাড় ও জঙ্গলটা অতিক্রম করতে পারলে বাঁচি। একটা পাকদণ্ডীর মুখে এসে পৌছলাম। উঁচুনীচু অবড়া-খবড়া পাথরের উপর দিয়ে কোনমতে মনের জোরে হেঁটে পাকদণ্ডীটা পেরিয়ে গেলাম। চতুর্দিকেই ঘন জঙ্গল, নাম-না-জানা গাছের ভীড়, সব জড়াজড়ি করে রয়েছে, মাথার উপর জঙ্গলের চন্দ্রাতপ, কোথাও কোথাও সামান্য পাতার ফাঁক-ফোঁকর ভেদ করে ছিটে ফোঁটা সূর্যরশ্মি পড়েছে। এই ঘন জঙ্গলে সেই সূর্যকিরণটুকুই আমাদেরকে পথ চিনতে সাহায্য করছে। মাঝে মাঝে পাহাড়ী ঝর্ণা তির্‌তির্ করে বয়ে যাচ্ছে পথের উপর দিয়ে। পথের দুপাশে লজ্জাবতীর জঙ্গল। কতকগুলো জায়গায় বনতুলসীর ঝাড়, আকন্দের ডালপালা ছড়িয়ে গেছে চারদিকে, মাঝে মাঝে কেরকেরী লতার ঝাড়। নাঙ্গা বাবা বললেন, প্রকৃতিরাণীর কেমন শিক্ষা দানের পদ্ধতি দেখুন, একই স্থানে কাছাকাছি এইসব আকন্দ কেরকেরী এবং বনতুলসী যে উৎপন্ন হয়েছে, এই দিয়ে এখানকার পাহাড়ী লোকেরা গাদা বন্দুকের বারুদ তৈরী করে। লক্ষ্য করুন, শাল, সেগুন, বাতরা, রশিবন্ধন, তেঁতরা, গামহার, মিটকুনিয়া, শালাই, কুচিলা শিশু প্রভৃতি কত শত হরজাই গাছ জড়াজড়ি করে আছে এই জঙ্গলে। প্রকৃতি কোন গাছই সৃষ্টি করেন নি অকারণে। প্রত্যেকটি গাছেরই উপযোগীতা আছে মানুষের জীবনে।

পাহাড়ের উপরে উঠেই দেখতে পেলাম কিছু দূরে একদল চিতল হরিণ ঘুরে ঘুরে চরছে – নিজেদের মধ্যে গুঁতোগুঁতি করছে। শিঙে খটাখট্ আওয়াজ হচ্ছে। মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে টাঁউ টাঁউ টাঁউ করে। উত্তরতট পরিক্রমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, হরিণদের ডাকে কোন সুরের রেশ থেকে যায় না। পর্দা থেকে অন্য পর্দায় গড়ায় না সুর। এক বা একাধিক পর্দায় চড়া সুর হঠাৎ বেজে উঠেই সে ডাক থেমে যায়। নাঙ্গা সাধু চুপিচুপি বললেন – তখন অজগরের জ্বালায় কেউ জিরিয়ে নিতে পারেন নি, এখন পাথরের উপর

বসে কিছুটা জিরিয়ে নিন সবাই, কিন্তু সাবধান ! বিন্দুমাত্র না কোন শব্দ হয়, বিন্দুমাত্র শব্দ হলেই চিতল হরিণের দল পালিয়ে যাবে। আমরা পাথরের উপর বসলাম। অজগর দেখে ভয়ে যে সব সন্ন্যাসীদের হাত থেকে কমণ্ডলু ছিটকে পড়ে গেছল, তাঁদের কমণ্ডলুতে জল ছিল না। যাঁদের কমণ্ডলুতে জল ছিল, সেই জল নিয়ে সকলেই এক ঢোক করে গলা ভিজিয়ে নিলেন।

মিনিট দশেক পরেই আমরা উঠলাম মানে উঠতে বাধ্য হলাম। বেলা বারটা বেজে গেছে, সেইমাত্র দূর থেকে বাঘের প্রচণ্ড গর্জন ভেসে এল। এই জঙ্গলের মধ্যে বসে থাকতে আর ভাল লাগল না। ছায়াচ্ছন্ন পাকদণ্ডীর মোড় হতে বেরিয়ে আসতেই চিতল হরিণের দল আমাদেরকে দেখতে পেয়ে টাউ টাউ টাউ শব্দ করতে করতে দৌড়ে পালাল। আমাদেরকে দেখতে পেয়ে কিংবা এইমাত্র যে বাঘের ভীষণ হুঙ্কার শোনা গেল সেই প্রচণ্ড গর্জনে তারা বিচলিত হয়ে পালাল, তা সঠিকভাবে বলা আমাদের পক্ষে অসাধ্য।

যাই হোক, আমরা পাহাড়ের ডান দিকে আর একটা পাকদণ্ডী দেখে সেইপথে নামতে লাগলাম নীচের দিকে। কিছুটা এগিয়ে যাবার পর আমরা দেখতে পেলাম পাহাড়ের নীচে একটা গভীর বাঁশের জঙ্গল। একদল হাতী সেই জঙ্গলের কচি কচি বাঁশ ভেঙ্গে খাচ্ছিল। প্রকাণ্ড সব দাঁতাল হাতী। বিরাট তাদের কলেবর। দলে প্রায় ২০/২৫টা তো হবেই। তাদেরকে দেখে আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম, আর এগোবো কি এগোবো না ভাবছি, নাঙ্গা সাধু দাঁড়িয়ে যেতে বললেন। সহসা কোথা থেকে কি হল জানিনা, হাতীগুলো হঠাৎ ক্ষেপে উঠে তাদের প্রকাণ্ড বিস্ফারিত দন্তরাজি এবং উৎক্ষিপ্ত গোলাকার শুঁড় দিয়ে বড় বড় গাছপালা ভেঙ্গে লণ্ডভণ্ড করতে করতে দৌড়ে আসতে লাগল উপর দিকে। হাতীকে জঙ্গলের মধ্যে চার পা তুলে যাঁরা দৌড়াতে না দেখেছেন, তাঁরা অনুমানও করতে পারবেন না, হাতী কত জোরে দৌড়াতে পারে। হাতীর দৌড়ের ভঙ্গীটা নিরাপদ কোন সংরক্ষিত স্থানে দাঁড়িয়ে দেখলে হাস্যকর মনে হবে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই ভয়ঙ্কর জঙ্গলের মধ্যে আমাদের মত ক্লান্ত শ্রান্ত অসহায় পথিকের কাছে তাদের একটানা প্যাঁ প্যাঁ প্রলয়ঙ্কর বৃংহন ধ্বনি কতটা যে ভীতিপ্রদ তা ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। আমরা ভয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম আর প্রতি মুহূর্তে আশা করছিলাম, ক্রোধোন্মত্ত হাতীর দল হয় তাদের গতিপথ বদলাবে, বিস্তীর্ণ পাহাড়ের অন্য কোন দিকে তারা হয়ত চলে যাবে। কিন্তু নাঃ ! তারা আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেই পথেই যে ছুটে আসছে ! ভয়ে সকলের মুখ শুকিয়ে গেছে, বাসবানন্দজী কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, বাঁশবনে হয়ত কোন অজগর বা অন্য কোন বিষধর নিশ্চয়ই দংশন করেছে কোন হাতীকে। নাঙ্গা সাধুর নির্দেশে চলার পথ থেকে বেশ কতকটা নীচে নেমে প্রত্যেকেই একেকটা বড় বড় গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম কিন্তু তখনই আবার নূতন বিপত্তি দেখা দিল। ভয়ে গোঁ গোঁ করতে করতে হিরন্ময়ানন্দজী, বাসবানন্দজী এবং আমাদের রঞ্জনবাবু পড়ে গেল গাছের তলায় পাথরের উপরেই। নাঙ্গা সাধু বললেন – ওঁরা মূর্চ্ছা গেছেন। আর মাত্র ২০০ গজ দূরেই ক্রুদ্ধ হাতীর দল। তুমি মা নর্মদাকে স্মরণ করে মন্ত্রপাঠ করতে করতে হাতাজোড়ি হাতীর দলকে দেখাতে থাক। Make haste, Make haste, আমি তৎক্ষণাৎ মরিয়া হয়ে আলখাল্লার পকেট হতে মহাত্মা কৃপানাথ প্রদত্ত করপুটিয়াটি বের করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলাম ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কাঁপা কাঁপা গলায়। আমি চোখ বন্ধ করে ফেলেছি, প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছি হাতীর পদতলে দলিত পিষ্ট হয়ে একতাল মাংসপিণ্ডে পরিণত হলুম বলে। দুতিন মিনিট আমার জ্ঞান ছিল না, চকিতের জন্য দেখলাম, মহাত্মা কৃপানাথ আমার যেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ! চোখ খুলে দেখি, কী আশ্চর্য ! সেই মত্ত হস্তীর দল স্তম্ভিত ও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে দু পা ঊর্ধ্বে তুলে ! পর মুহূর্তেই তারা পিছন ফিরে দৌড়

লাগালো। গাছপালা দলিত মথিত করে পালাচ্ছে তারা উলটো দিকে। এতক্ষণে আমার সম্বিত ফিরে এল যেন। আমি হাতাজোড়িটা সাদরে কপালে ছুঁইয়ে পকেটস্থ করলাম। মনে মনে প্রণাম জানালাম মহাত্মা কৃপানাথের উদ্দেশ্যে। মনে পড়ল, ইতিহাসে পড়েছিলাম দুর্ধর্ষ আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন মহাবীর পুরুরাজের চল্লিশ হাজার রণহস্তীর আক্রমণে সশস্ত্র রণনিপুণ গ্রীক সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। স্বয়ং আলেকজাণ্ডার বার বার উৎসাহ দিয়েও তাদেরকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারেন নি। মদমত্ত মাতঙ্গের আক্রমণমুখী দৃপ্তভঙ্গী যে কী ভীষণ হয়, তা আজ প্রত্যক্ষ করলাম। ভাগ্যিস্ আলেকজাণ্ডার এইরকম হাতাজোড়ি বা করপুটিয়া কোন ভারতীয় যোগীর কাছ হতে করায়ত্ত করতে পারেন নি!

গাছের আড়াল থেকে একে একে সব সাধুরা বেরিয়ে এসে পথের মধ্যস্থলে আমার চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালেন। নাঙ্গা সাধু কিন্তু তখনই সকলের আগ্রহ সত্ত্বেও যাত্রা করলেন না। তিনি সূচ্যগ্র দৃষ্টিতে বার বার নীচের দিকে তাকিয়ে বললেন – দূরে একটা তেঁতরা গাছের তলায় একটা মাদী হাতী দাঁড়িয়ে আছে, তার শরীর টলছে, বলে মনে হচ্ছে। বোধহয় কোনও মারাত্মক আঘাত বা কোন রোগের আক্রমণে, সর্পদংশনেও হতে পারে, ঐ মাদী হাতীটার সর্বাঙ্গ বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই আমরা দেখলাম, হাতীটা আস্তে আস্তে বসে পড়ল। নাঙ্গা বাবা বললেন – এখনই ওর মরদ হাতী নিশ্চয়ই ওর সন্ধানে ওখানে ফিরে আসবে। এখন তার সম্মুখীন হওয়া আমাদর উচিত হবে না। কিছুক্ষণ এইখানেই আমাদের অপেক্ষা করা উচিত। তাঁর কথাই সত্য হল। মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে থাকার পরেই দেখতে পেলাম মদ্দা দাঁতাল হাতীটা তার কাছে ফিরে এসেছে। মাদী হাতীটা বারবার মাটি ছেড়ে উঠবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু পারল না, কিছুতেই পারল না। কিছুক্ষণ তার শরীরের মাংস পেশীগুলো নড়ল, পাগুলোও একটু নড়ল তারপর সব স্থির হয়ে গেল। দাঁতাল হাতীটা যেন বিশ্বাস করতে পারল না যে, তার সঙ্গিনী মরে গেছে। সে মাদী হাতীটার চারপাশে ঘুরতে লাগল বারবার। তার প্রকাণ্ড দাঁত দিয়ে ওকে উঠাবার, দাঁড় করাবার চেষ্টা করতে লাগল বারবার। তাতেও যখন সঙ্গিনী কথা বলল না, নড়ল না চড়ল না, তখন সে এক আশ্চর্য কাণ্ড করল। তার প্রকাণ্ড লিঙ্গ উদ্যত করে সে পিছনে থেকে হস্তিনীর যোনি স্পর্শ করল, অনেক চেষ্টা করল সঙ্গিনীর ঘুম ভাঙাতে। বারবার চেষ্টা করতে থাকল। এতেও যখন হস্তিনী সাড়া দিল না, তখন হঠাৎ যেন দাঁতাল হাতীটা ক্ষেপে গেল। ক্ষেপে গিয়ে দূর থেকে এক দৌড়ে এসে দুটো দাঁতই ঢুকিয়ে দিল শায়িতা হস্তিনীর পেটে। নদ্ নদ্ শব্দ করে ভস্-স্-স্ আওয়াজে দুর্গন্ধ সমেত হাতীর কয়েক মন নাড়ীভুঁড়ি সব পাথরের উপর নেমে এল। মদ্দা দাঁতাল হাতীর অত বড় বড় দাঁতে পুরো পেটটাই ফেঁসে গেল মাদী হাতীর।

হাতী কেন এমন করল তার সেই জান্তব প্রবৃত্তির কারণ আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না, তখনও বুঝতে পারিনি, এখনও সে রহস্য অবোধ্যই রয়ে গেছে। কিন্তু আমরা সবাই দেখেছিলাম, সে ঐ রকমই করেছিল।

ঘটনা পরম্পরায় অভাবনীয়তায় ও বীভৎসতায় আমাদের সকলেরই বোধবুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছল কিছুক্ষণের মত। আমরা আরও ৫/৭ মিনিট পরে নাঙ্গা বাবার নির্দেশে যাত্রা সুরু করলাম। আমাদেরকে ঐ পথ দিয়েই যেতে হবে। নীরবে হেঁটে মৃতা হস্তিনীর কাছাকাছি হতেই দেখতে পেলাম পাহাড়ী বাজ এবং শকুনরাও নেমে আসছে আকাশ থেকে। ওদের চোখে কিছুই অদেখা থাকে না। গভীর জঙ্গলের মধ্যে যেখানেই এই ধরণের ঘটনা ঘটুক না, উপরের পাতার চন্দ্রাতপে যদি কিছুমাত্র ফাঁক থাকে তাহলে ওদের নজর এড়ায় না। হস্তিনীর মৃতদেহ অতিক্রম করে গিয়ে নাঙ্গা সাধু বললেন – বাঁশবনে ঢুকে হাতীর

দল যখন বাঁশের ডগা ভেঙ্গে খাচ্ছিল তখনই মহা বিষধর কোন সাপ-হস্তিনীকে দংশন করেছিল, তার রক্তে নীলাভ রং দেখে আমি নিশ্চত হয়েছি, মাদী হাতীটা সর্পদষ্ট হয়েই মারা গেল।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা এতক্ষণে নর্মদার তটে নেমে এলাম। ঘোর জঙ্গল ও পাহাড়ের মধ্যে নানা বিপত্তির মধ্য দিয়ে দুর্গম পথে হেঁটে এসে এতক্ষণে নর্মদার দর্শন পেয়ে আমরা শান্তি পেলাম। এখানেও ঘোর জঙ্গল, পাহাড় থেকে গাছপালা ভীড় করে চলে এসেছে নর্মদার ধার পর্যন্ত। নাঙ্গা বাবা বললেন — চার মাইল মাত্র পথ আসতে আমাদের প্রায় চার ঘণ্টা সময় লেগে গেল। আমরা উলুক তীর্থে এসে গেছি। এখানে কোন শিবমন্দির নাই। শৈলেন্দ্রনারায়ণজী পুরাণের গল্পে শ্রদ্ধাশীল না হলেও পুরাবৃত্ত জানতে হলে পুরাণের সাহায্য আমাদেরকে নিতেই হবে। অজগর সাপ দেখে ভয়ে হুমড়ী খেয়ে পড়ায় অনেকেরই কমণ্ডলু ত ফাঁকা, আপনারা এখানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করে কমণ্ডলু জলে ভরে নিন, আমি ততক্ষণে এই উলুক তীর্থের কিছু বিবরণ বলি। উলুক শব্দের অর্থ রাত্রিচর পাখী, আটপৌরে কথায় যাকে আমরা কালপেঁচা বলি। বায়ুপুরাণের রেবাখণ্ডে ৭৭-তম অধ্যায়ে [illegible], অতি প্রাচীনকালে এখানে এক গাছের কোটরে একটা কালপেঁচা বাস করত। কাক এবং কালপেঁচা পরস্পরের শত্রু। কাকরা কালপেঁচাকে জব্দ করাবার জন্য ঠোঁটে করে সরু সরু শুকনো ডাল এবং পাতা তার কোটরে নিক্ষেপ করে তার বাইরে যাবার পথ রুদ্ধ করতে চেয়েছিল যাতে কালপেঁচা তাদেরকে আর ঠোকরাতে না পারে। হঠাৎ একদিন অরণ্যে দাবানল জ্বলে উঠায় কালপেঁচা কোটর থেকে কাকদের ডালপাতার আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে দেরী হয়ে যায়। আগুনে তার পাখা এবং মুখচোখ ঝলসে যায়। সে ছটপট করতে করতে নর্মদাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার মৃত্যু হয়। পরমপাবনী নর্মদার জলে তার দেহান্ত ঘটায় সেই পুণ্যবলে সে পরের জন্মে জাতিস্মর হয়ে কাশীর রাজবংশে জন্মলাভ করে। জাতিস্মরতার কারণে পূর্বজন্মের কথা তার স্মৃতিপথে জাগে। সে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে ঘোর তপস্যা করে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেই থেকে এই স্থান সিদ্ধিপ্রদ। তাঁর কথা শুনতে শুনতেই আমাদের ছোলার ছাতু ভিজিয়ে খাওয়া হয়ে গেছল। শক্রতীর্থে কবিরাজ মশাই এই ছাতু ভিক্ষা হিসাবে দিয়েছিলেন। আমরা মা নর্মদাকে প্রণাম করে হাঁটতে সুরু করলাম জঙ্গলের পথে, বেলা তখন দুটো বেজে গেছে। ঘোর জঙ্গল হলেও এই পথ অপেক্ষাকৃত কম প্রস্তরময় বলে আমাদের চলার গতি অপেক্ষাকৃত দ্রুততর হল। নাঙ্গা বাবা বললেন — পিপ্পলাদ আশ্রমে নর্মদাতীরে দাঁড়িয়ে উত্তরতটের গমোনা গ্রামের পরিচয় দিয়েছিলাম। গমোনার পর বাগড়িয়া মহল্লা। বাগড়িয়া খুব বড় মহল্লা, এই পর্যন্ত বাগড়িয়া বিস্তৃত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাগড়িয়া গ্রামের মধ্যমণি বিখ্যাত আদিত্যেশ্বর মন্দির এবং সেই গ্রামের সম্পন্ন বসতি আমাদের এই উলুক তীর্থের বিপরীত দিকে উত্তরতটেই বিরাজিত। এখানে ঘোর জঙ্গলে সব ঢেকে আছে বলে নতুবা আদিত্যেশ্বর মন্দিরের চূড়া এখান থেকে দেখানো যেত। আমরা হাঁটতে হাঁটতেই আদিত্যেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম জানালাম। আদিত্যেশ্বর মন্দির থেকে বন্ধ দরজা খুলে অবধূত-চূড়ামণি করপাত্রীজী বেরিয়ে এসে আমাদেরকে আচম্বিতে দর্শন দিয়েছিলেন, সে কথাও আমার স্মৃতিতে জেগে উঠল।

আমরা নিবিড় বনপথে হাঁটছি। ক্রমে পাথরের আধিক্য পথের উপর এত বেশী মনে হল যে, ভাবলাম এত পাথরের চাঙড় পেরিয়ে আমরা আদৌ এগুতে পারব কিনা। যাই হোক, লাঠি ঠুকে ঠুকে বেশ কতকটা হাঁটার পর আমাদের সামনে পড়ল প্রায় ২০০০ ফুট উঁচু এক পাহাড়। চারদিকে শাল সেগুন এবং তেঁতরা গাছের এত ভীড় যে পাহাড়ে উঠতে গেলে পড়ে গিয়ে আমাদের কারও হাত পা ভাঙবে, এই ভয়ে আমাদের চলার গতি স্তিমিত হয়ে গেল। নাঙ্গা সাধু বললেন — উপায় নাই, এই পাহাড় আমাদেরকে ডিঙিয়ে যেতে হবে।

একদল বুনো শুয়োর পাহাড় থেকে দ্রুতগতিতে নেমে এসে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে আমাদের পাশ দিয়েই চলে গেল। পথ নানারকম কাঁটাগাছে ভরা। বড় বড় পাথরের মাঝখানেই এই কাঁটাগাছ। একটু দূরে দূরে এত বড় শালগাছ দেখলাম যে অতবড় শালগাছ সাধারণতঃ আমাদের চোখে খুব কমই পড়েছে। চালতা গাছের মত একপ্রকার গাছের ভীড় দেখলাম। নাঙ্গা সাধুকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন ওগুলো বাংলাদেশের চালতা গাছের মত দেখতে হলেও চালতা গাছ নয়, পাহাড়ী ঐ গাছের নাম তন্দণ্ডে তাঁর মনে আসছে না। নাঙ্গা সাধু আমাদেরকে বললেন – কান খাড়া রাখুন জলের কোন প্রচণ্ড শব্দ কানে এলে আমাকে জানাবেন। কিন্তু কেউ আমরা কান খাড়া করেও কোন জলপতনের শব্দ শুনতে পেলাম না। পাহাড়ের উপরে প্রায় উঠে এসেছি এমন সময় পথের উপর একদল সম্বরকে মারামারি গুতোগুতি করতে দেখে আমরা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম, একটা বুড়ো সম্বরকে একটা ছোকরা সম্বর শিং দিয়ে গুতিয়ে ধাক্কা দিয়ে মেরে ক্ষতবিক্ষত করে তাড়িয়ে নিয়ে গেল কতকটা। কতগুলো মাদী সম্বর চুপ করে দাঁড়িয়ে নীরবে সবই দেখল। বুড়ো সম্বরটাকে তাড়িয়ে দিয়ে ফিরে আসতেই তারা পালা করে ছোকরা সম্বরটার উরু প্রেমভরে চাটতে লাগল। আমাদের তাড়া আছে, তাই নাগা বাবার ইঙ্গিতে আমরা সকলে মিলে পাথর ছুঁড়তে লাগলাম। সম্বরগুলো পালিয়ে গেল পাহাড়ের অন্য দিক দিয়ে। হরানন্দজী রসিকলোক, তিনি মন্তব্য করলেন – মাদী সম্বরাও দেখুন যে কোন কুলটা নারীর মতই। ওদের বিবেক নাই। ওরা যে কোন মূল্যেই ওদের সুখ ছিনিয়ে নিতে জানে পৃথিবীর কাছ থেকে। কিন্তু আমরা তখন এতই ক্লান্ত যে বুড়োর রঙ্গরস উপভোগ করার মত মন ছিল না। অপরাহ্ণ এগিয়ে আসছে। গাছের তলাগুলো ক্রমশঃ ছায়াছন্ন হচ্ছে। মনের মধ্যে সদাই ভয় জাগছে, যে কোন সময় কোন হিংস্র জন্তু আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

আমরা সাধ্যমত দ্রুত হাঁটতে চেষ্টা করছি। নাগা বাবার বয়স হয়েছে, তাঁর উপর তিনি ভালভাবে চোখেও দেখতে পান না, তবুও পাথরের পর পাথর ডিঙিয়ে বেশ জোরেই হাঁটছেন তিনি, হিরন্ময়ানন্দের মত বুড়ো সাধুও তাঁর সঙ্গে সমান তাল রেখে হাঁটছেন কিন্তু আর সবাই গাছের শিকড়ে হোঁচট খেতে খেতে হাঁটছি। পাথরের গায়ে অন্য পাথর এমন ভাবে সমাবিষ্ট এবং তাদের মাথাগুলো ভিজে ভিজে বলে পিচ্ছিল হয়ে আছে। আমাদের পা পড়া মাত্রই তা পিছলে যাচ্ছে। হরানন্দজী আমাকে বললেন যে ব্যাপার কি বলুনতো ভাই, এই মোক্ষতীর্থ বা মোক্ষড়ী গঙ্গার কি কোন বিশেষ মাহাত্ম্য বা বৈশিষ্ট্য আছে যে এখানে বুড়োরা পৌছলেই তাদের যৌবন আবার ফিরে আসে? দুই বুড়ো কতদূর এগিয়ে গিয়ে আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে আছে দেখুন! আমরা তাঁদের কাছে পৌছানো মাত্রই জলপতনের ঘোর গর্জন শুনতে পেলাম। নাঙ্গা সাধু বললেন – 'এই সেই জলপ্রপাতের শব্দ। নীচে নেমে গিয়েই সেই জলপ্রপাতের ধারা বরফ হয়ে যাচ্ছে। এই পাহাড়ের মাথা থেকেই মোক্ষ গঙ্গার উদ্ভব হয়েছে। আর কিছুটা এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবেন এই মোক্ষ গঙ্গার ধারা নর্মদার সঙ্গে মিলিতা হয়েছে। বায়ুপুরাণের অন্তর্গত রেবাখণ্ডের ৭৬-তম অধ্যায়ে এই মোক্ষড়ী গঙ্গার বিশেষ মহিমার কথা বর্ণিত আছে।' আমরা আর কিছুটা এগিয়ে যেতেই জলপ্রপাতটা চোখে পড়ল। জব্বলপুরের ধুঁয়াধারা কিংবা অমরকন্টক হতে চার মাইল দূরস্থ কপিলধারার মত এখানেও প্রায় ৫০ ফুট নীচে এই জলধারা অতি দ্রুতবেগে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ায় অজস্র শীকর কণা একটা ধোঁয়ার সৃষ্টি করেছে। নর্মদাতে পড়ে-অজস্র সাদা বাষ্প কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। আমাদের গায়ে মাথায় ছিটকে পড়ছে জলকণা। এই জলপ্রপাতের এমনই গর্জন যে কানে তালা লাগার যোগাড়! আমরা কোনমতে যুক্তকরে মোক্ষ গঙ্গার উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে দ্রুত সেস্থান ছেড়ে যেতে পারলে বাঁচি। কিন্তু হাঁটবার চেষ্টা

করলেও বেশী দূর হাঁটতে পারলাম না। কিছুটা এগিয়েই দেখতে পেলাম, একদল বুনো হাতী পথের উপর জড় হয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আবার হাতী! আবার কোন হাতীকে সাপে কামড়েছে নাকি? কিন্তু হাতীদের মধ্যে তো কোন চাঞ্চল্য আতঙ্ক বা যুদ্ধোন্মুখী অবস্থা দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন তারা গোলাকারে দাঁড়িয়ে একটা মাদী হাতীকে পাহারা দিচ্ছে। ভাল করে লক্ষ্য করতেই সকলেরই চোখে পড়ল হস্তীবেষ্টিতা সেই মাদী হাতীটা পাথরের উপরে বসে যেন কোঁথ পাড়ছে, আমরা দূর থেকে সবিস্ময়ে দেখলাম, মাদী হাতীর যোনি-স্থান হতে বিরাট একটা পলিথিনের থলের মত গোলাকার থলে ভূমিষ্ঠ হল। হাতী-মা তার বিশাল কান দিয়ে অর্থাৎ কানের কুলো দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে সেই গোলাকৃতি বলে বাতাস দিতে লাগল। একসময় সেই গোলাকৃতি জলীয় বলটা ভুস্-স্-স্ শব্দ করে প্রবল শব্দে ফেটে গেল। জল-জল-পিছল-পিছল অনেক পদার্থ গড়িয়ে পড়ল সেখান থেকে। তারপর তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এল হাতীর গাব্দা-গুব্দো বাচ্চাটা! কিছুক্ষণ চুপচাপ বাচ্চাটা পড়ে থাকল স্থির হয়ে। মিনিট দশেক পরেই সহসা উঠে পড়েই বাচ্চাটা হাতী-মার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তনে শুঁড়ে লাগিয়ে দুধ টানতে লাগল পরম আনন্দে। হাতীর গাবলু-গুবলু কালো কুচকুচে বাচ্চাটার সর্বাঙ্গ তখন চকচক করছে। আরও কিছুক্ষণ পরে সে তার মায়ের সঙ্গে এবং অন্যান্য হাতীর সঙ্গে টল্‌তে-টল্‌তে, পড়তে-পড়তে, উঠতে-উঠতে হাঁটতে সুরু করল। আমরা পথ থেকে সরে গিয়ে বড় বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলাম ঘাপটি মেরে। আমরা যে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, তারা সেই পথ দিয়েই হেঁটে এল। তাদের কালো কুতকুতে চোখ দিয়ে নিশ্চয়ই আমাদেরকে দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু তারা আমাদের দিকে তেড়ে এল না। তাদের হাঁটাচলার মধ্যে কোন আক্রমণমুখী যুদ্ধবাজের ভঙ্গী নাই, বরং বলা যায় তাদের attitude আজ কতটা আত্মরক্ষামূলক। হয়ত বাচ্চাটা সঙ্গে আছে বলে।

যাক্ এতক্ষণে আমরা নিষ্কৃতি পেলাম। ধড়ে প্রাণ এল যেন! আমরা প্রাণপণে হাঁটতে লাগলাম। বেলা ৪টা বেজে গেছে। অপরাহ্নের হলদে রোদ ক্রমেই লাল হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যা নেমে আসবে। সন্ধ্যা হলেই হিংস্র বন্য জন্তুর এই বিচরণভূমিতে 'তেনারা' বেরিয়ে আসবেন শিকারের সন্ধানে। আমরা প্রায় প্রত্যেকেই অস্ফুট শব্দে রেবা রেবা জপ করে চলেছি। কতকটা এগিয়ে উপরের পথটা ছেড়ে মালভূমির নীচের দিকে নামতে লাগলাম উপত্যকার সমতলে। এক জায়গায় দেখলাম অনেক বড় বড় চৌরস পাথরের বড় বড় boulder ঝর্ণার মুখে পড়ে আছে, সেগুলোকে ঘিরে রয়েছে বড় বড় ফণিমনসার গাছ। কাঁটায় এবং কন্টকময় বনপথে উলুক তীর্থ হতে এই চার মাইল আসতে প্রত্যেকেরই পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে রি রি করে জ্বলছে। কিন্তু পাহাড় থেকে নেমে আসার পর হঠাৎ যে অপূর্ব সৌন্দর্যভরা দৃশ্য ক্লান্ত চক্ষুর সামনে খুলে গেল, তার বর্ণনা দেওয়া বড় কঠিন। সেই ছায়া নিবিড় অপরাহ্নে জনমানবের চিহ্নহীন ঘোর বনানীর পথে হেঁটে না এলে প্রকৃতির গোপন অন্তরালে লুকানো গম্ভীরদর্শন জলপ্রপাতের দর্শন মিলতো কি করে? বড় বড় আম, গাচকেন্দু ফার্ণ, ঐ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বড় বড় ফনিমনসা লম্বা লম্বা তৃণ লুদাম করণ্ড প্রভৃতি আরও অসংখ্য বন্য গাছে ঘেরা ঐ জলপ্রপাতের জলপতন ধ্বনি দ্বারা বিখণ্ডিত সেই গম্ভীর অরণ্যের নিঃশব্দতা সুদূর অতীতের কথা, বিশ্বদেবের সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কথাই কানে কানে বলে চলেছে, সমাহিত মনে তা শুনতে হয়। আমার মনে হয়েছে, অনন্তের মৌন ইতিহাস ওখানে আঁকা আছে পাথরের স্তরে স্তরে। বৈদিক আর্য ঋষিদের আমলেও ঐ জলপ্রপাতের শব্দ এবং তার জলধারা ঠিক এমনি ভাবেই ঝরে পড়ত এই ঘোর বনের মধ্যে, লোকচক্ষুর অন্তরালে এখানে লক্ষ লক্ষ পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, লক্ষ লক্ষ অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার নেমে এসেছে এই পাহাড়ী পথের বুকে। আমাদের মত পরিক্রমাবাসী এবং বন্য

পাহাড়ী লোকরা ছাড়া অন্য কারও চোখে পড়েনি, এই বন্য সৌন্দর্যভূমি। আমাদের মত উগ্র ধর্মোন্মাদ কিংবা যারা এই প্রতিকূল পরিবেশে বাধ্য হয়ে বাস করছে সেই পাহাড়ী বাসিন্দারা ছাড়া কে আসবে মরতে এই পথহীন জঙ্গলে, জানেই বা কে, খোঁজই বা করবে কে ? এই জঙ্গল পথে পথ হারিয়ে যাবার খুবই সম্ভাবনা, কোন সময়েই দলবদ্ধ না হয়ে বা উপযুক্ত পথ প্রদর্শক না নিয়ে কখনই এই ভয়ঙ্কর পথে কারও আসা উচিত নয়। একবার পথ হারিয়ে গেলে যে কোন মুহূর্তে সর্পদংশনে, বন্য হস্তীর পদতলে কিংবা বাঘের পেটে প্রাণ হারানোর যেখানে সমূহ সম্ভাবনা। অথচ কী অপার সৌন্দর্যভূমি লুকিয়ে রয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে।

আমি কতকটা আত্মমগ্নই হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলাম নাঙ্গা মহাত্মার কণ্ঠস্বরে। তিনি বলে উঠলেন – 'আর উপায় নাই এখানেই আজ রাত কাটাতে হবে। অনেক পোড়া কাঠ পড়ে আছে এখানে। মনে হচ্ছে আমাদের আগে নিশ্চয়ই একদল পরিক্রমাবাসী যাওয়া বা আসার পথে এখানে রাত কাটিয়ে গেছেন। অনেক শুকনো কাঠ পড়ে আছে চারদিকে, এখন সকলে হাত লাগিয়ে এখানে সব কাঠ জড়ো করে একটা গোলাকার মণ্ডলী সাজিয়ে ফেলি এস।' আমরা সকলে এক জায়গায় পাথরের উপর ঝোলা গাঁঠরী রেখে তার চারদিকে কাঠের ছোট ছোট স্তূপ সাজিয়ে ফেললাম। নর্মদার তটের উপরেই এই স্থান, চারদিকে কয়েকটা শাল, শিমুলগাছ ও বেলগাছ। যে সব স্থান পেরিয়ে এলাম, তাদের তুলনায় এই স্থানকে কতকটা ফাঁকা বলেই বলতে হবে। সূর্যাস্ত হতে আর দেরী নাই। নাঙ্গা বাবা ঘাট খুঁজে জলস্পর্শ করাতে নিয়ে গেলেন আমাদেরকে কিন্তু ঘাট পেলাম না, মরিয়া হয়ে যে কোন স্থানে নামতেও সাহস হল না কারও। তিনিই সাহস করে একস্থানে নেমে জলস্পর্শ করে জল ছিটিয়ে দিলেন আমাদের গায়ে, যাঁদের কমণ্ডলুর জল কম ছিল কিংবা শেষই হয়ে গেছল, সেগুলো ভরে ভরে হাত উঁচু করে এগিয়ে দিলেন আমাদের দিকে। কোন মতে হামাগুড়ি দিয়ে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট গাছপালা আঁকড়ে ধরে কোনমতে উঠে এলেন উপরে। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে, অন্ধকার নেমে এসেছে, যেন হঠাৎ একটা নীরন্ধ্র কালো যবনিকা নেমে এসেছে পৃথিবীর উপর। আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম সেই শিমুল ও বেলগাছের তলায়। কনকনে ঠাণ্ডা, নর্মদা হতে মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপ্‌টা এসে আমাদেরকে কাতর করে তুলছে। তাড়াতাড়ি কাঠে আগুন লাগানো হল। কাঠে ধীরে ধীরে আগুন ধরতে লাগল আমরা আসন কম্বল পেতে মাথায় গেরুয়া কাপড়ের ফেট্টি, মাফলার, গরম টুপী যার যেমন আছে সেইভাবে বেঁধে নিয়ে বসলাম। মুক্ত আকাশের তলায় সম্পূর্ণ নিরাবরণ অবস্থায় আমাদের সঙ্গে বসে রইলেন দিগম্বর সাধু।

আগুন ধীরে ধীরে স্তূপীকৃত কাঠের মধ্যে জাঁকিয়ে উঠে আমাদের সাজানো অনুযায়ী ঘিরে ধরল আমাদেরকে মণ্ডলাকারে। আমাদের শয্যা হতে দূরে আগুন ধিকি ধিকি জ্বলে উঠতেই আমরা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হতে নিস্তার পেলাম। পালা করে ৪জন করে প্রতি প্রহরে জেগে থাকার বন্দোবস্থ করা হল। নাঙ্গা মহাত্মা এবং হিরন্ময়ানন্দজীকে এই প্রহরা দেবার কাজ হতে অব্যাহতি দেওয়া হল। নাঙ্গা সাধু বললেন – আমরা এখন যেখানে বসে আছি, এখান থেকে মাত্র দেড় মাইল হেঁটে গেলেই ভৃগুপর্বতের কাছে শূলপাণীশ্বর মহাদেবের মন্দিরে পৌছে যেতে পারব। সকালে সূর্যোদয় হলেই ভৃগুপর্বতকে এইখান থেকেই দেখা যাবে। সকালে উঠে উত্তরতটের দিকে তাকালেই এখানকার যে মহল্লা আমাদের চোখে পড়বে, তার নাম বড়গাঁও। প্রাচীন যুগে ঐখানে গোপাল নামক এক গয়লার হাতে অনবধানতা বশতঃ একটি গাভীর মৃত্যু হয়। গোপাল তার ঐ গরুটিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। এই ঘটনার পর গোপালের মন অনুশোচনায় ভরে যায়। নিজেকে গো-হত্যার অপরাধে অপরাধী ভেবে সে নিরম্বু উপবাসে থেকে কঠোর তপস্যা করে। আশুতোষ তাকে

দর্শন দিয়ে বিমলেশ্বর তীর্থ স্থাপন করতে আদেশ দেন। তার প্রতিষ্ঠিত বিমলেশ্বর শিবের পূজা এখনও সেখানে হয়। ওঁকলেশ্বর হতে আসার পথে হরিধাম অতিক্রম করে কিছুদূরেই যে আর একটি বিমলেশ্বর তীর্থ আছে, নামের সাদৃশ্য থাকলেও ঐ দুটি পৃথক পৃথক তীর্থ। হরিধাম পেরিয়ে এই দক্ষিণতটেই যে বিমলেশ্বর দেখে এসেছেন তিনি স্বয়ং শিব। আর এখানে আমাদের সামনে যে বিমলেশ্বর তাঁকে শিব জ্ঞানে পূজা করলেও তিনি অনাদি লিঙ্গ নন, একজন শিবের গণ বা ভৈরব মাত্র।

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই খস্ খস্ শব্দ শুনে আমরা চমকে উঠলাম। আগুনের শিখায় দেখতে পেলাম চারটে নেকড়ে বাঘ এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের লক্‌লকে জিহ্বা বের করে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। একত্রে এতগুলো লোভনীয় শিকার চোখের সামনে দেখে তাদের নোলা থেকে জল ঝরছে। তাদের এবং আমাদের মধ্যে অগ্নির লেলিহান শিখা দাউদাউ করে জ্বলছে বলে ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছে না, নতুবা আমাদের কী যে দশা হত, তা মা নর্মদাই জানেন। রাত্রি প্রায় দশটা নাগাদ আমাদের পিছনে যে অগ্নিপ্রাকার তার থেকে কিছুদূরে 'হাঃ হাঃ হাঃ' অট্টহাসি শুনে আমরা চমকে পিছন দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল প্রায় একসঙ্গে ছ'টা হায়না এসে জড় হয়েছে। সামনে নেকড়ে এবং পিছনে হায়নার দল দেখে ভয়ে বাসবানন্দজী এবং আরও দুজন ব্রহ্মচারী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। ঠিক সময়ে হরানন্দজী বাসবানন্দজীকে এবং রঞ্জন আর দুজন ব্রহ্মচারীকে জাপটে ধরে আসনের উপর শুইয়ে না দিলে তাঁদের হাত পা মাথা নির্ঘাৎ টলটলায়মান অবস্থায় আগুনে পড়ে বিপর্যয় ঘটত। এইভাবে নেকড়ে এবং হায়নার দল আমাদেরকে ঘিরে ধরায় আমরা তখনও যারা দাঁড়িয়েছিলাম, ক্রমে আমাদের মনে প্রবল ভয় দেখা দিল। হিরন্ময়ানন্দজী এবং প্রেমানন্দ এই দুজনের শরীর এমনভাবে থর থর করে কাঁপতে লাগল যে তাঁরা হাতের লাঠি ফেলে দিয়ে বসে পড়লেন ধীরে ধীরে। আমি 'বাবা, বাবগো রক্ষা কর' বলে বড় অসহায়ভাবে প্রাণের আর্তি জানাতে লাগলাম। আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। রঞ্জনও মা মা বলে চিৎকার করে কাঁদছেন। যেখানটায় কাঠ কম ছিল, সেদিকের অগ্নিশিখার উচ্চতা ক্রমেই কমে আসছে দেখে পিছনের হায়নারা এবং সামনের নেকড়েরা সেই সব স্থান দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ করতেই দেখলাম গর্জে উঠলেন নাঙ্গা মহাত্মা। তিনি দুহাতে দুটো জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে মাথার উপর ঘোরাতে ঘোরাতে মন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন — ওঁ তৎ সবিতুবরেণ্যেম্ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং ভর্গোদেবস্য ধীমহি। উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ ধিয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ। মৃত্যোর্মুক্ষীয় মা অমৃতাৎ' গম্ভীর কণ্ঠে মন্ত্র পাঠের পর তিনি সামনে পিছনে দুদিকে দুটো কাঠ ছুঁড়ে দিলেন। দুটো কাঠের কোনটাই কোনদিকের বাঘের গায়ে লাগে নি, তবুও পরম বিস্ময়ের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করলাম, নিক্ষিপ্ত দুই কাঠের জ্বলন্ত আগুন দুই দিকে পাথরের উপর পড়া মাত্রই তার হল্‌কা ছুটে চলল তাদেরকে তাড়া করে নিয়ে। বাঘগুলো প্রাণপণে পালিয়ে যাচ্ছে, আমরা স্পষ্টতঃ দেখতে পেলাম দুই টুকরো কাঠের আগুন দশটা হল্‌কায় বিভক্ত হয়ে দশটা বাঘকে তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে আর আগুনের হল্‌কা চোখে পড়ল না। মিলিয়ে গেল অরণ্যের অন্ধকারের মধ্যে।

আমরা স্তম্ভিত হয়ে বসে পড়লাম। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে নাঙ্গা সাধুর কথায় মূর্চ্ছাগ্রস্থদের চোখে মুখে কমণ্ডলুর ঠাণ্ডা জল ছিটাতে লাগলাম। তাঁরা উঠে বসলেন তবে তাঁদের ভয়ার্ত চাউনী দেখে বুঝতে পারছি তাঁরা এখনও বাঘের ভয়ে জড়সড়। নাঙ্গাজী হিরন্ময়ানন্দজীকে বললেন — স্বামীজী বাঘ নে ভাগ গিয়া। চারো তরফ আচ্ছিতরেসে দে লিজিয়ে বাঘ নেহি হ্যায়, আউর কোঈ ডর নেহি। মাতা নর্মদা সবকো হিঁয়াসে হঠা দিয়া। আশুতোষ ঔঘড়দানী ভগবান, ভোলেনাথ য্যায়সা কৃপাময় হ্যায় উন্‌কী পুত্রী মা রেবাভী ঐয়সাই কৃপাময়ী হ্যায়। হিরন্ময়ানন্দজী তাঁকে প্রণাম করে বললেন — ভগবন্

হমনে আপনা আঁখ মে দেখা আপ্ মন্ত্রপূত জ্বলন্ত লকড়ী বিক্ দেনেসে উহ্ জন্তুয়ো নে ভাগ গয়া। হমারা কোঈ কসুর হ্যায় তো ক্ষমা (হিন্দী ভাষায় উচ্চারণ 'ছমা') কীজিয়ে, ক্ষমা কীজিয়ে। তিনি বললেন, এখনও কাঠের মধ্যে আগুন আছে, ঐ আগুনের তাপে এখানকার পরিমণ্ডল এখনও বেশ উত্তপ্ত। খোলা আকাশের নীচে আছি বলে টুপ্‌টুপ্ করে শিশির ঝরলেও ঠাণ্ডায় শীতে এখন আর কষ্ট হবে না। আপনারা সবাই শুয়ে পড়ুন, যতটুকু পারেন, ঘুমিয়ে নিন। এই জঙ্গলে যতক্ষণ থাকব, ততক্ষণ আর কোন হিংস্র জন্তু আমাদের ধারে কাছে আসবে না। তাঁর কথায় বিশ্বাস করে সকলেই আমরা কম্বল মুড়ি দিয়ে গুড়িশুড়ি মেরে শুয়ে পড়লাম। রাত্রি তখন ১টা বাজতে যায়। শোওয়া মাত্রই আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল যখন, তখন সাড়ে ৬টা বাজতে যায়। সমগ্র বনাঞ্চল জুড়ে পাখীর কলরবে তখন কান পাতা দায়! আস্তে আস্তে কুয়াশার ঘোরও কেটে যাচ্ছে বলে মনে হল। সকাল ৭টার সময় চারদিক ফাঁকা হয়ে গেল। আকাশে সূর্যোদয়ের আভাষ ফুটে উঠেছে। আমরা যে যার ঝোলা কম্বল বেঁধে নাগা বাবাকে সামনে রেখে হাঁটতে লাগলাম নর্মদার তট ধরে। মিনিট দশেক হাঁটার পর নর্মদার একটা ঘাট পেলাম। সেখানে স্বচ্ছন্দে উঠা নামা যেতে পারে। নাগা বাবা সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘাটে নেমে ডুব দিয়ে উঠে এলেন, আমাদেরকেও বললেন স্নান করে নিতে – 'গোটা রাত্রি বাঘের জ্বালায় tension-এর মধ্যে কেটেছে, শিশির ভোগ করতে হয়েছে, সকালে স্নান করে নিলে শরীরের গ্লানি ধুয়ে মুছে যাবে।' গতরাত্রিতে তিনি আমাদের জীবনরক্ষা করেছেন, সকলের মন ভরে আছে কৃতজ্ঞতায়। কাজেই তাঁর ইচ্ছা জানা মাত্রই সকলেই স্নান করে নিলাম। নর্মদার জলে তখনও সাদা বাষ্প ভাসছে, জল বেশ গরমই লাগল, স্নান করেই যে যার কৌপীন আলখাল্লা এবং সোয়েটার পরে নিতেই গা গরম হয়ে উঠল, অল্পক্ষণের মধ্যেই মিষ্টি মিষ্টি রোদ এসে গায়ে লাগায় আমরা খুব আরামের মধ্যেই হাঁটতে লাগলাম। জঙ্গল মনে হচ্ছে ক্রমশঃ নিবিড়তর হচ্ছে। গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে উঠেছে হাজার রকমের গাছ। অমরকন্টক যাওয়ার পথে মহাত্মা সুমেরদাসজীর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে এমন ঘোর জঙ্গল পেয়েছিলাম যে, যেখানে সত্যি সত্যি পাখী ডানা মেলে উড়তে পারে না। এই জঙ্গলেও দেখছি সেই রকম অবস্থা। এই বনের মধ্যেও সূর্যরশ্মি ঢুকতে পারছে না। একস্থানে এসে দেখলাম একটা বট অশ্বত্থ এবং কেঁদ গাছের মোটা মোটা তিনটি ডাল এমনভাবে জড়াজড়ি করে বিস্তৃত হয়েছে যে হঠাৎ উপরের দিকে তাকাতেই মনে হল তিনটে অজগর বা কেউটে সাপ একত্রে আমাদেরকে ছোবল মারার জন্য যেন উদ্যত হয়েছে। সাপের পেটের দিকে যেমন সাদা কালো মিশিয়ে ডোরা টানা দাগ থাকে, সেই রকম দাগ দেখে আমরা প্রথমে ঘাবড়েই গেছলাম। কিন্তু নাগা সাধু হাসতে হাসতে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন ঐগুলো সাপ নয়! তিনটে গাছের তিন রঙের ডাল ঐ ভঙ্গীতে জড়াজড়ি করে রয়েছে! আমরা দ্বিতীয়বার ভাল করে উপরের দিকে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। লজ্জাও পেলাম মনে মনে।

নাগা বাবা বললেন – আর আধঘন্টা বা পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটলেই আমরা শূলপাণীশ্বর মন্দিরে পৌঁছে যাবো। তার আগে এই স্থানের মাহাত্ম্য এবং এর উৎপত্তি রহস্য আমার কাছে শুনে নিন হাঁটতে হাঁটতেই। আপনারা এতদিন ধরে নানা মহাত্মার কাছে শুনে আসছেন, বশিষ্ঠসংহিতা, বায়ুপুরাণ এবং স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ড পড়ে জেনে এসেছেন যে শূলপাণি তীর্থকে নর্মদাখণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ, মহাতীর্থ বলা হয়। আমাদের বহু সুকৃতীবশে আজ সেখানে যেতে পারছি। মহর্ষি কশ্যপের প্রথমা পত্নী দিতির গর্ভে দৈত্য দানবরা এবং দ্বিতীয় পত্নী অদিতির গর্ভে ভগবান আদিত্য এবং দেবতাগণ জন্মগ্রহণ করেন। ঐ দিতির গর্ভে জন্মেছিলেন অন্ধকাসুর। দৈত্যাধিপতি অন্ধকাসুর ত্রিভুবনের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের জন্য শিবের কৃপালাভের উদ্দেশ্যে ঘোর তপস্যার ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি এক

হাজার বৎসর কেবল ধূমপান করে, এক হাজার বৎসর এক পায়ে দণ্ডায়মান হয়ে কেবলমাত্র বায়ু ভক্ষণ করে, পরের এক হাজার বৎসর নিরাহারে পঞ্চতপা করে অর্থাৎ নিজের চারপাশে পাঁচটি অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শিবের আরাধনা করতেন, সন্ধ্যা হলে যোগাভ্যাসে রত হতেন। সে যুগে এইরকম ঘোর তপস্যা কেউ কখনও করেন নি। অবশেষে এমন হল যে, তাঁর মাথা হতে ক্রমাগত ধূম উদ্গীরণ হতে থাকল। সেই ধূম্রজাল চতুর্দিক ছেয়ে ফেলতে মাতা পার্বতী তাঁকে বর দিবার জন্য মহাদেবকে অনুরোধ করেন। মা পার্বতীর কথায় মহাদেব তাঁকে বর দিতে গেলে অন্ধকাসুর প্রার্থনা করলেন – 'দেব দৈত্য কিন্নর গন্ধর্ব মনুষ্য সকলকেই আমি যেন পরাজিত করতে পারি।' বারবার চোখের জলে অন্ধকাসুর মিনতি জানাতে থাকায় শেষ পর্যন্ত মহাদেব 'একমাত্র বিষ্ণু ছাড়া আর সকলেই তোমার কাছে পরাস্ত হবেন' এই বর দান করে বসেন। বর প্রাপ্তির পরেই অন্ধকাসুর দেবতাদের উপর ঘোর অত্যাচার করতে থাকেন। ইন্দ্রকে পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য তাঁর কাছ হতে কেড়ে নেন। শচীদেবীকেও ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি কোনমতে ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে আশ্রয় নেন। এইভাবে স্বর্গমর্ত্য পাতাল ত্রিভুবন জয় করে যখন সে সমস্ত দেবতার অধিকার কেড়ে নিয়ে সকলের উপর ঘোর অত্যাচার করতে সুরু করল, দেবতারা সকলে ভগবান বিষ্ণুর কৃপাভিক্ষা করেন। বিষ্ণু মায়ায় মোহিত হয়ে ঐ বলদর্পী অসুর স্বয়ং মহাদেবকেই যুদ্ধে আহ্বান করে বসল। শিবকে আঘাতে আঘাতে যখন জর্জরিত করে ফেলল, তখন মহাদেব পার্বতীর ঈঙ্গিতে তাঁর ভুবনবিজয়ী ত্রিশূল নিক্ষেপ করলেন, অন্ধকাসুর নিহত হল। অন্ধকাসুর দৈত্য হলেও তিনি ছিলেন মহর্ষি কশ্যপের পুত্র। কাজেই ব্রহ্মহত্যার পাপ স্পর্শ করায় মহাদেবের ত্রিশূলে যে রক্তের দাগ লেগে গেল, নর্মদার উভয়তট ঘুরে ঘুরে সব তীর্থের জলে ত্রিশূলকে বারবার ধুয়েও সেই দাগ উঠাতে পারলেন না তিনি। অবশেষে তিনি এখানে এসে ভৃগুপবর্তের গায়ে তিতিবিরক্ত হয়ে ছুঁড়ে মারলেন ত্রিশূলকে। ত্রিশূল পর্বতগাত্রে যেখানে বিদ্ধ হল সেখানে পাতাল ভেদ করে ভোগবতী গঙ্গার আবির্ভাব ঘটল। ভোগবতী গঙ্গার সেই প্রবল স্রোত বয়ে এসে মিলিত হল নর্মদার সঙ্গে। তখন থেকে ঐ জলধারার নাম হয়েছে দেবগঙ্গা। দেবগঙ্গা এবং নর্মদার সঙ্গমস্থলে আবির্ভূত হলেন এক শিবলিঙ্গ। সেই শিবলিঙ্গই শূলপাণীশ্বর মহাদেব। তাঁর ত্রিশূল তাঁর হাতে ফিরে আসার পরেই তিনি সেই ত্রিশূল সংগমস্থলে ডুবাতেই অন্ধকাসুরের রক্তের দাগ, যা ব্রহ্মশাপের প্রতীক তা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। তিনি এই শূলভেদ তীর্থকে মহাতীর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ বলে ঘোষণা করলেন।

কথা বলতে বলতেই নাঙ্গা মহাত্মা একটি সুউচ্চ পর্বত দেখিয়ে বললেন – ঐ হল ভৃগু পর্বত। পর্বত থেকে যে সাদা ধবধবে জল ছুটে আসছে ওরই নাম দেবগঙ্গা। ভৃগুপর্বতের তলদেশের দিকে এগিয়ে চল, যেখানে দেবগঙ্গা এবং নর্মদা সংগতা হয়েছেন সেখানেই শূলপাণীর মন্দির বিরাজিত। একটু পরেই শূলপাণীশ্বর মহাদেবের মন্দিরে আমরা পৌঁছে গেলাম। বিশাল মন্দির। আমরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। শুকদেবেশ্বর থেকে এই পর্যন্ত অন্য কোথাও কোন মন্দিরে যাঁকে সাষ্টাঙ্গ দিতে দেখিনি, সেই নাঙ্গা সাধুকে দেখলাম অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে বিড় বিড় করে মন্ত্রপাঠ করতে করতে মহাদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছেন। তাঁর চোখে জল। হরানন্দজী বললেন – আজ ১৬ই মাঘ, শুক্লা সপ্তমী, রবিবার। ১৩৬১ সালের এই দিনটি আমাদের জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে রইবে। ১৯৫৫ সালের এই ৩০শে জানুয়ারীকে আমি আমৃত্যু স্মরণে রাখব। মন্দির পশ্চিমাভিমুখী। উত্তরে কমলেশ্বর এবং দক্ষিণে রাজরাজেশ্বররের মন্দির আছে। নাঙ্গা মহাত্মা আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রপাঠ করতে করতে মন্দির প্রদক্ষিণ করালেন। মন্দির প্রদক্ষিণ করতে করতেই আমরা মন্দিরের পিছনে পঞ্চপাণ্ডবের পাঁচটি ছোট ছোট মন্দির, প্রত্যেক মন্দিরেই

যুধিষ্ঠিরাদির পাঁচটি মূর্তি স্থাপিত আছে এবং কমলেশ্বরের ডান দিকে সপ্তর্ষিদেরও প্রত্যেকের জন্য সাতটি ছোট ছোট মন্দির দেখলাম। প্রত্যেক মন্দিরে এক একজন ঋষি ধ্যানাবিষ্ট মূর্তিতে বসে আছেন। সপ্তর্ষিদের সুন্দর সুন্দর মূর্তি দর্শন করলাম। মন্দিরের পিছন দিকে নর্মদার জলস্পর্শ করতে গিয়ে দেখলাম, নর্মদার পাট ষাট ফুট পর্যন্ত ফাঁকা, নর্মদার জল কমে গেছে। অথচ নর্মদা ও দেবগঙ্গার ঠিক সঙ্গমস্থলে যেখানে শূলপাণীশ্বরের আবির্ভাবে ঘটেছিল, সেই স্থান পূর্বে জলে ডুবে থাকত, এখন জল ষাট ফুট নীচে যাওয়ায় মন্দির যেন কোন প্রস্তরময় স্থলেই নির্মিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। নর্মদার জলে মুখ হাত ধুয়ে এসে 'হর নর্মদে হর, হর নর্মদে হর' ধ্বনি দিতে দিতে যখন মন্দিরের দরজায় এসে দাঁড়ালাম, তখন প্রায় তিন ফুট উঁচু মহাদেবকে দর্শন করে মোহিত হয়ে গেলাম। শিবলিঙ্গ হতে যেন হিরণ্যরশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন আমাদের সামনে সুবর্ণলিঙ্গ বিরাজমান। এই মন্দিরে বেদমন্ত্রে বিধিমতে পূজার ব্যবস্থা। পরিক্রকমাকারী সাধু বিশেষতঃ দণ্ডী সন্ন্যাসীদেরকে স্বহস্তে পূজা করতে দেওয়া হয়। আমরা একে একে সকলে শিবের মাথায় জল ঢেলে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। আমি মন্দিরের এক কোণে বসে মহর্ষি তণ্ডিকৃত মহাদেবের হাজার আট মন্ত্র পাঠ করতে লাগলাম। সকাল ন'টায় এখানে এসে পৌঁছে ছিলাম। যখন পূজা পাঠ শেষ হল, বেলা প্রায় বারটা বেজে গেছে। নাঙ্গা মহাত্মা বসে আছেন দেখলাম, কিন্তু অপরাপর দণ্ডী সন্ন্যাসীর কাউকে দেখতে পেলাম না। মন্দিরের বাইরে যে সকলের ঝোলা গাঁঠরী ছিল তাও নাই। এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, এমন সময় মন্দিরের পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে হরানন্দজী এসে পৌঁছলেন। বললেন – পুরোহিতজী আমাদের থাকার সু-বন্দোবস্থ করে দিয়েছেন। ইনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। নাম শ্রীমৎ পরমানন্দ মিশ্র। শূলপাণীশ্বরের প্রধান পূজারী। আমি তাঁকে নমস্কার করতেই তিনি জানালেন যে, এই মহাতীর্থের স্থানটি বরোদা কাঁটী এবং নাদোদের এলাকাভুক্ত। এখানে ঐ তিনস্থানের রাজন্যবর্গের তরফ হতে প্রত্যেক পরিক্রমাবাসীর জন্য তিনদিনের খাদ্যবস্তু দেওয়া হয়, পূর্বে প্রত্যেককে একটি করে বগুনা, হাতা, তাওয়া, সাঁড়াশী এবং পাঁচ হাত লম্বা বস্ত্রও দান করা হত, এখন তা বন্ধ হয়ে গেলেও ভোজন ব্যাপার নির্বাহের ব্যবস্থা এখনও আছে। এই স্থান ঘোর জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত হলেও এখানে কিছু গুজরাটী ও দক্ষিণী ব্রাহ্মণের বসতি আছে। কিছু পাহাড়ী স্থানীয় বাসিন্দাও এখানে বাস করেন। পরিক্রমাকারী সাধুদের বাসের জন্য এখানে চারটি যাত্রীনিবাস ধনী ব্যবসায়ীরা করে দিয়েছেন। বহু ব্যাপারী এসে জঙ্গলে মূল্যবান কাঠ এবং বাঁশ কেটে নিয়ে নৌকা করে নর্মদার জলপ্রবাহে সেই কাঠ ভাসিয়ে দেশ দেশান্তরে নিয়ে যায়। কাজেই মন্দিরে লোকের ভীড় থাকেই। এখানে কার্তিকী পূর্ণিমা এবং বৈশাখী অমাবস্যাতে বড় মেলা হয়। তখন নাদোদ, বরোদা, ডাভোই এবং আমেদাবাদ হতে হাজার হাজার যাত্রী এখানে আসে। তখন এখানে এলে এ স্থানকে ঘোর জঙ্গল বলে মনে হবে না।

হরানন্দজী মন্দির থেকে ডেকে নিয়ে এলেন মহাত্মাকে। প্রধান পূজারীকে বললেন – ইনি অন্নজল গ্রহণ করেন না। কাজেই ইনি ভিক্ষা গ্রহণ করতে যাবেন না। আমি এঁকে আমাদের বিশ্রামস্থলে রেখে দিয়েই আপনার বাড়ীতে যাচ্ছি ভিক্ষা গ্রহণ করতে। মন্দির হতে দুমিনিটের পথ হেঁটেই হরানন্দজী একটি দোতলা পাথরের বাড়ীতে এনে আমাদেরকে তুললেন। দোতালায় উঠে দেখি একটি বড় হলঘরে আমাদের সঙ্গী সন্ন্যাসীরা নিজেদের আসন শয্যা পেতে বসে আছেন। আমার শয্যাও রঞ্জন পেতে রেখেছে। অপেক্ষাকৃত একটি ছোট ঘরে মহাপুরুষকে ঢুকিয়ে দিয়ে আমরা সবাই নেমে গেলাম নীচে পুরোহিতজীর বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করতে। ভিক্ষা বলতে ঘি মাখানো বাজরার রুটি এবং গুড়। এই দুর্গম জঙ্গলে এই আমাদের কাছে অমৃত বলে মনে হল। ভিক্ষাগ্রহণের পর আমরা আমাদের

বিশ্রামস্থলে এসে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। প্রত্যেকের পা ক্ষতবিক্ষত। কারও কারও পা হোঁচট খেয়ে ফুলে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে সন্ধ্যারতি দেখবার জন্য মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

মন্দির গিয়ে দেখলাম, আরতি দেখার জন্য প্রায় ৪০/৫০ জন ভক্ত উপস্থিত। অধিকাংশই স্থানীয় অধিবাসী। মন্দিরে আরতির ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে কাড়া নাকাড়া বেজে উঠল গুড়ুগুড়ু শব্দে। বেজে উঠল ডম্বরু ও বিষাণ। ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে পুরোহিতজী প্রথমে কর্পূর জ্বেলে আরতি করলেন, গুরুগম্ভীর কণ্ঠে তিনি গাইতে লাগলেন –

ওঁ স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়মরুৎকুম্ভিতে সূক্ষ্মমার্গে,
শান্তে স্বান্তেঃ প্রলীনে প্রকটিত বিভবে দ্যোতরূপে পরাখ্যে।
লিঙ্গং তদ্‌ব্রহ্মবাচ্যং সকলতনুগতং শংকরং ন স্মরামি,
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রী মহাদেব শম্ভো॥

অর্থাৎ পদ্মাসনে উপবেশন পূর্বক প্রণব উচ্চারণ করতে করতে প্রথমে প্রাণবায়ুকে সুষুম্না পথে নিরুদ্ধ করে, অন্তঃকরণে বৃত্তিসমূহকে ধীরে ধীরে শান্ত করে, তৎ পশ্চাৎ যে প্রণব স্বীয় মহিমা প্রকাশ করেছে, তাকে জ্যোতির্ময় পরব্রহ্মরূপী সাক্ষীচৈতন্যে প্রলীন পূর্বক, প্রত্যেক শরীরে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত স্বয়ম্ভু শংকরকে সমাধিস্থ হয়ে স্মরণ করতে পারিনি। হে শিব, হে শিব, হে শিব, হে শ্রীমহাদেব, হে শম্ভু, তুমি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা কর।

কর্পূর জ্বেলে আরতির পর তিনি পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে আরতি করতে করতে গাইলেন –

ওঁ নগ্নো নিঃসঙ্গশুদ্ধস্ত্রিগুণ বিরহিতো ধ্বস্তমোহান্ধকারো
নাসাগ্রে ন্যস্তদৃষ্টির্বিদিত ভবগুণো নৈব দৃষ্টঃ কদাচিৎ।
উন্মন্যবস্থায় ত্বাং বিগিত কলিমলং শংকরং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রী মহাদেব শম্ভো॥

দিগম্বর সঙ্গরহিত, শুদ্ধ ত্রিগুণরহিত, মোহান্ধকার বিমুক্ত, নাসাগ্রে ন্যস্তদৃষ্টি এবং সংসারের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞাতা, তোমাকে কোনদিন দেখিনি কিংবা তোমাময় হয়ে কলিকলুষশূন্য মঙ্গলময় তোমাকে আমার কোন দিন স্মরণ করা হয় নি। হে শিব, হে শিব, হে শ্রীমহাদেব, হে শম্ভু, তুমি আমার সেই অপরাধ মার্জনা কর।

আরতির শেষে মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে যাত্রী-নিবাসে ফিরতে গিয়ে আমরা নাঙ্গা মহাত্মাকে দেখতে পেলাম না। তাঁকে আমরা খুঁজতে লাগলাম। চারদিকে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার, আমাদের কাছে কোন আলো নাই। প্রত্যেকেই আমরা ক্লান্ত, তার উপর প্রত্যেকেরই পাগুলো ক্ষতবিক্ষত। এ সময় সকলেই শয্যাগ্রহণের জন্য অস্থির। এই বিপত্তি দেখে সকলেই বিরক্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁকে ফেলে রেখে কিভাবেই বা যাওয়া যায়। কোথায় কিভাবে তিনি কোন্ অবস্থায় আছেন, তা না জেনেই বা কি করে নিশ্চিন্তমনে বাসায় যাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত হরানন্দজীই বুদ্ধি করে রঞ্জনকে বললেন – যাত্রী-নিবাসে গিয়ে আপনার টর্চটা নিয়ে আসুন। দেখেও আসুন, নাঙ্গা বাবা তাঁর ঘরে পৌছে গেছেন কিনা। মন্দিরে তখনও ভক্তদের ভীড়। পুরোহিতজী শূলপাণীশ্বরের আরতি সেরে কমলেশ্বর এবং রাজরাজেশ্বর মন্দিরে আরতি করতে গেছেন। ভক্তদের দলও তাঁর পিছনে পিছনে গিয়ে আরতি দেখছেন। রঞ্জন একটু পরেই এসে জানালেন – নাঙ্গা সাধু যাত্রী-নিবাসে নাই। তিনি তাঁর টর্চটা নিয়ে এসেছেন হাতে করে। পুরোহিতজী তাঁর আরতি শেষ করে সেইমাত্র শূলপাণীশ্বর মহাদেবের মন্দিরে ঢুকেছেন। তিনি একটা বড় কল্কেতে গাঁজা ভরে রৌপ্যনির্মিত গড়গড়াতে রেখে এলেন মহাদেবের সামনে। এসেই তিনি দরজা বন্ধ করলেন। ভক্তরা চলে গেছেন যে যাঁর আবাসে। আমরা টর্চ জ্বেলে তখনও নাঙ্গা মহাত্মাকে পাতিপাতি করে খুঁজছি। পঞ্চপাণ্ডবের মন্দির দেখে সপ্তর্ষিদের মন্দিরে এসে

দেখলাম, আমাদের রহস্যময় পুরুষ পদ্মাসনে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। নাসাগ্রে ন্যস্ত দৃষ্টি। সারা শরীর থেকে একটা aura of light – জ্যোতির আভা তাঁকে ঘিরে রেখেছে। আমরা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তরে। টর্চ নিভিয়ে হরানন্দজী আমার কানে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন – এইমাত্র পুরোহিতজী যে স্তব পাঠ করলেন, আরতির সময়, এঁর এখন দেখছি সেইরকমই অবস্থা – দিগম্বর, সঙ্গরহিত, শুদ্ধত্রিগুণাতীত অবস্থা। আমরা ধীরে ধীরে পিছিয়ে এসে মন্দিরের সামনে বসলাম। এমনিতে কন্‌কনে ঠাণ্ডা, তার উপর তিনি যেখানটা সমাধিস্থ হয়েছেন, সেদিকে নর্মদার ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপ্‌টা ক্রমাগত ঝড়ের মত বইছে। হিরন্ময়ানন্দজীকে বললাম, আপনার বয়স হয়েছে, আপনি বরং সকলকে নিয়ে ফিরে যান যাত্রী-নিবাসে। তিনি ফোঁস করে উঠলেন – এহি দিব্যদৃশ্য ছোড়কে হমলোগ যাবেগা নেহি। রাত্রি দশটা বাজতে আবার তাঁকে দেখতে গেলাম টর্চ জ্বেলে পা টিপে টিপে। এবার দেখলাম, তাঁর শরীরে স্পন্দন দেখা দিয়েছে। ধীরে ধীরে তিনি ব্যুত্থিত হলেন অর্থাৎ তাঁর সমাধি ভাঙল। তিনি ধীরে ধীরে চোখ খুলতেই আমাদেরকে দেখতে পেলেন। আস্তে আস্তে উঠে তিনি হাঁটতে লাগলেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। সারা মন্দির অলৌকিক সুরভিতে ভরে উঠেছে। গাঁজার গন্ধও মৃদুভাবে আমরা পেলাম। শূলপাণীশ্বরকে প্রণাম করে নীরবে ফিরে এলাম যাত্রী-নিবাসে। পুরোহিতজী আমাদেরকে রাত্রে প্রয়োজন হলে ব্যবহার করার জন্য একটা হ্যারিকেন দিয়েছেন। নাগা সাধু সোজা তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আমরা যখন হ্যারিকেন জ্বেলে যে যার বিছানা গোছগাছ করছি, সে সময় দরজাতে ঠুক্‌ঠাক আওয়াজ হতেই দরজা খুলে দেখলাম, তিনি আমাদের ঘরে এসে ঢুকলেন। ঘরের একধারে বসে তিনি বললেন – আপনারা সবাই তো কাশীবাসী। জ্যোর্তিলিঙ্গ বিশ্বনাথের কাশীক্ষেত্র পঞ্চক্রোশ বিশিষ্ট। অনেকেই পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা করেছেন। এখানেও শূলপাণীশ্বর মহাদেবের ক্ষেত্রও পঞ্চক্রোশী। এখানেও পঞ্চক্রোশী পরিক্রমার বিধান আছে।

আমি প্রায় ১০ বছর আগে একবার এবং ৫ বছর আগে আর একবার এই শূলপাণী ক্ষেত্রের পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা করে গেছি। আমি জীবনে শেষবারের মত আর একবার পঞ্চক্রোশী করতে সংকল্প করেছি। কাল সকালেই আমি যাত্রা করব। আপনারা কেউ যদি সঙ্গী হতে চান তাহলে আমার সঙ্গে যেতে পারেন। সামনের ঐ ভৃগু পর্বত এবং সেখান থেকে ভৃগুতুঙ্গ পর্বতের শিখরদেশ পর্যন্ত ঘুরে এলেই পঞ্চক্রোশী সমাপ্ত হবে। যাতায়াতের পথে যে সব তীর্থ পড়বে সে সবই শূলপাণীশ্বর মহাদেবের ক্ষেত্রের অন্তর্গত।

নাঙ্গা মহাত্মার কথা শুনে একে একে সবাই অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন। কারণ সকলের পদযুগলই ক্ষতক্ষিত। পাহাড়ী পথে হেঁটে এসে কেউ হোঁচট খেয়েছেন, কেউ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে পা ছাড়াও কোমরে চোট খেয়েছেন। রঞ্জন বেচারার ত ডানপায়ের বুড়ো আঙুলের নখটাই উড়ে গেছে। সে বলল – নাগা বাবা, আমার তো খুব ইচ্ছা। কিন্তু এখন আমার পায়ের যা অবস্থা তাতে তো পাহাড়ে উঠতে পারব না। আপনি কাল বাদ দিয়ে পরের সোমবার যান, তাহলে এই সাতদিনের মধ্যে কোনমতে জড়িবুটি লাগিয়ে সুস্থ হয়ে উঠব। তার কথা শুনে নাঙ্গা মহাত্মা বললেন – দুঃখিত, খুবই দুঃখিত। সোমবার পর্যন্ত এখানে থাকতে পারব না, আমাকে স্বস্থানে ফিরে যেতে হবে। আমি এখান থেকে বিদায় নেব আপনাদের কাছ থেকে। শেষ পর্যন্ত স্থির হল, তাঁর সঙ্গে কেবল আমি হরানন্দজী এবং প্রেমানন্দ তীর্থ, এ তিনজন কাল সকালেই পঞ্চক্রোশী পরিক্রমায় যাবো।

নাঙ্গা সাধু তাঁর নিজের ঘরে চলে গেলেন। প্রচণ্ড শীতের জন্য ঘরের মধ্যে কাঠ জ্বেলে আমরা একটা অগ্নিকুণ্ড সাজিয়েছি। আগুনের তাপে ঘর গরম হয়ে উঠেছে, আমরা সকলে হ্যারিকেন নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম আসতে দেরী হল না।

ঘুম ভাঙল সকাল সাড়ে ছ'টায়। দরজা খুলে দেখি চারদিকে প্রচণ্ড কুয়াশা। শূলপাণীশ্বর মন্দিরের দিকে তাকিয়ে প্রণাম করলাম। নাগা বাবার ঘরের দরজা খোলা দেখে বুঝলাম, তিনি তাঁর অভ্যাসমত প্রাতঃস্নানে বেরিয়ে গেছেন। আমরা সঙ্গে কিছুই নিলাম না। কিছু ছোলার ছাতু এবং গুড় সঙ্গে নিয়ে কমণ্ডলু ও লাঠি হাতে বেরিয়ে পড়লাম পথে। যার যা গায়ে ছিল গেঞ্জী, আলখাল্লা, ল্যাঙট্, সোয়েটার এবং হনুমান টুপি মাথায় জড়িয়ে। মন্দিরে গিয়ে দেখি, নাঙ্গাজী সেইমাত্র নর্মদাতে ডুবে এসে ভিজা গায়েই মহাদেবকে প্রণাম করছেন। নর্মদার দিকে তাকিয়ে ওপার স্পষ্টভাবে আমাদের চোখেই পড়ল না। কুয়াশায় ঢেকে আছে। আমাদের প্রণাম শেষ হতেই নাঙ্গাজী উত্তরতটের দিকে তাকিয়ে বললেন - সোজাসুজি ঐ উত্তরতটের নাম কপিলতীর্থ। আদি বিদ্বান মহর্ষি কপিল ঐ তটে ঘোর তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ঘোর কুয়াশায় সব ঢেকে আছে বলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কপিলেশ্বর মহাদেবের মন্দির চোখে পড়ছে না। নর্মদাতটে অনেকগুলি কপিলের তপস্যাস্থল আছে। অমরকণ্টকেও এক কপিল তপস্যা করেছিলেন। আমাদের শাস্ত্রে আদি বিদ্বান কপিলের নামধারী ২২জন কপিলের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁরাও হয়ত নর্মদাতটের বিভিন্ন জায়গায় তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু শূলপাণীশ্বরের ঐ অপরতটে যিনি তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তিনি স্বয়ং আদি বিদ্বান্ সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা কপিল মুনি। আমি বললাম – আমাদের বাংলাদেশে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে আদি বিদ্বান্ কপিল মুনির তপস্যাস্থল আছে। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের মেলা বসে। 'হতে পারে, সেখানেও হয়ত আদি বিদ্বান্ গিয়েছিলেন, প্রত্যেক যোগী ও সন্ন্যাসীকে পরিব্রাজন করতেই হয়। তবে আমার গুরুজীর কাছে শুনেছি, এখানকার ঐ উত্তরতটই আদি বিদ্বান্ কপিলের সিদ্ধিক্ষেত্র।'

আমরা ৭টা নাগাদ যাত্রা করলাম। প্রায় ক্রোশ খানিক দক্ষিণ দিকে হেঁটে গিয়ে বেলা ৯টা নাগাদ পৌঁছে গেলাম এক পাহাড়ের তলদেশে। পথ প্রস্তরময়, গোটা পথটাই ঘোর জঙ্গল। একটা ঝরনা বয়ে আসছে পাহাড়ের উপর থেকে। নাঙ্গা বাবা বললেন – এই পাহাড়ের নাম ভৃগুতুঙ্গ পর্বত। এই পাহাড়ের শিখরদেশে ঘোর জঙ্গলের মধ্যে মামা ডোকরী নামে একটা গুহা আছে। ঐ স্থান থেকেই দেবগঙ্গা বয়ে এসে ভৃগুপর্বত হয়ে নর্মদাতে গিয়ে মিলিত হয়েছে শূলপাণীশ্বরের কাছে। মামা ডোকরীতে পাহাড়ের ফাটলের মধ্যেই ভীলদের দেবতা আছে। ভীলরা কাউকে, অন্য ধর্মীকে ত নয়ই – তাদের দেবতাকে দর্শন তো দূরের কথা, ধারে কাছেই যেতে দেয় না।

অনেক শাল সেগুন এবং বাঁশের জঙ্গল ছাড়াও কয়েকটা নালা টিলাও পেরিয়ে এসেছি আমরা। এ পর্যন্ত আসতে আসতে একটা কুটরা একটা খুরাণ্টি এবং নীলগাই এর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের। আমরা নরম ঘাসের জঙ্গলও পেরিয়ে এসেছি। লাঠি দিয়ে সেগুলোকে শোয়াতে হয় নি আমাদের। শিশিরে ভিজে সেগুলো আপনা হতেই পাথরের উপর লুটিয়ে আছে। হয়ত হঠাৎ ঘাসের তলা থেকে সহসা সাপ বেরিয়ে তার উদ্যত ফণা নিয়ে ফুঁসে উঠবে দংশন করবে এই ভয়ে আমরা প্রাণপণে হর নর্মদে, জয় শূলপাণীশ্বর মহাদেব বলতে বলতে এগিয়ে এসেছি। এইবার পাহাড়ের যে দিকটা কচ্ছপের পিঠের মত ঢালু হয়ে নেমে এসেছে, সেই পথ বেয়ে পাহাড়ের উপর দিকে হাঁটতে লাগলাম। সূর্য উঠতে এদিকে দেরী হয়, তার উপর এই সুউচ্চ ভৃগুতুঙ্গ পর্বতের শিখরদেশ অতিক্রম করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তেও বিলম্ব হয়। সেইজন্য রাতভোর শিশিরের বৃষ্টি পড়েছে যে গাছের পাতায়, তা শুকিয়ে যেতে বিলম্ব হয়। আমরা কখনও হুমড়ি খেয়ে খেয়ে হাঁটছি। কখনও লাফ দিয়ে পাথর ডিঙাচ্ছি, শিশির ভেজা পিচ্ছিল পাথরে পা পড়লেই সামনে দুহাত বাড়িয়ে পাথর জাপটে ধরে হাঁটতে বাধ্য হচ্ছি। হরানন্দজী হাসতে হাসতে মন্তব্য করছেন, কে আমাদের

জোর করে দণ্ড দিতে দিতে এইভাবে যেতে বাধ্য করছেন ভীলদের দেবতা, না, শূলপাণীশ্বর স্বয়ং ?

নাঙ্গা বাবা বললেন – এই সমস্তই শূলপাণীশ্বরের ক্ষেত্রের অন্তর্গত। কাজেই ভেবে নিন তিনিই করাচ্ছেন। দেবস্থানে দণ্ড দিতে দিতেই যেতে হয়। কিন্তু আপনারা একবার পাহাড়ের উপর এই পথের দুধারে সেগুন বনগুলোর দিকে তাকান। তাঁর কথায় মিনিট দুই দাঁড়িয়ে সেগুন গাছগুলোর দিকে তাকালাম। সেগুনের ফিকে জলপাই সবুজ বড়বড় পাতাগুলোতে রাতের শিশির পড়েছিল। সেগুলো এখনও সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায় নি। সেই শিশির ভেজা সেগুন বনের উপর সূর্যের আলো পড়ায় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হীরে যেন ঝলমল করছে। সেই মাইলের পর মাইল বিস্তৃত ঢালু পাহাড়ের গায়ে সেগুন পাতার উপরের কোটি কোটি শিশির বিন্দু থেকে কতরকম যে রঙ, কত রকম দ্যুতি যে ফুটে বেরোচ্ছে, তার বর্ণনা দেওয়া সুদুষ্কর। আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম সেদিকে।

তারপর আবার পাহাড় বাইতে লাগলাম। মাঝে মাঝে গাছের ডালে বিচিত্র রকমের এক ধরণের পাখী দেখছি। হলদে কালোতে মেশামেশি তার দেহটা হয় দশ ইঞ্চি, কিন্তু তার লেজটা এত বিশাল যে, যে গাছের ডালে সে বসেছে, তার লেজ নেমে গিয়ে স্পর্শ করেছে নীচের পাথর। কিছুটা এগিয়ে যাবার পর একটা প্রকাণ্ড কেন্দুগাছের ডালে বসে একটা পাখী একটানা ডেকে যাচ্ছিল। নাঙ্গা বাবাকে জিজ্ঞেস করতেই বললেন – ওর নাম উড-ডাক, একরকমের বুনো হাঁস। হাঁসের মতই জোড়া-পা ওদের, দেখতেও প্রায় হাঁসেরই মত কিন্তু ওরা রাত কাটায় জলের মধ্যে গাছের ডালে।

তাঁর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই বনের মধ্যে ঝড়-ঝড় করে শব্দ হল। নাঙ্গা বাবা আমাদেরকে স্থির হয়ে দাঁড়াবার জন্য ইঙ্গিত করলেন। দেখলাম একদল নীলগাই দৌড়ে আসছে পাহাড়ের উপর থেকে। এদেরকে কেন যে গাই বলে জানি না। উত্তরতট পরিক্রমাকালে এদের সাক্ষাৎ আমি বহুস্থানে পেয়েছি। দেখতে এরা প্রায় ঘোড়ার মত। ঘোড়ার মতই এরা প্রচণ্ড জোর দৌড়াতেও পারে। ঘোড়ার মত ঘুরে ঘুরে বৃত্তের মত দৌড়ায় বিশেষতঃ এরা যখন খেলা করে কিংবা শৃঙ্গার করে।

যে কেঁদ গাছটার ডালে বসে পাখীটি তার বিচিত্র কণ্ঠে বিচিত্র শব্দ করে ডাকছিল, সেই গাছের পাশ দিয়ে, একরকম তার তলা দিয়ে ঝড় তুলে ছুটে গেল নীলগাই-এর দল, কিন্তু আশ্চর্য উড-ডাকের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না, তার ডাকও থামল না।

নীলগাই এর দল চলে যেতেই আমরা আবার পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। চন্‌চনে রোদ এসে লাগছে গায়ে। পথও অপেক্ষাকৃত ভাল মনে হচ্ছে। বহুলোকের বহুদিনের পায়ের দাগ পড়েছে এই পথে। তাই হয়ত ভাল। এ কথা হরানন্দজী বলে উঠতেই নাঙ্গা মহাত্মা বললেন – পাহাড়ের দুই দিকের ঢালের দিকে তাকিয়ে দেখ, অজস্র কুটীর। ঐগুলো সবই ভীলদের পল্লী। পূর্বেই বলেছি, এই ভৃগুতুঙ্গ পর্বতের শিখরে উঠে দেখতে পাবে সেখানে একটা চেরা গুফার মত স্থান আছে, সেখানে ভীলদের দেবতা আছেন, তাদের কাছে সেটি মহাপবিত্র পীঠস্থান। ভীলরা সেখানে মাঝে মাঝেই যায় পূজা দিতে। বৎসরে একবার করে সেখানে নরবলিও দেয়। তারা তাদের দেবস্থানে অক্লেশে যাবার জন্য পথটাকে পরিষ্কার রেখেছে, পাথর ও কাঁটাঝোপ সরিয়ে। তাছাড়া ঐ ভৃগুতুঙ্গ পর্বতের শিখরের তলায় দীর্ঘতমা ঋষি, কাশীরাজ এবং চিত্রসেন প্রভৃতি অনেক ঋষি ও রাজর্ষি তপস্যা করে সিদ্ধ হয়েছিলেন। দেবগঙ্গা উদ্ভূত হয়ে প্রথম পাহাড়ের যে খোরে বা কুণ্ডে পড়েছিল তাতে রুদ্রকুণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। রুদ্রকুণ্ড হতে কিছুদূরেই রয়েছে মা নর্মদার মানসপুত্র মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের গুহা। ঐ সব পবিত্র স্থানে চৈত্র মাসে বদী অমাবস্যাতে মেলা বসে, তখন হাজার হাজার যাত্রী আসেন এই পথেই, তাই পথ কতকটা সুগম বলে মনে হচ্ছে।

যে সব পরিক্রমাবাসী সাধুরা শূলপাণীশ্বর দর্শন করতে আসেন, তাঁরাও এখানে আসেন। ভৃগু পর্বতেও যান। কার্তিকী পূর্ণিমা এবং বৈশাখী অমাবস্যাতে যখন শূলপাণীশ্বর মন্দিরে মেলা বসে, তখনও হাজার হাজার যাত্রী গৃহী ও সন্ন্যাসী দল বেঁধে হিংস্র জন্তুর আক্রমণ এবং ভীলদের অত্যাচার উপেক্ষা করেও ছুটে আসেন এই ভৃগুপর্বতস্থিত তীর্থগুলি দর্শন করতে। তাই প্রতি বৎসরই লোক চলাচলের ফলে পথ সুগম হয়ে উঠেছে। ভৃগু পর্বতও ঘোর জঙ্গল পরিপূর্ণ, তবুও শূলপাণি ঝাড়ির অন্যান্য তীর্থের তুলনায় দেখতে পাবে, সেই পথ তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার।

আমরা আরও মাইলখানিক দুটো পৃথক পৃথক পাকদণ্ডী অতিক্রম করে উপরে উঠার পর আমাদের চোখে পড়ল, গাছের আড়ালে আড়ালে ৪জন ভীল ধনুকে তীর যোজনা করে আমাদেরকে অনুসরণ করছে। নাঙ্গা বাবাকে ফিস্‌ফিস্ করে একথা জানাতেই তিনি বললেন – অনেকক্ষণ আগেই আমি ওদেরকে দেখেছি। আমাকে দেখছে সম্পূর্ণ নাঙ্গা, তোমাদের পরিধানে জামাকাপড় ছাড়া আর কিছু সঙ্গে নাই। কাজেই আমাদের উপর কোনও আক্রমণের আশঙ্কা নাই, ওরা কেবল লক্ষ্য করছে আমরা মামা ডোকরীতে ওদের দেবস্থানে যাই কি না। নির্ভয়ে হেঁটে চলুন, কোন ভয় নাই।

আরও কতকটা এগিয়ে গিয়ে নাঙ্গা বাবাই আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখালেন, আমাদের পথ থেকে কিছুদূরে একটা প্রকাণ্ড বাঘ ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে, বাঘ দেখে ভয়ে আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল। নাঙ্গা বাবা তাঁর মুখে আঙ্গুল দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে ইঙ্গিত করলেন। আমরা কম্পমান অবস্থায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম, কোমর দুলিয়ে একটা সুন্দর নিঃশব্দ ছন্দে ব্যাঘ্র মহারাজ দুল্‌কি চালে হেঁটে চলেছেন। বাঘের চলার মধ্যে এমন একটা রাজা-রাজড়া ভাব ফুটে উঠেছে, তা একবার দেখলে ভোলা যায় না। ভয়ে আমাদের বুক শুকিয়ে যাচ্ছে বটে তবে ঘন বনের মধ্যে তার এই নিঃশব্দ পদক্ষেপ তারিফ্ করার মত। পাশের ঢালুতে কিঞ্চিৎ দূরে ভীলগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি, তারাও বাঘটাকে দেখতে পেয়েছে বলে মনে হল। তারা এমন দৃপ্তভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে যে, মনে হল, বাঘ আক্রমণোদ্যত হলেই তাদের আকর্ণ বিস্তৃত তীর টেনে চারজনে বাঘটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিবে। বুকে একটু ভরসা দেখা দিল। কিন্তু বাঘ আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। সে দু একবার এদিক ওদিক মাথা ঘোরালো বটে কিন্তু আমাদের দিকে চেয়েও দেখল না। আমাদেরকে ছাড়িয়ে বেশ কতকটা গিয়ে একটা চাপা গর্জন করল। তারপর লাফ দিয়ে চলে গেল অন্যদিকে। একটু পরেই দেবগঙ্গার দর্শন পেলাম। প্রবল বেগে বয়ে চলেছে, নীচের দিকে নামছে যখন জলের রং সাদা ধবধবে দেখাচ্ছে। মামা ডোকরী দূর থেকে দেখিয়ে তিনি একে একে মহর্ষি দীর্ঘতমা, কাশীরাজ, চিত্রসেন, কিছুদূরে রুদ্রকুণ্ড এবং মার্কণ্ডেয় গুহা দেখালেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন – আপনি এঁদের সম্বন্ধে কি জানেন ? আমার উত্তর দেওয়ার আগেই হরানন্দজী বললেন – নর্মদা পরিক্রমায় বেরোবার আগেই আমরা মার্কণ্ডেয় মুনি সম্বন্ধে যেখানে যা পেয়েছি, তা ভালভাবেই পড়েছি। রুদ্রকুণ্ড সম্বন্ধে তো আগেই আপনি বলেছেন মামা ডোকরী থেকে দেবগঙ্গা উদ্ভূত হওয়ার পর তার প্রথম জলধারা ঐ রুদ্রকুণ্ডেই পড়েছে, চোখের সামনে নীচের দিকে তাকিয়েও দেখতে পাচ্ছি, দেবগঙ্গার জল ওখানে পড়ে বরফে পরিণত হচ্ছে। স্বয়ং রুদ্র কর্তৃক রক্ষিত ঐ স্থান। কাশীরাজ হয়ত এইস্থানে এসে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহর্ষি দীর্ঘতমার নাম শুনেছি, তাঁর সম্বন্ধে এবং চিত্রসেন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। তবে শৈলেন্দ্রনারায়ণজী যদি ওঁদের সম্বন্ধে কিছু জেনে থাকেন, উনি বলুন আমরা শুনি।

মহাত্মা বললেন – তা না হয়, আমিই বলব, তার আগে তোমরা এখানে দেবগঙ্গার প্রবল স্রোতে না নেমে কমণ্ডলু ভরে জল নিয়ে নিজেরা স্নান করে ছাতু ভিজিয়ে খেয়ে

নাও। বেলা ১১টা বেজে গেছে। অর্দ্ধেক পথ মাত্র এসেছি, এখনও ভৃগুপর্বতে যেতে হবে। তাঁর আদেশ মাত্রই আমরা জামাকাপড় খুলে মাথায় জল ঢালতে আরম্ভ করলাম। হরানন্দজী ছাতু ভিজিয়ে দলা পাকাতে লাগলেন। তিনি গোঁড়া ছাতু তৈরী করে এক টুকরো গেরুয়া কাপড়ের উপর তা রেখে তিনি কমণ্ডলুর সাহায্যে স্নান করলেন। আমরা সকলেই স্নান করে সূর্যপ্রণাম করে কিছুক্ষণ রেবা ও শিবের মন্ত্র জপ করে নিলাম। খেতে খেতে আমি বললাম – দীর্ঘতমা ছিলেন ঋষি উতথ্য এবং মমতাদেবীর গর্ভজাত পুত্র। তিনি কঠোর তপস্যা করে মহর্ষিপদ অর্জন করেছিলেন এবং ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের অন্তর্গত ১৪০ থেকে ১৬৪ পর্যন্ত পঁচিশটি সূক্তের তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, এইমাত্র জানি। আর চিত্রসেন সম্বন্ধে জানি যে তিনি গন্ধর্বদের রাজা ছিলেন। মহাভারতের আদিপর্বে পড়েছি যে দিব্যাস্ত্র সংগ্রহের জন্য অর্জুন যখন ইন্দ্রলোকে গমন করেন, তখন তিনি এই গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের কাছেই নৃত্যগীতাদি শিক্ষা করেছিলেন। পাণ্ডবদের দ্বৈতবনে অবস্থানকালে দুর্যোধন ঘোষযাত্রার পথে দ্বৈতবনের কাছে এলে চিত্রসেনের গন্ধর্ব বাহিনী তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে বন্দী করেন। কৌরব স্ত্রীলোকগণ এমন কি দুর্যোধনের পত্নী ভানুমতীও বন্দিনী হন। কুল মর্যাদা রক্ষার জন্য অজ্ঞাতবাসে থাকলেও যুধিষ্ঠির খবর পেয়ে ভীম অর্জুন নকুল এবং সহদেবকে পাঠান, প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করে হলেও চিত্রসেনের হাত থেকে দুর্যোধনকে মুক্ত করতে। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে চিত্রসেন পরাজিত হন, পরে অর্জুনের সঙ্গে পূর্বের মিত্রতা স্মরণ করে সন্ধি করেন এবং অর্জুনের অনুরোধে তিনি দুর্যোধনদেরকে মুক্তি দেন। এই পর্যন্ত আমি জানি। এর বেশী কিছু আমার জানা নাই।

নাঙ্গা মহাত্মা সব শুনে বললেন – বশিষ্ঠ সংহিতার ৩৪তম অধ্যায়, বায়ুপুরাণের অন্তর্গত রেবাখণ্ডের ৬৩-৭৩তম অধ্যায়ে এবং স্কন্দপুরাণের ৮৫-৯১তম অধ্যায়ে মহর্ষি দীর্ঘতমা, কাশীরাজ এবং চিত্রসেনের উপাখ্যান সবিস্তারে বর্ণিত আছে। ঐ বইগুলি পড়লেই তাঁদের কথা জানতে পারবে।

মহর্ষি দীর্ঘতমা সম্বন্ধে মহাভারতের আদিপর্বে যে সব ন্যক্কারজনক কাহিনী বিবৃত আছে তা বেদব্যাসের নাম দিয়ে প্রচলিত থাকলেও তাকে আমি প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে করি। কারণ যে গুহাতে বসে দীর্ঘতমা মহর্ষি পদ অর্জন করেছিলেন সেই গুহাই এখানে প্রমাণ করছে যে তিনি কত বড় তপস্বী ছিলেন। এই ঘোর অরণ্য বেষ্টিত ভৃগুতুঙ্গ পর্বতের শিখরে বসে জিতেন্দ্রিয় যোগী ছাড়া কারও পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে তপস্যা করা সম্ভব নয়। তাঁর পত্নী প্রদ্বেষী তাঁকে জন্মান্ধ এবং বৃদ্ধ দেখে পুত্রদের সাহয্যে ভেলার উপর বসিয়ে ভাসিয়ে দেন। বলিরাজা ঋষি কর্তৃক তাঁর পত্নীর গর্ভে পুত্রোৎপাদনের জন্য রাণী সুদেষ্ণার কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি ঋষিকে অন্ধ এবং বৃদ্ধ দেখে অবজ্ঞাভরে তাঁর এক শূদ্রা দাসীকে পাঠিয়ে দেন। দীর্ঘতমা সেই শূদ্রযোনিতে কাক্ষীবানাদি এগারটি পুত্রের জন্ম দেন। কাক্ষীবান সাধারণ লোক ছিলেন না, ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের অন্তর্গত ১১৬হতে ১২৬তম সূক্তের সমূহ মন্ত্রের দ্রষ্টা ছিলেন, এই কাক্ষীবান। মন্ত্রদ্রষ্টা মহর্ষির পুত্রও মন্ত্রদ্রষ্টা, এই ঘটনাই প্রমাণ করছে যে দীর্ঘতমাকে কেন্দ্র করে যে সব ন্যক্কারজনক কাহিনী ব্যাসের নাম দিয়ে প্রচলিত তা পরবর্তীকালে কোন গল্পপ্রিয় পুরাণকারের সৃষ্টি।

আমাদের স্নান খাওয়া সবই হয়ে গেল। নাঙ্গা বাবা উঠে দাঁড়ালেন, আর এখানে থাকবার প্রয়োজন নাই। সবাই হাঁটতে আরম্ভ করলাম। এবার লক্ষ পার্শ্ববর্তী ভৃগু পর্বত। ভৃগুতুঙ্গ পর্বতের ঢালের রাস্তা ধরে নীচের দিকে নামতে লাগলাম। কী জঙ্গল রে বাবা! কত সহস্র গাছ যে জড়াজড়ি করে রয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। এ পথে কেউ হাঁটে বলে মনে হয় না। ভৃগুতুঙ্গ পর্বতের অর্দ্ধেক অঙ্গ জুড়ে যেমন চলার পথ কষ্ট হলেও হাঁটার যোগ্য, এ পথ তেমন নয়। অবড়া খবড়া পাথরে পরিপূর্ণ, তার উপর এক ধরণের কাঁটা ফলের গাছ,

গোটা রাস্তাটাকেই ঢেকে রেখেছে। লাঠি দিয়ে গাছের ডাল সরিয়ে হাঁটছি আমরা। ফলের কাঁটা গায়ে লাগলেই জ্বালা করছে। মনে হচ্ছে, এই কাঁটা গাছ প্রায় শেষ হবে না। কাঁটা গাছের তলা দিয়ে মাথা নুইয়ে নুইয়ে হাঁটছি, একটু সোজা হওয়ার চেষ্টা করলে কন্টকময় ফলের আঁচড় খেতে হবে, গাবফলের মত ফলের আকার, সবুজ সবুজ নরম কাঁটা ফলের গায়ে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে কোন অংশে সেই কাঁটা বুলিয়ে গেলেই হল, সাধারণ কাঁটার মত গায়ে পায়ে হাতে সেই কাঁটা বিদ্ধ হবে না কিন্তু তার স্পর্শই সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরাবে। মাথা নুইয়ে নুইয়ে পায়ে ক্রমাগত পাথরের ঠোক্কর খেতে খেতে প্রায় আধমাইলটাকে হাঁটার পর আমরা মাথা সোজা করে দাঁড়াতে পারলাম, এবার শাল সেগুন বারম বেল এবং তেঁতরা গাছের জঙ্গল, দুর্ভেদ্য জঙ্গল। বনের চেহারা দেখে মনে ভয় দেখা দিল। হরানন্দজী বললেন, আমাদের উপনিষদের প্রাচীন ঋষিরা কি এইরকম দুর্ভেদ্য জঙ্গলে দুর্গম গিরি গুহায় বসে তপস্যা করতেন? আমি বললাম – নিশ্চয়ই করতেন। এইমাত্র তো দেখে এলেন মহর্ষি দীর্ঘতমা, মার্কণ্ডেয় এবং গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের গুহা। তাঁদের কালে কি এইসব স্থান শহর ছিল বলে আপনার মনে হচ্ছে? আমি নর্মদার উত্তরতটে অনেক প্রাচীন গুহা দেখে এসেছি, এযুগেও অনেক ঋষিকল্প তপস্বী যে ঐরকম ঘনঘোর জঙ্গলের মধ্যে বাস করছেন তাও আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। এই কথা তাঁকে যখন বললাম, তখন আমার মনে পড়ল ওঁকারেশ্বরের প্রলয়দাসজী, সীতামায়ীর জঙ্গলে সোমানন্দজী, অকালবাড়ায় মহাত্মা দিগম্বর করপাত্রীজী এবং ধাবড়ী কুণ্ডের মহাত্মা একলিঙ্গস্বামীর কথা। কিন্তু খুব শীঘ্রই আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল, হঠাৎ ভীষণ দর্শন ৫জন ভীল কামটা হাতে এসে ঘিরে ফেলল, তারা যে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমাদের কাছে পৌঁছে গেল আচম্বিতে তার বিন্দমাত্র টের পাইনি কেউ। মহাত্মা নাঙ্গা সাধুর নিরাবরণ মূর্তি দেখে তারা খুব হতাশ হল বলে মনে হচ্ছে, একজন ভীল তাঁর দিকে থুক শব্দে থুথু ফেলে হরানন্দজীকে ধরলেন। আমাকে এবং প্রেমানন্দকে অপর দুজন ভীল ধরে ন্যাংটা করে ফেলল। আমার কাঠের কৌপীনের ছোট ছোট খিল খুলতে না পেরে এমন টানা হেঁচড়া আরম্ভ করল যে আমি শশব্যস্তে তা খুলে ফেলে তাদের হাতে দিলাম। তারা নাড়াঘাটা করে দেখতে লাগল। তাদের কোন দোষ নাই, আমি শুনেছি সাধুরা এইরকম ল্যাঙ্গট বা মাথার চুলের মধ্যে, কোমরবন্ধনীতে অনেক সময় গিনি লুকিয়ে রাখেন। প্রেমানন্দজী হরানন্দজী এবং আমার, এই তিনজনের তিনটে সোয়েটার, টুপি এবং মাফলার তারা জোর করে ছিনিয়ে নিল। নাঙ্গা বাবার কাছ থেকে আর নিবে কি? যাঁর পার্থিব বস্তু কিছু নাই, তাঁর কিছু হারাবারও ভয় নাই। তারা আমাদের ছেড়ে চলে যাবার জন্য সবেমাত্র পিছন ফিরেছে, এমন সময় তাদের একজন মুখে এক অদ্ভুত শব্দ করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমরা দেখতে পেলাম একটা শুকনো লতা পাথরের রাস্তা থেকে সোজা উঁচু হয়ে রয়েছে যেন মন্ত্রবলে। পরমুহূর্তেই লতাটা যেন হেলে দুলে উঠল। লতাটা একটা পাটকিলে সাপে রূপান্তরিত হয়ে তার সরু লিক্‌লিকে্‌ জিভ বের করে মাথাটা এ-পাশে ও-পাশে হেলাতে লাগল। ওটা যে একটা সাপ এবং প্রচণ্ড বিষধর সাপ ভীলরা না থাকলে তা চেনার এবং জানার কোন উপায়ই ছিল না। একজন ভীল হরানন্দজীর হাত থেকে তাঁর দণ্ডটা টেনে নিয়ে সেটা দিয়ে ঝাঁটা দেওয়ার মত শুইয়ে সাপটাকে আঘাত করল। সেই এক আঘাতেই সাপের কোমর ভেঙে গেল, কোমরটা পাথরে লেপটে রইল আর আর কোমর থেকে উর্দ্ধাংশ উপরে উঠিয়ে ফণা তুললো সাপটা। তখন তার আসল চেহারাটা দেখা গেল। শরীরটা তার তিনগুণ চওড়া হয়ে গেল। পাটকিলে রঙ বদলে গিয়ে তার মধ্য থেকে সবুজ রঙ ফুটে বেরুল। ফণাটা প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা হল। তার ফণার বিস্তার দেখে বুঝা গেল তার বিষ ঢালার ক্ষমতা কতখানি। ভীলটা আবার বাড়ী মারল তার মাথায়। এবারে সাপটা নেতিয়ে

পড়ল। কিন্তু তার শরীর কাঁপতে লাগল অনেকক্ষণ। মরে যাবার পরেও Reflex action-এ বিষধর সরীসৃপের শরীরটা কুঞ্চিত ও সম্প্রসারিত হতে থাকল।

এইবার নাঙ্গা মহাত্মা ভীলদের ভাষায় তাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। ভীলরাও উত্তর দিল। ভীলরা অগ্নিকোণের দিকে কামটা বাড়িয়ে কিছু তাঁকে দেখালো বলেও মনে হল। ভীলরা চলে যেতেই তাদের চলার পথে হাতজোড় করে প্রণাম করতে করতে বলে উঠলেন – ওঁ বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে নমঃ। অর্থাৎ ভীলরূপী নারায়ণকে নমস্কার! তাঁর সর্বাত্ম দৃষ্টিতে সকল জীবকে নারায়ণ জ্ঞানে প্রণাম পর্ব শেষ হতেই ভীলদের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের মর্ম জানতে আগ্রহ প্রকাশ করলাম আমি। তিনি বললেন – সাপটা কি জানতে চেয়েছিলাম আমি। তারা জানাল – কানখুন্টা সাপ, কেউটের চেয়েও মারাত্মক বিষধর। কান খুঁচুনির মত সরু এর চেহারা। লাউডগা সাপের চেয়েও সরু। লাউডগা সাপ লাউ বা কুমড়ো মাচায় থাকে, যাকে আক্রমণ করে সর্বাগ্রে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে চোখে দংশনে করে, এ সাপ তার চেয়েও অনেক অনেক বেশী সাংঘাতিক। এর এক দংশনে মানুষ তো কোন ছার বাঘ সিংহ হাতীও কুপোকাৎ হয়ে যায়। ঝাঁটার মত করে ঝেঁটিয়ে মেরেছি কারণ এই সাপকে ঐভাবেই মারতে হয়। সোজাভাবে লাঠি মারলে ফস্‌কে যাবার সম্ভাবনা বেশী। লাঠি ফসকানো মানেই আমাদের প্রাণ ফসকানো।

নাগা বাবা আরো জানালেন – তাদেরকে চক্রতীর্থ নামক কুণ্ডটার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কামটা বাড়িয়ে বলে গেল এ রাস্তা দিয়ে গেলে অনেক সময় লাগবে। অগ্নিকোণের দিকের রাস্তাটা ধরে এক দেড়মাইল গেলেই চক্রতীর্থের দর্শন পাবো।

আমরা ভীলদের প্রদর্শিত পথ ধরেই হাঁটতে লাগলাম। পথ প্রস্তরময় সন্দেহ নাই, হাঁটতেও কষ্ট অনুভব করছি, কিন্তু ভৃগুতুঙ্গ পর্বতের শিখর হতে যে ভয়ঙ্কর কাঁটা ফলের গাছের তলা দিয়ে আধখানা বেঁকে কখনও বা নুয়ে নুয়ে এসে যে ঘাড়ে ব্যথা ধরে গেল, সেইরকম পথ এদিকটা নয়। লম্বা লম্বা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া তেতুল মহুয়া অর্জুন এবং শাল সেগুনের গাছ এ পথে অজস্র। কিছুদূর গিয়ে একটা বড় মোটা বাঁশ ঝাড় পেলাম। আরও কতকটা গিয়ে একটা ভাঙা মন্দির পেলাম। অতি প্রাচীন পাথরের মন্দির, তার অনেকখানিই জীর্ণ হয়ে ধ্বসে পড়েছে। তার চারদিক ঘিরে ৩/৪টা বড় বড় বটগাছ, আমলকী, পলাশ আর বিল্ববৃক্ষ। বটাগাছের শিকড় ও ঝুড়িতে গোটা মন্দিরটাই জড়িয়ে পড়েছে। ঝুরি এবং শিকড়ে মন্দিরের দেওয়াল এভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে না পড়লে মন্দির কবেই ধ্বসে পড়ে পাথরের সঙ্গে মিশে যেত। আমাদের মনে হল,-হয়ত বহুপূর্বে এখানে কোন তপস্বী তপস্যা করতেন। নাঙ্গা বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি এই ভাঙা মন্দিরকে কারও তপস্যাস্থলী বলে চিনেন কিনা। তিনি নেতিবাচক উত্তর দিলেন। হঠাৎ আমাদের কানে ঢুকলো এক অদ্ভুত শব্দ হাঁকোর্ হাঁকোর্। নাঙ্গা বাবা তাড়াতাড়ি হাঁটতে বললেন। তিনি নিজেও এত দ্রুততালে পা ফেলতে লাগলেন যে, আমাদের মনে হল তিনি দৌড়াচ্ছেন। পাহাড়ের উপরে যেখানে মাথার উপর বড় বড় গাছের চন্দ্রাতপ, পথ বলতে কিছু নাই, এবড়ো-খেবড়োভাবে ছোট বড় সবরকমের পাথর পথের উপর পড়ে থাকায় পথ দুর্গম হয়েছে, সেখানে কাঁহাতক জোরেই বা হাঁটা যায়? প্রেমানন্দ পা পিছলে পড়ে গেলেন। আমি আর হরানন্দজী তাঁকে টেনে তুললাম। নাঙ্গা বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম বেলা এখনও একটা বাজে নি। নীচের দিকে তাকিয়ে শূলপাণি মন্দিরের চূড়া দেখতে পাচ্ছি, তবে এত হড়বড় করছেন কেন?

– হড়বড় করছি কি সাধে, ঐ যে থেকে থেকে হাঁকোর হাঁকোর করে শব্দ উঠছে, ঐ শব্দ আমি চিনি। রয়াল বেঙ্গল টাইগার যেখানে রাত্রিবাস করে, যে স্থানটিকে সে তার নিরাপদ বিশ্রামস্থল বলে মনে করে সেখানে সে পেটভরে খাবার পর ঘুমালে, তার ঐভাবে নাসিকা গর্জনের ধ্বনি উঠে।

নাগা বাবার কথা শুনে হরানন্দজী আমাকে বললেন – কি সুখের কথাই না শুনালেন উনি। চল ভাই প্রেমানন্দ, তুমি এইমাত্র আঘাত খেয়েছ বটে তবে শুনলে তো উনি কায়দা করে জানিয়ে দিলেন যে আমরা এখনও যে পথে হাঁটছি সে পথ ব্যাঘ্র-অধ্যুষিত! কাজেই বাঘের পেটে যাওয়ার চেয়ে ক্ষতবিক্ষত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলেও জোরে আর জোরে হাঁটতে হবে। আমরা আকুলপ্রাণে মহাদেব শূলপাণীশ্বর এবং মা নর্মদাকে প্রাণের আর্তি জানাতে জানাতে চলেছি। পথের পাশে যেখানে বন গভীর, যেখানে পাতা ভেদ করে রোদ এসে পড়তে পারে না সেখানে লজ্জাবতীর পাতায় পাথর ঢেকে আছে। জংলী শটীগাছ, কণ্টিকারী আরও কতরকম নাম-না-জানা লতাপাতা। প্রজাপতির ঝাঁক গুনগুনিয়ে উড়ছে। এক রকমের বড় কাঁচপোকা, যারা বুঁবু বুঁই-ই-ই আওয়াজ তুলে নিজেদের আনন্দে নিজেরাই হাওয়াতে পাক খাচ্ছে। একটা কাঠবেড়ালীকে দেখলাম, চোখের পলকে আমরা যে রাস্তায় হাঁটছি, তা একলাফে পেরিয়ে একটা সেগুন গাছে উঠে মগডাল থেকে মগডালে, লাফিয়ে বেড়াতে লাগল। একধরণের সুন্দর ছোট বাদামী হরিণকে দেখলাম বাদামী রঙের ঝলক তুলে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে। নাঙ্গা বাবা আপনা থেকেই বললেন, নর্মদাতটের জঙ্গলেই এই অপরূপ সুন্দর ছোট্ট হরিণগুলোকে খুব বেশী করে দেখা যায়। এর নাম খুরান্টি হরিণ, ইংরাজীতে যাকে বলে Mouse deer. এই ভাবে প্রতিনিয়ত রেবামন্ত্র জপ করতে করতে, জপের ফাঁকে দুএকটা করে টুকরো টুকরো কথা বলতে বলতে একটা পাকদণ্ডী যখন পেরোচ্ছি, তখন আকাশ ফাটিয়ে একটা বাঘের প্রচণ্ড গর্জন উঠলো। সেই শব্দ গাছের পাতায় সিরসির করে প্রতিধ্বনিত হয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল চারদিকে। আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম কিছুক্ষণ। মুখে অস্ফুট নাদে জপে চলেছি – হর নর্মদে হর। নাঙ্গা বাবা আমাদেরকে স্থিরভাবে দাঁড়াতে বলে একটু এগিয়ে গিয়ে নীচের দিকে এবং উপরের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন চারদিক তারপর হাস্যোদ্ভাসিত মুখে ফিরে এলেন আমাদের কাছে। বললেন – আমরা আমাদের অভীষ্ট স্থানে এসে পৌঁছে গেছি, আর ভয় নাই। পাকদণ্ডী পেরিয়েই আমরা চক্রতীর্থের দর্শন পেলাম। মহাত্মা বললেন – বাঘের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য আমি যেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম, সেখানে সুরভিযুক্ত হোমের গন্ধ পেলাম, আপনারাও গেলেও ঐ হোমের গন্ধ পাবেন। আমি জানি চক্রতীর্থ হতে সবসময় হোমের গন্ধ চারদিকে দিবারাত্রি বিকীর্ণ হচ্ছে অথচ কাছে গিয়ে দেখবেন চলুন সেখানে জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই, কোন ঋষি বা তপস্বীর দল সেখানে ঘৃতাহুতি দিয়ে হবনও করছেন না। আমার গুরুদেবের সঙ্গে দুবার এসেছি এখানে, দুবারই এই দিব্যগন্ধ আমরা পেয়েছি গুরুদেব বলেছেন, এই দিব্যস্থানের সমগ্র সূক্ষ্ম পরিমণ্ডলে অনাদিকাল ধরে এই হোমের গন্ধ দিবারাত্রি সবসময় বর্তমান। আমরা প্রত্যেকেই হোমের সৌরভ পেলাম। শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তরে চক্রতীর্থের কাছে এসে আমরা সকলেই সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে প্রণাম করলাম শূলপাণীশ্বর মহাদেবকে।

নাঙ্গা বাবা বললেন, আমাদের ঘড়িবাবু (অর্থাৎ রঞ্জন) সঙ্গে নাই, তাই ঠিক এখন বেলা কয়টা তা জানা যাচ্ছে না, নিঃসন্দেহে দুটা বাজতে যায়। আমি পূর্বেই বলেছি অন্ধকাসুরকে বধ করতে গিয়ে মহাদেব যে তাঁর কালান্তক ত্রিশূল ছুঁড়ে মেরে ছিলেন, তা অন্ধকাসুরের দেহ ভেদ করে ভৃগু পর্বতের এখানে এসে বিদ্ধ হয়, সঙ্গে সঙ্গে এক কুণ্ড এখানে তৈরী হয়ে যায়। এরই নাম চক্রতীর্থ। কুণ্ড থেকে কারও মতে ভোগবতী গঙ্গা কারও মতে সরস্বতী গঙ্গা, ভৃগুতুঙ্গ পর্বতের মামা ডোকরী হতে উদ্ভূতা দেবগঙ্গার ধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে নর্মদার সঙ্গে সঙ্গম করেছে। সেই মিলিত সঙ্গমস্থলেই শূলপাণীশ্বর বিরাজমান আছেন। সমগ্র নর্মদাখণ্ডে শূলপাণীশ্বরের ক্ষেত্র যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ মহাতীর্থ তেমনি আবার শূলপাণির পঞ্চক্রোশ ব্যাপ্ত সিদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে এই চক্রতীর্থ সর্বোত্তম। এই

চক্রতীর্থের জল কোন পাপী স্পর্শ করতে পারে না, সেইরকম কোন লোক তিনি পরিক্রমাবাসীই হোন বা কোন সন্ন্যাসীই হোন, চক্রতীর্থের জল স্পর্শ করতে চেষ্টা করলেই এখানে বাজ পড়তে আরম্ভ করে। দু-একজন সর্পদংশনেও সঙ্গে সঙ্গে মারাও গেছেন। এইজন্য আর কেউ সেইরকম অপচেষ্টা করেন না। একটু দূরেই দেখুন, ব্রহ্মা কর্তৃক স্থাপিত ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গ তিনকাল ধরে এখানে বর্তমান। এখানে ১০৮জন ক্ষেত্রপাল নিয়ত আছেন। গণেশজী এই তীর্থকে রক্ষা করেন। শংকরের ত্রিশূল ভৃগু পর্বতের এই অংশে বিদ্ধ হয়েছিল বলে সমগ্র শূলপাণির ক্ষেত্র শূলভেদ তীর্থ নামে অভিহিত হয়ে থাকে। ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গের ডান দিকে শেষশায়ী ভগবান আছেন। ইদানীংকালে শেষশায়ী ভগবানের এবং ব্রহ্মশ্বর লিঙ্গের মন্দির নির্মিত হয়েছে। ভৃগু পর্বতের প্রায় আড়াই হাজার ফুট উচ্চস্থানে চক্রতীর্থের আশেপাশে যত তীর্থ সকলই শূলপাণীশ্বরের ক্ষেত্রের অন্তর্গত। ভৃগুতুঙ্গ পর্বতের শিখরদেশে মহর্ষি দীর্ঘতমা কাশীরাজ চিত্রসেন এবং মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের যে সব গুহা দেখে এলাম, তাঁরা এখানে বসেও বৎসরের পর বৎসর ধরে তপস্যা করেছিলেন। এই তপোভূমিতে আরও কত যে ঋষি তপস্যা করে সিদ্ধকাম হয়েছিলেন, তার ইয়ত্তা নাই। আমরা সর্বত্র সর্বাঙ্গ লুটিয়ে লুটিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে মা নর্মদার ধারার দিকে তাকিয়ে যুক্তকরে সমস্বরে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলাম –

ওঁ ললিত সিত দুকূলা মঞ্জুমূলাং মাহেশীং,
করকলিত কুটাব্জামিশ্র মিষ্টাং সুকেশীং।
মণি খচিত বিভূষাং ভালবালেন্দু ভূষাং –
শিরসি ধৃত কিরীটাং নর্মদাং চিন্তয়ামি॥

মা নর্মদাকে প্রণাম করে এবার নামতে লাগলাম নীচের দিকে। চৈত্র মাসের বদী অমাবস্যা, বৈশাখী অমাবস্যা এবং কার্তিকী পূর্ণিমাতে শূলপাণির মন্দিরে যে মেলা বসে, তার অধিকাংশ ভক্ত এবং পরিক্রমাবাসীর দল এখানে আসেন বলে তাঁদের চলার দাগে পা রেখে দুপাশে ঘন ঘোর জঙ্গল থাকলেও আমরা দ্রুতগতিতে নামতে লাগলাম ভৃগু পর্বতের তলদেশের দিকে। চক্রতীর্থ এবং অন্যান্য তীর্থদর্শনে সকলেরই মন আনন্দে ভরে আছে। পরিষ্কার পাথরের ধাপে ধাপে প্রায় দেড়াঘন্টা হেঁটে দেবগঙ্গার দক্ষিণভাগে রণছোড়জীর মন্দিরে এসে পৌছলাম। এখান থেকে শূলপাণীশ্বরের মন্দির নাগা বাবা জানালেন মাত্র এক মাইল। রণছোড়জীর মন্দির অতি প্রাচীন বলে মন্দিরের এখন জীর্ণ দশা। মন্দিরস্থ রণছোড়জীর মূর্তিটি সুবিশাল। কালো চক্‌চকে পাথরে নির্মিত। সেখানে প্রণাম করে হাঁটতে লাগলাম শূলপাণির মন্দিরের দিকে। সূর্য তখনও আক্ষরিক অর্থে অস্তমিত না হলেও বনের মধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে।

আমরা উচ্চৈঃস্বরে হর নর্মদে, হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে মন্দিরের দিকে এগোচ্ছিলাম। আমাদের কণ্ঠস্বর শুনে মন্দিরে আমাদের দলের যাঁরা সমবেত হয়েছিলেন, তাঁরাও আনন্দে জয়ধ্বনি দিলেন। মন্দিরে প্রণাম করে উঠতেই পুরোহিতজী বললেন, ভগবান শূলপাণীর দয়ায় সকলে অক্ষতভাবে ফিরে এসেছেন দেখে আমরা সবাই আনন্দিত। এই দুর্গম অরণ্যপথ, ততোধিক দুর্গম শ্বাপদ সঙ্কুল পাঁচক্রোশ ব্যাপী পথ নিরাপদে পরিক্রমা করে আসা শূলপাণীশ্বরের দয়া ছাড়া কখনও সম্ভব নয়। আমি তাঁকে বললাম – রণছোড়জীর মন্দিরের জীর্ণ দশা দেখে খুব দুঃখ হল। জল ঝড় বা প্রাকৃতিক কোন বিপর্যয় ঘটলে ঐ মন্দিরের কি দশা হবে কেউ বলতে পারে না। তিনি বললেন 'সবই লীলাময় ঠাকুরর ইচ্ছা'। এই যে শূলপাণীশ্বরের মন্দির দেখছেন, এও প্রাচীন, সুপ্রাচীন। কোন যুগে কার দ্বারা যে বাবার এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল, তা আমাদের জানা নাই। কেবল এইটুকু জানি যে ১৮২৬ সংবতে রাজা রাজসিংহ এই মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করেছিলেন। এখন ২০১১

সংবত চলছে। অর্থাৎ তাও প্রায় ২০০ বৎসর হতে চলল। এখন যাত্রীনিবাসে যান, গরম জামাকাপড় গায়ে দিয়ে আসুন। আজও খুব শীত পড়েছে।

নাগা বাবার তো গায়ে কিছু চাপানোর বালাই নাই। তিনি সর্বদাই সব ঋতুতে সম্পূর্ণ নিরাবরণ থাকেন। পঞ্চক্রোশী পরিক্রমার সময় ভৃগুতুঙ্গ হতে ভৃগুপর্বতে যাওয়ার পথে সশস্ত্র ভীলরা আমাদের কাছে আর কিছু না পেয়ে প্রেমানন্দ হরানন্দজী এবং আমার সোয়েটার কেড়ে নিয়ে গেছে, কাজেই শীতের কাঁপুনি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা তিনজনে গেলাম যাত্রীনিবাসে কম্বল গায়ে দিয়ে আসার জন্য। আমাদের দলের বাকীরা সবাইতো কম্বলমুড়ি দিয়ে আগে থেকে আমাদের প্রতীক্ষায় মন্দিরে বসেছিলেন। কাজেই নাগা বাবাসহ সকলেই সেখানে বসে রইলেন।

যাত্রীনিবাসে গিয়ে দেখি, একতলাতে ৬জন সন্ন্যাসী এসে ডেরা নিয়েছেন। তাঁরা মন্দিরে আরতি দেখতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। আমরা দোতলায় গিয়ে তাড়াতাড়ি কম্বল গায়ে চাপিয়ে তাঁদের সঙ্গেই মন্দিরে ফিরে এলাম। আসতে আসতে পথে আলাপ করতে জানতে পারলাম, তাঁরা খান্দেশ থেকে প্রতি বৎসরই এখানে আসেন, যে কোন সোমবারের শেষরাত্রে শূলপাণীশ্বরের ভস্মারতি দর্শন করতে। প্রতি সোমবারই এখানে ভস্মারতি হয়। এ জিনিষ ভারতে আর কোন শিবমন্দিরে হয় না।

মন্দিরে যখন পৌছলাম, তখন প্রাত্যহিক সন্ধ্যারতি সুরু হয়ে গেছে। নাঙ্গা মহাত্মার সঙ্গে সকলেই হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। আরতির শেষে নাঙ্গা বাবাকে সঙ্গে নিয়ে বাসায় এলাম। এসেই রঞ্জন এবং বাসবানন্দজী হৈ হৈ করে বলে উঠলেন – আমরা ত সব এক সঙ্গেই আছি, আপনাদের পঞ্চক্রোশী পরিক্রমার বিবরণ যে কোন সময় শুনে নিতে পারব, আপনারা নিরাপদে ফিরে এসেছেন এতেই আপততঃ নিশ্চিন্ত হয়েছি। বাব্বা! সারাদিন আমাদের কী দুশ্চিন্তাতেই না কেটেছে! স্বয়ং পুরেহিতজীও ঐ দুর্গম জঙ্গলের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করছিলেন। যাই হোক্, এদিকে একটা মজার সংবাদ শুনুন, আজ রাত্রি সাড়ে ৩টার সময় শূলপাণীশ্বরের ভস্মারতি হবে। আপনারা পরিক্রমা করে একেবারে সন্ধ্যার মুখে ফিরে এলেন, তাই পুরোহিতজী আপনাদেরকে জানাবার সুযোগ পান নি। এ জিনিষ নাকি শিবময় ভারতবর্ষের আর কোন মন্দিরে হয় না। এখানে একজন অঘোরী শিবসাধক থাকেন। তিনি প্রতি সোমবার শেষরাত্রে ভস্ম নিয়ে পৌছান। কোন সন্ন্যাসীর দেহান্ত হলে অগ্নিতে তাঁর মৃতদেহ সৎকারকালে সর্বাঙ্গ দগ্ধীভূত হয়ে গেলে, তাঁর ব্রহ্মতালু যখন ফেটে যায়, সেই ভস্মীভূত ব্রহ্মতালু সংগ্রহ করে সেই ভস্ম দিয়ে শূলপাণীশ্বরের আরতি হয়। ঐ আরতি দর্শনের অধিকার কোন স্ত্রীলোক বা গৃহীর নাই। শুধু পরিক্রমাবাসী এবং সন্ন্যাসীদের তা দর্শনের অধিকার আছে।

আমি বললাম – শুধু এই মন্দিরেই ভস্মারতি হয়, ভারতের আর কোন মন্দিরে হয় না, একথা মানতে পারলাম না। উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে সপ্তাহে শুধু একদিন মাত্র নয়, প্রতিদিনই সেখানে রাত্রি ৩টার সময় ভস্মারতি সুরু হয়। মহাকাল মন্দিরে একজন অঘোরপন্থী সাধক আছেন তিনি সারা সপ্তাহ ধরে ভস্মারতির ভস্ম সংগ্রহ করে থাকেন, এক বিশেষ নিয়মে। সেই আরতি দর্শন কালে মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকার নাই। তবে পুরুষ গৃহীরা তা দর্শন করতে পারে। অবগাহন স্নান কিংবা সেখানকার কোটিতীর্থের জল মাথায় ছিটিয়ে আরতি দেখার নিয়ম। কোটিতীর্থের মধ্যে ৫০ফুট বা ১০০ফুট দীর্ঘ এক সুবিশাল ত্রিশূল প্রোথিত আছে।

– তোমার কথা সম্পূর্ণ সত্য। তবে এই মন্দিরে আরতিকালে মহর্ষি জৈগীষব্য কৃত একটি স্তোত্র এবং সামবেদের যা একটি মন্ত্রপাঠ হয় বিশুদ্ধ সুর ও স্বর সংযোগে সে জিনিষ মহাকালেশ্বর মন্দিরেও হয় না। এখানকার পুরোহিত মশাইকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে

পারবেন, ভস্মারতির জন্য প্রতি সোমবার তাঁকে সারাদিন রাত নিরম্বু উপবাসে থাকতে হয়। মহাকাল মন্দিরের পুরোহিতরা সন্ধ্যা থেকে উপবাসী থাকলেও দিনের বেলা নিরম্বু উপবাসে থাকেন না।

নাঙ্গা মহাত্মার কথা শেষ হলে হরানন্দজী হাতজোড় করে তাঁকে বললেন – নাগা বাবা! আমি বহুবার নানা প্রসঙ্গে মহর্ষি জৈগীষব্যের নাম শুনেছি, কিন্তু তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছু শোনা নাই। এখন ত রাত্রি সাড়ে দশটা বেজে গেছে। আপনার তো রাত্রে ঘুমের প্রয়োজন হয় না। আপনি যদি দয়া করে জৈগীষব্যের কথা শোনান, সারাদিন পরিক্রমা করে ক্লান্ত থাকলেও আমি না ঘুমিয়ে তা শুনব।

নাঙ্গা মহাত্মা তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ দেখে বললেন – মহাভারতের শল্য পর্বে কঠোর তপস্বী জৈগীষব্যের বিবরণ আছে। তিনি একবার যদৃচ্ছা ভ্রমণ করতে করতে মহর্ষি শাণ্ডিল্যের গোত্র সম্ভূত তপস্বী দেবলের আশ্রমে এসে উপস্থিত হন। সেখানে এসে সবসময় যোগস্থ হয়ে থাকতেন। তিনি কেবলমাত্র দেবলের ভোজনের সময় তাঁর সমীপস্থ হতেন। একদিন দেবল তাঁর আশ্রমের কোন স্থানেই জৈগীষব্যকে দেখতে পেলেন না। তখন তিনি সমুদ্রে গিয়ে দেখলেন যে জৈগীষব্য পূর্বাহ্নেই সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সমুদ্রে স্নানের পর আশ্রমে ফিরে এসে দেবল দেখেন যে, তাঁর পূর্বেই জৈগিষব্য সেখানে উপস্থিত হয়ে নীরবে উপবিষ্ট আছেন। জৈগীষব্যের শক্তি পরীক্ষা করবার জন্য মন্ত্রজ্ঞ দেবল ব্যোমমার্গে উত্থিত হয়ে দেখলেন, অন্তরীক্ষচারী সিদ্ধগণ জৈগীষব্যের পূজারত রয়েছেন। অতঃপর তিনি আরও দেখলেন যে জৈগীষব্য স্বর্গলোক পিতৃলোক যমলোক ও চন্দ্রলোক প্রভৃতি বহু ঊর্ধ্বলোক বিচরণ করে অন্তর্হিত হলেন। সিদ্ধরা দেবলকে জানালেন যে, জৈগীষব্য শাশ্বত ব্রহ্মলোকে গিয়েছেন, সেখানে দেবলের যাবার ক্ষমতা নাই। তখন দেবল তাঁর আশ্রমে ফিরে গেলেন, আশ্রমে পৌঁছে তিনি পরম বিস্মিত হলেন এই দেখে যে জৈগীষব্য তাঁর পূর্বেই আশ্রমে এসে বসে আছেন! তখন শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তরে দেবল তাঁর কাছে মোক্ষধর্মের দীক্ষা প্রার্থনা করলেন।

কাশীখণ্ডে আছে, মহাদেব তাঁরই ধ্যানে নিমগ্ন জৈগীষব্যের তপোবহ্নি-পরিশুষ্ক অস্থিচর্মসার শরীর দেখে নন্দিকেশ্বরকে আদেশ করনে –'গৃহাণ লীলাকমলমিদং পীযূষপোষণম্। অনেন তস্য গাত্রাণি স্পৃশ সদ্যঃ সুবৃংহিণা' ॥ অর্থাৎ সদ্য প্রস্ফুটিত, অমৃতময় এই লীলাকমল গ্রহণ পূর্বক এর দ্বারা তুমি জৈগীষব্যের সমগ্র শরীরে বুলিয়ে দাও। মহাদেবের আদেশে নন্দী সেই লীলাকমল স্পর্শ করাতেই, গ্রীষ্মান্তে বৃষ্টির জল পেলে বিবরস্থ ভেককুল যেমন উল্লসিত হয়, তেমনি লীলাকমলের স্পর্শ মাত্রেই জৈগীষব্যের সারা শরীরে আনন্দের বাণ ডাকল। সেই অবস্থাতেই নন্দী তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আকাশপথে এই অনাদি লিঙ্গের সামনে এনে উপস্থিত করলেন। গিরিজালিঙ্গিত বামার্ধ ভগবান শূলপাণিকে দিব্যনেত্রে দর্শন করে জৈগীষব্য সে সময় যে দীর্ঘ স্তব পাঠ করেছিলেন, আজ ভস্মারতির সময় শুনবে গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত সেই মন্ত্রের একটি স্তবক পাঠ করতে করতে পুরোহিতজী আরতি করবেন। তারপর তিনি বৃহতী ছন্দে যে বেদমন্ত্রটি পাঠ করবেন তা সামবেদের অন্তর্গত পূর্বাচিকে ঐন্দ্রকাণ্ডের ২৩৩ নম্বর মন্ত্র।

জৈগীষব্যের পুণ্যজীবন বর্ণনা করেই মহাত্মা চলে গেলেন তাঁর ঘরে। হরানন্দজী চোখের ইসারা করে মুখ টিপে আমাকে বললেন – আমাদের এই গুণমণিও জৈগীষব্যেরই একটি পকেট সংস্করণ। মনে আছে ত, ইনি চোখে ভাল করে দেখতে পান না সেখানকার পুরোহিতের কাছে শুনে হিরণ্ময়ানন্দজীর চাপে শুকদেবেশ্বর থেকে এঁকে এড়িয়ে চলে এসেছিলাম, কিন্তু রুণ্ড গ্রামে এসে দেখলাম, আমাদের আগেই তিনি সেখানে পৌঁছে গেছেন। রুণ্ড গ্রাম থেকে নরবাড়ী মহল্লায়, নরবাড়ী থেকে পৈচায় পুতিকেশ্বর মন্দির,

পুতিকেশ্বর মন্দির থেকে কটোরায় হনুমন্তেশ্বর মন্দির সর্বত্র আমরা তাঁকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করলেও তিনি সর্বত্র আমাদের আগে আগে পৌঁছে গেছলেন। কটোরার হনুমন্তেশ্বর মন্দির থেকে ইনি এ পর্যন্ত সর্বত্র আমাদর সঙ্গে সঙ্গে আছেন। ক্রমশঃ এঁর গুণের পরিচয় পেয়ে এখন বলতে গেলে আমরা ওঁর ভক্তই হয়ে গেছি। আমাদের বুড়ো স্বামীজী তো আগে ওনাকে দুচোখ মিলে দেখতেই পারতেন না, এখন ত সুযোগ পেলেই পদধূলি নেন। যাক্‌গে এখন রাত্রি ১২টা বেজে গেল। এবার শুয়ে পড়া যাক। আবার রাত্রি ৩টায় উঠতে হবে। যদি ঘুমিয়ে পড়ি ডেকে দিও ভাই।

সকলেই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। রাত্রি সোওয়া তিনটায় খান্দেশ থেকে যে সাধুরা এসে নীচের তলায় রয়েছেন, তাঁদের কোলাহলে আমরাও উঠে পড়লাম। দরজা খুলে দেখি, নাঙ্গা সাধু দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা হ্যারিকেন এবং টর্চ হাতে নিয়ে কোনমতে মন্দিরে গিয়ে পৌঁছলাম। চারদিকে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার, তার উপর হিমেল বাতাসের ঝাপটা। মনে হচ্ছে যেন বরফের বৃষ্টি হচ্ছে। যাত্রী-নিবাস থেকে মন্দিরে আসতেই শিশির ভেজা পথে আসতে গিয়ে মনে হল পাগুলো অসাড় হয়ে গেছে। পুরোহিতজীর নির্দেশে কম্বলাদি সকল গাত্রবস্ত্র বারান্দায় রেখে দিয়ে নগ্ন গাত্রেই মন্দিরে গিয়ে ঢুকলাম সবাই। গুড়গুড় শব্দে কাড়া নাকাড়া বেজে উঠল। একসঙ্গে বেজে উঠল শিঙা ডম্বরু ও বিষাণ এবং তার সঙ্গে দুটি বৃহদাকারের করতাল। সব যন্ত্রই তালে তালে এমন গুরুগম্ভীর শব্দে বাজছে যে, এখন রাত্রি সাড়ে ৩টা বাজলেও মনে হচ্ছে যেন নিশীথে কোন শ্মশানে তাল বেতাল এবং ভৈরবরা সব একতালে নাচতে আরম্ভ করেছে। ঘন ঘোর জঙ্গলের মধ্যে এক ভয়ংকর পরিবেশ এবং পটভূমিকায় বম্‌বম্, গুড়গুড়, গুব্‌গুব্ ধ্বনি উঠতে মনে হল, আমরা যেন কোন ভুতুড়ে অলৌকিক স্থানে দাঁড়িয়ে আছি। কর্পূরের আরতির পরেই অঘোরাপন্থী সাধু সেই ভস্মের পুটলি নিয়ে এসে শূলপাণীশ্বরের গায়ে ছড়াতে ছড়াতে তাথৈ তাথৈ নৃত্য সুরু করলেন পুরোহিতজীর সঙ্গে। আমরা পরিক্রমাবাসীরাও তালে তালে নাচতে সুরু করে দিয়েছি, হাততালি দিচ্ছি, পা ঠুকে তাল দিচ্ছি, মুখে বলছি হর নর্মদে হর নর্মদে কখনও বা হর হর ববম্ বম্। তারপর পুরোহিতজীর ইঙ্গিতে সকলে হাত ধরাধরি করে শূলপাণীশ্বরকে মাঝখানে রেখে বৃত্তাকারে ঘিরে নাচতে লাগলাম। নাগা বাবা এবং পুরোহিতজীও আমাদের সঙ্গে বৃত্তাকারে নেচে নেচে প্রদক্ষিণ করছেন। সকলের মধ্যেই একটা ভাবের উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে, দুর্দণ্ড নৃত্যে আমরা যেন অধীর হয়ে পড়েছি। সেই নিদারুণ শীতের রাতেও আমাদের গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। অঘোরী সাধু ভস্ম ছড়িয়ে ছড়িয়ে শূলপাণীদেবকে প্রায় যখন ঢেকে ফেলেছেন, তখন পুরাহিতজী মহর্ষি জৈগীষব্যের সেই স্তব পাঠ করতে লাগলেন –

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় সর্বজ্ঞায় শুভাত্মনে।
জগদানন্দকন্দায় পরমানন্দ হেতবে ॥
অরূপায় স্বরূপায় নানারূপ ধরায় চ।
বিরূপাক্ষায় বিধয়ে বিধি বিষ্ণুস্তুতায় চ ॥
স্থাববায় নমস্তুভ্যং জঙ্গমায় নমোঽস্তুতে।
সর্বাত্মনে নমস্তুভ্যং নমস্তে পরমাত্মনে ॥

অর্থাৎ শান্ত শুভাত্মা সর্বজ্ঞ শিবকে প্রণাম। প্রণাম করি জগদানন্দ পরমানন্দের হেতু ভূত মহেশ্বরকে। হে প্রভো! রূপহীন অথচ স্বরূপ! নানারূপধর! বিধিবিষ্ণুস্তুত! হে বিরূপাক্ষ! হে বিধে! আপনাকে প্রণাম। হে স্থাবর জঙ্গম রূপিন্! আপনাকে প্রণাম। হে সর্বাত্মন্! হে পরমাত্মন্! আমাদের প্রণাম গ্রহণ করো প্রভো!

আমরা তখনও বৃত্তাকারে যেন কোন আবেগের ঘোরে নেচে চলেছি। পুরোহিতজীর স্তব পাঠ শেষ হল, সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। আমরা স্তম্ভিত ও

বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। স্তবপাঠ শেষ হতেই পুরোহিতজী নতজানু হয়ে বৃহতী ছন্দে গেয়ে উঠলেন সেই সামবেদের মন্ত্র –

ওঁ অভিত্বা শূর নোনুমোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ।
ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানামিন্দ্র তস্থুষঃ॥

অর্থাৎ দোহন করা হয় নি এমন দুগ্ধবতী গাভীদের মত ভক্তিবিনম্র চিত্তে, হে ঈশান! আমরা তোমার চরণতলে এসে উপস্থিত হয়েছি। হে ইন্দ্র, তুমি জঙ্গমের ঈশ্বর, তুমি স্থাবরের ঈশ্বর, তুমি সর্বদর্শী।

মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন পুরোহিতজী। তিনি সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের ভিতর আর একবার বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। হকচকিয়ে গিয়ে আমরাও প্রণাম করলাম ভগবান শূলপাণীশ্বর মহাদেবকে। বেদমন্ত্র আর পাঁচটা সংস্কৃত মন্ত্রের মত নয়, বিশেষতঃ সামবেদের মন্ত্র তো পরিপূর্ণ সংগীত। যে কোন গানের যেমন স্বর, মাত্রা, ছন্দ, সুর, তাল ও লয় থাকে, তেমনি সামবেদের মন্ত্রও যথোপযুক্ত সুর ও ছন্দে গাইতে হয়। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ দৃষ্ট এই মহামন্ত্রটি বলা বাহুল্য, পুরোহিতজী যথোপযুক্ত শ্রুতিমধুর বৃহতী ছন্দেই গাইলেন।

মন্দিরের বাইরে এসে দেখি, চারদিক কুয়াশায় ঢেকে থাকলেও সকাল যে হয়ে গেছে তা বুঝা যাচ্ছে। পাখীর ডাকে সমগ্র জঙ্গল মুখর। নাঙ্গা বাবা তাঁর অভ্যাস মত নর্মদার ঘাটে স্নান করতে যেতে উদ্যোগী হতেই তাঁর শরীরের টলটলায়মান অবস্থা দেখে আমরা তাঁকে ধরে ধরে যাত্রী-নিবাসে এনে তাঁর ঘরে ঢুকিয়ে শুইয়ে দিলাম, মেঝের উপর। তাঁর তখন পরিপূর্ণ ভাবোন্মাদ অবস্থা।

আমরাও আমাদের ঘরে ঢুকে যে যার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। সারাদিন ধরে ভৃগুতুঙ্গ ও ভৃগু পর্বতে ঘুরে পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা করার ধকল, তার উপর রাত্রি সাড়ে ৩টা থেকে সকাল পর্যন্ত ভস্মারতি দর্শনে রাত্রি জাগরণের যে ক্লান্তি তাতে পরিশ্রান্ত হয়ে আমরা সবাই শোওয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল আমারই সবার শেষে বেলা তখন ১০টা বাজতে যায়। আমার কিছুক্ষণ আগে উঠেছেন আর দুজন পঞ্চক্রোশী অর্থাৎ স্বামী হরানন্দজী ও প্রেমানন্দ। জেগে উঠে শুনলাম, বেলা প্রায় ৮টা নাগাদ ব্যুত্থিত হয়ে নাগা বাবা নর্মদা স্নান করে শূলপাণীশ্বরকে দর্শন ও প্রণাম করে এসেছেন। অন্যান্য সকলেরই স্নানাদি পর্ব শেষ হয়ে গেছে! খান্দেশ থেকে যে ৬জন সন্ন্যাসী এসেছেন তাঁদের ও আমাদের আজ একসঙ্গে রান্নার ব্যবস্থা হয়েছে। খান্দেশের দুজন সন্ন্যাসী সহ আমাদের দুজন ব্রহ্মচারী রুটি তৈরী করছেন।

আমরা তিনজন তাড়াতাড়ি নর্মদাতে স্নান করতে গেলাম। পূর্বেই বলেছি, মন্দিরের পিছনেই নর্মদা বয়ে চলেছেন। উত্তরতটের পর্বতশ্রেণী এবং এই তটের পর্বতশ্রেণীর মধ্যে তিনটে চট্টানের উপর দিয়ে নর্মদার জল অত্যন্ত খরবেগে বইছে। আমরা এক হাঁটু জলে নেমে সাবধানে স্নান করে এসে মন্দিরে প্রণাম করলাম শূলপাণীশ্বরকে। আমি ঝোলা থেকে মহাত্মা প্রলয়দাসজী প্রদত্ত মহর্ষি তণ্ডিকৃত হাজার আট শ্লোকরাজি বের করে পাঠ করতে লাগলাম, হরানন্দজী ও প্রেমানন্দ বসে বসে জপ করতে লাগলেন। পুরোহিতজী তখন মন্দিরের পূজা করছেন। আমাদের পাঠ ও জপ শেষে যাত্রী-নিবাসে যখন ফিরে এলাম তখন বেলা দেড়টা।

এসেই আমরা ভোজনে বসলাম। নিচের তলায় রুটি গুড় খেয়ে যখন দোতলায় উঠে এলাম হরানন্দজী বললেন – সন্ন্যাসীদের দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ। নর্মদা পরিক্রমায় এই জঙ্গল খণ্ডে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে কখন কখনও নিতান্ত শারীরিক কারণে আমরা এ নিয়ম ভাঙতে বাধ্য হয়েছি বটে কিন্তু আজ ত বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছি, এখন শোওয়ার কোন

প্রয়োজন নাই। কাশীতে মঠে থাকাকালে আমরা যেমন গুরুদেবের মুখে নানা সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করে সময় কাটাতাম, আজ আমরা সেইভাবেই কাটাব। আমি পাশের ঘরে গিয়ে নাঙ্গা মহাত্মার কাছে প্রার্থনা করে দেখি তিনি আমাদেরকে কোন শাস্ত্র কথা শোনাতে রাজী হন কি না। সত্যি সত্যিই কয়েক মিনিটের মধ্যেই হরানন্দজী তাঁকে হাজির করলেন আমাদের ঘরে। তিনি বসতে বসতে বললেন – তোমরা কোন প্রশ্নের অবতারণা কর, আমি সেই প্রসঙ্গেরই কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব।

মিনিট খানিক চিন্তা করে হরানন্দজীই বললেন – মহাত্মন! গতকালই আপনার সঙ্গে পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা করতে গিয়ে ভৃগুতুঙ্গ পর্বতে মহর্ষি দীর্ঘতমার সাধনগুহা দেখে এলাম। আপনি মহাভারতের আদিপর্ব হতে বেদব্যাস বর্ণিত দীর্ঘতমার কাহিনী শোনালেন যে তিনি মহর্ষি উতথ্যের ঔরষে মমতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘতমা যখন গর্ভে ছিলেন তখন উতথ্যের ছোটভাই দেবগুরু বৃহস্পতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া মমতার বাধা সত্ত্বেও তার সঙ্গে সুরতক্রিয়া করেন কিন্তু গর্ভস্থ শিশু তার পা দিয়ে পিতৃব্যের শুক্ররোধ করেন। শুক্র প্রবেশ পথ না পেয়ে ভূতলে পড়ে যায়। তখন বৃহস্পতি রাগ করে শিশুকে শাপ দেন – তুমি অন্ধ হবে। সেই জন্মান্ধ উতথ্য-পুত্রের নাম হয় দীর্ঘতমা। তিনি বড় হয়ে বেদবিৎ মহর্ষি হন। তিনি যে মহাতপস্বী ছিলেন, তার জাজ্বল্য প্রমাণ দুর্গম জঙ্গলে উত্তুঙ্গ পর্বত শিখরে তাঁর সাধনগুহা তো নিজের চোখেই দেখে এলাম। দীর্ঘতমা বেদজ্ঞ এবং মহর্ষি হয়েও ধর্ম শিক্ষা করে যত্রতত্র কামচর্চা করে বেড়াতেন। তাতে তাঁর পত্নী তাঁকে ভেলায় বেঁধে জলে ভাসিয়ে দেন। বলিরাজা তাঁকে জল থেকে উদ্ধার করে নিজের বংশরক্ষার জন্য মহারাণী সুদেষ্ণাকে তাঁর কাছে পুত্রার্থে পাঠিয়ে দেন ইত্যাদি।

এইসব শ্লীলতা বিরোধী উপাখ্যানকে আপনি প্রক্ষিপ্ত বলে অভিমত প্রকাশ করলেও ঐ আদিপর্বেই দাসরাজার কন্যা সত্যবতীকে কুমারী অবস্থাতে মহর্ষি পরাশরের বলাৎকার, তার ফলে দ্বৈপায়ন ব্যাসের জন্ম, পুত্র বিচিত্রবীর্যের অকালমৃত্যু হলে তাঁর অম্বিকা অম্বালিকা নামক দুই বিধবা পুত্রবধূর কাছে তাঁর কানীন পুত্র বেদব্যাসকে পাঠিয়ে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুর প্রভৃতির জন্মদান, দুর্বাশার কাছে সিদ্ধমন্ত্র শিখে কুমারী অবস্থাতে সূর্যকে আকর্ষণ করে তাঁর সঙ্গে সহবাস করে কর্ণ নামক পুত্র, বিবাহের পরে ধর্মের সঙ্গে সহবাস করে যুধিষ্ঠির, পবন দেবতার সঙ্গে সহবাস করে ভীম, ইন্দ্রকে আকর্ষণ করে তাঁর সঙ্গে সহবাসে অর্জুন, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সঙ্গে সহবাসে নকুল ও সহদেব এই পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম দেন মাতা কুন্তী। দ্রৌপদী একসঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবকে বিবাহ করে প্রত্যেক ভাই-এর সঙ্গে এক এক মাস করে বাস করতেন। কাজেই মহাভারতে আদিপর্বের এতগুলি ঘটনার সবকটিকে কি আপনি প্রক্ষিপ্ত বলে চাপা দিবেন! যদি ঘটনাগুলি সত্য হয়, সত্যি সত্যি এগুলি মূল মহাভারতে থাকে, তাহলে ত আমাদেরকে ঘাড় নীচু করেই স্বীকার করতে হবে যে প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা ও কৃষ্টি অতি নিম্নস্তরের ছিল; সে যুগে নিয়োগপ্রথা ছিল, মেয়েরা যদৃচ্ছা কামভোগের সুযোগ পেলেই মত্ত হয়ে পড়তেন, সংযম শুচিতা একনিষ্ঠ প্রেম, পাতিব্রত্যের কোনও বালাই ছিল না। অথচ আমরা জানি মহাভারত মূলতঃ আমাদের জাতীয় ইতিহাস। এই মহাভারতেই বলা হয়েছে – যদিহাস্তিতদন্যত্র, যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ (স্বর্গারোহন পর্ব ৫অ, ৫০ শ্লোক)। অর্থাৎ যা আছে ভারতে, তা আছে ভারতে। যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে। এই মহাকাব্যের প্রণেতা স্বয়ং বেদব্যাস, যিনি ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ ধর্মের অনুশাসয়িতা। মানবনীতি শাস্ত্রের এমন কোন দিক নাই, যার মহত্তম প্রকাশ ও বিকাশ এই মহাকাব্যে ঘটেনি। আর শুধু কাব্যসাহিত্যের দিকটা বিচার করলে আমাদের এই মহাকাব্যের সঙ্গে পৃথিবীর যে কোন ভাষায় প্রকাশিত কোন কাব্য ও মহাকাব্যের কোন তুলনাই হয় না। এই মহাকাব্যে যে চরিত্রসম্পদ, যে আদর্শের কথা আছে তারও কোনও তুলনা হয় না।

আদর্শস্বরূপ যেখানে ঐ আদিপর্বে সত্যবতী তাঁর কানীন পুত্র বেদব্যাসকে ডেকে বিচিত্রবীর্যের দুই বিধবা পত্নীর গর্ভে পুত্রোৎপাদনের জন্য প্ররোচিত করেছিলেন, সেখানেই আছে ব্যাসকে আহ্বানের পূর্বে তিনি ভীষ্মকে ডেকে ঐ কাজ করতে বলেছিলেন। তার উত্তরে ভীষ্ম বলেছিলেন — আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে কখনও দার পরিগ্রহ করব না, কোন নারীদেহ স্পর্শ করব না। পৃথিবী যদি গন্ধ ত্যাগ করে, জল যদি রস ত্যাগ করে, বায়ু যদি স্পর্শ গুণ ত্যাগ করে, সূর্য যদি তেজ ত্যাগ করে, ধূমকেতু যদি উষ্ণতা ত্যাগ করে, আকাশ যদি শব্দ গুণ ত্যাগ করে, চন্দ্র যদি শীতাংশু ত্যাগ করে, ইন্দ্র যদি বিক্রম ত্যাগ করে, এমন কি স্বয়ং ধর্মরাজও যদি ধর্ম ত্যাগ করেন, তবুও কিছুতেই আমি সত্য ত্যাগ করতে পারব না — ন ত্বহং সত্যমুৎসৃষ্টুং ব্যবসেয়ং কথঞ্চন।

যিনি এই মহত্তম ভীষ্ম চরিত্রের আদর্শ অঙ্কন করেছেন, তিনিই আবার একই পর্বের মধ্যে দীর্ঘতমাকে বেদবিৎ মহর্ষি আখ্যা দিয়েও তাঁর কদর্য চরিত্র আঁকলেন কি করে ? কি করেই বা সুদেষ্ণা, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতির ন্যক্কারজনক ছবি ফোটালেন ? তাই অপবাদ ক্ষালনের জন্য একদল পণ্ডিত যেমন ঐ সব কাহিনীকে প্রক্ষিপ্ত বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন তেমনি আর একদল পণ্ডিত ঐ সব ঘটনার যৌগিক বা আধ্যাত্মিক অর্থ দিতে গলদ্‌ঘর্ম হয়েছেন। এই সব দেখে শুনে, আমাদের দেশের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মহাকাব্যের অনুপম ভাবসম্পদের দিকেই মূলতঃ দৃষ্টি দিতে বলেছেন। প্রসঙ্গক্রমে মন্তব্য করেছেন - যৌগিক অর্থের কোন কসরৎ কষে এই প্রাণ-গঙ্গার ধারাকে কুহকাচ্ছন্ন করা উচিৎ নয়।

এই বলে হরানন্দজী নাঙ্গা মহাত্মাকে হাতজোড় করে বললেন — এখন আপনি এ বিষয়ে যদি কথঞ্চিৎ আলোকপাত করেন, তাহলে ধন্য হই।

নাঙ্গা মহাত্মা সকল কথা মনোযোগ পূর্বক শুনে বলতে আরম্ভ করলেন — মহাভারতকে শুধু ইতিহাস বা নানা রোচক উপাখ্যানের গল্প হিসাবে দেখলে চলবে না, এই মহাকাব্যের প্রতিটি ঘটনার কেবল স্থূল, আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক অর্থ করলেই চলবে না, কবিগুরু যাই মন্তব্য করে থাকুন, এর প্রতিটি বর্ণনার মূলে যে সব নিগূঢ় আধ্যাত্মিক রহস্য আছে, তারও সন্ধান অবশ্যই নিতে হবে। কারণ, মনে রাখতে হবে এই মহাগ্রন্থের প্রণেতা আর কেউ নন, স্বয়ং বেদব্যাস। তিনি শুধু ঋষি নন, ঋষীনাং ঋষি। ঋষি প্রণীত শাস্ত্রে বর্ণনা গুণে মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সকল উপদেশ থাকতে পারে, থাকতে পারে সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, বিজ্ঞানতত্ত্ব ও বিশ্বজনীন ভাবধারা, চাই কি সমকালীন সমস্যাকে চিরকালীন সমাধানেও পরিণত করতে পারেন, কিন্তু সেটা হল তাঁদের রচনার 'উপাদেয়ত্ব', অনুপমত্ব। কিন্তু সেটাই তাঁদের গ্রন্থের সব কথা বা শেষ কথা নয়। গঙ্গা যমুনার মিলিত ধারার অন্তরালে যেমন সরস্বতীর গুপ্তধারাটি বয়ে চলে, এখানে যেমন নর্মদা ও দেবগঙ্গার মিলিত ধারার অন্তরালে সরস্বতী গঙ্গার গুপ্তধারাটি প্রবহমানা, তেমনি সকল কিছু জ্ঞানতত্ত্ব ও কর্মতত্ত্বের বহুতর জটিল বর্ণনার অন্তরালে গ্রন্থকর্তা মহর্ষি তাঁর জীবনের উপলব্ধ সত্য-যোগলব্ধ মহাজ্ঞানের দীপ্ত রশ্মিটিকেও মিলিয়ে দেন। সেটাই তাঁদের লক্ষ্য, আর সব উপলক্ষ্য। এখন আমরা যদি লক্ষ্যকে উপেক্ষা করে উপলক্ষ্যকেই সার বা সর্বস্ব ভেবে বসে থাকি, সেটা আমাদের অক্ষমতা। এই অক্ষমতা ক্রান্তদর্শী ঋষির প্রতি অবিচারও বটে।

ভেবে দেখুন, মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের যে মুখ্য বর্ণনাটা আমরা পাই, সেটা আসলে কি ? আসলে তো তা ব্যাস বংশেরই মারামারি আর কাটাকাটির ইতিহাস। কারণ, যুধ্যমান দুটি দলের একদল হলেন পাণ্ডুর পুত্র আর একদল ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র। পাণ্ডু এবং ধৃতরাষ্ট্র উভয়েই ব্যাসদেবেরই বংশধর, তারই ঔরসজাত পুত্র। সুপণ্ডিত কথক ঠাকুররা শ্রোতাদেরকে রসিয়ে রসিয়ে অনেক কথাই বলেন কিন্তু কথক ঠাকুররা বা তাঁদের শ্রোতারা

একবারও ভেবে দেখেন না যে – যে মহাভারত ব্যাস বংশেরই গৃহবিবাদের ইতিহাস, তা আবার ব্যাসেরই রচিত। সিদ্ধতপস্বী আর কিছু কাজ পেলেন না। তাঁর ইতিহাস লেখার ইচ্ছা থাকলে, সমকালীন ভারতবর্ষের আর কিছু উপাদান তাঁর চোখে পড়লো না, তিনি নিজের গুণবন্ত বংশধরগণের মতিচ্ছন্ন কাণ্ডকারখানা আর হানাহানির কুলজিনামা তৈরী করতে বসে গেলেন। চৈতন্যের শিখরভূমিতে উঠেও তাঁর মন লেগে গেল পাঁক ঘাটতে। আচ্ছা, একী সম্ভব ? সম্ভব কি না, ঋষি তা করেছেন কি না তা দেখবার জন্য আসুন আমরা এই অমর মহাকাব্যের 'প্রস্তাব', 'প্রারম্ভ' আর 'উপসংহার' পর্যালোচনা করে দেখি।

'আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তু নির্দেশোঽবাপি তন্মুখম্' – চিরায়ত সাহিত্য রচনার এই হল সর্বজনস্বীকৃত নীতি। এর অর্থ, কোন বিষয়ের সূচনা করার পূর্বে 'আশীর্বাদ', 'নমস্ক্রিয়া' অথবা বস্তুনির্দেশ করতে হয়। বক্তব্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণকে, তাৎপর্য বর্ণনাকেই বস্তু নির্দেশ বলা হয়। মহাভারতে এই বস্তু নির্দেশ কিভাবে করা হয়েছে, তারই একটু সন্ধান নেওয়া যাক। প্রথমেই পাই – একদা কুলপতি শৌনক নৈমিষারণ্যে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞবাসরে লৌমহর্ষণ-পুত্র পৌরাণিক উগ্রশ্রবাঃ সৌতি হঠাৎ এসে উপস্থিত হন। তাঁকে পেয়ে ঋষিরা খুব খুশী। সৌতি তাঁদেরকে জানালেন – 'মহর্ষিগণ ! আমি মহারাজ জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে গিয়েছিলাম। সেখানে বৈশম্পায়নের মুখে বেদব্যাস রচিত মহাভারত শুনলাম।' ঋষিগণ তা শুনে সাগ্রহে তাঁকে বললেন – 'সৌতি ! জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে তুমি ব্যাস রচিত যে মহাভারত শুনেছ, আমরা তাই শুনতে ইচ্ছা করি।'

সৌতি সুরু করলেন –

অসচ্চ সদসচ্চৈব যদ্বিশ্বং সদসদ্‌পরম্।
পরাবরানাং স্রষ্টারং পুরাণং পরমব্যয়ম্ ॥

অর্থাৎ, যিনি এই চরাচর স্থাবর জঙ্গমের স্রষ্টা, যিনি সদ্ ও অসদ্ বিশ্বরূপ, যিনি অনাদি অনন্ত অব্যয় পুরাণ-পুরুষ – সেই পরব্রহ্মকে স্মরণ করে এই মহাভারত বলছি।

স হি সত্যমমৃতঞ্চৈব পবিত্রং পুণ্যমেব চ।
শাশ্বতং ব্রহ্ম পরমং ধ্রুবং জ্যোতিঃ সনাতনম্ ॥ (১/২৫৭)
যস্য দিব্যানি কর্মানি কথয়ন্তি মনীষিণঃ ॥
অসচ্চ সদসচ্চৈব যস্মাদ্বিশ্বং প্রবর্ততে।
সন্ততিশ্চ প্রবৃত্তিশ্চ জন্মমৃত্যু পুনর্ভবাঃ ॥ (১/২৫৮)
অধ্যাত্মং শ্রূয়তে যচ্চ পঞ্চভূতগুণাত্মকং।
অব্যক্তাদি পরং যচ্চ স এব পরিগীয়তে ॥ (১/২৫৯)

– যিনি সত্য, অমৃত, পবিত্র পুণ্যস্বরূপ, তিনি নিত্য পরমব্রহ্ম সনাতন ধ্রুব জ্যোতিঃ। মুনি ঋষিরা তাঁরই দিব্য কর্মসমূহের বর্ণনা করে থাকেন। যাঁ হতে সদ্ ও অসদ্ চরাচর বিশ্বের জন্ম হয়েছে, যিনি জন্মমৃত্যুর প্রবর্তন করে সকল জীবের সৃষ্টি ও বিনাশ করেন, তিনি অধ্যাত্ম পঞ্চভূতাত্মক অব্যক্ত পরব্রহ্ম বলে এই গ্রন্থে গীত হয়েছেন।

প্রারম্ভেই পাওয়া গেল – মহাভারতের রচয়িতা ঋষি বেদব্যাস্। বক্তা ঋষি সৌতি। তিনি মহাভারতের বিবরণ শুনেছিলেন অপর একজন ঋষি বৈশম্পায়নের মুখে। এখন তিনি তা বলতে লাগলেন উগ্রতেজা মহর্ষিদেরকে। স্থান – নৈমিষারণ্য। পুনঃ পুনঃ স্পষ্ট করে বলছেন যে, এই গ্রন্থে যিনি ধ্রুবজ্যোতিঃ পরব্রহ্ম, তাঁরই কথা বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ঋষি আরও মন খুলে চেৎবাণী উচ্চারণ করলেন। পাছে কেউ এই মহাগ্রন্থের রোচক আখ্যান ভাগকে মুখ্য না ভাবেন, পাছে কেউ নিছক নীতিশাস্ত্র বা রাজারাজড়ার কোন ইতিবৃত্ত বললে না ভেবে বসেন, এজন্য যেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছেন – এই গ্রন্থে ব্যাসদেব

পরব্রহ্মতত্ত্বই প্রতিপাদিত করেছেন। কারণ ঋষির মুখে কানু ছাড়া কোন গীত থাকে না। লক্ষ্য করুন সৌতি বাক্য, তিনি বলছেন – মুনি ঋষিরা তাঁরই, কেবলমাত্র পরজ্যোতিঃস্বরূপেরই কথা বলে থাকেন – কারণ ঋষির উপজীব্য বস্তু, তাঁর রসের ও রসায়নের আস্পদ পরব্রহ্ম ছাড়া আর কী-ই বা থাকতে পারে ? কস্য দিব্যানি কর্মানি কথয়ন্তি মনীষিণঃ ?

কাজেই এই মহাগ্রন্থের সাধ্যমত আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করা যাক্। প্রথমেই নৈমিষারণ্যের পরিচয় নিই আসুন। এর স্থূল অর্থ ঋষি মহর্ষিদের নিবাসস্থল – একটি পবিত্র তপোবন। গল্পাংশ হচ্ছে যে, সনকাদি ব্রহ্মার চার মানসপুত্রের ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা যখন আর কোথাও রইল না, তখন তাঁদের প্রার্থনায় ব্রহ্মা চক্র নিক্ষেপ করলেন। সেই চক্রের নেমি যেখানে স্থির হল, সেই স্থানই নৈমিষারণ্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করল। ব্রহ্মা নির্দেশ দিলেন – এই অরণ্যই ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠার অনুকূল স্থান। নিমেষ মধ্যে এই বন সৃষ্টি হয়েছিল বলে এর নাম হল নৈমিষারণ্য। অরণ্য শব্দের অর্থ – বন। বন কি ? উপনিষদ বলেন – বন মানে ব্রহ্ম। কেনোপনিষদের ৪/৬ বল্লীতে আছে – 'তদ্ হ তদ্ বনং নাম, তদ্বনমিতি উপাসিতব্যম্'। এই ব্রহ্মে বিচরণের নামই ব্রহ্মচর্য। গুরুকৃপায় জীব-চৈতন্যের – ধারা যখন ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী স্থানে সহসা কেন্দ্রীভূত হয়, তখন চক্রাকারে একটি জ্যোতির বলয় সাধক মাত্রেরই দৃষ্টিগোচর হয়। এই অখণ্ডমণ্ডলাকার চিদ্‌জ্যোতিঃ দর্শন হলে তবেই ব্রহ্মচর্যের প্রতিষ্ঠা। এই অখণ্ডমণ্ডলাকার জ্যোতিঃ দর্শন গুরু করান বলেই গুরুর প্রণাম মন্ত্রে বলা হয়েছে – অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। এই হল ব্রহ্মার চক্রের রহস্য। ব্রহ্মচক্রের নেমি হল – সত্য। উৎক্রমণের পথে ব্রহ্মার চক্রই হল First Axis of Ascent. এই ব্রহ্মার চক্রই দিব্যপুরুষের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। উগ্রতেজা মুনি ঋষিদের এই ভূমিই বাঞ্ছিত ভূমি। এই পুণ্য ক্ষেত্রই নৈমিষারণ্য। এই চক্র বিচ্ছুরিত জ্যোতির ধারাই সাধককে একদিকে যেমন মধুচ্ছন্দার উৎসর্পিনী গতি দান করে তেমনি অন্যদিকে এই নিয়ত ঘূর্ণমান জ্যোতিশ্চক্রের অবিরাম রসই সৃষ্টি স্থিতির নিয়ামক। যাতে কেউ এই নৈমিষারণ্যকে নিছক একটা ভৌম স্থান বলে না ভুল করেন, এজন্য ব্যাসদেব আদিপর্বের ৩৮, ৩৯ এবং ৪০ অধ্যায়ে ঐ ব্রহ্মার চক্রের রহস্য খুলে বলে দিয়েছেন –

> যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিদ্ভূতং স্থাবর জঙ্গমং।
> পুনঃ সংক্ষিপ্যতে সর্বং জগৎপ্রাপ্তে যুগক্ষয়ে॥ (১/৩৮)
> এবমেতদনাদ্যন্তং ভূতসংহার কারকং।
> অনাদি নিধনং লোকে চক্রং সম্পরিবর্ততে॥ (১/৪০)

অস্য অর্থঃ, প্রলয়কালে এই বিশাল বিশ্বসংসার একমাত্র পরমব্রহ্মে লীন হবে, কোন পদার্থের কোন-চিহ্নের বর্তমান থাকবে না। একবার সৃষ্টি, তারপর প্রলয়, আবার উৎপত্তি আবার স্থিতি আবার লয় – এইভাবে সংসার চক্র সর্বদা নিয়ত ঘূর্ণমান হচ্ছে। ব্রহ্মার চক্র তারই প্রতীক। ব্রহ্মবিচ্ছুরিত জ্যোতিঃ থেকেই এই চক্র নিত্য গতিশীল। নৈমিষারণ্যের এই হল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব।

[এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা সসঙ্কোচে নিবেদন করি। আমাদের জাতীয় পতাকায় আজ যে ধর্মচক্র স্থান পেয়েছে, এই ধর্মচক্র বুদ্ধদেবের প্রবর্তিত ধর্মচক্র বা অশোকচক্র নয়। বর্তমান যুগের Modern পণ্ডিতরা যাই বলুন – এই চক্র যে ব্রহ্মা প্রবর্তিত চক্রের প্রতীক, এ কথা ভারতের প্রকৃত যোগীরা জানেন। তপোনিষ্ঠ গুহ্য যোগীমণ্ডলীতে এই চক্রের প্রতীক সাধনচিত্র হিসাবে সুপ্রচলিত। তফাৎ এই যে, এই ব্রহ্মার চক্রে পশুশক্তির প্রতীক সিংহের ত্রিমূর্তির উপর আঠারোটি নেমি যুক্ত চক্র স্থাপিত। চক্রের

মধ্যস্থলে ভারতের শাশ্বত বাণী – সত্যমেব জয়তে ; চক্রের একদিকে একটি অশ্ব – গতির প্রতীক। অন্যদিকে একটি বৃষরাজ, যা ধর্মের প্রতীক। দুর্ভাগ্যবশতঃ অশোকচক্র নামে পরিচিত আমাদের জাতীয় পতাকায় ঐ চক্রের উপর সিংহের ত্রিমূর্তি স্থান পেয়েছে। এই চক্রেরও আঠারোটি নেমি, এর একদিকে একটি অশ্ব আর একদিকে বৃষরাজ ; সত্যমেব জয়তে বাণীটিও ক্ষোদাই করা কিন্তু চক্রের উপরে সিংহের ত্রিমূর্তি মুখ ব্যাদন করে আমাদের বহির্মুখতা যেন পরিহাস করে চলেছে।

যাক্ সে কথা। ঐ যে নৈমিষারণ্যের কথা বললাম, ঐ নৈমিষারণ্যেই মহাভারত ব্যক্ত হয়, প্রকট হয়। এইভাবে স্রষ্টা ব্রহ্মা, যে সাধন-চক্রের প্রবর্তন করলেন, তার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ভার দেওয়া হয়েছিল ব্যাসদেবকে। মহাভারতেই পাই, ব্রহ্মা একদিন ব্যাসদেবকে বলেন – 'তুমি তত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি উৎকৃষ্ট তম তত্ত্ব মহাভারত প্রকাশ কর।' কথাটি বিচার করে দেখুন, ব্রহ্মা মহাভারতকে বললেন – উৎকৃষ্ট তত্ত্ব। কেন ? মহাভারত শব্দটির নিরুক্তির মধ্যেই তার জবাব আছে। মহান্ যে ভারত = মহাভারত। ভারত কি ? এটি কি শুধু একটি বই ? পাণিনি অনুসারে 'ভাঃ' মানে দীপ্তি, জ্যোতি বা আলোক। ভাঃ মানে আলোক তাতে রত, অনুরত, এজন্য ভাঃ + অত = ভারত। যা হতে ভাঃ অর্থাৎ দীপ্তি আসে, তিনি সর্বজ্যোতির আধার। শ্রুতির ভাষায় - জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ, স্বয়ং জ্যোতিঃ। এই মহান্ জ্যোতিস্তত্ত্বই মহাভারত। তাই ব্রহ্মা মহাভারত রচনার শেষে আর একবার প্রকট হয়ে ব্যাসদেবকে বলেন – তব কথামৃতং শ্রবণমঙ্গলং। কথা কি ? আমরা কথা বলতে বাক্য বুঝি। কিন্তু 'কথা' শব্দটির নিরুক্তি তা নয়। 'কং' জলং তস্মিন্ প্রলয়ে যোগনিদ্রা অবলম্বনে স্থাস্যতি ইতি। স্থা ধাতু ড, ক প্রত্যয়ে নিপাতনে drop হওয়ায় 'থ' থা হয়েছে। অতএব সেই কারণার্নবশায়ী পরমপুরুষেরই কথা পদবাচ্য। আবার কং সুখং, যিনি সর্বাশ্রয় আনন্দস্বরূপ – একমাত্র যাঁরই স্থা অর্থাৎ নিত্যস্থিতি আছে, তিনিই কথা। কথা শব্দটির বৈদিক নিরুক্তি হচ্ছে – ক ব্যঞ্জন বর্ণের আদ্য অক্ষর। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৪/১০/৫ মন্ত্রে বলা হয়েছে – 'কং' প্রজাপতির বীজ। ঋগ্বেদে এবং অথর্ববেদে এই 'ক' দেবতার উদ্দেশ্যে স্তুতি করে বলা হয়েছে – কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। আধুনিক পণ্ডিতরা এই বেদমন্ত্রের অর্থ করেছেন – কোন্ দেবতাকে আমরা হবি দান করব ? তাঁদের এই কদর্থ হতে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা লিখেছেন – বৈদিক যুগে আর্যরা primitive ছিল। সমুদ্র মেঘ বিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকে দেখে অপার বিস্ময়ে তারা প্রত্যেকটিকেই এক একটি দেবতা বলে ভাবত। তাই ভীত সন্ত্রস্ত এই মানুষগুলি প্রার্থনা করেছিল – কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ! কিন্তু কিম্ শব্দের চতুর্থী যে কস্মৈ, এখানে সেই কস্মৈ নয়। ক শব্দের চতুর্থীর প্রথম বচনেও কস্মৈ হয়। অতএব বৈদিক সূক্তটির অর্থ – ক অর্থাৎ সেই সুখস্বরূপ সেই পরমানন্দ পরুষকেই আমরা আমাদের প্রাণের হবি অর্থাৎ ভক্তি নিবেদন করব। ব্যাসদেব এই 'ক' এর কথাই মহাভারতে লিখেছেন। তাই ব্রহ্মা বলেছিলেন – তব কথামৃতং শ্রবণমঙ্গলং।

এখন এই ব্যাসের একটু পরিচয় নেওয়া যাক্। গল্পাংশ এই, মহর্ষি পরাশর কঠোর তপস্যান্তে যখন তীর্থ পর্যটন করছিলেন, তখন যমুনাতীরে ধীবর দাসরাজার কন্যা সত্যবতীকে দেখে হঠাৎ কামজর্জর হয়ে পড়লেন। স্থান কাল পাত্র ভুলে তিনি সত্যবতীকে সম্ভোগ করতে চাইলে সত্যবতী বললেন – চারদিকে লোকজন আমার লজ্জা করে ! ঋষি বললেন – কুচ পরোয়া নেই। যোগবলে আমি এখনই কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করছি। সত্যবতী তৎক্ষণাৎ আবার বায়না তুললেন – আমি জেলের মেয়ে – আমার গায়ে মৎস্য-গন্ধ, আপনি সে দুর্গন্ধ সহ্য করবেন ? ঋষি বললেন – আমার বরে তোমার বর-অঙ্গ পদ্ম গন্ধে সুরভিত হোক। সত্যবতীর তৃতীয় বায়না হল চারিদিকে জল। কিভাবে কোথায় এই সুরতক্রিয়

চলবে ? ঋষি যোগবলে তখনই যমুনার মধ্য স্থলে এক দ্বীপ সৃষ্টি করে ফেললেন। ঋষির সঙ্গে মিলন হল। এই মিলনের ফলে পূর্ণাবয়ব ব্যাস জন্ম নিলেন। দ্বীপে জন্ম, তাই নাম হল – দ্বৈপায়ন। ব্যাসের এই জন্মবৃত্তান্তটাই একটি ব্যাসকূট বা ধাঁধা। দুশ্চর তপস্যার পর সমগ্র সিদ্ধি যাঁর করতলগত, যিনি যোগবলে মুহূর্তে কুজ্ঝটিকা ও দ্বীপ সৃষ্টি করতে পারেন, মৎস্যগন্ধকে ইচ্ছামাত্রই পদ্মগন্ধে পরিণত করতে পারেন, তিনি কিন্তু এক সুন্দরী কন্যাতে কামশরে জর্জরিত – এ কি সম্ভব ? আবার দেখুন – এই স্থূল গল্পাংশকে যদি সত্যি বলে মানতে হয়, তাহলে মনে প্রশ্ন জাগে – ব্যাসদেব, যাঁকে 'বিশালবুদ্ধি' বলা হয়, স্বয়ং ব্রহ্মা যাঁকে বলছেন তত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ - তিনি কিরকম সুপুত্র যে পিতার ঐ রকম কলঙ্কিত চরিত্র নিজের লেখা বই-এ ঐভাবে বর্ণনা করলেন ? যে কোন সাধারণ লোকও তার পিতার চরিত্রে দোষ থাকলেও তা সতত গোপন করে থাকে। আর সাধারণ লোকের যে Common sense টুকু থাকে, আপনাদের কি মনে হয়, মহর্ষি ব্যাসদেবের তা ছিল না ? স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, ব্যাসের জন্মকাহিনীটাই একটা বড় ব্যাসকূট – একটা জটিল ধাঁধা। স্থূল অর্থগ্রহণ করলে এই বিভ্রাট ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু পূর্বেই দেখিয়েছি, মহাভারত বৈদিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ যোগশাস্ত্র। যৌগিক অর্থগ্রহণ করলেই এই ব্যাসকূটের সমাধান পাওয়া সম্ভব।

অনেকেই জানেন না যে, ব্যাস জননী সত্যবতী দাসরাজের কন্যা নন। তাঁর পিতার নাম উপরিচর। কঠোর তপস্যাবলে পুরু বংশের এই রাজা 'বসু' হন। তাঁর রাজধানীর নাম চেদিরাজ্য। তাঁর রাজধানীর কাছে শুক্তিমতী নামে এক নদী ছিল। কোলাহল নামে এক সচেতন পর্বত কামান্ধ হয়ে এক স্রোতস্বতীর সম্ভোগাভিলাষী হওয়ায় রাজা তার মস্তকে পদাঘাত করেন, পর্বত পদাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়। উক্ত নদীর গর্ভে কোলাহলের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। কন্যার নাম গিরিবালা। উপরিচর গিরিবালাকে বিবাহ করে। এই গিরিবালাই ছিলেন সত্যবতীর মাতা। জন্মের পরেই সত্যবতী পরিত্যক্তা হন। ধীবররাজ তাঁকে পালন করেন।

গল্পটির আজগুবি অংশ বাদ দিয়ে সূক্ষ্ম অংশ গ্রহণ করলে আমরা কি পাই ? উপরিচর কে ? উ – ঊর্দ্ধং পরিপরিতঃ বিচরতি যঃ, স উপরিচরঃ। দেহের উপরিভাগে থেকে, যা কেশ থেকে নখাগ্র পর্যন্ত পরিতঃ অর্থাৎ সর্বত্র যা পরিব্যাপ্ত সেই প্রাণচৈতন্যই উপরিচর। তাঁর রাজধানী চেদি, চিৎ শব্দেরই রূপান্তর। উপনিষদ এই বিশ্বকে বলেছেন চিদ্ জড়ের গ্রন্থি। চিদ্ বা প্রাণচৈতন্য যদি উপরিচর হন, তাহলে গিরিবালা হলেন জড়শক্তি। চিৎ বা চিতিসত্ত্বা জড়ের মধ্যে এমন অন্তঃচারী অবস্থায় থাকে যে, জড়কেই মানুষ দেখে, চিতিশক্তিকে দেখে না। দেখলে তাকে জড় বলেই ভ্রম করে। ভ্রমের অপর নাম শুক্তি। তাই গল্পটিতে উপরিচরের রাজধানীর সন্নিকটবর্তী নদীটির নাম শুক্তিমতী। ভ্রম অন্ধকারতুল্য। কোলং জাড্যং আহলয়তি, উড্ডীনং করোতি স কোলাহলঃ প্রকাশেচ্ছা ইতি। জাড্য অর্থাৎ নিথর জড়শক্তি যখন উদ্ভিন্ন হয়ে নদীর অর্থাৎ গতি বা বেগের সঙ্গে মিলিত হয়, তখনই জড়ের বুকে জাগে প্রাণের স্ফুরণ। স্পর্শমণির স্পর্শে লোহা সোনা হয়, তেমনি প্রাণচৈতন্যের সঙ্গমে জড়েরও চিন্ময়ত্ব ঘটে। জড়ের বুকে এই চিতির বোধনই জীবের নব জন্মান্তর। রূপকের ভাষায় সত্যের এই উন্মেষ অবস্থাই সত্যবতী। ঊর্ধ্বগামী চিৎধারা অর্থাৎ উপরিচর তাই সত্যবতীর পিতা। সাধনার পথে জীবের চিৎধারাটি ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে কিন্তু তখনও সম্পূর্ণতঃ নামরূপ উপাধি বিনির্মুক্ত দুর্লভ অবস্থাটি লাভ হয় নি; দেহের ঘাটে ঘাটে, দেহাত্মবুদ্ধির নিম্নতর ভূমিতে এই যে স্থিতি, এটা হল ধীবর গৃহে সত্যবতীর বাস। তাই সত্যবতী দাসরাজের পালিতা কন্যা। একটি মৎস্যের পেটে তাকে পাওয়া যায়। এই রূপকটি কিসের ইঙ্গিতে দেয় ?

আমরা যতক্ষণ না আত্মজ্ঞান লাভ করি, ততক্ষণ আমরা দেহসর্বস্ব থাকি। জীবের এই দেহসর্বস্ব অবস্থাই মদলিপ্ত মৎস্যভাব। এই অবস্থাটা অর্থাৎ আলোর চুম্বন ভাগ্যে ঘটে নি – অদীক্ষিত সেই অবস্থাটার নামই মৎস্যগন্ধা অবস্থা। মৎস্যগন্ধা পরাশরের স্পর্শে পদ্মগন্ধ হয়েছিলেন। পরাশর কে ? সদ্‌গুরুই পরাশর। পরা অর্থাৎ পরমতত্ত্ব ব্রহ্মকে যিনি শরের ন্যায় সন্ধান করেছেন, পরাতত্ত্বে শরবৎ তন্ময় হওয়ার কৌশলটিও যিনি শিক্ষা দিতে পারেন, সেই ব্রহ্মজ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরুই পরাশর পদবাচ্য। গুরু যখন জীব অবস্থার আবরণ অপাবৃত করে দেন, শিষ্যের তৃতীয় নয়ন উন্মোচন করে তাকে ঋতম্ভরা স্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই মাহেন্দ্র ক্ষণটিই ব্যাসের জন্মলাভ। তাই বেদ এই বৈদিক গুহ্যবিদ্যার নাম দিয়েছেন বৈয়াসকী ক্রিয়া। ভারতের সিদ্ধ যোগাচার্যরা এই রহস্য অবগত আছেন। বাপমায়ের রজোবীর্য সংযোগে যেমন এই দেহের জন্ম, তেমনি পরাশররূপী সদ্‌গুরুর চিন্ময় শক্তিপাতে শিষ্যের দ্বিদলে জ্যোতির্ঘন দিব্যতনু প্রকট হয়।

বলা হয়েছে ব্যাসের জন্ম দ্বীপে। চতুর্দিকে জলবেষ্টিত স্থলকে দ্বীপ বলে। ঘনকৃষ্ণ আস্তরণের যবনিকা ভেদ করে শ্বেত জ্যোতিসমুদ্রের যখন আবির্ভাব হয়, বিন্দুর মধ্যে ঘটে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার স্ফুরণ – সেইটাই হল – দ্বৈপায়ন অবস্থা ! ঋতম্ভরা বেদবাণীও তখনই – কেবলমাত্র তখনই প্রকট হয়। সিদ্ধকাম এ হেন জীবাত্মাই ব্যাস। তখনই তিনি বিশালবুদ্ধি, ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।

শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ বলছেন, আমাদের যে শ্বাসপ্রশ্বাস, তা হল আসলে প্রাণচৈতন্যের gross manifestation আবার আত্মচৈতন্যের grosser manifestation কে প্রাণচৈতন্য বা life - current বলা হয়। এইভাবে যোজনগন্ধা অর্থাৎ যোগসূত্র থাকার ফলে আমাদের বিনা চেষ্টাতেই নিয়ত শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া চলছে। এ যেন অবিরাম জপক্রিয়া। না জপলেও এই জপক্রিয়া চলে। অজপা জপ।

সত্যি কথা বলতে কি, শ্বাস প্রশ্বাস যেন আমাদের বাঁধা দাস। প্রতিদান বা অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই এর মত দাসত্ব আর কেউ করতে পারে না। এ যেন দাসত্বের রাজা ; দাসদের রাজা ! এ হেন শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারাই আমাদের দেহ পালিত। যতক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাসের ডুরি চলছে, ততক্ষণ দেহাত্মবুদ্ধিটিও ষোল আনা বজায় থাকে। দেহাত্মবুদ্ধির জন্যই আমাদের চৈতন্যের ঘাটে উত্তরণ হয় না। নীচের ঘাটে বসে থাকতে হয়। কাজেই এই দেহাত্মবুদ্ধি হল নীচ জাতি ; কারণ বৃত্তি এর নিম্নমুখী। বাহ্যিক শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতীক তাই ধীবররাজ। বহির্মুখ জীবদেহ মৎস্যগন্ধা তাই শ্বাসেরই পালিত কন্যা। গল্পাংশে আছে – মৎস্যগন্ধার ধীবর পিতার একখানি তরণী ছিল। ধর্মার্থী হয়ে তিনি বিনা শুল্কে সকলকে সেই নৌকা দিয়ে পারাপার করতেন। জীবের উপকার করা, জল থেকে বাঁচানো ধর্ম ; শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারাই জীব রক্ষা পায় বেঁচে থাকে। সহজ শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য কাউকে শুল্ক দিতে হয় না। এই শ্বাসপ্রশ্বাস অজ্ঞান অবস্থাতেও দেহের সকল ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। এই অবস্থাটি বুঝানোর জন্যই তরণীর সার্থক উপমাটি প্রয়োগ করা হয়েছে। এই উপলব্ধি এইবার সাধন-জগতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। দেখবেন – ত্রিকুটীতে, ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার ত্রিবেণীসংগমে যখন এই শ্বাস-চৈতন্যের বিলয় ঘটে, তখনই প্রাণচৈতন্যের অয়মন (বিস্তার) হয়। এইভাবেই আবিঃ ছন্দের বিস্তার ঘটে রাত্রিছন্দ বা মধুছন্দের পথে। ঋষি পতঞ্জলির ভাষায় – শ্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ। প্রাণস্য অয়মাৎ উৎক্রমণঃ। বিদৃতিদ্বারেতু আশিরিতি চিদ্‌শিখা।

প্রাণের বিস্তার লাভ ঘটলেই, শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ হলেই জীবের উৎক্রমণ ঘটে। উৎক্রমণ ঘটে বিদৃতিদ্বারের পথে – নিস্তারিণী চিদ্‌শিখার পথ বেয়ে। উজানপথে centrifugal force – আবির তখন centrepetal force এ রূপান্তর ঘটে। এই আবিঃটি

কি ? আবিরিতি প্রকাশস্য মূলারূপেস্চ বিস্তৃতেঃ। অবরোহ পথে ব্রহ্মচৈতন্যের সৃষ্টি – অভিমুখী যে প্রকাশ ও বিস্তৃতি, তারই মূলরূপ এই আবিঃ ছন্দ। 'আবিঃ' এই শব্দটির মধ্যে আছে – আ + বি +র্। এই তিনটি অক্ষর যথাক্রমে বায়ু, বিদ্যুৎ বা আকাশ আর বহ্নি (র্)। মধ্যের অক্ষর বি-বিদ্যুৎ বা ব্যোমরূপী ব্রহ্ম নিজেকে অনন্তরূপে বিস্তার করেছেন। এ বিস্তার কেবল দেশের বিস্তার বা কালের বিস্তার নয়। দেশ কাল কারণাদির যে সীমাহীন ব্যাপ্তি – সেইটিই হল বিশ্বসৃষ্টির মৌলিক আধারপট। অবরোহ পথের আবিচ্ছন্দ অভ্যারোহের পথে ঐ অনন্ত বিস্তারে লয় হয়ে গেলেই গায়ত্রীছন্দের প্রকাশ ঘটে। গায়ত্রীকে বলা হয় বেদমাতা। কারণ, ঐ নিস্তারিণী চিদ্‌শিখাই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার মূলবীজ। বৈদিক ঋষিরা শব্দতত্ত্বের দিক দিয়ে ব্রহ্মের ঐ জ্বলদর্চিমান প্রকাশকে বলেছেন – নাদ। 'আবীরূপেন নাদঃ সমজনি বিততং ব্যোম সর্বাশ্রয়ং যদ্।' কাজেই দেখা যাচ্ছে, মূল প্রাণের অয়মন পরিণতির শিখরভূমিতে গিয়ে যখন জ্যোতির শিখা স্পর্শ করে তখন সাধকের কী ঘটে ? বৈদিক ঋষিরা বলেছেন – তখন জীবাত্মা একবার ব্রহ্মবর্চস্ অর্থাৎ তেজ, একবার নাদ – নাদ হতে পুনরায় ব্রহ্মবর্চস্ বা ব্রহ্মণ্যতেজ বিবর্তিত হতে থাকে। এককথায় তখন একটিমাত্র উপলব্ধি থাকে – তৎ শুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ।

জ্যোতির্ব্যোম্নি স্বকীয়ে কিরসি নিজকনান ভাস্করা যে মহান্তো –
নাদজ্যোতির্বিলোভ্য কলয়সি লহরীঃ কেন্দ্রসান্দ্রাংশ্চ বিন্দূন্॥

অর্থাৎ 'পরমাশ্চর্যময় সেই জ্যোতির্ব্যোমে আমার জ্যোতিঃ যেন সহস্রকণায় বিচ্ছুরিত হয়ে, অন্ত ও বহির্বিশ্বে কত সব মহান্ ভাস্কররূপে প্রকাশ পাচ্ছে। নিজের আনন্দজ্যোতিরূপ ঐ পরমব্যোমকে স্পন্দিত করে আমিই তো হয়েছি নাদ, নাদের লহরী। আবার সেই অসীম বিতত নাদকে কেন্দ্রীভূত করে অহো ! আমি যে ধরিগো বিন্দুরূপ !'

মহেশ্বরের মতে, এই অবস্থাটির নাম – জীবের মহাচেতন সমুত্থান। বোধির বোধনে, তেজ ও অচির তড়িৎ সংঘাতে এই পরম মুহূর্তটিকেই বলা হয়, ভর্গের প্রকাশ – ভর্গদেবস্য ধীমহি। যে মূল ধারাটিকে ধরে ভর্গজ্যোতির এই প্রকাশ ঘটলো, তা হল গায়ত্রী ছন্দ। স্বতোৎসারিত বেদবাণীর গুহ্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ, বিভাগ বা ব্যাসকরণের ক্ষমতা এই সময় থেকেই সাধকের আয়ত্ত হয়। তাই গায়ত্রীকে বলা হয়েছে বেদমাতা। তাই ভর্গকে বলা হয়েছে বেদবিৎ ব্রাহ্মণের সারসর্বস্ব। জীবভাবের পরিবর্তে নিরঞ্জন শিবতত্ত্বে সাধকের এই যে প্রতিষ্ঠা, অথর্ববেদ বলছেন, এইটি 'ব্রহ্মণ্যদেবত্ব'। উষ্ণীথ যোগের এটি একটি চরম ও পরম সাধ্য সাধনতত্ত্ব –

'আনন্দ ব্যোমসান্দ্রঃ ব্রহ্মণ্যদেবোহয়ং নিষ্কলো তু তুরীয়ঃ।'

গুরুকৃপায় জীবের চিদ্‌ভূমিতে ভর্গরূপী ব্রহ্মণ্যদেবের এই পরম প্রকাশই ব্যাসের জন্ম।

কাজেই বুঝে দেখুন, মহাজ্যোতিস্তত্ত্বরূপ মহাভারতের প্রবক্তা ব্যাস ছাড়া আর কেই বা হতে পারবেন ? ভর্গত্ব লাভ না করলে কার পক্ষেই বা বেদবিভাগ সম্ভব ?

এই গুহ্য সাধনতত্ত্বটিই ব্যক্ত করা হয়েছে মহাভারতে সরস গল্প আকারে। বলা হয়েছে – ব্রহ্মার আদেশে ব্যাস যখন মহাভারত লিখবার সংকল্প করলেন, তখন বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তিনি এমন একজনও খুঁজে পেলেন না যিনি দ্রুত শ্রুতলিখনে সিদ্ধহস্ত। অবশেষে তিনি পার্বতীপুত্র গণেশের শরণাপন্ন হলেন। গজানন তাঁর প্রস্তাবে রাজী হলেন বটে কিন্তু সর্ত আরোপ করলেন – মুহূর্ত বিরাম ঘটলেই তিনি লেখা বন্ধ করে অন্তর্হিত হবেন। সঙ্গে সঙ্গে বেদব্যাসেরও সর্ত থাকলো – 'আমি যা বলব, তার যথার্থ অর্থবোধ না করে আপনিও লিখতে পাবেন না'। এই কারণে ব্যাস স্থানে স্থানে প্রায় ৮৮০০টি কূটশ্লোক রচনা করেছেন মহাভারতের মধ্যে। তিনি মন্তব্য করেছেন, আমি সর্বসাধারণের জন্য এই উপাদেয় মহাকাব্য

রচনা করেছি বটে, তবে আমার রচিত কূটশ্লোকগুলির অর্থ কেবল আমি জানি, গণেশ জানেন, সঞ্জয় জানেন না, এমন নি 'শুকো বেত্তি ন বেত্তি বা।'

একদিকে বলছেন, সর্বসাধারণেরে জন্য মহাভারত রচনা করেছি, আবার অন্যদিকে বলছেন, 'আমি আর গণেশ ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।' চমৎকার! ধনভাণ্ডার তিনি দান করলেন কিন্তু ভাঁড়ারের চাবিটি রইলো তাঁর কাছে! সত্যসন্ধ ঋষি কি তাহলে ছলনা করছেন? না। এই গল্পও তাঁর ব্যাসকূট! এর সহজ মীমাংসা এই, মহাভারত বুঝতে হলে, এই জ্যোতির সমুদ্রটি মন্থন করে অমৃত পান করতে হলে স্বয়ং পাঠককেই ব্যাসত্ব লাভ করতে হবে। সেই আনন্দসান্দ্ররূপ ভর্গ অবস্থা না লাভ করলে মহাভারতের মর্ম সম্পূর্ণতঃ বুঝা যায় না, বুঝা যাবে না। এই হল তাঁর বক্তব্যের নিগূঢ় রহস্য।

এই গণেশ কে, তাঁরও একটু পরিচয় প্রয়োজন। বক্তাকে জেনেছি, এবার লেখকের পরিচয়টা নেওয়া যাক্। ঋষি তাঁর বর্ণনা দিচ্ছেন –

স্ফারাস্যং ব্রহ্মসূক্তং প্রমিতিরুতিরুদং সম্যগ্ উদ্গীথ শুণ্ডং।
দ্বেবিদ্যে যত্র নেত্রে বিশদ পরিচয়াপাস্ততামিস্র ভালং।
মন্ত্রং বক্ষশ্চ পার্শ্বৌ যতিততি কুষলৌ দোষ ঋষ্যাদয়শ্চ।
মাত্রাদ্যৈস্তে সমাঢ্যাঃ সকল মখতনুং নৌমি সিদ্ধি ঋদ্ধিপাদম্॥

অর্থাৎ গণেশ হলেন জ্ঞানবিজ্ঞানের আদি প্রবর্তক। তাই তাঁর মুখকমল যেন সাক্ষাৎ প্রকটিত বেদবাণী। স্ফার বা নাদময়ী যে শ্রুতি, সেই শ্রুতি বা বেদের সূক্ত বা মন্ত্র হল গণপতির বক্ত্র অর্থাৎ তাঁর বদনকমল যেন বেদমন্ত্রেরই প্রকট মূর্তি। তাঁর রদ বা দন্তটি কি? না – প্রমিতিরুতিরুদং। অর্থাৎ প্রমিতি বা প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞানরূপ যে রুতি বা শব্দধারা, তাই হল তাঁর দন্ত। আর সম্যক বা যথাযথভাবে নিষ্পন্ন যে উ`ীথ, ছান্দোগ্য উপনিষদে যাকে উদ্‌গান বলা হয়েছে, চৈতন্যের ঊর্ধ্বভূমিতে যে গান সাধককে টেনে তোলে ভূমি হতে ভূমার পথে, সেই উদ্‌গান হল তাঁর শুণ্ড। তাঁর নয়ন দুটিতে কিসের প্রকাশ? – দ্বেবিদ্যে, পরা এবং অপরা, উপনিষদের ভাষায় সম্ভূতি এবং অসম্ভূতি, এই দুই বিদ্যাই তাঁর করায়ত্ত। শুধু জ্ঞানতত্ত্ব, নয়, বিজ্ঞানতত্ত্বেও তিনি পারংগম। মনে রাখতে হবে, এই বিজ্ঞানের অভাবেই নারদ শোক তমসের পারে যেতে পারেন নি। ছান্দোগ্যতে দেখি, নারদ তাই সনৎকুমারের শরণাগত হয়েছিলেন, যিনি তম্ (তাঁকে) সম্পারং দর্শয়তি। নারদের যে বিজ্ঞানতত্ত্ব আয়ত্ত ছিল না, গণেশ তাতে সিদ্ধ, পারংগম। তাই তাঁর ললাট জ্ঞানজ্যোতিতে ভাস্বর, শুভ্র সমুজ্জ্বল। তিনি যতিততিতেও পারংগম। 'যতি' হল বিজ্ঞানতত্ত্ব আর 'ততি' হল, তা উপলব্ধির ব্যবহারিক কৌশল। তাঁর 'দোষ' অর্থাৎ বাহু চারটি – ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ। এ হেন চারটি বাহুতে তিনি ধারণ করে আছেন কি? না – মাত্রা, পদ, কলা এবং কাষ্ঠা। শ্রীগণেশের দিব্য কলেবরের বর্ণনায় পাচ্ছি, তিনি অরুণরক্তিমরুচি। নিস্পন্দ পরমতত্ত্বে নাদরূপ যে মূল স্পন্দ, তারই দিব্যস্ফুরণ তিনি। তাই আনন্দের রক্তিম রাগে তাঁর বর অঙ্গ অরুণাভ।

এই পর্যন্ত শ্রুতি প্রতিপাদিত যে গণেশ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হল, তাতেই আশা করি বুঝতে পারছেন, ব্যাস যদি ব্রহ্মণ্যদেবের ভর্গজ্যোতি হন, তাহলে গণেশ হলেন, সেই ভর্গতেজের স্ফূরণ বা প্রকাশ। অর্থাৎ বক্তা এবং লেখক উভয়েই বেদোক্ত স্পন্দ্রতত্ত্বের – ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা ও তেজস্তত্ত্বের পরম বোদ্ধা।

পঞ্চম বেদ মহাভারতের এহেন বক্তা এবং লেখকের মহিমা স্মরণ পথে রেখেই আমাদেরকে মহাভারত বুঝতে হবে। বুঝতে হবে নানা আখ্যান ও উপাখ্যানের গহন-গহীন আবরণের অন্তরালে তাঁদের উদ্দেশ্য এবং আশয়টি কি।

এই পর্যন্ত বলেই নাঙ্গা বাবা শশব্যস্তে উঠে পড়লেন। বললেন – চলুন চলুন মন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখি গিয়ে। ৭টা বেজে গেছে। আরতি আরম্ভ হয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে আমরাও সবাই উঠে পড়লাম। ঘরের দরজা খুলতেই মন্দিরে আরতির বাজনা বাজছে শুনতে পেলাম। শীত যেন কালকের চেয়ে বেশী পড়েছে বলে মনে হল। কম্বল মুড়ি দিয়ে এসে আমরা আরতি দেখতে লাগলাম। আরতির শেষে পুরোহিতজী যখন মন্দিরের পিছনে পঞ্চপাণ্ডব এবং সপ্তর্ষিদের আরতি করতে গেলেন, তখন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে নাঙ্গা বাবা হাতজোড় করে শূলপাণীশ্বর মহাদেবের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে সজল কণ্ঠে বলতে লাগলেন –

ওঁ নমো নমস্তেঽখিলকারণায় নিষ্কারণায় অদ্ভুতকারণায়।
সর্বগমাম্নায় মহার্ণবায়, নমোঽপবর্গায় পরায়ণায়॥
ওঁ নমো শিবায়।

অর্থাৎ সর্বকারণের কারণ হয়ে যিনি নিজে কারণ রহিত, অপরিণামী হয়েও যিনি জগতের উপাদান কারণ, হে মহাদেব! সেই আপনাকে আমি প্রণাম করি। সমগ্র শাস্ত্র এবং বেদরূপ নদীসমূহ, মহাসমুদ্ররূপী যে আপনাতে পর্যবসান লাভ করে, পরমানন্দময় মুক্তিস্বরূপ, জীবের সর্বোৎকৃষ্ট আশ্রয় হে মহাদেব! সেই আপনাকে আমি প্রণাম করি।

স্তোত্র পাঠ করে তিনি পুনরায় ভূমিষ্ট হলেন শূলপাণীশ্বরের চরণতলে।

আরতির শেষে আমরা নাঙ্গা বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলাম যাত্রী-নিবাসে। তিনি সোজা ঢুকে গেলেন তাঁর ঘরে। আমরা আর তাঁকে বিরক্ত করলাম না। যে যাঁর আসনে বসে সান্ধ্যক্রিয়াতে মন দিলাম। সত্যি কথা বলতে কি আমি জপে বসলেও জপে মন বসল না। দুপুর থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত নাঙ্গা মহাত্মা আজ আমাদের কাছে মহাভারতের যে মর্মকথা উদঘাটিত করলেন, সেই সব কথাই ঘুরে ফিরে আমার মনে ভাসতে লাগল। আমি জপ ছেড়ে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম রেবা মন্ত্র জপ করতে করতে। আজ মহাভারতের তত্ত্ব শুনতে শুনতে এমনই সবাই মগ্ন হয়ে পড়েছিলাম যে, আজ ঘরের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড করা হয় নি। তার ফলে শীতে সবাই কাঁপতে লাগলাম। ছট্‌ফট করতে করতে অবশেষে কোনমতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল ৬টায়। আজ ১৯শে মাঘ, বুধবার। ১৬ই মাঘ এখানে পৌঁছেছিলাম। তীর্থক্ষেত্রে ত্রিরাত্র বাস তো হয়েই গেল। নাঙ্গা বাবা সঙ্গে থাকায় আমাদের এই যাত্রাটা অর্থাৎ শুকদেবেশ্বর মন্দির হতে শূলপাণীশ্বর পর্যন্ত পরিব্রাজন খুব সুখের হয়েছে। সকাল ৭টার সময়েও গাছপালায় অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে। কুয়াশায় চারদিক ছেয়ে আছে। নাঙ্গা মহাত্মা কিন্তু যথারীতি ভোরেই উঠে পড়েছেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, তিনি নর্মদায় স্নান করে তাঁর অভ্যাসমত ভিজা গায়েই উঠে এলেন। এই ক্ষুধাতৃষ্ণাজয়ী জিতনিদ্র মহাপুরুষকে দেখলে আমার কেবলই তাঁকে প্রাচীন আর্যঋষির সমতুল্য বলে মনে হয়। আমরা সকলে এবারে প্রাতঃকৃত্য সেরে স্নান করতে গেলাম। আকাশে তখন সূর্যোদয়ের আভাস ফুটে উঠেছে। স্নান তর্পণাদি সেরে আমি সকাল ৯টা নাগাদ্ মন্দিরে বসে মহর্ষি তণ্ডিকৃত শিবস্তোত্র পাঠ করতে লাগলাম। অন্যান্য সন্ন্যাসীরাও মন্দিরে এসে জপে বসলেন। পাঠ করতে করতেই লক্ষ্য করলাম, নাঙ্গা বাবাও এসে আমার পাঠ শুনতে লাগলেন। আমার যখন পাঠ শেষ হল, তখন পুরোহিতজী মন্দিরে এসে পূজা করে চলে গেছেন, দণ্ডী সন্ন্যাসীরাও জপ করে ফিরে গেছেন যাত্রী-নিবাসে। আমি শূলপাণীশ্বরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে যাত্রী-নিবাসে ফিরলাম নাঙ্গা মহাত্মাকে সঙ্গে নিয়ে। রঞ্জনের ঘড়িতে তখন বেলা সাড়ে ১২টা। বেলা ১টার সময় আমাদের ভোজন পর্ব শেষ হল। খেয়ে উপরের ঘরে এসে দেখলাম, নাঙ্গা বাবা আমাদের ঘরে এসে বসে আছেন। মন খুব উল্লসিত হয়ে উঠল এই ভেবে যে আজও তাহলে মহাভারতের বিষয়েই কিছু

বলবেন। কিন্তু না, তিনি সে বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্যই করলেন না ! পরিবর্তে বলে বসলেন, আমি যে পথ দেখিয়ে শূলপাণীশ্বর মন্দির পর্যন্ত আপনাদেরকে নিরাপদে নিয়ে এলাম, এজন্য আপনারা আমার কাছে কিঞ্চিৎ ঋণ স্বীকার করেন কি না ? স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন – বিলক্ষণ। বিলক্ষণ। আপনার কাছে আমাদের সকলেই আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। নাঙ্গা বাবা হাসতে হাসতে বললেন – তীর্থ ঋণ রাখতে নাই ! এইজন্য আপনাদের কাছে আমার দাবী বা প্রার্থনা যাই বলুন, আগামীকাল বেলা ১২টার মধ্যে অতি অবশ্যই আপনাদের সবাইকে ভিক্ষা গ্রহণের পর মন্দিরের পিছনে সপ্তর্ষি মন্দিরের নিকটস্থ নর্মদার তটে উপস্থিত হতে হবে। আমি আপনাদেরকে একটি মজার দৃশ্য দেখাবো। আর শৈলেন্দ্রনারায়ণজী তুমি আমাকে যে কোন একটি দুটি বেদমন্ত্র ব্যাখ্যা করে শোনাও, তাহলে তোমাদের তিনজনকে যে এখানে পঞ্চক্রোশী পরিক্রমায় সাহায্য করেছি, তোমাদের সে ঋণও শোধ হয়ে যাবে। আমি খুশী হব।

– আপনি যে বেদমন্ত্র শুনতে চাচ্ছেন, তাতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমি আপনাকে দুটি বেদমন্ত্র শোনাচ্ছি। এই মন্ত্র দুটি ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তের প্রথম দুটি মন্ত্র। আমার ইহজীবনের ইষ্ট এবং উপাস্য পিতাঠাকুরের কাছে ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করেছি, তাঁর অনুজ্ঞায় মননও করেছি। আমার বুঝবার সুবিধার জন্য তিনি ১ম সূক্তের সমূহ মন্ত্রের পদ্যানুবাদও করেছিলেন। আমি সেই পদ্যানুবাদও শোনাচ্ছি –

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।
হোতারং রত্নধাতমং ॥ ১ ॥
অগ্নিঃ পূর্বেভি ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি ॥ ২ ॥

পরমপূজ্যপাদ পিতাঠাকুরের পদ্যানুবাদ –

অগ্নিদেবে আমি করি স্তব ; –
যিনি যজ্ঞ পুরোহিত, যিনি দীপ্তিমান্।
যিনি সে ঋত্বিক হোতা বহুরত্নবান ॥ ১
যিনি পূর্ব ঋষিগণ – স্তুতির ভাজন,
যাঁহারে করয়ে স্তুতি নব্য ঋষিগণ,
তিনি দেবগণে হেথা করুন বহন ॥ ২

গায়ত্রী ছন্দে রচিত বেদমন্ত্র দুটির সরল পদ্যানুবাদ শুনে নাঙ্গা মহাত্মা খুব খুশী হলেন বলে মনে হল। তিনি বললেন – মন্ত্র দুটির কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা এবং অন্তর্নিহিত মর্ম কথা আমাকে শোনাও। অগ্নি দেবতাদেরকে বহন করে আনুন, এ কিরকম কথা ? দেবতারা কি কোন বহন যোগ্য পদার্থ যে অগ্নিদেব তাঁদেরকে ঘাড়ে বা পিঠে করে এই মর্ত্যভূমিতে আমাদের কাছে বয়ে আনবেন ?

– বৈদিক ঋষিদের মতে, সারা বিশ্বজুড়ে চলেছে এক বিরাট যজ্ঞ। সকল বস্তুই এই যজ্ঞে নিজেকে আহুতি প্রদান করে চলেছে ! কেন না, যজ্ঞ হচ্ছে গতি অর্থাৎ ক্রমবিকাশের, পূর্ণতার, সার্থকতার দিকে নিত্য প্রবহমান ধারা। সৃষ্টির অন্তর্গত প্রতি পদার্থের আত্মাহুতির দ্বারা নিত্য যজ্ঞ নিষ্পাদিত হচ্ছে, তবেই সৃষ্টি সচল হয়েছে, এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। প্রত্যেকেই নিজেকে আহুতি দিয়ে, একে অপরকে সৃষ্টি করছে, নিজের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে বৃহত্তর সত্তাকে। জড় হতে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ হতে প্রাণী, প্রাণী হতে মানুষ ফুটে উঠেছে এবং মানুষ হতে দেবতা ফুটে উঠতে চাচ্ছে, এইরকম ক্রমিক আত্মবলির কল্যাণে মেঘ নিজেকে

বলি দিয়ে ঝরে পড়ে বৃষ্টিরূপে, পিতা নিজের রক্তমাংস বলি দিয়ে জন্ম দেন পুত্রের – এ সকলও যজ্ঞেরই নানা মূর্তি। এইভাবে বিশ্বজুড়ে যে যজ্ঞক্রিয়া চলছে, তা লক্ষ্য করে গীতার ঋষি বলেছেন –

সহযজ্ঞাঃ প্রজাসৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥

অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করে বলেছিলেন – এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা সদা সমৃদ্ধ হও; এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট প্রদানে কামধেনুর তুল্য হোক।

এই যজ্ঞ বা সৃষ্টিচক্রকে ধারণ করে রয়েছে যে সব মূল শক্তি, তাঁরাই দেবতা। নিজেকে উৎসর্গ করে জীব দেবধর্ম পালন করে চলেছে।

বাইরে চলছে যে ভূতযজ্ঞ, মানুষের অন্তরে তাই হচ্ছে যোগযজ্ঞ। মানুষের জীবন-সাধনাও একটা যজ্ঞ। সাধনার লক্ষ্য কি? ক্রমোন্নতি, উর্ধ্বগতি – ক্ষুদ্র হতে বৃহতের দিকে, স্থূল হতে সূক্ষ্মের দিকে, দেহ হতে দেহাধিপতির দিকে – দুঃখ, অশক্তি, অজ্ঞান হতে আনন্দ শক্তি জ্ঞানের দিকে বাহিত হওয়া। কি রকমে তা সম্ভব? সেই একই আত্মবলি – উৎসর্গ নিবেদনের দ্বারা। আমার মধ্যে যে নীচের নীচের স্তর, নীচের নীচের ধর্ম সে সকলকে ক্রমে উপরে উপরের স্তরের ও ধর্মের নিকট শাণ্ড মনে ধরে দিতে হবে। তাই কঠোপনিষদের নির্দেশ –

যচ্ছেৎ বাঙ্মনসি প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেৎ জ্ঞানমাত্মনি॥
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্ যচ্ছেৎ শান্তমাত্মনি॥ (১/৩/১৩)

বিবেকী পুরুষ ইন্দ্রিয়বর্গকে মনে অর্পণ করবেন, মনকে প্রকাশাত্মক বুদ্ধিতে অর্পণ করবেন, বুদ্ধিকে মহত্তত্ত্বে অর্পণ করবেন, এবং উক্ত মহান আত্মাকে সর্ববিক্রিয়া রহিত মুখ্য আত্মাতে লয় করবেন।

জীবের ভিতরে উপরের যে উপরিতম শক্তিসঙ্ঘ তারই নাম দেবতা। সাধক নিজেকে এই দেবশক্তির কাছে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে দিবে, তবেই দেবতা তার মধ্যে নেমে এসে তার আধারটিকে দেব ঐশ্বর্যে ভরে তুলবে। এইভাবে সাধক দেবশক্তিকে নিজের মধ্যে জন্ম দিচ্ছে, দেবশক্তিও মানুষকে তাঁর নিজের মধ্যে তুলে ধরছেন।

এই যে রহস্যময় যজ্ঞক্রিয়া – জীবনের ক্রমিক উন্নতি, উর্ধ্বগতি – তার সম্মুখভাগের তোরণে রয়েছেন যে দুয়ারী তিনিই অগ্নি অর্থাৎ তপঃশক্তি। তপঃশক্তিকে সামনে রেখে তাঁরই সহায়ে সাধক সাধনার পথে – অধ্বর যজ্ঞে আগুয়ান। অগ্নি তাই যজ্ঞের পুরোহিত। এই তপঃশক্তিরই মধ্যে সাধক তার আধারের প্রতি অঙ্গ আহুতি দিচ্ছে, এই তপঃশক্তিই সাধকের আত্মনিবেদন ও আকুতি দেবতার কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন, দেবতাকে সাধকের আধারে আবাহন করে প্রতিষ্ঠা করছেন, তাই অগ্নি হোতা। অগ্নির আর এক নাম বহ্নি, বহন করেন বলেই বহ্নি, কারণ তিনি সকল দিব্যশক্তিকে সাধকের মধ্যে বয়ে আনছেন এবং সাধককেও আবার দিব্যশক্তির মধ্যে বয়ে নিয়ে চলেছেন। এই কাজ অগ্নি করে চলেন সত্যের অটুট ছন্দে, দিনে দিনে ক্রমিক পরিস্ফুরণে, তাই তাঁকে বেদমন্ত্রে বলা হয়েছে ঋত্বিক। ঋত্বিক তিনিই – যিনি জানেন কোন্ ঋতুতে কোন্ মাহেন্দ্রক্ষণে কখন কিভাবে যজ্ঞ করতে হয়, যজ্ + ন, যুক্ত করতে হয়। তপঃশক্তি (অগ্নিও) জানেন সাধকের মধ্যে সত্যপ্রেরণার বলে সাধনা কখন, কোন্ পথে কিভাবে ফুটিয়ে তুলতে হয়।

তপঃশক্তির আগুন সাধকের আধারকে পুড়িয়ে শুদ্ধসমর্থ করে তুলছে, তার মধ্যে এনে দিচ্ছে দিব্যশক্তি (যশসং বীরবত্তমং), দিব্যজ্ঞান (চিত্রশ্রবস্তমং) আর দিব্য আনন্দ

(ঋতুধাতমং), পরিপূর্ণ সার্থকতা (তৎ সত্যং ভদ্রং, রয়িং) । অগ্নির যে শক্তি তা হচ্ছে দিব্যদৃষ্টির স্বভাবজ ক্রিয়াশক্তি, সাক্ষাৎ জ্ঞানের কর্মসামর্থ্য (কবিক্রতু), তাই তিনি মূর্ত্য সত্য ধর্ম (গোপাং ঋতস্য) । এই সত্যের ঋতের, বৃহতের যে প্রতিষ্ঠান, যে তুরীয়লোক, তারই নাম স্বর্লোক, তাই অগ্নি সকল দেবতাদের 'স্ব দম' অর্থাৎ নিজের আবাসভূমি, নিজগৃহ । তাঁর ঐ স্বর্লোকে সকল দেবতা স্বরূপে ও স্বভাবে উদ্ভাসিত । তবে প্রত্যেক দেবতার আছে – ইহলোকে ব্যক্ত আধারে একটা বিশেষ লীলাভূমি । অগ্নির আসন, কর্মক্ষেত্র হচ্ছে পৃথিবী, স্থূল শরীর । তপঃশক্তি সাধককে আশ্রয় করে প্রথমে তার শরীর চেতনায়, ক্রমে শরীর হতে প্রাণে, প্রাণ হতে মনে, মন হতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হতে বোধিতে, তারপর তুরীয় স্বর্লোকে । প্রত্যেক দেবতা এক একটি বিশেষ স্তরের বিশেষ ধর্মের দিব্যমূর্তি এবং সকলেই সেই একই দেবশক্তির প্রকাশ । কিন্তু সকল দেবতার আগে অগ্নি এবং সাধককে সাধনার পথে অগ্রসর হতে হলে আগে অগ্নিরই শরণ নিতে হবে । তাই ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রেই আছে – অগ্নিম্ ঈলে অর্থাৎ অগ্নিকে বন্দনা করি ।

আমার ব্যাখ্যা যখন শেষ হল, তখন দেখলাম নাঙ্গা মহাত্মা সহ সকল দণ্ডী সন্ন্যাসী চোখ বন্ধ করে বসে আছেন । নাগা বাবা ধীরে ধীরে চোখ খুলে আমার চিবুকে হাত দিয়ে আদর করলেন । আমি প্রণাম করতেই তিনি বললেন – আপনাদের যদি কিঞ্চিৎ উপকার বা সেবা করে থাকি, সেই সব ঋণই শোধ হয়ে গেল । আপনাদের আর কারও কোন তীর্থ ঋণ থাকল না । আপনার ব্যাখ্যা শুনে আমার গভীর পরিতৃপ্তি হয়েছে । এখন বেলা প্রায় চারটা বাজতে যায় । গতকাল মহাভারত ব্যাখ্যায় সকলেই তন্ময় ছিলাম বলে সন্ধ্যারতি প্রথম থেকে দেখতে পাই নি । আজ আগে থেকেই মন্দিরে বসে থাকি চলুন । আজকে শূলপাণীশ্বরের সন্ধ্যারতির আশীর্বাদ মন প্রাণ দিয়ে সম্ভোগ করতে হবে । কেন এই কথা বলছি, কাল যখন মধ্যাহ্নকালে আমি মদুক্ত সেই 'মজার দৃশ্য' দেখাবো, তখন সব বুঝতে পারবেন ।

এই বলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন । আমরা তাড়াতাড়ি নিজেদের কম্বল গায়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গে নীচে নেমে এলাম । মন্দির এসে বসে রইলাম । আজও বেশ কনকনে ঠাণ্ডা । মন্দিরের চারপাশেই বড় বড় গাছ । তাই এখনও সূর্যাস্ত না হলেও এখানে অন্ধকার নেমে এসেছে । আমরা নর্মদাকে প্রণাম করে জলস্পর্শ করে সান্ধ্যক্রিয়ায় বসলাম ।

মন্দিরে যখন কাড়া নাকাড়া ঝাঁঝ ঘড়ি ও শঙ্খ বেজে উঠল, তখন বুঝলাম মন্দিরে পুরোহিত মশাই এসে গেছেন । এবারে আরতি হবে । আমরা সবাই ধীরে ধীরে মন্দিরে এলাম আরতি দেখতে । আচমনাদির পর পুরোহিতজী পঞ্চপ্রদীপে ঘিএর বাতি এবং কর্পূরদানীতে কর্পূর জ্বেলে একই মন্ত্র দুবার ধরে উচ্চারণ করে আরতি করতে লাগলেন । অদ্ভুত এই মন্ত্র, মন্ত্রের সুর স্বর ছন্দ এবং তালের অপরূপ ঐক্যতান এবং মাধুর্য দেখে অনুমান করলাম এ মন্ত্র নিশ্চয়ই সামবেদের । কিন্তু সামবেদের অন্তর্গত কোন্ সূক্তে এই অপরূপ মন্ত্রটি আছে, তা কিছুতেই স্মরণে এল না । অনুমান করলাম, এই মন্ত্র নিশ্চয়ই মহানাম্নী আর্চিকে আছে । পুরোহিতজী সুমধুর কণ্ঠে গাইছেন –

ওঁ যজিষ্ঠং ত্বা যজমানা হুবেম জ্যেষ্ঠমঙ্গিরসাং বিপ্র মন্মভির্বিপ্রেভিঃ শুক্র মন্মভিঃ ।
পরিজ্মানমিব দ্যাং হোতারম্ চর্ষণীনাম্ ।
শোচিষ্কেশং বৃষণং যমিমা বিশঃ প্রবন্তু জূতয়ে বিশঃ ॥
ওঁ নমো শিবায় ॥

হে মহাদেব ! হে শুভ্রদীপ্ত অগ্নি, আমরা তোমার যজমানেরা অর্থাৎ তোমার ভক্তরা, তোমাকে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্মা, অঙ্গিরাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠরূপে জেনে এবং মেনে মননের দ্বারা প্রীতিপ্রদ মন্ত্রের দ্বারা তোমাকে আহ্বান করি ; তোমার শিখা উজ্জ্বল পবিত্র, তুমি শুচিকেশ, তুমি নিয়ত কৃপাবর্ষণকারী ; মানুষের প্রীতিদায়ক ফললাভের জন্য তুমি তাদের রক্ষা কর। হে মহাদেব ! তোমায় প্রণাম।

শূলপাণীশ্বরের আরতি শেষ করে পুরোহিতজী ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে মন্দিরের পিছনে গেলেন পঞ্চপাণ্ডব এবং সপ্তর্ষিদের আরতি করতে। শূলপাণীশ্বরের আরতি শেষ হওয়া মাত্রই স্থানীয় অধিবাসীরা যাঁরা আরতি দেখতে এসেছিলেন, অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্য তাঁরা একে একে প্রণাম করে চলে গেলেন ' মন্দির ফাঁকা হতে এতক্ষণে খেয়াল হল, নাঙ্গা মহাত্মাকে তো দেখতে পাচ্ছিনা, তিনি কি আমাদের সঙ্গে নর্মদাতট থেকে উঠে আসেন নি ? হরানন্দজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন – আমরা যেখানে সান্ধ্যক্রিয়া করতে বসেছিলাম, সেখানেই ত তিনি সিঁড়ির উপর বসেছিলেন। সর্বনাশ ! এতক্ষণ যদি সেখানে ধ্যানে থাকেন, তাঁর ধ্যান মানে ত সমাধি ! তাহলে তিনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। চলুন ; দেখি গিয়ে। তাঁকে এবং রঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে আমি টর্চ টিপতে টিপতে সাবধানে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু আমাদের ভাগ্য ভাল, বেশীদূর সিঁড়ি বেয়ে নামতে হল না। টর্চের শিখায় দেখতে পেলাম, তিনি টলত টলতে উঠে আসছেন উপরের দিকে। রঞ্জন এবং হরানন্দজী তর্‌তর্ করে নেমে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেললেন। দুজনে ধরে ধরে তাঁকে মন্দির এনে বসিয়ে দিলেন। তিনি শূলপাণীশ্বরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। পুরোহিতজীর তখন আরতি হয়ে গেছে। তিনিও এসে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাত্রি প্রায় ন'টা বাজতে যায়। কিছুক্ষণ পরে নাঙ্গা বাবা নিজেই ফিরতে চাইলেন যাত্রী-নিবাসে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আর আমাকে ধরতে হবে না ; আমি নিজেই যেতে পারব। আমরা সবাই মিলে তাঁকে ঘিরে ধরে হাঁটতে লাগলাম। যাত্রী-নিবাসের কাছে এসে তিনি পুরোহিতজীকে অনুরোধ করলেন -- আপনি কৃপা করে আগামীকাল বেলা ১২টা নাগাদ অতি অবশ্যই সপ্তর্ষিদের মন্দিরের কাছে উপস্থিত থাকবেন। আমাদেরকে দেখিয়ে বললেন – এঁরাও দয়া করে উপস্থিত থাকবেন, কথা দিয়েছন। আমি সবাইকে একটা মজার দৃশ্য দেখাবো। আমার উপর গুরুদেবের সেইরকমই হুকুম।

পুরোহিতজী সকলের উদ্দেশ্যে 'নমো নারায়ণায়' জানিয়ে তাঁর বাসায় চলে গেলেন, আমরা উপরে উঠে মহাপুরুষকে তাঁর নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে এলাম। হ্যারিকেন জ্বেলে যে যার শয্যা বিছিয়ে নিলাম। আজ কাঠ কুড়িয়ে অগ্নিকুণ্ড জ্বালার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খান্দেশ থেকে যে ৬ জন সন্ন্যাসী এসে আমাদের নীচের তলায় রয়েছেন, তাঁদের নেতার নাম বিশোকানন্দ গিরি। তিনি আমাদের ঘরে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন – মহাপুরুষ আমাদেরকেও কাল বেলা ১২টার সময় সপ্তর্ষি মন্দিরের কাছে উপস্থিত হতে বলেছেন, তাঁর কথিত 'মজার দৃশ্য' দেখার জন্য। এজন্য আগামীকাল সকালেই রুটি তৈরীর ব্যবস্থা করব যাতে বেলা ১১টা নাগাদ অন্ততঃ আমরা ভিক্ষাপর্ব শেষ করতে পারি। আপনারা তো তাঁর সঙ্গে এসেছেন। এই রহস্যময় পুরুষের সম্বন্ধে কিছু জানালে আমাদের কৌতূহল মিটত ! হরানন্দজী বললেন – আমাদের কাছেও উনি 'রহস্য'। বিশেষ কিছু জানি না। ভারোচ থেকে আসার পথে শুকদেবেশ্বর মন্দিরে এসে ওঁর দেখা পাই। উনি আমাদের সঙ্গে থাকায় আমরা এই ঘোর জঙ্গল পথে নিরাপদে এখান পর্যন্ত আসতে পেরেছি। উনি জিতনিদ্র, ওঁর

কোন খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। অর্জুনেশ্বর মন্দিরে এবং এখানেও ওঁকে দু একবার সমাধিস্থ অবস্থায় দেখেছি। ওঁর গুরু কে ? কোন্ দেশের উনি অধিবাসী, এসব বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না।

বিশোকানন্দজী নীচের তলায় নেমে গেলেন। আমরা আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

আমাদের যখন ঘুম ভাঙল, তখন সকাল সাড়ে ৬টা বেজে গেছে। ভীষণ কুয়াশা। ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে দেখলাম শিশির পড়ে বারান্দাও এমন ভিজে গেছে যে, মনে হচ্ছে যেন গোটা বারান্দাটাই বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে গেছে। মন্দিরটাও দেখা যাচ্ছে না। হরানন্দজী কোনমতে পা টিপে টিপে মহাত্মার ঘরে উঁকি মেরে এসে বললেন – নাগা বাবা তাঁর অভ্যাসমত স্নান করতে বোধহয় চলে গেছেন। আমরা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে বাঁচলাম। অগ্নিকুণ্ডে আরও দু একটা কাঠ চাপিয়ে আগুন পোয়াতে লাগলাম। সাড়ে আটটা বাজতে সবাই প্রাতঃকৃত্য সেরে স্নান করতে যাবার জন্য নেমে এলাম নীচে। স্বামী বিশোকানন্দজীর সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বললেন – আমি নর্মদাতে একটু আগে স্নান করে আসার সময় দেখে এলাম, নাঙ্গা মহাত্মা মন্দিরের চারিধার ঘুরে ঘুরে পরিক্রমা করছেন। আপনাদেরকে জানাতে বলেছেন, তিনি এখানে আর আসবেন না। বেলা পৌনে বারটা নাগাদ আমাদের ভিক্ষা গ্রহণের পর সপ্তর্ষি মন্দিরে যেতে বলেছেন, আমাদের না যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই বসে থাকবেন তিনি। হ্যাঁ মশাই, উনি যে মজার দৃশ্য দেখাবেন বলেছেন তা কি কোন ম্যাজিক ? যাই হোক, আমরা একটু পরেই উনুন ধরিয়ে রুটি বানাতে বসব। আমাদের দুজন ব্রহ্মচারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা স্নান ও প্রণাম করে এসেই একটু হাত লাগাবেন, তাহলে বেলা ১০টা নাগাদ লিট্টি পাকানো হয়ে যাবে। তাঁর কথা শুনে নিয়ে আমরা শূলপাণীশ্বর মহাদেবকে দূর থেকে প্রণাম করে মন্দিরের পাশ দিয়ে নেমে গেলাম নর্মদার ধারে। একে একে সবাই স্নান করে মন্দিরে এসে প্রণাম করলাম মহাদেবকে। পত্রান্তরালে ভেদ করে সূর্যকিরণ তখন পড়েছে মন্দিরের চত্বরে। চারদিকেই আলোর আভাস ফুটে উঠেছে। মহাত্মাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। হরানন্দজী মন্দিরের পিছন দিকটা ঘুরে ফিরে এসে জানালেন – নাগা বাবা সেদিন রাত্রে যেখানে সমাধিস্থ হয়েছিলেন, সেখানেই তিনি বসে আছেন নর্মদার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। আমি মন্দিরের বারান্দায় বসে পুঁথি খুলে মহর্ষি তণ্ডিকৃত মহাদেবের স্তব পাঠ করতে লাগলাম। যে দুজন ব্রহ্মচারী লিট্টি পাকানোতে অংশগ্রহণ করবেন, তাঁরা স্নানের পর যাত্রী-নিবাসে চলে গেলেন। অন্যান্য দণ্ডী সন্ন্যাসীরা মন্দিরে কিছুক্ষণ জপের জন্য বসলেন। আমার যখন স্তব পাঠ শেষ হল, পুরোহিতজী তখন মন্দিরে এসে পূজায় বসে গেছেন। দণ্ডী সন্ন্যাসীরা বাসায় ফিরে গেছেন। আমি একবার ভাবলাম, সপ্তর্ষি মন্দিরে গিয়ে দেখে আসি নাঙ্গা মহাত্মা কি করছেন ! কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, তাঁর আদেশ আছে ভিক্ষান্তে তাঁর কাছে যেতে। কাজেই অহেতুক তাঁর বিরক্তি উৎপাদন করে লাভ নাই, যাত্রী-নিবাসেই ফিরে যাওয়া ভাল, একসঙ্গেই সকলে আসা যাবে। এই ভেবে যাত্রী-নিবাসে যখন ফিরলাম তখন বেলা ১১টা বেজে গেছে স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী এবং প্রেমানন্দ প্রভৃতি প্রায় সকলেই খেতে বসেছেন। বাকী আছেন কেবল বিশোকানন্দজী, হরানন্দজী এবং রঞ্জন। আমি উপরের ঘরে গিয়ে পুঁথি রেখে এসেই চারজন একসঙ্গে বসে লিট্টি ও গুড় খেলাম। সকলেরই চোখে মুখে দারুণ ঔৎসুক্য। হরানন্দজী উচ্ছ্বসিত হয়ে এই মহাত্মার যোগবলের প্রশংসা করছেন, মোক্ষড়ী গঙ্গা পেরিয়ে এসে খোলা আকাশের নীচে বসে আমরা যে রাত কাটানোর সময়

আমাদের দুদিকে যে ৬টা হায়না এবং ৪টা নেকড়ে বাঘকে দুটুকরো জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে তিনি হিংস্র পশুগুলোকে কিভাবে তাড়িয়ে ছিলেন, তারও আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত খান্দেশের সন্ন্যাসীদেরকে তাঁর ইতিপূর্বেই দেওয়া হয়ে গেছে। তিনি সবাইকে বলেছেন, এই রকম উচ্চকোটির মহাত্মা প্রদর্শিত 'মজার দৃশ্য' কোন ম্যাজিকের খেলা হবে, তা ভাবা উচিত হবে না, নিশ্চয়ই তাঁর 'মজার দৃশ্য' যোগেরই কোন গুঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করবে। তাঁর analysis এর গুণে সকলের কৌতূহল চোখ মুখ দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে।

আমরা সকলেই তাড়াতাড়ি দল বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম। মন্দিরে পৌছতেই পুরোহিতজীও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে। আমরা মোট ২৬জন লোক ধীরে ধীরে সপ্তর্ষি মন্দিরে গিয়ে পৌছলাম। গিয়ে দেখলাম, বদ্ধ পদ্মাসনে বসে নর্মদার দিকে তাকিয়ে নাঙ্গা মহাত্মা আপনমনে মৃদুকণ্ঠে বলে চলেছেন –

ন তদস্তি ন যত্রাহং তন্নেহাস্তি ন যন্ময়ি।
কিমন্যদভিবাঞ্ছামি সর্বং সংবিন্ময়ং ততম্ ॥
যেথা আমি নাই – হেন কিছু নাই,
হেন কিছু নাই – আমাতে যা নাই,
অন্য কিছু কিবা আছে কামনার ?
মোর জ্ঞানে ব্যাপ্ত অখিল সংসার।

আমরা স্তব্ধ হয়ে তাঁর পিছন দিকে দাঁড়িয়েছিলাম। তাঁর মুখে এই মন্ত্র শুনে আমি চমকে উঠলাম। শরীরটা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল। আমার মনে পড়ল, ভারতবিখ্যাত পঞ্চদশীকার বিদ্যারত্ন মুনীশ্বর তাঁর দেহান্তের পূর্বে সমবেত সন্ন্যাসী শিষ্য এবং অন্তেবাসীদেরকে বিদায়বাণী শোনাতে গিয়ে এই মন্ত্রই ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেছিলেন, শুনিয়েছিলেন অদ্বৈতবাদের চরমতত্ত্ব – সংবিদের প্রজ্ঞাময়ী বাণী। তাহলে কি, তাহলে কি.................. আমি আর ভাবতে পারলাম না। চঞ্চল হয়ে আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, আমার দেখাদেখি সকলেই একে একে তাঁকে একটু দূরত্ব রেখে মণ্ডলাকারে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর শরীরটা বার দুই থরথর করে কেঁপে উঠল। মিনিট খানিক স্থির থেকে বলতে লাগলেন – নমো নারায়ণায়, নমো নারায়ণায়। আপনারা যে দয়া করে সকলেই এসেছেন এজন্য কৃতার্থ বোধ করছি। ভগবান শূলপাণীশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন – এঁদের মধ্যে একমাত্র তুমিই উত্তরতট পরিক্রমাকালে অকালবাড়াতে এসে আমার গুরুদেব দিগম্বর করপাত্রীজীকে সাক্ষাৎ করে এসেছ। তাঁর হুকুম এসেছে আজ ২০শে মাঘ বৃহস্পতিবার উত্তরায়ণে শুক্লা একাদশীর মধ্যাহ্নক্ষণে এই স্থূলদেহটা নর্মদাতটে ভগবান শূলপাণীশ্বরের ক্ষেত্রে ফেলে দিয়ে আনন্দ পারাবারে নিমগ্ন হতে হবে। তাই আপনাদেরকে এখানে আসার কষ্ট দিলাম। সাধারণের মত দেহ পরিত্যাগ করব না। শান্তনু-নন্দন গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম হতে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত পরম্পরাক্রমে ভারতের যোগিসমাজ যে ভাবেই মৃত্যুকে পরম বাঞ্ছিত বলে মনে করেন, আমি গুরুকৃপায় সেইভাবেই দেহত্যাগ করে চলে যাচ্ছি। আমার মৃতদেহের অগ্নিসংস্কারই বাঞ্ছনীয়। কঠোপনিষদের প্রসিদ্ধ কারিকাতে (২/৩/১৬) আছে –

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্ধ্বমায়ন্ অমৃতত্বমেতি বিষঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥

অর্থাৎ হৃদয় হতে নিষ্ক্রান্ত একশ একটি নাড়ীর মধ্যে একটি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে নির্গত হয়েছে। এটি মূর্ধাস্থলে গিয়ে সংলগ্ন। উৎক্রমণকালে এই নাড়ীকে অবলম্বন করে উর্ধ্বে গমন পূর্বক প্রকৃত যোগীরা অমৃতত্ব লাভ করেন। অন্যান্য নাড়ীমার্গে উৎক্রমণ সংসারগতির

কারণ হয়। দিগম্বর করপাত্রীজীর সন্তান আমি, তার কৃপায় আমি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে চলে যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি অমৃতলোকে।

এইবলে বদ্ধ পদ্মাসনে ঋজু আয়তদেহে উন্নত মেরুদণ্ডে উপবিষ্ট সিদ্ধতাপস ধ্যানস্থ হলেন, মিনিট তিনেক পরে তাঁর ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে আমরা সবই দেখলাম স্পষ্টতঃ একটি শিখা ঊর্দ্ধাকাশে গিয়ে মিলিয়ে গেল। হরানন্দজী চোখে ঢাকা দিয়ে হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন। হিরন্ময়ানন্দজী থপ্ করে পাথরের উপর বসে পড়ে অশ্রুরদ্ধ কণ্ঠে বলতে লাগলেন – রেবামায়ী ইয়ে তুমনে ক্যা কিয়া ! হমলোগ শূলপাণিকা ঝাড়ি ক্যায়সে অতিক্রম করেগা ? নাঙ্গা বাবা হমলোগোকা প্রধান সাহারা থে। তিনি আর বেশী কথা বলতে পারলেন না। কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়লেন পাথরের উপর। সবাই আমরা অন্তিম আসনে উপবিষ্ট মহাপুরুষকে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে কাঁদতে লাগলাম। পুরোহিতজী মহাপুরুষকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে ছুটে গেলেন মন্দিরে। একটু পরেই মন্দির থেকে প্রদীপ ও ধূপ এনে জ্বাললেন, কর্পূর জ্বেলে সকলেই তাঁর দেহকে আরতি করলাম। একটি সুবৃহৎ তাম্রকুণ্ড এনে তাতে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে প্রত্যেকের হাতে একটুকরো করে মোণ্ডা দিয়ে বললেন – আপনারা আমার সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করুন। বেদের নির্দেশ ক্রমে যমের উদ্দেশ্যে এই মিষ্টদ্রব্যের হবন করা হচ্ছে। ঋগ্বেদের যম পৌরাণিকদের কল্পিত যম নন, বেদোক্ত যম পুণ্যকর্মের পুরস্কার বিধাতা, স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ –

ওঁ যমায় মধুমত্তমং রাজ্ঞে হব্যং জুহোতন
ইদং নম ঋষিভ্যঃ পূর্বজেভ্যঃ পূর্বেভ্য পথিকৃদ্ভ্যঃ ॥ ওঁ যমায় স্বাহা।

– হে ব্রহ্মস্বরূপ যমরাজ। তোমার উদ্দেশ্যে এই মিষ্টদ্রব্যের হবন করছি। এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে তাঁর সাধনোচিত ধামে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। তোমাকে প্রণাম করি। যে সকল পূর্বকালের ঋষি আমাদের অগ্রে জন্মগ্রহণ করে ধর্মের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁদেরকেও প্রণাম করি।

ওঁ যমায় স্বাহা, ওঁ যমায় স্বাহা। বলে সবাই আমরা তাম্রকুণ্ডে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দিলাম। আমরা যখন হবন করছি, তখন পুরোহিতজীর পুত্র এসে এই দৃশ্য দেখে মহাপুরুষের দেহকে প্রণাম করে গেলেন। তাঁর কাছে খবর পেয়ে একটু পরেই পুরোহিতজীর মাতাঠাকুরাণী তাঁর বাড়ীর মেয়েদেরকে নিয়ে মহাপুরুষকে প্রণাম করতে এলেন। সঙ্গে এনেছিলেন প্রচুর ফুল চন্দন এবং ১টি মালা। পুরোহিতজী তাঁদেরকে দেহ স্পর্শ করতে দিলেন না, দণ্ডী সন্ন্যাসীদেরকে বললেন দেহকে ফুল ও চন্দন দিয়ে সাজিয়ে দিতে। খবর পেয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় সকলেই এলেন মহাপুরুষকে প্রণাম করতে। হরানন্দজী তাঁদেরকে বললেন – 'দেখে যান, প্রাণ ভরে দেখে যান এই 'মজার দৃশ্য।' মহাপুরুষ স্বয়ং কাল থেকে আমাদেরকে এখানে আসতে বলেছিলেন, এই 'মজার দৃশ্য' দেখতে।' বলতে বলতেই হরানন্দজী ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। 'তাঁর মনে তাহলে এই ছিল যে চরম বিয়োগান্তক দৃশ্য দেখিয়ে গেলেন মজার দৃশ্যের নাম করে।' 'এ কথা বুঝছেন না কেন যে মৃত্যু মহাপুরুষদের কাছে একটা মজার খেলা।' এই ধরণের টুকরো টুকরো কথা ভেসে বেড়াতে লাগল দর্শকদের মধ্যে।

পুরোহিতজীর জ্যেষ্ঠপুত্র একটি বাঁশের পাটাতন আনতেই তাতে মহাপুরুষের পুষ্পমাল্যে সজ্জিত চন্দনচর্চিত নিস্পন্দ দেহকে বসিয়ে আমি, হরানন্দজী, প্রেমানন্দ এবং বিশোকানন্দজী কাঁধে তুলতেই পুরোহিতজী পথ দেখিয়ে আমাদেরকে নর্মদাতটের ধারেই

একস্থানে নিয়ে এলেন। এসে দেখি, ভস্মারতি করে যে অঘোরী বাবা, তিনি এবং আরও চার, পাঁচজন ব্রাহ্মণ বসে আছেন চিতা সাজিয়ে। আমরা হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে তাঁর দেহকে একই উপবিষ্ট অবস্থায় বসিয়ে নর্মদার জল ছিটিয়ে বড় বড় চমসে করে তাঁর দেহকে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে ঘৃতসিক্ত করে নিলাম। বেলা প্রায় ২টার সময়ে সকলেই এক টুকরো করে কাঠ অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত করে চিতাতে অগ্নিসংযোগ করা হল হর নর্মদে, জয় ভগবান শূলপাণীশ্বরকী জয়, হর হর বম্ মহাদেও প্রভৃতি ধ্বনি দিতে দিতে। পুরোহিতজী এবং আমি বড় বড় দুটি চমসে ঘি নিয়ে চিতার দুদিকে দাঁড়িয়ে ঘৃতাহুতি দিতে দিতে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলাম –

ওঁ প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্বেভির্যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ।
উভে রাজানা স্বধয়া মদন্তা যমং পশ্যাসি বরুণং চ দেবম্॥

(ঋ ১০ম / ১৪ সূ / ৭)

অর্থাৎ নাঙ্গা বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলছি – হে মহাত্মন! আমাদের পূর্বপুরুষেরা, পূর্ব পূর্ব মহাপুরুষেরা যে পথ দিয়ে, যে স্থান গিয়েছেন তুমিও সে পথ সে স্থানে যাও। সেই যে দুই রাজা, দিব্য ভাস্বর পুরুষ যম আর বরুণ, যাঁরা স্বধা প্রাপ্ত হয়ে আনন্দ করছেন, তাঁদের গিয়ে দর্শন কর।

ওঁ সং গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সংযমেনেষ্টা পূর্তেন পরমে ব্যোমন্।
হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি সং গচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চাঃ॥

(ঋ ১০ম / ১৪সূ / ৮)

অর্থাৎ সেই চমৎকার দিব্যধামে পূজনীয় মহাগুরুদের সঙ্গে মিলিত হও, ব্রহ্মপুরুষ যমের সঙ্গে এবং তোমার যোগানুষ্ঠানের ফলের সঙ্গে মিলিত হও। পাপ পরিত্যাগ পূর্বক অস্ত নামক গৃহে প্রবেশ কর এবং উজ্জ্বল দেহ গ্রহণ কর॥

ওঁ যে চেহ পিতরো যে চ নেহ যাংশ্চ বিদ্ম যাঁ উ চন প্রবিদ্ম।
ত্বং বেত্থ যতি তে জাতবেদঃ স্বধাভির্যজ্ঞং সুকৃতং জুষস্ব॥

অর্থাৎ এ স্থানে যে সকল পিতৃপুরুষগণ এসেছেন, কিংবা যাঁরা আসেন নি, যাঁদেরকে আমরা জানি কিংবা যাঁদেরকে আমরা জানি না, হে জাতবেদা অগ্নি! তুমি জান তাঁরা কে কে। হে পিতৃলোকবাসী দিব্যপুরুষগণ! স্বধা শব্দ উচ্চারণ পূর্বক এই সুসম্পন্ন যজ্ঞ ভোগ কর।

দাহকার্য যখন শেষ হল তখন রঞ্জনের ঘড়িতে সাড়ে ৪টা বেজেছে। সূর্য তখন পাটে, অস্তাচলগামী সূর্যের রক্তিমাভাতে যেন বেদনা ফুটে উঠেছে। নর্মদার জল ছিটিয়ে দিলাম চিতার উপরে। আমরা চিতার কাছেই ঘাটে নেমে মহাত্মার উদ্দেশ্যে তিলাঞ্জলি অর্পণ করলাম। এ চিতা কিছুক্ষণ পরে নিশ্চয়ই নিভে যাবে, কিন্তু আমাদের বুকের চিতা তো নিভবে না। সে চিতা বহ্নিমানই থাকবে। আমরা সকলেই সেই নিদারুণ শীত অগ্রাহ্য করে নর্মদাতে স্নান করলাম। তারপর নীরবে নতমস্তকে ফিরে এলাম মন্দিরে। ভগবান শূলপাণীশ্বরকে প্রণাম করে ফিরে চললাম যাত্রী-নিবাসে। আজ ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসছে শুধু এই জঙ্গলখণ্ডে নয়, অন্ধকার নেমে এসেছে আমাদের বুকের মধ্যেও। অব্যক্ত বেদনায় সকলেরই বুকের মধ্যটা গুর্‌গুর্ করে উঠছে। স্বজন বিয়োগের ব্যথাও বোধহয় মানুষকে এতখানি কাতর করে তোলে না! সকলেরই মুখ থমথমে। কেউ কারও দিকে ভাল করে তাকাতে পারছি না। অন্ধকার ঘরে ঢুকে আন্দাজে যে যার শয্যায় শুয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে মুখ ঢাকলাম। শুয়ে পড়লেন প্রায় সবাই। এখন আর হ্যারিকেন জ্বালতে ইচ্ছা

হল না, এখন যেন অন্ধকারকেই বড় ভাল বড় আপন বলে মনে হচ্ছে। কেউ কেউ জপ ধ্যানে মন দিলেন বলে অনুমান করছি, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কারও ফোঁপানি, কারও ছটফটানির আভাস পেয়ে বুঝতে পারছি সকলেই যেন জঙ্গলখণ্ডের একজন একান্ত সুহৃদ বা সাথীকেই হারলাম না, হারালাম এক নিত্যকালের সাথীকে। ক্রমে ক্রমে রাত্রি গভীর হতে লাগল। সবচেয়ে ছটফট করছেন হরানন্দজী, তিনি কম্বল মুড়ি দিয়ে কেবলই এদিক ওদিক করছেন ; কেউ ঘুমাতে পারছি না। মনের মধ্যে কেবলই মহাত্মার নানা কথা টুকরো টুকরো করে ভেসে বেড়াচ্ছে। ঘুম কিছুতেই না আসায় শেষ পর্যন্ত আমি হ্যারিকেন জ্বেলে খাতা পেন্‌সিল নিয়ে বসলাম কিছু লিখতে। বুকের জমাট ব্যথাকে গল্‌গল্‌ করে দরবিগলিত ধারে ঝরিয়ে দিতে পারে চোখের জল আর কবিতা। আমি লিখতে লাগলাম –

অতীতের নেপথ্য হইতে
অযাচিত করুণার মত,
এসেছিলে হাসিতে হাসিতে –
ভুলাইতে পথক্লেশ যত।

কি জানি, কি রহস্য জড়িত,
এই অন্ধ মানব-জীবন !
কোন্‌ দিব্য-প্রেমে নিয়ন্ত্রিত,
পর কেন হয় গো আপন ?

অজানিত অতিথির কাছে
মুক্ত করি হৃদয়-ভাণ্ডার,
সুখ দুঃখ-সঞ্চিত যা আছে,
সমাদরে দিলে উপহার !

নিরাশায় হয়ে প্রতিহত
তব পাশে আসিনু যখন ;
মায়াময়ী জননীর মত
স্নেহাঞ্চলে করিলে ব্যজন।

যদি এই আশ্রিতে তোমার,
হেরিয়াছ স্নেহের নয়নে ;
তবে এরে ভুলিও না আর –
জন্মান্তরে যুগ-আবর্তনে ॥

আজ ২১শে মাঘ, শুক্রবার। গতকাল মধ্যাহ্নক্ষণে পরম পূজনীয় নাঙ্গা মহাত্মা যোগস্থ হয়ে সত্যি সত্যি একখণ্ড জীর্ণ বস্ত্রের মত স্থূল দেহটা ত্যাগ করে চলে গেছেন। আমাদের সকলের চোখের সামনে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে যাত্রা করেছেন অনন্তলোকে। মনের সেই শোক এবং শূন্যতাবোধ ঢাকবার জন্য কবিতা লিখতে গিয়ে অনেক রাত্রিতে ঘুমিয়েছিলাম, তাই আজ যখন ঘুম ভাঙল, তখন সকাল আটটা বেজে গেছে। আমার সাথীরা অনেক আগেই উঠে পড়েছেন। তাঁদের প্রাতঃকৃত্যাদিও সারা হয়ে গেছে। স্নান করতে যাওয়ার জন্য আমার জন্য কেবল অপেক্ষা করছিলেন। আমি লজ্জিত মুখে উঠে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে আসন শয্যা গুটিয়ে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে স্নানের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। সবে মাত্র দোতালা হতে নিচে নেমেছি, এমন সময় পুরোহিতজী তাঁর বৃদ্ধ মাতাকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। বললেন –

মাতাজী এসেছেন আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাতে। এই অবিমুক্তক্ষেত্রে মহাপুরুষের গতকাল যে মহাপ্রয়াণ ঘটল, সেই উপলক্ষ্যে মায়ের আগ্রহ হয়েছে আপনাদেরকে ভিক্ষা দিবেন। মায়ের আদেশে আজই সেই ভাণ্ডারার আয়োজন করেছি। এতগুলি দণ্ডী সন্ন্যাসীকে একত্রে পেয়ে দণ্ডী সন্ন্যাসী ভোজনের মত পুণ্যানুষ্ঠানের সুযোগ মাতাজী ছাড়তে চান না। আপনারা কৃপা করে মাতাজীর এই সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে আমরা কৃতার্থ বোধ করব।

বৃদ্ধা মাতাজী যুক্ত করে দাঁড়িয়েছিলেন মাথায় ঘোমটা দিয়ে অবনত মস্তকে। পুরোহিতজীর প্রস্তাব শুনে হিরন্ময়ানন্দজী তাঁর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন – হমলোগ জরুর যায়েঙ্গে মাতাজী। পূজাকা বাদ আপকো কোঠিমেঁ সব মূর্তিয়োঁ জরুর পৌছ যাবেঙ্গী।

স্বামীজীর সানন্দ সম্মতি পেয়ে পুরোহিতজী বলতে লাগলেন – আপনারা সবাই জানেন এই শূলভেদ তীর্থ বা শূলপাণীশ্বর মহাদেবের স্থান সব তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীর্থ, মহাতীর্থ। এই সর্বদেবময় মহাতীর্থের কিছু গোপন রহস্য আছে। সেই রহস্য স্বয়ং মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের ভাষায় 'গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং', তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন,

ন কস্যচিদ্ ময়াখ্যাতং পৃষ্টোঽহং ত্রিদশৈরপি।
গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং তীর্থং সদা গোপ্যং কৃতং ময়া॥

'হে রাজন! দেবতারা জিজ্ঞাসা করলেও তাঁদের নিকটও আমি এই শূলপাণীশ্বর মহাদেবের বিশেষত্ব প্রকাশ করিনি, সতত গোপনই রেখেছি।' সেই রহস্য আমরাও বংশপরম্পরা গোপন রেখে আসছি। লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়েও আমরা সেই তত্ত্ব কখনও কারও কাছে প্রকট করি নি। কিভাবে জানি না, মহাত্মা নাঙ্গা বাবা কিন্তু এ রহস্য বিদিত ছিলেন। গত পরশু প্রাতঃস্নান করে এসেই মহাত্মা আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, এই শূলপাণীশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ আপনাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিতে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার পূজনীয় পূর্বপুরুষদের কঠোর নিষেধ বাক্য স্মরণ করে আমি তাঁর সেই অনুরোধ রাখি নি। গতকাল তাঁর দেহান্তকালে দেহত্যাগের ধরণ দেখে আমি বুঝেছি যে, তিনি যোগীশ্বর ছিলেন। যোগীশ্বরের আদেশ বা ইচ্ছা সতত মান্য, এও আমার পূর্বপুরুষদেরই হুকুম। তাই তাঁর পুণ্য ইচ্ছা পূরণার্থেই আপনাদেরকে অনুরোধ করছি, আপনারা অতি অবশ্যই স্নানান্তে মন্দিরে উপস্থিত থাকবেন।

এই বলে পুরোহিতজী তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। আমরা নর্মদাতে গেলাম স্নান করতে। স্নান তর্পণাদি সেরে মন্দিরে যখন এলাম, তখন পুরোহিতজী মন্দিরের মধ্যে হোমের আয়োজন করছেন আর তাঁর মাতাঠাকুরাণী মালা জপছেন মূল দরজার বাইরে বসে। আমরা 'হর নর্মদে হর' ধ্বনি দিতে দিতে মন্দিরে পৌঁছাতেই পুরোহিতজী তৎক্ষণাৎ আমাদেরকে ভিতরে ডাকলেন। আমরা মূল মন্দিরে প্রবেশ করা মাত্রই তার মাতা ঠাকুরাণী দরজা টেনে দিলেন বাইরে থেকে। স্বামীজী পুরোহিতজীকে বললেন – বিশোকানন্দজীদেরকে এখানে উপস্থিত দেখছি না, কাউকে পাঠিয়ে তাঁদেরকে এখানে ডেকে আনব কি?

– প্রয়োজন নাই। তারা দণ্ডী সন্ন্যাসীও নন, আনুষ্ঠানিকভাবে পরিক্রমাবাসীও নন। ভৃগু পর্বতের শীর্ষদেশে পঞ্চক্রোশী করতে গিয়ে তাঁদের কেউ মূল শূলভেদ তীর্থও দর্শন করে আসেন নি। যোগীশ্বর নাঙ্গা বাবা তাঁদের জন্য আমাকে কোন অনুরোধ করেও যান নি। এইজন্য আমি তাঁদেরকে ভাণ্ডারার আমন্ত্রণ জানালেও এইখানে এইসময় আসতেও বলে আসি নি। আপনারা পুষ্পপাত্র হতে একটি করে সচন্দন বিল্বপত্র নিয়ে শূলপাণীশ্বরের পূর্বভাগে বিরাজমানা উমাদেবী এবং অদূরে গুহাবাসী মার্কণ্ডেশ্বরের পূজা করে এসে শূলপাণীশ্বরকে মণ্ডলাকারে ঘিরে দাঁড়ান, আমি রহস্য উদ্‌ঘাটন করছি।

পুরোহিতজীর আদেশানুসারে আমরা মা উমা এবং মার্কণ্ডেশ্বরের চরণতলে এক একটি বিল্বপত্র অর্পণ করে পুরোহিতজী সহ শূলপাণীশ্বর লিঙ্গকে ঘিরে দাঁড়াতেই তিনি বলতে লাগলেন – আপনারা এসেই দেখেছেন এবং এখনও দেখছেন শূলপাণীশ্বরের বহিরাবয়ব সুবর্ণমণ্ডিত। সকল ভক্ত যাত্রীরা এসে তাই দেখে থাকেন। তাই সুবর্ণলিঙ্গ নামে ইনি জগৎ প্রসিদ্ধ। আমি অতি প্রত্যূষে এসে এঁর সুবর্ণ আবরণ উন্মোচন করে পূজা করি, পূজান্তে তাঁর প্রকৃত স্বরূপের উপর আবার সোনার ঢাকনা পরিয়ে দিই। পূজান্তে দরজা বন্ধ করে চলে যাই। এক ঘণ্টা বা দেড়ঘণ্টা পরে আবার আসি, দরজা খুলি, তখন অগণিত যাত্রী, ভক্ত, পরিক্রমাবাসী সন্ন্যাসীরা যে যখন আসেন, প্রাণভরে বাবার মাথায় জল ঢেলে পূজা করে থাকেন। আবহমান কাল ধরে এই রীতি চলে আসছে। চলে আসছে আমাদের বংশানুক্রমে। বাবার লিঙ্গমূর্তির পরিমাপে এমন পরিপাটি করে এই সোনার ঢাকনাটি তৈরী যে পরিয়ে দিলে এমনভাবে লেপটে থাকেন যে, কারও সাধ্য নাই বুঝে যে এটি একটি বহিরাবরণ। এইভাবে বাবার প্রকৃত স্বরূপ সাধারণ লোকের দৃষ্টি থেকে ঢেকে রাখা হয়েছে। তিনি মহাদেবের অতি গুহ্য একটি ত্র্যক্ষর বীজ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে করতে আমাদেরকেও তা জপ করে যেতে বললেন। বেলপাতা সরিয়ে তলার দিকে কোথায় কি বোতাম টিপলেন বা অতি সূক্ষ্ম সোনার তারের মত কোন খিল টেনে নিলেন যে, মুহূর্তে ঢাকনাটা উঠে গেল। আমরা স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম তাঁর স্বরূপের দিকে; এও যে দেখছি সুবর্ণ জ্যোতিতে ভাস্বর! শূলপাণীশ্বরের স্বর্ণাভ জ্যোতিতে জ্বলন্ত ঘি-এর প্রদীপের দীপ্তি নিষ্প্রভ হয়ে গেল। আমরা সকলেই নতজানু হয়ে ভক্তি বিগলিত কণ্ঠে ত্র্যক্ষর বীজ জপ করতে করতে বিস্ফারিত লোচনে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

পুরোহিতজীর কণ্ঠস্বর যেন আমাদের চেতনা ফিরে এল। পুরোহিতজী কাঁপতে কাঁপতে দরবিগলিত অশ্রু হয়ে মৃদুকণ্ঠে বলতে লাগলেন – এই মহাজাগ্রত জ্যোতির্লিঙ্গের প্রভাব এবং বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মহামুনি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন –

যথা নদীনদাঃ সর্বে সাগরে যান্তি সংক্ষয়ম্।
তথা পাপানি নশ্যন্তি শূলভেদস্য দর্শনাৎ॥
প্রত্যক্ষো দৃশ্যতে অদ্যাপি প্রত্যয়ো অবণীপতে।
বিস্ফুলিঙ্গা লিঙ্গমধ্যে স্পন্দন্তে স্নানযোগতঃ।
দ্বিতীয়ঃ প্রত্যয়স্তত্র তৈলবিন্দু র্ন সর্পতি॥

অর্থাৎ নদনদীগণ যেমন সমুদ্রের জলে বিলীন হয় সেই রকম শূলভেদ তীর্থে শূলপাণীশ্বরকে দর্শন করলে সকল রকমের কলুষ নষ্ট হয়ে থাকে। অদ্যাপি এই জ্যোতির্লিঙ্গের প্রভাব সম্বন্ধে কয়েকটি প্রত্যক্ষ প্রত্যয় - কারণ দৃষ্ট হয় – (১) স্নানার্থ লিঙ্গ মস্তকে জল দিলেই লিঙ্গ মধ্যে বিস্ফুলিঙ্গ স্পন্দিত হতে দেখা যায়; (২) লিঙ্গের অঙ্গে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করলে তা স্থির থাকেন, কদাচ নিসর্পিত হয় না অর্থাৎ গড়িয়ে পড়ে না।

স্মরণাতীত কাল পূর্বে মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের আমলে যা ঘটত, এই ঘোর কলিযুগেও যে সেই ঘটনা শূলপাণীশ্বর মহাদেবকে কেন্দ্র করে এখনও ঘটে থাকে, এই জ্যোতির্লিঙ্গের সেই প্রভাব যে এখনও অব্যাহত এবং অটুট তা আপনারা প্রত্যক্ষ করুন।

এই বলে তিনি সেই ত্র্যক্ষর বীজ উচ্চারণ করতে করতে লিঙ্গের মাথায় ভক্তি ভরে এক কোশা জল ঢাললেন; জল ঢালতেই আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, একটা তুবড়ীতে আগুন ধরালে তা হতে যেমন অগ্নিকণা ক্রমশঃ উৎক্ষিপ্ত হতে আরম্ভ করে তেমনি ভাবে

জ্যোতির্লিঙ্গের মাথা হতে জ্যোতির কণা কম্পমান অবস্থায় বিস্ফুরিত হতে থাকল। জল নীচে গড়িয়ে পড়তেই পুরোহিতজী একবিন্দু তেল ছিটিয়ে দিলেন লিঙ্গ গাত্রে। অবাক হয়ে আমাদের ১৯জন পরিক্রমাবাসীর ১৯ জোড়া চোখ দেখল, লিঙ্গ গাত্রের যেখানটাতে তেলের বিন্দু গিয়ে লেগেছিল, সেখানেই তা স্থির হয়ে থাকল, গড়িয়ে পড়ল না। পুরোহিতজী তাড়াতাড়ি সোনার ঢাকনাটা ঢাকা দিয়ে দিলেন পূর্বের মত পরিপাটি ভাবে। আমরা প্রায় প্রত্যেকেই টলতে টলতে দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম বাইরে। অব্যক্ত আনন্দ ও উত্তেজনায় আমরা অবশ হয়ে গড়িয়ে পড়লাম মন্দিরের বারান্দায়। প্রায় পনের মিনিট এইভাবে পড়ে থাকার পর আমরা ধীরে ধীরে ধাতস্থ হলাম, উঠে বসলাম।

রঞ্জনকে সময় জিজ্ঞাসা করায় সে জানাল একটা বেজে পনের মিনিট। পুরোহিতজী হাত জোড় করে হিরন্ময়ানন্দজীকে বিনতি জানালেন – অব চলিয়ে হামারা কোঠিমেঁ। আমরা শূলপাণীশ্বরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে হিরন্ময়ানন্দজীর পিছনে পিছনে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে চললাম। মাতাজী কখন যে পৌঁছে গেছেন বাড়ীতে তা লক্ষ্য করিনি। আমাদেরকে দেখে বাড়ীর ভিতর থেকে শঙ্খ ধ্বনি উঠল। পুরোহিতজীর ভাই, পুত্র, পুত্রবধু সকলে এসে আমাদের পা ধুইয়ে মুছিয়ে দিতে লাগলেন, কোনও ওজর আপত্তি তাঁরা শুনলেন না। ডাল এবং গুড় সহযোগে পুরী খেয়ে আমরা যখন যাত্রী নিবাসে আমাদের বিশ্রামস্থলে পৌঁছলাম, তখন বেলা ৩টা বেজে গেছে। আমরা কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে বসে নাঙ্গা মহাত্মারই প্রসঙ্গ আলোচনা করতে থাকলাম। তাঁর স্মৃতিচারণা করতে করতে সবাই আমরা একমত হলাম যে এতবড় উচ্চকোটির মহাত্মাকে আমরা কেউ চিনতে পারি নি। হিরন্ময়ানন্দজী অশ্রুসজল কণ্ঠে বলে উঠলেন – অথচ এ হেন মহাপুরুষকেই আমি শুকদেবেশ্বর হতে যাত্রা করার সময় তিনি আমাদের সঙ্গে পরিক্রমা পথে আসতে আগ্রহী হলেও, তোমাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি সঙ্গে আসতে দিই নি। মহাযোগীকে আটকাতেও পারি নি, avoid করতেও পারি নি। অগ্রবর্তী সমূহ তীর্থেই এসে দেখেছি, তিনি আমাদের আগেই সে সব স্থানে এসে পৌঁছে গেছেন। আমার সেই ব্যবহারের কথা স্মরণ করে আজ আমার মনে এত ধিক্কার এবং ব্যথা যে, তা তোমাদেরকে বলে বুঝাতে পারব না। পরে তাঁর অপার যোগৈশ্বর্যের পরিচয় পেয়ে আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম বটে কিন্তু তার আগে যে রূঢ়তা দেখিয়েছি, তার জন্য মনে আমার বড়ই দুঃখ। মোক্ষড়ী সংগমে আসার পথে তিনি না থাকলে জঙ্গলে সেই ভয়ঙ্কর অজগরের আক্রমণ হতে কিভাবে রক্ষা পেতাম? যে দিন এই মহাতীর্থে এসে পৌঁছালাম তার পূর্বদিন রাতে জঙ্গলের মধ্যে রাত কাটানোর সময় আমাদের দুদিক থেকে আক্রমনোদ্যত হায়না এবং নেকড়ের হাত হতে তিনি যে ভাবে রক্ষা করেছিলেন, অগ্নিবাণ চালনার সেই অলৌকিক বিভূতি কি কখনও ভুলতে পারি? তাঁর চরণকমলে আমাদের যে কৃতজ্ঞতার ঋণ তা জীবনে আর পরিশোধ করার সুযোগ পেলাম না। দুর্গম জঙ্গল পথে তিনি আমাদেরকে পিতার মত, পরম হিতৈষী বন্ধুর মত আগলে আগলে এনেছিলেন। এখন আমরা একান্ত অসহায় হয়ে পড়লাম। এই শূলপাণির ঝাড়ির এখনও বাকী ৮০ মাইল পথ কিভাবে যে পরিক্রমা করব, সেই দুশ্চিন্তাই আমাকে বড় কাতর করে তুলেছে। যা করেন মা নর্মদা। এই বলে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী চুপ করে গেলেন বটে কিন্তু তাঁর চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। হরানন্দজী বললেন – স্বামীজী, মুক্তপুরুষের দিব্য লোকোত্তর গমনে এ ভাবে শোক বিহ্বল হওয়া উচিত নয়। আপনি আত্মস্থ হোন। আত্মস্থ হোন এই ভেবে যে, ঋষি সেবিত ভারতবর্ষে মহাপুরুষের সন্তানে

যোগস্থ হয়ে দেহত্যাগের যে কাহিনী বরাবর শুনে আসছি, সেই মহান্ ধারার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পরিক্রমায় এসেছিলাম বলে তা আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারলাম। আজকাল রেওয়াজ হয়েছে যে কেউ দীর্ঘকাল কোন উৎকট রোগভোগ করে বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকতে বকতে মারা গেলেও কাগজে বিজ্ঞপ্তি বেরোয় অমুক অষ্টোত্তর শতশ্রী ভগবৎ-পাদ বা বিষ্ণুপাদ সজ্ঞানে দেহরক্ষা করিয়াছেন! বীভৎস কর্কটরোগ কুষ্ঠ বা বহুমূত্র রোগে অকস্মাৎ হার্টফেল করে মারা গেলেও লক্ষাধিক শিষ্যের তথাকথিত ইষ্টদেবদের সম্বন্ধেও নানাপ্রকারে সাড়ম্বরে, ঢক্কানিনাদে প্রচার করা হয় 'অমুক মহাত্মা সজ্ঞানে ব্রহ্মলীন হইয়াছেন'! এইসব দেখেশুনে 'সজ্ঞানে' দেহত্যাগের ব্যাপারটা আমার কাছে একটা পরিহাস বাক্য বলে মনে হত। আমি কেবলই ভাবতাম, সত্য ত্রেতা দ্বাপরে যাই ঘটুক, এই ঘোর কলিকালে সজ্ঞানে দেহত্যাগের ব্যাপারটা একটা কথার কথা মাত্র! একদিন গুরুদেবের কাছে আমার এই মনোভাব ব্যক্ত করতে তিনি বলেছিলেন – নারায়ণ! নারায়ণ! তুমি এ রকম কখনও ভেবো না ভগবন! আমাদেরই এই মঠের একজন পূর্বতন আচার্য ছিলেন দণ্ডীস্বামী মণীষ্যানন্দ তীর্থ নামে। তাঁর অসাধারণ মনীষা এবং পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি দণ্ডী সন্ন্যাসীদের সমাজে অসাধারণ "বিচারমল্ল' নামে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর গুরু ছিলেন স্বামী ভাবানন্দ তীর্থ। মহাযোগী ভাবানন্দজী এই কামরূপ মঠের সন্ন্যাসী হলেও তিনি এই মঠে বাস করতেন না, তিনি বিশ্বনাথ মন্দিরের নিকটস্থ তাঁর এক ভক্তের তিনতলা বাড়ীর খোলা ছাদে মুক্ত আকাশের তলায় শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সকল ঋতুতেই একই ভাবে পড়ে থাকতেন শবাসনে। রাত্রি তিনটায় উঠে তিনি দশাশ্বমেধ ঘাটে যেতেন স্নান করতে। স্নানান্তে বিশ্বনাথকে প্রণাম করে উঠে যেতেন তাঁর নিবাসস্থল সেই খোলা ছাদে। সকাল ৮টা নাগাদ তাঁর কাছে গিয়ে মণীষ্যানন্দজী তাঁকে ২/৩টি ঋক্ মন্ত্র শুনিয়ে আসতেন। বেলা ১১টা নাগাদ তাঁর কাছে যেতেন মহারাষ্ট্রীয় সারস্বত ব্রাহ্মণ সর্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত কাকারাম শাস্ত্রী তাঁর স্বরচিত আত্মপুরাণ শোনাতে। এই আত্মপুরাণ একটি মহামূল্য বেদান্তগ্রন্থ, বারাণসীর দণ্ডি-সম্প্রদায়ে এই বই শঙ্করাচার্য রচিত বেদান্ত ভাষ্যের সঙ্গে আজও সমান মর্যাদায় পঠিত ও আলোচিত হয়ে থাকে। তৎকালীন কাশীরাজের সভাপণ্ডিত ভট্টপল্লীর তারাচরণ তর্করত্ন এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন কাশীতে থাকলে প্রতিদিন বিকেলে তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। এঁরা সকলেই মহাত্মা ভাবানন্দজীর ভক্ত ছিলেন। ১৯০৯ সালে মহাত্মা ভাবানন্দজীর বয়স যখন ৮১, তখন একদিন তিনি তাঁর এই চার ভক্তকেই বলেছিলেন, আগামীকাল ১লা চৈত্র, সূর্যোদয়কালে অতি অবশ্যই তোমরা দশাশ্বমেধ ঘাটে উপস্থিত থাকবে, ঐদিন এই মর্ত্যভূমি ত্যাগ করে অমর্ত্যলোকে যাত্রা করব। শরীর জীর্ণ হয়ে পড়েছে, এবার একে ত্যাগ করাই ভাল। তোমরা এখন একথা কাউকে বলবে না। কাল অতি প্রত্যূষেই তোমরা এ সম্বন্ধে পাকা খবর পাবে।

এই সংবাদ শুনে তাঁর ঐ সব শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত এবং মণীষ্যানন্দজী ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যে যার স্থানে ফিরে যান। পরদিন শেষরাত্রে চারজনেই যে যার শয্যাগৃহের দরজায় তিনবার '*ঠক্ ঠক্ ঠক্*' টোকার শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি দশাশ্বমেধ ঘাটে কিঞ্চিৎ আগে পৌঁছে যান। পৌঁছে দেখেন তখন সবে মাত্র সূর্যোদয় হচ্ছে। ঘাটের উপর উত্তর বাহিনী গঙ্গার স্রোতে বিধৌত বুরুজের উপর ভাবানন্দজী বদ্ধ পদ্মাসনে উন্নত মেরুদণ্ডে সূর্যের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। মণীষ্যানন্দজীর দিকে দৃষ্টি পড়তেই তিনি বলে উঠলেন – এখন মনে হচ্ছে, সম্মুখে আনন্দ-সাগর, এই দেহই শুধু প্রতিবন্ধক, মাটির ঢেলার মত, এটি পরিত্যাগ

করতে পারলেই অমৃত পারাবারে মিশে যাবো। এই ছিল তাঁর দেহে থাকাকালীন শেষ বাণী। এই কথা বলেই তিনি উদীয়মান সূর্যের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করলেন। তাঁর শিষ্যরা অশ্রুমোচন করতে লাগলেন। আধঘণ্টা পরে মণীষ্যানন্দজী মহাপুরুষের গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন, দেহ নিস্পন্দ। তিনি চলে গেছেন।

এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার নরনারী মহাপুরুষকে শেষবারের মত দর্শন করার জন্য ছুটে এসেছিলেন। সেইখানে সেই অবস্থাতেই দণ্ডী সন্ন্যাসীরা মহাপুরুষের মৃতদেহকে স্নান করিয়ে পূজা এবং আরতি অন্তে একটি পাথরের সিন্দুকে ভরে নৌকায় করে মণিকর্ণিকার ঘাটে নিয়ে গিয়ে সলিল-সমাধি দিয়েছিলেন। গুরুদেবের বয়স তখন ১২। তিনি তখন তাঁর বিধবা মায়ের সঙ্গে কাশীর বাড়ীতে বাস করতেন। তিনিও তাঁর মায়ের সঙ্গে দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে এই অভিনব দৃশ্য দর্শন করেছিলেন।

গুরুদেব একদিন প্রসঙ্গ ক্রমে তাঁর জীবনের এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেছিলেন 'সত্য ত্রেতা দ্বাপরে মহাপুরুষরা যোগস্থ হয়ে সজ্ঞানে দেহরক্ষা করতেন, এই কলিযুগে এ ঘটনা ঘটে না', এই রকম কোন লঘু এবং চপল উক্তি করবে না। আমি আশীর্বাদ করছি তোমার জীবনেও এইরকম ঘটনা ঘটুক, একদিন এইরকম দৃশ্য স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য তোমার জীবনেও ঘটবে।

গতকাল পূজনীয় নাঙ্গা মহাত্মার দেহান্তের দৃশ্য দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। গুরুদেবের বাক্য বর্ণে বর্ণে মিলে গেল।

নাঙ্গা বাবার স্মৃতিচারণ করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমরা উঠে পড়লাম নর্মদা স্পর্শ করে ভগবান শূলপাণীশ্বরের আরতি দর্শন করতে।

মন্দিরে পৌঁছতেই পুরোহিতজীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁকে আমরা জানালাম যে, রাত্রি প্রভাত হলেই আমরা এখান থেকে যাত্রা করবো সোজা অমরকণ্টকের পথে। আপনার সঙ্গে অত সকালে হয়ত আর দেখা হবে না। আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সুহৃদ ও সহায়কে বাবা কেড়ে নিলেন আমাদের কাছ থেকে, নিজজনকে রেখে দিলেন নিজের কাছে। আমরা পথ ঘাট চিনি না। নাঙ্গা বাবার যে যোগশক্তি এই শ্বাপদ সঙ্কুল দুর্গম অরণ্য পথে আমাদেরকে রক্ষা করে আসছিল, তা থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। বাবাকে বলবেন, তাঁর কৃপা দৃষ্টি যেন আমাদেরকে সতত রক্ষা করেন। আপনার মাতাঠাকুরাণী এবং পরিবারবর্গকে আমাদের নারায়ণ জানাবেন। আপনার কথা আমরা কখনও ভুলব না। নাঙ্গা বাবাকে হারিয়ে এখন আমাদের এমনই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা যে এখান থেকে বেরিয়ে পড়লে মনে হচ্ছে স্বস্তি পাব। হর নর্মদে।

পুরোহিতজী বললেন আপনারা পরিক্রমাবাসী। চরৈবতি মহামন্ত্রের শপথ নিয়েছেন। আপনাদেরকে আটকাবার উপায় নাই। এগিয়ে যেতে হবেই। যাঁর নাম নিয়ে, যাঁকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চলার শপথ নিয়েছেন, তিনিও আপনাদেরকে সর্বাবস্থায় রক্ষা করবেন। কাল শনিবার ২২শে মাঘ (৫/২/১৯৫৫) সর্বশুদ্ধা ত্রয়োদশী তিথি। তবে অনুরোধ, আমার সঙ্গে না দেখা করে যাবেন না। সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে আমার পূজা শেষ হয়ে যাবে। আমি এখানেই বসে থাকব। শূলপাণীশ্বরের নির্মাল্য নিয়ে যাত্রা করবেন। সামনের কতকটা পথ ঘোরালো। আমি কতকদূর পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে গিয়ে সিন্দূরী সংগমের পথ দেখিয়ে দিয়ে আসব। এই মন্দির থেকে সিন্দূরী সংগম প্রায় দশ মাইল। ঘোর ঝাড়ি পথ। সেখান থেকে মাইল আষ্টেক হেঁটে গেলেই ডেহরী সংগমে পৌঁছতে পারবেন। শূলপাণীশ্বর

যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ, মহাতীর্থ, তেমনি নর্মদা তটের উভয়তটে যত ঘোর জঙ্গল আছে, ডেহরীর জঙ্গল তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর, সবচেয়ে কঠিন এবং সবচেয়ে দুর্গম। এখন আপনারা কিছুক্ষণ আরতি দর্শন করে বাবার কাছে প্রার্থনা করে বিশ্রাম করুন গিয়ে যাত্রী-নিবাসে। সকালে দেখা হবে। এই বলে তিনি মন্দিরে ঢুকে গেলেন আরতি করতে।

আমরা তাঁর নির্দেশমত কিছুক্ষণ আরতি দেখে ভগবান শূলপাণীশ্বরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ফিরে এলাম যাত্রী-নিবাসে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কম্বল মুড়ি দিয়েও মনে হচ্ছে আপাদমস্তক হিম হয়ে গেছে। নীচের তলায় বিশোকানন্দজীর কিছু কাঠ চেয়ে নিয়ে এসে হরানন্দজী তাতে আগুন ধরালেন। ধীরে ধীরে ঘর গরম হয়ে উঠল। আমরা কিছু সময় জপ ক্রিয়াদি সেরে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম নাঙ্গা মহাত্মার কথা। তিনি দেহত্যাগ করেছেন, মনে আশঙ্কা জাগছে। শেষ পর্যন্ত এই বিষম শূলপাণীর ঝাড়ি নিরাপদে অতিক্রম করে অমরকন্টক পর্যন্ত গিয়ে জলেহরি পরিক্রমার সংকল্প রক্ষা করতে পারব ত ? উত্তরতট পরিক্রমা করে এসেছি, পথে guide-এর অভাব হয় নি। মহাত্মা সোমানন্দজী, দিওয়ানাজী, নগেন্দ্রভারতীজী প্রভৃতি বিচক্ষণ কোন-না-কোন নর্মদা পর্যটককে সঙ্গী হিসাবে পেয়েছিলাম। মা নর্মদার দয়ায় কোন পথে হাঁটতে হবে, সে নিয়ে আমাকে কখনও কোন কিছু ভাবতে হয় নি। নাঙ্গা মহাত্মাকে পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম যে তাঁর সাথে এই দুর্গম জঙ্গলে হাঁটলে অবলীলাক্রমে অমরকন্টক পৌঁছে পরিক্রমা শেষ করব, কিন্তু তাঁর আকস্মিক পরলোকগমনে কেবলই মনে হচ্ছে সহসা আমাদের নৌকার হাল ভেঙ্গে গেছে, পাল ছিঁড়ে গেছে। তাহলে কি আমাদের পরিক্রমা সফল হবে না ? একি তারই অশুভ ইঙ্গিত ? আমার মনে পড়ে গেল অনিমানন্দ অবধূতের কথা। সেই উলঙ্গ সাধু কোমরে এক টুকরো কাপড় জড়িয়ে ঘুরে বেড়াতেন। গঙ্গা সাগর যাত্রার পথে মাঝে মাঝে তিনি আমাদের গ্রামে এসে আমাদের শীতলা মন্দিরে আসন বিছাতেন। তিনি একবার আমার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য ন্যাংটা হয়ে দেখিয়েছিলেন, তাঁর লিঙ্গটি একটি শেকল দিয়ে বিদ্ধ। দেখে অবাক হয়েছিলাম। তিনি এক বৎসর দু'বৎসর ছাড়া আমাদের গ্রামে এলেই আমি তাঁর কাছে গিয়ে বসতাম। বাবা এবং গ্রামের অন্যান্য প্রবীণ ব্যক্তিরাও বিকেল হলেই তাঁর কাছে গল্প শুনতে আসতেন। তিনি গল্প করতেন কুমায়ুন ও নন্দাঘুন্টির। তাঁর গুরু মহিমানন্দজীর সঙ্গে নন্দাদেবী দর্শনের জন্য কুমায়ুন পর্যটন করেছিলেন। তাঁদের চলার পথে বাগেশ্বর নামক স্থানে সরযূ নদীর সঙ্গে গোমতী নদীর সঙ্গম। দুটি নদীর মিলন স্থলে বাগেশ্বর জনপদ। বাগেশ্বরে সরযূ নদীগর্ভে রয়েছে মার্কণ্ডেয় শিলা। সেই শিলায় উপবিষ্ট হয়ে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় নাকি দুর্গা সপ্তশতী অর্থাৎ চণ্ডীর সমূহ শ্লোক রচনা করেছিলেন আর সেখানেই সেই খরস্রোতা নদীগর্ভে নাকি রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন দেহরক্ষা করেছিলেন। তাঁর গুরু মহিমানন্দজীও সেইখানে সহসা ঝাঁপ দিয়ে দেহরক্ষা করেন। গুরুর দেহান্ত হতেই তাঁদেরকে পর্যটন ত্যাগ করে চলে আসতে হয়। শেষ পর্যন্ত নন্দাদেবীর দর্শন তাঁদের ভাগ্যে ঘটে নি।

এই গল্প তাঁর কাছে বারবার শুনে শুনে আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছল। আজ এতদিন পরে অনিমানন্দ অবধূতের সেই সব প্রসঙ্গ মনে পড়ায় ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখতে পেলাম আমি নাঙ্গা মহাত্মার সঙ্গে তুষার শুভ্র হিমালয়ের কোলে হাঁটতে হাঁটতে বাগেশ্বর জনপদে পৌঁছে গেছি। অদূরেই সরযূর উপর সেই সেতু। সেতুর নীচে মার্কণ্ডেয় শিলাটি আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে আমাকে কিছুক্ষণ তা দেখতে বলে সেতুর উপর কয়েক পাপড়ি এগিয়ে গেলেন। আমি দেখছি খরস্রোতা সরযূর উচ্ছল জলধারা

অবিশ্রান্ত বয়ে চলেছে মার্কণ্ডেয় শিলার উপর দিয়ে, অদূরে গিয়ে মিশছে গোমতীর সঙ্গে। 'জয় শিব শম্ভো' শব্দ শুনে চমকে তাঁর দিকে তাকাতেই নাঙ্গা বাবা আমার দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই ঝাঁপ দিলেন সরযূর জলে!

আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। বিছানার কাছেই অগ্নিকুণ্ড। গনগনে আগুনের লাল আভায় অস্পষ্টভাবে হরানন্দজী রঞ্জন ও প্রেমানন্দজীর মুখ দেখতে পাচ্ছি। আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে নাক মুখ ঢেকে মনে মনে হাসছি স্বপ্নের মধ্যে অঘটন ঘটবার, অদেখা জিনিষ দেখবার বিচিত্র কারিগরি দেখে! এ সব ঘটনা কি অবচেতন মনের কি কোন প্রতিক্রিয়া ? অবচেতনা কি এত জাল বুনতে পারে ?

– ঘুম ভেঙেছে ? আপনিও কি পাশের ঘরের অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেয়েছেন ? নাঙ্গা বাবা যে ঘরটায় থাকতেন, সেখানে কি মনে হচ্ছে না, কেউ যেন পা ঘসে ঘসে হাঁটছে আর অবিরাম 'নমো শিবায়' 'নমো শিবায়' বলে যাচ্ছেন ? হরানন্দজীর ফিস্ ফিস্ করে কথা বলার শব্দে আমি চমকে উঠলাম। আমি ফিস্‌ফিস্ করে বললাম – কৈ আমি তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। আমি তো ঘুমিয়ে ছিলাম, এইমাত্র জেগেছি, আপনি কি ঘুমান নি ?

– না, শুয়ে শুয়ে নাগা বাবার কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ পাশের ঘরটাতে, ঐখানটাতেই তো নাগা বাবা থাকতেন, ঐ ঘরে পা ঘসে ঘসে কেউ যেন চলাফেরা করছেন আর নমো শিবায় বলছেন শুনে গা ছমছম করে উঠল। ঘুম কিছুতেই এলো না। ভয়ে সিঁটিয়ে আছি।

– উঠে দেখে আসি চলুন। মুক্তপুরুষদের কোন প্রেত্যদশা হয় না। তবুও আপনার এই অহেতুক আশঙ্কার অপনোদন দরকার, তা না হলে আপনার কিছুতেই ঘুম আসবে না। এই বলে আমি রঞ্জনের মাথার কাছে টর্চটা নিয়ে কম্বল গায়ে উঠে দাঁড়ালাম। হরানন্দজীও কম্বল গায়ে উঠে দাঁড়ালেন। সাবধানে পা টিপে টিপে গিয়ে দরজাটা খুলে বারান্দায় বেরোলাম। চারিদিকে কী সূচীভেদ্য অন্ধকার। টুপটাপ করে জল ঝরার শব্দ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্‌টায় জঙ্গলের গাছপালাগুলোর নড়ে উঠার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমি হরানন্দজীর হাত ধরে সেই ঘরটার সামনে দরজা ঠেলে টর্চ টিপতেই সারা ঘর আলোয় ভরে গেল। বললাম – দেখলেন ত ? কোথাও কিছু নাই, কেউ নেই এখানে!

তাঁকে আবার ধরে ধরে ঘরে নিয়ে এসে দরজার খিল এঁটে দিলাম। নিজেদের বিছানায় বসে টর্চটা যথাস্থানে রাখতে গেছি, এমন সময় রঞ্জন কম্বলের মধ্যে থেকে ঘুমের ঘোরে বলে উঠল, বাঘ এসেছে না কি ? কি বাঘ ? নেকড়ে ?

– হ্যাঁ।

আধজড়ানো কণ্ঠে রঞ্জন বলল – ওর এখানে এমন সময় কি দরকার ? কামড়াবে নাকি ?

– হ্যাঁ।

– কামড়ালেই হল! কামড়ানো কি চারটিখানি কথা ? বাঘ এলেই সামনেই পাবে হিরন্ময়ানন্দজীকে বাসবানন্দজীকে। ওদেরকে কামড়ালেই বাঘের অর্দ্ধেক রাগ কমে যাবে। আমরা ঘরের এক কোণে আছি। তারপর আগুনের চুল্লী। আগুন ডিঙিয়ে যখন আসবে তখন আর এত এনার্জি থাকবে না। কম্বলের উপর দাঁত ফোটানো অত সহজ নয়, বুঝলেন ? অকাট্য যুক্তি। তাই গম্ভীর কণ্ঠে বললাম – হ্যাঁ, বুঝেছি। এখন আপনি

প্রাণভরে ঘুমান তো ! হরানন্দজী ফিস্ ফিস্ করে বললেন – বাপ্ রে বাপ্ কী ঠাণ্ডা ! এক চিমটি শঙ্খিয়া দিন তো । যা শীত ঘুম আসছে না । কাল সকালে উঠেই আবার হাঁটতে হবে তো !

আমি তাঁকে মোড়ক থেকে এক পুরিয়া শঙ্খিনী দিলাম । মুখে পুরেই তিনি আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন । সকলেই ঘুমে অচৈতন্য । বিভিন্ন সুরে এবং ছাঁদে তাঁদের নাসিকা তালে বেতালে ডেকে চলেছে । আমিও কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম ।

সকাল ৭টায় আমাদের ঘুম ভাঙল । সকলে যে যার ঝুলি কম্বল গাঁঠরী বেঁধে নিয়ে একে একে প্রাতঃকৃত্য সেরে নিতে লাগলাম । যাত্রীনিবাসেই প্রাতঃকৃত্য সারার ব্যবস্থা আছে । নীচে নেমে বিশোকানন্দজীদের সঙ্গে দেখা হল । তাঁরা বেলা ১০টা নাগাদ এখান থেকে রওনা হবেন । তাঁরা পরিক্রমাবাসী নন । তাঁরা প্রতি বৎসর যেমন আসেন তেমনি এসেছেন খান্দেশ থেকে । এখান থেকে তিন মাইল হেঁটে গেলেই নাকি কোথায় কোন্ বাস যাতায়াতের রাস্তা আছে । তাঁরা বাসে করেই এসেছেন, বাসে করেই যাবেন । বাস না পেলে নৌকায় করে যাবেন নাদোদ । আমরা তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে মন্দিরে এসে পৌঁছলাম । তখন বেলা ৮টা । পুরোহিতজী পূজা সেরে বসে আছেন আমাদের অপেক্ষায় । আমরা শূলপাণীশ্বর মহাদেবকে ভক্তি ভরে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে পুরোহিতজীকে সামনে রেখে এগিয়ে চললাম, বিদায় নিচ্ছি এই মহাতীর্থ, মহাসিদ্ধ পীঠস্থান থেকে ।

পূর্বেই বলেছি, এই শূলপাণীশ্বর ক্ষেত্র পাঁচক্রোশ ধরে পরিব্যাপ্ত । জঙ্গলের মধ্যেই এই ক্ষেত্র । আমরা হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে চললাম পূর্বাভিমুখে । বড় বট, অশ্বত্থ, বিল্ব ও যজ্ঞ ডুমুর, বড় বড় শাল সেগুন গাছে ঘেরা এই বন পথে প্রায় আধমাইলটাক হেঁটে যাবার পর আমরা একটা উঁচু পাহাড়ের তলদেশে এসে পৌঁছলাম । ভৃগুতুঙ্গ এবং মূল ভৃগু পর্বত আমাদের অন্যদিকে রয়ে গেল ।

পুরোহিতজী বললেন – উপায় নাই, এ পাহাড়ের শীর্ষদেশে আপনাদেরকে উঠতে হবে । তিনি পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগলেন । আমরাও গা থেকে কম্বল খুলে নিয়ে উঠতে লাগলাম । পাহাড়ের কোল জুড়ে অজস্র ফুল । সাদা হলুদে লাল – বিচিত্র রঙের সমারোহ । বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে মিষ্টি গন্ধ । পাহাড়ময় নানা গাছ । পাহাড় বেয়ে উঠতে উঠতে এক ধরণের বড় বড় গাছ দেখলাম, যার কাণ্ড এবং বড় বড় ডালের মোটা এবং পাতলা পাতলা ছাল অর্থাৎ আস্তরণগুলো আপনা হতে চিড় খেয়ে উঠে গেছে, তার কতক পড়ে আছে গাছের তলায়, কতকগুলো বা এখনও ডালের সঙ্গে জড়িয়ে আছে । একটা ছাল গাছের তলা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে পুরোহিতজী আমাদেরকে দেখিয়ে বললেন – 'এই ছালগুলো চিনতে পারছেন কি ? এইগুলো ভূর্জপত্র । এটা ভূর্জপত্রের গাছ । হিমালয়ের জঙ্গলে এই গাছ অজস্র আছে । শূলপাণির ঝাড়িতেও কোথাও কোথাও এই গাছ দেখা যায় । হিন্দু ভারতবর্ষের এই গাছ বড় পবিত্র এবং বড় আদরের জিনিষ । এই গাছের ছালেই লিপিবদ্ধ হয়েছিল বেদ পুরাণ এবং উপনিষদ । সেই সুপ্রাচীন যুগে যখন বেদব্যাস মুখে মুখে বিশাল মহাভারতের শ্লোক রচনা করেছিলেন তখন সেই শ্লোক শুনে শুনে সিদ্ধিদাতা গণেশ লিখে নিয়েছিলেন এই ভূর্জপত্রে । সেই যুগের কোন ইতিহাস নাই' । পুরোহিতজী বললেন বটে সেই যুগের 'ইতিহাস' নাই তবে আমার মনে হল এই ভূর্জপত্র গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি অতীত যুগকে । প্রাচীন ঋষি মুনির ধ্যানমন্ত্র যেন লহর

তুলছে প্রাণের মধ্যে, কানের মধ্যে। মিনিট খানিকের জন্য আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। হঠাৎ আমার চমক ভাঙল একদল মেয়ের কলকাললিতে। তারা সমস্বরে গান গাইতে গাইতে পাহাড়টার অপর দিক থেকে প্রচণ্ড চড়াই ভেঙ্গে উঠে আসছে আমাদের দিকে। আমরাও চড়াই ভেঙ্গে উঠতে লাগলাম। পিছনে ফিরে দেখতে পেলাম স্রোতস্বতী নর্মদার ধারা। ধীরে ধীরে সব কিছু যেন ছোট হতে লাগল, সেই সঙ্গে আমাদের নিঃশ্বাসও। বেলা বড় জোর দশটা বা সওয়া দশটা এরই মধ্যে আমাদের মুখচোখ চকচক করছে ঘামে। আলখাল্লার নীচে শরীরটা ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছে বুঝতে পারছি। আমরা একদিক থেকে উঠছি আর অন্য দিক থেকে উঠছে সেই মেয়েরা। এক সময় তারা আমাদের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল গান থামিয়ে। মাথা নিচু করে আড়াচোখে দেখল আমাদের ঘামে ভেজা মুখ। রৌদ্রোদ্ভাসিত পাহাড়ে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়া আমাদের শরীরের অবস্থা দেখে ফিক ফিক করে হাসল তারপর আবার চলল এগিয়ে। স্বচ্ছন্দ ওদের গতি, স্বাভাবিক ভাবে প্রচণ্ড চড়াই ভেঙে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে। একটুও ক্লান্তি নাই যেন। একটু দূরেই একদল পুরুষ। মেয়েদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েই ওরা অস্পষ্ট শব্দ করল। মেয়েরা সাড়া দিল খিল খিল করে হাসতে হাসতে। পুরুষের দল একপাল ভেড়া নিয়ে যাচ্ছে তাড়িয়ে আর মাঝে মাঝে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সরু মত লম্বাটে পাথরের টুকরো বা গাছের ডাল গুঁজে দিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে ওরা পথের নিশানা রেখে যাচ্ছে। মেয়েদের কোঁচড়ে কি যেন বাঁধা ছিল, পুরুষদেরও লাঠির মাথায় একটা করে ছোট ছোট পুটলী। পুরোহিতজীকে 'ঐগুলো কি' জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন – কোঁচড়ে করে নিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের কোলে চাষ করা একরকম ঘাসের বীজ পিষে রুটি বানিয়ে। ঐ ওদের ঘরে এবং বাইরে প্রধান খাদ্য।

প্রায় ২০০০ ফুট উঁচু খাড়া পাহাড়ের চড়াই ভাঙতে আমাদের প্রায় দুঘণ্টা সময় লাগল। পাহাড়ের শীর্ষে উঠে অপর দিকে দেখতে পেলাম এক সারি কুঁড়ে ঘর। পাহাড়ীদের বস্তি। হিরন্ময়ানন্দজী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন – উহ্ ক্যা ভীল লোগোঁ কা বস্তি হৈ? মৃদু হেঁসে পুরোহিতজী – নেহিজী! উহ্ লোগো নেঁ ভীল নেহি। লেকিন্ পাহাড়ী তো জরুর। ভীলকা মাফিক লুটেরা নেহি। উহ্ জো জেনানা ঔর মর্দানা লোগোঁ কো দেখা হ্যায়, উহ্ সব্ নে এহি বস্তিকা বাসিন্দা হৈ। আচ্ছা আদমী হ্যায়। ডেহরী কা জঙ্গল মেঁ আপকো ভীল দোস্তকা সাথ ভেট হো সকতা হৈ। এই বলে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। আমাদেরকে বললেন – আর আমি এগোব না। প্রাতঃকালের মূল পূজা সেরে এসেছি। বেলা ১০টার সময় ভগবানের যে পূজা হয় তার ভার দিয়ে এসেছি ছোট ভাই এর উপর। এবার আমি নামবো। নামবার সময় এত কষ্ট হবে না। একটু দূরে যে পাকদণ্ডীটা দেখতে পাচ্ছেন, পাহাড়ের কোল বেয়ে বেয়ে এগিয়ে চলেছে সর্পিল গতিতে। ঐ পাকদণ্ডী পথে নেমে গেলেই তলদেশে যেখানে গিয়ে পৌঁছবেন, সেখানে কুট গাছের ক্ষেত দেখতে পাবেন। কুট গাছ দেখতে ঘাসের মত। পাহাড়ীরা এই কুট ঘাস সংগ্রহ করে শুকিয়ে নেয়। ওজন দরে বিক্রয় করে। এই গাছ তাদের মতে সর্বরোগের মহৌষধি, বিভিন্ন অনুপান সহযোগে বিভিন্ন রোগে পাহাড়ীরা ব্যবহার করে এবং ফল পায়। এই কুট গাছের মাঝে মাঝে একরকম খাঁজ কাটা লম্বাটে গাছ দেখতে পাবেন, তা শুকিয়ে তাতে ওরা নেশার জিনিষ তৈরী করে, গুঁড়িয়ে পিষে ফেলে তাতে রুটি বানায়। মালভূমিতে যেখানেই কুটগাছ বা ঐ খাঁজকাটা লম্বাটে ঘাস জন্মায়, পাহাড়ীরা তার খবর রাখে, পাহাড়তলীর দূর

দূর অঞ্চল থেকে পাহাড় অতিক্রম করে তারা সেখানে পৌছে যায়। এই পাহাড়ের তলায় কুট গাছের ক্ষেত পেরিয়েই চোখের সামনে দেখতে পাবেন এই রকমই উঁচু আর একটি পাহাড়। সেই পাহাড়টা নিরাপদে পেরিয়ে যেতে পারলে আপনারা নিরাপদে সিন্দূরী সংগমে পৌছে যেতে পারবেন। সিন্দূরী সংগম পেরিয়েই ডেহরীর জঙ্গল সুরু। ভগবান শূলপাণীশ্বর আপনাদেরকে সতত রক্ষা করুন। এই বলে ম্লান হাসি হেসে তাঁর দুটো হাত বাড়িয়ে ধরলেন, আমরা সবাই মিলে তাঁর হাত দুটো জড়িয়ে ধরলাম, নারায়ণ নারায়ণ বলতে লাগলাম, আমাদের প্রত্যেকেরই মনের ভিতর কেমন একটা বেদনা যেন, কেমন যেন একটা অভাববোধ। অপরের কথা বলতে পারি না, আমার বুকের ভিতরটা গুরগুর করে উঠল। এই এক আশ্চর্য মানুষ, অন্যান্য পুরোহিতের মত আমাদের কাছে পাওয়ার কোন ধান্দা করেন নি, পরিবর্তে নির্বান্ধব জঙ্গলে একদিন আধদিন নয়, যাত্রী-নিবাসে সাত সাতটা রাত্রি নিরাপদে কাটানোর জন্য থাকার ব্যবস্থা থেকে নিত্য ভিক্ষা প্রাপ্তিরও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, আমাদের পরম বান্ধব নাঙ্গা মহাত্মার দেহান্ত হলে তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ারও সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। সর্বোপরি আর হাজার হাজার যাত্রী ও পরিক্রমাবাসীর মত শূলপাণীশ্বরকে সুবর্ণলিঙ্গ বা ধাতুনির্মিত লিঙ্গ ভেবে আমাদেরকে যে ধারণা করতে হত, তা দূর করেছিলেন ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ দেখিয়ে। এঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই।

ধীর পদক্ষেপে তিনি চলে যাচ্ছেন। পাহাড় বেয়ে খাড়াই পথে যেখানে আমরা উঠে এসেছিলাম, তিনি সেখানে পৌছে উৎরাই-এর পথে দাঁড়িয়ে পড়ে হাত নেড়ে ডাকলেন। আমরা চার পাঁচজন সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গেলাম তাঁর কাছে। তিনি বললেন – একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, এই পাহাড়ের তলায় পৌছে আর একটা যে পাহাড় পাবেন, সেই পাহাড়ে প্রায় প্রতি বর্ষাতে ধস নেমে পথের নিশান চাপা পড়ে যায়। জানিনা, গত বর্ষাতে পাহাড়ের দশা কি হয়ে আছে। ধস নামলেও একটু সাবধানে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন সরু পথের রেখা আবার আত্মপ্রকাশ করে চলে গিয়েছে মালভূমির দিকে। পাহাড়ের খাঁজে মাঝে মাঝে চীর গাছ দেখতে পাবেন। পাহাড়ীরা বিশেষ করে ভীলরা চীর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে টিনে ভর্তি করে। ঐ রসে তৈরী হয় রজন। এইভাবে ঐ গাছের রস পাহাড়ীদের জীবিকা অর্জনে সাহায্য করে। চীর গাছ সাধারণতঃ তুষারাঞ্চলেই বেশী জন্মায়। তবে এখানেও শীতকালে কোন কোন সময়ে বরফাবৃত পাহাড়ে চীর গাছ জন্মাতে দেখা গেছে। চীরগাছ দূর থেকে দেখতে পেলেই একটু সাবধানে পথ চলবেন। সেখানে ভীলদের আনাগোনা বেশী। আর একটা কথা, পাহাড়ের মাথা থেকে উৎরাই-এর পথে নামার সময় গড়গড়িয়ে নামবেন না। কুয়াশা হিম এবং ঝরণার জল চোয়ানোর ফলে পথ ভিজা থাকে, পিচ্ছিল হয়। নামবার সময় টাল সমালাতে না পারলে নিচে পড়ে গিয়ে হাড় গোড় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যে কেউ মারা যেতে পারেন। শিবমস্তু।

এই বলে স্নেহময় মানুষটা আবার ম্লান হাসি হেসে নামতে লাগলেন নিচের দিকে। আমরা আমাদের সঙ্গীদের কাছে ফিরে এসে পুরোহিতজীর শেষ কথা সবিস্তারে বললাম। আমরা পাহাড়ের উপর থেকে দূরে নর্মদার জলধারা দেখতে পাচ্ছি। করজোড়ে সবাই তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে কিছুটা হেঁটে গিয়ে পাকদণ্ডীর মুখে এসে দাঁড়ালাম। হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে সকলে ধীরে ধীরে নামতে লাগলাম পাকদণ্ডীর পথে। এঁকে বেঁকে চলেছে এই পথ। পুরোহিতজী উপযুক্ত শব্দই ব্যবহার করেছিলেন – সর্পিল পথ। সাপের মতই

এঁকে বেঁকে নেমে গেছে তলদেশের দিকে। এই পথে এক সঙ্গে পাশাপাশি দুজন হেঁটে যাওয়ার উপায় নাই, পথ সংকীর্ণ। পথের পাশে কোথাও ছোট ছোট ঘাস, কোথাও বা পাহাড়ী লতাপাতা এসে ছড়িয়ে পড়েছে, লতাপাতায় জড়িয়ে আছে। পাহাড়ের উপরে এইমাত্র প্রদীপ্ত সূর্যের রশ্মি দেখে এলাম কিন্তু এই পথে কোথাও ক্ষীণ রশ্মি এসে পড়েছে। কোথাও বা সূর্যের আলো আদৌ ঢোকে নি। রাত্রিভোর যে কুয়াশা পড়েছিল তারজন্য পথ এখনও স্যাঁতস্যাতে ভিজা ভিজা। লাঠি ঠুকে ঠুকে যাচ্ছি। মুখে এবং মনে কেবলই হর নর্মদে নাম। উৎরাই এর পথে নামছি বলে সাবধানে টাল সামলাতে সামলাতে নামছি, দেহের ভার সম্পূর্ণ লাঠির উপর রেখে। এইভাবে প্রায় ৪৫ মিনিট হাঁটার পর প্রশস্ত মালভূমিতে নেমে এলাম। নেমেই দেখতে পেলাম পাহাড়ের কোন স্থান হতে একটা ঝরণা নেমে এসেছে। ঝরণার জলে প্লাবিত এবং পিচ্ছিল হয়ে আছে যে অংশ, তারই একধারে প্রায় দশ বিঘা জায়গা জুড়ে একটা বিস্তীর্ণ সবুজ গালিচা যেন পাতা হয়ে আছে। ঘাস, ঘাস, শুধু ঘাস। ঘাসের মধ্যে খাঁজ কাটা এক ফুট দেড়ফুট লম্বা শীষ পালং-এর শীষের মত খাড়া উঁচু উঁচু ডগা দেখে অনুমান করলাম এইগুলিই বোধ হয় পুরোহিতজী কথিত কুট গাছ। ক্ষুধা ও তৃষ্ণাতে তখন প্রায় প্রত্যেকেই অস্থির হয়ে পড়েছি, তাই আমরা কোনমতেই ঝরণার জলে স্নান করে ছাতু ভিজিয়ে সবাই এক গোঁড়া দু গোঁড়া করে খেয়ে নিলাম। সামনেই আর একটা পাহাড় ঘনঘোর জঙ্গলে ঢাকা। কিন্তু পুরোহিত মশায় বলে গেছেন এই পাহাড়টা ডিঙ্গিয়ে গেলে তবে সিন্দূরী নদীর সঙ্গমে পৌঁছতে পারব। পাহাড়ের তলদেশেই দেখছি সহস্র সহস্র সিন্দূরী গাছ, তলা থেকে পাহাড়ের উপর পর্যন্ত থাকে থাকে উঠে গেছে। সিন্দূরী গাছ আমি একবার দেখেছিলাম আমাদের সুন্দরবনে। গঙ্গাসাগর মেলায় যাবার পথে সিন্দূরী গাছ রাস্তার ধারে কোথাও দেখা যায়। সিন্দূরী কাঠ খুব মজবুত কাঠ, এই কাঠে ঘরের জানালা কপাট কড়ি বরগা প্রভৃতি হয়। সুন্দরবনের নাম এই সিন্দূরী গাছের জঙ্গলের জন্যই। সিন্দূরী গাছ দেখে আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হল, কি জানি এই পাহাড়েরও সুন্দরবনের মত রয়াল বেঙ্গল টাইগার আছে হয়ত, তাহলেই তো গেছি! যা করেন মা নর্মদা। মনের ভাব কারও কাছে প্রকাশ করলাম না। হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে আমরা পাথরের খাঁজে পা দিয়ে দিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। বেলা তখন সওয়া দুটো। সিন্দূরী গাছের মোটা মোটা গুঁড়ি তার শাখা প্রশাখাও হলদেটে। গাছের পাতায় কিন্তু প্রথমে সবুজাভা থাকে পরে চালতা গাছের পাতা পেকে গেলে যে রকম হয় সেই রকমই হয় দেখতে। সিন্দূরী গাছের সঙ্গে শাল সেগুন বহেড়া ও আমলকী গাছও যথেষ্ট। ছোট ছোট গাছের মাথা জড়িয়ে ধরে, কোথাও মোটা মোটা লতাকে আঁকড়ে ধরে সাবধানে পাথরের খাঁজে পা রেখে রেখে আমরা চড়াই পথে উঠতে লাগলাম। এইভাবে প্রায় আধঘণ্টা হেঁটে আমরা সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। শেষকালে গাঁঠরী ঝোলা কমণ্ডলু এমন কি হাতের লাঠিটাও পিঠে ফেলে পিঠের সঙ্গে বেঁধে ফেললাম। প্রত্যেকের সঙ্গে তিন চারফুট করে কাছির মত মোটা দড়ি ছিল বলে রক্ষা। প্রত্যেকের গামছাও পিঠে পেটে ভাল করে বেঁধে ফেললাম। তারপর হুমড়ি খেয়ে অর্ধবক্র হয়ে ডন ভাঁজার যেমন pose করা হয়, সেই ভঙ্গিতে চার হাত পা দিয়ে উঠতে লাগলাম চড়াই। দুহাত দিয়ে সামনে উঁচু কোন পাথর বা ছোটগাছ জাপটে ধরে আর পা দুটো দিয়ে ছোট ছোট পাথরের খাঁজে ঠেকা দিয়ে পনের মিনিট কাল পাহাড় বেয়ে উঠার পর আমরা কিছুটা সমতল স্থান পেলাম। একটা গাছের তলায় বসে হাঁপাতে লাগলাম। দর বিগলিত ধারে ঘাম ঝরে যাচ্ছে, ঘামে

প্রত্যেকেরই পরিধেয় বস্ত্র এবং গায়ের জামা বা আলখাল্লা ভিজে সপসপে্ হয়ে গেছে। যে গাছের তলায় বসে আমরা জিরিয়ে নিচ্ছিলাম, গাছের উপর দিকে তাকিয়ে চিনতে পারলাম যে গাছটা ভূর্জগাছ। গাছের ডালে কাগজের মত পাতলা আঁস কতক খুলে পড়ে গেছে, কতক বা ডালের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বনের মধ্যে গাছপালার মড়মড় শব্দ শুনে ভয়ার্ত হয়ে তাকিয়ে দেখি সাঁই সাঁই শব্দে একপাল হরিণ ছুটে যাচ্ছে। পেছন থেকে তাদেরকে তাড়া করে আসছে একপাল বুনো কুকুর। বাসবানন্দজী বেশ উষ্মাভরা কণ্ঠে হিরন্ময়ানন্দজীকে বলে উঠলেন – আপনি কি মশায় সত্যিই শূলপাণির ঝাড়িতে এর আগে এসেছিলেন ? তাহলে এই দুর্গম দুরারোহ পাহাড়ের কথা বলেন নি কেন ? পথের এইরকম দুর্গমতা এবং কষ্টের কথা জানা থাকলে কে মরতে আসত মশায় এই পথে ? এখান থেকে ফিরে যাবারও তো কোন উপায় দেখছি না। এই নির্বান্ধব জঙ্গল দেশে দেখছি শেষ পর্যন্ত হয় পাহাড় হতে পড়ে গিয়ে নয়ত বাঘের পেটে বেঘোরে মরতে হবে।

হিরন্ময়ানন্দজী চুপ করে রইলেন, বাসবানন্দজীর অভিযোগের কোন উত্তর দিলেন না। আমরা সকলে উঠে পড়ে আবার চড়াই বেয়ে উঠতে লাগলাম। প্রায় ১৫ মিনিট হেঁটে সুরু হল উৎরাই। নিচের দিকে দৃষ্টি ফেলে বুঝলাম এই উৎরাই-এর পথ বেশী দূর এগোয় নি। লাঠির সাহায্য ছাড়া এই উৎরাই-এর পথে নামা যাবে না। পিঠ থেকে যে যার লাঠি টেনে নিয়ে লাঠির উপর ভর দিয়ে নামতে লাগলাম। পাহাড়ের উপর বোধ হয় ধস নেমেছিল বর্ষাকালে। বড় পাথরের চাঙড় ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেছে। এই ধসের উপর দিয়েই প্রায় ১৫০ ফুট নেমে আবার উঠতে হবে। ধসের ওপারেই পাহাড়ের খাড়া দেওয়াল দেখা যাচ্ছে। তার মানে উৎরাই-এর পর আবার চড়াই। আমরা ধসের জায়গায় পা দেবার আগে দাঁড়িয়ে পড়ে নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করে নিলাম। লাঠি বাড়িয়ে সামান্য ঠুকে দেখলাম লাঠি গুঁড়ো গুঁড়ো পাথরের মধ্যে বসে যাচ্ছে। ব্রহ্মচারী তুরীয় চৈতন্য জোয়ান মানুষ, বলিষ্ঠ শরীর। সে রঞ্জনের হাত ধরে নীচে পা বাড়াল, পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো পাথর ঝুর ঝুর করে গড়িয়ে পড়তে সুরু করল। রঞ্জনের সঙ্গে আরও দুজন হাত বাড়িয়ে তুরীয় চৈতন্যকে তাড়াতাড়ি টেনে তুলল। ব্রহ্মচারীকে টেনে তুলতে গিয়ে তার পায়ের যেটুকু চাপ পড়েছিল, তাতেই দেখা গেল আরও বেশী পরিমাণে কুচি কুচি পাথর গড়িয়ে পড়তে লাগল। গড়িয়ে পড়ার শব্দ আর শেষ হয় না। আমি বললাম, এই বিপজ্জনক পথে তো যাওয়া যাবে না। এমনিতে তো গুঁড়ো পাথরের ভিতর পা ঢুকে যাচ্ছে। তারপর মাধ্যাকর্ষণের বলে যদি কয়েক ফুট নিচে নেমে যেতে হয় ধসে যাওয়া পাথরগুলোর সঙ্গে আর কোন গতিকে যদি বেড়ে যায় মাধ্যাকর্ষণের বেগ তাহলে প্রাণ সমেত দেহটা আর মাটি স্পর্শ করার সুযোগ পাবে না, তার আগেই মাঝপথেই দেহ থেকে প্রাণ-পাখী ফুড়ুৎ করে উড়ে যাবে। হরানন্দজী বললেন – কথাটা ত ঠিক কিন্তু এখন উপায় কি করি ? হায়, আজ যদি নাঙ্গা বাবা সঙ্গে থাকতেন তাহলে এত ভাবতে হত না। আমরা কি শেষ পর্যন্ত সিন্দূরী সংগমে পৌছাতে পারব না ? তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই আমাদের পিছন দিকে খানিকটা উপরে চ্যাঁ-এ্যাঁ-চ্যাঁ-এ্যাঁ, কুঁক্-কুঁক্ শব্দে দুটো শঙ্খ চিল এবং একটা ডম চিল ঝটাপটি খেতে খেতে একটা সিন্দূরী গাছের মগডাল হতে নিচে পড়ল, ডম চিলটা পড়ে রইল আর দুটো শঙ্খচিল উঠে গেল আকাশপথে। প্রেমানন্দ বললেন – 'আমার মা শঙ্খচিলকে বলতেন শংকর চিল, যার দুটো ডানাই লালচে রংএর, পেটটা সাদা আর ডম চিল পাঁশুটে কালচে রঙের। তাঁর মতে শংকর চিল শুভ আর ডম চিল অশুভ। চলুন, যে যার লাঠি আবার পিঠে লম্বাভাবে গুঁজে নিয়ে ঐ হলদেটে গাছটার কাছে উঠে যাই ডন দিবার ভঙ্গীতে। আমাদের তখন মনের অবস্থা এমন যে

তাঁর কথাকেই সবাই সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিলাম। আমরা চড়াই-এর পথে হুমড়ি খেয়ে দুহাত সামনে মিলে পাথরের খাঁজ জাপটে ধরে দুই পায়ের ঠেকা দিয়ে দিয়ে উঠতে লাগলাম উপরের দিকে। শ্বাস টানতে টানতে হাঁপাতে হাঁপাতে কেবলই সকলে বলে চলেছি হর নর্মদে হর, হর নর্মদে হর। চিলদের ঝটাপটি দেখে মনে হয়েছিল, সিন্দূরী গাছটা খানিকটা উপরে কিন্তু প্রায় ৫০ ফুট পাথরের খাড়া কালো দেওয়াল, যে দেওয়ালে অজস্র গ্র্যাব অর্থাৎ শিরা উপশিরার চিহ্ন, তা অতিক্রম করে মালভূমির কিছুটা অপ্রশস্ত অংশে পৌঁছে ক্লান্তিতে লুটিয়ে পড়লাম পাথরের উপরে। সত্যিই সেই সিন্দূরী গাছের তলায় একটা ডম চিল ক্ষত বিক্ষত হয়ে পড়ে আছে। তবে মরে নি, বেঁচে আছে। প্রেমানন্দ বললেন – বুঝতে পারছেন কি, একটা শঙ্খচিল বা শংকর চিল শংকরের প্রতীক আর তাঁর সঙ্গী যিনি, তিনি শংকর দুলালী স্বয়ং নর্মদা ? এতগুলো দণ্ডী সন্ন্যাসী ধসের মুখে এগিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুবরণ করত, তাই দেখে মৃত্যু দেবতা যমের প্রতীক ডম চিলটাকে ক্ষত বিক্ষত করে স্বয়ং শিব এবং শিব দুহিতা আমাদেরকে রক্ষা করে গেলেন। এখন চলুন এগিয়ে যাই, বেলা ৩টা বেজে গেছে। প্রেমানন্দ দার্শনিক মানুষ ভাবাবেগে কথা বলেন, তাঁর কথা শুনতে খুব ভালই লাগল কিন্তু মনের উদ্বেগ কারও গেল না। আমরা হাঁটতে লাগলাম, প্রায় ২০০ ফুট হেঁটে যেতেই দেখতে পেলাম, একটি ছোট্ট জলধারা পাহাড় ভেদ করে পাহাড়ের গা বেয়ে নিচের দিকে ছুটে চলেছে, ভাল করে এদিক ওদিক তাকাতেই দেখতে পেলাম সেই জলধারার পাশে পাশে পাহাড়ের খাঁজে কতকগুলি চীর গাছ। বনের অন্যান্য গাছপালার মধ্য থেকে ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। চীর গাছ দেখেই পুরোহিতজীর কথা মনে পড়ল। তিনি বলেছিলেন চীর গাছের রস থেকে রজন তৈরী হয়, তা বেচে গরীব পাহাড়ী লোকরা বিশেষতঃ ভীলরা তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে। তাদের যাতায়াত আছে বলে যে জলধারা পাহাড় ভেদ করে নিচের দিকে বয়ে যাচ্ছে তার পাশে পাশে একটা সংকীর্ণ রাস্তারও সৃষ্টি হয়েছে। আমরা সেই পথ দিয়ে লাঠি ঠুকে ঠুকে হাঁটতে লাগলাম। পাহাড়ের গাছে এবড়ো খেবড়ো পাথর এলোমেলো ভাবে পড়ে থাকলেও হাঁটতে কোন অসুবিধা হল না। রজনের লোভে ভীলরা এখানে আসে বুঝতে পারলেও আমি ভরসা দিলাম, এই অবেলায় অপরাহ্ণ কালে নিশ্চয়ই এখন এ পথে পাহাড়ীরা কেউ আসে নি, আসলেও মধ্যাহ্নের পূর্বেই তারা ফিরে গেছে। প্রায় শতখানিক ফুট নিচে নামবার পর দেখলাম, সুতোর মত সরু সেই মূল জলধারার সঙ্গে আরও দুটি সরু জলধারা দুদিক থেকে এসে মিশেছে। নিচে নামবার সঙ্গীর অভাব হয় না। আরও নিচে হয়ত এগিয়ে এসেছে শত শত জলধারার কৈশিকা নাড়ী, সকলের সমবেত শক্তি নিয়ে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। ঐ ত্রিধারা একত্রিত হয়ে উচ্ছল হয়ে উঠেছে, সবাই মিলে জুগিয়েছে দীর্ঘপথ চলার প্রাণ-প্রবাহ। জলের প্রবাহ ক্রমশঃ প্রশস্ত হয়ে নিচে গিয়ে বোধ হয় দূরে যে এখান থেকেই নর্মদা প্রবাহ দেখতে পাচ্ছি, তারই সঙ্গে মিলিত হয়েছে! তাহলে এইটাই সিন্দূরী নদী ? তা যদি হয়, তাহলে তো সঙ্গমস্থলে পৌঁছতে পারলেই একটি নদীর আদি ও অন্ত দেখা হয়ে যাবে!

জলধারা ক্রমে ক্রমে যেমন একটু একটু করে প্রশস্ত, প্রশস্তরা হচ্ছে, আমাদের রাস্তার রেখাপথও ক্রমশঃ সরে সরে যাচ্ছে। সামনে আছেন হিরন্ময়ানন্দজী, তাঁর পিছনে হরানন্দজী, তারপর আমি, আমার পিছনে রঞ্জন এইভাবে পরপর। হঠাৎ একজন ব্রহ্মচারী থমকে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল – আপনারা দাঁড়িয়ে পড়ুন। এখানে এসে দেখে যান একটা মূর্তি। অপূর্ব সুন্দর কারুকলা। স্থাপত্য শিল্পের এমন কারিগরি এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে অনাদরে পড়ে আছে। আমরা পিছনের দিকে কয়েক step হেঁটে একটা সিন্দূরী গাছের তলায় একটি সত্যিই অপূর্ব সুন্দর জটাজুট মূর্তি দেখতে পেলাম। কালো পাথরের প্রায় ৩ফুট উঁচু এই মূর্তির চারপাশে লম্বাটে পাথরের slab ছোট ছোট খুঁটির মত পোঁতা আছে। কোন

মন্দির নাই, এ মূর্তি কারও পূজার প্রত্যাশা করে না। স্থানীয় ভীলরা রজনের লোভে এবং কোন কোন পরিক্রমাবাসী পরিক্রমার পথে এ পথে আসেন কদাচিৎ আমাদের মতই বাধ্য হয়ে। হিরন্ময়ানন্দজী মন্তব্য করলেন – এই মূর্তি বোধ হয় বেদব্যাসের। আমি বললাম – আমার মনে হয় এই মূর্তি মা নর্মদার মানস পুত্র মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের। এই কল্পনাত্তস্থায়ী মহাপুরুষের ধ্যানজ্ঞান ছিলেন মা নর্মদা। দেখছেন না মূর্তিতে তাঁর আয়ত চক্ষু দুটি অদূরে কলস্বনা নর্মদার প্রবাহের দিকে কেমন ভাবাবেশে তাকিয়ে আছেন। বলিহারী নির্মাতার কারিগরীকে। ব্যাসদেবও নর্মদা তটে এসেছিলেন বটে কিন্তু তিনি যেখানেই গিয়েছিলেন এবং কিছুদিন ধরে তপস্যা করেছিলেন, তপোভূমি নর্মদার সেই সব স্থান তীর্থের মর্যাদা পেয়েছে। সকল স্থানেই গড়ে উঠেছে শিব মন্দির। আমি উত্তরতট পরিক্রমা করার সময় কোন মহাপুরুষের মুখে শুনেছিলাম যে শূলপাণির ঝাড়ির কোন স্থানে বসে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় স্কন্দপুরাণ রচনা করেছিলেন। স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডে তিনি অবন্তীক্ষেত্রের বর্ণনা দিয়েছেন ৭১টি অধ্যায়ে, ৮৪টা জ্যোতির্লিঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন ৮৪টি অধ্যায়। আর মা নর্মদার মহিমা বর্ণনা করেছেন রেবাখণ্ডম্ নাম দিয়ে ২০০টি অধ্যায়ে। আমার মনে হয় মহর্ষি এখানে বসে লিখেছিলেন ঐ বিরাট পুস্তক। আমরা মহর্ষির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে জলধারার গতিপথকে অনুসরণ করে উৎরাই-এর পথে নামতে লাগলাম। প্রত্যেকেই দুএকবার হোঁচট খেতে খেতে লাঠি ঠুকে ঠুকে এগিয়ে চললাম পাহাড়ের তলদেশের দিকে। উপরদিকে তাকিয়ে গাছপালার শোভা দেখা বা অরণ্যের বিচিত্র পাখীদের কলরব শোনা বা দাঁড়িয়ে তাদের অঙ্গসৌষ্ঠব দেখারও অবসর নাই, সন্তর্পণে পা ফেলার দিকে মন দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ নাই। চলার পথে গাছপালার নিচে অন্ধকার কোথাও কোথাও ছায়া ফেলেছে দেখে বুঝছি সূর্য ক্রমশঃ পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছেন। কথা বলতে বলতে পথ চললে পথের ক্লান্তি অনেকটা দূর হয়, তাই আমি কথা বলতে লাগলাম। বললাম, এখানে তো কেউ বাস করে বলে মনে হয় না, দূরে দূরে পাহাড়তলীতে হয়ত কোন বস্তি আছে, যদি তাদের সঙ্গে দেখা হত তাহলে সদ্য দৃষ্ট ঐ মার্কণ্ডেয় মূর্তিকে কেন্দ্র করেই কোন গল্প শুনতে পেতাম, সাধারণ লোকের দৃষ্টি কল্পনা বিলাসী, সমতলেই হোক আর পাহাড়েই হোক নানা রকম পৌরাণিক কাহিনী তা যতই কুসুমিত পল্লবিত হোক, তার উপর রং-এর পর রং চাপিয়ে তাই নিয়েই তাদের কাল কাটে। সাধারণ লোক বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ নিয়ে মাথা ঘামায় না। পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়ানো আছে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত। নদী ঝরণা পাহাড়েরও ভাষা আছে, কাহিনী আছে। সে সব কাহিনী নিয়েই স্থানীয় সাধারণ লোক কাল কাটায়। ঐ সব কাহিনীর সত্যতা যাচাই করা সম্ভব নয়। কারণ পুরাণ বিজ্ঞান নয়, ইতিহাসও নয়। ঐতিহাসিক সত্য স্থাপনের জন্য যে সমস্ত তথ্যের প্রয়োজন, পৌরাণিক গল্পকথায় সেই সব তথ্যের কোন যুক্তিনিষ্ঠ ধারাবাহিকতা থাকে না। নাই-বা রইল তথ্যের ধারাবাহিকতা, তবু ভাল লাগে সেই সব ইতিবৃত্ত শুনতে।

অতীতে কোথায় কোন যুগে অর্জুন গিয়েছিলেন হিমালয়ে, কোথায় কোন্ পর্বতে কিরাতবেশী পশুপতির সঙ্গে যুদ্ধ করে পরে তাঁকে স্তবে তুষ্ট করে বর পেয়েছিলেন, সেই পর্বত এখন আছে কি নাই, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় এই পর্বতে বসে বসে স্কন্দপুরাণ রচনা করেছিলেন কি না – এই সব প্রশ্ন মনের মধ্যে বেশীক্ষণ টিকতে পারে না। অবিশ্বাসী মনও স্তব্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ কৃচ্ছ্রসাধন আর প্রতীক্ষার পরিসমাপ্তিতে যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও উপভোগের সন্ধান মিলে তার মূল্যায়ন হয়ে উঠে অসম্ভব। এমনি করেই মর্তে অমরাবতী নেমে আসে। তাই বুঝি হিমালয়ে নন্দনকাননের শেষ নাই। ব্রহ্মলোক বিষ্ণুলোক শিবলোক সব পাশাপাশি।

প্রলয়দাসজী নামে এক মহাত্মা উত্তরতট পরিক্রমা করার সময় ওঁকারেশ্বর জঙ্গলে আমাকে কিছু রোমাঞ্চকর তথ্য শুনিয়ে মন্তব্য করেছিলেন – আমার কথায় বিশ্বাস কর, বিশ্বাস চাই। ঈশ্বর আছে কি নাই, এ বিশ্বাস নয়। যা তোমার দৃষ্টির সম্মুখীন হয়েছে, তোমার মনের উপর যার প্রতিফলন হয়েছে, তার প্রতি বিশ্বাস। ইন্দ্রিয়ের কার্যক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস। সে বিশ্বাস ভাব বিলাসী করে তুলুক ক্ষতি নাই। দর্শনের যে আনন্দ, সে আনন্দ আনন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে নেওয়া কণা মাত্র। তার ছোঁওয়া শুধু দর্শকের দৃষ্টিকে পরিতৃপ্ত ও সার্থক করে না, সার্থক করে সর্বকালের দৃষ্টিকে, দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমিভরা দৃষ্টিকে।

আমরা গল্প করতে করতে পৌছে গেলাম পাহাড়ের তলদেশে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য, তখনই নূতন চিন্তা দেখা দিল, বেলা তখন পৌনে পাঁচটা। পাহাড় থেকে তো নেমে এলাম কিন্তু রাত্রিবাস করব কোথায় ? এই জঙ্গলের মধ্যে ? নর্মদাকে দেখা যাচ্ছে, আমরা যে জলধারাকে অনুসরণ করে এলাম তা বেঁকে ছুড় ছুড় কলকল শব্দে মিশেছে গিয়ে নর্মদায়। এই জলধারাই তাহলে সিন্দূরী নদী, এই পাহাড়ের শীর্ষদেশে যেখানে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের সেই সুন্দর মূর্তি সিন্দূরী গাছের তলায় দেখে এলাম, সেই স্থানেই তাহলে সিন্দূরী নদীর উৎসস্থল ? কিন্তু অত কিছু ভাববার সময় নাই, এখন আমরা রাত্রি কাটানোর স্থান খুঁজতে মনে প্রাণে ব্যগ্র হয়ে পড়লাম ; এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, এমন সময় পাহাড়ের গায়ে একটা কালো পোড়া দাগ দেখে সবাই সেদিকে এগিয়ে গেলাম, গিয়ে দেখি সেখানে পরপর দুটি গুহা, একটি ছোট, একটি বড়। গুহার বাইরে এবং ভিতরে অনেক পোড়া কাঠের অবশিষ্ট অংশ পড়ে আছে। বুঝলাম, আমাদের পূর্বে অপর কোন পরিক্রমাবাসী এখানে নিশ্চয়ই রাত্রি কাটিয়ে গেছে কিন্তু সে কবে ? কতদিন আগে ? গুহার মধ্যে কোন হিংস্র জন্তু নাই তো ? আমরা হাতের লাঠি গুহার ভিতরে ঢুকিয়ে প্রাণপণে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে লাগলাম, রঞ্জন দুটো গুহার মধ্যে টর্চ টিপে দেখে নিল ভিতরটা। যখন নিশ্চিন্ত হলাম, গুহার মধ্যে কোন জন্তু জানোয়ার নাই, তখন অপেক্ষাকৃত ছোট গুহাটিতে ৮ জন এবং বড়টিতে ১১ জন করে ঢুকে গিয়ে সেই পোড়াকাঠগুলোর সঙ্গে কিছু কাঁচা কাঠ কেটে মিশিয়ে দুই গুহার মুখে দুটো বড় বড় অগ্নিকুণ্ড জ্বালার ব্যবস্থা অতি দ্রুত করা হল। দুই গুহার মধ্যে দুটো মোমবাতি জ্বেলে সকলের কম্বলাদি পেতে ঠাসাঠাসি গুঁজাগুঁজি করে শোওয়ার ব্যবস্থা করা হল। সিন্দূরী নদীর সেই জলধারা থেকে সকলে কমণ্ডলু ভরে জল নিয়ে এলাম।

কাঠের স্তূপ ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে কমণ্ডলু ভরা জল নিয়ে গুহার ভিতরে ঢুকে গেলাম আমরা। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। পাতলা চাদরের তলায় যেন ঢাকা পড়ে গেল সমস্ত পৃথিবী। কালো চাদর, তবু উত্তর-পশ্চিমে সূর্যাস্তের লোহিত আভা থোকা থোকা ছড়িয়ে আছে মেঘের গায়ে। সামনের পাহাড় গুলোর মাথায় তুলোর আঁশের মত পাতলা মেঘ। লাল মেঘ একটু করে কালচে হচ্ছে। চারদিক নীরব নিস্তব্ধ। কাছেই সিন্দূরী নদীর জলধারা নর্মদাতে মিশে সংগম হয়েছে কিন্তু তার গর্জন গুহার মধ্যে ক্ষীণভাবে শোনা যাচ্ছে। দুটো গুহাতেই কাঠের স্তূপে হরানন্দজী আগুন জ্বালালেন। কাঁচা কাঠের ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে, প্রত্যেকের দু চোখ জলে ভরে গিয়েছে। বাইরে যে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপ্টা বইছে তার থেকে রেহাই পাওয়া গেছে। বিছানায় বসে প্রত্যেকে যে যার ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করছেন, আমি স্মরণ করছি আমার পরম দয়াল পিতা ঠাকুরকে। ক্রমশঃ ধোঁয়া কেটে গিয়ে আগুন গনগনে হয়ে উঠল। প্রায় ঘণ্টা খানিক কেটে যাবার পর যখন সকলে কম্বল মুড়ি দিয়ে শোবার উপক্রম করছি এমন সময় গুহার বাইরে একটা ভারি পদ শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে যেন। তা গুহার মুখে এসে

দাঁড়াল। আগুনের চুল্লীর কাছাকাছি হতে সবাই দেখলাম কালো বিশালকায় একটা দৈত্য মুখটা ঘোড়ার মত গুহার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সকলেরই চোখে মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন, ভয়ার্ত দৃষ্টি! হর নর্মদে, হর নর্মদে, জয় শূলপাণীশ্বর বলে আমরা করুণ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলাম। বীভৎস মূর্তিটা ধীরে ধীরে সরে গেল আমাদের কাছ থেকে। বাঁচলাম আমরা, ঘর্মাক্ত হয়ে গেছি। কিন্তু ওটা কি?

আমাদের গুহার কাছ থেকে সরে যেতে আমরা বাঁচলাম বটে কিন্তু মিনিট খানিক পরেই পাশের গুহা থেকে আমাদের অপরাপর সঙ্গীরা আর্তনাদ করে উঠলেন। বুঝলাম ঐ ভয়ংকর জীবটা নিশ্চয়ই তাঁদের গুহার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তাকে দেখতে পেয়ে তাঁরা পরিত্রাহি চীৎকার করছেন। মুখ বাড়িয়ে যে সেখানে কি ঘটছে, তা দেখারও উপায় নাই। জ্বলন্ত কাঠের আগুন আমাদের গুহার মুখ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। আমরা প্রাণপণ চীৎকারে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে লাগলাম আর তারস্বরে প্রার্থনা করতে লাগলাম – 'মা নর্মদা গো! আমাদেরকে রক্ষা কর, বাঁচাও। সকলকে আগুনের জন্য আমাদের বেরোবার উপায় নাই। অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে লাগলাম সকলে। মিনিট তিনেক পরে তাঁদের আর্তনাদ থামল। আমরা আগুনের আভায় দেখতে পেলাম সেই ভয়ংকর জীবটা হেঁটে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। তার হাঁটার সময় চলার ভঙ্গী দেখে বুঝলাম মনুষ্যাকৃতি জীব; তুরীয় চৈতন্য বলল, সে দেখেছে তার কোমর থেকে একটা কামটা ঝুলছে। আমরা সিদ্ধান্ত করলাম, এই জীব এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে যে উদ্দেশ্যে এসে থাকুক সে মানুষ। হরানন্দজী প্রাণপণ চেষ্টায় তাঁর চিম্‌টা দিয়ে জ্বলন্ত কাঠগুলোকে গুহামুখ থেকে কিঞ্চিৎ সরিয়ে মুখ বাড়িয়ে চীৎকার করে বললেন – প্রেমানন্দ সাড়া দাও, তোমরা বেঁচে আছ তো? চিম্‌টা দিয়ে আগুন সরিয়ে তোমরা বল ঐ ভয়ংকর জীবটা তোমাদের কারও কোন ক্ষতি করে যায় নি ত? তিন চারবার এইভাবে বলার পর প্রেমানন্দ চীৎকার করে জানালেন – না, না, আমরা সব ভাল আছি। জীবটা যাবার সময় বলে গেছে - ছত্তি - হিত্তি - হেৎ, সেৎ, খেৎ। যাক্ জীবটা যতই বিকট দর্শন হোক, যে উদ্দেশ্যেই আসুক, আগুনের জন্য ঢুকতে পারে নি, আমরা এখনও বেঁচে আছি! নিশ্চিন্ত মনে আমরা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। আমার বাঁ পাশে রঞ্জন এবং ডান পাশে তুরীয় চৈতন্য। সব ঠাসাঠাসি অবস্থা। আগুনের তাপের জন্য কনকনে ঠাণ্ডা আমাদের মালুমই হচ্ছে না। সকলেরই ক্রমে ক্রমে নাক ডাকতে শুরু করল। আমার চোখে কিন্তু ঘুম এলো না। মাথার মধ্যে ছত্তি-হিত্তি-হেৎ, সেৎ, খেৎ এই শব্দ কয়টা ঘুরপাক খেতে লাগল। কোথাও যেন শব্দ কয়টা পড়েছি বা কারও মুখে শুনেছি! কিন্তু কিছুতেই তা স্মরণ করতে পারলাম না। শুয়ে শুয়ে ছট্‌পট করতে লাগলাম। এমন সময় মনে হল কেউ যেন আমার আলখাল্লার পকেটে হাত ঢুকিয়ে মহাত্মা কৃপানাথ প্রদত্ত হাতাজোড়ি বা করপুটিয়া বের করে নেওয়ার চেষ্টা করছে। পকেটের ভিতর তার হাতটা সজোরে জাপ্‌টে ধরে চীৎকার করে উঠলাম – রঞ্জন ওঠ, ওঠ, টর্চটা জ্বালত, চোরটার মুখ দেখি! রঞ্জন ধড়ফড় করে জেগে উঠেই টর্চটা টিপতেই গুহা আলোকিত হয়ে উঠল। চোরের মুখ দেখেই বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে উঠলাম। এ যে তুরীয় চৈতন্য! ইতিমধ্যে সবাই জেগে উঠেছেন। তখনও ব্রহ্মচারী হাতটা পকেট থেকে সরিয়ে নেবার জন্য ঝট্‌কা মারছে। আমি তার কব্জিতে মোচড় দিয়ে বললাম – এই বামুনের কব্জিতে ভয়ানক জোর, বেশী হাপ্‌টা হাপ্‌টি করলে ভেঙ্গে দিব হাত। নির্লজ্জ কোথাকার! হিরন্ময়ানন্দজী ব্রহ্মচারীর গালে চড় মেরে বললেন – দেখলে হরানন্দ! কামরূপ মঠে থাকতে থাকতেই এর চৌর্যবৃত্তি আমার চোখে ধরা পড়েছিল। সে সময় গুরুদেবকে বলেছিলাম একে মঠ থেকে তাড়িয়ে দিতে, কিন্তু গুরুদেব ভেবে ছিলেন, ক্রমে এ শুধরে যাবে। কিন্তু চোরের স্বভাব বদলায় না। নর্মদ

তটে এসেও এই হীন প্রবৃত্তি। মঠে ফিরে গিয়ে একে তাড়াবই, যদি তখনও গুরুদেব ক্ষমার অবতার সাজেন, তাহলে আমিই মঠ ছেড়ে চলে যাবো। রাগে গরগর করতে লাগলেন স্বামীজী। ব্রহ্মচারী মুখ নীচু করে সকলের ভর্ৎসনা এবং ধিক্কার শুনতে লাগল।

সকলে মিলে কোনমতে হিরণ্ময়ানন্দজীকে শান্ত করে টর্চ নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। রঞ্জনের ঘড়িতে তখন সাড়ে এগারটা বেজেছে।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন সকাল সাড়ে সাতটা। আগুন নিভে এসেছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি তখনও কুয়াশা চারিদিকে ছেয়ে আছে। শিশির পড়ছে টিপ্‌টিপ্ করে। আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর পাশের গুহা থেকে প্রেমানন্দ বেরিয়ে এসে আমাদের আগুন নিভালেন কমণ্ডলুর জলে ঢেলে। আমরা একে একে বেরিয়ে এলাম ঝোলা গাঁঠরী বেঁধে নিয়ে। বেরিয়ে দেখলাম আমাদের অন্যান্য সঙ্গীরাও ঝোলা গাঁঠরী বেঁধে বেরিয়ে এসেছেন। চারদিক ফাঁকা হয়েছে। পাহাড়ের উপর সূর্যোদয় হয়েছে, তার আলোর আভা ছড়িয়ে পড়েছে ক্ষীণভাবে পত্রান্তরাল ভেদ করে। হিরণ্ময়ানন্দজীর তখনও রাগ শান্ত হয় নি। তিনি সকলকে আর একবার তুরীয় চৈতন্যকে দেখিয়ে বললেন -- ওর মুখ দর্শন করতে ইচ্ছা হয় না। ওকে কামরূপ মঠের ব্রহ্মচারী বলে ভাবতেও আমাদের লজ্জা হয়; গত রাত্রে হারামজাদা শৈলেন্দ্রনারায়ণজীর আলখাল্লার পকেটে হাত পুরে হাতাজোড়িটা চুরি করবার চেষ্টা করেছিল!

হঠাৎ ঈশান কোণের দিকে নজর পড়তেই আমরা দেখতে পেলাম, যে পাহাড় আমরা পেরিয়ে এসেছি, তার কিঞ্চিৎ উপর দিক ঘেঁসে রাত্রির সেই ঘোড়ামুখো লোকটা আর একটা লোকের সঙ্গে সিন্দূরী নদীর জলধারা পেরিয়ে আমাদের দিকেই আসছে। রাত্রির অন্ধকারে গুহার মধ্যে বসে যাকে বিকটাকার হয়গ্রীব দৈত্য মনে হয়েছিল তার সঙ্গে একজন মানুষ দেখে এই প্রকাশ্য দিবালোকে আমরা ভয় পেলাম না। আমাদের কাছে এসে সেই বিচিত্র জীবের সঙ্গী লোকটি খোড়িবোলি ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে হিরণ্ময়ানন্দজীর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। আমরা তার একটা কথাও বুঝতে পারব বলে মনে হল না। তাই সেদিকে মন না দিয়ে রাত্রির সেই বিকটাকার নরপশুকেই খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। কোমরে তার পূর্বদৃষ্ট সেই শাণিত কামটা ঝুলছে। তাকেই আমরা দেখছি বুঝতে পেরে সে তার মুখ থেকে ঘোড়ার মুখোসটা খুলে ফেলল। প্রায় ছ ফুট লম্বা মানুষটার মুখশ্রী সুন্দর! পেশীবহুল বলিষ্ঠ গঠন। আমাদের দিকে তাকিয়ে সে হাসতে লাগল। হিরণ্ময়ানন্দজী আমাদেরকে বলতে লাগলেন -- লোকটির দুর্বোধ্য অদ্ভুত ধরণের হিন্দী থেকে যেটুকু অতিকষ্টে বুঝলাম, লোকটি বলছে, জলধারার যেখানটা অতিক্রম করে তারা আমাদের কাছে এসেছে, সেই পথে গেলে তাদের গ্রামে আমরা পৌঁছে যাবো। গ্রামের নাম কুঠরী। আগে এই স্থান কাঁঠি রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বর্তমানে এই স্থান পশ্চিম খান্দেশ জেলার শেষ সীমা। কাঁঠি রাজ্যের নাম হয়েছে খান্দেশ। গতকাল সন্ধ্যায় ঘোড়ার মুখোশ পরে যে লোকটা আমাদের মনে ভয় উৎপাদন করেছিল, সে কিন্তু আমাদেরকে ভয় দেখাতে আসেনি। সিন্দূরী পাহাড়ে চিতা বাঘের খুব উপদ্রব আছে। আমরা কেবল মা নর্মদার দয়ায় চিতার মুখে পড়িনি, নতুবা ঐ পাহাড় অতিক্রম করতে গিয়ে অনেকেই চিতার মুখে প্রাণ দিয়েছে। পাহাড়ের তলায় গুহার মুখে আগুন জ্বালতে দেখে তারা বুঝেছিল কোন অসহায় পরিক্রমাবাসীর দল এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের গ্রামে নিয়ে গিয়ে নিরাপদে রাত্রিবাসের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পাঠিয়েছিল ঐ ঘোড়ামুখো হয়গ্রীব মার্কা লোকটাকে। ওরা জাতে হত্তি বা ছত্তি। এদের জাতির মধ্যে হিত্তি, হেৎ সেৎ এবং খেৎ নামে কতকগুলি শাখা আছে। কোন্ স্মরণাতীত কাল পূর্বে যে তারা নর্মদা কূলের ডেহরী পাহাড়ের তলায় কোথা হতে এসে বাসা বেঁধেছিল সে সম্বন্ধে এরা কিছু বলতে পারবে না।

তবে বর্তমানে এই কুঠরী গ্রামে প্রায় শতাধিক ছত্তি বাস করে। যে লোকটি আমার সঙ্গে কথা বলল, সে বানর জাতীয় ব্রাহ্মণ। কুঠরী গ্রামে ১০ ঘর বানর জাতীয় ব্রাহ্মণের বাস। ওরা ছত্তিদের পূজাপাঠ দৈবকার্যাদি করে থাকে। এখন তোমরা বল, তাদের ওখানে এখন যাবে কিনা, আতিথ্য স্বীকার করবে কিনা। বানররাই কিছুটা খোড়িবোলি হিন্দীতে কথা বলতে পারে। ছত্তিদের উপজাতীয় বন্য ভাষা আমাদের দুর্বোধ্য।

সব শুনে হরানন্দজী বললেন – কথায় বলে যাঁচা অন্ন ছাড়তে নাই। কাল পাহাড় ডিঙাতে গিয়ে আমাদের হাড়গোড় ব্যথায় টন্‌টন্ করছে। যদি এখানে ওদের পল্লীতেই আজ রাত কাটাতে হয়, সেও ভাল। একদিন বিশ্রাম হয়ে যাবে। কাল সকালে উঠেই ডেহরীর পথে হাঁটবো।

আমরা সেই বানর জাতীয় ব্রাহ্মণ এবং ছত্তি জাতীয় হয়গ্রীব বীরের সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম নর্মদাকে প্রণাম করে। আমরা যে পথ দিয়ে এসেছিলাম, সেই পথে পাহাড়ের উপর দিকে কিছুদূর হেঁটে গিয়ে বানর ব্রাহ্মণের দেখানো নির্দিষ্ট পথে হাঁটতে লাগলাম জলধারা পেরিয়ে। ৯ ইঞ্চি ১০ ইঞ্চি কোথাও ১২ ইঞ্চি উঁচু খরস্রোতা জলের টান পা টিপে টিপে পেরিয়ে তাদের সেই কুঠরী গ্রামে পৌঁছে দেখলাম প্রায় শতাধিক কুঁড়ে ঘর পাহাড়ের তলায়। নদী ও একাধিক ঝরণার জলে ভিজে থাকার ফলে বিস্তীর্ণ জায়গায় চাষযোগ্য জমি আছে। জমিতে মকাই বাজরা এবং ভুট্টাগাছ অজস্র দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আমরা তাদের গ্রামে পৌঁছাতেই অনেক মেয়ে পুরুষ কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এল আমাদেরকে দেখতে। একটা কাঠের ছাউনী দেওয়া ঘরের মধ্যে আমাদেরকে বসতে দিল একটা বিরাট বট গাছের তলায়। একজন বৃদ্ধলোক হাতজোড় করে কিছু বলল। সেই ব্রাহ্মণ বুঝিয়ে দিল ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে যে গ্রামের সর্দার আমাদেরকে আজ এখানে বিশ্রাম করতে বলছে। আমরা হেসে ঘাড় নাড়লাম অর্থাৎ সম্মতি দিলাম। দুজন বুড়ী কাঠের বারকোষের মত দুটো বড় বড় কাঠের পাত্রে পেষা মকাই এনে রেখে গেল। সেই বানর জাতীয় ব্রাহ্মণ যাঁর নাম কুন্দুন বলে হিরন্ময়ানন্দজী জেনে নিয়েছেন, তিনি আমাদেরকে নর্মদাতে স্নান করাতে নিয়ে গেলেন। যে পথ দিয়ে আমরা গেলাম সেই পথ থেকে প্রায় হাজার গজ দূরেই উত্তুঙ্গ পর্বত, ঊর্ধ্বশীর্ষ হয়ে উঠে গেছে উপরের দিকে। নর্মদার ঘাটে নেমে হাঁটু পরিমাণ জলে আমরা স্নান তর্পণাদি সারলাম। জলের নিচে হাঁটু পর্যন্ত মনে হচ্ছে অসাড় হয়ে গেছে; এতই ঠাণ্ডা, মনে হচ্ছে আমরা বরফগোলা জলে নেমেছি। অদূরে যেখানে সিন্দূরী নদী এসে নর্মদার মিলিত হয়েছে সেখানের প্রচণ্ড তোড় এবং ঘূর্ণি কিছুক্ষণ ধরে দেখলে যে কোন লোকের হৃদকম্প উপস্থিত হবে।

নর্মদার তট ঘেঁসেই উঠে গেছে ডেহরী পাহাড়। নর্মদার তট ঘেঁসে গেলেই পথ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, পরিক্রমাবাসীরা তাই কূল ঘেঁসেই যেতে পছন্দ করে কিন্তু এপথে সে উপায় নাই। নর্মদার জল ছলাৎ ছলাৎ শব্দে পাহাড়ে ধাক্কা মারছে। কুন্দুন জানাল আপনারা এই পাহাড় ডিঙ্গিয়ে যেতে পারলে তবেই ডেহরীর জঙ্গল অতিক্রম করতে পারবেন। কুন্দনের ভাষার শতকরা ৮০ ভাগই আমরা বুঝতে পারছি না, হিরন্ময়ানন্দজী আমাদের দো-ভাষীর কাজ করছেন, তাও অতিকষ্টে, যাকে বলে, 'কোন মতে'। তাঁকে হিন্দীতে বললাম – আপনি কুন্দুনকে জিজ্ঞাসা করুন তো, এই সিঁদূরী সঙ্গমের সোজা উত্তরতটে যে পাহাড় ও জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, ঐ স্থানের নাম কি? আমার ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দী কুন্দুন প্রায় বুঝতে পেরেছিলেন, হিরন্ময়ানন্দজী জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই তিনি উত্তর দিলেন – উহ্ উত্তরতটকা মহল্লা মাকড়খেড়া। পাহাড় ঔর ঘোর জঙ্গল হৈ মাকড়খেড়াসে চার মাইল দূর মেঁ যো পাহাড়োঁকা শ্রেণী দেখাই দেতা হৈ, উস্ মহল্লা কা নাম চারবারী। মার্গ পত্থরোঁ কে টুকড়ে, কাঁকরোলী পত্থরোলী বহোৎ কঠিনাই সে যানা পড়তা হৈ।

স্নানের পর সকলে গরম জামা এবং কম্বল গায়ে চাপালেও শীতে ঠকঠক করে কাঁপছি সবাই। তাই আর নদীর তীরে উত্তুরে হাওয়ার ঝাপটার মধ্যে না দাঁড়িয়ে আমাদের আশ্রয়স্থলে ফিরে এলাম। এসে দেখি সেই বানর জাতীয় দুই ব্রাহ্মণী মকাইএর আটা জল মাখিয়ে ভাল করে দলে প্রায় ২৫টা লিট্টি গোঁড়া তৈরী করে রেখেছেন, একটা আগুনের চুল্লীও জ্বেলেছেন। হরানন্দজী বললেন – এদের ছোঁওয়া খাদ্য খেতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না। আমি বিরক্ত হয়ে বলে উঠলাম – আপনারা সন্ন্যাসী হয়েও এত ছুঁৎমার্গী কেন ? অগ্নিনা পরিশুদ্ধতি – এও ত ছুঁৎমার্গী স্মার্ত পণ্ডিতের কথা ! দুই ব্রহ্মচারীকে বসিয়ে দিন ঐ গোঁড়াগুলোকে আগুনে পুড়ে নিতে ! সাবধান ! হিরন্ময়ানন্দজীকে বলুন এমনভাবে কথা বলতে যেন কোনমতে এঁদের sentiment-এ কোন খোঁচা না লাগে ! পার্বত্য জাতির মন মেজাজ কখন কি রকম থাকে তা বুঝা দুষ্কর !

বটগাছের তলায় যে দিকটায় আমাদের রাত্রিবাসের স্থান তার বিপরীত দিকে একটা কাঠ দিয়ে ঘেরা জায়গায় তাদের দেবস্থান। কাঠের দরজা ঠেলে সেখানে ঢুকে দেখলাম একটি প্রস্তর মূর্তি, বীরোচিত তাঁর অবয়ব, আর একটি নারী মূর্তি, দুটি মূর্তিই সিন্দুর লিপ্ত। ছত্তিদের সেই পুরোহিত বানর ব্রাহ্মণ বললেন – পুরুষ মূর্তির নাম 'ক' আর নারী মূর্তির নাম কা-মা বা কা-মা-চী। একটা ঝুড়িতে কিছু বনফুল রাখা আছে। দণ্ডী সন্ন্যাসীদের অনেকেই বিশেষতঃ হিরন্ময়ানন্দজী কিছুতেই পাহাড়ীদের পদতলে ফুল চাপিয়ে পূজা বা প্রণাম করতে চাইলেন না, খুঁৎ খুঁৎ করতে থাকলেন। অতি মৃদুকণ্ঠে ফিস্ ফিস্ করে বলতে লাগলেন – নসীবে শেষ পর্যন্ত এই ছিল যে পার্বত্য উপজাতির দেবদেবতাকে প্রণাম ঠুকতে হবে ! ব্রহ্মোপাসক দণ্ডী সন্ন্যাসীর আর কত দুর্দশা করবে মা নর্মদা ! স্থানীয় অনেক পাহাড়ী পুরুষ এবং স্ত্রীলোক ভীড় করে এসে দাঁড়িয়েছে, আমাদের পূজা দেখবে ! আমি বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে পাহাড়ী দেবদেবীর পায়ে কমণ্ডলুর জল ঢেলে.মন্ত্র পাঠ করতে লাগলাম –

আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতোঽদব্ধাসো
অপরীতাস উদ্ভিদঃ।
দেবা নো যথা সদমিদ্বৃধে অসন্নপ্রায়ুবো
রক্ষিতারো দিবে দিবে ॥

আমি নতজানু হয়ে সুর করে মন্ত্র পাঠ করে সেই সুরেই এমনভাবে বঙ্গানুবাদ শোনাতে লাগলাম যে যাতে পাহাড়ীরা বুঝে আমি মন্ত্রপাঠই করছি ! ওহে সর্বজ্ঞ দণ্ডী সন্ন্যাসীর দল, ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৮৯ নম্বর এই মন্ত্রটি বিশ্বদেব সূক্তম্-এর ১ম মন্ত্র নামে পরিচিত। এই মন্ত্রে পরমেশ্বর ব্রহ্মের নিকট আবেদন জানানো হচ্ছে যে, কল্যাণময় নিরূপদ্রুত অপ্রতিরুদ্ধ ও শত্রুবিনাশক ক্রতু সমূহ সকল দিক হতে আগমন করুক। আশ্রিত পালক এবং প্রতিদিন রক্ষাকারী দেবতারাও সর্বদা আমাদের মঙ্গল বিধায়ক হউন।

একই সুর ও স্বর গ্রামে আমি বলতে লাগলাম, আপনারা নিতান্তই যদি দুর্মতিগ্রস্ত না হয়ে থাকেন, তাহলে অবিলম্বে একে একে এসে এদের ইষ্টদেবতার পায়ে ফুল দিয়ে প্রণাম করতে থাকুন। নতুবা এই সদাশয় বন্ধুরা উগ্রমূর্তি ধারণ করবে। তাদের দেবতাকে উপেক্ষা করছেন বলে বুঝতে পারবে। এখান থেকে ফিরে গিয়ে বুঝিয়ে দিব যে আপনাদের প্রণাম প্রকৃত দেবতার পায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। আপনাদের জাত ধর্ম কিছুই নষ্ট হয় নি। আমি প্রণাম করে উঠে পড়তেই দেখলাম হরানন্দজী হিরন্ময়ানন্দজী প্রভৃতি সকল সন্ন্যাসীরাই 'ক' এবং 'কা-মা' বা কা-মা-চীর পাদ পদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। পাহাড়ীরা হর্ষধ্বনি করে উঠল।

আমরা ফিরে এলাম আমাদের আশ্রয়স্থলে। দুই ব্রহ্মচারী মকাই-এর লিট্টি তৈরী করে ফেলেছেন। আমারা প্রায় প্রত্যেকেই একখানা করে লিট্টি খেলাম। বেলা প্রায় ২টা

বাজতে যায়। এই অবেলায় আর পাহাড়ে চড়া সম্ভব নয়। কম্বল মুড়ি দিয়ে সবাই বসে গল্প করতে লাগলাম। হরানন্দজী বললেন -- আমাদেরকে যে বন্য দেবদেবীর পায়ে মাথা ঠোকালেন এবার বলুন তো ঐ দেবতার মধ্যে আপনি কী মহিমা দেখলেন ? সব খোলসা করে বলুন। দেখছেন না, খাওয়া দাওয়ার পরেও বুড়ো (হিরন্ময়ানন্দজী) কেমন গোমড়া মুখে বসে আছেন। উত্তর যদি সন্তোষজনক না হয় তাহলে বুড়ো হয়তো আপনাকে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দিবেন! আমি বললাম – আপনারা সবাই জানেন যে 'ক' ব্যঞ্জনবর্ণের আদ্য অক্ষর, সুতরাং সৃষ্টি ব্যঞ্জনার আদ্য অক্ষর, সুতরাং সৃষ্টি ব্যঞ্জনার আদ্য দেবতা। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে 'ক' ই ব্রহ্ম (৪/১০/৫); 'কং' প্রজাপতির বীজ। ঋগ্বেদে এবং অথর্ববেদে এই 'ক' দেবতার উদ্দেশ্যে স্তুতি করে বলা হয়েছে – 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেমঃ'। মিশর দেশের দর্শন মতে মানুষের প্রাণবায়ু দেহ হতে নির্গত হয়ে গেলেও দেহসৃষ্টির আদি শক্তি 'ক' থেকে যায়; সেইজন্য মানুষ মরলেই তার দেহ ফুলের পাপড়ির মত শুকিয়ে যায় না। এই বিশ্বাসের জন্যই 'ক' কে নিরাপদ রাখার জন্য মিশরের রাজপুরুষ বা রাণীদের দেহ-বল্লরী 'মমি' করে রাখার ব্যবস্থা ছিল। শৈবাগম তন্ত্র মতে 'কা' – শক্তি আর 'ক' – শক্তিমান। সুতরাং 'কা' হলেন আদ্যাশক্তি মহামায়া – মা - মা। তাঁর অপর নাম – কা-মা বা কা-মা-চী। 'চী'-এর অর্থ ব্রহ্ম হতে উদ্ভূতা শক্তি। কা-মা থেকেই কা-মা-খ্যা। কামাখ্যা শব্দের অর্থ কা-মা নাম্নী মহামায়া রূপে আখ্যায়িতা যে শক্তি। তিনি আকাশচারিণী বা ব্যোমতত্ত্বে (খ) প্রাণবায়ুর যে বিস্তার (অর্থাৎ আ) স্বরূপিনী অর্থাৎ কা-মা-খ্যা। ইনিই মা এবং রাজ্ঞীরূপে আকাশে বিস্তারিতা (আ) জগৎ নিয়ন্ত্রিণী শক্তিরূপে জগতে সতত গতিশীলা। এখন আপনারা ভেবে দেখুন 'ক' নামক ব্রহ্ম এবং কা-মা নাম্নী ব্রহ্মশক্তির শ্রীচরণে মাথা নুইয়ে আপনারা স্বধর্মচ্যুত হলেন কি ?

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি, আমাদের এই দেবভূমি বিশাল ভারতবর্ষের এখন যে সীমা দেখি, অতি প্রাচীনকালে তার পরিধি ছিল অনেক বেশী। প্রাচীন নাম ব্রহ্মাবর্তবর্ষকে কেন্দ্র করে পশ্চিম সীমান্তে কেতুমালবর্ষ (পশ্চিম সীমান্তে আফগানিস্তান), উত্তরে হিমালয়, হিমালয়ের পারে কিম্পুরুষবর্ষ, নিষধবর্ষ, উত্তরপূর্বে ভদ্রাশ্ববর্ষ প্রভৃতি। নানারকম ঝড় ঝাপ্টা ভূমিকম্প, সমুদ্রোচ্ছ্বাসের জন্য upheaval এর submerge প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ভূ-প্রকৃতির যেমন পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনি নানা সময়ে নানা প্রকারের বৈদেশিক আক্রমণের ফলে নানা ধর্ম ও কৃষ্টির ধারকবাহক বিভিন্ন জাতিও ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল চারদিকে। যে গোষ্ঠী যেখানে গিয়েছিল সেখানেই ভাব ভাষা তাদের ধর্ম এবং সংস্কৃতিও দানা বেঁধে উঠেছিল। আমাদের বহু পুঁথি, পাণ্ডুলিপি শিলালিপি নষ্ট হয়ে গেছে। তদবির তদারকিতে সুপটু অনেক তথাকথিত গবেষক এবং ঐতিহাসিকবৃন্দ উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে প্রকৃত ইতিহাস ও সত্য গবেষণার সুপ্রশস্ত মাঠে উল্টো রথের চাকা ঘুরিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ, অনেক বিজ্ঞ ঐতিহাসিক বর্তমান অযোধ্যার স্থান সম্বন্ধে এতদিন পরে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন! আমি স্বামী অনিমানন্দ অবধূতের স্বচক্ষে দেখা নন্দাঘুটির পথে সরযূ ও গোমতী নদীর সংগমস্থলে বাগেশ্বরের নিকটে রাম লক্ষণ ভরত শত্রুঘ্নের সরযূর জলে স্বেচ্ছায় সলিল-সমাধির কথা শুনিয়েছিলাম। এখন তর্কের বিষয়, কোনটি রামচন্দ্রের আসল অযোধ্যা ? উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা নামক স্থান এবং তার পার্শ্ববর্তী অযোধ্যা নদী ? না – কুমায়ুন নন্দাঘুটি অঞ্চলে অবস্থিত সরযূ ও গোমতীর সঙ্গমস্থলের নিকটবর্তী অযোধ্যা ?

যাক্ সে কথা! আমাদের আলোচ্য কা-মা বা কা-মা-খ্যা সম্বন্ধেই কিছু বলি। আপনারা সকলেই জানেন, আসামের গৌহাটি শহরের নিকটে নীলাচল পর্বতে অতি প্রাচীন কাল হতে আদ্যাশক্তির যোনি পীঠ কামাখ্যা তীর্থ নামে পূজিত। আবার পদ্মপুরাণের

পাতাল খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে আর এক প্রাচীন যুগের কামাখ্যা তীর্থের উল্লেখ আছে। এটি বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলির উত্তর পশ্চিম প্রান্তে পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। স্থানীয় জনসাধারণ একে কেউ কামাখ্যার যোনিপীঠ, কেউ বা চণ্ডিকা স্থান বলে অভিহিত করে। এই তীর্থ আমি দর্শন করে এসেছি। আবার মহাভারতের বন পর্বে ৮২-তম অধ্যায়ে আর এক যোনিতীর্থের উল্লেখ আছে।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউ এন সাঙ্ প্রাচীন পুষ্কলাবতী নগরের প্রায় ১৫০ মাইল উত্তর পূর্বে পবর্তশৃঙ্গের উপর প্রাচীন যুগের নীলবর্ণা ভীমাদেবীর মন্দির এবং দেবীমূর্তির যোনিপীঠ দর্শন করেছিলেন (Vide Siyuki Pt II, P - 162)। মহাভারতের ঐ বন পর্বেই ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্তে ৮০ মাইল দীর্ঘ ও ৮ মাইল প্রশস্ত 'দেবীকা' নামক সরোবরের তীরবর্তী রুদ্রদেবতার পবিত্র কামাখ্যা তীর্থের উল্লেখ আছে। ঐ তীর্থে বানর জাতীয় ব্রাহ্মণরা দৈবকার্য নিষ্পন্ন করতেন বলে উল্লেখ আছে (৮২ অধ্যায়)।

আপনাদের মধ্যে অন্ততঃ দু চারজন ত বটেই আসামে কামাখ্যা দর্শন করে এসেছেন। সেখানকার যোনিতীর্থে যদি আপনারা পূজাপাঠ করে এসে থাকেন, তাহলে এখানকার কা-মা এবং তাঁর যোনিপীঠে পূজা প্রণামে দোষ কোথায় ? মহাভারতোক্ত বানর জাতীয় ব্রাহ্মণরা যদি সে যুগে সম্মানের পাত্র হয়ে থাকেন, এবং তাঁরা যদি সে যুগের সমাজে 'জলচল' হয়ে থাকেন, তাহলে এ যুগে এই পাহাড় অঞ্চলে তাঁদের ব্রাহ্মণীদের তৈরী মকাই-এর লিট্টি খেলে আপনাদের জাত চলে যাবে কি ভাবে ? কে বলতে পারে যে এই কা-মা দেবী এবং তাঁর যোনি পীঠ আসল কামাখ্যা এবং আসল যোনি তীর্থ নয় ? এই ভয়ঙ্কর সুদুর্গম শূলপাণির ঝাড়িতে এই তীর্থ অবস্থিত বলে বর্হিজগতে-এর প্রচার নাই – এই আমার ধারণা।'

S. Piggot নামক একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের লেখা Pre-Historic India নামক এক গবেষণা মূলক ঐতিহাসিক গ্রন্থে আছে বর্তমান বেলুচিস্থানের কিরথার পর্বতশ্রেণীর অন্তর্গত যোহি নামক স্থানের সন্নিকটে মনছার নামক বিশাল হ্রদের তীরে মহেঞ্জদাড়ো যুগের যে ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে অজস্র প্রাচীন মূর্তির মধ্যে ছত্তি বীর নামক কতকগুলি মূর্তি বেরিয়েছে, যাদের অঙ্গে বীরের সজ্জা, পরিধানে বর্ম কোমরে অস্ত্র, নানা জন্তুর মুখোস পরা। উপরোক্ত হত্তি বা ছত্তি জাতির নামই আমার মনে হয় হিত্তি, হেৎ সেৎ খেৎ। গতরাত্রে আমাদের গুহার কাছে যে এখানকার হয়গ্রীব গিয়েছিল, আজ সকালে দেখতে পেলাম, তারও পরিধানে বর্ম, কোমরে ঝুলছিল কাম্টা, মুখে ছিল ঘোড়ার মুখোস। এই কিম্ভূতকিমাকার বেশ দেখলে বনের হিংস্র জন্তুরাও ভয় পায়।

Sir John Marshall কৃত Mohenjodaro. (Pts I, II, III), Will Durant কৃত Our Oriental Heritage, C. W. Ceram কৃত The Discovery of Hittite Empire প্রভৃতি গ্রন্থে এই সব সুপ্রাচীন জাতির বেশভূষা, তাদের পূজিত দেবদেবীর মূর্তি, তাদের সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে। মনীষী Ceram তাঁর উপরিলিখিত গ্রন্থের ৫৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, – এশিয়া মাইনর অঞ্চলে বর্তমান তুর্কী রাজ্যে বঘাজ্-কুই নামক স্থানে খৃষ্টপূর্ব বিংশ শতাব্দী কালের প্রবল প্রতাপান্বিত হিত্তি জাতির হাত্তুজ নগরের ধ্বংসকীর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও অসংখ্য কর্দম লিপি ও শিলালিপিও আবিষ্কৃত হয়েছে সেখানে। বঘাজ্-কুই ও মিশরে আবিষ্কৃত বহু ফলকে এবং বাইবেলে এই জাতিকে হত্তি, ছত্তি, ক্ষত্তি, হেৎ, সেৎ, খেৎ প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা হয়েছে। ইংরাজীতে বলা হয়, Hittitis জাতি, সংক্ষেপে হিত্তি। ঐ শব্দগুলি সংস্কৃত ক্ষত্ত, ক্ষত্রি, ছত্রি প্রভৃতি শব্দের অপভ্রংশ।

উক্ত ছত্তি জাতি ছিল মহাযোদ্ধা; রণাঙ্গনে অশ্ব ও অশ্ববাহী রথ ব্যবহারে প্রথম পথ-প্রদর্শক। লৌহ ধাতুর আবিষ্কারও তাদেরই কীর্তি। তাদের দেহের বর্ণ এবং মুখাকৃতির গঠন ছিল সুন্দর, মেয়েরা ছিল দেবীপ্রতিমাবৎ। পুরুষদের বেশভূষা ছিল পরবর্তী যুগের রাজপুতদের মত। যে হয়গ্রীব মূর্তি আমাদের গুহার কাছে গিয়েছিল, এখানে আসার পর সে ঘোড়ার মুখোস খুলে ফেলতে তার সুন্দর মুখাবয়ব ও উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। যে দুটি মহিলা আমাদের জন্য মকাই-এর আটা এনেছিলেন, তাঁরাও দেখতে সুন্দর। এই সব কথা সব দিক দিয়ে বিচার করে আমার মনে হচ্ছে, কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এদের মূল ভূখণ্ডে কোনও পরিবর্তন বা সর্বনাশ ঘটায় স্মরণাতীত কাল পূর্বে ভারতের নানা প্রান্তে পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল, এখানে সিন্দূরী পাহাড় এবং ডেহরী পাহাড়ের উপত্যকায় তাদেরই একটি ক্ষুদ্র অংশকে দেখতে পাচ্ছি। এদের সদাশয়তা এবং আতিথেয়তা দেখে এদের পূজিত 'ক' দেবতা এবং কা-মা দেবীকে আমাদের সতত প্রণম্য বলে ভাবছি।

আমার সঙ্গী দণ্ডী সন্ন্যাসীর দল মন দিয়ে সব শুনলেন। কেউ কিছু মন্তব্য করলেন না। কেবল বাসবানন্দ বললেন – আমাদের উপনিষদ এবং স্মৃতি শাস্ত্রাদিতে ক্ষাত্ত, ক্ষত্রি, ছত্রি, উগ্র ক্ষত্রিয় নামক একটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে, তারা বৈদিক সমাজ সংস্থার ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত নয়। অশ্ব প্রতিপালক রথচালক, নগর বা প্রাসাদের প্রহরী, যজ্ঞাশ্বের অনুসরণকারী, রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রাণ হননের কাজে জল্লাদের কাজ করত। তারা ছিল আর্যবৈদিক সমাজের চতুর্বর্ণের বাইরে।

আমি উত্তর দিলাম – তা হবে। কালচক্রের আবর্তনের সঙ্গে যুগের যেমন পরিবর্তন হয়, মানুষেরও তেমন পরিবর্তন হয়, পরিবর্তন ঘটে মানুষের শিক্ষা দীক্ষা পেশা ও বৃত্তিতে। স্মৃতি শাস্ত্রের বিধান অনুসরণ করে সমাজপতিরা কলমের আঁচড়ে কাউকে ঊর্ধ্বে তুলে কাউকে বা জাতিচ্যুত করে পণ্ডিতি ফলায়। আমি কিন্তু এখানকার 'ক' এবং কা-মার উপাসক এবং উপাসিকাদের মহত্ত্ব দেখে তাঁদেরকে সামান্য জংলী পাহাড়ী বলে ভাবতে পারছি না। বানর জাতীয় ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত কুন্দুন নামক পুরোহিতের গলায় যে উপবীত ঝুলছে তা কি বৈদিক না অবৈদিক রীতি ?

হিরন্ময়ানন্দজী বললেন – বেলা সাড়ে ৪টা বেজে গেছে। একটু পরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসবে। এখন চল নর্মদায়। মা নর্মদাকে প্রণাম ও স্পর্শ করে আসি। কুন্দুন একজন লোককে আমাদের সঙ্গে দিলেন। ঘোড়ার মুখোস পরে হয়গ্রীব সেজে লোকটি একটি বল্লম হাতে নিয়ে আমাদের সঙ্গে নর্মদার ধার পর্যন্ত সঙ্গে গেল। আমরা গাইতে গাইতে গেলাম –

নমো নর্মদে মাতু ঈশান তন্যা
নমো শর্মদে বর্মদে দেবি ধন্যা
কলিকাল গঙ্গে সে তেরি বিশোষা,
কথৈ মাহাত্ম্য মানৌ দেবা সুরেশা ॥

অর্থাৎ মা নর্মদে! তুমি ঈশান মহেশ্বরের তনু হতে জাত। তুমি একাধারে সুখদাত্রী এবং জীবের রক্ষাকর্ত্রী। ধন্য তোমার করুণা। কলিকালে গঙ্গার চেয়ে তোমার মহিমা বেশী। তোমার এই বিশেষত্বের কথা, সমস্ত দেবতা, এমন কি স্বয়ং সুরেশ্বরও মেনে থাকেন। হর নর্মদে।

আমরা নর্মদার জল মাথায় ছিটিয়ে কর্পূর জ্বেলে মা নর্মদার আরতি করে প্রণামান্তে ফিরে এসেই ছত্তিদের 'ক' দেবতা এবং কা-মা দেবীর স্থানে ঢুকে কর্পূর জেলে আরতি করতে করতে স্তব পাঠ করতে লাগলাম সবাই মিলে –

ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে নুতি মহো
ন চাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাঃ।
ন জানে মুদ্রাস্তে তদপি চ ন জানে বিলপনং
পরং জানে মাতস্ত্বদনুসরণং ক্লেশ হরণং ॥

'অহো, আমি যন্ত্র মন্ত্র জানি না, এমন কি স্তুতিও জানি না; আবাহন ও ধ্যানও জানি না; তোমার মুদ্রা এমন কি তোমার যথার্থ মন্ত্রও জানি না, কি ভাবে তোমার কাছে আর্তি ও কাতরতা জানাতে হয়, তাও আমাদের জানা নাই। কিন্তু মা, একথা ভালভাবেই জানি যে তোমার স্মরণ নিলে দুঃখ নাশ হয়।'

মন্ত্রপাঠ করে সকলেই 'ক' এবং কা-মা-কে প্রণাম করলাম। এরা কড়ুয়া তেল ছাড়া অন্য কোন তেলের ব্যবহার জানে বলে মনে হয় না। নর্মদাকে প্রণাম করে এসে এখানে যখন ঢুকি, তখন দেখি তিনটি কাঠের ম্যাকে নেকড়া জড়িয়ে তা কড়ুয়া তেলে ডুবিয়ে আগুন জ্বেলেছিল। সেই প্রজ্বলিত মশাল দাউ দাউ করে জ্বলছিল। কড়ুয়া তেলের বিদ্‌ঘুটে গন্ধে ভরে গেছল চারদিক; আমরা কর্পূর জ্বালতে তার সুরভিতে দুর্গন্ধ কেটে গেছে। কর্পূর বোধহয় এরা কখনও দেখে নি। এই দুর্গম শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্য রাজ্যে কর্পূর এরা কি ভাবেই বা পাবে? বিস্ময়ভরা কৌতূহলী দৃষ্টিতে এরা কর্পূর দেখছিল। আমি হিরন্ময়ানন্দজী এবং হরানন্দজীকে বললাম – সিন্দূরী পাহাড় অতিক্রমে করে এতদূর পর্যন্ত এলাম। একমাত্র মার্কণ্ডেয় ঋষির একটি মূর্তি ছাড়া শিবভূমি নর্মদার তটে কোথাও কোন শিবমন্দির দেখলাম না। কাল সকালে সামনের ডেহরী পাহাড়ের দুর্ভেদ্য অরণ্যেও কোন শিবমন্দির দেখতে পাবো বলে মনে হয় না। কাজেই সামান্য পরিমাণ কর্পূর রেখে দিয়ে বাকী কর্পূর এদেরকে দিয়ে দিন। এরা খুশী হবে। আমার কথায় তাঁরা সানন্দে রাজী হলেন। আমরা দেবস্থান থেকে আমাদের আশ্রয়স্থলে ঢুকে দেখি, এখানকার লোকরাই আমাদের ঘরের মধ্যে শুকনো কাঠ বয়ে এনে ঘরের মধ্যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পাবার জন্য কাঠে আগুন দিয়ে ঘর গরম করার ব্যবস্থা করেছে। কৃতজ্ঞতায় আমাদের মাথা নুয়ে এল। রঞ্জন একটা মোমবাতি জ্বালতেই হিরন্ময়ানন্দজী তাঁর ঝুলি হাতড়ে তিন গোঁড়া কর্পূর বের করে দলের সর্দার এবং কুন্দুনের হাতে দিলেন। কর্পূর পেয়ে তাঁদের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই কাঠের দরজা বন্ধ করে দিয়েই কম্বল মুড়ি দিয়ে যে যার জপে বসে গেলাম।

দরজাতে সেট করা কাঠের ফালিতে কোথাও কোথাও ফাঁক আছে। ছেঁড়া চট সেই সব ফাঁকে গোঁজা থাকলেও কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস ঢোকার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। আমারা মনে মনে জপ করছি বটে কিন্তু শীতে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছি সবাই। চুল্লীতে আরও কিছু ভারী ভারী শুকনো কাঠ চাপানো হল। প্রায় ঘণ্টা খানিক সময় লাগলো ঘর গরম হতে। শূলভেদ তীর্থে পঞ্চক্রোশী করার সময় ভৃগু পর্বতে যাওয়ার সময় কয়েকজন ভীলদের আক্রমণ এড়াবার জন্য আমি হরানন্দজী এবং প্রেমানন্দ আমাদের সোয়েটার তাদের হাতে দিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। সকলের গায়ে সোয়েটার আছে, কিন্তু আমাদের গায়ে নাই তাই আমরা তিনজনই শীতে বড় বেশী কাতর হয়ে পড়লাম। তাই আমরা আগুনের কাছ ঘেঁসে নিজেদের বিছানা সরিয়ে নিয়ে এলাম। আবার আগুনের চুল্লীর উপর আরও কিছু কাঠ চাপালাম। রঞ্জনের ঘড়িতে দেখলাম রাত্রি সাড়ে আটটা বেজেছে। মনে পড়ল, আজ, রবিবার ২৩শে মাঘ চতুর্দশী, আগামী কাল পূর্ণিমা, তাহলে ত বাইরে আজ জ্যোৎস্নার আলো। আগুনের আভায় দেখতে পেলাম সকলেই আপাদ মস্তক কম্বলে ঢেকে শুয়ে আছেন, হয়ত ঘুমিয়েই পড়েছেন! আমার মাথায় হঠাৎ কি ভূত চাপল, জ্যোৎস্না-স্নাত এই বনভূমির রূপ দেখতে। একবার ইচ্ছা হল, দরজায় ঠেকা দেওয়া আছে যে বড় পাথরটা সেটা

সরিয়ে দরজা খুলে জ্যোৎস্নালোকিত ধরিত্রীর, এই পার্বত্য প্রান্তরের শোভা দেখে নিই ! কিন্তু দরজা খুলতেই যদি কোন হিংস্র জন্তু ঢুকে পড়ে ! এতগুলি ঘুমন্ত প্রাণীর তাহলে জীবন বিপন্ন হবে। এই চিন্তা মনে উদয় হতেই দরজা খুললাম না, কিন্তু চন্দ্রকিরণ এমন ভূবন ভুলানো স্নিগ্ধ হাসি নিয়ে কাঠের ফাঁক দিয়ে ঢুকছে তা দেখে মনের দুর্দমনীয় আবেগ আর চেপে রাখতে পারলাম না। ঘরের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে যেখানে ছেঁড়া চট গোঁজা ছিল, সেটা অনেক কষ্টে সরিয়ে ফেললাম। নির্জন নিস্তব্ধ অরণ্য প্রান্তর জুড়ে চাঁদের হাসির যেন বান ডেকেছে, সেই রূপে আমার মন মুগ্ধ হয়ে গেল, সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম যেন স্তব্ধ ও অসাড় হয়ে যাচ্ছে। জ্যোৎস্না-প্লাবিত সিন্দূরী পাহাড়ের শীর্ষদেশে নজর পড়তেই মনে হল, সমগ্র পাহাড়টাই যেন মহাদেবের শান্ত সমাহিত রূপ ধারণ করেছে। মহাপ্রকৃতির সঙ্গে মিলনের আনন্দে তিনি যেন নির্বিকল্প সমাধিতে অন্তর্মুখী, জ্যোৎস্নার ধারাকে মনে হচ্ছে তাঁরই যেন অঙ্গজ্যোতিঃ !

সেই অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে সারা শরীর অসাড় হয়ে এল, পা গুলো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে আমি সেইখানেই ধপ করে বসে পড়লাম।

আমার কোন জ্ঞান ছিল না, কতক্ষণ যে সেইভাবে বসেছিলাম সে সম্বন্ধেও আমার কোন বোধ ছিল না। পরে শুনলাম, কাঠের ফাঁক ঢাকা চট সরিয়ে ফেলেছিলাম বলে ঠাণ্ডা হাওয়া হু হু করে ঢোকায় নিদ্রিত দণ্ডীর দল অতিরিক্ত শীতে কাতর হয়ে জেগে উঠেছিলেন, আমাকে তদবস্থায় দেখে তাঁরা আমাকে আগুনের কাছে টেনে নিয়ে এসে অনেকক্ষণ ধরে সেঁক দেন, শিশিরে আমার আলখাল্লাই ভিজেই গেছল, কম্বল গা থেকে খুলে পড়েছিল, সেটাও শিশিরে ভিজে গেছে। আমার যখন জ্ঞান হল তখন শুনতে পাচ্ছি সকলের ভর্ৎসনা বাক্য। তখনও গা হাত এমন কি জিহ্বা অসাড় বলে কোন উত্তর দিতে পারলাম না, ক্ষমা ভিক্ষাও করতে পারলাম না। ঘরের মধ্যে আরও অনেক কাঠের টুকরো পড়েছিল বলে রঞ্জন ও হরানন্দজী আরও একটা আগুনের চুল্লী জ্বেলে দিলেন ঘরের উত্তাপ বাড়ানোর জন্য। প্রেমানন্দের কাছে একটা extra কম্বল ছিল, সেটা তিনি আমার গায়ে চাপিয়ে দিলেন। আমি নীরবে একান্ত অপরাধীর মত পড়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। সঙ্গী সন্ন্যাসীরা অনেক আগেই উঠে পড়েছেন, তাঁদের অনেকের প্রাতঃকৃত্যও সারা হয়ে গেছে। আমি সবার শেষে উঠেও দেখলাম, গাছপালা হতে তখনও টপ্ টপ্ করে শিশির পড়ছে। প্রস্তরময় উপত্যকার পাথরগুলোও ভিজে আছে। ছত্রিদের বস্তিতে সকলেই জেগে উঠেছে, তারা আগুন পোয়াচ্ছে কাঠ জ্বেলে। আমাদের গায়ে তবুও কম্বল জামা ইত্যাদি আছে কিন্তু এখানকার লোকরা এতই দরিদ্র যে আগুন ছাড়া এই তীব্র শীত হতে তাদের বাঁচার উপায় নাই। গতরাত্রির ঘটনার জন্য সকলেই আমাকে কুটুস্ কুটুস্ করে বিঁধছিল; রঞ্জন বলছিল – আর এইরকম খেলা খেলবেন না। কোটিনারে মহাত্মা কৃপানাথের আশ্রমেও আপনি একদিন শীতের রাত্রে আপনার ইচ্ছাকৃত দৈবী মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়ে আমাকে ঘোরতর দুর্ভাবনায় ফেলেছিলেন, সেদিন আমার জেগে উঠতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হলেই আপনি পুড়ে মরতেন। কিছুক্ষণ পরেই ডেহরী সংগমে যাবার জন্য রওনা হব। সকলের কাছেই শুনে আসছি, ডেহরীর জঙ্গল নর্মদাখণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জঙ্গল। আপনি মা নর্মদা এবং এখানকার 'ক' এবং 'কা-মার' কাছে জানিয়ে যান, এই ভীষণ পথে আর যেন আপনি ঐ রোগে না পড়েন ! আমি কারও কথার কোন উত্তর না দিয়ে প্রাতঃকৃত্য করতে চলে গেলাম। নর্মদার জল দেখলাম ধোঁয়ায় ধোঁয়াময়। এই ধোঁয়া শিশিরের বাষ্প। চারদিক বেশ ফাঁকা হয়ে উঠেছে বলে বুঝলাম, আকাশে সূর্যোদয় হয়ে গেছে কিন্তু জঙ্গলের পত্রান্তরাল ভেদ করে উপত্যকার সমতল প্রান্তরে এখনও সূর্যরশ্মি এসে পড়ে নি। আমি

নর্মদা তট থেকে যখন ফিরে এলাম, তখন সকলেই ঝোলা গাঁঠরী বেঁধে ছত্তিদের দেবস্থানে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে আছেন রওনা হওয়ার জন্য। কুন্দুনজী এবং আমাদের প্রথম দৃষ্ট হয়গ্রীব মার্কা বীর পুরুষ যথারীতি ঘোড়ার মুখোস পড়ে বল্লম হস্তে দাঁড়িয়ে আছে। কুন্দনজীর হাতেও একটা বল্লম। শুনলাম ডেহরী পাহাড়ের কতকটা পথ তাঁরা এগিয়ে দিয়ে আসবেন। আমি তাড়াতাড়ি তাদের দেবস্থানে প্রণাম করে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে রওনা হলাম। কুন্দুনজী এবং সেই হয়গ্রীব (!) আমাদের আগে আগে চললেন।

জঙ্গল পথে প্রায় পনের মিনিট হাঁটার পর আমরা ডেহরী পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌছলাম। নর্মদার ধার থেকে এই পাহাড় উঠেছে বলে নর্মদার জল উত্তর পশ্চিম দিক থেকে দমকা বাতাসের ঝাপটায় ছলাৎ ছলাৎ শব্দে পাহাড়ের পাদদেশে এসে ঝাপটা মারছে। আমরা নর্মদাকে যুক্ত করে প্রণাম জানিয়ে একটা বিশাল বটগাছের শিকড় ডিঙ্গিয়ে বটের ঝুড়ি ধরে ধরে উপর দিকে উঠতে লাগলাম। খাড়া চড়াই ঘন বনের মধ্যে দিয়ে গাছ ধরে ধরে উঠতে লাগলাম। হঠাৎ পাহাড়ের উপর থেকে বাঘ ডেকে উঠল। ভয়ঙ্কর বাঘের গর্জনে গোটা পাহাড় যেন নড়ে উঠল। আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। চড়াই পথে উঠতে উঠতে দাঁড়ানো যায় না। যেমন ছোট গাছ বড় গাছ হাতের কাছে পেলাম, তাই জাপ্‌টে ধরে আমরা দাঁড়িয়ে পড়ে দম নিতে লাগলাম। কিছু পরে হয়গ্রীব (!) হাতের ইসারা করতে আবার চড়াই ভাঙতে লাগলাম। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে অজস্র শাল, সেগুন, ভূর্জ, বেল অশ্বত্থ গাছ যেমন আছে তেমনি পাহাড়ের গা জুড়ে আছে বিশাল বিশাল কাঁটা গাছের ঝোপ। কুন্দুনজী অতি সন্তর্পণে আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। আমাদের থেকে কিছু উপরে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার মুখোস পরা মানুষটা হঠাৎ বল্লমটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচাতে নাচাতে বিকট চিৎকার সুরু করে দিল। কুন্দুনজী ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বলে উঠলেন হুঁসিয়ার! হুঁসিয়ার! নিশ্চয়ই ও কোন হিংস্র জন্তু কাঁটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে দেখেছে নতুবা তার গন্ধ পেয়েছে। তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই একদল বন্য কুকুরকে ঘেউ ঘেউ শব্দ করতে করতে দৌড়ে আসছে দেখতে পেলাম। হয়গ্রীবকে দেখে তারা থমকে দাঁড়াল, আর তদ্দণ্ডেই দেখলাম ঝোপ থেকে একটা চিতাবাঘ বেরিয়েই একটা বন্য কুকুরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টুটি চেপে ধরল। অন্য কুকুরগুলো থামলো না বা ভয় পেল না। এক সঙ্গে প্রায় সাত আটটা কুকুর চিতাটাকে চারদিক থেকে আক্রমণ করে তার চারটে পা, বুক ও পিঠ কামড়ে ধরল। হয়গ্রীব উপর থেকে তাড়াতাড়ি নেমে এসে কুন্দুনজীকে তার দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বলতেই কুন্দুনজী দ্রুত আমাদেরকে অন্যপথ দিয়ে বাঁদিকে একটা উৎরাই-এর পথে নর্মদার ধারে নিয়ে চললেন। নর্মদার তটে নেমে গিয়ে জলে অজস্র শালগ্রাম ভাসতে দেখে অবাক হলাম। আমরা জানি নেপালের কালীগণ্ডকী নদীর কূলে কূলে বিশেষতঃ মুক্তিনাথের পথে দামোদর কুণ্ডে শালগ্রাম শিলার উৎপত্তি। কালীগণ্ডকীতে শালগ্রাম শিলা অজস্র ভাসে বলে ঐ নদীর নামই হয়েছে শালগ্রামী বা নারায়ণী। নিকটস্থ পর্বতের নামও শালগ্রামী বা নারায়ণী। নেপালে তুলসীগাছ দুর্লভ। এইজন্য হিন্দু গৃহস্থ তুলসীপাতা সমতল ভূমি হতে সংগ্রহ করে নিয়ে যান দামোদর কুণ্ডে। সেখানে তুলসীপাতা কুণ্ডের জলে ফেলে দিলেই যেটি আসল শালগ্রাম, সেটি তুলসী পাতাটিকে চোঁ করে টেনে নেয় চুম্বকের মত। অতিকষ্টে সংগ্রহ করে সেই শিলাটি হিন্দু গৃহস্থ নিয়ে যান তাঁর বাড়ীতে; গৃহদেবতা রূপে আমৃত্যু পূজা করেন। হিন্দু ভারতবর্ষে খুব কম গৃহস্থই আছেন যার বাড়ীতে শালগ্রাম নাই। শালগ্রাম শিলার মধ্যে সোনা থাকে বলে আজকাল নেপাল সরকার দামোদর কুণ্ডকে সৈন্য দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। আমি নর্মদার উত্তরতট পরিক্রমার সময় ধাবড়ীকুণ্ডে হাজার হাজার বানলিঙ্গ নর্মদার জলে ভাসতে দেখেছি, নর্মদাতটের আরও বহুস্থানেও শিবলিঙ্গ দেখেছি

কিন্তু শালগ্রাম শিলা কোথাও দেখিনি। এখানে এই ডেহরী পর্বতের সানুদেশে নর্মদার জলে শালগ্রাম শিলা দর্শন, আমার মনে হল এটি যেন বিস্ময়কর আবিষ্কার! ৯টা বেজে গেছে, কিছুক্ষণ আগে যে চিতাবাঘ ও বন্যকুকুরের লোমহর্ষক লড়াই দেখে এসেছি, তাতে সবারই মন চঞ্চল ও ভারাক্রান্ত ছিল, শালগ্রাম শিলাদর্শনে আমাদের মন ক্ষণিকের জন্য আনন্দিত হলেও পথের বীভৎসতা স্মরণ করে সবাই সন্ত্রস্ত ও ভীত হয়ে পড়েছি। কুন্দনজী ও তাঁর সঙ্গীকে দেখে কতকটা স্থির আছি মাত্র! হিরন্ময়ানন্দজী এঁরা থাকতে থাকতেই কমণ্ডলুতে জল ভরে ভরে কোনমতে মাথায় ঢেলে স্নান করে নিতে বললেন, – ঘাটে নামার উপায় নাই। নর্মদার জলে সূর্যরশ্মি এসে পড়েছে। উভয়তটের মনোরম দৃশ্য দেখে চোখ ফেরানো যায় না। আমরা হিরন্ময়ানন্দজীর পরামর্শ মত স্নান করে নিয়ে জামা গায় দিয়ে, প্রত্যেকের গায়ের কম্বল সোয়েটার গাঁঠরীর সঙ্গে বেঁধে নিলাম। কারণ এখনই চড়াই ভেঙ্গে উঠতে হবে। তাতে এমনিতেই গা গরম হয়ে উঠবে হাঁপ ধরবে। যে পথে নেমে এসেছিলাম, আবার সেই পথেই, এবার চড়াই-এর পথে কুন্দনজী আমাদেরকে নিয়ে চললেন। যেখানে বাঘ কুকুরের লড়াই দেখেছিলাম সেখানে পৌঁছে দেখি বীভৎস দৃশ্য! চিতাবাঘটা, সেই সঙ্গে একটা বুনো কুকুরও ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মরে পড়ে আছে। আমরা দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চড়াই-এর পথে উঠতে লাগলাম। ঘন জঙ্গলাবৃত পাহাড় বেয়ে আরও শতখানিক ফুট উঠার পর পাহাড়ের গায়ে একটা স্তর পেলাম যেখানে কিছুক্ষণ বসা যায়। সেখানে শিশুগাছ অকোলা, রিমঝা, সেগুন এবং চুলুর গাছ এমন জড়াজড়ি করে উঠেছে যে, গাছের পাতা ভেদ করে সেখানে সূর্যালোক ঢুকতে পারছে না। চুলুর গাছটা দেখিয়ে আমি হরানন্দজী এবং রঞ্জনকে বললাম যে, এই গাছটা দেখামাত্রই চিনতে পারলাম এই কারণে যে, উত্তরতট পরিক্রমাকালে ওঁকারেশ্বরের শিবপুরীতে ওঁকারমান্ধাতাতে পর্বতশীর্ষের উপরে সিদ্ধনাথ দর্শন কালে সিদ্ধনাথ মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে এই রকম একটা বিশাল চুলুর গাছ আমাকে প্রলয়দাসজী নামে একজন সিদ্ধ মহাত্মা চিনিয়ে দিয়েছিলেন। হিরন্ময়ানন্দজী কুন্দনজীকে সেই গাছের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে তিনি জবাব দিলেন – হ্যাঁ, চুলুর গাছই বটে! কুন্দনজী বললেন – এবার আমরা এখান থেকেই বিদায় নিব। আপনারা এই পথে অন্ততঃ সাতটা পাকদণ্ডী এবং ১১টা পার্বত্য ঝরণা দেখতে পাবেন। এই জঙ্গল বাইসন, সম্বর, হিরণ (হরিণ) ছাড়াও বড় বড় শের, চিতাবাঘ হায়না সবরকমের হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ। চড়াই ভাঙতে ভাঙতে আরও অন্ততঃ ১০০ ফুট উপরে উঠলে পাহাড়ের এমন একটা অংশে পৌঁছবেন, যেখানে পাহাড়ের গাটা সহস্র সহস্র উর্ধ্বমুখী শিবলিঙ্গে পরিপূর্ণ বলে মনে হবে। কা-মা আপনাদেরকে রক্ষা করুন। এই বলে তিনি আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে কোলাকুলি করে বিদায় নিলেন। হয়গ্রীব আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর তরতর করে নেমে যেতে লাগলেন নিচের দিকে। আমরা সম্পূর্ণ অসহায় ও নির্বান্ধব হয়ে পড়লাম। মনে মনে বললাম – তোমাদেরকে কখনও ভুলবো না বন্ধু! তোমাদের সদাশয় ব্যবহার এবং আতিথেয়তার কথা মনের স্মৃতি ফলকে আমৃত্যু অক্ষয় হয়ে থাকবে।

বেলা বোধ হয় ১১টা বাজতে যায়, হিরন্ময়ানন্দজী এবং বাসবানন্দজী বললেন – কুন্দনজীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হতে বুঝা যাচ্ছে, সিন্দূরীর খাড়া দেওয়ালের মত চড়াই ভাঙতে গিয়ে যেমন আমাদেরকে ডন ভাঁজার ভঙ্গীতে হুমড়ী খেয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে উঠতে হয়েছিল, কিছুটা এগিয়ে আমাদেরকে হয়ত সেই রকম ভাবেই উঠতে হবে, কাজেই এখান থেকে সকলে ঝোলা গাঁঠরী কমণ্ডলু লাঠি সবই পিঠে বেঁধে নিয়ে এগোনো ভাল। বলতে বলতে তাঁরা সেইভাবেই প্রস্তুত হয়ে গেলেন। আমরাও সকলে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। চুলুর গাছের তলা থেকে উঠে প্রায় ৫০ ফুট পায়ে হেঁটে চড়াই ভেঙ্গে যেখানে পৌঁছলাম, দেখলাম

সেখান থেকেই ডেহরী পাহাড়ের খাড়া দেওয়াল শুরু। পর্বত গাত্রের এ কি গঠন রে বাবা! এ যে দেখছি, পাহাড়ের গায়ে কারা যেন প্ল্যান করে হাজার হাজার সূঁচলো শিবলিঙ্গ সেট করে রেখেছে! প্রত্যেকটি ঘন সন্নিবিষ্ট। পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে একটা ঝরণা ক্ষীণ ধারায় বয়ে আসছে বলে মনে হল শিবলিঙ্গগুলি প্লাবিত করে। বড়ই পিচ্ছিল পথ, ডন ভাঁজার ভঙ্গীতে হুমড়ী খেয়ে কঠিন চড়াই-এর পথে উঠতে লাগলাম। কিন্তু জলে ভিজে শিবলিঙ্গের মত পাথরগুলো এমনই হড়হড়ে হয়ে উঠেছে যে ৫ হাত চড়াই ভাঙ্গলে ২/৩ হাত হড়ুকে নেমে যেতে হচ্ছে। দুই হাত দিয়ে দুটো শিবলিঙ্গ আঁকড়ে ধরে ২ পায়ে ঠেলা মারতে গেলেই শেওলা পড়া শিবলিঙ্গের মত পাথরে কিছুতেই টিপ দিতে পারছি না। শেষ পর্যন্ত আমরা হুমড়ি খাওয়া অবস্থাতেই সবাই মিলে পরস্পর পরস্পর আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করলাম, কোনমতে বসে পড়ে বসা অবস্থাতেই পিঠে বাঁধা গাঁঠরী থেকে চট, কম্বল, কাপড় ছেঁড়া, থলে প্রভৃতি টেনে নিয়ে ছুরি দিয়ে তা কেটে টুকরো টুকরো করে বা ছিঁড়ে নিয়ে তাই দিয়ে দুহাত এবং দুই পায়ে পট্টি বেঁধে এগোতে হবে, তাহলে হয়ত শিবলিঙ্গগুলো হাত দিয়ে জাপটে ধরতে পারব এবং দুটো পায়েও টিপ্ দিতে পারব। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে গিয়েও আর এক মারাত্মক বিপত্তি দেখা গেল। সূঁচলো পাথরের উপর বসেও থাকতে পারছি না, পাছায় লাগছে। আমরা ভয়ে এবং পরিশ্রমে রীতিমত ঘামছি যেমন, তেমনি কষ্টে সকলের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সবাই কাঁদতে কাঁদতে হর নর্মদে হর নর্মদে করছি। হিরন্ময়ানন্দজী বললেন – আমার কেবলই মনে হচ্ছে, ঝোলা গাঁঠরী সব ফেলে দিই। আমি বললাম – ছেলেমানুষী করবেন না। যত কষ্ট হোক আর ৫০ হাত উঠতে পারলে উপরে পর্বতগাত্রে আর শিবলিঙ্গের মত পাথরের setting দেখতে পাচ্ছি না। ঐখানে পৌঁছতে পারলে আর আমাদের অত কষ্ট হবে না। আমরা যেমন ভাবে দুহাত ও দুপায়ের উপর ভর দিয়ে এতটা উপরে উঠে এলাম, সেইভাবে পুনরায় ডন ভাঙ্গার ভঙ্গীতে বাঁদর যেমন ভাবে বড় বড় গাছের মোটা মোটা গুঁড়ি ভেঙ্গে গাছের উপরে উঠে সেইভাবে আরও প্রায় ২০হাত উঠে গাছের দুটো মোটা মোটা শিকড় হাতের নাগালে পেয়ে গেলাম। আমরা শিকড় ধরে কোন মতে শিকড়ের উপরে বসে পড়ে স্বস্তি পেলাম। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি দুটো গাছ পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে। এ গাছ উত্তরতটের মাকড়খেড়ার জঙ্গলে আমি দেখেছিলাম। নগেন্দ্রভারতীজী আমাদের এই দুই রকম গাছই চিনিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, একটার নাম দহিখেড়া এবং আর একটির নাম বেড়াই। এই দুই রকম গাছই পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে পারে। বেড়াই গাছে এক রকম বড় বড় ফল হয়। সেই ফল পেকে ফেটে পড়লে তার মধ্যে থেকে বাদামের মত বীচি বেরোয় খেতে বাদামের মতই লাগে। কাজু বাদামের মতই এই বীচি খুবই পুষ্টিকর। পাহাড়ী লোকরা সাগ্রহে বেড়াই গাছের ফল পেকে গেলেই সংগ্রহ করে।

আমরা কোনমতে দহিখেড়া এবং বেড়াই গাছের মোটা মোটা শিকড় জাপটে ধরে উঠে বসলাম। শিকড়ের উপর বসে যে যার গাঁঠরী খুলে মেঝেতে পাতবার মোটা মোটা চট সংরক্ষি কম্বল ঝোলা ইত্যাদি ফালিফালি করে ছিঁড়ে ভাল করে প্রত্যেকেই যে যার পায়ে হাতে জড়িয়ে একে অপরকে দিয়ে চট থলে সংরক্ষি ছেঁড়ার ফুঁপি দিয়ে বেঁধে নিলাম। আবার মা নর্মদাকে স্মরণ করে দ্বিগুণ উৎসাহে বাঁদরের গাছ বেয়ে উঠার মত পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগলাম চড়াই-এর পথে। হাত পায়ে এই রকম ভাবের কিম্ভূতকিমাকার ব্যাণ্ডেজ বাঁধার পর জলে ভেজা শিবলিঙ্গগুলোকে দুহাতে ধরতে এবং দুপায়ে ঠেকা দিতে কিছুটা যে সুবিধা হল সে কথা অস্বীকার করে লাভ নাই। জলে ভিজে লটপট খেতে খেতে আমরা উঠতে লাগলাম। ব্যথায় সকলেই কষ্ট পাচ্ছি, সকলেই কাৎরাচ্ছি, সকলেই যে যার ইষ্ট দেবতার নাম নিয়ে আর্তি জানাচ্ছি, এমন কি শূলপাণীশ্বর মহাদেবকে গালাগালিও করছি,

অসাধারণ কথা সাহিত্যিক বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর পাথেয় এবং পরিবার প্রতিপালনের দায়দায়িত্ব বহনের অঙ্গীকারে তাঁকে নর্মদা ভ্রমণে পাঠাতে পারতেন, তাহলে তাঁর কলম দিয়ে যে লেখা বেরোত তা বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকত। তাঁর প্রকৃতিকে দেখার দৃষ্টি ছিল, অন্তর্দৃষ্টি এবং ভাবদৃষ্টি দুই-ই। তাঁর কলমেও ছিল যাদু। তিনি হলে লিখতে পারতেন – 'ওই নক্ষত্রলোক থেকে অপরিচিত রূপসী দেববালাগণ অদৃশ্য চরণে নেমে আসেন এমনই জ্যোৎস্না শুভ্র নিশীতে রাত্রে এই গভীর অরণ্যানী মধ্যস্থ সরোবরে জলকেলি করতে ইতর চক্ষুর অন্তরালে। মহাকাল এখানে অচঞ্চল, স্তব্ধ মৌন বনস্পতি শ্রেণীর মত ধ্যান-সমাহিত। এই আকাশ, এই নির্জন জ্যোৎস্না, এই নিশীথ রাত্রি, এই গভীর অরণ্য যেন কি কথা বলছে – সে শব্দহীন বাণী ওই বন্য নদীর চঞ্চল কলগীতিতে মুখর হয়ে উঠছে প্রতিক্ষণে – কিংবা গভীর অরণ্য নিঃশব্দতার সুরে সুর মিলিয়ে অন্তরাত্মার কানে তার সুগোপন বাণীটি পৌঁছে দিচ্ছে। ...... সে বাণী নৈঃশব্দের বটে, কিন্তু অমরতার বার্তা বহন করে আনছে। এই অরণ্যই ভারতের আসল রূপ, সভ্যতার জন্ম হয়েছে এই আরণ্য শান্তির মধ্যে, বেদ আরণ্যক, উপনিষদ জন্ম নিয়েছে এখানে – এই সমাহিত স্তব্ধতায় – নগরীর কলকোলাহলের মধ্যে নয়। আজ এখানে এসে মনে হচ্ছে, অশোকের সময়েও এই নদী ঠিক এমনি বয়ে চলতো এই গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে – এই অরণ্য আরও গভীরতর ছিল – তারও পূর্বে আর্যদের ভারতবর্ষ প্রবেশের দিনেও এই নদী এখানে এমনি চঞ্চল কলোচ্ছ্বাসে নৃত্যশীলা বালিকার নূপুর বাজানো পা দুটির মত নৃত্যভঙ্গীতে ছুটে চলতো, উদাসীন প্রকৃতি এমনি সাজিয়েছিল এ বনভূমিকে কিন্তু কেউ কখনো দেখুক না দেখুক – প্রশ্নও করেনি। আজ আমরা এসেছি, করুণাময় বিশ্বশিল্পী যেন প্রসন্ন নেত্রে হাসিমুখে নীরবতার মধ্য দিয়ে ওই জলকলতানের মধ্য দিয়ে বলছেন – কেউ দেখে না, কত যুগযুগান্তর থেকে থেকে এমনই সাজিয়ে দিই, প্রতি দিনে, প্রতি সন্ধ্যায়, প্রতি রজনীতে – আজ এলে তোমারা এতদিনে ? বড় আনন্দ হচ্ছে আমার। দেখ, ভাল করে দেখ।

জয় হোক তাঁর, জয় হোক সে মহা দেবতার।

চারদিকের চুল্লীর আগুন কমে আসছে। আমার সঙ্গে duty দিচ্ছিল আর একজন ব্রহ্মচারী। তাকে বললাম, যেখানে যেখানে আগুন নিভে আসছে, সেখানে সেখানে দুটি করে কাঠ চাপাও। সবাই যখন অঘোরে ঘুমাচ্ছে আর কোথাও কোন বিপদ দেখছি না, তখন আরও কিছুক্ষণ জেগে থাকি। তোমার কি কোন কষ্ট হচ্ছে ? ব্রহ্মচারী বললেন – জলকাদায় লেপ্টা লেপটি হয়ে ত্রিশূলের খোঁচার মত পাথরের উপর হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে এই দেখুন আমার বুকটা আঁচড়ে রক্তাক্ত হয়ে গেছে। স্বামীজী সকলের সঙ্গে আমাকেও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খেতে দিয়েছেন। আগুনের তাপে শরীর আমার টনকো হয়ে উঠেছে। আমার চেয়ে সকলেরই বয়স বেশী, আহা ! ওঁদের কত কষ্টই না হয়েছে ! ওঁদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। কারও কোন সাড় নাই। ঘুমে সবাই অচৈতন্য। বুড়ো স্বামীজী এবং হরানন্দজী ত পথের কষ্টের চেয়ে দুই স্বামীজীর একসঙ্গে বাঘের কবলে মৃত্যু দেখে একেবারে শোক বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। ওঁদেরকে আরও কিছুটা সময় ঘুমাতে দেওয়া ভাল। আমি আরও ঘণ্টা খানিক জেগে থাকতে পারব। আমি সাবধানে রঞ্জনের ঘড়িটা টেনে নিয়ে দেখলাম, রাত্রি ১০টা বেজে গেছে। ব্রহ্মচারী চারদিকে দু তিনটা করে কাঠ চাপিয়ে আমাকে পুনরায় প্রশ্ন করল, পর্বতগাত্রে শিবলিঙ্গের মত অজস্র তিন কোণা সূঁচালো পাথর বসানো দেখে বুঝতে পারছি, শুধু ভগবান শূলপাণীশ্বরের পীঠস্থান হিসাবে নয়, পর্বতগাত্রে ঐ রকম শিবলিঙ্গের আকৃতি দেখে এই জঙ্গলের নাম শূলপানির ঝাড়ি নাম খুবই সার্থক। কিন্তু একটা অপরাধবোধ আমার মনে খচ্‌খচ্‌ করছে, শিব আমাদের ইষ্টদেবতা, আমরা সেই শিবলিঙ্গের উপর পা দিয়ে মাড়িয়ে উঠলাম। আমাদের এতে কোন অপরাধ হলো না ?

– না, কারণ ঐ পর্বতগাত্রে কেউ শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন নি। ঐগুলো শিবলিঙ্গই নয়। কোন পাথরের শিবলিঙ্গের মত আকৃতি হলেই তাকে শিবলিঙ্গ বলা যাবে না। প্রত্যেকটি শিবলিঙ্গের নানারকম বর্ণ এবং চিহ্ন থাকে। আমাদের শাস্ত্রে নানা বর্ণ, আকৃতি এবং লক্ষণ বিচার করে বিখ্যাত বিখ্যাত শিবলিঙ্গের নাম করা হয়েছে। ডেহরী পাহাড়ের ঐ অংশটি পাহাড়েরই স্বাভাবিক আকৃতি।

আমরা কথা বলতে বলতেই দেখলাম তিনটি চিতাবাঘ আমাদের দিকে তাদের লকলকে জিহ্বা বের করে দৌড়ে এসেই আগুনের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। তাদের চোখ চকচক করছে, চোখ থেকে ঝরে পড়ছে লোভ এবং হিংস্রতা। এসেই আগুনের চারপাশে ঘুরতে লাগল। এই ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আর কি! আমাদের ঘুমন্ত সাথীদের জাগাতে বাধ্য হলাম। তাঁরা চিতাবাঘ এবং তাদের ক্রমাগত লেজ ঝাপটানি দেখে ভয়ে কুঁকড়ে গেলেন। কাঁদতে কাঁদতে হর নর্মদে বলে চীৎকার করতে লাগলেন। বললাম, কান্না শুনে কি চিতাবাঘ ভেগে যাবে? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশা! লাঠি হাতে উঠে দাঁড়ান, কাঠের অভাব নাই। আগুন ডিঙিয়ে আমাদেরকে আক্রমণ করতে সাহস করবে না। আমরা প্রত্যেকেই জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে ছুঁড়তে লাগলাম! হরানন্দজী বললেন – ভাই আপনার পকেট থেকে হাতাজোড়িটা বের করে দেখান। এর আগের পাহাড়ে আপনার মনে নাই, হাতাজোড়ি দেখে বুনো হাতির দল থমকে দাঁড়িয়ে গেছল, তারপর পালিয়েছিল মুখ ঘুরে। আমি বললাম – চিতাবাঘ আর বুনোহাতি এক নয়, এদের মত হিংস্র এবং ধূর্ত কম প্রাণীই আছে। এরা রয়াল বেঙ্গল টাইগারের চেয়েও রক্তলোলুপ এবং জিঘাংসু। মহাত্মা কৃপানাথকে স্মরণ করে, আপনারা যখন বলছেন, তখন হাতাজোড়িটা দেখাচ্ছি। ফল কি হয় দেখা যাক্! যেখানে আগুনের শিখাটা একটু কম, সেদিকেই দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হয়েছে, আমি হাত উঁচু করে হাতাজোড়িটা ঘুরাতে লাগলাম। তারা ঝাঁপ দিল না, থমকে দাঁড়িয়ে প্রায় হাত পঞ্চাশেক পিছিয়ে বসে রইল। পূর্ণিমার ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় তাদেরকে স্পষ্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাদের হরিদ্রাবর্ণের চামড়ার উপর কালো কালো দাগ অদ্ভুত দেখাচ্ছে জ্যোৎস্নার আলোতে। ক্রমে রাত্রি ৩টা বাজলো। হরানন্দজী বললেন – আজ যদি নাঙ্গা মহাত্মা আমাদের সঙ্গে থাকতেন! হায়! আজ তাঁর অভাব বড় বেশী করে অনুভব করছি। সকলের মনে আছে ত? মোক্ষড়ী গঙ্গার কাছে পাহাড় পেরিয়ে এইভাবে আমাদেরকে গাছের তলায় আগুন জ্বালিয়ে রাত কাটাতে হয়েছিল, সেই দিনও আমাদেরকে ঘিরে ধরেছিল একদিকে নেকড়ে অন্যদিকে হায়েনার দল, যোগীশ্বর নাঙ্গা মহাত্মা দুহাতে দুটো জ্বলন্ত কাঠ দুদিকে ছুঁড়ে মেরেছিলেন, সেই জ্বলন্ত কাঠের আগুন কয়েক খণ্ডে বিভক্ত হয়ে দুদিকের প্রত্যেকটা নেকড়ে এবং হায়েনাকে তাড়া করে নিয়ে গেছল। আমরা অব্যাহতি পেয়েছিলাম। যোগীশ্বরকে পেয়েও হারিয়েছি। সে রকম যোগীশ্বরকে আর কোথায় পাব, আজ বুঝতে পারছি বাসবানন্দজী এবং তুরীয় চৈতন্যের মত আজ আমাদেরকেও বাঘের পেটে যেতে হবে! – আমি বললাম, সেই রকম যোগীশ্বর এই নর্মদার উত্তরতটে সীতামায়ীর জঙ্গলে আমি দেখে এসেছি। অনন্ত যোগৈশ্বর্যের অধিকারী তিনি।

– কে তিনি? কি নাম তাঁর? সংযত চিত্তে স্মরণ করুন তাঁকে। যো যস্য হৃদ্যং নহি তস্য দূরং। যোগীশ্বর যদি হন, তাহলে আপনার কাতর প্রার্থনায় তাঁর কৃপা দৃষ্টি আমাদের উপর পড়তে পারে। হিরন্ময়ানন্দজীর কথায় আমি সেই অগ্নি বেষ্টিত স্থানে বসে পড়েই বাবার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে মহাত্মা সোমানন্দজীকে স্মরণ করতে লাগলাম। আধঘণ্টা কাটতে না কাটতেই হরানন্দজী বললেন ফিকে জ্যোৎস্নায় দেখতে পাচ্ছি কে যেন নর্মদা গর্ভ হতে টলতে টলতে, কি যেন বলতে বলতে উঠে আসছেন। তাঁর কথা শুনেই

আমি তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে সূচ্যগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম নর্মদার দিকে। আনন্দে আমার মন নেচে উঠল। তিনি আসছেন! তিনি আসছেন! সেই একই রকম টলতে টলতে আর অসংবদ্ধ প্রলাপের মত বলতে বলতে আসছেন – যম বেটা ভাই দুমুখো থলি, তাই জন্য ওর আঁত খালি। ও কেবল খাচ্ছে, খাচ্ছে, ওর পেটে কি কিছু থাকছে ? থাকছে। থাকছে।

যেয়েও আছে, থেকেও নাই। তেমনি তুমি আর আমি রে ভাই। আমরা মরে বাঁচি, বেঁচে মরি। মা নর্মদার এ কি বিষম চাতুরী।

স্বরূপের বাজারে থাকি। শোন্ রে খেপা বেড়াস্ একা, চিনতে নারলে ধরবি কি। কালার সঙ্গে বোবার কথা হয়, কালা গিয়ে শরণ মাগে শূলপাণির কাছে কে পাবে নির্ণয়। আর অন্ধ গিয়ে রূপ নেহারে তার মর্ম কথা বলবো কি। মড়ার সঙ্গে মড়া ভেসে যায়। জেয়ান্তে ধরতে গেলে হাবুডুবু খায়, সে মড়া নয়গো রসের গোড়া, তার রূপেতে দিয়ে আঁখি!

এখন পথ আর পথে চলা। যে জায়গা যত বড় সেখানে যাওয়ার পথও তত বেশী। শূলপাণি যখন উপনিষদের পরাগতি, বেদের সেই মহান্ প্রভুর্বৈ, সেই হিরন্ময় কোষের নিষ্কল ব্রহ্ম, তখন সেখানে পৌছবার পথও অসংখ্য অগণ্য।

এই পর্যন্ত বলতে বলতে তাঁকে চিতাবাঘগুলো ঘিরে ধরলো। আমার সঙ্গীরা সব ভয়ে চোখ ঢাকা দিল, আমি অস্থির হয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে আগুনের পাঁচিল ডিঙিয়ে তাঁর দিকে ছুটতে লাগলাম, দেখলাম তিনি দুটো বাঘের গালে দুই চড় কষে বললেন – ভাগ্ ভাগ্ ভাগ্ এখান থেকে, তোদেরকে বলেছিলাম না বামুনের মাংস তেতো হয়। অট্টাট্ট হাসিতে ফেটে পড়ে তিনি বললেন – ভয়ে ভাগছিস্ কেন, শেষ কথা শুনে যা, তোরা সব ব্রজের মানুষ – ব্রজ ব্রজ ব্রজ! এগিয়ে চল, হিংসার পশুযোনি ত্যাগ করে ভালবাসার যোনিতে জন্ম নে, জিঘাংসা লোপ পাবে, তখন তোদের বুকেও ভালবাসার ফুল ফুটবে। আমি ছুটে গিয়ে তাঁর দু পা জড়িয়ে ধরলাম। আমার পিঠে চাপড় মেরে বললেন – হ্যাঁরে বামুনছানা, ডেহরীর পাহাড়ে উঠে তোর বাবাকে ডাকতে ভুললি কেন ? বাবাকে ডাকতে ডাকতে জঙ্গল পথে হাঁটলে তোদের কোন বিপত্তি ঘটত না। বাবাকে ডাকলে তাঁর নাম নিলে জগতের যিনি বাবা, সেই শূলপাণীশ্বর ত্রিশূল হাতে তোর সঙ্গে ঘুরতেন! ঐ মুখপোড়া সাধুগুলো ত নিজেদের বাপ মার নাম ভুলে বসে আছে, সেই জন্যই ত ওরা বাঘের পেটে যায়! নিজের বাপ মাকে ইষ্ট ভাবতে পারলে কোন দুর্দশা ঘটে না, নে কান মোলা খা, এত রাত্রে মা নর্মদার হুকুমে আমাকে ছুটে আসতে হয়েছে!

আমি কান মোলা খেলাম!

৫টা বাজতে যায়, সকাল হয়ে আসছে, তবুও ঘোর কুয়াশার জন্য চারদিক অন্ধকারে ঢেকে আছে। বাঘগুলোকে প্রানপণ দৌড়ে পালিয়ে যেতে দেখে ৫টা কমণ্ডলুর জল এব জায়গায় ঢেলে সেখানকার আগুনটা নিভিয়ে দিলেন দণ্ডীর দল। তারপর নিজেদের ঝোলা গাঁঠরী গুছিয়ে নিয়ে আগুনের প্রাকার থেকে একে একে বেরিয়ে এলেন সবাই। এতগুলো ভয়ানক জিঘাংসু চিতাবাঘকে যোগবলে কাবু করতে দেখে তাঁর একে একে এসে যোগীশ্বর সোমানন্দজীর চরণতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। মহাত্মা কারও দিকে না তাকিয়ে ভা বিহ্বল কণ্ঠে মা নর্মদার দিকে তাকিয়ে আপন মনে বলে যেতে লাগলেন – মাগো সকলেই তোর জলময়ী রূপটাই দেখে, ভাবে, তোর তটে তটে দুর্গম পাহাড় পর্বত আর ঘনঘোর জঙ্গল ছাড়া আর কী-ই বা আছে! তবু কেন ঋষিরা বৈদিক যুগ থেকে তোর তটে বসে তপস্যা করে গেলেন ? সংসারী লোককে কি করে বুঝাই বল্ ত, যে তাপ সহা বড় তপস্যা ? যোগাসনে বসে নাখ মখ খিচে, শ্বাস টেনে নানা মুদ্রার কসরৎ করলেই কি

যোগ হয় ? অনেকে ভাবে, এই মর্ত্যলোকে তারা যে সব দেবী মূর্তি দেখেছে, তাঁদের গায়ে কত আভরণ ! কত অলঙ্কার ! যোগদৃষ্টিতে অনেক শুদ্ধচিত্ত যোগী সালঙ্কারা দেবীর জ্যোতির্ময়ী রূপ দর্শন করেছেন বলে শুনি ! তাঁরা মিথ্যার জাল বুনে গেছেন, এ কথা আমি বলছি না । তবে তোকে মা ! যারা কেবল নীরাকার দেখে, তারা জানে না, তোর কত আভরণ ! এই বলে তিনি সামনের দিকে হাঁটতে লাগলেন । আমরা যে যার ঝোলা গাঁঠরী তুলে নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম । টলতে টলতে তিনি ভাবের ঘোরে কখনও নাচতে নাচতে গেয়ে চললেন –

নাই আভরণ এমন কথা কেউ এনো না মুখে আর ।
রেবা মা-ই করতে পারেন অলংকারের অহংকার ।

এ জগৎ বটে মা তোমার অলংকার সাজানো থাল,
প্রাতর্মধ্যসায়ংকালে সাজায়ে দেন মহাকাল;
আবার নিশাকালে বদলে পরায়
তাতে আলো আঁধার দুই-ই দেখা যায়,
বল্ মা তবে কার মা ভাব আছে এত অলংকার !

কে বলে মোর রেবা মায়ের অলংকারের অপ্রতুল,
পরেন তিনি স্থির তড়িতের সুতায় গাঁথা তারার ফুল,
পরে থাকেন মা নর্মদা ইন্দ্রধনুর একাবলী,
স্বয়ং বৈজয়ন্তী* হয়ে পরবেন কেন বৈজয়ন্তী-নোলী ?

জীবের জীবন নাসার নোলক তা ত জানে সর্বজন,
পদ্মপাত্রে জলের মত দোলে যে তা সর্বক্ষণ ।
জ্ঞান সমুদ্রের মহারতন, শ্রুতি যে তাঁর কর্ণভূষণ
মুকুট যে তাঁর সদানন্দ নাশেন ভবের যতেক কালি !

বরাভয় মার হাতের বলয় তা ত সবার জানা কথা,
মা যে করুণার কঙ্কণ পরেন, মুক্তিফলের মালা গাঁথা;
মায়া-যন্ত্রে কায়া ঢাকি, সদা সংগোপনে থাকি
নিতম্বে সতত পরি সপ্তসিন্ধুর চন্দ্রহার ।

অষ্টসিদ্ধির নূপুর পরেন, তাইতে মায়ের অনুরাগ,
পুণ্যগন্ধস্বরূপিনী স্বয়ং শ্রী মা'র অঙ্গরাগ ।
ব্রহ্মাম্বায়ের অলক্তের জল, কেশব তাঁহার চোখের কাজল
কালানল তাম্বুল তিনি চর্বণ করেন বারংবার ॥

গোবিন্দ দেখেছে মাগো সুধাইলে বলবে সেও,
বাছা বাছা কাঁচা মেঘের আমলা বেটে মাথায় দাও ।
পোহাইলে বিভাবরী শিশু-সূর্যের সিঁন্দুর পরি
চাঁদ বেটে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে থাক অনিবার ॥
কে বলে তুমি কেবল নীরাকারা, নাইকো তোমার অলংকার !

---

*বৈজয়ন্তী শব্দের সাধারণ অর্থ ধ্বজা বা পতাকা অন্য অর্থ জানু পর্যন্ত লম্বিত পঞ্চবর্ণময়ী মালা ।

ভাবাবেগে এই রকম সুর করে ছড়া আবৃত্তি করতে করতে স্থির হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। মুখে তাঁর অলৌকিক হাস্যচ্ছটা! আমরা স্তম্ভিত হয়ে তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়লাম। স্বামী হিরন্ময়ানন্দজীকে দেখলাম, তদাবস্থায় তাঁর পাদস্পর্শ করার জন্য তিনি যেন আঁকুপাকু করছেন। পাছে বুড়ো স্বামীজী তাঁকে ছুঁয়ে ফেলেন, এজন্য আমি গায়ের জোরে তাঁকে দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে মৃদু কণ্ঠে ধমক দিয়ে বললাম – স্বামীজী! এ্যায়সা মৎ করিয়ে। সমাধিবান যোগীরা যখন সমাধিস্থ হন, তখন স্বাভাবিক ভাবে তাঁরা বুত্থিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁদেরকে স্পর্শ করতে নাই। ঐ সময় তাঁদেরকে স্পর্শ করলে তাঁদের দেহত্যাগ পর্যন্ত ঘটে যেতে পারে। কিন্তু সংসারী লোক সাধারণতঃ খুব লোভী ও স্বার্থপর হয়! যোগীর দেহ যায় যাক্, সেদিকে তারা ভ্রূক্ষেপ করে না, নিজের স্বার্থসিদ্ধির ধান্দায় তারা মশগুল থাকে। মনে ভাবে সমাধিস্থ যোগীর ঐ সময় পাদস্পর্শ করলে তাঁর দেহ বিচ্ছুরিত চৈতন্য শক্তি তার দেহস্থ সব কালিমা টেনে নেবে, তার পরমার্থ লাভ হবে। কিন্তু ভ্রমান্ধ সংসারী লোকের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আপনার মত বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বদ্ধ গৃহীর মত আচরণ করবেন কেন?

আমার কথা তাঁর কানে ঢুকলো বলে মনে হল না। উলটে রেগে গিয়ে তিনি বলতে লাগলেন – এ বিষয়ে তোমাকে কোন উপদেশ দিতে হবে না। তুমি বরং বল, তুমি কি এঁকে আগে থেকে চিনতে? তোমার সঙ্গে এঁর কোথায় পরিচয় হয়েছিল? উনি কি দীক্ষা দেন? তুমি কি ওঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছ?

আমি হাতজোড় করে বললাম – ওঁর সমাধি ভাঙা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আপনি নিজেই জিজ্ঞাসা করবেন ওঁকে, ওঁর কাছেই আপনার সমূহ প্রশ্নের উত্তর পাবেন। আমাকে রেহাই দিন। এই বলে আমি তাড়াতাড়ি মহাত্মার কাছে ফিরে এলাম। তিনি একই অবস্থায় চিত্রার্পিতবৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সকাল ৮টা বেজে গেছে। পর্বত শীর্ষে সূর্যোদয় হয়েছে। সেই সূর্যরশ্মি তাঁর মুখে পড়ায় তাঁর মুখমণ্ডল আরও উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। এই রকম তাঁর জ্যোতির্দীপ্ত মুখমণ্ডল দেখেছিলাম উত্তরতটের সীতামায়ীর জঙ্গলে সীতামায়ীর মন্দিরে, রাত্রিকালে যখন তিনি নিদ্রিতবৎ ছিলেন। গভীর রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে যেতে তাঁর দিকে নজর পড়ায় দেখেছিলাম তাঁর মুখমণ্ডলকে ঘিরে রয়েছে একটা জ্যোতির বলয়, ইংরাজীতে যাকে বলা হয় – Aura of light!

আমি হরানন্দজী এবং রঞ্জন তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলাম। সন্ন্যাসীরা দল বেঁধে ঝরণার দিকে গেলেন প্রাতঃকৃত্য সারতে। তাঁর ঘণ্টাখানিক পরে যখন ফিরে এলেন, তখনও মহাত্মা চিত্রার্পিতবৎ একইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন! আমরা তিনজন ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলাম, যদি ব্যুত্থানের সময় স্বেদ কম্প শিহরণ ইত্যাদি সাধারণ যোগীদের ক্ষেত্রে যেমন শোনা যায়, সেই ধরণের কিছু হয়ে তিনি পড়ে গেলে আমরা ধরে ফেলব, সেই আশায়! কিন্তু সে সব কল্পনা বৃথা! তাঁর শ্রী অঙ্গ তিনবার শিহরিত হল বটে কিন্তু তাঁর মধ্যে পতন ও মূর্চ্ছার কোন ঢং দেখতে পেলাম না, তিনি ব্যুত্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খিল্ খিল্ করে হাসতে হাসতে নর্মদার দিকে তাকিয়ে আনন্দ গদ্গদ্ কণ্ঠে বলে উঠলেন –

তুমি ত মা রইলে ভুলে আমি পাগল নিয়ে সারা হই,
হাসে কাঁদে সদাই ভোলা জানে না মা আমা বই।
দিতে হয় মা মুখে তুলে, না হয় খেতে যায় মা ভুলে
ভোলার কথা ভাবতে গেলে আমাতে আর আমি নাই।

আবার খিল খিল করে হাসি! হাসতে হাসতেই তিনি একটি উঁচু পাথরের উপর বসে পড়লেন। তিনি বসে পড়তেই প্রণামের হিড়িক পড়ে গেল। দূর থেকে সবাই প্রণাম

করলেন। হিরন্ময়ানন্দজী প্রথমেই প্রশ্ন করলেন – আপনি শৈলেন্দ্রনারায়ণজীকে দেখা হতেই বললেন – সে ভয়ঙ্কর ডেহরী পাহাড় অতিক্রম করতে করতে পিতৃনাম স্মরণ করেনি বলে আর আমরাও তা করিনি বলেই নাকি বিপত্তির মুখে পড়েছিলাম; আমাদের দুই সাথী বাঘের মুখে প্রাণ হারিয়েছে, আমরাও প্রত্যেকে অবর্ণনীয় দুর্দশা ভোগ করেছি। আপনার এ কথা মানতে পারছি না। কারণ, আমরা ত এক মুহূর্তের জন্যও 'হর নর্মদে' মন্ত্র জপ করতে ছাড়ি নি। 'হর নর্মদে' মন্ত্র স্মরণের চেয়ে কি পিতৃনাম বেশী শক্তিশালী ?

– তুমি বাপু কি রকম সন্ন্যাসী ? হর অর্থাৎ শিব এবং নর্মদার স্বরূপ কি তুমি কখনও চোখে দেখেছ ? যাঁকে চোখে দেখনি, যাঁদের স্নেহ ভালবাসার স্বাদ কোন দিন পাওনি, তাঁদের নাম জপে কি ফলটা ফলবে শুনি ? অদৃষ্টপূর্ব বস্তুকে কি স্মরণ মনন করা যায় ? তুমি গোলাপ বেল যুঁই চোখে দেখেছ, তাদের গন্ধও শুঁকেছ, কাজেই গোলাপ বেলা যুঁই এর নাম করলে তাদের আকৃতি এবং কোন ফুলের কি রকম গন্ধ সঙ্গে সঙ্গে তা অনুমান করতে পারবে, কিন্তু তোমাকে যদি কম্‌প্রিটাম বা ডিকেনড্রাম ফুলের নাম, তার আকার, তার ফুল ও লতার নাম স্মরণ মনন করতে বলা হয়, তুমি কিছুতেই তা পারবে না। কারণ তুমি কম্‌প্রিটাম ডিকেনড্রাম গাছ কস্মিন্ কালেও দেখনি। হর, হরজায়া এবং হরকন্যার স্বরূপ তোমাদের দেখা নাই, হর বললেই যাত্রার দলে ত্রিশূলধারী যে লোকটি শিব সাজেন হয়ত তাঁরই কথা তোমার চিন্তায় ফুটে উঠবে, তোমার কল্পনা প্রখর হলে সেই লোকটারই পরিধানে বাঘছাল, তাঁর কপালে আগুন ধক্ ধক্ করে জ্বলছে, গায়ে তাঁর সাপ জড়িয়ে আছে এইরকম কিম্ভূতকিমাকার এক রূপ ধারণা করে বসবে, হরজায়া বললেই দুর্গাপূজার সময় যেমন দুর্গামূর্তি কারিগররা কল্পনায় গড়ে সেই রকম দশ প্রহরিণী ধারিণী সিংহবাহিনী এক নারীমূর্তি তোমার মনের পটে ভেসে উঠবে, নর্মদে নর্মদে বললেই তাঁর এই যে জলময়ী বহিরঙ্গ রূপ, এই জলের প্রবাহ ছাড়া আর কিছুই তোমার মনে ভাসবে না। অথচ এইগুলির কোনটিই তাঁদের স্বরূপ নয়। কিন্তু বাবা বা মার নাম নিলে বা তাঁদেরকে স্মরণ করলে ঐ রকম কোনও কাল্পনিক ভুলরূপ ফুটে উঠার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। মা বাবা যে সন্তানের অন্তর্সত্ত্বা বহির্সত্ত্বা ব্যেপে সতত বিরাজ করছেন। মা বাবার স্নেহ ঢলঢল মুখছবি, সন্তানের শরীর স্বাস্থ্য লেখাপড়া তপস্যা, নাম যশে তাঁদের উল্লাস আবার কোন বিষয়ে পুত্রকন্যা অকৃতকার্য হলে তাঁদের বিষাদময় মুখছবিতে যে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, এমন আর কারও মধ্যে দেখেছ বা দেখতে পাবে ? অকৃতী অধম সন্তানের উপরও মা বাবার যে টান থাকে, দয়া থাকে, ভালবাসা থাকে, তার জন্য যে কল্যাণ চিন্তা থাকে এমনটি আর কোথাও দেখতে পাবে না। এইজন্য বেদের নির্দেশ–মাতৃদেবোভব, পিতৃদেবোভব। তুমি ত এদিকে দেখছি গেরুয়া পরেছ, সন্ন্যাসের ভেক ধারণ করেছ, কিন্তু তুমি কি শতপথ ব্রাহ্মণের এই বচনটি শোন নি যে – মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্যবান্ পুরুষো বেদ অর্থাৎ প্রথম মাতা, দ্বিতীয় পিতা এবং তৃতীয় আচার্য এই তিনজনের প্রতি যখনই কারও তীব্র অনুরাগ জাগে, তখনই তার পক্ষে প্রজ্ঞালাভ সম্ভব হয়। শাস্ত্রে এমন কথাও আছে, মা বাবার অনুমতি ছাড়া যারা সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে তারা ভ্রষ্ট সন্ন্যাসী। মা বাবার অনুমতি ছাড়া তাঁদেরকে কাঁদিয়ে যারা সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করে, সেই সব অকৃতজ্ঞ বেঈমানরা যতই তীব্র তপস্যা বা যোগানুষ্ঠান করুক তাদের সিদ্ধি সুদূর পরাহত। স্বয়ং যোগিগুরু আচার্য শঙ্কর যতক্ষণ মায়ের অনুমতি পান নি, ততক্ষণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নি, অঙ্গে গেরুয়া চাপান নি। দাক্ষিণাত্যে পূর্ণানদীতে স্নান করার কালে তাঁকে একবার কুমীর ধরেছিল, তিনি নদীতটে দণ্ডায়মানা মাকে আর্তকণ্ঠে রোরুদ্যমান্ কণ্ঠে বলেন – মাগো ! তুমি দয়া করে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দাও, নতুবা কুমীরের করাল গ্রাসে আমার মৃত্যু অনিবার্য। স্নেহময়ী পুত্রগতপ্রাণা জননী পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য তদ্দণ্ডেই তাঁকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দেন।

বলা বাহুল্য, আদি শঙ্করাচার্য তখনই কুমীরের গ্রাস মুক্ত হন। পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্যদের কেউ কেউ প্রচার করে গেছেন যে, আসলে কুমীরে আচার্য শঙ্করকে আদৌ আক্রমণ করে নি, তিনি মাতৃ আদেশ আদায় করার জন্যই এইরকম ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। একথা সত্য বা অসত্য যাই হোক, একথা কিন্তু প্রমাণ করে যে, আচার্য শঙ্করও তাঁর মাতৃরূপিণী মহাগুরুকে জীবনে অগ্রাধিকার দিয়ে গেছেন। তাঁর মা যখন মৃত্যুশয্যায়, আচার্য শঙ্কর তখন ছিলেন ওঁকারেশ্বরে। যোগদৃষ্টিতে তা জানতে পেরে তিনি ওঁকারেশ্বর হতে দাক্ষিণাত্যের সুদূর কালাডিগ্রামে গিয়ে মুমূর্ষ মায়ের শয্যাপার্শ্বে থেকে সেবা করেছিলেন। এই তপোভূমি নর্মদার তটে তপস্যা করলে সিদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। এজন্য বৈদিক ঋষিরা সবাই এখানে এসে তপস্যা করেছিলেন। আমি আজীবন অনুসন্ধান করে দেখেছি, যে সব বৈদিক ঋষি নর্মদাতটে তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তাঁরা সকলেই মাতৃপিতৃভক্ত ছিলেন। আর যাঁরা নর্মদা তটে উগ্রতম তপস্যা করেও সিদ্ধিলাভ করতে পারেন নি, আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি, তাঁদের মা বাবার প্রতি কোন টান ছিল না। একথা ধ্রুব সত্য বলে জানবে যে বাবা স্বয়ং শিব, মা স্বয়ং উমা। মা বাবা উভয়ে মিলে অর্ধনারীশ্বর। শিবশিবানী যেমন একত্রে অর্ধনারীশ্বর, শিবানীকে মানলে যেমন শিবকেও মানা হয়, তেমনি মাকে মানলে বাবাকে এবং বাবাকে মানলে মাকেও শ্রদ্ধা ভালবাসা জানানো হয়।

বাবা এই নরলোকে প্রত্যক্ষ জীবন্ত ঈশ্বর আর মা হলেন নরদেহে প্রকটিতা জীবন্ত ঈশ্বরী। মা বা বাবা তাঁদের নাম নিলে, তাঁদের নাম ও মূর্তি চিন্তা করতে করতে পুত্রের যে কোন কারণে চোখে জল ঝরলে সদা ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির টনক নড়ে, উমা এবং শিবকন্যা-মা নর্মদারও আসন টলে – একথা সত্য সত্য সত্য।

এই বলেই মহাপুরুষ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন – চল চল, এখান থেকে আর ঘণ্টা দেড়েক হাঁটলেই আমি তোমাদেরকে ডেহরী গ্রামে ডেহরী নদীর সঙ্গমে পৌঁছে দিতে পারব। সেখানে জঙ্গলের মধ্যে এক তপস্বী পরিত্যক্ত একটা প্রাচীন পাথরের শিবমন্দির আছে। সেখানেই তোমরা ২/৪ দিন বিশ্রাম করবে। তিনি যথারীতি আমাদের আগে আগে চলতে লাগলেন টলতে টলতে। কখনও হাসছেন, কখনও বা বিড়বিড় করছেন। যে ঝরণাটা ডেহরী পাহাড় থেকে বয়ে আসছিল, আমরা অত্যন্ত সাবধানে পা টিপে টিপে লাঠি ঠুকে ঠুকে পেরোতে লাগলাম। ঝরণা পেরিয়ে আরও প্রায় ১০০ ফুট চড়াই ভেঙ্গে দেখতে পেলাম কলকল শব্দে একটা জলধারা তীব্রবেগে বয়ে চলেছে, নীচে নর্মদার দিকে। মহাত্মা সোমানন্দজী বললেন – এটাকে ঝরণা ভাবিস না, এইটাই প্রকৃতপক্ষে ডেহরী নদী, ডেহরী গ্রামের কাছে গিয়ে বড়জোর এই ৪০ ফুট জলধারাই প্রচণ্ড আকার ধারণ করে মা নর্মদার সঙ্গে মিলিতা হয়েছে। তোরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক এই জায়গায়। আমি দু দুজনের দু হাতের দুই লাঠি ধরে ধরে পার করে দিচ্ছি। জলে পা ডুবিয়েই দেখলাম ভীষণ তোড়। পা রাখাই কঠিন। মহাপুরুষ আমাদের লম্বা করে বাড়ানো লাঠির ডগা ধরে এক সঙ্গে দুজন দুজন করে সাধুকে পার করে আনলেন নদীর এপারে। তারপর উৎরাইএর পথে নামতে লাগলাম সকলে একসঙ্গে। নামছি ত নামছি, নদীর ধারাও প্রশস্ততর হচ্ছে। মহাত্মা সোমানন্দজী বলতে লাগলেন – বনের মধ্যে যেখানেই এ সব দেশে নদী বয়ে যায়, সেখানে তার গতিপথে নানা সুন্দর সুন্দর দৃশ্য সৃষ্টি করেই অগ্রসর হয় নদী। পাথরের বড় বড় চাঁই, গাছপালা, শাল, সেগুন, ভূর্জ, বেড়ী, অর্জুন, পিয়াশাল, জলধারার মর্মর কলতান, গাছে গাছে ময়ূরের কেকা রব, ধনেশ পাখীর গাছের এক ডাল হতে অন্য ডালে লাফানো এইসব মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে যাচ্ছি। একটা বাঘের ভীষণ গর্জন বহুদূর থেকে ভেসে এল। অন্য সময়ে হলে বাঘের ডাকে আমাদের হৃদ্কম্প সুরু হত কিন্তু আজ সকালেই মহাত্মার যে হিংস্র পশু দমনের যোগবিভূতি সবাই দেখে

এসেছেন, তিনি স্বয়ং সঙ্গে রয়েছেন বলে কারও মনে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে বলে মনে হল না। আমরা উৎরাই-এর পথে আরও নিম্নস্থানে নেমে যেতেই দেখতে পেলাম ডেহরী নদী হুড় হুড় শব্দে বড় বড় boulder টেনে এনে নর্মদাতে এসে মিলিতা হয়েছে। মহাত্মা বললেন – এই হল ডেহরী সঙ্গম। এখানে নর্মদার জল অত্যন্ত গভীর। নর্মদাগর্ভ গভীর নিম্নতম খাদ সৃষ্টি করেছে। নর্মদা ও ডেহরীর এই বিপুল ঘূর্ণাবর্ত সঙ্কুল স্থান থেকে একটু দূরে দৃষ্টি দিয়ে দেখ, নদীর মাঝখানে দিয়ে যে চট্টান দেখা যাচ্ছে তা যেন মাকড় পাথর (labrite) দিয়ে বাঁধানো। কত হাজার বছর ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে এই প্রচণ্ড জলধারার ধাক্কা ক্রমাগত তলাকার পাথরকে ক্ষয়িয়ে ক্ষয়িয়ে উপর দিকে ঠেলে তুলেছে তার হিসাব কারও জানা নাই। তোমারা এখানেই জলের ধারে হাঁটু পর্যন্ত নেমে কমণ্ডলু ডুবিয়ে জল তুলে তা মাথায় ঢেলে স্নান করে নাও। আমি বসে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করে নিই। এইবলে তিনি একটা পাথরের উপর বসে মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন। তাঁর নির্দেশ মত স্নান করে তর্পণাদি সারলাম। রঞ্জনের ঘড়িতে তখন সওয়া একটা। তিনি আমাদেরকে কিঞ্চিৎ পাহাড়ের উপর উঠে একটা মন্দিরে এনে তুললেন। এককালে এটি বড় শিবমন্দির ছিল। কত প্রাচীন কালে যে এখানে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা কারও জানা নাই। মন্দিরের চূড়া এবং অর্ধাংশ ভেঙ্গে পড়ে গেছে। যে অংশটুকু দাঁড়িয়ে আছে তাতে দুখানা ঘর এখনও অটুট। টুকরো টুকরো পাথরের কুচি পরিস্কার করে নিলে অল্প পরিশ্রমেই ঘর দুটো বাসোপযোগী হয়ে উঠবে। ঘরের মধ্য দিয়ে ঘর, একটা মাত্র দরজা। দরজাটা এখনও যথেষ্ট মজবুত। মন্দিরের চারদিকে চারটা আমগাছ দাঁড়িয়ে আছে। চারটা গাছকেই দু রকমের লতাগাছ এমন পর্যায় ক্রমে ঢেকে রেখেছে যে মূল গাছের পাতাই দেখা যাচ্ছে না। মহাত্মা বললেন – এই দেখ কর্মপ্রিটাম, এই দেখ ডিকেনড্রাম লতার গাছ। তোমরা ঘর দুটো পরিস্কার করে বিছানাপত্র পেতে নাও, বস তোমরা, আমি এখনই আসছি। এই বলে তিনি বনের মধ্যে কোথায় ঢুকে গেলেন। ক্ষুধায় তখন আমাদের পেটে আগুন জ্বলছে যেন। হরানন্দজী বললেন – আমরা ছাতু ভিজিয়ে খেয়ে নিলেই ত হয়।

– খেতে ইচ্ছা হয়, আপনারা খান, খাবার সময় ত নিশ্চয়ই হয়েছে। তবে আমি খাব না। আমি তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে থাকি, তিনি বসতে বলে গেছেন, আমি বসেই থাকব।

আমার কথা শুনে হরানন্দজী বললেন – তাই ভাল। তাঁর জন্য অপেক্ষা করা যাক্। বসে বসে ততক্ষণ পায়ে হাতে কুষ্ঠরোগীর মত যে ব্যাণ্ডেজগুলো বাঁধা আছে তা জলে ভিজে ফুলে উঠেছে, এইগুলোই খুলে ফেলা যাক্। সবাই মিলে আমরা যে যার ব্যাণ্ডেজগুলো খুলে বনের দিকে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলাম। নেকড়া চট ছেঁড়া যা কিছু বেঁধে ছিলাম, তা খুলতেই দেখলাম, প্রত্যেকেরই হাতে পায়ে ঘা হয়ে গেছে। যথার্থ কুষ্ঠ রোগীদের মত দশা!

ঠিক ঐ সময় মহাপুরুষ ফিরে এলেন; তাঁর হাতে কতকগুলো লতাপাতার বাণ্ডিল। এসেই বললেন – প্রত্যেকেই পাঁচটা করে এই গাছের পাতা চিবিয়ে খাও, তারপর পাশের ঘরে গিয়ে দেখ, তোমাদের জন্য মা নর্মদা খাবার রেখে গেছেন।

তাঁর নির্দেশমত পাতাগুলো চিবিয়ে খেয়ে পাশের ঘরের গিয়ে দেখি, শালপাতাতে গরম গরম পুরী এবং গুড় অন্য একটি শালপাতা দিয়ে ঢাকা দেওয়া আছে। ঠিক গুণে গুণে আমাদের সতের জনের জন্য সতেরটি পাতা। বিস্ময়ে আমাদের বাক্যস্ফূর্তি হল না। ক্ষুধার চোটে আমরা মনের আনন্দে খেয়ে ফেললাম। খেয়ে উঠেই আমরা নর্মদার ঘাটে নেমে হাত মুখ ধুয়ে এলাম। এঁটো পাতাগুলো খাবার পরেই বনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। এসে দেখি, তিনি একই ভাবে মাথা দোলাতে দোলাতে বলে চলেছেন – রাঁধুনী নেই তো রাঁধলে কে, রান্না নেই তো খেলেন কি। যে রাঁধলে সেই খেলে, এই তো দুনিয়ার ভেল্কি রে ভাই, এই তো দুনিয়ার ভেল্কি!

চক্ষু মুদিলে সকলই দেখি, দেখি স্বরূপের বাজার ; চক্ষু মেলিলে যা দেখি সবই ধোঁকা। দিনে সৃষ্টি রাতে লয়, নিরন্তর ইহাই হয়!

আমরা তাঁকে ঘিরে নির্বাক হয়ে বসে আছি। তিনি আপন মনে বলে চলেছেন – সাবাস্ বেটা শৈলেন্দ্রনারায়ণ ! এখানে পৌঁছে ঘাটে নেমে একমাত্র তোকেই দেখলাম পিতৃতর্পণ করলি, আর সব সাধুকে দেখলাম অঞ্জলি ভরে সূর্যার্ঘ্য দিতে। বাবা মার তর্পণ, পিতৃপুরুষের তর্পণ, সূর্যার্ঘ্য এমন কি কোন জ্যোতির্লিঙ্গের মাথায় জল ঢালারও বাড়া। এই জিনিষ কখনও ভুলিস্ না বাপ্।

দু তিন মিনিট চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগলেন – এ শরীরটা যে বাঙালী শরীর তা তো তোমরা বুঝতে পারছ। বড় লোকের ঘরে এই শরীরটা জন্মেছিল। যখন ৯ বৎসর বয়স তখন বাবাকে হারাই। তার দু বৎসর পরেই হারালাম মা জননীকে। আমাদের বাড়ীতে থাকতেন ক্ষান্ত পিসী। তিনিই আমার দেখাশোনা করতেন। আমার এক জ্ঞাতিকাকা ১৩ বৎসর বয়সে আমার উপনয়ন দিয়ে দিলেন। মাথার উপর মা বাবা না থাকলে যা হয় আমারও সেই দশা হল। বদসঙ্গে মিশে লেখাপড়া হল না। সারাদিন খেলাধুলো করেই আমার সময় কাটত। পরের বাগানের ফল চুরি, ফুল চুরি, ফুলকফি চুরি – এইসব নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম। বেপাড়ার ছেলেদেরকে ধরে মারপিট করতাম। ক্ষান্ত পিসী আমাকে অনেক বুঝাতেন। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমাকে একটা ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু সেখানেও আমার উৎপাতে সকলেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। একদিন ত একজন মাষ্টার মশাই-এর হাতে কামড়ে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে এলাম স্কুল থেকে। সেই বছরই মহালয়ার দিনে ক্ষান্ত পিসী নৈহাটির ঘাটে গঙ্গা নাইতে গেলেন, পাছে তাঁর অনুপস্থিতিতে কোথাও কিছু অনর্থ ঘটিয়ে ফেলি, তাই আমাকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন। ঘাটে তখন বহুলোকের ভীড়। কয়েকজন ব্রাহ্মণ টিকি নেড়ে হাতের আঙ্গুলে পৈতা জড়িয়ে পিতৃ পুরুষদের নাম ধরে ধরে তর্পণ করছিলেন। তাঁদের দেখাদেখি আমিও তাঁদের মতই বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করতে করতে নদীর পাড়ে অঞ্জলি ভরে জল ছেঁচতে লাগলাম। তাই দেখে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন – এ তুমি কি করছ ? হাসতে হাসতে উত্তর দিলাম – শাকের ক্ষেতে জল দিচ্ছি। এখানে শাকের ক্ষেত কোথায় ?

ব্রাহ্মণের প্রশ্ন শুনে চটপট উত্তর দিলাম – আপনারা যে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে তর্পণ করছেন, তাঁরা এখানে কোথায় ? যদি নদীর জল নদীতে নিক্ষেপ করলে পিতৃপুরুষরা প্রাপ্ত হন, তবে নদীর পাড়ে জল সেচন করলে আমার শাকের ক্ষেতে তা পৌঁছাবে না কেন ?

আমার বাচালতায় সেই ব্রাহ্মণকে কুপিত হতে দেখলাম না। তিনি এক কোমর জলে নেমে এসে আমার চিবুক ধরে আদর করতে করতে বললেন – বাবা! লক্ষ্মীটি! আমার কথা শোন, তুই অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে চোখ বন্ধ করে মা বাবার মূর্তি চিন্তা কর ত দেখি! তোর মা বাবা তোকে কত ভালবাসতেন, কত আদর যত্ন করতেন, সেই কথা ভাবতে ভাবতেই জল দে, কোন মন্ত্র তন্ত্র নয়, তাঁদের মুখ চোখ চিন্তা করতে করতে এক বিন্দু চোখের জল ফেল্‌ত সোনা!

ব্রাহ্মণের কথায় কি যাদু ছিল জানি না, মা বাবার কথা ভাবতেই আমার চোখ জলে ভরে গেল, দেখলাম, চোখ থেকে যেন একটা পাতলা পর্দা সরে যাচ্ছে, দেখলাম মা বাবা জ্যোতির্ময় মূর্তিতে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। মা বলছেন – তুই কাশী চলে যা। সেখানে তোর জন্য তোর গুরু অপেক্ষা করছেন, তাঁর সঙ্গেই চলে যাবি নর্মদায়। সেইখানে গিয়ে তোর সব হবে, সব পাবি!

আমি জ্ঞান হারিয়ে নদীতেই উলটে পড়েছিলাম; সেই ব্রাহ্মণই আমাকে আর একজন ব্রাহ্মণের সহায়তায় নদী পাড়ে এনে শুইয়ে দেন। ক্ষান্ত পিসীর কান্নায় বিচলিত হয়ে ৪

জন লোক আমাকে কাঁধে করে এনে বাড়ীতে শুইয়ে দেন। জ্ঞান হলেই প্রায় দুদিন ধরে আমি মা - মাগো! বাবা - বাবগো! বলে চীৎকার করে কাঁদতাম। ঘুমন্ত অবস্থাতেও ক্ষান্ত পিসীর কাছে আমি শুনেছি মা বাবাকে স্মরণ করে ঘুমের মধ্যেই আর্তনাদ করে উঠতাম। এইভাবে প্রায় দশদিন কাটার পর আমি কাশী যাবার বায়না ধরি। ক্ষান্ত পিসী বাধ্য হয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে কাশীতে পৌছে যান। পৌছেই ট্রেন থেকে নামতেই দেখা হয়ে গেল সেই নৈহাটি ঘাটের ব্রাহ্মণের সঙ্গে, যিনি আমাকে গঙ্গার ঘাটে তর্পণ করাতে গিয়ে আমার চোখ খুলে দিয়েছিলেন, চিনিয়ে দিয়ে ছিলেন মা বাবা কী জিনিষ! কাশীতে ৮ বৎসর ছিলাম, কাশীতে দু বৎসর পরেই ক্ষান্ত পিসীর দেহান্ত ঘটে। সেই ব্রাহ্মণই আমাকে ব্যাকরণ ও বেদ পড়িয়ে আনেন নর্মদাতটে। সেই থেকে আমি নর্মদাতট ছেড়ে কোথাও যাই নি। তা দেখতে দেখতে সেও বোধহয় ২০০ বৎসর কেটে গেল। এখনও মা বাবার কথাই চিন্তা করি। মাকে ধ্যান করলেই দেখি, মা নর্মদা, পার্বতী, স্বয়ং ভোলানাথ আমার পিছনে পিছনে ঘুরছেন!

তাঁর কথায় টান দেখে মনে হচ্ছিল, আরও হয়ত তিনি কিছু বলতেন কিন্তু হিরন্ময়ানন্দজী স্যোৎসাহে তাঁর কথায় বাধা দিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন – তা আপনি যতই বলুন, মাকে জীবন্ত ঈশ্বরী এবং বাবাকে জীবন্ত ঈশ্বর কিছুতেই বলা যায় না। প্রত্যেকের মা বাবাকে দেখা গেছে তাঁরা ষড় রিপুর দাস, তাঁদেরকে কামার্ত হতে, ক্রুদ্ধ হতে, লুব্ধ হতে, গর্বিত হতে, অনেক নীচ কাজ করতে এবং মোহান্ধ হতে, প্রায়শঃই দেখা যায়। কামাবেগে মিলিত হয়ে তাঁরা পুত্র কন্যার জন্ম দেন। তাঁদের রজঃবীর্যের সংযোগে জাগতিক স্বাভাবিক নিয়মে মানুষের দেহের উৎপত্তি ঘটে। সন্তানের প্রতি যে মা বাবার স্নেহ সেও ত মোহের নামান্তর। সন্তান বুড়ো বয়সে দেখবে, ভরণপোষণ করবে, রোগনারাতে চিকিৎসা করাবে – এই স্বার্থচিন্তাতেই মা বাবা সন্তানকে ভালবাসেন। তাঁদেরকে স্বয়ং ঈশ্বর ঈশ্বরী ভাবা যায় না।

আগুনে যেন ঘৃতাহুতি দেওয়া হল! তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উগ্রমূর্তি ধারণ করলেন। চীৎকার করে বলতে লাগলেন – তোর মত পাষণ্ডের মুখদর্শনেও পাপ হয়। কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগলেন – যম বেটা তুই কোথায় গেলি! আয়, আয়, খেয়ে আয়, বুঝেছি তোর আঁৎ খালি। তুই আবার কিছু খেতে চাচ্ছিস্। জগতে যেখানে যত মাতৃপিতৃদ্রোহী আছে, তারাই সতত তোর যোগ্য খাদ্য।

হরানন্দজী এবং প্রেমানন্দ জোর করে হিরন্ময়ানন্দজীকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরের ঢুকিয়ে দিয়ে এলেন। আমি এবং আর সকলেই নতজানু হয়ে তাঁকে বলতে লাগলাম – আপনি দয়া করে শান্ত হোন্। আপনার কাছ থেকে বুড়োকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছি, আপনাকে আর মুখ দর্শন করতে হবে না। আমাদের কাতর প্রার্থনায় সঙ্গে সঙ্গে জল হয়ে গেলেন। একগাল হেসে বললেন – বয়স হলেও বুড়োটা সেই ছোটবেলায় আমি যেমন গণ্ড মূর্খ আর দুষ্টু ছিলাম, সেই রকম দুষ্টু আর কি! এই বলে সদানন্দ ভোলানাথ হো হো করে হাসতে হাসতে বলে উঠলেন – ভাগরে ভাগ ফকরী কা বালকা দেমাক ঔর দামিনী দুই বাঘ লাগে। মারলেগী পড়া চীচায়েগা। ভয়া বেকুফ তু নহী ভাগে। বাঁচে ন কোঈ যৌ লাখ ত্যাগে। পল্টুদাস কহে এক উপায় হৈ। বৈঠ সৎসঙ্গমেঁ নিত্য জাগে। অর্থাৎ পালা রে পালা ফকিরের চেলা। দেমাক আর দামিনী, অহং বুদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠা বুদ্ধি এই দুই বাঘ আর বাঘিনীর তোর উপর নজর পড়েছে। তোকে বধ করে ছাড়বে, পথের মধ্যে তুই চীৎকার করে মারা পড়বি। তুই নিতান্ত নির্বোধ তাই এখনও পালিয়ে বাঁচতে চাচ্ছিস্ না। অহংকার আর প্রতিষ্ঠা বুদ্ধি ছাড়তে পারছিস্ না। লক্ষ দ্রব্য দিলেও ওদের গ্রাস থেকে কেউ বাঁচে না। পল্টুদাস বলছে, সাধু সংসর্গে বসে সর্তক থাকাই এর একমাত্র প্রতিষেধক।

শোন বাপুরা, তোমরা এখন যেখানে এসে উঠেছ এটা হল ডহর মুনির আশ্রম। প্রায় হাজার বছর আগে এখানে ডহর মুনি নামে এক সাধু এসে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। ঊর্ধ্বপদ ও হেটমুণ্ড হয়ে সাধু উগ্রতম তপস্যা করায় তাঁর সেই কঠোর তপস্যার কথা কিংবদন্তির মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে; দিক্‌দিগন্তর হতে বহুলোক তাঁকে দেখতে আসত। হাজার হাজার লোক তাঁর এই রকম উগ্র তপস্যা দেখে তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করে, ক্রমে সেই সাধু এখানে এক শিব প্রতিষ্ঠা করে তাঁর নাম দেয় 'ডহরেশ্বর'। এক বিশাল মন্দির গড়ে ওঠে। সাধুর মনে কিন্তু শান্তি ছিল না, কারণ প্রকৃত সিদ্ধিলাভ তাঁর হয় নি। একদিন স্বপ্নে দেখলেন কেউ যেন তাঁর কাছে এসে বলছেন – তুই যৌবনে এক নিম্নজাতীয়া যুবতীকে ভালবেসেছিলি, বাপ মা ঐ বিবাহে বাধা দিয়েছিলেন। সেইজন্য ক্রোধোন্মত্ত হয়ে তাঁদের দুজনকেই তুই নিজ হস্তে কেটে ফেলেছিলি। সেই মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে আসার পথে এই নর্মদাতটেরই কোন জঙ্গলে বাঘের আক্রমণে সেই কামিনীর মৃত্যু ঘটে। তখন তোর মনে বৈরাগ্য দেখা দেয়; এখানে এসে তপস্যায় বসে গেছিস্। যতই তপস্যা কর মাতৃঘাতক পিতৃঘাতকের উপর ঈশ্বর কোন মতেই প্রসন্ন হন না, হবেন না। তুই বাঁচতে চাস্ ত এ স্থান ত্যাগ করে চলে যা। তা না হলে মা নর্মদার রোষে তোর জীবন সম্পত্তি এবং প্রতিষ্ঠা সবই লোপ পাবে। স্বপ্ন ত দেখলেন, কিন্তু এতদিনকার প্রতিষ্ঠা কি সহজে ত্যাগ করা যায়। তিনি এ স্থান ছেড়ে গেলেন না। পরের বৎসরই নর্মদার বন্যায় তাঁর শিব সহসা মন্দির থেকে অন্তর্হিত হলেন, মন্দির ধ্বসে পড়ল, মন্দির চাপা পড়ে তাঁরও মৃত্যু হল। ডহর শব্দের অর্থ গভীর নিম্নস্থান, বা নৌকার খোল। তোমরা কাল স্নান করার সময় একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে নর্মদার মধ্যস্থলে যেখানে পাথরের চড়া পড়েছে, সেখানে অনেক নৌকার খোল পড়ে আছে। হাজার হাজার নৌকা এখানে স্রোতের টানে ঘূর্ণাবর্তে উল্টে পড়ে বহু যাত্রীরও বিনাশ ঘটেছে। এ জন্য এই ভয়ংকর স্থানে নৌকা নিয়ে কেউ আসে না। মাতৃপিতৃদ্রোহীদের জীবনে কী দুর্দশা ঘটে, ডহর মুনির জীবনই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। মাতাপিতার প্রসন্ন আশীর্বাদ ছাড়া কোন তপস্যাই ফলপ্রসূ হয় না।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন – মাতৃপিতৃভক্তি সম্বন্ধে তুমি সৎসঙ্গ করো। মাথা মুড়িয়ে বৈরাগী হওয়ার মত এরা সবাই গেরুয়াধারী হয়েছে কিনা! মাতাপিতার সেবাপূজাকে জলাঞ্জলি দিয়ে ওঁ তৎসৎ, অহং ব্রহ্মস্মি, বা সোহহং প্রভৃতি যে কোন একটা মন্ত্র জপ করাকেই এরা জীবনের সার সর্বস্ব করে বসে আছেন ত! জন্মদাত্রী মা এবং জন্মদাতা পিতার স্মরণ মনন একদম ভুলে বসে আছেন! হা হতোস্মি!

মহাপুরুষের কথা শেষ হতেই আমি হাতজোড় করে বললাম – ডহরের অর্থ যেমন গভীর গহ্বর নিম্নস্থান হয়, তেমনই ডহরের আর একটি অর্থ পিশাচ। আমাদের বুড়ো স্বামীজী লোক খারাপ নন, হয়ত এই পিশাচের স্থানে সহসা এসে পড়ায় তাঁর মাথায় সাময়িক ভাবে পিশাচ ভর করেছিল, তাই তিনি মাতাপিতা সম্বন্ধে ঐ রকম মন্তব্য করেছিলেন। আপনি তাঁকে মার্জনা করুন।

সদানন্দ সাধু হো হো করে হাসতে হাসতে বলে উঠলেন – ও সব কথা এখন বাদ দে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে এখন আমি যাই। আজ ২৫শে মাঘ, বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি অর্থাৎ ২৯শে মাঘ পর্যন্ত এখান ছেড়ে যাস্ নি। এ কয়দিন এখানে বিশ্রাম করে ১লা ফাল্গুন রবিবার সকালে এখানে থেকে যাত্রা করবি। এখান থেকে আট মাইল গেলেই পেণ্ড্রায় পৌঁছে যাবি। পেণ্ড্রার বিপরীত দিকে নর্মদার উত্তরতটে হাপেশ্বর তীর্থ। পেণ্ড্রা থেকে পর পর দমখেড়া, ভুচ্‌গাঁও, বহাদল ঘাট, খাড়া চৌকি, হিরণফাল ইত্যাদি পেরিয়ে রাজঘাট পৌঁছাতে পারলে শূলপাণির ঝাড়ি শেষ হবে। তারপর আর কোন চিন্তা নাই। ভাল ভাল রাস্তা। পথে আরও অনেকগুলি পাহাড় পড়বে। সেই সব ঝাড়ি পথও বিপজ্জনক কিন্তু

এই ডেহরী পাহাড় বা ডেহরী সংগমের মত কোন স্থানই এত বিপজ্জনক এত ভয়ংকর জংলী পথ আর কোথাও নাই। যতদিন এখানে থাকবি, ততদিন তোদেরকে আমি চোখে চোখে রাখব। এই ডহরেশ্বর মন্দিরের চারদিকে হাজার ফুট এলাকার মধ্যে বাঘ ভালুক নেকড়ে হায়না সাপ প্রভৃতি কোন হিংস্র জন্তু আসবে না, এমন কি ভূত পিশাচও না। আজ তোদের ঘরে কাঠ নাই, আগুন জ্বালতে পারবি না। যাক্ আজকের মত তোদের ঘর গরম রাখব, কাল তোরা কাছাকাছি জায়গা থেকে নিজেরাই কাঠ সংগ্রহ করে নিবি। তোদের কাছে আটা এবং ছাতু আছে। চারদিন বেশ হেসে খেলে চলে যাবে। মোমবাতি বা দিয়াশালাই আছে ত ?

হরানন্দজী 'হাঁ' বলতেই বললেন – মোমবাতি জ্বালার আগে সুতোটা বাদ দিয়ে গোটা বাতিটা জলে একবার ভাল করে ডুবিয়ে নিবি। তাহলে অনেকক্ষণ ধরে ভালো আলো দিবে। তোমরা ঘরে ঢুকে মোমবাতি জ্বাল গিয়ে। তারপর স্বস্থানে প্রস্থান করব। মাভৈঃ।

তাঁর আদেশ মাত্রই তাঁকে প্রণাম করেই আমরা ঘরে ঢুকলাম। রঞ্জন টর্চ টিপতেই হরানন্দজী মোমবাতি জলে ডুবিয়ে জ্বাললেন। ঘর আলো হয়ে উঠল। আমরা তিন চারজন বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, রঞ্জন টর্চ টিপে এদিক ওদিক ঘোরাতে লাগলেন – তাঁকে কোথাও দেখতে পেলাম না, তিনি চলে গেছেন। আমরা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। দরজায় কোন খিল নাই, এই প্রাচীন জীর্ণ বাড়ীতে তা আশা করাও অনুচিত। সকল সাধুই দেখছি, এ নিয়ে খুঁতখুঁত করতে লাগলেন। তাঁদের মনোভাব দেখে আমি বললাম – মহাপুরুষ মাভৈঃ বাণী শুনিয়ে গেছেন, তাঁর উপর আমার বিশ্বাস আছে। ভিতরে ঘর থেকে আমার আসন বিছানা টেনে এনে দরজার পাশে শুচ্ছি।

হিরন্ময়ানন্দজী ব্যঙ্গ করে বললেন – মহাপুরুষের উপর বিশ্বাস ছাড়াও তোমার পিতাই যখন জীবন্ত ঈশ্বর এবং সেই বিশ্বাস যখন তোমার এত দৃঢ়, তখন তোমারই ত দরজার কাছে শোওয়া উচিত ! আমরা যে সব দেবতাকে মানি, তাঁদের ত অত শক্তি নাই যে এই মহা জঙ্গলের মধ্যে ভাঙা বাড়ীতে ঢুকে আমাদেরকে হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন ! তাঁরা রক্ষা করতে পারলেও আমার অতখানি নির্ভরতা নাই !

হরানন্দজীকে পরিচয়ের পর হতেই দেখছি, তিনি হিরন্ময়ানন্দজীকে বরাবরই বিশেষ দেখতে পারেন না, এখন তিনি আমাকে বিদ্রূপ করায় ক্ষেপে উঠলেন। স্বামীজীকে মুখে কিছু না বলে রাগে গরগর করতে করতে হরানন্দজী তাঁর বিছানাপত্র টেনে নিয়ে গিয়ে পরের ঘরটাতে তা বিছিয়ে দিয়ে হাত ধরে তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়ে বসালেন। আমার বিছানার পাশে বিছানা পাতলেন হরানন্দজী স্বয়ং এবং রঞ্জন। দণ্ডীদের দলে উমানন্দ নামক সন্ন্যাসীটির সঙ্গে হিরন্ময়ানন্দজীর বেশী ভাব। তিনি নিজের আসনে বসে উমানন্দকে বলতে লাগলেন – বুঝলে উমানন্দ ! যে সাধুর সঙ্গে আজ আমরা এখানে এলাম, লোকটাকে আমার পিশাচসিদ্ধ বলে মনে হয়। পিশাচসিদ্ধ না হলে একটু আগে যে ঘর পরিষ্কার করে খালি দেখে গেলাম, একটু পরেই সেখানে গরম গরম পুরী আসে কোত্থকে ? একমাত্র পিশাচসিদ্ধরাই পারে খালি হাতে বাঘ ভালুককে জব্দ করতে ? হরানন্দজী নিজের বিছানাতে বসেই গর্জে উঠলেন – 'অকৃতজ্ঞ বেইমান ! তাহলে মহাত্মা নাঙ্গা বাবা যে ভগবান শূলপাণীশ্বর মন্দিরে আসার পথে মোক্ষড়ী গঙ্গার উদ্ভব যে পাহাড়ে, সেই পাহাড় অতিক্রম কালে জঙ্গলের মধ্যে অজগর সাপটাকে কাবু করলেন কিংবা মোক্ষড়ী গঙ্গার ধারে রাত্রি কাটানোর সময় নেকড়ে বাঘ এবং হায়নার দলকে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করে তাদেরকে তাড়িয়ে দিলেন, সেও কি পিশাচ সিদ্ধির ফলে ? মহাত্মা নাঙ্গা বাবাও কি তাহলে পিশাচ সিদ্ধ ছিলেন বলে বলতে চান ? আপনি চুপ করুন আমাদেরকে শান্ত মনে সান্ধ্যক্রিয়া করতে দিন।'

হরানন্দজীর ধমকে স্বামীজী চুপ করে গেলেন। আমরা জপে বসলাম। রাত্রি ১০টা নাগাদ আমাদের সান্ধ্যক্রিয়া শেষ হল। যে যার কমণ্ডলু হতে জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম। হিরন্ময়ানন্দজী রঞ্জনকে ডেকে বললেন – মোমবাতিটা জ্বলতে থাকুক নিভিও না।

মহাত্মা সোমানন্দজীর কথা চিন্তা করতে করতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভাঙল, তখন সকাল ৭টা বেজে গেছে। দরজাটা খুলে দেখলাম, তখনও চারিদিক কুয়াশায় ঢেকে আছে। শিশির পড়ছে, নর্মদার দিকে তাকিয়ে দেখি উত্তরতট থেকে নর্মদার মধ্যস্থল পর্যন্ত সাদা বাষ্পে ভরা। নর্মদার এদিককার যে অর্ধাংশ কিঞ্চিৎ দেখা যাচ্ছে, তাও ধোঁয়ায় ভরা। যেন গরমজলে ভাপ উঠছে। হিরন্ময়ানন্দজীকে উমানন্দ বলছেন শুনতে পেলাম – আশ্চর্য ! সেই পাগলা সাধুটা যে বলে গেছলেন, আজ রাত্রে শীত বেশী লাগবে না, বাস্তবে তাই ত ঘটল। মাঝরাতে কম্বলটা কেবল আলতো করে গায়ে দিয়ে রেখে ছিলাম, গতরাত্রে কনকনে ঠাণ্ডা যাকে বলে তাতো অনুভব করতেই পারি নি। আরও আশ্চর্য, গায়ে কোন ব্যথা বেদনা আছে বলে মালুমই হচ্ছে না। হাতে মুখে যে সব ঘা হয়েছিল, তাও শুকিয়ে গেছে দেখছি! স্বামীজী ! আপনার গা হাতের দরদ কমেছে কি ?

– নর্মদা তটে মিথ্যা কথা বলব না। কাল রাত্রে শীতে কোন কষ্ট পাই নি। সর্বাঙ্গে ব্যথা বেদনাও অনুভব করছি না। কিন্তু তাই বলে এতে সেই পাগলটাকে ধন্য ধন্য করবার কিছু দেখছি না। পিশাচসিদ্ধরা এ সব করতে পারে। তা ছাড়া এটা হচ্ছে দ্রব্যগুণ। মনে নাই সে আমাদের ৫টা করে কোন লতাগাছের পাতা চিবোতে দিয়েছিল, সেই পাতার গুণে শরীর গ্লানিমুক্ত হয়েছে। গাঁয়ে ঘরে বেদেরা এবং বুড়ো হাকিমরাও এই রকম অনেক জড়িবুটি জানে যার অত্যাশ্চর্য গুণ দেখে তাজ্জব হতে হয়। এর মধ্যে কোন যোগ সিদ্ধি অনুসন্ধান করা বেকুবি। আমরা পরবর্তী ঘরে বসে বসে সবই শুনলাম। কেউ কিছু মন্তব্য করলাম না। ক্রমে চারদিক ফাঁকা হয়ে এল, উত্তরতটের শৈলশ্রেণীতে প্রভাত সূর্যের রশ্মি দেখতে পেয়ে বুঝলাম, সূর্যোদয় হয়ে গেছে। প্রাতঃকৃত্য সেরে এসেই হিরন্ময়ানন্দজী উমানন্দ রমানন্দ নামক দুজন দণ্ডী এবং প্রকাশ ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে কুড়ুল নিয়ে গাছ কাটবার বন্দোবস্ত করতে গেলেন। রান্না করার জন্য এবং রাতে আগুন জ্বালবার জন্য অনেক কাঠ আমাদের দরকার। মন্দিরে পিছনে দিকে কাঠ কাটার শব্দ পেলুম। ৩ জন কাঠ কাটছেন আর হিরন্ময়ানন্দজী তদারকি করছেন, তিনিই দলের নেতা ত! শুনতে পেলাম – তিনি বলছেন গাছের শুকনো ডাল দেখলেই তা কেটে নাও। লিট্টি পাকাতে এবং রাত্রে অগ্নিকুণ্ড করতে সুবিধা হবে। আর শোন, কাঠ কেটে বয়ে নিয়ে গেলেই তোমাদের ছুটি। হরানন্দজী প্রেমানন্দের উপর ভার দিব লিট্টি পাকাতে। খবরদার ! তারা রান্নার কাজে হাত লাগাতে বললেও তা করবে না। প্রেমানন্দ হরানন্দজীকে বললেন – লোকটা পাগল হয়ে গেলেন নাকি ? আগে ত এই রকম ছিলেন না। ঈর্ষা, ঈর্ষা ! ঈর্ষা ! ছাড়া আর কিছু নয়। গুরুদেব তাঁকে আমাদের দলের নেতা করে পাঠিয়েছেন, আমরা তাঁকে তাঁর প্রত্যাশা মত মানছি না ! তার উপর আমাদের চোখের সামনে তাঁকে মহাত্মা সোমানন্দজী যে ভাবে 'পাষণ্ড' ইত্যাদি বলে ধমকালেন, তাতে তাঁর আত্মাভিমানে ভীষণ ভাবে লেগেছে !

একটু পরেই তাঁরা বোঝা বোঝা কাঠ নিয়ে এসে ঘরের সামনে প্রাঙ্গণে ফেললেন। হরানন্দজী এবং প্রেমানন্দ দুজনের দিকে তাকিয়ে হিরন্ময়ানন্দজী বললেন – তোমাদের উপর ভার দিলাম লিট্টি বা রুটি তৈরী করার।

'যো হুকুম স্বামীজী ! থুড়ি নেতাজী ! শুধু আজ নয়, যে কয়দিন এখানে থাকব, সব দিনই রুটি পাকানোর ভার আমরা নিলাম। কিন্তু একটা কথা ভাবছি, ঠাকুর বাড়ীর কাঁদালেই কাঠ কাটলেন কেন। এর মধ্যে ত অনেক কাঠই কাঁচা, আগুন দিলে ধোঁয়ায়

ভরে যাবে ঘর দুটো। আপনার শ্রী অঙ্গের চক্ষুরত্ন দুটি ধোঁয়াতে জ্বলতে থাকবে, জলে ভরে যাবে চোখ দুটি! হাজার খানিক ফুট দূরেই ত অনেক গাছে শুকনো ডালা দেখতে পাচ্ছি, কৃপা করে ঐখান থেকে ত কাঠ কেটে আনতে পারতেন!'

– 'কেয়া আপ্ শোচতে হো উস্ পিশাচসিদ্ধ বুঢ়াকো বাত মেঁ হমলোগ উধার যানে নেহি সকতা ? এই বলেই হিরন্ময়ানন্দজী দুম্ দুম্ শব্দে পা ফেলে সেদিকে যেতে লাগলেন। মিনিট খানিক পরেই আর্তনাদ শুনে আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। 'ভাল্লু হৈ, ভাল্লু এই বলে তিনি থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে দৌড়ে আসছেন! আমরা দেখলাম একটা বেড়ী গাছ হতে মিশ্‌মিশে কালো একটা লোমশ ভালুক আসছে থপ্ থপ্ করে নেমে মুখব্যাদন করতে করতে। তার মুখের ভিতরটা লাল। জিহ্বাও লাল। বেশ কতকটা এগিয়ে এসে একটা আমলকী গাছের গোড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর দৌড়ে পালাল উত্তর দিকের আরও ঘন অরণ্যের মধ্যে। এদিকে পড়ে গিয়ে হিরন্ময়ানন্দজী মূর্চ্ছা গিয়েছেন। আমরা সকলে ছুটে গিয়ে তাঁকে তুলে এনে ঘরের মধ্যে শুইয়ে দিলাম, চোখে মুখে জলের ছিটা দিলাম। আধঘণ্টা পরে তিনি চোখ খুলে তাকালেন, তার মানে তাঁর হুঁস এল।

বেলা প্রায় ১০টা বেজেছে। উমানন্দ রমানন্দ প্রকাশ ব্রহ্মচারী ছাড়াও আরও জনা পাঁচেক সন্ন্যাসীকে তাঁর কাছে বসিয়ে রেখে বাকী সবাই স্নান করতে নামলাম নর্মদায়। নর্মদায় হাঁটু পরিমাণ জলে নেমে কমণ্ডলু ভরে মাথায় জল ঢালতে লাগলাম। গতকাল মাকড়া পাথরের যে চড়া দেখেছিলাম, আজও সেটা দেখলাম, অধিকন্তু দেখলাম, স্রোতের টানে কতকগুলো নৌকার খোল কয়েকটা উপুড় হয়ে কতকগুলো বা সোজা হয়ে জলে ডুবে আছে। তিন চতুর্থাংশ জলে, এক চতুর্থাংশ জলের উপর মাথা উঁচু করে মনে হচ্ছে যেন দাঁড়িয়ে আছে। প্রেমানন্দ বললেন – দূরে পূর্বদিকে তাকিয়ে দেখুন বেশ কতকটা দূরে কালো কালো কতকগুলো কুমীর বা বড় বড় হাঙর জলে ডুবছে, উঠছে। আমি বললাম – না, ঐগুলো নৌকার খোল বলেই মনে হচ্ছে। প্রচণ্ড জলের ঘূর্ণিতে ঐগুলো ঐভাবে জলে ডুবছে উঠছে। গায়ে জল ঢালতেই আমরা শীতে কাঁপতে লাগলাম। তর্পণাদি সেরে আমরা সবাই উঠে এলাম উপরে। যে যার ভিজা কাপড় চোপড় নিংড়ে শুকোতে দিলাম রোদে। ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখি, হিরন্ময়ানন্দজী উঠে বসেছেন! তিনি খুব গম্ভীর। উমানন্দের কাছে শুনলাম, ঝোলা হতে বের করে তাঁর আর্ণিকা সেবন হয়ে গেছে। হরানন্দজী ও প্রেমানন্দ কাঠের আগুন জ্বেলে ঘরের বাইরে যে দালানের ভগ্নাংশ পড়ে আছে, সেইখানে লিট্টি পাকানোর আয়োজন করতে লাগলেন। বাকী সবাই জপ করতে বসে গেলেন, আমি পাঠ করতে লাগলাম মহর্ষি তণ্ডিকৃত মহাস্তব। আগুনে ফুঁ দিতে দিতে হরানন্দজী চেঁচিয়ে বললেন – একটু জোরে জোরে পড়বেন মশাই, আমরাও যেন শুনতে পাই। হিরন্ময়ানন্দজী বাকী সকলকে সঙ্গে নিয়ে স্নান করতে চলে গেছেন। শ্রীতণ্ডিকৃত মহাদেবের ১০০৮ নামাবলী পাঠ যখন শেষ হল, তখন বেলা দেড়টা বেজেছে। পাঠ শেষে দেখলাম ইতিমধ্যেই হিরন্ময়ানন্দজীর দল স্নান করে ফিরে এসে জপাদি ক্রিয়া সবে মাত্র শেষ করে উঠেছেন। যে যার পূজার আসন গুটাচ্ছেন। লিট্টি পাকানো শেষ হয়েছে। শালপাতা ছিঁড়ে এনে আমরা সকলেই ভোজন করতে বসলাম। ভোজনান্তে বাইরে গিয়ে এক একটা পাথরে বসে রোদ পোয়াতে লাগলাম। বনের মধ্যে ধনেশ পাখী ডাকছে। লম্বা ঠোঁট এবং বড় বেশী লম্বা লেজ এই ধনেশ পাখীর। উত্তরতট পরিক্রমার সময় জঙ্গলে এই পাখী আমি অনেক দেখেছি। প্রথম যখন সুমেরদাসজীর সঙ্গে আমি অমরকন্টকের জঙ্গলে ঢুকি, তখনও এই ধনেশ পাখী দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এখানেও দেখছি সেই ধনেশ পাখী। কক্‌কক্ শব্দ করে একটা বিচিত্র বর্ণের বন মোরগ পালিয়ে গেল। হরানন্দজী ভিতরের ঘরে উঠে গিয়ে খাবার পর ৫-৬টা লিট্টি বেশী হয়েছিল, সেগুলো নিয়ে

এসে ছিঁড়ে ছড়িয়ে দেওয়া মাত্রই পাহাড়ের গায়ে যে সব গাছ, সেখানে থেকে নেমে একদল নানা রং-এর নানা জাতির পাখী উড়ে এসে সেগুলো ঠোকরাতে লাগল। তাদের লেজ নাচিয়ে নাচিয়ে ঠোঁটের ঠোক্কর মেরে খাওয়ার ভঙ্গীটা অপূর্ব! খাওয়া শেষ হতেই তারা উড়ে গেল বনে। ময়ূরের কেকাধ্বনির সঙ্গে ধনেশ পাখীর কর্কশ রব মিশে এই নির্জন পাহাড়ের বনভূমিতে অদ্ভুত একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে! অপরাহ্নের ছায়া পড়ে এসেছে, রোদ হলদে হয়েছে, সামনে পিছনে যেদিকেই তাকাই, দেখতে পাচ্ছি, কি সুন্দর বনের বড় বড় গাছ এবং পাষাণময় উচ্চ তীর। এই দিকে এবং উত্তরতটে দুদিকেই দেখছি স্তরে স্তরে উঠছে শৈলশ্রেণীর পেছনে শৈলশ্রেণী, সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত। এই নির্জন গহ্বরারণ্যে ময়ূরের কেকা, নানারকম পাখীর কলকাকলি, উপরে অপরাহ্নের নীলকাশ, বহু নিম্নে ডেহরী নদীর নালার মত কালো হাত — আমাদের আশেপাশে বিশাল বনস্পতি শ্রেণী, আমলকী, মহুয়া গাছ, বাঁশঝাড়, পাহাড়ের অনাবৃত অংশ, চীহড় লতা, রাম দাঁতনের কাঁটা লতা, পরপর তিনটা বটগাছ, তাদের লম্বমান মোটা মোটা ঝুরির সঙ্গে আরও অনেক বড় বড় গাছ থাকে থাকে নেমে হঠাৎ যেন শূন্যে ঝুলছে। চারদিক থেকে নানরকম ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। না দেখলে এ দৃশ্যের বিরাট মহনীয়তা, গাম্ভীর্য, ভয়, বিস্ময় সৌন্দর্য কিছুই বোঝানো যাবে না কাউকে।

৫টা বাজতে না বাজতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। উত্তর ও পশ্চিমদিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা আসছে। আর বাইরে থাকা যাচ্ছে না। আমরা ঘরে ঢুকলাম। ঘরে ঢুকেই আজ নিজে হিরন্ময়ানন্দজী কালকের মত একটা মোমবাতিকে জলে ভিজিয়ে তাতে দিয়াশলাই-এর কাঠি জ্বাললেন। মোমবাতির মাথায় শুকনো সুতোটা জ্বলে উঠতেই দুটো ঘরই আলো হয়ে উঠলো। যে ঘরে তিনি শুয়েছিলেন সেই ঘরে তিনি মোমবাতিটা বসালেন, সেই ঘরে বেশী আলো হলেও যে ঘরটাতে আমরা কাল শুয়েছিলাম, সেখানেও আলোর দীপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে। আমি দেখতে পেলাম দরজার কাছে একটা কোণে দুটো বড় বড় পাথর কেউ রেখে দিয়েছে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে হরানন্দজীর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন — খাওয়ার পরেই আপনি লনে গিয়ে পাথরের উপর গিয়ে বসে পড়েছিলেন। আপনার এদিকে নজর ছিল না, নর্মদার দিকে তার উত্তরতটের রৌদ্রালোকিত পাহাড়ের স্বর্ণোজ্জ্বল চূড়ার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, সেই সময় বুড়ো স্বামীজী উমানন্দ, রমানন্দ এবং প্রকাশ ব্রহ্মচারী তাঁর একান্ত অনুগত এই তিন জন সেবককে দিয়ে শিবমন্দিরের এই দুটো ভগ্নাবশেষকে বয়ে এনে ঘরে রেখে দিয়েছেন, দরজায় ঠেকা দিবার জন্য। আপনারা কি ভেবেছিলেন, বুড়ো স্বামীজীর দয়া মায়া নাই! সাহসী বাঘ ঢুকে দরজার কাছে শোওয়া নিদ্রিত অবস্থায় আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে, এটা তিনি হতে দিবেন না! যতই বলুন তিনি আমাদের দলের সর্দার ত? তাঁর সর্দার হিসাবে একটা দায়িত্ব ত আছে!

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ দেখলাম, আমাদের ঘর দুটোর জানালাহীন ফোকর দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছে। জ্যোৎস্না দেখে রঞ্জনের ভাবুক মনে উল্লাস জাগলো। বেচারার একতারাটার তার সিন্দূরী পাহাড় বেয়ে উঠতে গিয়ে ছিঁড়ে গেছে কিন্তু তাতে কি রসিক শিল্পীর মন বাধা মানে! সে মনের উল্লাসে বিনা যন্ত্রেই গান ধরল —

পালে তো লাগ্‌বে রে বায় লাগবে।
পেছনে হাওয়া হোক্‌ না কড়া,
ছিঁড়ুক না তোর দড়ি দড়া,
এমনি দশা রইবে না তোর,
ফিরবে হাওয়া ফিরবে।
ভাবিস্‌ তোর এ ক্ষুদ্র ভেলা
সইবে না ঐ বিষম ঠেলা,

আঠার মাঝে থাকবি ডুবে,
সঙ্গে ভবের খেলা,
হবে না তোর যাওয়া।
না, না, না, নারে ও ভাই –
ছাড়িস্ নে তুই হাল,
কেন মিছে গুটাস্ পাল,
দেখ্‌না ওরে আসছে ঘুরে
প্রবল উত্তর হাওয়া,
হবে রে তোর যাওয়া॥

গান গাইতে গাইতে মনের আবেগে রঞ্জন দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমি এবং হরানন্দজীও বেরিয়ে এসে মুক্ত আকাশের তলায় দাঁড়ালাম। চারিদিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। পেছন থেকে হিরন্ময়ানন্দজীর গলা শুনতে পেলাম -- রমানন্দ দরজা বন্ধ করে দাও। বিপদ ঘটলে তখন ওরা বুঝবে ঠেলা! আমি বেরিয়ে যেতে যেতেই পিছন ফিরে বললাম – সব বিপদকে অগ্রাহ্য করা যায়, এই নির্জন বনভূমিতে জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাত্রির শোভা দেখবার জন্য। পাহাড়ের উপর শাল মহুয়া দোকা পড়াশি বট অশ্বত্থ ও অর্জুন গাছের জঙ্গলে জ্যোৎস্নার যেন বান ডেকেছে। চন্দ্রকিরণের জোয়ার তরঙ্গিত হয়ে এমন এক মায়ালোকের সৃষ্টি করেছে যেন মনে হচ্ছে স্বয়ং বনদেবী এই জনহীন নিশীথে ধীর পদক্ষেপে নেমে আসছেন মা নর্মদা এবং মহাদেবের পূজা করতে। হাতে যেন তাঁর পূজার ডালি! বন পুষ্পের অপরূপ সৌরভে আমোদিত হয়ে উঠছে চারদিক। আমি উর্ধ্বাকাশের দিকে তাকিয়ে যুক্ত করে প্রণাম করতে করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলাম – বাবা, বাবাগো প্রণাম। পূজনীয় পিতৃপুরুষগণকে প্রণাম। তোমাদের আশীর্বাদেই আমি এস্থানে আসতে পেরেছি, এই অপরূপ অলৌকিক দৃশ্য দেখে ধন্য হতে পারলাম।

নর্মদার দিক হতে ভীষণ ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে আসছে বলে বেশীক্ষণ আর দাঁড়লাম না। নর্মদাকে প্রণাম করে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলাম। দুই ঘরেই দুটো আগুনের চুল্লী জ্বালা হয়েছে বলে ঘর গরম। এসে দেখি, রমানন্দ ছাড়া আর সবাই সান্ধ্যক্রিয়ায় বসে গেছেন। কেবল বেচারা রমানন্দ বুড়ো স্বামীজীর হুকুমে দরজা ঠেলে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা ঘরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে আমরা চারজনে মিলে কোণে রাখা সেই দুটো পাথর এনে দরজা ঠেকা দিয়ে দিলাম। আমরাও নর্মদার জল স্পর্শ করে কমণ্ডলুর জলে আচমনাদি করে জপে বসে গেলাম। আমাদের জপ তেমন হল না। জঙ্গলের মধ্যে পাহাড় থেকে নানারকম শব্দ ভেসে আসতে লাগল; মন সকলেরই খুব চঞ্চল হল। 'নমো নমো' করে সেরে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। শীতের চোটে ঘুম আসতে দেরী হলেও রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ ঘুমিয়ে পড়লাম সবাই।

সহসা রঞ্জনের ঠেলা খেয়ে উঠে পড়লাম। হাতে ঘড়ি নিয়ে সে ফিস্ ফিস্ করে বলল – রাত্রি ২টা বেজেছে, উঠে পড়ুন, পিপ্পলাদ আশ্রমে থাকাকালে মহাত্মা নাঙ্গা বাবা যেমন ভাবে যে কৌশলে কথা বলায় আমরা ভাবতাম তিনি শিব মন্দিরে নাই অন্য কোথাও হতে কথা বলছেন তেমনি Ventriloquism এর মত করে মহাত্মা সোমানন্দজীর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি, তিনি একটি মন্ত্র তিন চার মিনিট ছাড়া ছাড়া উদাত্ত কণ্ঠে পাঠ করছেন। আমরা সবাই শুনেছি। আমাদের একবার মনে হচ্ছে ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি মন্ত্র পাঠ করছেন, একবার মনে হচ্ছে নর্মদার ঘাটে দাঁড়িয়ে তিনি মন্ত্রোচ্চারণ করছেন, আবার কখনও বা মনে হচ্ছে সারা জঙ্গল জুড়ে তাঁর মন্ত্র ভেসে বেড়াচ্ছে। রঞ্জনের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই আর একবার তাঁর কণ্ঠস্বর নিনাদিত হয়ে উঠল। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন –

ওঁ সুবিবৃতং সুনিরজমিন্দ্র ত্বাদাতমিদ্‌যশঃ ।
গবামপ ব্রজং বৃধি কৃণ্বষ রাধো অদ্রিবঃ ॥

তাঁর অলৌকিক কণ্ঠস্বর নীরব হতেই হিরন্ময়ানন্দজী বলে উঠলেন – এ কি রকম সাপুড়ে ভূতুড়ে মন্ত্র রে বাবা ! এ রকম মন্ত্রতো কখনও শুনিনি । কোন স্তবকবচমালায় এ মন্ত্র পড়েছি বলে ত মনে হচ্ছে না । হয়ত কোন ডাকিনী তন্ত্র যোগিনী তন্ত্র বা শাবর তন্ত্রে হয়ত ঐরকম মন্ত্র থাকতে পারে ।

আমি কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই বললাম – আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসী বলে আপনাকে সর্বতোভাবে সম্মান করে চলি । আপনি যা জানেন না, সে সম্বন্ধে কোন বাচাল মন্তব্য করা উচিত নয় । আপনি প্রথম থেকেই ঐ অত্যন্ত উচ্চকোটির মহাযোগীকে পিশাচসিদ্ধ ধরে নিয়ে যখন তখন যা তা মন্তব্য করে চলেছেন । হরানন্দজী যে বলেন – আপনার বিদ্যা পুরাণ, পুরোহিত দর্পণ এবং স্তবকবচ মালা পর্যন্ত, এখন তা প্রমাণিত হল । আপনি জেনে রাখুন মহাপুরুষের উচ্চারিত ঐ মন্ত্র বিশুদ্ধ বেদ মন্ত্র । ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলান্তর্গত ঐন্দ্র-সূক্তং নামে অভিহিত দশম সূক্তের সপ্তম ঋক ঐ মন্ত্রটি ।

– তুমি কি বেদ্যাধ্যয়ন করেছ ? কোন্ আচার্যের কাছে পড়ছে ? প্রাঞ্জলভাবে ঐ মন্ত্রটা ব্যাখ্যা করত শুনি ।

– বাবাই আমার আচার্য । যা কিছু শিখেছি, তাঁর দয়াতে তাঁরই কাছে শিখেছি । ঐ ঋক্ মন্ত্রে সাধারণ অর্থে প্রার্থনা করা হচ্ছে, হে অদ্রিবৎ-দৃঢ় ইন্দ্রদেব অর্থাৎ হে পরমেশ্বর ! জীবের কর্মফলভূত যে যশ, অন্ন বা ধনকে অনায়াস লভ্য বলে মনে করি সে সকলই তাঁর কাছ হতে শোধিত হয়ে আসে অর্থাৎ তিনিই দান করেন । হে পরমপ্রভু ! আপনি দয়া করে সনাতন ধর্মের আবাস দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্বক আমাদের অভিষ্ট ধন দান করুন ।

এই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত অর্থ হল, এ জগতে অবিশ্বাসী হৃদয় সহসা ভগবানের কর্তৃত্ব স্বীকার করতে চায় না । তারা মনে করে, নিজের চেষ্টায় দৃঢ় পরিশ্রমে কর্ম করেই তারা ফল লাভ করতে পারবে, ভগবানের ধার ধারার কোন আবশ্যকতা নাই । এই রকম সংশয়ান্বিত চিত্তকে প্রকৃতিস্থ করার উদ্দেশ্যেই এই মন্ত্রের অবতারণা । মন্ত্র সন্দিগ্ধ চিত্ত ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, তোমার সকল কর্ম আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও সুফল প্রসূ হয় না কেন ? কাউকে দেখা যায় অল্প পরিশ্রমেই আশাতীত ফললাভ করে আবার কেউ বা জীবন পাত করে ফেললেও নিষ্ফলতা ছাড়া আর কিছু ভাগ্যে ঘটে না । এই ঋক্ সেই সংশয়ের সমাধান করে দিচ্ছে । কর্মফলকে আমরা যত সহজসাধ্য এবং অনায়াস সাধ্য বলে মনে করি, বাস্তবে তা ঘটে না । কর্মফলকে যত সুখলভ্য মনে করি তাদৃশ তা সুলভ নয় । বস্তুতঃ সকল কর্মফলই ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তিনি সকলের সকল কর্মকে বিচার করে ফলদান করেন । ত্বাদাতৎ ইৎ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ত্বাদাতং ইৎ অর্থাৎ ত্বয়া শোধিতং চ সম্পন্নমেবেতি, এক কথায়, মানুষের কর্মফল শ্রীভগবানেরই মুঠোর মধ্যে, ফলাফল সম্পূর্ণতঃ তাঁরই হাতে । যেন তুলাদণ্ডে পরিমাপ করে যে কর্মের যে ফল, তা তিনিই মানুষকে তার সাধনার গুরুত্ব ও আন্তরিকতা বিচার করে বিতরণ করে থাকেন । মন্ত্রোক্ত 'অদ্রিবঃ' বিশেষণের সার্থকতা এইখানেই দেখি । ঋকের 'যশঃ' পদটি এই হিসাবেই সুবিন্যস্ত রয়েছে । মন্ত্রে বলা হয়েছে, তিনি অদ্রিবৎ অর্থাৎ পর্বতের মত কঠোর; বলা হয়েছে, তাঁর হাত দিয়েই মানুষের যশ বা ধন শোধিত হয়ে আসছে । এই কথার মধ্যে একটা নিগুঢ় রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ।

মানুষের সকল কাজের মূলে থাকা চাই সততা, সত্য নিষ্ঠা । অসদুপায়ে অর্জিত অর্থের সাহায্যে অনেক সময় মানুষ যশ লাভের ইচ্ছা করে, বড় লোক হওয়ার চেষ্টা করে ।

ভাবে, চৌর্যবৃত্তির দ্বারা পরস্বাপহরণের দ্বারা, সেই অর্থের দ্বারাই সে নিজের পাপ ধামাচাপা দিতে পারবে, সকল কলঙ্ক মুছে ফেলতে পারবে। এই রকম দুর্নীতি পরায়ণ এবং পাপাচারী যারা তাদের পক্ষে ভগবান 'অদ্রিবঃ' অর্থাৎ পাষাণবৎ কঠোর হয়ে আছেন। প্রকাশ্যে সৎকর্মের ভাণ দেখাবে আর গোপনে অপকর্ম করে যাবে, সর্বান্তর্যামী ভগবানের কাছে তা কখনও অপ্রকাশ থাকবে না। তিনি শুধু সর্বান্তর্যামী নন, তিনি সর্বাত্মদৃষ্টিসম্পন্ন; তিনি অহর্নিশি সকলের সকল অবস্থা সমভাবে লক্ষ্য করে চলেছেন।

ঋকের আর এক অংশ – 'গবাং ব্রজং অপবৃধি।' এই মন্ত্রাংশের সায়ণাচার্য প্রভৃতি বেদ ভাষ্যকাররা অর্থ করেছেন – তিনি গো গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করে দেন এবং গবাদি দান করেন। আমার বাবা কিন্তু 'গো' শব্দে এখানে গোজাতি রূপ অর্থ সঙ্গত মনে করতেন না। তাঁর মতে 'গবাং ব্রজং' শব্দ দ্বয়ের অর্থ, সদ্ধর্মের আশ্রয়স্থল, জ্ঞানের আশ্রয়স্থল। বৈদিক নিরুক্তানুসারে 'গো' শব্দে জ্যোতিঃ বা কিরণ; তা মেঘে বা অজ্ঞানতার অন্ধকারে ভেদ করে আলোকরশ্মি বিকিরণই হল 'অপবৃধি' বা দ্বার উদ্ঘাটন ক্রিয়া।

মানুষের হৃদয়ে স্বতঃই জ্ঞানরশ্মি সঞ্চিত থাকে। কিন্তু অজ্ঞান - আঁধারে তা আবৃত থাকে। তপস্যার দ্বারা ভগবানের করুণা লাভে সমর্থ হলে, তিনিই সেই অজ্ঞান - অন্ধকার ছিন্ন ভিন্ন করে জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করতে থাকেন, তার ফলে জ্যোতির সমুদ্রে জ্যোতির কণা মিশে যায়। এখানে রূপকে এই ভাবটি ব্যক্ত হয়েছে।

ঋকে যে ধনের প্রার্থনা আছে, গৃহদ্বার উদ্ঘাটন পূর্বক যে ধন তিনি প্রদান করবেন বলে মনস্থ করেন, সেই ধনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করলে তা সহজেই বোধগম্য হতে পারে। সেই ধনের নাম ঋক্ দিয়েছেন – 'রাধঃ'। আরাধনা রূপ ভাব মূলক সিদ্ধ্যর্থক 'রাধ্' ধাতু হতে ঐ বৈদিক শব্দটি নিষ্পন্ন। কাজেই ভগবদ্ আরাধনা বা সাধনার দ্বারা আমরা যে ধন প্রাপ্ত হই, এ ধন সেই ধন, গবাদি পশুধন কদাপি নয়। অজ্ঞান-আঁধার উচ্ছিন্ন করে অন্তরে যখন জ্ঞান-রশ্মি প্রবেশ করেন, তখন যোগিধ্যেয় সেই পরম ধনই মানুষ প্রাপ্ত হয়। এই ঋক্ মন্ত্রে সেই ধনের প্রার্থনাই মূর্ত হয়ে উঠেছে, দেখতে পাচ্ছি।

আমার এই ব্যাখ্যা যখন শেষ হল, তখন সকাল ৫টা বাজতে মাত্র ২০ মিনিট বাকী। হিরন্ময়ানন্দজী সহ সকল সন্ন্যাসীই বেদ মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনছিলেন। প্রবল ঠাণ্ডা বাতাস জানালার ফোকর দিয়ে ঢুকছিল। আগুন কমে আসছে দেখে দু ঘরের দুটো চুল্লীতেই আরও কাঠ চাপিয়ে আমরা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। আমাদের যখন ঘুম ভাঙল, তখন বেলা ১০টা বাজতে যায়। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখি চারদিকে রোদ উঠে গেছে। আমরা প্রাতঃকৃত্য সেরে নর্মদাতে গেলাম স্নান করতে। মনে মনে ভাবছি এতকাল নর্মদার তটে পরিক্রমা করছি, আজকের মত এত বেলা পর্যন্ত আর কোথাও ঘুমাই নি। মহাপুরুষের কথায় আমরা এক রকম বাক্যবন্দী হয়ে পড়েছি। আর কি করা যাবে! ভগবানের যা ইচ্ছা তাই ঘটুক। ভাগ্যে যাই ঘটুক, মহাত্মা সোমানন্দের বাক্য মান্য করতেই হবে। সকলেই এক হাঁটু জলে নেমে স্নান, পিতৃপুরুষের তর্পণ এবং সূর্যার্ঘ্য প্রদানাদি কাজ সারলাম। 'সকলেই' এই শব্দটা ব্যবহার করলাম বটে কিন্তু বোধ হয়, আমি এবং রঞ্জনই পিতৃপুরুষের তর্পণ করলাম, দণ্ডী সন্ন্যাসীরা প্রায় সকলেই সূর্যার্ঘ্য দিয়ে জপ পূজাদি সারলেন। মানসিক জপ, মানসিক পূজা। আমরা সাড়ে ১১টা নাগাদ, ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে আমাদের আবাসস্থলে ফিরে এলাম। চারিদিক পাহাড় ও জঙ্গল দিয়ে ঘেরা হলেও সূর্য অনেকখানি উপরে উঠে যাওয়ায় ডহরেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে যথেষ্ট রোদ এসে পড়েছে। ভিজা ল্যাঙ্গট গামছা প্রভৃতি রোদে শুকোতে দিয়ে জামা চাদর গায়ে দিয়ে আমরা রোদে বসলাম এক একটা পাথরের উপর। হরানন্দজী স্বভাবতঃই খুব রসিক লোক। তিনি যে পাথরটার উপর বসে হিরন্ময়ানন্দজী রুদ্রাক্ষের মালা জপ করেছিলেন –

সেই পাথরের চারধারে 'নমো নারায়ণায়' বলতে বলতে প্রদক্ষিণ করে বলতে লাগলেন – প্রভো ! আশা করি, মহাত্মা সোমানন্দজী যে কোন পিশাচসিদ্ধ নন, তাঁর মুখে বেদমন্ত্র শুনে সে ভ্রম আপনার ঘুচেছে ! এখন আজ্ঞা হোক, আমি আর প্রেমানন্দ আগুন জ্বেলে লিট্টি পাকাতে আরম্ভ করি ? তিনি বললেন – নেহি জী ! আজ প্রকাশ ব্রহ্মচারী এবং রমানন্দ লিট্টি পাকায়েগা ! সেই দুজন সাধুর দিকে তাকিয়ে বললেন – ঘরকা অন্দর মেঁ নেহি, বাহার মেঁ লকড়ি জ্বালকে ইধারই লিট্টি পাকাও । হরানন্দজী বললেন – প্রভুজী কী বড়ি দয়া ! এই বলে হাসতে হাসতে বসে পড়লেন – একটা পাথরের উপর ।

হিরন্ময়ানন্দজী তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন – তোমাদের ঐ মহাপুরুষ যে গত পরশ্ব কথা প্রসঙ্গে বলে গেলেন – মা জীবন্ত ঈশ্বরী এবং বাবা জীবন্ত ঈশ্বর – তাঁদের মত ইষ্ট এবং উপাস্য নাকি আর কেউ নন এই বিচিত্র তত্ত্বের দীক্ষা কি তুমি তাঁর কাছেই পেয়েছ ? উনি কি দীক্ষা দিয়ে থাকেন ?

– আজ্ঞে না । উনি দীক্ষা দেন কিনা আমার জানা নাই । তবে মাতৃপিতৃ মন্ত্রের মহাদীক্ষা আমি ওঁর কাছে পাই নি । যাঁর বা যাঁদের কাছে পেয়েছি, তা শুনতে হলে আপনাকে কিঞ্চিৎ ধৈর্য ধরে আমার বাল্য ও কৈশোরের কিছু কাহিনী শুনতে হবে । আমার বাবা শিশুকালেই মাতৃহারা হয়েছিলেন । তাঁকে মায়ের অধিক যত্নে প্রতিপালন করেছিলেন, তাঁর এক বাল-বিধবা পিসীমা । আমরা ভাইবোনেরা তাঁকে 'ঠাকুমা' বলে ডাকতাম । আমার মামার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল এক কথায় বলা যায় অম্লমধুর । মামা তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন, আবার সুযোগ পেলেই তাঁর সঙ্গে নানা রকম মজা বা রগড় করতেও ছাড়তেন না । একদিন হয়েছে কি, ঠাকুমা বাইরের বারান্দায় বসে রোদ পোয়াচ্ছিলেন, মামা এসে চুপি চুপি তাঁর কাছে বসলেন । ঠাকুমা তখন বয়সের ভারে ন্যুব্জ, চোখেও ভাল দেখতে পেতেন না । তিনি জিজ্ঞেস করলেন – 'কেরে বাবা তুই' ?

মামা বললেন – 'নাম বলব না । অকড়া গ্রাম থেকে আসছি ।' গলার স্বর এবং অকড়া গ্রামের নাম শুনে ঠাকুমা বোধ হয় চিনতে পেরেছিলেন । তিনিও রগড় করার জন্য বললেন – 'তবে তোর ঠাকুরের নাম বল । না বললে বুঝব, তোর ঠাকুর কে তা তোর জানা নাই ।' আমি তখন ঘরের ভিতর খেলায় মত্ত ছিলাম । উভয়ের কথোপকথন শুনে কৌতূহল বশে বাইরে এসে দেখি মামা ! তিনি বাধ্য হয়ে তখন বলছেন, 'আমার ঠাকুরের নাম শ্রী অধর চন্দ্র ভট্টাচার্য ।' ঠাকুমা মামাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন, মাও তখন বাইরে বেরিয়ে এসেছেন । মা ও মামা দুজনেই ভিতরে গেলেন ।

ঘটনা নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং সামান্য । কিন্তু সেই হাস্য-পরিহাস সূচক সামান্য ঘটনাই আমার শিশুমনে অসামান্য প্রভাব সৃষ্টি করল । আমি ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করলাম – ঠাকুরের নাম তো দামোদর, শ্রীধর, লক্ষ্মীনারায়ণ, শিব বা শীতলা প্রভৃতি হয় । মামা কেন দাদুর নাম বললেন ?'

– বাবাই ত আসল ঠাকুর রে । আজকাল কথাবার্তার ছিরি বদলাচ্ছে, মেলেচ্ছ শিক্ষার ফলে মিষ্টার-ফিষ্টার লাগিয়ে বাপের নাম জিজ্ঞাসা এবং উত্তর দিবারও নূতন ঢং হয়েছে । শহুরে বাবুদের চালচলন আমার জানা নাই; আমরা পাড়া গাঁয়ের লোক চার· চিরকালে ঠাকুর বলতে বাবাকেই বুঝি । এই দেখলি না, তোর মামা কেমন ঠাকুরের নাম বলতে বাবার নাম বলল । বাবাই প্রকৃত জ্যান্ত ঠাকুর ।

ঠাকুমার কাছে সেই আমার পিতৃমন্ত্রের প্রথম দীক্ষা ॥

ঐ ঠাকুমাই আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, রোজ সকালে উঠেই বাবাকে প্রণাম করবি স্নান করে এসেও বাবাকে প্রণাম করবি । তাহলেই সব দেবদেবীর পূজা করা হবে । বাব কাছে না থাকলে সূর্যের দিকে তাকিয়ে বাবার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাবি ।

তারপর দিন থেকেই ঠাকুমার উপদেশ মেনে চলতাম। বাবা প্রথম দিনে সকালের প্রণামে কিছু বলেন নি, কিন্তু দ্বিতীয় দিনে স্নান করে এসে তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি বলেন – 'এ কি হচ্ছে! আগে ঠাকুর ঘরে শ্রীদামোদরজীউকে প্রণাম করে আয়।' ঠাকুমা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন – 'শৈলেন ঠিক করেছে। আমি ওকে বলেছি।' বাবা তাঁর পিসীমাকে খুব ভক্তি করতেন, মান্য করতেন, বোধহয় ভয়ও করতেন। তিনি চুপ করে রইলেন। আমার প্রাত্যহিক দিনচর্চার অঙ্গ হয়ে রইল পিতৃ প্রণাম।

কিছুদিন পরেই দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে। একদিন আমি যথারীতি স্নান করে এসে বাবাকে প্রণাম করছি, হঠাৎ দেখি এক জটাজুট সাধু এসে পেছন থেকে বলছেন – 'সাবাস্ বাচ্চা সাবাস্। এইসা কিয়া করো, হামেশা করো, মোত্ তক্ করতে চলো, কেঁউ কি,

একোঽপি পিতরি নিত্য প্রণামী দশাশ্বমেধী ন চ যাতি তুল্যম্।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম পিতৃ প্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥

'যাও বাচ্চা অন্দর মেঁ জাকর মাতাজীকো বলো এক সাধু ভিক্ষা করেঙ্গে। মেরে আস্তান প্রয়াগ রাজ মেঁ। গঙ্গা সাগর যা রহাঁ হুঁ। বাবা সংস্কৃত শ্লোকটির অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, প্রতিদিন যে পিতাকে অন্ততঃ একটি বারও প্রণাম করে, দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্যফলও তার তুল্য নয়। কারণ দশাশ্বমেধকারীর পুনর্জন্ম হতে পারে কিন্তু নিত্য পিতৃ প্রণামীকে এই সংসারে আর জন্মাতে হয় না।

তৃতীয় গল্পটি আমার এক ঋষিকল্প শিক্ষক শ্রীসুকুমার বিশ্বাস কথিত একটি গল্প, বিশেষতঃ তাঁর অনবদ্য বাচনভঙ্গী। পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলায় আমার বাড়ী। সেখানে বালিচক ভজহরি ইনষ্টিট্যুটের আমি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। আমার ঐ শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মশায় ছিলেন ইংরাজী সাহিত্যের কৃতবিদ্য পণ্ডিত। ইংরাজী ভাষায় তিনি কথা বলতে পারতেন, অধ্যয়ন-পাগল মানুষ, ছাত্রদেরকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। স্কুল ছুটির পর কিঞ্চিৎ জলযোগ করে প্রতিদিন তাঁর সাথে একটা ক্যানেলের ধারে বেড়াতে যেতে হত। একদিন গিয়ে দেখি, তিনি তন্ময় হয়ে একটি ইংরাজী বই পড়ছেন। পড়া শেষ হতেই বেড়াতে বেরোলেন। বেড়াতে বেড়াতে বলতে লাগলেন, 'এইমাত্র সমারসেট মমের 'হোম' নামক গল্প শেষ করলাম। কালজয়ী সাহিত্যিকদের প্রতি গল্পই আপন বৈশিষ্ট্যে অনুপম। গল্পটি হচ্ছে, জর্জ মেডোজ এবং টম নামে দুই ভাই ছিল। তারা দুজনেই এমিলি নামে একটি মেয়েকে ভালবাসত। জর্জ ছিল একটু খামখেয়ালী কিন্তু টম ছিল কর্মঠ এবং বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন। মেয়েরা খুব হিসাবী হয়। কাজেই যা হবার তাই হল। এমিলি জর্জকে প্রত্যাখ্যান করে বিয়ে করল টমকে। ব্যর্থ প্রেমিক জর্জ তার ভাগের সম্পত্তি এমিলির সুখের জন্য টমকে দান করে বিবাগী হয়ে গেল। জীবনের দীর্ঘকাল তার চীনেই কাটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে ফিরে আসে ইংলণ্ডে। বাতে পঙ্গু হয়ে 'পোর্টস মাউথের একটা নাবিকাশ্রমে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। শেষ সময়ে তার পিতৃপুরুষের গ্রাম (Country-house) আর ভিটা দেখতে সাধ হয়। তার চিঠি পেয়ে তার এক নাতি আলবার্ট তাকে আনতে যায় এমিলিও তখন বৃদ্ধা, টম্ মারা গেছে। গল্প লেখার এমন sytle লেখক যেন সেই গ্রামেরই লোক, দীর্ঘকাল পরে মেডোজ পরিবারের নিরুদিষ্ট বৃদ্ধ ফিরে এসেছেন শুনে তিনি যেন তাঁকে দেখতে এসেছেন।

আলবার্ট তখন বলছেন – 'জানেন! গেট পর্যন্ত এসেই দাদু বললেন গাড়ী থামাতে। হেঁটে এলেন বাড়ী পর্যন্ত।' বৃদ্ধ জর্জ যেন লেখককে দেখে বললেন – অথচ দেখনু দু বছর কাল আমি বিছানা থেকে উঠিনি। গাড়ী যখন আমাকে আনতে গেল, আশ্রমের লোকেরা ষ্ট্রেচারে করে নিচে নামাল, পাঁজাকোলা করে গাড়ীতে উঠিয়ে দিল। হেঁটে আসার কথা একবারও ভাবিনি কিন্তু বাড়ীর গেটে এসেই সারি সারি এলম্ গাছগুলো দেখেই মনে পড়ে গেল, বাবা এক এক সময় এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন গাছগুলোর কোন একটার তলায় আর

আমরা দুভাই ছুটোছুটি করতাম এ গাছের ছায়া হতে ও-গাছের ছায়ায়। মনে পড়তেই যেন বাবার ডাক শুনতে পেলাম — আয় না আয়, দৌড়ে আয়। শেষ পর্যন্ত দৌড় হয়ে উঠল না বটে কিন্তু হেঁটে ঠিকই এলাম।'

আমি স্যারকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি সম্ভব ? স্যার বললেন — কেন নয় ? মানুষের মনের শক্তি প্রচণ্ড। কোন সাত্ত্বিক ভাবকে আশ্রয় করে মন উদ্দীপ্ত হলে মনঃশক্তি অঘটন ঘটাতে পারে। পিতৃস্মৃতির চেয়ে পুণ্যময় শুদ্ধ সত্ত্বভাবে আর কি আছে ?

সমারসেট মমের গল্প বর্ণনা করতে গিয়ে সেদিন আমার স্যারের আবেগদীপ্ত কণ্ঠস্বরের মধ্যে যেন আমার সেই বুড়ী ঠাকুমারই কণ্ঠ শুনতে পেলাম — প্রত্যেকের বাবাই তার কাছে প্রকৃত জ্যান্ত ঠাকুর !

গল্প করতে করতে রমানন্দ চেঁচিয়ে বললেন — লিট্টি তৈরী হয়ে গেছে ! আমি বললাম — চলুন আগে খেয়ে আসি, তারপর আমার জীবনের চতুর্থ ঘটনা আপনাদের কাছে ব্যক্ত করব। হিরন্ময়ানন্দজী রমানন্দকে বললেন — খাব ত লিট্টি, তুমি শাল পাতায় করে এইখানে এনে সকলের হাতে দাও, এইখানে বসে বসে চিবাবো। রোদ ছেড়ে আর উঠব না। তাঁর নির্দেশ মত রমানন্দ ও প্রকাশ ব্রহ্মচারী, প্রত্যেকের হাতে একটা দুটো করে লিট্টি এনে দিলেন। আমরা সেইখানে বসে বসেই খেলাম। হাত মুখ ধুয়ে জল খেয়ে বসেছি, এমন সময় এক ঝাঁক পাখী উড়ে এসে বসল। গতকাল এদেরকে লিট্টি দেওয়া হয়েছিল। আজ লিট্টি সব আমরা খেয়ে ফেলেছি। হরানন্দজী ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে ছাতু মাখিয়ে ছোট ছোট গোঁড়া করে ছড়িয়ে দিলেন লনের চারদিকে। বিধাতার সুন্দর সৃষ্টি অপরূপ অবোলা নিরীহ এই পাখীর জাত। তারা কিচির মিচির করতে করতে খাওয়া শেষ হতেই উড়ে গেল বনে। হিরন্ময়ানন্দজী আমাকে বললেন — শৈলেন্দ্রনারায়ণজী ! এবার তোমার জীবনের চতুর্থ ঘটনাটি বল। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছেন। রোদের তাপ ক্রমশঃ কমে আসছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইতে সুরু করার আগেই চতুর্থ ঘটনাটি শুনে নিই। আমি বলতে আরম্ভ করলাম — অপর তিনটি ঘটনার সঙ্গে আমার এই চতুর্থ ঘটনার পারম্পর্য এবং সমাপতন বিশ্লেষণ করে আপনারা যে সিদ্ধান্তেই আসুন, এই চতুর্থ ঘটনাই যে যোগের পরিভাষায় আমাকে লব্ধভূমিকতত্ত্বের স্তরে টেনে নিয়ে গেছল, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। ১৯৪৯ সালে আমি যখন এম এ পড়ি, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটির অবকাশে বাবার অনুমতি নিয়ে আমি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যাই। মহারাষ্ট্রে গিয়ে পান্ধারপুরে পৌঁছি এক বৈষ্ণব সাধুর সঙ্গে। বিঠলজী সেখানকার জাগ্রত বিগ্রহ। ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ — যজুর্বেদের এই মন্ত্রোক্তির স্পন্দনে আমার জীবনাদর্শ গড়ে উঠেছে বলে 'শ্রী বিগ্রহে' আমার আগ্রহ না থাকলেও ঐ বিগ্রহের দৃষ্টি-নন্দন সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল সন্দেহ নাই। ঐখানে আমি সৌভাগ্যক্রমে কয়েকজন সিদ্ধ তপস্বীর দর্শন পাই। তাঁদের কাছেই জানতে পারি, পাণ্ডুরঙ্গ নামে এক নিষ্ঠুর দস্যুর নামানুসারে বিগ্রহের পূর্ণ নাম — পাণ্ডুরঙ্গ বিঠ্‌ঠলনাথ। গুজরাট ভাষায় লেখা 'পুষ্টিমার্গনো ইতিহাস' এবং ভাই মণিলাল পারেখ রচিত 'শ্রী বল্লভাচারিয়া' নামক দুখানি গ্রন্থ পড়িয়ে শুনিয়েছিলেন তাঁদের একজন। গ্রন্থ দুটি শুনে জানতে পারি, পাণ্ডুরঙ্গ তীর্থ যাত্রীদের দলে ভিড়ে গভীর রাত্রে তাঁদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করত। একবার এই উদ্দেশ্যেই সে গভীর অরণ্যে লুকিয়েছিল, সহসা দেখতে পেল, দুজন সুন্দরী তরুণী দুটি সুদৃশ্য মাটির কলসী মাথায় নিয়ে বন পথে আপন মনে হেঁটে চলেছেন। পাণ্ডুরঙ্গ গাছের আড়াল হতে বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করায় তাঁরা জানালেন যে, তাঁদের একজনের নাম গঙ্গা, একজনের নাম যমুনা। ঠাকুর স্বপ্নে তাঁদেরকে প্রত্যাদেশ দিয়েছেন, এক মাতৃপিতৃগত প্রাণ ভক্তকে প্রতিদিন এক কলসী গঙ্গার জল এবং এক কলসী যমুনার জল দিয়ে আসতে হবে। তাই তাঁরা জল নিয়ে সেই ভক্তের বাড়ীতে যাচ্ছেন। ঐ ভক্ত মাতাপিতার সেবা ছেড়ে কোথাও যান না।

পাণ্ডুরঙ্গ প্রশ্ন করেন, মাতাপিতার সেবা কি এমনই মহত্তম তপস্যা যে, যে জন্য স্বয়ং ভগবানকে স্বপ্নাদেশ দিতে হল ? সে তো ভগবানের সেবা পূজা করছে না, নিজের বাবা মায়ের সেবা করছে। তাতে তার উপর প্রভুর এত কৃপার কারণ কি ?

'কারণ, মাতা পিতাই ঈশ্বরের জীবন্ত প্রকাশ। মাতাপিতার সেবাতে শ্রীভগবানেরই সেবা করা হয়। মাতাপিতার সেবা পূজা বাদ দিয়ে যে যতই জপ তপ করুক না কেন, সে তপস্যা বন্ধ্যা, তাতে সিদ্ধিলাভ হয় না। জীবন্ত ঈশ্বরজ্ঞানে মাতাপিতার সেবা পূজা করলে অচিরাৎ সিদ্ধিলাভ ঘটে। এটি অব্যর্থ ফলপ্রদ গুহ্যতম সিদ্ধপথ।'

এই বলে ঐ তরুণী দুজন পাণ্ডুরঙ্গের দৃষ্টির সামনেই বন পথে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মুহূর্তে নিষ্ঠুর দস্যুর জীবনে পালা বদল ঘটে গেল। হায় হায় আমি ত সারাজীবন দস্যুবৃত্তি করে আসছি, মা-বাবার প্রতি ভক্তি নাই, কত কষ্টই না তাঁদেরকে দিয়েছি – এই গ্লানি ও অনুশোচনার আগুন তাকে দগ্ধ করতে লাগল। গভীর নিশীথে সেই নির্জন অরণ্যে দাঁড়িয়ে সে কাতরভাবে কাঁদতে লাগল। সংকল্প স্থির করতে দেরী হল না; পরদিনই পান্ধারপুরে ফিরে মা বাবার পা ধরে কিছুক্ষণ কাঁদল। সেইক্ষণ থেকে সে মা বাবার সেবায় মন প্রাণ ঢেলে দিল।

কয়েক বছর পরে একদিন রাত্রে সে যখন তার পিতা ঠাকুরের পাদ সংবাহন করছে, সহসা তার কুটীর দিব্য আলোক রশ্মিতে ভরে গেল। পাণ্ডুরঙ্গ সবিস্ময়ে দেখল, সেই রশ্মির চিন্ময় পথ ধরে এক দিব্যমূর্তি ধীরে ধীরে প্রকট হচ্ছে। শঙ্খচক্রধারী কেয়ূর কুণ্ডলবান পীতাম্বর নারায়ণের স্বরূপ ! ক্রমে সেই দিব্য আলোর ছটায় তার নিদ্রিত পিতার দেহ নারায়ণের সঙ্গে একীভূত দেখাতে লাগল; মহাচেতন সমুত্থানের রসাবেশে পাণ্ডুরঙ্গ কখনও দেখছেন – পিতাই নারায়ণ, কখনও দেখছেন – নারায়ণই পিতা। এক অপূর্ব দিব্য অনুভূতি ! পাণ্ডুরঙ্গ দৈববাণী শুনলেন – এই ঘোর কলিকালে পিতাকে জীবন্ত ঈশ্বর জ্ঞানে সেবাপূজা রূপ তপস্যার যে মহান্ পথ তুমি দেখিয়েছ, এটি ঋষিজন সেবিত অতিগুহ্য সিদ্ধ পথ।*

শ্রীভগবান বললেন – আমি প্রসন্ন ; তুমি বর চাও – বরং বৃণীষ্ব ভদ্র ত্বং যত্তে মনসি বর্ততে।

আনন্দাশ্রু ফেলতে ফেলতে পাণ্ডুরঙ্গ করজোড়ে নিবেদন করলেন, 'প্রভু, তোমার দর্শন লাভেই আমি ধন্য। আমার পিতৃসেবা সার্থক। তবুও একান্তই যদি বর দিতে চাও, তবে আমার এই পিতৃসেবার ধর্মকেই জীবন্ত করে রাখ। যারা নিজের মাতাপিতাকে জীবন্ত ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা পূজা করবে, তারাই যেন তোমার দর্শন পায়।'

প্রভু বললেন – তথাস্তু। এই দিব্য ঘটনার স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ তার পরেই পান্ধারপুরে নারায়ণের শ্রী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নামকরণ করা হয় – পাণ্ডুরঙ্গ বিঠ্ঠলনাথ।

হিরন্ময়ানন্দজীর দিকে তাকিয়ে বললাম – সেই পাণ্ডুরঙ্গ আচরিত, স্বীয় জীবনে উপলব্ধ, অব্যর্থ ফলপ্রদ এই শ্রুতিসিদ্ধ পথের মহিমা সাধ্যমত আপনাদের কাছে কীর্তন করলাম। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে, শীতও পাচ্ছে, এখন চলুন ঘরে যাই। হরানন্দজী ও রমানন্দ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দু ঘরে দুটো মোমবাতি জ্বালালেন। আমার হাত ধরে যেতে যেতে বুড়ো স্বামীজী বললেন – তুমি অপরের লেখা দুটো গুজরাটি গল্প শোনালে। তোমার গল্প বলার ভঙ্গীটি চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নাই। কিন্তু ঋষি প্রণীত কোন গ্রন্থে কি, বিশেষতঃ বেদে কি কোথাও মাতাপিতাকে জীবন্ত দেবতারূপে বন্দনা করা হয়েছে ?

কেন, স্বয়ং ভগবান মনুই বলেছেন –

মাতারং পিতরং চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাম্।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্বপ্রযত্নতঃ ॥

---

* লেখক প্রণীত 'পিতরৌ' নামক গ্রন্থের ৪–৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ মাতাপিতাকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে গৃহস্থ সবর্দা সর্বপ্রযত্ন তাঁদের সেবা পূজা করবে। আমার কথা শুনে হিরন্ময়ানন্দজী এমন ভাবে খল্‌খল করে হাসতে লাগলে যে তাঁর পাটি হতে বাঁধানো দাঁত খুলে পড়ে গেল তাঁর বিছানার উপর। তিনি তোৎলাতে তোৎলাতে বলে উঠলেন – ভগবান মনু এই নির্দেশ দিয়েছেন গৃহস্থদেরকে – 'মত্বা গৃহী নিষেবত'; আমি বর্ণাশ্রম ত্যাগী দণ্ডী সন্ন্যাসী, গৃহীর জন্য নির্দিষ্ট বিধানে আমি চলতে বাধ্য নই, এ বিষয়ে সাক্ষাৎ বেদের যদি কোন বিধান থাকে, তোমার জানা থাকলে বল।

আমি কি উত্তর দিব ভাবছি, এমন সময় সারা বনভূমিকে প্রকম্পিত করে মহাত্মা সোমানন্দের দৈববাণীর মত কণ্ঠস্বর ভেসে এল – শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩১ নম্বর কণ্ডিকাতে বলা হয়েছে –

ওঁ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথা ভাগমাবৃষায়ধ্বম্
অমীমদন্ত পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত ॥

সহসা মহাত্মার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলাম। স্তম্ভিত হয়ে তাঁর মন্ত্রোচ্চারণ শুনতে লাগলাম। মন্ত্র পাঠের শেষে পূর্ববৎ শূন্যপথে অদৃশ্য থেকে তিনি আদেশ করলেন – শৈলেন! তুমি ঐ বুড়োকে মন্ত্রটির অন্বয়মুখে শব্দার্থ বিশ্লেষণ করে এর মর্মানুসারিণী ব্যাখ্যা শুনিয়ে দাও। কোন ভয় নাই, তোমরা আমার দৃষ্টি পথেই আছ।

তিনি নীরব হতেই গর্জে উঠলেন হিরন্ময়ানন্দজী। হাত দিয়ে দুই কান চেপে ধরে তিনি বললেন – না, না, আমি কোন মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনতে চাই না। কাল সকাল হলেই এ স্থান আমি আলবৎ ছেড়ে যাবো। এই ভুতুড়ে জায়গায় থাকতে থাকতে মনের উপর নিয়ত পীড়ন হওয়ায় আমার স্নায়ুগুলো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। আমরা পরিক্রমা করতে বেরিয়েছি, একটা পাগলা সাধুর নির্দেশে এক ভয়াবহ দুর্গম জঙ্গলে পাঁচ ছদিন বসে থাকব কোন্ যুক্তিতে? আমার সঙ্গে যে যেতে চাও, সকালেই প্রস্তুত হয়ে পড়বে। না হলে, আমি একাই চলে যাব। আজ ২৭শে মাঘ। রাত্রি প্রভাত হলে ২৮শে মাঘ এখান থেকে চলে আমি যাবোই।

তাঁর কথা শুনে হরানন্দজী ও প্রেমানন্দ এক সঙ্গে বলে উঠলেন – স্বামীজী! মাঝখানে ত, মাত্র দুটো দিন। ২৯শে মাঘ সংক্রান্তি, ১লা ফাল্গুন সকালেই ত সকলেই যাব, তবে এত জিদ ধরছেন কেন? এক গুঁয়েমি করে যদি কাল সকালেই চলে যান, আমরা দুজন অন্ততঃ আপনার সঙ্গে যাচ্ছি না। শৈলেন, তুমি মন্ত্রের ব্যাখ্যা আমাদেরকে শোনাতে আরম্ভ কর।

– মহাত্মার আদেশ যখন, তখন আমি ত শোনাবই। মহাপুরুষ সদ্যোচ্চারিত বেদমন্ত্রটির অন্বয় মুখে শব্দার্থ বিশ্লেষণ করছি, যাঁর শুনতে ইচ্ছা হয় শুনুন –

পিতরঃ (হে পিতঃ! হে পিতৃপুরুষাঃ!) অত্র (মম হৃদ্দেশে) যথাভাগং (ভোগং অনতিক্রম্য, যথোপযুক্তাং ভক্তি সুধাং প্রাপ্য ইত্যর্থঃ) মাদয়ধ্বং (হৃষ্টা ভবত); ততঃ আবৃষায়ধ্বং (পুরুষার্থ রূপং অভীষ্টং সম্যক বর্ষয়তঃ)। পিতরং যথাভাগং অমীমদন্ত (হৃষ্টা অভবন্) আবৃষায়িষত (সাধকাভীষ্টং সর্বতো ভাবেন অপূরয়ন্) ॥

মন্ত্রের মর্মানুসারিণী ব্যাখ্যা করলে বুঝা যায়, স্বয়ং বেদ পিতা ও পিতৃপুরুষদের পূজা শিখাচ্ছেন। হে পরমারাধ্য পিতৃদেব তথা পিতৃপুরুষগণ! তোমরা আমার হৃদয়ের যথোপযুক্ত ভক্তিসুধা গ্রহণ করে তৃপ্ত হও এবং পুরুষার্থ রূপ অভীষ্ট বর্ষণ কর। ভাবার্থ এই যে, আমি যেন এরূপ ভক্তিমান হতে পারি, আমার হৃদয় যেন এমন সদ্‌ভাবে পূর্ণ হয় যাতে আমার হৃদয় ক্ষেত্র তোমাদের হর্ষের আনন্দের কারণ হতে পারে। পিতা এবং পিতৃপুরুষদের আশীর্বাদেই জীব নিঃশ্রেয়স্ লাভ করে থাকে এবং এই রকম অনুগ্রহ তাঁরা স্বতঃই করে থাকেন। এই স্বতঃসিদ্ধ গুহ্য তত্ত্বটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করার জন্য মন্ত্রে

দ্বিতীয়াংশে দ্বিরুক্তি করে বেদ বলছেন – যথোপযুক্ত পূজা ও ভক্তি দ্বারা পিতৃপুরুষগণকে হৃষ্ট ও তুষ্ট করতে পারলে তাঁরা জীবকে ধর্মার্থ কাম মোক্ষ রূপ পুরুষার্থ বর্ষণ করেন (কাজেই ভক্তি সহকারে পিতৃপূজা জীবের অবশ্য কর্তব্য) ।

মন্ত্রের প্রতি, মন্ত্রের ব্যাখ্যার প্রতি চরম অশ্রদ্ধা দেখাবার জন্য ব্যাজার মুখে হিরন্ময়ানন্দজী কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন । আমরাও আর তাঁকে বিরক্ত না করে শুয়ে পড়লাম । শোবার সময় হরানন্দজী বেশ জোরে জোরেই মন্তব্য করলেন – 'যিন্ কো যৈসী মতি, উনকা ঐসী হি গতি' অর্থাৎ যার যেমন মতি তার তেমনি গতি ।

আমাদের যখন ঘুম ভাঙল তখন সকাল ৭টা । আমাদের আগেই হয়ত হিরন্ময়ানন্দজী, উমানন্দ, রমানন্দ প্রভৃতি উঠে পড়েছিলেন । আমার ঘুম ভাঙার পর চোখে পড়ল, তাঁরা প্রায় সকলেই তাঁদের বিছানা গাঁঠরী বেঁধে ফেলেছেন । আমাকে ডেকে হিরন্ময়ানন্দজী বললেন – আপনি বা রঞ্জনবাবু কিছু মনে করবেন না । আমরা একসঙ্গে আসিনি, কাজে কাজেই এক সঙ্গে যে অমরকন্টক পর্যন্ত যেতে হবে, তার কোন বাধ্যবাধকতা নাই । ডহর মুনি এই মন্দির চাপা পড়ে মরেছিলেন, তাঁর বুভুক্ষ আত্মা, নৈরাশ্যের নিপীড়নে সর্বক্ষণ দীর্ঘশ্বাস ফেলছে । এখানকার বনে জঙ্গলে পাতার মর্মরে, বিধ্বস্ত মন্দিরের প্রতিটি পাথরে সেই সাধুর কান্না আমি শুনতে পেয়েছি । আগামীকাল মাঘমাসের সংক্রান্তি । ১লা ফাল্গুন অগস্ত্য । আপনাদের পরমমান্য মহর্ষি সেই অগস্ত্যের দিনে এখান হতে যাত্রা করতে বলে গেছেন । হিন্দু ভারতবর্ষের কেউ কখনও অগস্ত্যের দিনে যাত্রা করেন না । ভগবান না করুন – আপনাদের সেই যাত্রা শেষ পর্যন্ত অগস্ত্য-যাত্রায় পরিণত না হয় ।

এই বলে তাঁরা তের জন হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে যাত্রা করলেন, মা নর্মদাকে প্রণাম জানিয়ে । তখনও সূর্যোদয় হয় নি । কুয়াশা সবে মাত্র কাটতে সুরু হয়েছে । বেশ কতকটা চড়াই এর পথে উঠে গিয়ে একটা উঁচু পাথরের উপর দাঁড়িয়ে তিনি হুঙ্কার দিয়ে বললেন – হরানন্দ ! প্রেমানন্দ ! এই জঙ্গল পথে যেখানেই ডাকঘর পাব, সেখানেই তোমাদের কীর্তিকলাপ এবং আচরণের কথা গুরুদেবকে সব লিখে জানাব । তোমাদেরকে মঠ থেকে বিতাড়িত করে ছাড়ব । এই বলে হন্ হন্ করে চলতে লাগলেন ।

আমরা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ । আকাশে সূর্যোদয় হচ্ছে । প্রভাত সূর্যের উদয় রশ্মি পর্বতশীর্ষে পড়ায় বনজঙ্গল এবং বনস্পতিরাজি আলোকিত হয়ে উঠেছে । উত্তরতটের দিকে তাকিয়ে দেখি ওপারের পাহাড় শ্রেণী ঝকমক্ করছে যেন । সকালে সাড়ে ন'টা ১০টার আগে এই ডহরাশ্রমের প্রাঙ্গণে রোদ এসে পড়বে না । এখানে যে পাথরগুলোর উপর আমরা বসি সেগুলো এখনও শিশিরে ভেজা । প্রেমানন্দ তাঁর গামছা দিয়ে চারটে পাথর মুছে ফেললেন । আমরা কম্বল মুড়ি দিয়ে সেখানেই বসলাম । প্রেমানন্দ স্বগতোক্তি করতে লাগলেন – হিরন্ময়ানন্দজীকে আমাদের দলনেতা করে পাঠিয়েছিলেন গুরুদেব, আমাদের সকলের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ বলে, কিন্তু তাঁর স্বভাব কিছুতেই বদলালো না, সেই একই রকমের ক্রোধী ও কোপন স্বভাবেরই থেকে গেলেন । জানেন, গুরুদেব ওঁকে দু'দুবার মঠ থেকে বের করে দিয়েছিলেন, একবার তিন দিনের জন্য, আরেকবার তিন মাসের জন্য ।

রঞ্জন বলল – বেলা ১০টার আগে ত স্নান করব না, ততক্ষণ ঘটনাগুলো বলুন শুনি । প্রেমানন্দ বলতে লাগলেন – একবার বিশ্বনাথ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত কামরূপ মঠে দেখা করতে এসেছিলেন । পরে জানা গেল, উনিই তাঁকে পটিয়ে পাটিয়ে এনে ছিলেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে । তিনি এসেই গুরুদেবকে (শ্রী ১০৮ ভোলানন্দ তীর্থ, মঠাধ্যক্ষ, কামরূপ মঠ, বারাণসী) অনুযোগ করতে লাগলেন – ব্রহ্মা তাঁর চারপুত্র সনক সনন্দাদিকে সঙ্গে নিয়ে এইখানে বসে বাজশ্রবস যজ্ঞ এবং অগ্নিহোত্র করেছিলেন । এ হেন পবিত্র স্থানের

সন্ধান কেবল মুষ্টিমেয় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী এবং কয়েকজন মাত্র তত্ত্বসন্ধানী ছাড়া আর কেউ জানবে না কেন। এই মঠকা আচ্ছিতরেসে প্রচার হোনা চাহিয়ে।

তাঁর কথা শুনে গুরুদেব হাসতে হাসতে বললেন – আপনি কি ভগবান! ঐ সব কথা লিখে মঠের সামনে সাইন বোর্ড লাগাতে বলছেন? আমাদের মঠের একজন ব্রহ্মচারী সেদিন পড়ে শোনাচ্ছিল, কোলকাতায় কোন এক বালক ব্রহ্মচারী নাকি তার নির্বিকল্প সমাধির বিজ্ঞাপন কাগজে দিয়েছে, আপনি সেই রকম কিছু করতে বলছেন?

পুরোহিত – ঠিক ততটা না হলেও কিছুটা প্রচার ত জরুর দরকার। উসমেঁ হরজা ক্যা? স্বামীজী – সে কি বাবা! আমরা কটা অপদার্থ লোক, যাদের কোন চালচুলো নাই, যোগ ও তপস্যার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই, কোনমতে বিশ্বনাথের দরবারে তাঁর নাম নিয়ে পড়ে আছি, সেই ভিখিরী দেখবার জন্য লোক ডাকবো? ঢ্যাঁড়া পেটাবো?

পুরোহিত – এ্যায়সা মৎ বোলিয়ে জী! হমলোগ জানতা হৈ আপ্ কৌন্ হ্যায়। কাশীমেঁ য্যাতনা সাচ্চা সাধক হ্যায়, গুপ্ত যোগী হ্যায় – রাতভোর ইধর আতা হৈ ঔর মাথা ঠোক্‌তা হ্যায়।

স্বামীজী – তাঁরা কি আপ্‌কা পাশ নাম লিখাকর পারমিট (Permit) লেকর আয়ে হৈ? আপনি ত ভগবন্! তাহলে সোজা লোক নন? আপনি সবার জন্য পারমিট ইস্যু (issue) করেন?

পুরোহিত – মহারাজ! হামরা বোলনেকা মতলব এহি হ্যায়, আপ্‌কা পুণ্য দর্শন ভক্ত লোগোঁকা হোনা চাহিয়ে।

স্বামীজী – নিজেই ভক্ত হতে পারলুম না। তার আবার ভক্তকে দর্শন দান! পাদো হবে পবন বাবু! এই মঠের পূর্বতন আচার্যরা বিশেষতঃ অহোম্ রাজ্যের (আসাম) প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, এই কামরূপ মঠের আদি প্রতিষ্ঠাতা স্বামী মহাদেবানন্দ তীর্থজী বলে গেছেন – 'ভক্ত যেন হাজার টাকার বিষ। না পারি উগরাতে, না পারি সামলাতে। বিষটা ফেলে দিতে পারি না, হাজার টাকা দাম যে! গিলতেও পারি না – বিষ কি না, প্রাণ যাবে!'

পুরোহিতজীকে এই কথা বলেই তিনি হিরন্ময়ানন্দজীকে ডাক দিলেন। উনি একতলা থেকে দোতলায় উঠে আসতেই বললেন – তুমিই পুরোহিতজীকে এই সব কথা বলার জন্য শিখিয়ে পড়িয়ে এনেছ। তুমি আশা করে বসে আছ, তুমিই আমার পরে এই মঠের মোহান্ত হবে! তাই আমি বেঁচে থাকতে থাকতে যতটা পার মঠের প্রতিষ্ঠা এবং জাঁকজমক বাড়িয়ে নিতে চাও! সন্ন্যাসীর কাছে প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা। তোমার এই প্রতিষ্ঠা বুদ্ধির জন্য তোমাকে মঠ থেকে তিন দিনের জন্য তাড়িয়ে দিচ্ছি। অবিলম্বে মঠ থেকে তুমি বেরিয়ে যাও। এই তিন দিন বাইরে ভিক্ষা করে খাবে আর বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার জন্য চোখের জল ফেলবে। তিন দিন পরে তোমার যদি অনুতাপ ও অনুশোচনা আসে তখন এসে দেখা করবে। এই তিন দিন তোমার মুখ যেন আমি না দেখি।

স্বামীজীর ধমক খেয়ে তদ্দণ্ডেই মঠ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল হিরন্ময়ানন্দজীকে। তিন দিন পরে ফিরে এসে কাঁদা কাটা করতে, নামেও ভোলানন্দ, আচরণেও ভোলানন্দ স্বামীজী আবার মঠে তাঁকে স্থান দিয়েছিলেন।

এই ঘটনার প্রায় দুবছর পরে বেনারস বার এসোসিয়সনের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শ্রী সত্যচরণ বাগুলি এসেছিলেন গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে। সত্যচরণ বাবু হরিশচন্দ্র ঘাটে থাকতেন। তিনি একদিন গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে এসে প্রণামান্তে গুরুদেবকে বলেন – গতকাল বনপুরিয়া বাবাকে দর্শন করতে গিয়েছিলাম হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে বনপুরিয়া মহল্লাতে। সবাই বলে, কাশীর জ্যান্ত বিশ্বনাথ হরিহর বাবার গুরু ইনি। কিন্তু

তাঁকে দর্শন করে আমার তেমন ভক্তি হল না। গিয়ে দেখি একটা আমগাছ তলায় বাঁধানো বেদীতে বসে তিনি খাচ্ছেন। ২০/২৫টা কুত্তা তাঁকে ঘিরে আছে। একজন চেলা ২০/২৫ খানা এ্যায়সা বড় বড় রুটি এনে দিল, ২০/২৫টা ল্যাংড়া আম, তার সঙ্গে এক গামলা মকাই এর হালুয়া। সবই তিনি কুত্তাগুলোর সঙ্গে একই পাতে রসিয়ে রসিয়ে চেটে পুটে খেলেন। তারপর ঝুপড়িতে ঢুকে শুয়ে পড়লেন। বিছানাটাও দেখলাম বেশ পুরু গদী!

এই কথা শুনে গুরুদেবকে কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত হতে দেখা গেল। তিনি বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন – সাধুকে কোনদিন Criticize করো না। সাধু খাবে না, ঘুমুবে না এ সব কি বাজে ধারণা? সাধু কি কোন উল্লুক ভাল্লুক বা কোন বিচিত্র ধরণের নিরাহারী জীব যে তাঁর মানুষের মত আহার বিশ্রাম থাকবে না? গায়ে গু বা ছাই মেখে পাগল না সাজলে বুঝি সাধু হওয়া যায় না? খবরদার সাধু সম্বন্ধে কিছু বলবে না। আচ্ছা সাধু সম্বন্ধে কতটুকু জানো? সাধু সব করতে পারে! অযথা সাধু-নিন্দা করলে জানো, এই ঘোর কলিযুগেও তার জন্য প্রতিফল ভোগ করতে হয়, অকালে অপঘাতে মৃত্যুমুখে পড়তে হয়!

গুরুদেবের ধমকানিতে সত্যচরণ বাবু নতমুখে চুপ করে বসেছিলেন, এমন সময় হিরন্ময়ানন্দজী সেখানে গিয়ে হাজির হন। তাঁকে দেখেই বাপুলি মশাই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন – গুরুদেব আমার অপরাধ মার্জনা করুন। আমি বনপুরিয়া বাবাকে ছোট করার জন্য কিছু বলি নি, যা দেখেছিলাম, অবিকল তাই বর্ণনা করেছি। আমরা সাধারণ সংসারী লোক, আমাদের এ ভুল হতেই পারে, কিন্তু আপনার শিষ্য যে আজ সকাল বেলাই সর্বজনমান্য হরিহর বাবাকে যৎপরনাস্তি অপমান করে এলেন, তার বেলা?

কি ঘটেছে, তা গুরুদেব জিজ্ঞাসা করতেই বাপুলি মশাই বললেন – আজ সকালেই হরিহর বাবা প্রাতঃকৃত্য সেরে ওপার থেকে নৌকাতে করে অসি ঘাটে ফিরে এলেন, তখন সেখানে বালু চড়ার উপর খেতড়ীর মহারাজ, কাশীর মহারাজ, সম্পূর্ণানন্দজী, শ্রীপ্রকাশজী প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য প্রসিদ্ধ লোক তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করার জন্য বসেছিলেন। উনি গট্‌গট্‌ করে নৌকাতে উঠেই বললেন – আমি কামরূপ মঠ থেকেই আসছি, আপনার সঙ্গে সাধন ভজন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার জন্য অনেকক্ষণ ধরেই বসে আছি। আপনার ওপার থেকে আসতে বড় বেশী সময় নষ্ট হয়ে গেল। আচ্ছা, বাহ্য পেচ্ছাপ করতে আপনাকে ওপারে যেতে হয় কেন বলতে পারেন? হরিহর বাবা শান্তভাবে বললেন – ইয়ে হ্যায় বিশ্বনাথ ক্ষেত্র, আনন্দ-কানন। ইধর থুকনাভি ঠিক নেহি হ্যায়। এই শুনে উনি তাঁকে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে এলেন – ওহো! তোমার বিশ্বনাথ তাহলে বিশ্বব্যাপ্ত নন। তিনি শুধু এপারেই বিরাজ করেন, ওপারে তিনি নাই! তোমার বয়সের ঠিক ঠিকানা নাই, গায়ের লোমও সব পেকে শননুড়ি হয়ে গেছে, এতকাল ধরে এই তাহলে তোমার উপলব্ধি! এই বলে তাঁকে নমো নারায়ণায় না জানিয়েই চলে এলেন।

এই শুনে গুরুদেব হিরন্ময়ানন্দজীকে বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন – বাপুলির কথা সত্য কি না। তিন চারবার জিজ্ঞাসা করার পর তিনি যেন দয়া করে উত্তর দিলেন – হ্যাঁ, আমি যা ভাল বুঝেছি, তাই করেছি। ভুল করে হরিহর বাবাকে সকলে জ্যান্ত বিশ্বনাথ বলে থাকেন। আমি গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে সজ্ঞানেই ইচ্ছাকৃতভাবেই বুঝিয়ে দিয়ে এলাম – তাঁদের তথাকথিত জ্যান্ত বিশ্বনাথের স্বরূপটা কি!

গুরুদেব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন – আমিও তাহলে যা ভাল বুঝছি তাই করছি। তুমি এই মঠ থেকে অবিলম্বে দূর হয়ে যাও। তদ্দণ্ডেই তাঁকে সেদিন মঠ থেকে চলে যেতে হয়েছিল। হিরন্ময়ানন্দজী মঠ ছেড়ে চলে যাবার পর আশ্রমস্থ দণ্ডী সন্ন্যাসীদের সামনেই বাপুলিকে বললেন – আসল কথাটা কি জান বাপু! দোষ কারও দেখতে নাই। যে পাকা

ঘুটি, সে কারও দোষ দেখলে তার মন সেই রংএ আকারিত হয়ে তুমিও দোষী হয়ে পড়বে। তাছাড়া এ কথাটা সবার মনে রাখা উচিত যে, যেটাতে বা যার দোষ দেখছো, তাতে ত গোটাটাই আর দোষ নাই ? গুণও আছে। কারও মধ্যে শুধু পাপই থাকে না, পুণ্যও থাকে। দোষে গুণেই মানুষ্য দেহ, তার মধ্যে শুধু গুণটাই বেছে নিতে হয়। আজ যা গুণান্বিত কাল তা গুণাতীত হবে।

গুণান্বিত অবস্থার মধ্য দিয়ে গুণাতীত অবস্থায় পৌছতে হয়।

হরানন্দজী বললেন – অতীত কথা রোমন্থন করে আর কি হবে। মা নর্মদা তাঁর মঙ্গল করুন, এই দুর্গম পথ যাত্রা যেন তাঁর নিরাপদ হয়। 'এইবার চলুন ঘরের ভিতর থেকে গামছা কমণ্ডলু নিয়ে আসি, বেলা ১০টা বাজতে যায়। এবার স্নান করতে নর্মদায় নামা যাক, একটু পরেই এখানে রোদ এসে পড়বে। স্নান করে এসে এখানে বসলে আরাম হবে।' রঞ্জনের কথায় আমরা ঘরে গেলাম। হরানন্দজী বললেন – যা কাঠ আছে, তাতে আমাদের চারজনের লিট্টি সেঁকা এবং রাত্রে আগুন পোয়ানোও হয়ে যাবে। এই বলে তিনি ২/১টি ঝোলা হাতড়েই আর্তনাদ করে উঠলেন। হিরন্ময়ানন্দজী আমাদের জন্য এক মুঠোও আটা রেখে যান নি। ২/৩ দিন চলার মত কিছু ছাতু মাত্র পড়ে আছে। তিনি যতই বুড়ো হচ্ছেন, ততই মতিচ্ছন্ন দশা প্রাপ্ত হচ্ছেন।

আমরা চারজনে নর্মদাতে স্নান করতে গেলাম। হাঁটু পর্যন্ত জলে নেমে স্নান করেই শীতে কাঁপতে কাঁপতে তাড়াতাড়ি গা মুছে, তটে বসে তর্পণ করলাম জলে হাত ডুবিয়ে, গরম জামা গায়ে দিয়ে। হরানন্দজী বললেন – আজ ত রান্নার কোন বালাই নাই, ছাতু ভিজিয়ে খেতে হবে। আপনি এখানে পাথরের উপরে বসেই শিবের নামাবলি পাঠ করতে থাকুন, আমরাও এক একটা পাথরে বসেই নিত্যকৃত্য সারি। আমার যখন মহর্ষি তণ্ডিকৃত ১০০৮ শিব নাম পাঠ শেষ হল, তখন বেলা সাড়ে বারটা বেজে গেছে। অন্যান্য সাথীদেরও নিত্যকৃত্য সারা হয়ে গেছে। হরানন্দজী ছাতু গুলে নিয়ে এলেন। আমরা এক গোঁড়া করে ছাতু খেয়ে বসলাম। যথারীতি এক ঝাঁক পাখী উড়ে এসে বসল। পাখীদের জন্য হরানন্দজী ছাতুর গোঁড়া পাকিয়ে রেখে দিলেন। তাদেরকে ছাতু দেওয়া হল। ছাতু খেয়ে পাখীর দল উড়ে যাওয়া মাত্রই ছোট টুনটুনি পাখীর মত কয়েকটা পাখী উড়ে এসে হরানন্দজীর মাথায় পিঠে বুকে এবং কাঁধে বসে আওয়াজ করতে লাগল টুং টুং টুং, টুং টুং টুং ধ্বনি তাদের ডাক। একটা পাখী বুড়ো হরানন্দজীর চিবুক ধরে ঠোঁট দিয়ে আস্তে আস্তে আদর করতে লাগল। আমি প্রেমানন্দকে বললাম, ঘরে গিয়ে শীঘ্র একটু ছাতু গুলে এক গোঁড়া এনে এদেরকে দিন। না দিলে এদের আদরের ঠেলায় বুড়ো অস্থির হয়ে পড়বে। আমরা পাখীগুলোর আবদার জানাবার ভঙ্গী দেখে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলাম। যতক্ষণ না প্রেমানন্দ ছাতুর গোঁড়া এনে পাথরের উপর টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিল, ততক্ষণ তারা হরানন্দজীকে ছাড়লো না। ছাতুর টুকরো গুলোর এক একটা লেজ নাচাতে নাচাতে খেয়ে আবার টুং টুং আওয়াজ তুলে তারা পালালো। আমি তাঁকে বললাম প্রেমের জ্বালাতন যে কী বস্তু, তা এবারে বুঝলেন তো ?

এ কয়দিন এখানে থেকে একটানা বিশ্রামে শরীর আমাদের তরতাজা হয়ে উঠেছে। আমরা সেই ডহরাশ্রমের প্রাঙ্গণে হাত পা গুলো ছাড়িয়ে নিবার জন্য সকলে মিলে এ প্রান্ত হতে ও প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারী করতে লাগলাম। পায়চারী করতে করতে হঠাৎ দূরে এক জায়গায় ঘন বনের ফাঁকে এমন সুন্দর চওড়া পাষাণময় বনানীর সৌন্দর্য চোখে পড়ল যে আমি স্থির দৃষ্টিতে সেদিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সেদিকে সাথীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম – দেখুন দেখুন দূরে ঐ নদীগর্ভে বনের ফাঁকে ঐ বিরাট চওড়া পাথরটার ওপারে কম্প্রিটাম লতার ফুলফোটা বিশাল শৈলসানুর অরণ্যানী। কি গম্ভীর অপরূপ

শোভা ! শূলপাণির ঝাড়িতে বনে বনে বনান্তরালে কত স্থানে কত সৌন্দর্যভূমি যে ছড়িয়ে রেখেছেন, কৃপণের মত দু একটা জায়গায় গুণে গেঁথে হিসাব করে রচনা করে রাখেন নি – ধনী দাতার মত দুহাত পুরে ছড়িয়ে দিয়েছেন হাজারে হাজারে । মনে হচ্ছে বিশ্ব কারিগর নিরন্তর অপরূপ শিল্প সৃষ্টি করে চলেছেন, যেন বলছেন যার চোখ আছে সে দেখ আমার মনোহারিণী শিল্প সৃষ্টি !

বেলা ৪টা বাজতে যায় । ঘন ছায়া পড়ে আসছে বনে বনে । চারধারে পাহাড়ে ছায়া নেমে এসেছে – কোন অজানা বনপুষ্পের সুবাস ভাসছে অপরাহ্নের শীতল বাতাসে । আজ নর্মদার ধারে নেমে গিয়ে নর্মদা স্পর্শ করে আসতে ইচ্ছা হল । ৪ জনে এক সঙ্গে ঘাটে নেমে নর্মদা স্পর্শ করে আমরা কৃতাঞ্জলি পুটে প্রার্থনা করলাম –

গতং তদৈব মে ভয়ং তদম্বু বীক্ষিতং যদা
মৃকণ্ডু সূনু শৌনকাসুরারিসেবি সর্বদা ।
পুনর্ভবাব্ধিজন্মজং ভবাব্ধিদুঃখবর্মদে
ত্বদীয় পাদ পঙ্কজং নমামি দেবী নর্মদে ॥

– মার্কণ্ডেয় শৌনকাদি ঋষি তথা সমস্ত দেবতারা মাগো ! তোমার নিরন্তর সেবা করেন । যেই মুহূর্তে আমি তোমার জল দর্শন করেছি, সেই মুহূর্তেই আমার জন্মমরণের দুঃখ এবং সংসারের সকল তাপ হতে আমি মুক্ত হয়ে গেছি । সংসার রূপী সমুদ্রের যতেক দুঃখ দূরকর্ত্রী ! মা নর্মদে, তোমার চরণ কমলে প্রণাম করছি । তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ কর মা জননী !

আমরা নর্মদা প্রণাম করে এসেই ঘরে গিয়ে ঢুকলাম । মোমবাতি জ্বেলে আমরা একটা ঘরেই চারজনে বিছানা পাতালাম । দুঘরের নির্বাপিত চুল্লীর অর্ধদগ্ধ কাঠ একত্র করে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালা হল । ঘন অন্ধকারে চারদিক ঢেকে গেছে । হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে জানালার ফোকর দিয়ে; আমরা কম্বল মুড়ি দিয়ে বলসাম যে যার বিছানায় । দরজাটাও বন্ধ করা হল । চারদিক ঘুরঘুট্টি অন্ধকার । আজ ২৮শে মাঘ পঞ্চমী তিথি, আকাশে চন্দ্রোদয় হতে দেরী আছে । আমরা যে যার কুশাসন বিছিয়ে সান্ধ্যক্রিয়ায় মন দিলাম । সকলের জপ যখন শেষ হল, তখন জানালা দিয়ে বাইরের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে দেখি জ্যোৎস্না ফুটে গেছে । হরানন্দজী শোবার উপক্রম করছেন, তিনি বললেন – হিরন্ময়ানন্দজীর যতই দোষ ত্রুটি থাক, আমার সঙ্গে ত তাঁর প্রায়ই খিটিমিটি লাগত, তবুও দীর্ঘকাল একই সঙ্গে মঠে বাস করায় কেমন যেন একটা টান জন্মে গেছে । তাঁর কথা মনে এলেই মনটা আনচান করে । একসঙ্গে এসেছিলাম নর্মদা পরিক্রমা করতে; তাঁর গোয়ার্তুমির ফলে আজ আমরা আলাদা হয়ে গেছি । না জানি এখন তিনি কত দূরে । তাঁর দুটি চোখে জল চিক্‌চিক্ করছে । আমরা কোন মন্তব্য করলাম না । তিনি শুয়ে কম্বল মুড়ি দিলেন, আমরাও শুয়ে পড়লাম । সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন সাতটা বেজে গেছে । চারদিকে ঘোর কুয়াশা । শীত যেন আজ কালকের চেয়েও বেশী । আমরা চুল্লীতে দুচারটি কাঠ গুঁজে দিয়ে চারজনেই আগুন পোয়াতে পোয়াতে শিবস্তোত্র একসঙ্গে গলা ছেড়ে পাঠ করতে লাগলাম –

ওঁ চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর পাহি মাং
চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাম্ ॥ ১

– হে চন্দ্রশেখর, হে চন্দ্রশেখর, হে চন্দ্রশেখর, আমায় পালন কর; হে চন্দ্রশেখর, হে চন্দ্রশেখর, আমায় রক্ষা কর ।

ওঁ রত্নসানুশরাসনং রজতাদ্রিশৃঙ্গ নিকেতনং
শিঞ্জিনীকৃত পন্নগেশ্বরমচ্যুপনন সায়কং

ক্ষিপ্রদগ্ধপুরত্রয়ং ত্রিদিবালয়ৈরভিবন্দিতং
চন্দ্রশেখরমাশ্রয়ে কিং করিষ্যতি বৈ যমঃ ॥ ২

মেরু পবর্ত যাঁর ধনু, কৈলাস পর্বতের শৃঙ্গে যাঁর বাস, সর্পরাজ যাঁর ধনুর গুণ, বিষ্ণুর বদন যার শর, যিনি নিমেষ মাত্র ত্রিপুর দগ্ধ করেছিলেন, দেবতাদের দ্বারা যিনি বন্দিত, সেই চন্দ্রশেখরের আমি আশ্রয় ভিক্ষা করি; যম আমার কি করতে পারে ? অর্থাৎ এ হেন চন্দ্রশেখর মহাদেবের যে চরণ কমল আশ্রয় করেছে, যমের ক্ষমতা নাই সেই ভক্তের কিছু ক্ষতি করার।

বেলা ৮টা বাজতে আমরা প্রাতঃকৃত্য সারার জন্য ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। প্রাতঃকৃত্য সারার পর হরানন্দজী জানালেন, যেটুকু ছাতু আছে, তাতে একজনের মাত্র কোন রকমে পেট ভরতে পারে, বাকি তিনজনের তাহলে কি হবে, তাই আমি বলি কি প্রাতঃকৃত্য করতে গিয়ে আমি গাছ দেখে এসেছি। ফলগুলো পেকে গাছের নিচে পড়ে আছে। আমরা ত কুরজী গ্রামে শুনে এসেছি, এই ফলের ভিতর এমন দানা আছে, তা চিবোলে কাজুবাদামের মত খেতে লাগে। আমরা সকলে চলুন ঐ গাছের তলা থেকে ঐ ফলগুলি কুড়িয়ে আমি। তাই খেয়ে আজ কোনমতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করব; যে টুকু ছাতু আছে, তা পড়ে থাক্। দুপুরবেলা যদি পাখীর ঝাঁক আসে তাদেরকে ঐ ছাতু দেওয়া যাবে। ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে প্রেমানন্দ জানালেন – রাত্রিতে আগুন জ্বালার জন্য কাঠ কিভাবে সংগ্রহ করা হবে ? দুটো কুডুল আমাদের সঙ্গে ছিল, হিরন্ময়ানন্দজীর দল দুটো কুডুলই নিয়ে গেছেন, আমাদের জন্য একটাও রেখে যান নি। হরানন্দজী বললেন – তা আর কি করা যাবে। আমরা তিনজন শুকনো গাছের পাকা ফল কুড়াবো, আপনি গাছের ডাল কুড়াবেন। গাছের চারদিকে অনেক গাছের শুকনো ডাল ভেঙ্গে পড়ে আছে আমরা দেখে এসেছি।

আমরা চারজনে ডহরাশ্রম থেকে ৩০/৪০ ফুট পিছনের দিকে গিয়ে ফল এবং শুকনো ডাল যখন কুড়িয়ে আনলাম তখন রঞ্জন তার ঘড়ি দেখে জানালো যে বেলা সাড়ে দশটা বেজে গেছে। প্রাঙ্গণে কালকের মত আজও রোদ এসে পড়েছে। কিন্তু আজকে আর আমরা পাথরে বসে রোদ পোয়ানোর সময় পেলাম না। গামছা কমণ্ডলু নিয়ে চারজনেই গেলাম নর্মদাতে স্নান করতে। তর্পণাদি সেরে যখন ফিরলাম, তখন সাড়ে এগারটা বেজেছে। ভিজা গামছা ও ল্যাঙ্গটগুলো রোদে শুকতো দিয়ে বাইরের পাথরের উপর বসে আমি মহর্ষি তণ্ডিকৃত ১০০৮ শিব নাম পাঠ করলাম। তাঁরা আজ পৃথক পৃথক প্রস্তর খণ্ডে বসে জপাদি ক্রিয়া করলেন না। আমাকে বললেন – শিবভূমি নর্মদায় আপনি বসে বসে উদাত্ত কণ্ঠে মহর্ষি তণ্ডিকৃত মহাদেবের সিদ্ধ নামাবলী কীর্তন করবেন আর আমরা ইষ্টমন্ত্রে মন স্থির করে ধ্যান করব, এতবড় যোগী আমরা নই। শিবনামই ত সর্বশ্রেষ্ঠ ইষ্টমন্ত্র। আপনি পাঠ করুন, আমরা মন দিয়ে শুনি।

আমার যখন পাঠ শেষ হল তখন বেলা প্রায় ২টা বেজেছে। আমরা সেই ফল খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম, ঘরে ঢুকেই দেখলাম, একটা বড় লাউ-এর কমণ্ডলুর মুখ রেশমী কাপড়ে ঢেকে কেউ যেন রেখে গেছে। আমরা চমকে উঠলাম। সকলেই বিস্ময়ে হতবাক্। মুখ দিয়ে আর 'রা বেরোচ্ছে না। আমরা স্নান করতে যাওয়ার আগে এখানে কাউকে দেখে যাই নি। ২৫শে মাঘ থেকে আজ ২৯শে মাঘের এই দিন পর্যন্ত এই ৫ দিনের মধ্যে কাউকে এখানে আসতেও দেখি নি, এই তল্লাটে থাকবেই বা কে ? এই জনশূন্য ভয়ঙ্কর জঙ্গলে কেই বা আসবে ? জঙ্গলে হিংস্র জানোয়াররা আছে, কিন্তু জন্তু জানোয়ার কি এত যত্নে এমন সুদৃশ্য রেশমী কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা কমণ্ডলু রেখে যাবে ? এও কি সম্ভব ? ভয়ার্ত কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে রঞ্জন বলল – কোন প্রেত যোনির

কাণ্ড নয় ত ? এই ভাঙা পতিত বাড়ীতে ত আমি শুনেছি প্রেতদেরই আনা গোনা থাকে। তাছাড়া মাতৃপিতৃঘাতী ডহর মুনি এই খানেই শিবমন্দির চাপা পড়েছিলেন। তাঁরই অশরীরী আত্মা এই কমণ্ডলু রেখে যায় নি ত ? নিজের বাপ মাকে নিজ হাতে কেটে ফেলতে যার হাত কাঁপেনি সেই দুরাত্মা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হবার পর আরও হিংস্র হয়ে পড়েছে। তার নিবাসস্থলে আমরা এতদিন আছি, এটাকে হয়ত সে উপদ্রব বলে ভাবছে। তাই প্রতিহিংসা সাধনের জন্য এই কমণ্ডলুতে হয়ত কোন বিষধর সাপ পুরে রেখে গেছে ! ওতে হাত না দেওয়াই ভাল।

'চুপ করুন ভাই বোকা বাউল' – এই বলে হরানন্দজী গর্জে উঠলেন। তিনি চটপট রেশমী কাপড়ের ঢাকনা খুলে ফেললেন, তা দুধে ভর্তি। তিনি সর্বাগ্রে সেই দুধ নিজের কমণ্ডলুতে ঢেলে আকণ্ঠ পান করলেন। বললেন – আঃ ! এ যেন অমৃত ! ক্রমে ক্রমে আমি প্রেমানন্দ এবং রঞ্জনও আকণ্ঠ পান করলাম। দুধের স্বাদ যে এমন হয় তা জানা ছিল না ! হরানন্দজী রঞ্জনকে ঠাট্টা করে বললেন – কি পেটের মধ্যে কোন বিষক্রিয়া অনুভব করছেন নাকি ? সে লজ্জায় অধোবদন। হরানন্দজী বললেন – গুরুদেবের একটা গল্প শোনাই এই প্রসঙ্গে। তিনি পরিব্রাজক অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে হিংলাজ যাওয়ার পথে পাঞ্জাবের কোন গ্রামে গিয়ে পৌছে ছিলেন। তখন সবে মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। তিনি কোথায় আশ্রয় নেওয়া যায়, এই কথা ভাবছেন, এমন সময় দূরে মাঠের মধ্যে একস্থানে আগুন জ্বলছে দেখে সেখানে গিয়ে দেখেন একজন বিধবা স্ত্রীলোক, বয়স বড়জোর ত্রিশ হবে, শ্মশানে বসে কাঠ জ্বেলে রুটি তৈরী করছেন। গুরুদেবকে সহসা দেখতে পেয়ে তিনি ভূত প্রেত বা ভৈরব জ্ঞানে সহসা মূর্চ্ছা গেলেন। গুরুদেব জানতেন তৎকালে ঐ স্থানে কোন নারীর অকাল বৈধব্য হলে সন্ধ্যাকালে মাত্র একবার শ্মশানে বসে নিজের রান্না নিজেকে করে নিতে হত। সেই বিধবা যখন রান্না করতেন, সে সময় কিছু দূরেই তাঁর কোন নিকট আত্মীয় বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতেন। গুরুদেব একথা জানতেন বলে তিনি 'কোঈ হ্যায়' বলে বারবার চীৎকার করতে আরম্ভ করায় মেয়েটির আত্মীয়রা দৌড়ে শ্মশানে এলেন। অচৈতন্য মহিলাকে অতি সাবধানে নিকটস্থ বাড়ীতে এনে সেবা শুশ্রূষা করে জ্ঞান ফিরালেন। চেতনা ফিরে আসতেই গুরুদেব তাঁর কাছে গিয়ে বললেন – দেখ মা, যাকে তুমি ভূত মনে করে মূর্চ্ছা গেছলে আমিই সেই সন্ন্যাসী। রক্তমাংসের শরীর আমার। পরদেশী পরিব্রাজক সন্ন্যাসী আমি, তোমার রান্নার আগুন দেখে তোমাকে লক্ষ্য করে হাঁটছিলাম, উদ্দেশ্য ছিল নিকটস্থ কোন গ্রামে রাত্রিবাস করার জন্য কোন দেবমন্দিরাদি আছে কি না তার সন্ধান নেওয়ার। তোমার মনে ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংস্কার অত্যন্ত প্রবল। শ্মশানে আমাকে সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখেই ভয়ে মূর্চ্ছা গিয়েছিলে শ্মশান বা কোন নির্জন পরিত্যক্ত গৃহ হলেই যে সেখানে ভূতের বাসা হবে, এ ধারণা ভুল। (যে গৃহস্থ বাড়ীতে ল্যাম্পট্য, অনাচার ও ব্যাভিচার চলে, প্রতারণা পূর্বক অর্থোপ যে বাড়ীতে প্রধান উপজীবিকা সেখানেই ভূতের বাসা হয়।) প্রেতযোনির পক্ষে সেই সব গৃহই তাদের প্রিয় নিবাসস্থল। বলাবাহুল্য, গুরুদেবের প্রবোধ বাক্যে সেই মহিলা অচিরাৎ সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন।

রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে গল্পটি বলে হরানন্দজী মন্তব্য করলেন – এই ডহরাশ্রম নির্জন স্থানে বহুকাল ধরে পরিত্যক্ত পড়ে আছে বলে একে ভূতুড়ে বাড়ী ভাবার কোন কারণ নাই। নর্মদা তট শিবভূমি, প্রেতভূমি নয়। কে বলতে পারে এই দুর্গম প্রদেশে এতগুলি পরিক্রমাবাসীকে অভুক্ত থাকতে হবে বলে স্বয়ং মা নর্মদা এই দুধভরা কমণ্ডলু রেখে যান নি ? এই কমণ্ডলু দৈব প্রেরিত না হলে কি এই কমণ্ডলু দুধে আমাদের চারজনের চার-চারটে কমণ্ডলু দুধে ভরে যায় ? আমাদের কমণ্ডলু গুলো ত মাটির তৈরী চা-খাওয়া ভাঁড়ের মত ছোট নয় !

তাঁর গল্প শেষ হতেই আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম সেই কমণ্ডলু হাতে নিয়ে। রেশমীর সেই কাপড় টুকরোটা হরানন্দজী বারবার মাথায় ঠেকিয়ে নিজের ঝোলার মধ্যে অমূল্য সামগ্রী জ্ঞানে তুলে রাখলেন। বাইরে বেরিয়ে দেখি, পূর্ব পূর্ব দিনের মত একঝাঁক নানাশ্রেণীর পাখী এসে কলরব করছে। হরানন্দজী কমণ্ডলুটা আমার হাতে দিয়ে আবার ছুটে গেলেন ভিতরে। অবশিষ্ট সব ছাতু গুলো গোঁড়া পাকিয়ে তিনি টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। পাখীরা তা খেয়ে উড়ে গেল বনে। উত্তরতটের দিকে তাকিয়ে দেখি, সে দিককার তটভূমিতে পাহাড়গুলোর মাথায় অস্তগামী সূর্যের রঙীন রশ্মি এসে পড়েছে! সূর্যকে অস্তগামী দেখে আমরা নর্মদার ঘাটে নামলাম নর্মদার জল স্পর্শ করতে। সেই লাউ কমণ্ডলুটি নর্মদার জলে ডুবিয়ে দিয়ে কর্পূরের আরতি করা হল। ঘরে এসে যখন ঢুকলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকে হরানন্দজী মোমবাতি জলে ডুবিয়ে দিয়াশালাই জ্বেলে তা ধরিয়ে ফেললেন। ঘর আলো হয়ে উঠল। যে সব শুকনো ডাল গাছতলা থেকে কুড়িয়ে আনা হয়েছিল, তা হাতে ভেঙে আগুনের চুল্লীও ধরানো হল। আমরা প্রত্যেকের বিছানা পেতে বসে আজকের আচম্বিতে লাউ-এর কমণ্ডলুতে দুধ পেয়ে যে আজকের আহার পর্ব শেষ করলাম, আমরা বসে বসে সেই সম্বন্ধেও আলোচনা করছিলাম। আমরা সবাই একমত হলাম যে ভক্তবৎসলা কল্পলতিকা মা নর্মদারই এটি বিশেষ দয়া। প্রেমানন্দ এবং হরানন্দজী দুজনে বসে সেই গাছের ফলগুলো ভেঙে কাজুবাদামের মত সুস্বাদু বীচিগুলো ভেঙে ভেঙে ২/৩টা ছোট ছোট পুঁটলী করে বেঁধে ফেলছিলেন। একসঙ্গেই সব গল্প করছিলাম। প্রেমানন্দ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন – একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছেন? শূলপাণীশ্বর মন্দিরের পর আমরা প্রায় ৩২ মাইল নর্মদাতট অতিক্রম করে এলাম, এই পথে কোথাও একটা শিবমন্দির চোখে পড়ল না। আশ্চর্য নয় কি?

– হ্যাঁ, আমারও মনে একথাটা উদয় হয়েছে। দুর্গম ঝাড়িপথ এর একমাত্র কারণ তা মানতে মন চায় না। কারণ, উত্তরতটেও এইরকম, বরং এর চেয়েও অনেক বেশী দুর্গম জঙ্গল ও পাহাড় অতিক্রম করে এসেছি, কিন্তু সেখানে ঘন ঘন শিবের মন্দির দেখেছি। বিভিন্ন বৈদিক ঋষির তপস্যাস্থলী প্রত্যেক ঘাটে শুধু একটা নয়, একাধিক শিবমন্দিরেরও দর্শন পেয়েছি, কিন্তু এই দীর্ঘপথে শূলপাণীশ্বরের মন্দির ছাড়া আর একটাও মন্দির দেখতে পেলাম না। বড়ই আশ্চর্য!'

আমার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই ঘর গমগম করে উঠল – মহর্ষি সোমানন্দের কণ্ঠস্বরে। যেন তিনি পাশের ঘরে দাঁড়িয়েই বলছেন – নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়। এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? শিবভূমি নর্মদার মধ্যে শিব, গাছপালায় শিব, পর্বত শিখরের শীর্ষে শীর্ষে শিব, পাথরে পাথরে শিব, শিবময়ী নর্মদা। মন্দির থাকল, কি না থাকল, তাতে কিছু আসে যায় না। বিচিত্র দুরধিগম্য মহাদেবের মহিমা। ভেবে দেখেছ কি কোনদিন? অন্তরের সুধায় তিনি বসুধা তরে দেন অথচ নিজে পান করেন গরল। তিনি দেবাদিদেব, কালিমালিপ্ত জীবকেও অমৃত দান করেন অথচ নিজে পান করেন বিষ। যাঁর ঘরণী স্বয়ং অন্নপূর্ণা, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ফিরেন তিনি। মুহূর্তে যিনি ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ এবং সূর্যকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে পারেন, তিনি নিজে বাস করেন শ্মশানে। তাঁর কৃপা কটাক্ষে তাঁর ভক্তদেরকে প্রাসাদবাসী করে নিজে হয়েছেন শ্মশানচারী। যাঁর কণ্ঠে উমা দিয়েছেন বরমাল্য তাঁর গলায় জড়িয়ে আছে সাপ, সেই সাপের বিষে তাঁর কণ্ঠ হয়েছে নীল। সমুদ্র মন্থনের সময় বাসুকী ও অনন্তনাগের বিষে যখন সাগরজল নীল হয়ে গেল, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারা সৃষ্টি লোপের আশঙ্কায় যখন অস্থির হয়ে পড়লেন তখন হাসিমুখে সেই গরলকে কণ্ঠে ধারণ করে মহাদেব হলেন নীলকণ্ঠ। জীবন্ত শঙ্করভাষ্য এই নর্মদা। এই ভাষ্য যে বোঝেনি তার পক্ষে নর্মদার রহস্যও বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। এই

আজ যে শিবকন্যা নর্মদা দুধ দান করে তোমাদের ক্ষুধা মিটালেন, শিবকন্যা ও শিবের এই দয়া সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধির অগোচর। এখানে কি কোন মন্দির আছে ? মন্দির না থাকলেও শিবের কৃপা যে হয় তাতো একটু চিন্তা করলেই উপলব্ধি করতে পার। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে, প্রতিদিনের তুচ্ছ সুখের কাঙাল তিনি নন, মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তাতে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করে রাশি রাশি পঞ্চগব্য আর বিল্বপত্র চাপালেই তিনি কৃতার্থ হবেন, না হলে তিনি দয়া করবেন না, এমন দেবতা তিনি নন। ভোলানাথ প্রতিদিনের তুচ্ছ সুখের কাঙাল নন। হোম আরতি ঘি-এর বাতি আর বেদমন্ত্রে যজ্ঞের আড়ম্বর তিনি চান না, অন্তরঢালা ভক্তি, ভালবাসার কাঙাল তিনি। প্রত্যহের অতীত 'আনন্দম' তিনি। কেউ তপস্যা করলে ভয়ে কেঁপে ওঠে ইন্দ্রের বুক, এই বুঝি তাঁর স্বর্গরাজ্য কেড়ে নেয় তপস্বী কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেবের কীর্তি পর্যালোচনা করে দেখ, চোখের জল ফেলতে ফেলতে অন্ধকাসুর বা ভস্মাসুর প্রার্থনা করে বসল – 'আমার এই হাত যার মাথায় পড়বে সেই হবে ভস্মসাৎ। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের প্রার্থনা মঞ্জুর করে বসলেন ভক্তবৎসল আশুতোষ!

ইনিই সেই মহাকাল যাঁর মন্দিরা দুহাতে বাজে – সুখে বাজে দুঃখে বাজে, ফুলে বাজে, কাঁটায় বাজে! আলো ছায়ায়, জোয়ার ভাটায়, ভালোয় মন্দয়, আশা ও শঙ্কার মধ্যে বেজে চলেছে তাঁর নিত্যকালের ডমরু। মন্দির নাইবা থাকল কোথাও, দয়ার সাগর তিনি, তাঁর সর্বব্যাপ্ত বিরাট স্বরূপকে সতত অনুধ্যান করবে।

তাঁর কণ্ঠস্বর মুহূর্তের জন্য নীরব হতেই প্রেমানন্দ দুহাত বাড়িয়ে প্রার্থনা করে বসলেন – প্রভু দয়াময়! আমি নিত্য গুরুনির্দিষ্ট পন্থায় সাধনভজন করতে ভালবাসি, নিত্য ধ্যান করি, দৈবী অনুভূতির আশায় নর্মদাতটে ছুটে এলাম, মা নর্মদাকেও ভালবাসি কিন্তু তবুও আজ পর্যন্ত কোন realisation হচ্ছে না কেন ? সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্বপথে শূন্যস্থান হতে তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে এল – 'ভালবাসা' দরকার বাবা, 'ভালবাসা'টি নয়। 'ভালবাসি' এই বোধটা দগ্‌দগে ঘায়ের মত মনের মধ্যে রয়েছে কিনা! 'ভালবাসির' মধ্যে 'আমি' থাকে, থাকে মায়া, থাকে লোভ। তাই ভালবাসির ফুল বাসি হয়ে যায়। ফুল তুললে, মালা গাঁথলে, গলায় পড়লে, ঠাকুর সাজালে তারপর প্রয়োজন ফুরালেই বাসি ফুল ফেলে দিতে হয়। ভালবাসি রূপ বাসি ফুলে কি মৌমাছি বসবে, না গুণ্‌গুণ্‌ করবে। মধু জমবে কোথা থেকে ? তাই বলছি ভালবাসার জন্য ভালবাসা ভাল। তাতে কি হচ্ছে আর কি হচ্ছে না, তার কোন হিসাব থাকে না। ভালবাসা হলে সে বাসায় প্রেমের ঠাকুর মদনমোহন ঢুকে যান। ভালবাসাই ভগবান।'

তাঁর কথা শেষ হতেই আশ্চর্য হয়ে দেখলাম – রঞ্জন দুহাত জড়ো করে প্রার্থনা করতে বসল – আমার গুরু করতে ইচ্ছা নাই। বাউল আমি, এই বাউল গান গেয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে গেলেই আমার কি মুক্তি হবে না ?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভেসে এল। গুরু করবার ইচ্ছা নাই ত ভারোচে পৌঁছে উত্তরতটের নর্মদাতটের তবরাতে ছুটে গেছল কেন তোমার বাউল গুরুর কাছে ? কি দেখলে সেখানে ? দেখলে তোমার সেই বাউল গুরুও এক শৈবগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে শিবনামে বিভোর হয়ে আছেন। তাঁর তাড়াতাড়ি দেহান্ত হয়ে গেল বলে হরিধাম অতিক্রম করে এসে বিমলেশ্বরে পৌঁছে শৈলেনের সঙ্গী হলে! গুরু করতেই হবে তোমাকে জগদ্গুরুর কাছে পৌঁছাতে হলে। সুরে সুরে তালে তালে যতই বাঁধো তোমার একতারা, সেই তার যাবে একদিন ছিঁড়ে। তখন গুরুই হবেন একমাত্র সেতু তোমার আর তাঁর মধ্যে। দুস্তর পারাবার অতিক্রম করে তোমার আর তাঁর মধ্যে গুরুই পারবেন মিলন ঘটাতে। ঘুড়ি উড়বে কি করে আকাশে, কেউ যদি না ধরে লাটাই ? যাক্ ভাবনা করো না, এই দক্ষিণতটেই ওঁকারেশ্বর তীর্থে গিয়ে মার্কণ্ডেয় শিলার কাছে তুমি তোমার প্রকৃত গুরুর সন্ধান পাবে।

কাল সকালেই এখান থেকে চলে যেও পেঁড্‌রার পথে। মনে রাখবে আমি বলছি পেঁডরা, পেণ্ড্রা নয়। পেণ্ড্রা মূল অমরকণ্টকের কাছে। পেঁডরা দমখেড়া ভুচেগাঁও পেরিয়ে বহাদল ঘাটে পৌঁছে তোমরা তোমাদের পুরাণো সাথীদের খবর পাবে। কারও কারও সঙ্গে দেখাও হয়ে যাবে। আর শৈলেন! তোমাকে একটা কথা বলছি, আর যখন তখন আমাকে এভাবে স্মরণ করবে না। তুমি ডাকলেই আমি আর আসব না, আমার ইচ্ছা হলে বা প্রয়োজন বুঝলে তবে দেখা দিব, নতুবা নয়। শিবমস্তু।

কণ্ঠস্বর নীরব হল, ঘরের ভিতর বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। বুঝলাম, তিনি চলে গেলেন। প্রেমানন্দ এবং রঞ্জনকে খুব উৎফুল্ল দেখলাম, কারণ তাঁরা অদৃশ্য মহাপুরুষকে প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছেন, মনের মত উত্তরও পেয়েছেন, কেবল হরানন্দজী এরই মন খারাপ দেখলাম। কারণ, তিনি প্রশ্ন করতে সাহস পাননি, প্রশ্ন করলে এভাবে যে উত্তর দিবেন সূক্ষ্ম জ্যোতির্ময় দেহে শূন্যপথে নিরালম্বপুরীকে আশ্রয় করে তা শুধু তাঁর কেন, আমি কল্পনা করতে পারি নি। যাইহোক, এবার সবাই শোওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগলাম। মনের আনন্দে সান্ধ্যক্রিয়ার কথাও ভুলে গেলাম। শুয়ে শুয়ে রঞ্জন গুণগুণ করে গাইতে থাকল –

ওগো আমার শিবসুন্দর! হিয়ায় এসে নিজে
গড়ো আমার জপমালা তোমার নাম-বীজে।
অশ্রু-সূতে গাঁথো আমার প্রেমের জপদাম
ঘুরুক আঙুল গুণে গুণে রেবা শিব রাম॥
মনের সাথে এই রসনা রসুক নাম-রসে
মন্ত্র তোমার হৃদ্‌যন্ত্রে চলুক প্রেমবশে।
নাচুক আমার পাগল হিয়া নাচুক আমার মন,
নাচুক আমার ভাবলহরী আনন্দ-মগন।
জিহ্বা আমার উঠুক নেচে নামের রসে ভোর,
নাচুক আমার করাঙ্গুলে জপমালার ডোর।
নাচুক আমার চোখের তারা ঊর্ধ্বে নাচুক হাত,
নাচুক আমার চরণ দুটির প্রতি পদপাত।
ঠোঁটে আমার নাচুক হাসি নিতে তোমার নাম,
আনন্দেরি অশ্রু চোখে ঝরুক অবিরাম॥

রঞ্জনের মনোহারী কণ্ঠস্বরে এক অপূর্ব তান ও সুর ফুটে উঠেছে, মনোহারী স্বর ও সুরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভাষার মনোহারীত্ব মনকে মাতিয়ে তুলল, ভাব ও ভাষা যেন নৃত্যের তালে তালে নেচে চলেছে। মূর্ত হয়ে উঠেছে এক অপূর্ব ছন্দ। এই দুর্গম জঙ্গলে নির্জনতম পরিবেশে রঞ্জনের গানে যেন যাদু মাখানো। ঘুমে বিহ্বল ঢুলুঢুলু চোখ দুটো আপনা হতেই বন্ধ হয়ে গেল।

এক ঘুমেই সকাল সাতটা। নিবিড় কুয়াশায় গাছপালা সব ঢেকে গেছে। জানলা দিয়ে তীব্র শীতের হাওয়া বয়ে আসছে। তবুও তা অগ্রাহ্য করে উত্তর দিকের জানালার কাছে এগিয়ে গেলাম মা নর্মদাকে দর্শন করতে। নর্মদার ধারাকে একটা রূপালী স্রোত বলে মনে হচ্ছে, কুয়াশার জন্য দৃষ্টি চলে না, কন্‌কনে ঠাণ্ডার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতেও কষ্ট হয়। কোনমতে হাতদুটো কপালে ঠেকিয়ে দৌড়ে ফিরে এলাম বিছানায়। ভাল করে কম্বলে সারা শরীরকে ঢেকে নিচ্ছি, এমন সময় দেখলাম, পাশের ঘর থেকে আরও কিছু শুকনো ডাল এনে হরানন্দজী আগুনের চুল্লীর উপর চাপিয়ে দিয়ে ফুঁ দিতে লাগলেন। আগুন জ্বলে উঠতেই তিনি আবার বিছানায় শুয়ে কম্বল মুড়ি দিলেন। বললেন, শঙ্খিয়া খেয়েছিলাম বলে আজ রাত্রির ঠাণ্ডা কোনমতে সহ্য করতে পেরেছি। আজ রাত্রে কেবলই মহাত্মা নাঙ্গা

বাবার কথা স্মরণ পথে উদিত হয়েছে। তিনি দয়া করে শঙ্খিয়ার পুরিয়া দিয়েছিলেন বলে এই পাঁচ দিন বেঁচে আছি। এরপরে যেখানেই রাত কাটাতে হবে, সেখানে দুটো করে চুল্লী জ্বালব, চারজনের জন্য। আমি বললাম – আর ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন। ৮টা সাড়ে ৮টার মধ্যে এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। মহর্ষি সোমানন্দজীর নির্দেশ মনে আছে ত, আজ ১লা ফাল্গুন, এখান থেকে যাত্রা করতে হবে। 'আপনি কি মনে করেন, এই সুখের জায়গা ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না আমার ? তবে এস্থান আমার স্মৃতিপথে গাঁথা থাকবে, এইখানে এসে মহর্ষির কৃপা, মা নর্মদার কৃপা বেশী করে উপলব্ধি করতে পেরেছি।' হরানন্দজীর কথা শুনে প্রেমানন্দ কম্বলের ভিতর থেকেই বলে উঠলেন – আলবৎ ! একথা লাখ কথার এক কথা ! কোন মহাপুরুষ যে দেবতার আবির্ভাবের মত সহসা আবির্ভূত ও তিরোভূত হতে পারেন, শাস্ত্রে এ সব কথার পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে, সে সব কাহিনী পুনঃপুনঃ পড়েছি, কিন্তু নিজের জীবনে এই রকম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই প্রথম হল। লক্ষ্য করেছিলেন কি কাল শূন্যপথে অপ্রকট হওয়ার সময় কেমন ভাবে বিদ্যুৎ চমকের মত জ্যোতিঃ ঝলসে উঠেছিল ? '

'ওঃ, আপনাদের বক্‌বকানির জ্বালায় সকালের ঘুমটা জমে উঠল না। পৌনে আটটা বাজতে যায় ! এবারে সকলেই তৈরী হয়ে নিন' এই কথা বলতে বলতেই রঞ্জন উঠে পড়েই নিজের বিছানা গুটিয়ে বেঁধে ফেললেন। তাঁর দেখাদেখি আমরা তিনজনও নিজেদের ঝোলা গাঁঠরী বেঁধে তৈরী হয়ে গেলাম। ঘরের এক কোণায় আমাদের চারটে লাঠি পড়েছিল, এ কয়দিন কাজে লাগেনি, আজ সেগুলো হাতে তুলে নিয়ে সাদরে চুম্বন করলাম। রঞ্জন সুর করে চুমু খেতে খেতে বলে উঠল – 'ওগো, আমার সোহাগিনী, পথের সাথীগো, আমি তোমায় করিনি হেলা !'

আগুনের চুল্লীতে জল ঢেলে আমরা প্রাঙ্গণে নেমে বললাম – ডহর মুনি ! তুমি তোমার কৃতকর্মের ফল ভোগ করেছ। আমরা তার বিচারক নই। কিন্তু তোমার নির্মিত এই দুখানি কামরা ছিল বলে আমরা এইখানে এই কয়দিন নিরাপদে থাকতে পেরেছিলাম, তোমাকে নমস্কার ! শিবসুন্দর তোমাকে সদ্‌গতি দান করুন। চতুষ্পার্শ্বস্থ জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে সবাই সমস্বরে বললুম – হে সুপ্রাচীন অরণ্য ! তোমায় প্রণাম করি। শত বিস্ময়ের সৌন্দর্যভূমি তোমার মধ্যে হাজার হাজার বছর ধরে লুকানো ছিল কেউ আসে নি দেখতে, এমন কি পরিক্রমাবাসীরাও এ স্থানকে সভয়ে এড়িয়ে যান – আজ আমরা এতদিনে দেখে ধন্য হয়ে গেলাম। কম্‌প্রিটাম, ডিকেনড্রাম, আরও কত নাম-না-জানা ফুলের সুবাস আমরা উপভোগ করেছি, ময়ূরের কেকা ধ্বনি, ধনেশ পাখীর কর্কশ চীৎকার, জলপ্রপাতের জলপতন ধ্বনি, জনহীন গহন বনে এই ঘরদুটি, অপূর্বদর্শন বনাবৃত চারিদিকের এই শৈলমালা – এই দেখা শোনার, উপভোগ করবার অভিজ্ঞতা যে কত দুর্লভ তা আমরা জানি। সেইজন্য মাতা নর্মদাকে প্রণাম করছি, যিনি কৃপা করে এখানে আমাদেরকে টেনে এনেছেন। হর নর্মদে। হর নর্মদে।

এই 'হর নর্মদে' ধ্বনি দিতে দিতেই আমরা নর্মদার ঘাটে নেমে গিয়ে জলস্পর্শ করে চড়াইএর পথ ধরলাম। সাড়ে আটটা বেজেছে। সূর্যকিরণে ওপারের উত্তরতট সহ নর্মদার জলও চিক চিক করছে, তবু এখনও নর্মদার জল থেকে বাষ্পাকারে কুয়াশা উঠছে, একেবারে মিলিয়ে যাওয়ার পূর্বাভাষ। চড়াই উঠতে গিয়ে কুয়াশার জলে সিক্ত পাহাড়ের পাথর এখনও ভীষণ ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা পাথরের খাঁজে খাঁজে সাবধানে পা দিয়ে দিয়ে লাঠি ঠুকে ঠুকে উঠতে লাগলাম উপরের দিকে। শাল সেগুন বেড়াই বেড়ী এবং মহানিম গাছ থাকে থাকে উঠে গেছে উপরের দিকে। মহানিম গাছের ডালে ডালে প্রায় প্রতিটি শাখাতেই অজস্র বন্য বানর দেখলাম। আমাদেরকে দেখেই হুঁপ্ হাঁপ শব্দে এক ডাল হতে

অন্য ডালে লাফাতে লাগল। আমরা পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট লতাগাছ ধরে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পাড়াগাঁয়ের ছেলে আমি, হনুমান আমি অনেক দেখেছি, সেইরকম এদের গাত্রচর্ম ও লম্বা লম্বা লেজ হলেও, এদের মধ্যে কালো রঙের কিঞ্চিৎ খর্বকায় হনুমানও আছে অজস্র। আশ্চর্য এদেরও মুখ পোড়া। তাদের continuous চীৎকারে এবং হুঁপ হাঁপ শব্দে অতিষ্ঠ হয়ে আমরা মহানিম গাছের তলা ছেড়ে আরও উপরের দিকে উঠতে লাগলাম লাঠি ঠুক ঠুকে। প্রতিপদে আমাদের ভয় করছে, ডেহরী পাহাড়ের মত পাহাড়ের গা যদি কোথাও সোজা খাড়া দেখতে পাই, তাহলে আমরা কি করব ? আবার কি সেই রকম বুকে পিঠে ঝোলা গাঁঠরী বেঁধে হুমড়ি খেয়ে পাহাড় বেয়ে উঠতে হবে ? একস্থানে কতকগুলো বেড়াই গাছ দেখলাম। তাদের তলাগুলা কাঁটা ঝোপে ভর্তি। ডহরাশ্রমের কাছেও এই বেড়াই গাছ দেখেছি, যার কতকগুলো পাকা ফল ফাটিয়ে কাজুবাদামের মত খাবার জন্য হরানন্দজী সঙ্গে এনেছেন। হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে ঘন জঙ্গলের বেড়ী, ভূর্জ, বিল্ব, শাল, কুসুম, অকোলা দহিখেড়া প্রভৃতির ভিতর দিয়ে প্রায় সাত শো ফুট উঠে এসে একটা চুলুর গাছের তলায় দাঁড়ালাম। দূর হতে একটা বাঘের গর্জন ভেসে আসল। একদল barking deer ব্বাক্ ব্বাক্ শব্দ করতে করতে দৌড়ে গেল আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম তার প্রায় ৫০ ফুট উপর দিয়ে। বাঘের গর্জন শুনেই আমার সাথীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের চোখে মুখে সেই ভয়ের চিহ্ন দেখে তাঁদেরকে অন্যমনস্ক দেখে বললাম – আমরা প্রায় সাত / আটশো ফুট উঠে এলাম। পাহাড়ের গা সেই ডেহরী পাহাড়ের মত সোজা খাড়া ভাবে উঠে যায় নি। সেই খাড়া পাহাড়ের গায়ে কোন গাছও ছিল না, মনে আছে ত যে পাহাড়ের গায়ে শিবলিঙ্গের মত খোঁচা খোঁচা পাহাড়ের গায়ে বসানো ছিল। কিন্তু এতদূর পর্যন্ত ত আমরা ধাপে ধাপেই উঠে এলাম। সর্বত্র বড় বড় গাছ, ছোট গাছ, লতা গাছে ভরে আছে। এই পাহাড়টা মনে হচ্ছে স্তরে স্তরে বিভক্ত। তাই প্রত্যেক জায়গায় আমরা ধাপে ধাপে পা রাখার স্থান পাচ্ছি। গোটা পাহাড়টাই বোধ হয় এমনি। চলুন আবার আমরা উঠতে থাকি। হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে উঠতে লাগলেন সবাই। আমি বাবার মুখপদ্ম স্মরণ করে করে উঠতে লাগলাম। এখানে বনের পথে শাল, অশ্বত্থ বড় বড় তেঁতুল গাছ ছাড়াও অজস্র ঝোপ, ডেহরী পাহাড়ে উঠার পথে কা-মার পূজারী সেই ছত্তি জাতির পুরোহিত কুন্দনজী এক রকম কাঁটা ফলের গাছ দেখিয়ে বলেছিলেন ঐগুলো ওকড়া ফলের ঝোপ, ভীষণ কাঁটা, একবার কাপড়ে লাগলে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে, যতই হাঁটবেন, ততই বাতাস লেগে ফুলে উঠবে, শত চেষ্টা করেও কাপড় জামা থেকে তুলতে পারবেন না, কাপড় জামার ভারেই পাহাড়ী পথে বিশেষতঃ চড়াই-এর পথে উঠতেই পারবেন না, উলটিয়ে ফেলে দেবে, কাজেই যেখানেই ওকড়া ফলের ঝোপ দেখবেন, সেই গাছ থেকে শতহস্ত দূরে সরে যাবেন, ওকড়া ফলের মহিমা সাথীদেরকে বললাম। তাঁরা সাবধানও হলেন, সাবধানে পাথরের খাঁজে উঠতে লাগলেন। কিন্তু তবুও 'শতহস্ত দূরে' বললেই কি এই দুর্গম জঙ্গল পথ জুড়ে কাঁটা ঝোপকে এড়িয়ে চলা যায় ? চারজনে লাঠি দিয়ে পাপড়ি ফেলার পথে যেটুকু কাঁটা গাছ, তা ভেঙে দিলাম কিন্তু তবুও হরানন্দজীর কাপড় ও জামাতে কখন যে ঐ কাঁটা ফল বিঁধে গেছে তা কেউ বুঝতে পারি নি। চড়াই ভেঙ্গে পাহাড়ের উপর উঠতে গিয়ে হরানন্দজী নিজেই বললেন, পিঠে ভার বোধ হচ্ছে, দেখুন ত ভাই পিঠটা। একটা ছোটগাছের ডাল ধরে একটা আসান গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আমি আঁতকে উঠলাম। তাঁর জামা ও পরিধেয় গেরুয়া কাপড়ের পিছনে প্রায় ১৪/১৫টা ওকড়া ফল গেঁথে আছে। একটা আসান গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি কাপড় ও জামাটা খুলে ঝুলির মধ্যে পুরে নিতে বললাম। তিনি চটপট ঝোলা থেকে একটা গেরুয়া কাপড় ও জামা বের করে তা পরে ফেললেন। আমরা

কেবল উঠছি ত উঠছি, আশে পাশে চেয়ে দেখছি, পানজন, বট আসান, অজস্র শিমূল আর মহানিমের মোটা মোটা সুউচ্চ গাছ। আমাদের নিচের স্তরে হাতীর বৃংহন শুনে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় ১৫০/২০০ ফুট নিচের স্তরে গাছপালা ভেঙ্গে জঙ্গলকে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করে একদল বুনো হাতী গর্জন করতে করতে ছুটে চলেছে। যে আসান গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ওকড়া ফলের কণ্ঠকবিদ্ধ কাপড় জামা হরানন্দজী খুলে ফেলে ঝোলাতে গুঁজে রেখেছিলেন আমরা নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেই আসান গাছ এবং তার সংলগ্ন গাছগুলোকে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলল; তাদের বড় বড় দাঁত এবং দুর্বার শক্তির পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত হলাম। হাতী যে কি দুর্বার শক্তি ধারণ করে তা যাদের সার্কাস বা সংরক্ষিত পশুশালার হস্তী দর্শন পর্যন্ত দৌড়, তারা কল্পনাও করতে পারবে না। বুনো হাতী স্বস্থানে অর্থাৎ বনের মধ্যে বিশেষতঃ মত্ত অবস্থায় দল বেঁধে থাকে, তাদের সামনে প্রকাণ্ড বাঘও এগোতে চায় না। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে হর নর্মদে হর নর্মদে বলতে বলতে হরানন্দজী ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। বললেন, কিছুক্ষণ আগে হলে আমাদের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি অনিবার্য ছিল। বেলা সাড়ে এগারটার সময় প্রায় দুহাজার ফুট উঁচু এই পাহাড়ের মাথায় উঠে গেলাম। পাহাড় থেকে নিচে দূরের দিকে দৃষ্টি দিতেই আমরা দেখতে পেলাম, সবাই বুঝতে পারলাম মা নর্মদা বয়ে চলেছেন। আমরা সেখান হতে যুক্তকরে মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করলাম, জয় মা নর্মদা, জয় মা নর্মদা। পাহাড়ের শীর্ষদেশ হতে বুঝতে পারলাম নর্মদার সমান্তরালে পর পর আরও প্রায় দুটো ছোট ছোট পাহাড় আছে। ঘন জঙ্গলে আবৃত, বড় জোর হাজার বা বার চৌদ্দশ' ফুট উঁচু হবে। আমরা সর্বোচ্চ এই পাহাড়টার শীর্ষদেশে পৌঁছে, এইমাত্র মা নর্মদার প্রত্যক্ষ কৃপার পরিচয় পেলাম, তাতে হর্ষোৎফুল্ল অন্তরে আমরা চলার গতি বাড়িয়ে ফেললাম। আপনা হতেই যেন চলার গতি বেড়ে গেল। মা নর্মদা আছেন ভয় কি ? গতকাল রাত্রে মহর্ষি সোমানন্দ নিজের মুখেই আশ্বাস বাক্য শুনিয়ে গেছেন, আমরা যেখানেই থাকি তাঁর দৃষ্টি পথেই থাকব তা না হলে অল্পের জন্য হাতীর মুখ থেকে বাঁচলাম কি করে, আর একটু দেরী হলেই ত বুনো হাতির পদতলে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যেতাম। ছোট বড় পাহাড় ডিঙিয়ে দ্রুততালে হাঁটছি আমরা এক জায়গায় এই মালভূমিতে দেখলাম, একটা বড় পাথর বেরিয়ে আছে পাহাড়ের গায়ে। ঝর্ণার উদ্‌গম হয়েছে একটুখানি উপরে প্রায় ১০ ফুট উঁচুতে। সেই ঝর্ণার জল পড়ে পাহাড়ের উপর গর্ত হয়েছে। প্রায় শতখানিক ফুট এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, পাহাড়ে ধস নেমেছে, ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক ধস, পাথরের ডেলা হাজার হাজার টন, হাজার টন বালি কেন, লক্ষ লক্ষ টন বললেও অত্যুক্তি হবে না। মালভূমির গা বেয়ে বোধ হয় পাহাড়ের তলদেশে পর্যন্ত নেমে গেছে চূনো চূনো পাথরের স্তূপ। কোন বন্য জন্তুর তাড়া খেয়ে কেউ যদি ঐ জায়গায় পা দেয়, তাহলে আর রক্ষা নাই। সে সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে পড়বে নিচে, হুড় হুড় করে পাথরের গুঁড়ো আর ছোট বড় পাথরের ডেলা তাকে চাপা দিয়ে যে কোন অতলে গড়িয়ে নিয়ে যাবে তার হদিস্ কেউ পাবে না। দেখেই আমার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। ধ্বসের মুখে আবার একটা বড় লতাপাতার ঝোপ, সাক্ষাৎ মৃত্যু যেন এখানে সর্বগ্রাসী হাঁ বিস্তার করে ওৎ পেতে বসে আছে। বন্য জন্তু তাড়া না করলেও কেউ যদি স্বাভাবিক ভাবে হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্ক হয়ে ঐ ঝোপের কাছে পা ফেলে বসে তাহলে আর রক্ষা নাই। রঞ্জন কৌতূহল বশে ঝোপের গোড়ায় তার লাঠির ডগা দিয়ে খোঁচা লাগাতেই হুড় হুড় গড়গড় শব্দে গড়িয়ে পড়তে লাগল পাথর। প্রেমানন্দ রঞ্জনের হাত ধরে সজোরে টেনে নিয়ে গেলেন পিছনে। আমরা দ্রুত পিছিয়ে গেলাম। আমরা তিনজন মিলে যৎপরনাস্তি ভর্ৎসনা করলাম রঞ্জনকে। তখনও চূনো ছোট ছোট পাথর গড়িয়ে যাওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। একতাল পাথর গড়িয়ে গিয়ে নিচের স্তরকে যখন ধাক্কা দিচ্ছে,

তখন সেগুলোও ধাক্কা পেয়ে গড়াচ্ছে। উপরের কুচো পাথরের স্তরের ধাক্কায় গতিবেগ বেড়ে যাওয়ায় নিচের পাথরের স্তূপ গড়িয়ে যাচ্ছে আরও বেগে। পতনশীল পাথরকুচির হুড়হুড় দুড়দাড় শব্দ যেন কিছুতেই থামতে চায় না। রঞ্জন বেচারার মুখ শুকিয়ে গেছে তার স্বেচ্ছাকৃত এই ছেলেমানুষী-কাণ্ডের জন্য। আমতা আমতা করে বলল, হাতী হরিণ বাঘ কত যে হাজার হাজার বন্য জন্তু এখানে পড়ে পড়ে মারা পড়ছে, তার ইয়ত্তা নাই। গভর্ণমেণ্টের বন্য জন্তু সংরক্ষণ বিভাগ থেকে এই স্থানটাকে ঘিরে রাখা উচিত ছিল। সাধারণ লোকের প্রাণরক্ষার জন্যও অন্ততঃ কিছু একটা করা উচিত ছিল! হরানন্দজী রঞ্জনের চিবুক ধরে নাড়া দিতে দিতে বললেন – হক্ কথা বলেছেন শ্রীমান্‌জী! এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আপনি administration খুঁজছেন! এখানে হাঁটতে হাঁটতে কটা মানুষের দর্শন পেয়েছেন মহাপ্রভু! চারপাশে যতদূর দৃষ্টি যায়, জঙ্গল আর বন্য জন্তু ছাড়া মানুষজনকে কি কোথাও দেখা যাচ্ছে যে তারা এক জোট হয়ে এসে দাবী তুলবে – আমাদের দাবী মানতে হবে, নয়ত গদী ছাড়তে হবে? এখনও আপনি একেবারেই ছেলেমানুষ! খোকন সোনা! আপনি এতকাল বনে পাহাড়ে ঘুরে ফিরেও কি জানেন না যে বন্যজন্তুরা বনের নাড়ীনক্ষত্র কোথায় কি বিপদ আছে তা আপনার আমার চেয়ে বেশী জানে। এখন এগিয়ে চলুন, পাহাড় হতে নর্মদা-তীরে নেমে কোন পথ পাই কি না দেখি। আমরা প্রায় শতখানিক পথ হেঁটে একটা পাকদণ্ডী দেখতে পেলাম বাঁ দিকে। পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে ঠিক যেন টানেলের মত নেমে গেছে নিচের দিকে। আমি বাবাকে স্মরণ করে সাথীদেরকে বললাম – মা নর্মদাকে স্মরণ করে এই পথে নেমে যাই চলুন, মধ্যাহ্ন হতে যায়। এই পাকদণ্ডী আমাদেরকে কোথায় নিয়ে পৌঁছাবে তা আমার জানা নাই। এ পথে কখনও আসিনি। আপনাদের মত আমারও এ পথ অজানা। আপনারা যে যার ইষ্টদেবকে স্মরণ করে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করুন। এই বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মিনিট দুই পরে তাঁরা বললেন – যা করেন মা নর্মদা। এই পথেই নামা যাক্। এই বলে হরানন্দজীই সর্বপ্রথম হর নর্মদে ধ্বনি তুলে সেই পাকদণ্ডীর পথে পা বাড়ালেন। পিছনে পিছনে আমরাও চললাম। লাঠি ঠুকে ঠুকে সাবধানে পা ফেলে ফেলে আমরা পাকদণ্ডীর পথে নামতে লাগলাম। পথ এমন ঢালু যে একপা এগোলেই চার পা টেনে নিচ্ছে, কেউ যেন ঠেলে দিচ্ছে পিছন থেকে। চলার দিকে লক্ষ্য রেখে টাল সামলাতেই ব্যতিব্যস্ত লাঠি ঠুকে ঠুকে, লাঠির উপর সম্পূর্ণ ভর দিয়ে, ক্রমে নিম্ন পাহাড়ী ঢালের পথে নামতে মন না দিলেও স্বাভাবিক ভাবে কম্‌প্রিটান লতা বন্য কন্দ বন্য অশ্বগন্ধা এবং আরও কত কি যে গাছপালা চোখে পড়ল তার বর্ণনা দেওয়া যায় না। এই ঢালু পাকদণ্ডীর পথে অন্ততঃ সাত আটটা জায়গায় পাহাড়ের গা চুইয়ে জল জমে আছে তাও দেখলাম। হর নর্মদে ধ্বনি দিতে থাকলাম ঘণ্টাখানিক ধরে হেঁটে যখন উপত্যকায় এসে পৌঁছলাম, অবারিত প্রস্তরময় উপত্যকা এবং নর্মদাকে দেখে প্রাণ জুড়ালো। আমরা বুঝলাম যে পেঁড্‌রাতে এসে পৌঁছে গেছি। ৩টি পাহাড়ী মেয়ে এবং দুটি পাহাড়ী লোককে নর্মদার ঘাটে দেখতে পেয়ে হরানন্দজী ছুটে গেলেন তাদের কাছে। মিনিট তিনেক পরে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললেন – ওরাও আমার ভাষা বোঝে না, আমিও বুঝি না তবুও তাদের কথা থেকে যা বুঝলাম যে এখান থেকে মাইল চারেক হেঁটে গেলেই আমরা দমখেড়াতে পৌঁছে যাবো। ওরা ভীল, দূরে বা কাছে কোথাও না কোথাও ভীলদের গ্রাম আছে। ঘাটটা ভাল, ওরা ঘাটে থাকতে থাকতেই ওখানে আমাদের স্নান করে নেওয়া ভাল। যত তাড়াতাড়ি স্নান করে নিয়েই আমাদের চলে যাওয়া ভাল। জাতে ভীল ত! নিষ্ঠুর লুটেরা! মহল্লায় পৌঁছে খবর দিবার আগেই আমরা চম্পট দিতে পারলে বেঁচে যাই, তাছাড়া এখানে থাকবই বা কোথায় এই প্রচণ্ড শীতে? চলুন চলুন ঘাটে চলুন। তিনি এমনভাবে তাড়া

লাগাতে লাগলেন যে, আমরা শশব্যস্তে ঘাটে নেমে স্নান ও সংক্ষেপে তর্পণ সেরে নিতে বাধ্য হলাম। স্নান সেরে নিয়েই আমরা হাঁটতে লাগলাম দ্রুততালে। নর্মদার তটে সারি সারি পাহাড়। ঘাটে স্নানরত ভীলদের কাছে মারাত্মক অস্ত্র কামটা ও তীর ধনুক দেখেছিলাম। আমাদেরকে কতকটা সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিবার জন্যই তারা বলেছিল, পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে 'বহুৎ শের' আর 'বহুৎ ভাল্লু' আছে। উত্তরতটের দিকে হাত বাড়াতে তারা বলেছিল – হঁপে হঁপে হাপেশ্বর। আমরা ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পাহাড়ের গা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাপেশ্বরের গল্প করতে লাগলাম। হরানন্দজী তাঁর ঝোলা থেকে বেড়াই ফলের বীচি হতে সযত্নে সংগৃহীত সেই কাজু বাদামের মত সুস্বাদু বীচি সকলের হাতে দিলেন। আমরা বীচি চিবাতে চিবাতে, সাবধানে ছোট বড় পাথর ডিঙ্গাতে ডিঙ্গাতে গল্প করতে লাগলাম। হাপেশ্বর মহাদেবের গল্প। আমি বললাম – উত্তরতট পরিক্রমার সময় উত্তরতটের ঐ হাপেশ্বর বা হংসেশ্বর তীর্থ দর্শন করে এসেছি। দুর্দান্ত জঙ্গল। উত্তরতটের দিকে তাকিয়ে দেখুন ধনুকাকৃতি অর্ধ বক্রাকারে পর পর কতকগুলি পাহাড় দেখা যাচ্ছে। ঐখানকার একটি পাহাড়ের উপর অতি প্রাচীন পাথরের মন্দিরে হাপেশ্বর বা হংসেশ্বর মহাদেব বিরাজমান। বিশাল মন্দির। মন্দিরে খাম্বাই আছে ২২টা। পরিক্রমার পথে ঐ মন্দির থেকে ৪ মাইল উত্তরে দেবলি গ্রাম থেকে হেঁটে বাণগঙ্গা নদীর সংগম অতিক্রম করে এসে ঐ হাপেশ্বর মন্দিরে দুদিন বিশ্রাম করেছিলাম। মন্দির থেকে মাইল খানিকের মধ্যে পর পর দুটি পাহাড়ী গ্রাম আছে, তাদের একটির নাম শাকরজা আর একটির নাম অঞ্জনবার। হাপেশ্বর মন্দিরে থাকা কালে আমরা ঐ দুটি পাহাড়ী গ্রামে ভিক্ষা করতে যেতাম। ঐ হাপেশ্বর মহাদেবের ক্ষেত্র বরুণের তপস্যা স্থল।

শাল, মহানিম, পানজ্বেল, বটগাছ এবং ঝোপঝাড় এই জঙ্গলে বেশী। পথ মোটেই ভাল নয়। পাহাড়ের গায়ে রাস্তা বলে কত শত যে ছোট বড় পাথরের চাঁই পড়ে আছে তার ইয়ত্তা নাই। লাঠির উপর ভর দিয়ে কোথাও বা পাথরের চাঁইগুলো ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যেতে বড় কষ্ট হচ্ছে। যে পর পর দুটো পাহাড়ের গা দিয়ে যাচ্ছি, সেই দুটো পাহাড়ই ১২/১৪শ ফুটের বেশী উঁচু নয়। পথের মধ্যে পর পর তিনটা ঝোপ দেখে হরানন্দজী বললেন – আর ৭০/৮০ ফুট চড়াই ভেঙ্গে উপরে উঠে গেলেই ত আমরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যেতে পারি, দেখলে হত, পাহাড়ের উপর মালভূমির রাস্তা হয়ত অপেক্ষাকৃত ভাল হতে পারে। এই ঝোপের পাশ দিয়ে যেতে আমার ভয় করে। আবার যদি কাপড় জামায় লাগে ত যন্ত্রণার একশেষ হবে। আমি বললাম – আর পাহাড়ের চূড়ায় উঠে বিক্রম দেখিয়ে লাভ নেই মশাই সাড়ে ৩টা বেজে গেছে। সাড়ে চারটা বাজতে না বাজতেই পাহাড়ের জঙ্গলে সন্ধ্যা নেমে আসবে, তখন দুর্দশার একশেষ হবে। ঐ ঝোপগুলোর মধ্যে আমি ভালভাবেই লক্ষ্য করেছি, ঝোপঝাড়ের মধ্যে ওকড়া ফলের গাছ নাই। সকলে মিলে দুপাশে লাঠি ঝাপটাতে ঝাপটাতে কোনমতে পথটুকু পেরিয়ে যাই চলুন। এই পথে ছোট বড় পাথরে সমাকীর্ণ হলেও এই পথে মানুষের চলাচল আছে বলে মনে হচ্ছে। কারণ, অনেক জায়গায় পাথরের গড়াগড়ি দেখে মনে হচ্ছে চলার পথ একটু পরিষ্কার করার জন্যই ঐ পথের পাথরগুলো যেন কেউ সরিয়েছে। আমি যে ঐ উত্তরতটের হাপেশ্বরকে বরুণের তপস্যাস্থল বলে বললাম ঐ বরুণ সম্বন্ধে কিছু গল্প বলি শুনুন, গল্প শুনতে শুনতে পথ চললে পথ চলার কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে। ঝোপে লাঠির আঘাত আছড়াতে আছড়াতে রঞ্জন বলল – বরুণ যে জলের দেবতা, সে আমরা সবাই জানি, তাঁর মধ্যে আবার নূতন কি বিশেষত্ব থাকতে পারে?

– বরুণ জলের দেবতা বলে প্রসিদ্ধ হলেও তিনি দশ দিকপালের অন্যতম একজন দিকপাল। সূর্য তাঁর একটা নেত্র, সুবর্ণময় তাঁর রথ ও প্রাসাদ। তাঁর বহু অনুচর। ইনি

বারুণী নামে সুরা পান করেন। এই সুরা সমুদ্র মন্থন হতে উত্থিত হয়েছিল। বেদে বরুণ সহস্র লোচন নামে বন্দিত হয়েছেন। বেদে বহুস্থলে মিত্রাবরুণ নামে পূজিত হন। মিত্র হলেন আলোকের দেবতা। বরুণ শব্দের অর্থ আবরণ বা আবৃত করা। আবরণকারী আকাশকে আর্য ঋষিরা বরুণ নামে পূজা করতেন। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ২৫তম সূক্তে অজীর্গতের পুত্র শুনঃশেপ ঋষির দৃষ্ট ২১টি মন্ত্র আছে। তার দুটি মন্ত্রে বরুণ কি ভাবে স্তুত হয়েছেন শুনুন –

ইমং মে বরুণ শ্রুধি হবমদ্যা চ মৃলয়। ত্বামবস্যুরা চকে॥ ১৯

– হে বরুণ। আমার এই আবাহন বাক্য শ্রবণ কর, আজ আমাদেরকে সুখী কর। তোমার কাছে রক্ষণাবেক্ষণ প্রার্থী হয়ে আজ আমরা তোমাকে ডাকছি।

ত্বং বিশ্বস্য মেধির দিবশ্চ গ্মশ্চ রাজসি। স যামনি প্রতিশ্রুধি॥

– হে মেধাবী বরুণ! দ্যুলোকে ভূলোকে এবং সমস্ত জগতে দীপ্যমান হয়ে রয়েছে। আমরা তোমার কাছে ক্ষেম প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করছি।

মন্ত্রপাঠের পর দুমিনিটও কাটে নি হঠাৎ টিনের কেনেস্তারা বাজানোর শব্দ এবং একদল লোকের হৈ হৈ শব্দ, চারদিকে একটা হুল্লোড় ধ্বনি শুনে আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভয় পেয়ে থমকে গেছি সবাই, এমন সময় দেখলাম পাহাড়ের উপর থেকে পাথর সহ হুড়হুড় করে গড়িয়ে পড়ছে একটা বিদঘুটে কালো রঙের বীভৎস কোন জন্তু। আমরা চারজনে লাফ দিয়ে সরে দাঁড়ালাম দৌড়ে গিয়ে একটা বটগাছের তলায়, ঝুরির আড়ালে। পাথরগুলো এমনভাবে উপর থেকে সজোরে ছিটকে আসছে যে, তার যে কোন একটা গায়ে পায়ে মাথায় এসে লাগলে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য।

এক মিনিট যেতে না যেতেই একটা বিরাট ভালুক, রক্তাক্ত অবস্থায় ধমাস্ শব্দে উলটে পড়ল আমাদের চলার পথের উপর। সর্বাঙ্গ রক্ত মাখামাখি ত বটেই, ভালুকটার মুখ দিয়েও ঝলকে রক্ত উঠছে। সেই বিকট ও বীভৎস দৃশ্য দেখে আমরা হতভম্ব হয়ে পড়লাম। ভালুকটার গায়ে ২/৩টা তীর বিদ্ধ হয়ে আছে। পাহাড় থেকে গড়াতে তীরের ডগাগুলো ভেঙে গেছে বটে, তবে তার গায়ে যে কেউ তীর বিদ্ধ করেছে, তা আমরা বুঝতে পারলাম। চারজন পাহাড়ী যুবক তদ্দণ্ডে দৌড়ে এসে হাজির হল সেখানে। তারা মৃত ভালুকটাকে পায়ে করে গড়িয়ে দিল পাহাড়ের ঢালের দিকে। ঝুরির আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। হরানন্দজী ভয়ার্ত কণ্ঠে হিন্দীতে তাদেরকে বললেন – হমলোগ পরকরমাবাসী। তাদের মধ্যে যে বয়সে প্রবীণ, সে ভাঙা ভাঙা খোড়িবোলি দেহাতী হিন্দিতে বক বক করে যা বলল, অনেক কষ্টে যা বুঝলাম, তারা আমাদেরকে বোঝাতে চাইছে যে আমরা দমখেড়া মহল্লাতে এসে পৌছেছি। জলের যে বিরাট গর্জন কানে ভেসে আসছে, তা হল খাড়া নদীর সঙ্গম। খাড়া নদী এবং নর্মদার সঙ্গমস্থলের পাশেই দমখেড় গ্রাম। আজ ঐ ভালুক দুপুরবেলা তাদের মহল্লার একটা ১০/১২ বৎসরের বালককে নখে চিরে মেরে ফেলেছে, সেই থেকেই তারা নানা স্থানে অনুসরণ করতে করতে পাহাড়ের উপর মহুয়া গাছের জঙ্গলে তাকে দেখতে পেয়ে তীর বিদ্ধ করে। তারা আরও জানাল যে, তারা ওয়াঙ্কি, ভীলদের মত লুটেরা নয়। বুড়ো হাত জোড় করে তাদের মহল্লায় আজ রাত কাটাবার জন্য আবাহন জানাল। রাত্রি নেমে আসছে, এই অন্ধকার এই জঙ্গলের পথে আর কোথায় বা যাবো। হরানন্দজী সম্মতি জানাতেই তারা আমাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে চলল। তাদের নির্দেশমত আমরা চড়াই-এর পথে আরও কতকটা উঠে যেখানে খাড়া নদীর উদ্গম হয়ে জল কম সেই স্থান চারজনের হাত ধরে পার করে তাদের মহল্লাতে নিয়ে এল। সঙ্গম ক্ষেত্রে বড় বড় boulder গিয়ে এমনভাবে প্রবল গর্জনে হুড় হুড় দুড়দাড় শব্দে পড়ছে যে, কানে তালা লাগার জোগাড়! এতক্ষণে যেন আমাদের হুঁস এল, ঘোর

কাটলো, যেখানে আচম্বিতে বিশালকায় মিশ্‌কালো দৈত্যাকৃতি ভালুকটা আমাদের সামনে এসে পড়েছিল, সন্ধ্যার মুখে অকস্মাৎ সেই কাণ্ড ঘটায় আমরা কিছুক্ষণের জন্য যেন বোধ বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাই খাড়া সঙ্গমের এই প্রবল গর্জনও আমরা শুনতে পাই নি। সেই লোকগুলি আমাদেরকে একটি প্রশস্ত মাটির ঘরে ঢুকিয়ে চাটাই পেতে দিল বসতে। আমরা মোমবাতি জ্বালালাম। একটু পরেই দুজন বৃদ্ধ এল, তাদের বিনত প্রণামের মুদ্রাটি লিখে বুঝানো যাবে না, সম্মার্জনী মুদ্রার ঢং-এ তিনবার বিচিত্র ভঙ্গীতে দুহাতের দুটি তর্জনীকে কপালে ঠেকিয়ে সম্মান ও অভ্যর্থনা জানাল তারা। অনুমান করলাম, এরাই বোধ হয় ওয়াস্কিদের সর্দার স্থানীয় মুখ্য ব্যক্তি। একটু পরেই তিন কুঁদা ঈষদুষ্ণ গরম জল এনে দিল তিনটি মেয়ে। সর্দাররা হাত পা মুখ ধুয়ে নিতে ইঙ্গিত করল আমাদের। প্রচণ্ড শীতে মা নর্মদার দয়ায় অভাবিতভাবে গরম জল পাওয়ায় হাত পা মুখ ধুয়ে আমাদের খুব আরাম হল। সর্দারকে বহুতর ধন্যবাদ জানিয়ে হরানন্দজী তাঁদেরকে বিদায় দিলেন। তাঁরা চলে যাবার সময় বাইরে কাঠের টুকরো টুকরো ফালি বসানো দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেল। গাঁঠরী খুলে আমরা যে যার বিছানা পেতে নিলাম। হরানন্দজী বললেন – পাহাড়ী পথে পরিক্রমা করার সময় ৮ মাইলের বেশী চড়াই উৎরাই করে হাঁটতে নাই বলেছিলেন গুরুদেব। আমরা ভীলদের ভয়ে পেঁড্‌রা থেকে একটানা আজ বার তের মাইল হেঁটে আসতে বাধ্য হলাম। তবুও ত মা নর্মদার দয়ায় এই ভয়ঙ্কর পথে আমরা কোন বিপদের মুখে পড়ি নি। এখানে এসে গরম জলও পেলাম। আমার একটা ভুল হয়ে গেল, এখানে দু তিনদিন আগে আমাদের হিরন্ময়ানন্দজীর দল অর্থাৎ আমাদের বেশভূষাধারী কেউ এসেছিল কিনা, জিজ্ঞাসা করে নিলে ভাল হত। আমি বললাম – ঘরের দেওয়ালে চকখড়িতে দেখছি অনেক নাম লেখা আছে, দেবনাগরী অক্ষরে। মোমবাতিটা তুলে নিয়ে পড়ে দেখুন না। যদি আমাদের দলের কারও নাম পাওয়া যায়। তবে আমি নিশ্চিত জানি, কারও নাম ঐ দেওয়ালে খুঁজে পাবেন না। কারণ সোমানন্দজী যখন বলেছেন ভুচেগাঁওতে গিয়ে তাঁদের খবর মিলবে, তখন তার আগে তাঁদের কোন হদিস্‌ পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। যে মেয়েরা আমাদেরকে গরম জল দিয়ে গেছল, তারা একটা আগুনের চুল্লী জ্বেলে দিয়ে গেছল। আমরা তিনজনে হাত পা পিঠ ও বিশেষ করে প্রত্যেকের হাঁটু দুটোতে সেঁক নিতে লাগলাম। হরানন্দজী মোমবাতিটা হাতে নিয়ে চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেওয়ালে চকখড়িতে দেবনাগরীতে লেখা নামগুলো অনেকক্ষণ ধরে পড়ে হতাশ হয়ে বললেন – নাঃ! আমাদের দলের দণ্ডী সন্ন্যাসীদের কারও নাম খুঁজে পেলাম না। তবে বুঝা যাচ্ছে, সব নামই সন্ন্যাসীদের নাম, তীর্থ, আশ্রম, ব্রহ্মচারী, ভারতী, সরস্বতী প্রভৃতি উপাধি বিশিষ্ট। তবে আমার আশা পূর্ণ হোক আর না হোক, একটি সারগর্ভ দোঁহা এখানে কেউ লিখে গেছেন, শোনাচ্ছি শোন সবাই –

ফিকির সব কো খা লিয়া ফিকির জগৎ কো পীর।
যো ফিকির কো ফাঁকা করে উসকো নাম ফকীর॥

– অর্থাৎ ভাবনা চিন্তা মানুষকে নষ্ট করে, চিন্তাই সকলের গুরুস্বরূপ। যে লোক এই অনর্থকারী চিন্তাকে ধ্বংস করতে সমর্থ হয়, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ফকির বা সাধু।

– 'তাহলে আপনি সাধু হয়ে আর ভাবনা চিন্তা করছেন কেন দল ছাড়া সাধুদের জন্য। এখন বিছানায় শুয়ে সর্বচিন্তাহারিণী নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ি আসুন।'

– থামুন, থামুন, ঐ পাশের দেওয়ালে আর একটা দোঁহা লেখা আছে, পড়ে শুনাই শুনুন –

বিনা ভাগসে জগ সুখ কাঁহা মোক্ষ নেহি হোয়।
ভোগ মোক্ষ যো নর চাহে পুণ্য কামাবে সোয়॥

অর্থাৎ সৌভাগ্য ছাড়া কেউ জগতে সুখলাভে সমর্থ হয় না ং মোক্ষ ত দূরের কথা ! যে ব্যক্তি ইহলোকের সুখভোগ বা মোক্ষ কামনা করে সে পুণ্য কর্ম করা প্রয়োজন, কারণ পুণ্যফল ছাড়া কদাচ সুখ ভাগ্যে জোটে না ।

'বড় খাঁটি কথা ! বড় খাঁটি কথা ! তার চেয়েও খাঁটি কাজ হবে এক পুরিয়া করে শঙ্খিনী খেয়ে এখন ঘুমিয়ে পড়ি আসুন । শঙ্খিনী না খেলে শীতের কামড় আর সহ্য করা যাবে না, গা হাতের ব্যথাও মরবে না' – প্রেমানন্দের কথা হাসতে হাসতে হরানন্দজী মোমবাতিটি ভাল করে বসিয়ে দিয়ে সকলের হাতে এক পুরিয়া করে শঙ্খিনী দিলেন । আমরা শঙ্খিনী সহ পেট পুরে জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম ।

এক ঘুমেই সকাল হল । রঞ্জনের ঘড়িতে তখন ৭টা বেজেছে । দরজাটা ঈষৎ ঠেলে দেখলাম বাইরে প্রচণ্ড কুয়াশা । গাছ, পাহাড়, রাস্তা ঘাট দেখে মনে হল রাত্রে যেন বৃষ্টি হয়েছে । চারদিক ভিজা ভিজা । আসলে বৃষ্টি হয় নি, সারারাত্রি ধরে শিশির পড়ে এই অবস্থা । দরজা বন্ধ করে চুপ করে সবাই বসে থাকলাম । পৌনে আটটা নাগাদ চারদিকে সূর্যোদয়ের আভাস ফুটে উঠল । আমরা কমণ্ডলু ও গামছা হাতে নিয়ে প্রাতঃকৃত্য ও স্নান করতে চলে গেলাম । সঙ্গমস্থলের কর্ণপটহ বিদারী প্রচণ্ড গর্জন, জব্বলপুরের ধুঁয়াধারের মত অজস্র জল বিন্দু ছিটকে আকাশে উঠে চারদিক ধোঁয়ার মত সৃষ্টি করেছে । প্রাতঃকৃত্য সেরে সঙ্গমের জলে কমণ্ডলু বারবার ডুবিয়ে গায়ে মাথায় ঢেলে কোনমতে স্নান তর্পণ সেরে নিলাম । পাহাড়ের উপর দিয়ে তখন সূর্যের আলো সমগ্র মালভূমি এবং উপত্যকা অঞ্চলকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে । আমরা আমাদের আশ্রয়স্থলে এসে জামাকাপড় চড়িয়ে ঝোলা গাঁঠরী বেঁধে ফেলেছি, এমন সময় কয়েকজন তরুণ ও বৃদ্ধ একটা বড় চেঙ্গারীতে কতকগুলো কচি বাঁশের কোঁড়া এবং বড় বড় ডাবের মত গোটা চারেক বেল নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন এসেই কালকের মত তাদের বিশিষ্ট পদ্ধতিতে দণ্ডবৎ জানিয়ে তাদের আনা চেঙ্গারীর দ্রব্য গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন । তাঁদের মধ্যে একজন তরুণ এগিয়ে এসে পরিষ্কার হিন্দীতে বললেন যে এই দমখেড়াতে এগারশ ওয়াক্কি বাস করে । তিনি এখানের স্কুলের হেডমাষ্টার । এটা তাদের পঞ্চায়েৎ গৃহ, বিচার পঞ্চায়েতও হয়, আবার পরিক্রমাবাসী মহাত্মারা এই পথে এসে পড়লে তাঁদেরকে এখানে থাকতেও দেওয়া হয় । আগে আপনারা ঘরের মধ্যে ঢুকে কিছু খেয়ে ফেলুন, খেয়ে বেরিয়ে এলে পথের হদিস্ দিব, এমনকি আমাদের চারজন সঙ্গে গিয়ে পাহাড়ী পথে কতকটা এগিয়েও দিয়ে আসব । গতকাল সারা পথ কেবল বেড়াই গাছের ফল চিবিয়ে কেটেছে, সবাই ক্ষুধার্ত । কাজেই আমরা দ্বিরুক্তি না করে ঘরের মধ্যে ঢুকে আগে বাঁশের কোঁড়া চিবাতে বসলাম । রঞ্জন বলল – এ জিনিষ কখনও খাই নি, পেটে গিয়ে কোন বিপ্রক্রিয়া করবে না ত ? আমি বললাম – আমি গাঁয়ের ছেলে, গ্রামের সাঁওতাল ডোমদের ছেলেপুলেকেও এই কোঁড় চিবিয়ে খেতে দেখেছি । বাঁশ বনে যখন কচি বাঁশ জন্মায়, তখন তার গোড়া খুললেই সাদা মত এই রকম শাঁস বেরোয় । বুনো লোকেরা তা খায় । এই দুর্গম পাহাড়ে লুচি মোণ্ডা আর কোথায় পাবে ? এই বলেই আমি কোঁড়াতে কামড় লাগালাম । আমার দেখাদেখি সকলেই খেলেন । তারপর বেল খেলাম । এতবড় বেল এর আগে কোথাও দেখিওনি, খাইওনি । খুবই সুস্বাদু । এর একটা খেলেই পেট ভরে যায় । বেল তারা ফাটিয়েই এনেছিল । পরম পরিতৃপ্তি সহকারে ফলাহারের পাট চুকিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেই হরানন্দজী এইবার পথের হদিস্ জানতে চাইলেন । তাদের সেই মাষ্টারমশাই হিন্দীতে উত্তর দিলেন – 'হিয়াসে করীব ছ'সাত মিল যানেসে ভূচেগাঁও মে পৌছেগা । পাস মে নষ্টা চৌকী ভি হ্যায় । মার্গ পাহাড়ী ঔর জঙ্গল কা হৈ । মার্গ মেঁ সাদরী মহল্লা হ্যায় উধর হামারা জাত-বিরাদর ওয়াক্কি লোক হ্যায় । ইধর ভীলকা কোঈ ডর নেহি, লেকিন্ হিংস্র জন্তু ত হ্যায়ই হ্যায় । উহ মহল্লা পশ্চিম খান্দেশ জিলা কী আখেরী সীমা হ্যায় । এই বলে দেওয়ালে একটা রেখা টেনে পথের চেহারা যা দেখাল, তা দেখতে আমাদের বাংলা অক্ষরের 'দ' এর মত ।

মাথায় ঝুটি বাঁধা, তাতে ময়ূরের পালক গোঁজা, গায়ে একটা লাল জামা, বগলে একটা কাঁথা গুটিয়ে বাঁধা পুটলি নিয়ে, কাঁধে তীর ধনুক এক ভীমকান্তি যুবককে দেখিয়ে তাদের সর্দার তাদের ভাষায় আমাদেরকে বুঝিয়ে দিল যে, সেই যুবক আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ভুচেগাঁও। সেখানেই তার কুটুমবাড়ী। তার ২/১ দিনের মধ্যেই সেই কুটুমবাড়ী যাওয়ার কথা ছিল। পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলে আমাদের যাওয়ার সুবিধা হবে বলে সর্দার বুঝিয়ে সুঝিয়ে আজই তাকে আমাদের সঙ্গী করে দিল। এই পাহাড়ীদের এইরকম বদান্যতা দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমরা বন্য পাহাড়ীদের কাছে এতখানি মহানুভবতা আশা করি নি। বারবার হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে মা নর্মদাকে প্রণাম করে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানালাম – ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে – মায়ী ইন লোগোঁকা আচ্ছা করেঁ, ভালা করে। সর্বে সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ। আমাদের এই ভাষা তাদের বুঝা সম্ভব নয় তাই হিন্দী-জানা মাষ্টারমশাই সমবেত ওয়াক্বিদেরকে আমাদের বক্তব্যের সারমর্ম বুঝিয়ে দিল। তারা উল্লাস ধ্বনি করে উঠল। তাদের সেই মাষ্টারমশাই যদি আমাদের বক্তব্য না বুঝিয়ে দিত, তবুও তাদের মুখচোখের অভিব্যক্তি দেখে বুঝতে পারছিলাম যে তারা আমাদের অন্তরের গদগদ ভাব দেখে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। আমাদের যে মনীষী বাঙালী সাহিত্যিক বলে গেছলেন যে ভাষা যেখানে মূক, ভাব সেখানে মুখর হয়ে ওঠে, সে কথা যে কত মূল্যবান, তা আমরা আজ অনুভব করলাম।

বেলা ১০টা বেজেছে, আমাদের যাত্রা শুরু হল। আমরা বেশ কতকটা গিয়ে পিছন ফিরে দেখি যে পাহাড়টায় আমরা উঠব, তার তলা পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে আছে তারা। আমরা সকলেই হাত নেড়ে তাদেরকে বিদায় জানালাম। তারাও হাত নাড়ল দেখতে পেলাম। পাহাড়ে চড়াই সুরু হল। পাহাড়টা ঘন বনে আচ্ছন্ন। কত যে শাল বেল অশ্বত্থ মহুয়া বেড়ালি ও বেড়ী গাছ তার ইয়ত্তা নাই। পাহাড়টা খাড়া উঠে গেছে উপর দিকে, খাড়া হলেও সিন্দূরী পাহাড়ের মত খাড়া দেওয়াল নয়। থাকে থাকে উঠে গেছে। তার ফলে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে পা রাখার সুবিধা হচ্ছে। বড় বড় বনস্পতির তলায় অজস্র ছোট ছোট নানা জাতীয় গাছ। আমরা সেই সব ছোট ছোট গাছের ডালে হাত দিয়ে, কখনও বা কোনটার আগা ধরে উঠতে লাগলাম। যে কায়দায় আমাদের পথ প্রদর্শক বীর দর্পে উঠে যাচ্ছে পাহাড়ের উপরে, তা দেখলে চমক লাগে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের পাহাড়ে উঠা কদাপি যে সম্ভব নয়, তা কিছুক্ষণ হেঁটেই বুঝতে পারলাম। আমরা চড়াই পথে উঠতে উঠতে এমন এক জায়গায় পৌছলাম, যেখানে শুধুই মহানিম এবং পিপলাস গাছের সারি। ছোকরা প্রায় ৫০ ফুট উপরে উঠে হাঁটু গেড়ে বসে কোন কিছুকে লক্ষ্য করে ধনুকে তীর জুড়ে তাক বা নিশানা করছে দেখতে পেলাম। আমরা ছোট ছোট ডালপালা ধরে আঁচড় পাঁচড় করে পাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম, তখন সে তীর ছুঁড়ে দিয়েছে। তার বিষাক্ত তীর গিয়ে বিঁধেছে প্রকাণ্ড ভয়াবহ একটা ময়াল সাপের মাথায়। তার তীর ময়াল সাপের মাথাটাকে গেঁথে ফেলেছে একটা মহানিম গাছের ডালে। সাপটা তার প্রায় ১০ হাত লম্বা দেহটাকে ঝুলিয়ে ছটপট করছে। এত বড় এত মোটা ময়াল সাপ আমরা জীবনে দেখি নি। ছোকরা আমাদেরকে পিছনে ফিরে দেখতে পেয়েই হরানন্দজীর হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে থাকল উপর দিকে। আমরাও পরস্পর হাত ধরাধরি করে পড়ি কি মরি করে হোঁচট ও পাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে হাঁটতে লাগলাম। মিনিট চল্লিশেক এইভাবে হাঁটার পর আমরা পাহাড়ের শীর্ষদেশে মালভূমিতে পৌছলাম। আমাদেরকে প্রচণ্ডভাবে হাঁপাতে দেখে ছোকরা

আমাদেরকে ইঙ্গিত করল কিছুক্ষণের জন্য সেখানে বসতে। 'ময়াল সাপের কথা আমরা বই-এ পড়েছি' – বললেন প্রেমানন্দ, 'এই সাপ যে কোন বড় গাছের ডালে নিজের দেহ মিশিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে। পাশাপাশি যে কোন অন্যগাছের ডালপালার পত্রান্তরালে নিজেকে ঢেকে রাখে। সেই গাছের তলা দিয়ে মানুষ ত দূরের কথা বাঘ হাতী গেলেও তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে পাক দিয়ে দিয়ে এমনভাবে জড়িয়ে চাপ দেয় যে, কোন জীবের সাধ্য নাই, তার করালগ্রাস থেকে রক্ষা পায়। উপর থেকে মা নর্মদা বয়ে যাচ্ছেন দেখতে পেলাম। আমাদের সকলেরই বুক টিপ টিপ করছে ভয়ে, কেবল সেই ধনুর্ধর যুবকই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার কোন ভয় ডর আছে বলে মনে হল না, কোন হেলকম্প নাই। সে আবার হাঁটতে আরম্ভ করল বাঁ দিকের রাস্তা ঘেঁসে। বেলা ১২টা বেজে গেছে, প্রায় চার পাঁচশ ফুট সমতল স্থানে হেঁটে আবার চড়াই এর পথে হাঁটতে লাগল। আমরাও তার পিছন পিছন চড়াইএর পথে উঠতে লাগলাম। একই রকম ঘন জঙ্গল, চুডুল বেড়ালি বেড়ী শালগাছই বেশী। প্রায় ঘন্টাখানিক হেঁটে এক জায়গায় পাথর ভেদ করে তর তর করে উঠছে জল, সেই বয়ে চলেছে একটা পথ ধরে ঝর্ণার রূপ নিয়ে। সেই ঝর্ণার গতিপথের পাশ দিয়ে সেই পাহাড়ী যুবক উৎরাই-এর পথে নামতে লাগল। আমরাও নামছি। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে অনুমান করলাম এই পাহাড়টা ১৫০০ বা ১৬০০ ফুট উঁচু নিশ্চয়ই হবে। হরানন্দজী একটা পাথর ছুঁড়ে মারলেন নিচের দিকে, প্রায় ১০ সেকেণ্ড পরে তার প্রথম পতনের শব্দ পেলাম, তারপর গুরু গম্ভীর শব্দে গড়াতে গড়াতে যেন কোন অতলস্পর্শ গহ্বরে গিয়ে পড়ল। মাথা নিচু করে সেইখানে দাঁড়াতে সহসা মাথাও শরীর টলটলায়মান হয়ে উঠে, কেবলই মনে হয় মাথা ঘুরে পড়ে যাবো ঐ অত্যন্ত নিচু উপত্যকার মেঝেতে, যেখানে শালবন, বাঁশ ঝাড় আরও কত কি গাছের মাথা ছোট ছোট ঝোপের মত দেখা যাচ্ছে। আমরা সেই ঝর্ণা পথে, পাহাড়ের পাকদণ্ডী পথে প্রায় ঘণ্টাখানিক হেঁটে দেখতে পেলাম সামনের উপত্যকাভূমি নিবিড় সবুজ মেষলোমের মত বৃক্ষ শীর্ষে ভর্তি। নর্মদার গতিপথও দেখতে পেলাম। যে ঝর্ণাটা আমাদের পাশে পাশে বয়ে চলেছে, তার বিস্তার অনেকখানি বেড়ে গেছে। সেই ছোকরার কথায় এইটুকু শুধু বোঝা গেল যে, যেটাকে ঝর্ণা বলে ভাবছি, ওটা আসলে নদী – উদী নদী। নর্মদার উত্তরতটের দিকে তাকিয়ে দেখি ওপারে স্তরে স্তরে উঠেছে শৈলশ্রেণীর পেছনে শৈলশ্রেণী, সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত।

উপত্যকার ভূমিতে নেমে উদী নদীর বিস্তার যেখানে কম, জলও কম, সেইখানে পার করিয়ে ডান দিকে বেঁকে ১৫ মিনিট হাঁটিয়ে একটা গ্রামে পৌঁছে, সেই ছোকরা বলল – ভূচেগাঁও। চারদিকে দৃষ্টি দিয়ে মনে হল এখানে বোধ হয় দেড় দুহাজার লোকের বাস। অজস্র কুঁড়ে ঘর। ছোকারার শ্বশুর ঘর এখানে, সে পল্লীর মধ্যে একটা অশ্বত্থ গাছের তলায় দাঁড় করিয়ে হন্ হন্ করে পল্লীর বস্তির মধ্যে ঢুকে গেল। একটু পরেই মহল্লার সর্দারকে সঙ্গে করে আনল। সর্দার দমখেড়ার ওয়াঙ্কিদের মত একই পদ্ধতিতে হাতের মুদ্রা করে আমাদেরকে দণ্ডবৎ জানিয়ে নিয়ে গেল তাদের পঞ্চায়েৎ বাড়ীতে। এখানে দুটো ঘর, একটা ছোট, একটা বড়। ছোট ঘর দেখিয়ে বলল – বীমারী চার সাধু হ্যায়। বড় ঘরটা দেখিয়ে বলল – আপলোগ উধর ঠারেঙ্গে। সাধুর নাম শুনেই হরানন্দজী দৌড়ে গিয়ে সেই ঘরে ঢুকলেন। আমাদেরকেও ডাকলেন। অসুস্থ সেই চারমূর্তিকে দেখে আমাদের বাক্যস্ফূর্তি হল না। এঁরা সকলেই কামরূপ মঠের সন্ন্যাসী, আমাদের পূর্ব সাথী। হিরন্ময়ানন্দজীর খোঁজ করতে যতীশ্বরানন্দ নামক সাধু ক্ষীণ কণ্ঠে কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিলেন – ৫ মূর্তি পাহাড়ের ধ্বসে তলিয়ে গেছেন, আর চারজনকে বুনো হাতী দাঁত দিয়ে

ফেড়ে ফেলেছে। হরানন্দজীও শিশুর মত হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলেন আমার দিকে তাকিয়ে – সোমানন্দজী শুধু মহর্ষি নন, তিনি সত্যর্ষি। আহত ও অসুস্থ সেই চারজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমাদেরকে অন্তরঙ্গ ভাবে কথা বলতে দেখে সেই ওয়াঙ্কি সর্দার বুঝে গেছে যে, তাঁরা আমাদেরই লোক। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলে গেল – ইয়ে লোক পহেলে আয়ে থে, তিন রোজ হো গয়া, চার আদমী থে, ইসী ওয়াস্তে ইয়ে ছোটা কামরা মেঁ ঘুসা দিয়া। আপ বাতচিৎ করিয়ে। বড়া কামরা মেঁ আপলোগ কে লিয়ে ইন্তেজাম কর রহা হুঁ। ওয়াঙ্কি ভাষা এবং খোড়িবোলি হিন্দী মিশিয়ে কোনমতে মনের ভাব প্রকাশ করে পাশের কামরাতে ঢুকে গেল সর্দার। দলছাড়া এই সঙ্গীদের নাম যথাক্রমে ত্রিদিবানন্দ, মহানন্দ এবং জ্যোতির্ময়ানন্দ। যতীশ্বরানন্দের নাম আগেই বলেছি। মহানন্দ এবং যতীশ্বরানন্দ কাঁদতে কাঁদতে জানালেন – আপনাদেরকে ছেড়ে ডেহরী সঙ্গমের কাছ হতে ডেহরী নদীর পাশে যে পর্বত, হিরন্ময়ানন্দজীর নির্দেশে সেই পর্বতে চড়াই পথে প্রায় চার ঘন্টা হেঁটে দুর্গম অরণ্যপথ বড় বড় গাছপালা এবং কাঁটা ঝোপ অতিক্রম করে পর্বতের চূড়ায় উঠে আধঘণ্টা বিশ্রাম করে মিনিট পনের হাঁটার পর আমরা একদল বুনো হাতীর মুখে পড়লাম। চারদিকে এমন বড় বড় পাথর এবং ঘন সন্নিবিষ্ট বড় বড় গাছ যে পালাবার পথ পেলাম না। আমরা এই চারজন চারটে বড় বড় পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে ছিলাম, উন্মত্ত বড় দাঁতালো হাতীর দল বৃংহন ধ্বনি তুলে ৪ জন দণ্ডী সন্ন্যাসীকে দাঁতে করে ফেড়ে ফেলল, হিরন্ময়ানন্দজীর সঙ্গে আর চারজন প্রাণের ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াতে গিয়ে পার্শ্ববর্তী একটা পাহাড়ের ধ্বসে অজান্তে পা ফেলে হুড় হুড় গড়গড় শব্দে তলিয়ে গেলেন প্রায় দু হাজার ফুট নিচে। পাথরের আড়ালে থেকে সেই হুড় হুড় গুড়গুড় শব্দ প্রায় তিন মিনিট কাল ধরে শুনলাম। আমাদের করবার কিছু ছিল না। কিছুক্ষণ পরে বুকের টিপটিপানি থামতে কোন মতে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, ৪ জন দণ্ডী সন্ন্যাসীর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে আছে। সেই মর্মন্তুদ ঘটনা, সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্য এখনও স্মরণ পথে এলে এখনও আমাদের বুক কেঁপে উঠে। আমরা ৯ জন সাথীকে হারিয়ে ৪ জন কাঁদতে কাঁদতে হাঁটতে লাগলাম। একটা পাকদণ্ডীর পথ ধরে কোনমতে দেহটাকে টেনে নিয়ে যাই পেঁড়রাতে। বেলা তখন ২টা। আমরা নর্মদার জলে স্নান করে উঠতেই একদল ভীল এসে আমাদেরকে আক্রমণ করে। কেবলই বলতে থাকে 'মুক্ মুক', আমরা তাদের কথা বুঝতে না পেরে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাদের মুখের দিকে তাকাতেই শাণিত কামটার পিছন দিক দিয়ে আঘাত করতে থাকে। আমরা পড়ে গিয়ে যন্ত্রণাতে কাতরাতে থাকি। তদাবস্থাতেই ৪জন ভীল আমাদের গা থেকে জামা গেঞ্জি সোয়েটার (একমাত্র কৌপীন ছাড়া) সব কিছুই কেড়ে নেয়, ঝোলা গাঁঠরী কম্বল সব। আমরা কিছুক্ষণ অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলাম। হুঁস আসতেই কোন মতে হাঁটতে থাকি, কখন কোন পথে কি ভাবে যে হেঁটেছি, তার কিছুই মনে নাই। পথের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। যখন জ্ঞান হল তখন দেখলাম, এই ঘরে আমরা শুয়ে আছি। কেউ আমাদের গায়ে দয়া করে কম্বল চাপা দিয়েছে, ঘরের মধ্যে আগুনের চুল্লী জ্বলছে। দুজন পাহাড়ী লোক বসে আছে আমাদের কাছে। মনে কৌতূহল এবং নানা প্রশ্ন জাগলেও মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞাসা করতে তখন আমাদের অবস্থা ছিল না, তারাও কিছু জিজ্ঞাসা করে নি। সকাল হতে ব্যথা অনুভব করলাম, কেউ যেন জড়ি বুটি বেটে প্রলেপ দিয়েছে। একটু পরেই একজন বৃদ্ধ দুজন বৃদ্ধাকে সঙ্গে এনে কিছু জড়ি বুটি বেটে দুধের সঙ্গে খাইয়ে গেলেন। ঔষধ খাওয়ার পরেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার মুখে। এই পাহাড়ীদের জড়িবুটির এমনই গুণ যে আমরা ১ দিনের মধ্যেই অনেক সুস্থ বোধ করলাম।

আমাদের গাগুলোর ঘা এখনও সম্পূর্ণভাবে শুকায় নি। ২/১ দিনের মধ্যেই আশা করছি চলৎ শক্তি ফিরে পাবো। এখানকার পাহাড়ী লোকগুলি এতই সদাশয় এবং মহৎ যে এদের সদাশয়তা ও মহত্ত্বের কোন তুলনা হয় না। নগ্নগাত্রে নগ্নপদে পথ হাঁটতে বাধ্য হওয়ায় কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় আমাদের হাত পা গা সব ফেটে খড়ি ফুটে গেছল। এরাই তেল মাখিয়ে দিয়েছে, নর্মদার জল টিনের ভারে তুলে এনে গরম জলে স্নানের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। মা নর্মদা এদের মঙ্গল করুক। এই বলতে বলতে সাধুদের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কিছুটা সামলে নিয়ে আবার বললেন – দুর্গম অরণ্য পথে ভীলদের দ্বারা সর্বহারা হয়ে ছুটতে ছুটতে যখন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলাম, তখন আমাদেরকে বাঘ ভালুক টেনে নিয়ে যেতে পারত, পারে নি সে কেবল মা নর্মদার দয়া। এক একগুঁয়ে দাম্ভিক সাধুর পাল্লায় পড়ে আমাদের এই দশা! গুরুদেব কেন যে হিরন্ময়ানন্দজীর মত লোককে আমাদের দলপতি করে পাঠিয়েছিলেন, তা আমাদের কাছে দুর্জ্ঞেয় রহস্য। যদি বেঁচে মঠে কোন দিন ফিরে যেতে পারি, তবে তাঁকে দুটো কড়া কথা না শুনিয়ে আমাদের গায়ের ঝাল মিটবে না। যেখানে আমরা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলাম, সেই পথেই এই গ্রামের একদল ওয়াস্কি আসছিল ভিন্ গাঁ থেকে। তারাই আমাদের সেই করুণ অবস্থা দেখে সঙ্গে এনে রেখে গেছে এখানে। জ্ঞান হওয়ার পর এ সব কথা শুনেছি এদেরই মুখ থেকে। এই গ্রামের নাম শুনেছি ভূচেগাঁও। শূলপাণির ঝাড়ি কি আমরা পেরিয়ে এসেছি? তবে এই যমের দক্ষিণ দুয়ার স্বরূপ মারাত্মক জঙ্গল শেষ হতে আর কত বাকী? আজ বাংলা মাসের কত তারিখ?

হরানন্দজী উত্তর দিলেন – শূলপাণির ঝাড়ি শেষ হতে এখনও প্রায় ৩৫ মাইল বাকী আছে। আজ ১৩৬১ সালের ২রা ফাল্গুন, সোমবার। রাত পোয়ালেই আগামীকাল ফাল্গুন মাসের তিন তারিখ মঙ্গলবার হবে। তোমাদের অসুস্থ শরীরে আর বেশী কথা বলা উচিত নয়। আমরাও সারাদিন হেঁটে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বিশ্রাম প্রয়োজন। আবার আমরা যে মিলিত হতে পেরেছি, এটা মা নর্মদার বিশেষ কৃপা। কাল সকালে দেখা হবে আবার। এই বলে আমরা স্বামীজীদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পাশের বড় ঘরটাতে এসে ঢুকলাম। ঘরে ঢুকে দেখি ঘর পরিষ্কার করে দুটি কাঠের চুল্লী জ্বালা হয়েছে। আগুনের তাপে ঘর গরম। ঘরের বারান্দাতে দুই কুঁদা গরম জল। এই দুর্গম জঙ্গলে হাত পা মুখ ধুতে যে গরম জল পাবো, এ কল্পনাতীত। এতক্ষণ ধরে অসুস্থ সাথীদের কাছে যে এখানকার ওয়াস্কিদের আতিথেয়তা এবং যত্নাদির গল্প শুনে এলাম, তা যে কত সত্য তা সকলেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম। দুজন ওয়াস্কি বৃদ্ধকে বহুৎ বহুৎ সুক্রিয়া জানিয়ে আমরা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। যে যার বিছানা পেতে আমরা কিঞ্চিৎ স্মরণ মনন করে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে ওয়াস্কিদের কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, নর্মদা তটে নৃশংস ভীলরাও যেমন আছে, তেমনি সাধু ভক্ত ওয়াস্কিরাও আছে। নাই বা থাকল এদের আধুনিক শিক্ষা, আধুনিক কৃষ্টি, এরা নাই বা পারল কেতাবী ঢং-এ কথাবার্তার কায়দায় মানুষকে আপ্যায়ন করার কসরৎ দেখাতে, কিন্তু ভারতের যে সুপ্রাচীন শিক্ষাদীক্ষার মর্মবাণী, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, আর্ত বিপন্ন পরদেশীকে সেবা ও সাহায্য, সে সবই এদের মজ্জাগত। উচ্চশ্রেণীর আর্য নামে অভিহিত ব্যক্তিরা এদেরকে হয়ত অনার্য অশিক্ষিত বুনো জংলী বলে উপেক্ষা করবেন, কিন্তু শুয়ে শুয়ে আমার মনে হল, এরা যদি অনার্য হয়, তবে আর্য কারা? উপেক্ষিত বা নিতান্ত অবজ্ঞার পাত্র হলে কি বৈদিক ঋষিরা বেছে বেছে এদের দেশেই ছুটে এসেছিলেন তপস্যা করতে? হতে পারে দেবনদী শিবস্বেদ সম্ভূত নর্মদার পুণ্যধারাই ছিল, তাঁদের প্রধান আকর্ষণ কিন্তু সেই সব দেবর্ষি মহর্ষি সত্যর্ষিদের পুণ

সান্নিধ্যের প্রভাবেও যে এদের দেহ মন উন্নত হয়েছে, একথা অস্বীকার করার উপায় নাই। ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন সাতটা বেজেছে। দরজা খুলে দেখি চারদিকে ঘোর কুয়াশা। সেই একই দৃশ্য, টপটপ করে শিশির পড়ছে। রঞ্জন বলল – ফাল্গুন মাস পড়ে গেছে, শীত ত এখনও কিছুমাত্র কম হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। সকাল সাড়ে সাতটাতে চারদিকে সূর্যরশ্মির আভাস ফুটে উঠল। সাড়ে আটটা নাগাদ রোদ এসে পড়ল পাহাড়ের চূড়ায়। আমরা সবাই বাইরে বেরিয়ে এলাম। প্রায় বার চৌদ্দজন ওয়াক্কি স্ত্রী পুরুষ দল বেঁধে এসেছে, আমাদেরকে দেখতে। ভাষা বুঝি না। মুখের মিষ্ট হাসি ছাড়া তাদেরকে আপ্যায়ন ও কৃতজ্ঞতা জানাবার আর কোন পন্থা আমাদের জানা নাই। পাশের ঘর থেকে আমাদের পূর্ব সাথীরাও লাঠি ঠুকে ঠুকে নমো নারায়ণায় বলে আমাদের কাছে এসে বসলেন। বললেন – প্রায় সেরে গেছি বললেই হয়, কালের দিনটা বিশ্রাম করলেই পথে হাঁটা চলার শক্তি ফিরে পাব। আমাদেরকে ফেলে পালাবেন না যেন!

হরানন্দজী বললেন – ক্ষেপেছ না কি? তোমাদের সন্ধান পাওয়ার জন্য আমার মন সতত ব্যাকুল ছিল। পথে আসতে আসতে পাহাড়ের চারদিকে তাকাতে তাকাতে আসতাম, হঠাৎ যদি দেখা হয়ে যায়, এই আশায়। আর তোমাদেরকে ছেড়ে যাই? তোমাদেরকে সঙ্গে নিয়েই যাব, তারজন্য যদি ২/৪ দিন এখানেই থেকে যেতে হয়, থাকব।

গতকাল সন্ধ্যায় এসে যে ওয়াক্কি সর্দারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে দুজন ওঝাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে দেখতে পেলাম। মহানন্দস্বামী আমাদেরকে বলল – সর্দার ঐ দুজন ওঝাকে সঙ্গে নিয়ে আসছে। ওদেরই জড়ি বুটি খেয়ে আমরা পুনর্জীবন লাভ করেছি। সর্দার এসে সম্মার্জনী মুদ্রায় আমাদেরকে নমস্কার করে ওঝাকে ইঙ্গিত করতেই ওঝা একে একে মহানন্দ, যতীশ্বরানন্দ, ত্রিদিবানন্দ এবং জ্যোতির্ময়ানন্দের নাড়ী পরীক্ষা করে প্রত্যেকের হাতে একটুকরো করে গাছের শিকড় দিয়ে চিবিয়ে খেয়ে নিতে বলল। সর্দারের সঙ্গে কিছু দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলল। সর্দার ওয়াক্কি এবং ভাঙা ভাঙা খোড়িবলী হিন্দীতে যা বলল, তাতে বুঝলাম যে, ওঝা বলেছে আমাদের ঐ চারজন সাথীকে আর "দাবা" খেতে হবে না। ২/১ দিনের মধ্যে তারা পূর্বশক্তি ফিরে পাবে। আমাদের সঙ্গে তারা নিকটস্থ উদী সঙ্গমে স্নান করতে যাবে কিনা, ত্রিদিবানন্দ জিজ্ঞাসা করায়, লাঠি ধরে ধরে সাবধানে তারা যেতে পারে, এমতও ওঝা দিল। কিন্তু সর্দার আজকের দিনটাও তাঁদেরকে এইখানেই তাদের আনা জলে স্নান করতে বলল। কাজেই আমরা তাঁদেরকে নিরস্ত করে নিজেরাই গেলাম স্নান করতে। নর্মদা ও উদী নদীর সঙ্গমস্থলে গিয়ে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম উভয় নদীর বিকট গর্জন শুনে। বড় বড় পাথরের boulder গড়িয়ে আসছে উদী নদীর খরস্রোতা ধারার সঙ্গে; পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি, হুড় হুড় গড়গড় কলকল প্রচণ্ড শব্দ তার সঙ্গে ছলাৎ ছলাৎ করে জলের উছলে উছলে ঠিকরে উঠার ধ্বনিতে কানে তালা লাগার জোগাড়। কাছেই একটা জঙ্গলাবৃত ছোট পাহাড়, উভয় নদীর জলের সংঘাত উছলে পড়ছে পাহাড়ের গায়ে। উর্দ্ধোত্থিত জলের ধারায় পাহাড়ের গাছপালা ভিজে যাচ্ছে অনবরত। জলের ঘূর্ণাবর্ত দেখে সেখানে নেমে স্নান করতে আমাদের সাহস হল না। দুজন ওয়াক্কি আমাদেরকে পাহাড়ের ধার দিয়ে কতকটা উপরে উঠিয়ে নিয়ে এল একটা পুলিশ ফাঁড়িতে। ফাঁড়িতে ৪জন বন্দুকধারী পাহারাদার। তাদের দুজন মারাঠী, দুজন হিন্দুস্থানী, ঐ চারজন ছাড়াও আরও দুজন স্থানীয় ওয়াক্কি যুবকও কাজ করে। হরানন্দজীর প্রশ্নের উত্তরে পুলিশদের একজন বলল – এর নাম নক্টা চৌকি। এই ভূচেগাঁও মহল্লা পশ্চিম খান্দেশ জেলার শেষ সীমা। তাই এখানে পুলিশ চৌকীর ব্যবস্থা আছে।

তারা তাদের বাসস্থানের পাশ দিয়ে ঘাটে নামবার একটা রাস্তা দেখিয়ে দিল। সেই রাস্তায় গিয়ে আমরা পরিষ্কার ঘাট পেলাম। ঘাটে এক হাঁটু জলে নেমে আমরা স্নান করতে করতে ছোট্ট পাহাড়টার চারদিকে দেখতে পেলাম পিয়াশাল, শাল, সর্জম, লতাশাল, বট, কদম্ব, মহুয়া, চীহড় লতা প্রভৃতি। আর একরকম লতা গাছ দেখলাম, বড় বড় গাছকে জড়িয়ে সেগুলো উঠে গেছে উপরের দিকে তাতে নীলাভ ফুল ফুটে আছে অজস্র। নিচে নর্মদার স্বচ্ছ জলধারা। সূর্যের রশ্মি এসে পড়েছে জলে। সমগ্র পরিবেশের পটভূমিকায় অপূর্ব সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। কিন্তু এই সৌন্দর্য চমকপ্রদ হলেও এদিকে হাঁটু দুটো কনকনে ঠাণ্ডা জলে ডুবে থাকায় শীতে শরীরে কাঁপুনি ধরে গেল। সৌন্দর্য উপভোগ করা সম্ভব হল না। কোন মতে স্নান সেরে তীরে বসে তর্পণ করলাম। প্রণাম করলাম মা নর্মদাকে। তারপর হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে ফিরে এলাম আমাদের আশ্রয়স্থল ওয়াক্কিদের সেই পঞ্চায়েৎ গৃহে।

আমরা যখন ফিরে এলাম, তখন বেলা সাড়ে এগারটা। ত্রিদিবানন্দ প্রভৃতি ৪ জনের তখন স্নান হয়ে গেছে ওয়াক্কিদের বয়ে আনা জলে। তারা বসে আছেন আমাদের অপেক্ষায়। আমরা ভিজা গামছা কাপড় ইত্যাদি গাছের ডালে শুকোতে দিয়ে বারান্দাতে বসেছি এমন সময় সেই ওয়াক্কি সর্দার এক কুঁদা সদ্য দোহন করা দুধ আনলেন আমাদের ভিক্ষার জন্য। আমরা ৮ জনই যে যার কমণ্ডলুতে ঢেলে ঢেলে আকণ্ঠ পান করলাম। দুগ্ধ পানের পরই মহানন্দ জানালেন – এরা প্রায়ই 'অশ্বত্থামার' পায়ের ছাপ অঙ্কিত একটা পথের কথা বলে। সেই ছাপ নাকি নর্মদার ঘাট থেকে উদী নদীর ধারার পাশ দিয়ে উঠে গেছে পূর্বদিকের ঐ পাহাড়ের একটা গুহা পর্যন্ত। আপনারা সর্দারকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহলেই সবিশেষ জানতে পারবেন। এই কথা শুনেই প্রেমানন্দ লাফিয়ে উঠে বলতে লাগলেন – আমি কাশীতে এক বৃদ্ধ মহাত্মার কাছে বহুদিন আগে শুনেছিলাম বটে বৈনতেয়র্বলির্ব্যাসঃ মার্কণ্ডেয় বিভীষণ ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি সাতজন চিরজীবীর মধ্যে অশ্বত্থামা না কি এই শূলপাণির ঝাড়িতে কোনও স্থানে এখনও বাস করছেন, জীবিত আছেন। মনে হয়, এদের ভাষায় আশ্‌থামাই সেই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা। এখনও জীবিত থেকে তাঁর কৃত কর্মের ভোগ করে চলেছেন। সর্দারকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি তাঁর ভাষায় যা বললেন, তার কোনমতে পাঠ উদ্ধার করে বুঝলাম যে এখান থেকে মাইল দেড়েক হেঁটে গেলেই পূর্ব দিকের ঐ পাহাড়ের মাথায় একটি বড় গুহা আছে। নর্মদার ঘাট থেকে অতিকায় কোন মানুষের বৃহদাকার পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে ঐ গুহা পর্যন্ত। ঐ পাহাড়টার পূর্বদিকের ঢালে সাদরী নামক এক মহল্লায় ওয়াক্কিদের আর একটা বড় বস্তি আছে। সেই বস্তির কেউ কেউ নাকি কখনও কখনও তাঁর দর্শন পেয়েছে। আমরা যেতে চাইলে সে আমাদেরকে কাল সকালে সঙ্গে করে সেখানে নিয়ে যাবে। মধ্যাহ্নের মধ্যেই আমরা এখানে ফিরে এসে স্নান তর্পণাদি সারতে পারব। সর্দারের কথায় আমরা সাগ্রহে সম্মতি জানালাম। সর্দার চলে যেতেই আমরা বিশ্রামের জন্য ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ঘরের মধ্যে পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে তিন দিকে তিনটে জানালার মত ফোকর চট ছেঁড়া গুঁজে বন্ধ করা আছে। আমরা ঘরে ঢুকে চট ছেঁড়াগুলো সরিয়ে দিতেই সূর্যরশ্মি এসে ঘরে ঢুকল। ঘরটা সূর্যালোকে ঝকমকে হয়ে উঠল। দমখেড়ায় যেমন দেখেছিলাম, তেমনি এখানেও দেখলাম, দেওয়ালগুলোতে অজস্র নাম লেখা। সবই সাধু সন্ন্যাসীর। হরানন্দজী বললেন – ভারতে যত তীর্থ আমি ঘুরেছি, দেখেছি সর্বত্রই লোক মন্দির পাহাড় বড় বড় পাথর এমন কি যে সব গাছের গুঁড়ি মোটা, সেখানেও যত্র তত্র নিজেদের নাম চক খড়িতে লিখে রাখে। স্বাক্ষরকারীদের মনস্তত্ত্ব এই যে, অমুক গ্রামের বা অমুক শহরের অমুক আমি যে

এখানে এসেছিলাম, তা লোকে জেনে রাখুক। মনে রাখুক আমার নামটা। অমর হয়ে থাকার ইচ্ছা পৃথিবীতে কার না হয়! তাই বলে পরিক্রমাবাসী সাধুরা, তাঁরা ছাড়া এই দুর্গম পথে কেউ আসেন না, আসবেন না, তাঁরাও যে এই দুর্বলতার শিকার হবেন, তা আশা করি নি! প্রেমানন্দ বললেন – এই স্বাক্ষরাবলী একথাও প্রকাশ করছে যে, এই ওয়াক্সিদের এই পঞ্চায়েৎ গৃহ সাধু সন্ন্যাসীদের একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল। ভূচেগাঁওয়ের ওয়াক্সিদের মহত্বের পরিচয় জ্ঞাপকও বটে।

পূর্ব দক্ষিণদিকের দেওয়ালের লেখন পড়ে পশ্চিমদিকের দেওয়ালের লেখা পড়তে গিয়ে আমরা চমকে উঠলাম। সেখানে পরপর তিনটি শ্লোক লেখা আছে –

১। তীরে ক্ষীর সমুদ্রস্য কালকূট-বিষং পপৌ।
ইহাপি গোপিতঃ কর্তা বুধৈরপি ন বুধ্যতে॥
২। গৌরী-নখর সঙ্কাশং শ্রদ্ধয়া শশিনং দধৌ।
ইহাপি গোপিতঃ কর্তা বুধৈরপি ন বুধ্যতে॥
৩। ভবানিশঙ্করোমেশং প্রতি পূজা-পরায়ণঃ।
কর্তা গুপ্তঃ ক্রিয়া গুপ্তা গুপ্তমামন্ত্রিতং পদম্॥

আমি এবং হরানন্দজী বারবার তিনটি শ্লোক পড়েও যথাযথ অর্থ উদ্ধার করতে পারলাম না। প্রেমানন্দ বললেন – মহানন্দস্বামী এবং ত্রিদিবানন্দ দুজনেই সংস্কৃতজ্ঞ, দুজনেই ধুরন্ধর বৈয়াকরণ, তাঁদেরকে এখানে ধরে ধরে নিয়ে আসি। তাঁরা এই শ্লোকের পাঠ উদ্ধার করলেও করতে পারেন। প্রেমানন্দ দুহাতে দুজনকে ধরে ধরে ঘরে আনলেন। তাঁরা মনোযোগ সহকারে শ্লোক তিনটি পড়ে বললেন – খণ্ড খণ্ড ভাবে শ্লোকের সংস্কৃত শব্দগুলির অর্থ বুঝা যাচ্ছে বটে কিন্তু সম্পূর্ণতঃ শ্লোকের মর্ম উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে না। যেমন, প্রথম শ্লোকের প্রথম পংক্তির অর্থ, ক্ষীর সমুদ্রের তীরে কালকূট বিষ পান করেছিলেন। দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ, এখানেও (ইহাপি) কর্তা গুপ্ত আছেন। সুধগণ অর্থাৎ জ্ঞানীগণও এর অর্থ বুঝেন না।

দ্বিতীয় শ্লোকের শব্দগত অর্থ – 'ইহাপি' অর্থাৎ এখানেও গৌরীর নখের ন্যায় শুভ্রচন্দ্রকে শ্রদ্ধাসহকারে মস্তকে ধারণ করেছেন। এখানেও 'ইহা' পদটি গুপ্ত রয়েছে। জ্ঞানীগণের কাছেও এটি বোধ্য নয়।

তৃতীয় শ্লোকটির সরল অনুবাদ – শংকর ও উমার ঈশ্বরের প্রতি পূজা পরায়ণ হও। এখানেও কর্তৃপদ গুপ্ত ও ক্রিয়াপদ গুপ্ত রয়েছে। কিন্তু খট্‌কা লাগছে শংকর ও উমেশ শব্দ দুটি নিয়ে। শংকর এবং উমেশ অর্থাৎ উমা + ঈশ, উমার যিনি ঈশ্বর বা পতি তিনি ত শংকরই। তবে পৃথক পৃথক শব্দ প্রয়োগ করে একই কথা বুঝানো হচ্ছে কেন? একই মহাদেবকে বুঝানোর জন্য শংকর ও উমেশ শব্দ ব্যবহারের সার্থকতা কোথায়? আসল কথা হল, আমরা এ হেঁয়ালির কোন মাথা মুণ্ডু বুঝতে পারছি না।

মহানন্দস্বামী এবং ত্রিদিবানন্দের এই উত্তর পেয়ে আমি ধাঁধায় পড়লাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত মাথা ঘামিয়েও আমি কোন সমাধানে পৌছতে পারলাম না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ওয়াক্সি সর্দারের নির্দেশে দুজন ওয়াক্সি যুবক যথারীতি দুটো কাঠের চুল্লীতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেল। অন্ধকার নেমে আসতেই আমরা সব ঘরে ঢুকলাম। সবাই সান্ধ্যক্রিয়া করতে বসে গেছেন কিন্তু আমার সেদিকে মন নাই। মাথার মধ্যে দেওয়ালে লেখা ঐ তিনটি শ্লোকই কেবল ঘুরপাক করছে। কিছুতেই সন্তোষজনক অর্থ বুদ্ধিতে ভাসছে না। তীরে ক্ষীর সমুদ্রস্য কালকূট-বিষং পপৌ। ইহা ক্ষীর সমুদ্রের তীরে কালকূট বিষ পান করিয়াছিলেন। কালকূট বিষ পান করেছিলেন ত শিব, কিন্তু শ্লোকে কোথাও শিব শব্দ নাই। গৌরী-নখরসঙ্কাশং শ্রদ্ধয়া শশিনং দধৌ। দ্বিতীয় শ্লোকের এই

পংক্তির সাধারণ অর্থানুসারে গৌরীর নখের ন্যায় শুভ্র চন্দ্রকে শ্রদ্ধা সহকারে মস্তকে ধারণ করেছিলেন যিনি তিনি ত শিব, এ ত জগৎ প্রসিদ্ধ কথা। কিন্তু এই শ্লোকে শিব শব্দের প্রয়োগ কোথাও নাই। তৃতীয় শ্লোকে শংকর ও উমেশের পূজায় তৎপর হতে নির্দেশ দিয়েছে শ্লোক রচয়িতা; সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন 'কর্তা গুপ্তঃ ক্রিয়া গুপ্তা' এমন কি শ্লোকের অভিলষিত পদও গুপ্ত আছে, 'গুপ্তমামন্ত্রিতং পদম্।' এ ত বিষম প্রহেলিকা!

রাত্রি দশটা বেজে গেছে। অপর সাথীদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তাঁরা যথারীতি কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছেন। আমারই পোড়া কপালে ঘুম নাই। তাঁরা শ্লোকের অর্থ বুঝা যায় নি ত যায় নি, সে নিয়ে তাঁদের মাথা ব্যথা নাই। কোন পরিক্রমাবাসী ভুল ভাবে ঐ শ্লোক লিখে গেছেন, হয়ত মুখস্থ শ্লোক লিখতে গিয়ে তাঁর পথশ্রমে হয়ত স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছিল, তাই ঐভাবে উল্টা পাল্টা করে রেখে গেছেন – এই সহজ সরল সিদ্ধান্তে পৌঁছে সবাই নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাচ্ছেন। কিন্তু আমার চোখে কিছুতেই ঘুম আসছে না। মনে পড়ল আমার ছাত্রাবস্থার কথা। ক্লাশের কোন অঙ্ক কষতে না পারলে গোটা রাত্রি আমি ঘুমাতে পারতাম না। ছোটবেলাকার সেই অভ্যাস আজও যায় নি দেখছি!

রাত্রি ২টা পর্যন্ত ঘুম এল না চোখে, ঘুমোবার জন্য রাত্রে বিছানায় শুলে যে কোন লোকের চোখে যে তন্দ্রাবেশ দেখা দেয়, তা একবার কোন কারণে ভেঙ্গে গেলে আর সহজে ঘুম আসে না। আমারও আজ সেই দুর্দশা। শুয়ে শুয়ে ভাবছি, কোন পরিক্রমাবাসীই পরিক্রমার পথে বেরিয়ে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাবনা, মিথ্যা চিন্তা, ভুল কথা সজ্ঞানে নর্মদাতটে বসে লিখে যাবেন না। কাজেই পরিক্রমাবাসী দেওয়ালে ভুল কথা অপরকে বিভ্রান্ত করার জন্য লিখে যাবেন না। আমিই এর অর্থ উদ্ধার করতে পারছি না। মনে বিচার এল, মহানন্দস্বামী এবং ত্রিদিবানন্দের মত ধুরন্ধর বৈয়াকরণরাও ত শ্লোকের অর্থ বুঝতে পারে নি, সে জন্য তাঁদের ত কৈ মনে কোন চাঞ্চল্য নাই। তবে আমি কেন এত অস্থির হয়ে পড়েছি? আসল কারণ, আমার আত্মাভিমান বা অহং এ ঘা পড়েছে! মনের অন্তঃস্থলে মগ্ন চেতনায় আমার নিশ্চয়ই এই অহংকার সুপ্ত হয়ে আছে যে, আমি বাবার কাছে পাণিনি পড়েছি, বেদাভ্যাস করেছি, কাজেই সংস্কৃতে রচিত কোন শ্লোকের অর্থই আমার কাছে অবিদিত থাকার কথা নয়! মা নর্মদা আমার সেই অহংকারে ঘা দিয়েছেন। আমার সুপ্ত পাণ্ডিত্যাভিমানে আজ পদাঘাত করেছেন। সেই জ্বালাতেই মরছি আমি! একজন সন্তের দোঁহা আমার মনে পড়ল –

অহংতা চুরি, অহং চামারি, অহং নীচেন কি নীচ।
অহং না হোতি বিচমে তো সাক্ষাৎ থে ঈশ॥

অর্থাৎ অহংকার চৌর্যাপরাধের মত জঘন্য অপরাধ। অহংকার-বৃত্তি মেথরাণী বা চণ্ডালিনীর মত নীচ। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা স্বরূপ এই অহং না থাকলে জীব সহজেই অনুভব করতে পারত যে সে স্বয়ং ব্রহ্ম স্বরূপ।

এইভাবে নানা চিন্তা ও বিচার করতে করতে রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। প্রেমানন্দ স্বামী জেগে উঠেছেন, তিনি বিছানায় উঠে বসে উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগলেন –

ওঁ আরাধয়ামি মণি সন্নিভমাত্মলিঙ্গং
মায়াপুরী হৃদয় পঙ্কজ - সন্নিবিষ্টং।
শ্রদ্ধা নদী বিমল চিত্ত জলাবগাহং
নিত্যং সমাধি কুসুমৈঃ অপুনর্ভবায়॥

– অপুনর্ভবায় অর্থাৎ পুনর্জন্ম আর যাতে না হয়, সেই বাসনায় আমি নিজ হৃদয় পঙ্কজে আত্মলিঙ্গীকে সন্নিবিষ্ট করে বিমল চিত্তে শ্রদ্ধারূপ নদীর জলে সমাধিরূপ কুসুমের দ্বারা তাঁকে পূজা করি।

রঞ্জন বাউলও ভাগাবেগে গেয়ে উঠলেন –

মন বুঝে না খুঁজে বেড়াই তুমি কোথায় নাইকো গো।
নয়ন মেলে দেখতে গেলে কেন বল লুকাও গো।
কতকাল আর অন্ধকারে রাখবে জীবে বদ্ধ করে,
আলোর সীমা নাই ত তোমার জানি না গো কার তরে,
পিয়াস আকুল কাতর জনে হতাশ করা বিধান গো।
আশার আমার নাই সীমানা, দেখ্‌বো কোথাও পাই কি না,
শূন্যে জলে সর্বস্থলে তোমায় হেরি বাসনা,
খুঁজে শেষে হিয়ার মাঝে দেখ্‌বো কোথায় লুকাও গো॥

রঞ্জনের ভাব পূর্ণ গানের ভাষায় এবং সুরেলা কণ্ঠস্বরে সবাই জেগে উঠেছি। গাছে গাছে কাক কোকিল এবং আরও নানা রকম পাখী ডেকে চলেছে। চারদিক ফরসা হয়ে আসছে। হরানন্দজী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন – আপনার চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আপনি রাত্রে আদৌ ঘুমান নি। আমার মনে হচ্ছে দেওয়ালে লেখা ঐ কিম্ভূতকিমাকার শ্লোকের অর্থোদ্ধারের জন্য এখনও আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন কি? মাথা থেকে ঐ চিন্তা ঝেড়ে ফেলুন এখন সাড়ে ৬টা বেজে গেছে। আর ঘণ্টা খানিকের মধ্যে ওয়াকি সর্দার প্রস্তুত হয়ে এসে পড়বে, আমাদেরকে অশ্বত্থামার গুহা দেখাতে। আমার মতে প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে আপনি টেনে ঘুম দিন, শরীর ঝরঝরে হয়ে যাবে। আমার নিজেরও এক স্বধর্মচ্যুত শিশুঘাতী পাষণ্ডের গুহা দেখতে যেতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না। ঋষি ভরদ্বাজের পৌত্র হয়ে ধ্যান ধারণা ঈশ্বরোপসনার পরিবর্তে পাষণ্ডটা অস্ত্র চালনা করেই জীবন কাটিয়ে ছিল। লোকটা কতবড় নিষ্ঠুর ছিল বুঝে দেখুন, রাত্রিকালে যখন যুদ্ধের বিরতিকাল সে সময়ে গোপনে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করে দ্রৌপদীর পাঁচ শিশুপুত্রকে হত্যা করে। তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করে অর্জুনের পুত্রবধূ উত্তরার গর্ভস্থ শিশুকেও বিনষ্ট করে ফেলে।

– 'থামুন! থামুন!' সহসা গর্জে উঠলাম আমি। আপনি স্বধর্মচ্যুত কাকে বলছেন? স্বয়ং ঋষি ভরদ্বাজ এবং তাঁর পুত্র দ্রোণাচার্য অর্থাৎ অশ্বত্থামার পিতাও ত অস্ত্রগুরু ছিলেন। পূর্বকালের ঋষিরা কেবল ব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন থাকাকে একমাত্র ব্রত বলে ভাবতেন না। জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল স্তরে অবাধে বিচরণ করে গবেষণা করে নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করাও তাঁদের ব্রতের অঙ্গ ছিল। ঋষি ভরদ্বাজ সেই সুপ্রাচীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্রাচার্য ছিলেন, ছিলেন বহু বিশ্ব বিধ্বংসী অস্ত্রের আবিষ্কারকও। তাই বলে তপস্যায় তিনি কোন ঋষির চেয়ে কম ছিলেন না। ঋগ্বেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের এক থেকে ত্রিশ সূক্ত পর্যন্ত প্রায় ৪৫৬টি মন্ত্রের দ্রষ্টা। এতগুলি চিন্ময় বেদমন্ত্রের দ্রষ্টাকেও কি আপনি স্বধর্মভ্রষ্ট বলতে সাহস রাখেন? ভরদ্বাজ যদি স্বধর্মভ্রষ্ট না হন, দ্রোণাচার্য যদি নিয়ত অস্ত্রবিদ্যার চর্চা করে স্বধর্মভ্রষ্ট না হন, তাহলে অশ্বত্থামা স্বধর্মভ্রষ্ট হন কোন্ যুক্তিতে? কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে দ্রোণাচার্য দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। অশ্বত্থামাও পিতার পথ অনুসরণ করে দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। এতে ভ্রষ্টাচার কোথায় দেখলেন? ভ্রষ্টাচারী কোন ব্যক্তি কি চিরজীবী হতে পারে? পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ছলে বলে কৌশলে পিতৃহন্তার যে কোন অনিষ্ট করাকে আমি পাষণ্ডতা বলে মনে করি না। চোখ থেকে কৃষ্ণভক্তির কাজল মুছে নিরপেক্ষভাবে বেদব্যাসের মহাভারত পড়লে আপনি এই সিদ্ধান্তে আসতে নিশ্চয়ই হবেন যে, সে যুগে প্রকৃত পাষণ্ড যদি কাউকে বলতে হয়, তাহলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনই ছিলেন প্রকৃত পাষণ্ড। নিজের পুত্র এবং অন্যান্য ছাত্রকেও দ্রোণাচার্য যে সব গুপ্ত বিদ্যা শিখান নি, তা তিনি শিখিয়েছিলেন অর্জুনকে। সেই অর্জুন হীন উপায়ে বধ

করেছিলেন পিতৃসম অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যকে। মহাভারত খুঁটিয়ে পড়লে জানতে পারবেন, কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে মালবের রাজা ইন্দ্রবর্মা পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করেন। তাঁর 'অশ্বত্থামা' নামে এক বিশাল হাতী ছিল। অজেয় দ্রোণাচার্যকে নিরস্ত্র ও যুদ্ধে বিরত না করতে পারলে কিছুতেই তাঁকে বধ করা যাবে না জেনে 'নাটের গুরু' শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদেরকে কূট উপদেশ দিলেন যে তাঁরা উচ্চৈঃস্বরে অনবরত প্রচার করতে থাকুক – দ্রোণের প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র অশ্বত্থামা যুদ্ধে নিহত হয়েছে। পাণ্ডবপক্ষের অবিরাম প্রচারেও দ্রোণ একথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি বললেন, সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির যদি অশ্বত্থামার মৃত্যু সংবাদ নিজে এসে বলেন, তবেই তিনি বিশ্বাস করবেন। কৃষ্ণের প্ররোচনায় ভীম ইন্দ্রবর্মার সেই 'অশ্বত্থামা' নামক হাতীটিকে হত্যা করলেন। তখন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে প্ররোচিত করলেন এই সংবাদ উচ্চৈঃস্বরে দ্রোণাচার্যকে জানাতে। কিভাবে উচ্চারণ করতে হবে তাও শিখিয়ে দিলেন।

যুধিষ্ঠির তখন দ্রোণাচার্যকে উচ্চৈঃস্বরে বললেন – 'অশ্বত্থামা হতঃ' আর অস্ফুট স্বরে মৃদুকণ্ঠে বললেন – 'ইতি গজঃ'। যুদ্ধের কোলাহলে 'ইতি গজঃ' শব্দটি দ্রোণের কাণে অশ্রুত রয়ে গেল। পুত্রের মৃত্যু হয়েছে জেনে দ্রোণাচার্য তখন অস্ত্র ত্যাগ করে যোগস্থ হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। সেই অবকাশে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়ার মত অর্জুনের প্ররোচনায় তাঁরই শ্যালক দ্রুপদ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ছুটে গিয়ে মহাসমাধিতে লীন দ্রোণের খড়্গাঘাতে শিরচ্ছেদ করলেন। লক্ষ্য করবেন দ্রোণাচার্য অস্ত্রচর্চা করতেন বলে আপনার মতানুযায়ী যদি স্বধর্মভ্রষ্ট হতেন, তাহলে ইচ্ছামাত্রই কি তার পক্ষে যোগাবলম্বনে দেহরক্ষা সম্ভব হত ? আচার্য দ্রোণের এইরকম জঘন্য হত্যাকাণ্ড কি অর্জুনের পাষণ্ডতা প্রমাণ করে না ? যুধিষ্ঠিরের তথাকথিত সত্য নিষ্ঠার প্রতিফলস্বরূপ তাঁর রথ যে সবর্দা ভূমি হতে চার আঙুল উপরে উঠে থাকত, কখনও ভূমি স্পর্শ করত না অর্থাৎ সর্বংসহা ধরিত্রীও যে ঐ গুরুহন্তার ভার বহন করতে অসম্মতা ছিলেন একথা কি প্রমাণ করে না ? এমন কি মহাপ্রস্থানের পর তাঁকে যে নরক দর্শন করতে হয়েছিল তাও ত স্বয়ং বেদব্যাসও মহাভারতে ভালভাবেই বর্ণনা করে গেছেন। কাজেই পিতৃহন্তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে অশ্বত্থামা যদি রাত্রির অন্ধকারে শিবিরে ঢুকে শিশুহত্যা করে বসেন, তাতে তাঁর পাষণ্ডতার চেয়ে পিতৃভক্তির পরিচয়ই বেশীভাবে ফুটে উঠেছে বলে আমি মনে করি। কাজেই রাত্রিতে আমার ঘুম হোক আর না হোক, সর্দার এলে অবশ্যই আমি অশ্বত্থামার সাধনগুহা দেখতে যাব এবং তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধানতি জানিয়ে আসব।

আমার উষ্মাপূর্ণ উক্তি শুনে হরানন্দজী চুপ করে বসে থাকলেন। যথাসময়ে ওয়াকি সর্দার প্রস্তুত হয়ে আসতেই আমি তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। প্রেমানন্দ রঞ্জন ছাড়া হরানন্দজীও দেখলাম বেরিয়ে এলেন আমাদের সঙ্গে যাবেন বলে। লাঠি হাতে পাশের ঘর থেকে মহানন্দস্বামী বেরিয়ে এসে বললেন – আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে, কতখানি সুস্থ এবং সবল হয়েছি পরখ করে নিই আজ। হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে আমরা পাঁচজন হাঁটতে লাগলাম অগ্নিকোণের দিকে। সবে মাত্র তখন সূর্যোদয় হতে আরম্ভ হয়েছে। মিনিট দশেক হাঁটার পর উদী নদীর গতিপথ হতে কিছু দূরে সর্দার আমাদেরকে পাহাড়ী পথে কতকগুলি পর পর বৃহদাকার পদচিহ্ন পথের উপর অঙ্কিত আছে দেখিয়ে মন্তব্য করল – আশ্‌ত্থামাকী; উন্‌কী কথা শুনাইয়ে। কোঈ সুরতসে সমঝে গা। প্রেমানন্দ আমাকে শোনাবার জন্য অনুরোধ করলেন। আমি বললাম – আমার শরীর মন এখন দুই অসুস্থ। রাত্রে ঘুম হয় নি। দেওয়ালে লেখা সেই তিনটি অবোধ্য শ্লোকই আমার মনকে এখন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। হিন্দীতে এখন বক্‌বক্ করতে পারব না। ক্লান্ত লাগছে মহানন্দস্বামী বলুন আমরা শুনতে শুনতে হাঁটতে থাকি। মহানন্দস্বামী মহা উৎসাহে আরম্ভ করলেন –

'কুরু পাণ্ডবের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামার মায়ের নাম কৃপী, কৃপাচার্যের ভগিনী। জন্মমাত্রই নবজাতক উচ্চৈঃস্বরে অশ্বের মত হ্রেষা রব করেছিলেন বলে ইনি অশ্বত্থামা নামে অভিহিত হন। ইনি পিতা দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন এবং অনেক মারাত্মক গুহ্য অস্ত্রের প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত হন। পিতার কাছ থেকেই তিনি নারায়ণ প্রদত্ত নারায়ণাস্ত্র এবং ব্রহ্মশির অস্ত্র লাভ করেছিলেন। পাণ্ডবদের বনবাস কালে অশ্বত্থামা দ্বারকায় গিয়ে যুদ্ধে অজেয় হবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মশির অস্ত্রের বিনিময়ে কৃষ্ণের কাছ হতে সুদর্শন চক্র প্রার্থনা করেন কিন্তু সুদর্শন চক্র উত্তোলন করতে অক্ষম হওয়ায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন।' অশ্বত্থামার উপাখ্যান শুনতে শুনতে আমরা হেঁটে চলেছি পায়ের ছাপের দিকে লক্ষ্য রেখে। প্রত্যেক স্থানের প্রতিটি পায়ের ছাপের যে স্পষ্ট দাগ আছে তা নয়। কোথাও বাঁ পায়ের আঙুলের দাগ, কোথাও ডান পায়ের আঙুলের দাগ স্পষ্টভাবে অঙ্কিত আছে পাথরের উপর। কোথাও বা পায়ের পুরোপুরি ছাপ আছে, আবার কতক জায়গায় হয়ত কোন ছাপই দেখতে পাচ্ছি না। আবার কতকটা এগিয়ে গিয়ে পায়ের ছাপ দেখতে পাচ্ছি। হরানন্দজী প্রশ্ন তুললেন – অশ্বত্থামার দেহের ওজন কি কয়েক টন ছিল যে শক্ত পাথরের উপর তাঁর পায়ের ছাপ বসে গেছল ? এ কথার উত্তর প্রেমানন্দই দিলেন। তিনি বললেন – দ্বাপর যুগের কথা, সে সময় হয়ত এখানকার ভূ-প্রকৃতি তলতলে নরমই ছিল। নিত্য নর্মদা স্নানের পর আসা যাওয়া করতে করতে যে দাগ মাটিতে পড়েছিল তাই হয়ত ভূ-প্রকৃতির নিয়মানুসারে পরে পাথরের রূপ নিয়েছে। তখন হয়ত এই ওয়াক্কিরাই এখানে বাস করত না। কিন্তু ঘটনার মধ্যে সত্য না থাকলে পুরুষানুক্রমে 'অশ্বত্থামার' কথা এদের মধ্যে এতকাল ধরে টিকে থাকে কি করে ?

আমরা ক্রমশঃই এগিয়ে যাচ্ছি। পথে অনেক বড় বড় গাছপালা থাকলেও একে জঙ্গল বলা চলে না। পাহাড়ের এপাশে ভূচেগাঁও এবং ওপারে সাদরী গ্রামে বহু ওয়াক্কি বসবাসের ফলে জঙ্গলের বহু গাছ কেটে তারা সাফ করে ফেলেছে। মাথার উপর সূর্য। আমরা কেউ কম্বল নিয়ে আসি নি, না এনে ভালই করেছি। রোদের তাপ ভালই লাগছে। পাহাড়ের তলায় এসে পৌঁছে গেলাম। পাহাড়ের চতুর্দিকের দৃশ্য মনোরম। চড়াই সুরু হল। পাহাড়টা বড় জোর ১২০০ বা ১৪০০ ফুট উঁচু বলে মনে হচ্ছে। ওয়াক্কি সর্দার চড়াই এর পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে থাকল। যতই উঠছি, ততই ঘন ঘন পায়ের ছাপ চোখে পড়ল। হরানন্দজী মহানন্দস্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন – হ্যাঁ, তারপর ? সেই যে সুদর্শন চক্র তুলতে না পেরে অশ্বত্থামা দ্বারকা হতে ফিরে এলেন তারপর কি ঘটেছিলে তাঁর জীবনে ? বাকীটুকু শুনিয়ে দাও। মহানন্দস্বামী পূর্বের জের টেনে আবার বলতে সুরু করলেন – কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অশ্বত্থামা পিতার সঙ্গে কৌরব পক্ষে যোগ দেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক দ্রোণাচার্যের জঘন্য ভাবে শিরশ্ছেদের পর সেই শোচনীয় দৃশ্য দেখে অশ্বত্থামা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তিনি পাণ্ডবদেরকে সবংশে এবং সসৈন্যে সংহার করার জন্য নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করে বসেন। নারায়ণাস্ত্রের মহিমা এই যে, সশস্ত্র যে কোন মহাবীর ঐ অস্ত্রকে রুখবার জন্য আস্ফালন বা Challenge করলেই অস্ত্র তাকে ভস্মীভূত করে ফেলবেই। কিন্তু কৃষ্ণের উপদেশে সকলেই রথ থেকে নেমে নিরস্ত্র অবস্থায় নিক্ষিপ্ত প্রলয়ঙ্কর মহাস্ত্রের দিকে পিছন ফিরে নতশির হতেই, অস্ত্রে কারও কোন ক্ষতি হল না। পাণ্ডবরা অনিবার্য মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পেলেন। অশ্বত্থামার পিতৃশোক কিছুতেই প্রশমিত হল না। দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর হতাবশিষ্ট কুরুসৈন্যের সেনাপতি হন এই অশ্বত্থামা। তিনি ঐ সময় একদিন গুপ্তভাবে মাতুল কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মাকে সঙ্গে নিয়ে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করে পিতৃহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন, উত্তমৌজা, যুধামন্যু শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রসহ আরও অনেক

পাণ্ডব সৈন্যকে হত্যা করে আসেন। সেই সময় পঞ্চপাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি সেখানে না থাকায় তাঁরা ঐ গুপ্ত হত্যার হাত থেকে কোন মতে রক্ষা পান। পুত্রশোকে সতীসাধ্বী দ্রৌপদী প্রয়োপবেশন আরম্ভ করেন এবং ভীমকে বলেন, অশ্বত্থামাকে নিহত করে তার মাথার সহজাত মণি না পেলে তিনি কিছুতেই প্রয়োপবেশন ভঙ্গ করবেন না। তখন ভীম অশ্বত্থামাকে হত্যা করার জন্য অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন অশ্বত্থামার খোঁজে.........'।

মহানন্দস্বামীর কথায় বাধা দিয়ে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে উঠলাম – দ্রৌপদী আবার সতীসাধ্বী হলেন কবে থেকে! আমাদের গেঁয়ো ভাষায় একটা কথা আছে –

দিনভাতারি বারাঙ্গনা। আর পাঁচ ভাতারি দ্রুপদ কন্যা! বেশ্যারা দিন দিন সঙ্গী বদলায় আর দ্রৌপদী প্রতিমাসে এক একজন করে স্বামী বদলায়! তাকে আবার সতী বলা যায় না কি?

আমার কথায় মহানন্দস্বামী কান দিলেন না। তিনি অশ্বত্থামার প্রসঙ্গই আলোচনা করতে লাগলেন, বললেন – 'অশ্বত্থামার খোঁজে গিয়ে ভীম অর্জুন ও যুধিষ্ঠির দেখলেন, অশ্বত্থামা ব্যাস ও অন্যান্য ঋষিদের মধ্যে লুকিয়ে আছেন। পাণ্ডবরা সেখানেই তাঁকে আক্রমণ করলেন। আক্রান্ত অশ্বত্থামা তখন ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগের ইচ্ছা করে একটি ঈষীকা অর্থাৎ কাশতৃণ মন্ত্রপূত করে নিক্ষেপ করলেন। অর্জুনও তখন ব্রহ্মশির নিক্ষেপ করলেন। দুই অস্ত্রের সংঘাতে প্রলয়ের আশঙ্কায় ব্যাস এবং নারদ এসে দুই অস্ত্র হতে নিঃসৃত অগ্ন্যুদ্গীরণের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং উভয়কে অস্ত্র প্রত্যাহার করে নিতে নির্দেশ দিলেন। ঋষিদের নির্দেশে অর্জুন 'ব্রহ্মশির' প্রত্যাহার করে নিতে পারলেন বটে কিন্তু অশ্বত্থামা অস্ত্র সংবরণে অপারগ হলেন। তিনি সেই অস্ত্র অভিমন্যুর পত্নী উত্তরার গর্ভে নিক্ষেপ করে বসলেন। ফলে গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু হয় কিন্তু পরে কৃষ্ণ যোগবলে শিশুকে পুনর্জীবিত করে তুলেন।

এইভাবে অশ্বত্থামা পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে তাঁর মাথার সহজাত মণি পাণ্ডবদের হাতে তুলে দিয়ে বনে গমন করেন। বড়ই আশ্চর্যের কথা, সারা ভারতবর্ষে এত পাহাড় পর্বত অরণ্য থাকতেও অশ্বত্থামা মোক্ষদাত্রী সিদ্ধিদায়িনী নর্মদাতটের শূলপাণির ঝাড়িকে তাঁর বসবাসের শ্রেষ্ঠস্থান হিসাবে নির্বাচন করে নিয়েছিলেন, এতে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।'

মহানন্দস্বামীর বর্ণিত উপাখ্যানও শেষ হল, আমরাও পাহাড়ের উপর একটা বড় গুহার কাছে এসে পৌছে গেলাম। গুহার মুখে দেখলাম একটা বড় পাথর চাপা দেওয়া আছে। আমি পিতৃগত প্রাণ অশ্বত্থামার সাধন-গুহার কাছে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। একমাত্র হরানন্দজী ছাড়া আর সকলেই গুহার কাছে মাথা নত করে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

ওয়াকি সর্দার পাহাড়ের উপর ১০ মিনিট কাল হাঁটিয়ে নিয়ে এসে দক্ষিণ দিকের ঢালে আঙুল বাড়িয়ে দেখালো সাদরী মহল্লা। বলল – সাদরী গ্রামের অধিকাংশ ওয়াকি হলেও ঐ গ্রামে কিছু ভীল লোকও বাস করে। উৎরাই-এর পথে নামতে নামতে সর্দার জানাল, বহুকাল আগে ভূচেগাঁও হতে সাদরী এবং সাদরী পেরিয়ে আরও বিস্তীর্ণ ভূভাগ জুড়ে ভীলদেরই রাজত্ব ছিল। সাদরী মহল্লায় ভীলরাজাকে মহাদেব দর্শন দিয়েছিলেন। সেখানে ভীলেশ্বর মহাদেব আভিত্তক বিরাজমান। এখন বেলা হয়ে গেছে। আপনাদের স্নানাহার হয় নি। আপনাদের স্নানাহারের পর ভীলেশ্বর মহাদেবের কাহিনী শোনাব।

উৎরাই-এর পথে অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে বেলা প্রায় ১২টা নাগাদ আমরা পৌছে গেলাম ভূচেগাঁওএর আস্তানায়। এসেই পাঁচ জনে স্নান করতে বেরিয়ে পড়লাম নর্মদা

চৌকির পাশে নর্মদা ঘাটে। স্নানে যাওয়ার আগে আমি হরানন্দজীর ঝোলা হতে কর্পূরদানী এবং কতকটা কর্পূর নিয়ে গেলাম। যতক্ষণ অশ্বত্থামার গুহা দেখতে গেছলাম, অশ্বত্থামার কাহিনীই মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, কিন্তু ফিরে আসার পরেই আবার মস্তিষ্কের মধ্যে দেওয়ালে লেখা সেই দুর্বোধ্য শ্লোকগুলি ঘুরপাক খেতে লাগল। নর্মদার ঘাটে স্নান তর্পণাদি সেরে মা নর্মদার উদ্দেশ্যে আরতি করতে করতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম, বললাম, 'মা ! তুমি দয়া করে আমার মনকে শান্ত ও সুস্থির করে দাও। দয়াময়ী মাগো ! হর নর্মদে হর।'

স্নান করে এসে দেখি, কালকের মতই সর্দার এক কুঁদা দুধ এবং কতকটা কন্দমূল এনেছে আমাদের জন্য। আমাদের ভিক্ষা গ্রহণ যখন শেষ হল, তখন বেলা পৌনে দুটা বেজেছে। আমি যতীশ্বরানন্দকে বললাম – আজ ৩রা ফাল্গুন, মহানন্দস্বামীকে ত দেখছি বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন, হাতে পায়ে বলও পেয়েছেন। পরিক্রমার পথে বেরিয়ে পড়তে আপনারা কবে নাগাদ সমর্থ হবেন ? জ্যোতির্ময়ানন্দ বললেন – আমরা ত সুস্থ হয়েই উঠেছি। আজ তিন জনে আমরা নর্মদার ঘাটে স্নান করতে গেছলাম। এখানে বসে গরম জলে স্নান করি নি। আগামী কালই যদি যাত্রা করেন, আমরাও যাব, এবার আর সঙ্গ ছাড়ছি না।

কথা বলতে বলতে সর্দার সহ আরও তিনজন বয়স্ক ওয়াকি আমাদের কাছে এসে পৌঁছল। মহানন্দস্বামী সর্দারকে বললেন সাদরী গ্রামের ভীল্লেশ্বর মহাদেবের গল্প শোনাতে। সর্দার গল্প আরম্ভ করল – সে বহুকাল আগের কথা। তখন এদেশে যে ভীলদের রাজা ছিল, তার মধ্যে ধর্মের কোন ভাব ছিল না। বুনো বর্বর বলতে যা বুঝায় সে সেই প্রকৃতিরই ছিল। মাঝে মাঝে সে ঘোড়ায় চড়ে যত্র তত্র বেরিয়ে পড়ত নিজের রাজ্যের অবস্থা দেখতে। তার মনে একটা অহংকার ছিল যে সে রাজা। ভগবান বা দেবদেবতার কোন ধার ধারত না। সে ভাবত, ভগবান বলে যদি কেউ থাকে, ত তাকে মানতে হবে কেন। ভগবান হয়ত একটা বড় রাজ্যের রাজা, আমি একটা ছোট রাজ্যের রাজা। দেখা হলে দুজনে নয়ত বন্ধুত্ব করে নিব, মানামানির প্রশ্ন আসে কোত্থেকে ? ভগবান রাজার ঠিকানা কি, কোথায় থাকে সে ? ঠিকানা না জানালে কি ভাবেই বা তার সঙ্গে ভেট করা যায় ?

এই চিন্তা মাথায় ঢোকার পর থেকে সে নানাজনের কাছে ভগবানের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতে থাকে। কিন্তু কেউ ভগবানের ঠিকানা বলতে পারে না। অবশেষে একদিন সে নর্মদাতটে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতে ঘুরতে এক স্থানে দেখল, একটা শিব মন্দিরে বহু সাধুর সমাগম হয়েছে। কৌতূহলী হয়ে সে দূর থেকে তাদের ক্রিয়াকলাপ দেখতে লাগল। দেখল, কেউ শিবলিঙ্গের মাথায় নর্মদার জল ঢালছে, কেউ দুধ ঢালছে, কেউ বা মন্ত্র পড়ে ভক্তিভরে বেলপাতা চাপিয়ে প্রণাম করছে। একজন সাধুকে জিজ্ঞাসা করতে সাধু তাকে জানাল – মন্দিরের ঐ শিব লিঙ্গই ঈশ্বর। ভগবান রাজার সন্ধান পেয়ে ভীলরাজার মনে আর আনন্দ ধরে না। যেখানে সে এই সন্ধান পেল, সে দেশ তার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। সেই সাধুর কাছেই জিজ্ঞাসাবাদ করে সে জানতে পারল যে ভীলরা নীচ জাতি বলে গণ্য মন্দিরে তাদের প্রবেশাধিকার নাই। মনের ক্ষোভ চেপে রেখে ভীলরাজ তার স্বরাজ্যে নিজের ঘরে ফিরে এল। রাতে ভগবান রাজার চিন্তায় তার ঘুম হল না। সারাদিন ছটপট করে কাটিয়ে মধ্যাহ্নের পরেই সে ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে পড়ল ভগবান-রাজার মন্দিরের উদ্দেশ্যে। পথে যেতে যেতে সে একটা মহুয়া গাছের ডাল হতে মৌচাক ভেঙ্গে নিল, বেলগাছ হতে একটা সুপক্ব বেল এবং কিছু বেলপাতাও পেড়ে নিল। একটা ছোট মাটির কলসী যাতে সে মুখ লাগিয়ে জল খায়, সেটাও ঘোড়ার জিনে বেঁধে নিতে ভুলল

না। এই সব নিয়ে যখন সে তার ভগবান-রাজার মন্দিরে প্রবেশ করল, তখন রাত্রি হয়ে গেছে। মন্দির জনমানব শূন্য। ঘোড়াটিকে মন্দিরের থামায় বেঁধে রেখে পাশেই নর্মদার ঘাট থেকে তার উচ্ছিষ্ট সেই জলের পাত্র নর্মদাতে ডুবিয়ে জল এনে পদাঘাতে রুদ্ধ মন্দির-দ্বার ভেঙে ফেলল। মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢালল। পূর্বে সাধুদেরকে যেমন করতে দেখেছিল, সেইভাবেই সে বিল্বপত্র চাপিয়ে সুপক্ক বেলটি ভেঙ্গে শিবের মাথায় দিল। মৌচাক ভেঙ্গে মধুও ঢালল লিঙ্গের মাথায়। তারপর করজোড়ে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল – বন্ধু, তোমার জন্য ভেট এনেছি গ্রহণ কর আর আমার সঙ্গে দুটো কথা কও। শিবলিঙ্গের কাছ হতে কোন জবাব না পেয়ে বড়ই কাতর হয়ে পড়ল ভীলরাজ। নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল ভীলরাজ। রাত্রি তৃতীয় প্রহর গত হয়ে যাচ্ছে দেখে ভীলরাজ নিরাশ হৃদয়ে ঘোড়ায় চড়ে ফিরে গেলেন নিজের রাজ্যে নিজের ঘরে। সকালে ঘরে ফিরে কারও সঙ্গে কোন কথা বলল না। কোন খাদ্য গ্রহণও করল না। মধ্যাহ্ন কাল অতীত হতেই আবার সে ঘোড়ায় চড়ে রওনা হল সেই শিব মন্দিরের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে এক হাঁড়ি হেড়িয়া বা পচাইও সঙ্গে নিল। পথে যেতে যেতে সে বন্য অশ্বগন্ধার মূল, কন্দমূল, নানরকম ফল ফুলও সংগ্রহ করে নিয়ে চলল তার ভগবান রাজার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে। সন্ধ্যার কিছু পরে সেখানে পৌঁছে, মন্দিরে ঢুকে শিবলিঙ্গের মাথায় পচাই-এর কলসী উপুড় করে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল – বন্ধু! আমি তোমার জন্য এই দেখ কত ভেট এনেছি। ফলমূল বিল্বপত্র সবই তোমাকে ভেট দিচ্ছি। দয়া করে এগুলি তুমি গ্রহণ কর, আমি তোমার কাছে আর কিছুই চাই না। কেবল তুমি আমার সঙ্গে দুটো কথা বল, একবার বন্ধু বলে ডাক!

এইভাবে সে শিবলিঙ্গের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে অনেক কাকুতি মিনতি করল, অনেক চোখের জল ফেলল। তবুও পাষাণ শিবলিঙ্গ পাষাণবৎ নীরবই থাকল। রাত্রির শেষ যাম উত্তীর্ণ হতে বসেছে দেখে সে হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে ফিরে চলল নিজের ঘরে। সেদিনও সে ঘরে গিয়ে কিছু খেল না, কারও সঙ্গে কোন বাক্যালাপও করল না। ঘরের দরজা বন্ধ করে সে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল – মহামান্য ভগবান রাজার মর্যাদার অনুরূপ ভেট আমি দিতে পারি নি। তাই হয়ত বন্ধু আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করলেন না। বন্ধু বলে স্বীকার করলেন না। আজ আমি সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন বলতে আমার কোষাগারে যা কিছু আছে, সবই নিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে ভেট দিব, দেখি তিনি দর্শন দেন কি না। এই সংকল্প মনের মধ্যে জাগা মাত্রই ভীলরাজ তার কোষাগারে ঢুকে মূল্যবান সোনাদানা চুনী প্রবাল মুক্তো যা কিছু ছিল সবই একটা থলিয়ায় ভরে ঘোড়ায় চড়ে মধ্যাহ্ন হতে না হতেই রওনা হয়ে গেল শিব মন্দিরের উদ্দেশ্যে। তার জল পাত্র ভরে এক কলসী দুধও নিয়ে গেল আজ। সন্ধ্যার মুখে গিয়ে পৌঁছল শিব মন্দিরে। জঙ্গলে লুকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। মন্দির জনমানবশূন্য হতেই সে মন্দিরে প্রবেশ করল। মন্দিরে ঢুকেই দুধের কলসী উপুড় করে ঢেলে দিল শিবলিঙ্গের উপর। কাঁদতে কাঁদতে বলল – তোমার জন্য আমার যথাসর্বস্ব এনেছি বন্ধু। তুমি দয়া করে এই রত্নগুলি গ্রহণ কর। এই বলে তার থলি উপুড় করে চুনী প্রবাল মুক্তো সোনাদানা সবই ঢেলে দিল শিবলিঙ্গের উপর। ব্যাকুলভাবে কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা করতে লাগল – হে জগদীশ্বর! তুমি যদি সত্যি জগতের রাজা এবং কর্তা হও, তাহলে আমার এই ভেটগুলি গ্রহণ করে একবার দয়া করে ডাক 'বন্ধু' বলে। অশ্রুসজল কণ্ঠে 'বন্ধু বন্ধু বন্ধু হে' বলে মন্দিরের মধ্যে আকুল কণ্ঠে ডাকতে লাগল ভীলরাজ। তার কণ্ঠস্বর শূন্য মন্দিরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। তবুও তার ভগবান রাজার কাছ থেকে কোন সাড়া মিলল না। এইভাবে রাত্রির তৃতীয় প্রহরও যখন অতিক্রান্ত

হতে যাচ্ছে, তখন সে অধীর হৃদয়ে বলে উঠল -- এখনও কথা বললে না বন্ধু ? তবে আমার উপঢৌকনে তুমি কি সন্তুষ্ট হও নি ? আমার যথাসর্বস্ব ত তোমাকে দিলাম, বল আর কি দিলে তুমি সন্তুষ্ট হবে ? তুমি যা চাইবে তাই দিব তোমাকে, তুমি একবার মুখ ফুটে কথা বল। তবুও প্রস্তর লিঙ্গ হতে কোন সাড়া মিলল না। অবশেষে সে কাঁদতে কাঁদতে বলল -- বুঝেছি, তুমি আমার সৎ বা অসদুপায়ে অর্জিত, পথচারী নিরীহ সাধু সন্ন্যাসীর কাছ হতে বহুদিন ধরে লুণ্ঠিত পার্থিব সম্পদ ঘৃণাভরে হয়ত গ্রহণ করছ না, প্রত্যাখ্যান করছ ! শুনেছি, মানুষের শ্রেষ্ঠরত্ন তার চোখ দুটি। বেশ আমার চোখ দুটোই উৎপাটন করে ডালি দিচ্ছি, দেখি এইবার তোমার মন টলে কিনা। এই বলে তার তূণ হতে একটা তীর এনে বামচক্ষু উৎপাটন করে সেই রক্তাপ্লুত চক্ষু শিবলিঙ্গের উপর অর্পণ করল। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে কাতরকণ্ঠে বলতে লাগল -- হে বন্ধু ! জগতের রাজা ! আমি ত তোমাকে আমার শ্রেষ্ঠরত্ন দিয়েছি, তবুও কেন নীরব বল। বুঝেছি, তুমি আমার দ্বিতীয় চক্ষুটাও চাও। কিছু দিয়ে কিছু রাখলে বোধ হয় তুমি তুষ্ট হও না ? বন্ধু ! তোমার হৃদয়ে বোধ হয় বিন্দু মাত্র করুণা নাই ? এইজন্যই বুঝি পাষাণ লিঙ্গের রূপ নিয়ে তুমি আবির্ভূত হয়েছ ? তবে এই নাও বন্ধু ! আমার দ্বিতীয় চক্ষুটাও নাও। এই বলে ভীলরাজ তার ডান চক্ষু উৎপাটন করতে উদ্যত হতেই শিবলিঙ্গ হতে জ্যোতির্ময় মূর্তিতে উদ্ভূত হয়ে মহাদেব ভীলরাজের হাত ধরে ফেলে বললেন -- 'এই আমি এসেছি বন্ধু !'

-- এতক্ষণ তুমি আসনি কেন ? তিন দিন ধরে একবিন্দু জলও মুখে দিই নি। কেবলই কেঁদেছি এবং কেঁদে কেঁদে তোমাকে ডেকেছি। মহাদেব বললেন -- আমি অনেক দূরে ছিলাম। তোমার ডাক শুনতে পাই নি। এখন বল বন্ধু ! তোমার কি চাই ? ভীলরাজ আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে উত্তর দিল -- তুমি যে বন্ধু বলে ডাকলে তাতেই আমি ধন্য। আর কিছু চাই না আমি। একান্তই যদি দিতে চাও, তাহলে এই মন্দিরে তুমি যেমন রূপে আছ, এই রকম রূপ নিয়েই তুমি আমার বাড়ীর কাছে সাদরী গ্রামে আবির্ভূত হও, তাহলে রোজ রোজ তোমাকে দেখতে পাবো, বন্ধু বলে রোজ রোজ আদর করতে পারব।

'তথাস্তু' বলে মহাদেব তিরোহিত হলেন ; যাওয়ার আগে তার চক্ষু দুটিতে হাত বুলিয়ে নষ্টচক্ষু পুনরুদ্ধার করে গেলেন। মনের আনন্দে কৃতকৃত্য হয়ে ভীলরাজ স্বগ্রামে ফিরে এসে দেখল তার বাড়ীর পাশেই এক স্বয়ম্ভু লিঙ্গের আবির্ভাব ঘটেছে। দর্শন মাত্রই অসহ্য পুলকে ভীলরাজ অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল। সাদরী গ্রামে সে শিবের মন্দির এখনও আছে। 'ভীলেশ্বর' নামে তিনি এখনও ওয়াস্কি ও ভীলদের দ্বারা নিত্য পূজিত হচ্ছেন। আজ বেলা হয়ে গেছল, স্নান পূজার দেরী হবে বলে আপনারা সাদরী মহল্লায় যেতে চাইলেন না, গেলে আজই আপনারা দর্শন করতে পারতেন।

হরানন্দজী সর্দারকে বললেন -- তোমার 'অশ্বত্থামার' উপাখ্যান শুনতে শুনতেই আমাদের সময় নষ্ট হল। পরিবর্তে পথে যেতে যেতে তুমি যদি এই ভীলেশ্বর মহাদেবের কাহিনী বলতে তাহলে আমরা অবশ্যই সাগ্রহে সেখানে আজই যেতাম। যাই হোক, কাল সকালেই স্নানের পর আমরা ভীলেশ্বরকে দর্শন করতে যাব। সর্দারের কথা শুনতে শুনতে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। সর্দারজী তার কুটীরে চলে গেলে আমরা একে একে ঘরে ঢুকলাম। ঘরে ঢুকে সেই দেওয়ালে লেখা শ্লোকগুলির দিকে চোখ পড়তেই মনের সেই চাপা আগুন আবার ধিকি ধিকি করে জ্বলতে লাগল।

আমার মুখ চোখের অবস্থা দেখে হরানন্দজী আমার দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন --

নেহি জ্ঞানকা গাঁঠরী নেহি চাতুরকা চোজ।
মন্ কি অভিমান মেট্নি এহি অনুভবকা ওজ ॥

বুঝলেন শৈলেন্দ্রনারায়ণজী, আমাদের গুরুদেব এই দোঁহাটি শুনিয়ে এর অর্থ বলে দিয়েছিলেন – জ্ঞানের কোন গাঁঠরী অর্থাৎ পোঁটলা নাই। পোঁটলা খুলে এক একটি বস্তু দেখানোর মত মস্তিষ্কের মধ্যে নাড়া দিয়ে সর্বপ্রশ্নের সমাধান সম্ভব নয়। তবে যে বিদ্বান ব্যক্তিরা সবজান্তার অভিনয় করে সব প্রশ্নের সমাধান করতে যায়, সেটা উঠান চালাকি ছাড়া আর কিছু নয়। যখন মন হতে সব রকমের আত্মাভিমান দূর হয়, তখনই প্রকৃত জ্ঞানের উপলব্ধি ঘটে। বুঝলে শৈলেন্দ্রনারায়ণজী ! লক্ষ্মী ভাইটি আমার, ঐ তিনটি উদ্ভট শ্লোক মাথা থেকে মুছে ফেলে শান্ত মনে সান্ধ্যক্রিয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করুন। রাত্রে কাল আদৌ ঘুমাতে পারেন নি, তা লক্ষ্য করেছি। আজ ঘুমানো চাই। না হলে শরীর ভেঙ্গে পড়বে। এখনও অনেক দূরের রাস্তা আমাদেরকে পরিক্রমা করতে হবে।

তাঁর কথা শুনে সকলের সঙ্গে সান্ধ্যক্রিয়া করতে বসলাম। সান্ধ্যক্রিয়ার শেষে মা নর্মদার কাছে প্রার্থনা করলাম – মাগো ! আমার আত্মগরিমায় ঘা দিয়ে মঙ্গলময়ী, তুমি আমার মঙ্গলই করেছ। আমার এই মূঢ় আত্মাভিমান আঘাতে আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করে দাও। ক্রিয়ান্তে সকলেই শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে লাগলাম বাবার কথা। মনে মনে বলতে লাগলাম – বাবা ! যে কোন পরীক্ষায় আমি কৃতিত্বের সঙ্গে সফল হলেই তোমার গর্ব ও আনন্দের অন্ত থাকত না। বড়মুখ করে সকলের কাছে বলে বেড়াতে ! আজ তুমি দেখ তোমার আদরের শৈলেন আজ নর্মদা তটে এসে পরীক্ষায় ফেল করেছে। এই কথা বলতে বলতেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যেই দেখতে পেলাম, সমগ্র ঘর আলোতে ভরে গেছে, আমার ভ্রূদ্বয়মধ্যবর্তী স্থান থেকে এক আলোর রশ্মি উঠে গেছে উপরের দিকে। সেই রশ্মিপথে দাঁড়িয়ে আছেন মহাত্মা প্রলয়দাসজী এবং বাবা। উভয়েরই মুখে মৃদু হাসি। আমি শশব্যস্তে বাবাকে প্রণাম করে মহাত্মার চরণতলে নত হতেই তিনি বলে উঠলেন –

এতো গতি হ্যায় অট্‌পটি ঝট্‌পট লখে ন কোয়।
যব মনকে খটপট মিটে ঝট্‌পট্ দর্শন হোয় ॥

– অর্থাৎ জীবের মনের গতি বিশুদ্ধ জ্ঞান বা সর্বজ্ঞতার দিকে সহজে ধাবিত হয় না। তার প্রধান কারণ মন নানারকম অভিলাষ বা অভিমান বশে সতত চঞ্চল থাকে। এরই নাম 'অট্‌পটি'। যখন মন হতে সব রকম আত্মাভিমান এবং অহংকার দূর হয়ে যাবে অর্থাৎ চিত্ত সম্পূর্ণরূপে বাসনা শূন্য নিস্তরঙ্গ হবে, তখনই সেই শুদ্ধ পবিত্র মনে ঝটপট বিশুদ্ধ জ্ঞানের অক্ষয় কোষ হতে যে কোন শব্দার্থ বা জটিলতম রহস্যের গুঢ় সমাধান সম্ভব হয়। বলেই তিনি মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন।

বাবা বললেন – এমন মূর্খও কেউ আছে, গোটা তিনেক শ্লোকের অর্থ বুঝতে না পেরে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে বসে ? বেদ এবং পাণিনি পড়ে দুনিয়ার সব কিছু শব্দের নিগুঢ় অর্থ বুঝতে পারবে, এই রকম আশা করাটাই ভুল। ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্য হল শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয় করা। অনাদিকাল হতে ভারতীয় ঋষিরা অনেক রকমের ব্যাকরণের সূত্র রচনা করে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দগঠন করে তার নিগুঢ় অর্থ নির্ণয় করে গেছেন। স্বয়ং মহেশ্বর কৃত মহেশ্বর সূত্র ছাড়াও পাণিনির পূর্ববর্তী অনেক আচার্য যেমন শাকটায়ন, ব্যাড়ি, কাত্যায়ণ প্রভৃতি বৈয়াকরণ স্ব স্ব নামে বিভিন্ন ব্যাকরণ রচনা করে গেছেন। তার ফলে সংস্কৃত সাহিত্যে অমেয় এবং অপরিমেয় শব্দ সম্ভারের সৃষ্টি হয়েছে। মহর্ষি যাস্ক প্রণীত নিরুক্তই বৈদিক শব্দকোষের শেষ কথা নয়। তার পূর্বেও অনেক নিরুক্তকার ছিলেন। একই শব্দের বিভিন্ন ব্যকরণের সূত্রানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের দ্যোতক হতে পারে। যে তিনটি শ্লোকের অর্থ নিয়ে তোর মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে,

তা হল বিদগ্ধ মুখমণ্ডলম্ নামক চির প্রসিদ্ধ সংস্কৃত হেঁয়ালি কাব্যের ৪৯, ৫০ এবং ৫১ নম্বর শ্লোক। সংস্কৃতজ্ঞ সুধী সমাজে এই বই-এর আদর চিরকালই ছিল, এখনও আছে। ৪৯ নম্বর শ্লোক অর্থাৎ 'তীরে ক্ষীর সমুদ্রস্য কালকূট বিষং পপৌ। ইহাপি গোপিতঃ কর্তা বুধৈরপি ন বুধ্যতে।' এই শ্লোকের অর্থ হল ইহা অর্থাৎ শিব ক্ষীর সমুদ্রের তীরে কালকূট বিষ পান করেছিলেন। এখানে 'ইহা' এই কর্ত্তৃপদটি এমনভাবে রয়েছে যে, হঠাৎ পণ্ডিতগণও 'ইহাপি' শব্দটিকে সপ্তম্যন্ত 'ইদম্' শব্দের রূপ (ইহ = এখানে) বলে ভেবে নিয়ে ভুল করে বসেন। 'ই' শব্দের অর্থ কাম, আর 'হা' শব্দের অর্থ হনন কর্তা। অতএব ইহা শব্দের অর্থ দাঁড়াল – কামের হনন কর্তা, কাম হন্তা অর্থাৎ কামারি শিব। সমুদ্র মন্থনকালে ক্ষীর সমুদ্র হতে যে কালকূট বিষের উদ্ভব হয়েছিল এবং মহাদেব তা নিঃশেষে পান করেছিলেন সেই পুরাণ প্রসিদ্ধ কথা সকলেরই জানা।

৫০ নম্বর শ্লোক অর্থাৎ 'গৌরী নখর সঙ্কাশং শ্রদ্ধয়া শশিনং দধৌ। ইহাপি গোপিতঃ কর্তা বুধৈরপি ন বুধ্যতে।' এই শ্লোকের অর্থ ইহা (মহাদেব) গৌরীর নখের ন্যায় শুভ্র চন্দ্রকে শ্রদ্ধা সহকারে মস্তকে ধারণ করেছিলেন। এখানেও 'ইহা' এই কর্ত্তৃপদটি পূর্বের মত গুপ্ত রয়েছে। ইহা শব্দের অর্থ যে শিব, একথা জানলে অর্থ বুঝতে কোন গোল থাকে না।

৫১ নম্বর শ্লোক অর্থাৎ'ভবানিশঙ্করোমেশ প্রতি পূজা পরায়ণঃ। কর্তা গুপ্তঃ ক্রিয়া গুপ্তা গুপ্তমামন্ত্রিতং পদম্ ॥' এই শ্লোকেও তোমরা ভবানি + শঙ্কর + উমেশং এইভাবে মূল শব্দটিকে ভেঙ্গে একার্থবাচক শব্দের রহস্য না বুঝতে পেরে বিভ্রান্ত হয়েছ। এখানে বলা হচ্ছে, হে কর ! ত্বম্ অনিশং নিরন্তরম্ উমেশং শিবং প্রতি পূজা-পরায়ণঃ ভব। এখানে ভক্ত তার হাত দুটিকে সম্বোধন করে বলছে, হে কর ! তোমরা সর্বদা শিবপূজায় তৎপর হও (ভব)। এখানে 'ত্বম্' এই কর্ত্তৃপদ, 'ভব' এই ক্রিয়াপদ এবং 'কর' এই সম্বোধন পদ গুপ্ত রয়েছে। ভব + অনিশং = ভবানিশং। কর + উমেশং = করোমেশং।

ধীরে ধীরে আলোর রশ্মি মিলিয়ে গেল। গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে আমি জেগে উঠলাম। রঞ্জনের ঘড়িতে তখন ৫ই ফাল্গুনের সকাল ৫টা। বৃহস্পতির সুপ্রভাত। আমার আনন্দ আর ধরে না। উত্তেজনায় বিহ্বল হয়ে আমি পাশের ঘরে স্বামীজীদেরকে ডেকে উল্লাসভরে চেঁচিয়ে উঠলাম – ইউরেকা ! ইউরেকা ! আমি পেয়েছি ! দেওয়ালে লিখিত সেই তিনটি শ্লোকের উত্তর পেয়ে গেছি আমি। গতরাত্রে স্বপ্নের মধ্যে বাবা দর্শন দিয়ে তিনটি শ্লোকেরই উত্তর বিশ্লেষণ করে দিয়ে গেছেন। তিনটি শ্লোকেই 'ইহা' এই কর্ত্তৃপদটি গুপ্ত আছে। দুটি শ্লোকে 'ইহাপি' শব্দ আছে বটে আমরা ইহা শব্দের সরল অর্থ 'এখানেও অর্থাৎ ইদং শব্দের সপ্তম্যন্ত রূপ বলে ভেবে নিয়ে ভুল করে বসেছিলাম। বাবা ভালভাবেই বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন যে 'ই' শব্দের অর্থ কাম আর 'হা' শব্দের অর্থ হনন কর্তা। তাহলে ইহা শব্দের অর্থ দাঁড়াল কামারি অর্থাৎ শিব। শিব অর্থ ধরতে পারলে শ্লোকের অর্থ বুঝতে আর কিছু কষ্ট হয় না। আমার চীৎকারের ফলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মহানন্দস্বামী, ত্রিদিবানন্দ, যতীশ্বরানন্দ, জ্যোতির্ময়ানন্দ চার জনেই আমাদের ঘরে ঢুকলেন, আর একবার দেওয়ালের লেখা শ্লোকগুলি পড়ে প্রতি শব্দের অর্থ মিলিয়ে নিলেন। আমি তাঁদেরকে আরও জানালাম যে বাবা জানিয়ে গেছেন, শ্লোকগুলি 'বিদগ্ধ মুখমণ্ডলম্' নামক পুস্তকের চির প্রসিদ্ধ হেঁয়ালি।

– আমি ত আগেই বলেছিলাম – ঐগুলো প্রহেলিকা, হেঁয়ালি, বর ঠকানো প্রশ্নের মত। ঐ নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভায়া ত তাই নিয়ে এমন লাফালাফি দাপাদাপি শুরু করে দিলে শেষ পর্যন্ত বাবাকেও অমর্ত্যভূমি হতে নেমে আসতে হল খোকনের আবদার মিটাতে !

আমি অন্যান্য সাধুদেরকে বললাম – বুড়োর কথা কান দিবেন না। এই সাত সকালে ওনার ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় ইনি ব্যাজার হয়েছেন। 'ব্রহ্মামুরারীস্ত্রিপুরান্তকারী' ইত্যাদি বারেক আওড়ে নিয়ে উনি সকাল সাতটা পর্যন্ত ঘুম লাগাতেন, তাতে বাধা পড়ে গেল কি না! তাই ওঁর মেজাজ বিগড়ে গেছে!

আমরা বিছানা পত্র গুটিয়ে রেখে সকলে মিলে স্নান করতে গেলাম, নর্মদার ঘাটে গামছা ও কমণ্ডলু নিয়ে। তখনও সূর্যোদয় হয় নি। অসুস্থ সেই চারজন সন্ন্যাসীও আজ আমাদের সঙ্গে গেলেন। পাহাড়ী জড়ি বুটির গুণে তাঁদের শরীর তরতাজা হয়ে গেছে। নষ্টা চৌকির কাছে নর্মদার ঘাটে আমরা এক হাঁটু জলে নেমে স্নান ও তর্পণাদি সারলাম। আজ যেন মনে হল, কুয়াশা থাকলেও কুয়াশার মাত্রা কম, জলের কনকনে ঠাণ্ডা ভাবটাও অপেক্ষাকৃত কম। উত্তরতটে কিছুটা সাদা বাষ্পের ভাব থাকলেও কিছু পরেই ধীরে ধীরে তা উবে যেতে লাগল। স্নান সেরে ফিরে আসার পথে পাহাড়ের উপর সূর্যোদয় হতে দেখে মহানন্দস্বামী প্রশ্ন করলেন ঐ যে আকাশে যে উদীয়মান সূর্য দেখছি এঁর নাম কি সবিতা? ওঁর বৈদিক পরিচয়টা কি? আমি বললাম – এখন চলুন বাসায় পৌঁছে জামা কাপড় পরে ভীমেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করতে যাই! পথে যেতে যেতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।

বাসায় ফিরে দেখি, পঞ্চায়েৎ গৃহের বারান্দায় ওয়াঙ্কি সর্দার বসে আছেন। আমাদেরকে দেখে সম্মার্জনী মুদ্রায় তিনি দণ্ডবৎ জানাতেই আমরাও নমো নারায়ণায় জানালাম, ভিজা গামছা ল্যাঙ্গট্ ইত্যাদি গাছের ডালে শুকোতে দিয়ে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম জলভরা কমণ্ডলু নিয়ে ভীমেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করতে। বেলা তখন সওয়া আটটা। আমাদের লক্ষ্য এখন সেই পাহাড় যেখানে অশ্বত্থামার গুহা আছে। চমৎকার রোদ উঠায় স্নানের পর হাঁটতে আমাদের ভালই লাগছে! উদী নদীকে কিছুটা দূরে রেখে ওয়াঙ্কি সর্দার আমাদেরকে নিয়ে চললেন ভিন্ন পথে একটু খানি বাঁ দিক ঘেঁসে। এ পথে দুচারবার অশ্বত্থামার পায়ের ছাপ বলে কথিত সেই বৃহদাকার পদচিহ্ন পাথরের উপর চোখে পড়লেও পরে আমাদের আর চোখে পড়ল না। পথে যেতে যেতে আমি মহানন্দজীর সূর্য বিষয়ক প্রশ্নের জের টেনে বললাম, আমরা সাধারণতঃ জানি সবিতা হচ্ছেন, উদীয়মান সূর্য। এই ভাবটি নিরুক্তেও আছে, বেদেও আছে। সর্বত্রই আছে যে, মধ্য রাত্র থেকে দিনের আলোর অভিযান সুরু হয়। যাকে আমরা Zero-hour বলি, তার থেকে সুরু হয়। প্রথমে অনুভব করি একটা dark-spell, ঘন তমিস্রাবৃত একটা মুহূর্ত। সেইখান থেকে দুভাগ করে দেওয়া হয়েছে অশ্বিদ্বয়কে – একজনকে বলে তমোভাক অশ্বী. আর একজনকে বলা হয় জ্যোতির্ভাক অশ্বী। গাঢ় তমিস্রার যেখানটাতে Zero-point, সেটা পার হতে সুরু হলেই অন্ধকার ক্রমশঃ তরল হতে সুরু করে। এটা প্রথম দিকে বুঝা যায় না! পরে যতই অন্ধকার তরল হয়ে আসে, তখন মানুষের চেতনায় একটা নূতন জাগৃতি দেখা দেয়, ঋষিরা এক একটা stage-এ এক একটা নামকরণ করেছেন। প্রথম যে অবস্থার বিকাশ ঘটে তিনিই উদয়ের দেবতা। তিনিই যজ্ঞ দেবতা, প্রথম দেবতা। তিনিই হচ্ছেন তমোভাক্ অশ্বী, তার পরেরটা জ্যোতির্ভাগ অশ্বী। এই অশ্বিদ্বয় আলোর প্রকাশকে পৌঁছে দেন যাঁর কাছে সেই দেবতার নাম উষা। উষার কূলে পৌঁছে দিবার পর তিনি আবার সেই আলোককে পৌঁছে দেন সবিতার কাছে।

ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৯২ নম্বর সূক্তে ১ থেকে ৬ষ্ঠ মন্ত্র পর্যন্ত উষা ও অশ্বিদ্বয়ের এই বিচিত্র কার্যকলাপ ভূ-প্রকৃতিতে এবং মানবচেতনায় কি ভাবে step by step এ কাজ করে চলেছে তার অপরূপ লক্ষণের বর্ণনা করেছেন দ্রষ্টা গৌতম ঋষি জগতী ছন্দে।

এতা উ ত্যা উষসঃ কেতুমক্রত পূর্বে রজসো ভানুমঞ্জতে।
নিষ্কৃণ্বানা আয়ুধানীব ধৃষ্ণবঃ প্রতি গাবোঽরুষীর্যন্তি মাতরঃ ॥ ১
– উষা দেবতাগণ আলোকে প্রকাশ করেছেন এবং অন্তরীক্ষের পূর্বদিকে জ্যোতি প্রকাশিত করেন। যোদ্ধাগণ যে রকম আয়ুধ সকলের সংস্কার করে সেই রকম স্বীয় দীপ্তি দ্বারা জগতের সংস্কার করে গমনশীল দীপ্তিমতী উষার প্রতিদিন আবির্ভাব ঘটে।

উদপপ্তন্নরুনা ভানবো বৃথা স্বাযুজো অরুষীর্গা অযুক্ষত।
অক্রন্নুষাসো বয়ুনানি পূর্বথা রুশন্তং ভানুমরুষীরশিশ্রয়ুঃ ॥ ২
– অরুণ ভানু কিরণ অনায়াসে উদিত হওয়ার পর রথ যোজন যোগ্যা শুভ্রবর্ণা গাভী সকলকে উষা দেবতাগণ রথে যোজিত করলেন এবং পূর্বের ন্যায় সমস্ত প্রাণীকে জ্ঞানযুক্ত করলেন। তারপরে দীপ্তিযুক্ত উষা দেবতা সকল শুভ্রবর্ণ সূর্যকে আশ্রয় করলেন।

অর্চন্তি নারীর পসো ন বিষ্টিভিঃ সমানেন যোজনেন পরাবৃতঃ।
ইষং বহন্তী সুকৃতে সুদানবে বিশ্বেদহ যজমানায় সুন্বতে ॥৩
– নেত্রী উষাদেবতাগণ উজ্জ্বল অস্ত্রধারী যোদ্ধাদের মত এবং উদ্যোগ দ্বারাই দূরদেশ পর্যন্ত স্বীয় তেজের দ্বারাই ব্যাপ্ত করেন। তাঁরা শোভন কর্মকারী দক্ষিণাদাতা যজমানকে সকল অন্ন প্রদান করেন।

অধি পেশাংসি বপতে নৃতূরিবাপোর্ণুতে বক্ষ উস্রেব বর্জহম্।
জ্যোতির্বিশ্বস্মৈ ভুবনায় কৃণোতি গাবো ন ব্রজং ব্যুষা আবর্তমঃ ॥৪
– উষা নর্তকীর মত রূপ প্রকাশ করছেন এবং গাভী যে রকম দোহন কালে নিজের উধঃ প্রকাশ করে সেইরকম উষাও নিজের বক্ষদেশ প্রকাশ করছেন। গাভী যে রকম গোষ্ঠে শীঘ্র গমন করে, সেই রকম উষাও পূর্বদিকে গমন করে বিশ্বভূবন প্রকাশ করে অন্ধকারকে ছিন্ন ভিন্ন করে চলেছেন!

প্রত্যর্চী রুশদস্যা অদর্শি বি তিষ্ঠতে বাধতে কৃষ্ণমভ্বম্।
স্বরুং ন পেশো বিদথেষ্বঞ্জঞ্চিত্রং দিবো দুহিতা ভানুমশ্রেৎ ॥৫
– উষার উজ্জ্বল তেজ প্রথমে পূর্বদিকে দৃষ্ট হয় পরে সকল দিকে ব্যাপ্ত হয় এবং বিপুল অন্ধকার অপসারিত করে। পুরোহিত যেমন যজ্ঞে আজ্য দ্বারা যূপকাষ্ঠ অঞ্জিত করে, সেই রকম উষাও নিজের তেজ প্রকাশ করছেন।

অতারিষ্ম তমসোস্পারমস্যোষা উচ্ছন্তী বয়ুনা কৃণোতি।
শ্রিয়ে ছন্দো ন স্ময়তে বিভাতী সুপ্রতীকা সৌমনসা জীগঃ ॥৬
– আমরা নৈশ অন্ধকারের পারে এসেছি। উষা সমস্ত প্রাণীকে চেতনা যুক্ত করেছেন। দীপ্তিমতী উষা সূর্যের প্রীতি পাবার জন্য নিজের দীপ্তির দ্বারাই হাসছেন। আলোক বিকসিতাঙ্গী উষা আমাদের সুখের জন্য অন্ধকার বিনাশ করছেন।

সবিতার প্রকাশ যেমন একটা স্তর, তার পরের স্তরটা হলেন ভর্গ। তার পরের স্তরটিকে সূর্য নামে প্রকাশ করা হয়। সে অবস্থাকে আমরা সূর্য বলি, সেই সূর্যকেই পরের স্তরে বলা হয় পূষা। পূষার পরে হলেন বিষ্ণু। সূর্যেরই একটি রূপ। বিষ্ণু হলেন মাধ্যন্দিন সূর্য। যে Zero hour থেকে আরম্ভ করা হয়েছিল, সেইখান থেকে আলোটা Zenith-এ গিয়ে উঠলো যেন! এইভাবে আলোর প্রকাশ বা উত্তরণ।

এরপরও কথা রয়েছে, আলোটা নেমে যাবে আবার, নিভে যাবে। আলো ওঠে আবার নামে। এই তার ক্রম বা ধারা। আবার বার ঘণ্টা দিনের পর বার ঘণ্টা রাত্রি। তাহলে বৈদিক ঋষিরা অশ্বিদ্বয় উষা এবং সূর্যের কথা বলতে গিয়ে যা যা বলছেন তা নিগূঢ় মর্ম এই যে, যতক্ষণ আলো আছে, ততক্ষণ জ্যোতি আছে, ততক্ষণ অশ্বিদ্বয়ের কথাও আছে। তারপর তারা ত গ্রস্ত হয়ে গেল। এল গাঢ় অন্ধকার।

এই যে সবিতা তাকে শুধু উদীয়মান সূর্যের প্রতীকরূপে গ্রহণ করলে চলবে না। এই যে অস্তগামী সূর্য তারও প্রতীক তিনি। অর্থাৎ সবিতার যেটা scope, সেটা এখান থেকে অর্থাৎ Zero-hour থেকে আরম্ভ করে আবৃত্ত হয়ে একটা পূর্ণবৃত্ত রচনা করে আবার ঐখানে ফিরে আসবে। এর মধ্যে তাহলে আমরা দুটো পর্ব পাচ্ছি। একটা হচ্ছে আলোর সহায়তা নিয়ে ক্রমশঃ এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হচ্ছে, এক সময় সেই আলো নিভে যাবে। তাই এইখানে ঋষিদের কথা হচ্ছে, এইবার চাই বীর্যের সাধনা, অন্ধকারের মধ্য দিয়েই আমরা অভিযান চালাব। কেননা, আলোর উদয়াস্ত আছে, কিন্তু যা নাকি আমাদের সংবিদ্-চেতনা-সংবিৎ, 'সংবিদ এষা স্বয়ং প্রভা', তার ত আর উদয়াস্ত বলে কিছু নাই।

আকাশ-পথে সূর্যের এই বিচিত্র দুটো সংবৃত্ত গতি এবং পরাবৃত্ত গতি দেখে বৈদিক ঋষিদের সাধনার ধারাও দুটি হয়ে গেল – একটি ধারা হল আলোর সাহায্যে উদয়ন। আর একটি ধারা হল অন্ধকারের সঙ্গে লড়াই করে উর্ধ্বপথে জাগরণ। একটা হল ঋষিদের সোমযোগের অন্তর্গত 'অগ্নিষ্টোম' যাগ, যেটি সন্ধ্যাবেলা শেষ হয়ে যায়। তারপর আসে যেটা, সেটা হল, 'অতিরাত্র' যাগ, সেটা ঐ dark-circleটাকে অবলম্বন করে। তাই ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের কয়েকটি সূক্তে যে বর্ণনা রয়েছে, তা ভালভাবে অনুধ্যান করলেই বুঝা যায় সবিতা যেমন উদয়ের সূর্য, অস্তগামী সূর্যও তিনি, ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ১৩৭ সূক্তের প্রথম মন্ত্রেই ঋষি বিশ্বাবসু বলেছেন –

সূর্যরশ্মির্হরিকেশঃ পুরস্তাৎ সবিতা জ্যোতিরুদয়াঁ অজস্রম্।

– দেব সবিতা সূর্যের কিরণে কিরণ যুক্ত, উজ্জ্বল কেশ বিশিষ্ট, তিনি পূর্বদিকে ক্রমাগত আলোকের উদয় করতে পারেন।

ঐ ঋগ্বেদেই ৪র্থ মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের তিন নম্বর মন্ত্রটিতে বামদেব ঋষি সবিতাকে লক্ষ্য করে বলেছেন –

আপ্রা রজাংসি দিব্যানি পার্থিবা শ্লোকং দেবঃ কৃণুতে স্বায় বর্মণে।
প্র বাহু অস্রাক্ সবিতা সবীমনি নিবেশয়ৎ প্রসুবন্নক্তুভির্জগৎ ॥

– দেব সবিতা তেজ দ্বারা দ্যুলোক এবং পৃথিবীলোককে পরিপূর্ণ করেন এবং স্বীয় কার্যের প্রশংসা করেন। তিনি প্রতিদিন জগৎকে নিজ নিজ কার্যে স্থাপন করে সৃজনকার্যে বাহু প্রসারিত করে থাকেন।

আবার সূর্য সম্বন্ধে ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৩৭-তম সূক্তে ৩ নম্বর মন্ত্রে অভিতপা ঋষির অনুভব এই যে, সূর্য বেগবান অশ্ব রথে যুক্ত করে আকাশ পথে গমন করেন। তিনি হরিৎ নামে সাতটি অশ্বীবাহিত রথে চলেন। জ্যোতি তাঁর কেশ (১/৫০/৮) – সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য। শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ ॥

প্রস্কণ্ব ঋষির এই স্পষ্ট ঘোষণা আরও দীপ্ত হয়ে উঠেছে মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষির অনুভূতিতে –

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষু মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবা পৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥ (ঋ১/১১৫/১)

বিচিত্র তেজপুঞ্জ স্বরূপ মিত্র বরুণ এবং অগ্নির চক্ষুস্বরূপ সূর্য উদয় হয়েছেন। দ্যাবা পৃথিবী অন্তরীক্ষকে নিজ কিরণে পরিপূর্ণ করেছেন। সূর্য স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীর আত্মা স্বরূপ।

সবিতৃ দেবের উদ্দেশ্যেই ব্রাহ্মণদের নিত্য জপ্য প্রসিদ্ধ চিন্ময় মহামন্ত্র গায়ত্রী রচিত। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ইত্যাদি মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি বিশ্বামিত্র। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৬২তম সূক্তের দশমী ঋক ঐ মহামন্ত্র। প্রসিদ্ধ বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য সবিতৃ শব্দের পরমেশ্বর এবং সূর্য দুই রকম অর্থই করেছেন। তাতেই মনে হয় সূর্যের সঙ্গে

সবিতার খুবই ঘনিষ্ঠ, এমন কি, একাত্মও বলা যেতে পারে। দশম মণ্ডলের ১৫৮ সূক্তে দেখা যায়, সূর্যকে কখনও সূর্য বলা হয়েছে, কখনও বা সবিতা বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। তাই সহজেই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে তাঁর নামে পরিচিত হলেও তাঁরা অভিন্ন দেবতা। বেদে সবিতার যে বর্ণনাটি রয়েছে, তাতে তিনি যেমন উদয়ের সূর্য, অস্তগামী সূর্যও তেমনি তিনি। এই ভাবটি ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যজ্ঞের সময় খুব স্পষ্টভাবে ব্যবহার হয়েছে। তাই বলা হত – সবিতা সবিতোঃ প্রসবে।

প্রসবে, 'সবে', 'সূ' ধাতু হতে নিষ্পন্ন। প্রসবে অর্থাৎ প্রসব করা। আর যখন 'সু' ধাতু থেকে নেওয়া হয়, তখন অর্থ হয় impell করা, ঠেলে দেওয়া। সূ আর সু দুটো ধাতুই আসতে পারে, সবিতৃ শব্দের মধ্যে।

এই তত্ত্বটাকেই যদি চেতনার দিক থেকে দেখি, তখন বুঝি সাবিত্র শক্তি সব সময় আলোর দিকে উত্তরণের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এই কথা থেকে প্রশ্ন জাগতে পারে, আলোর গতিটা কি রকম হবে ? সেটা কি একটা সোজা গতি হবে, আলোটা shoot করবে সোজা উপরের দিকে ? না, সেটা বেঁকে যাবে, বেঁকে গিয়ে এখানে আবার ফিরে আসবে ? ঋগ্বেদে আলোর এই বক্রগতির কথা আছে। আলোর গতি অধ্বর। ধ্বর্ মানে বাঁকা বক্রগতি। যা থেকে ধ্বর্ > ধূর কথাটার উৎপত্তি। ধূর মানে কুটিল, বাঁকা, ধুরন্ধর।

এই ভাবটার সাদৃশ্য আছে, জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের আলোর থিওরীর সঙ্গে। এই যে আলোটা বেঁকে গিয়ে ঘুরে আবার ফিরে এলো, একটা আবৃত্তপরায়ণ বৃত্তে। Zenith-এ গিয়ে যখন আলোটা পৌঁছালো, তখন তার নাম মাধ্যন্দিন সূর্য। ঋগ্বেদে রয়েছে, এই মাধ্যন্দিন সূর্যই হলেন বিষ্ণু।

কথা বলতে বলতে কখন যে পাহাড় পেরিয়ে ঢালে নেমে এসেছি, বুঝতে পারি নি। ওয়াঙ্কি সর্দার বলে উঠল – ওহি ভীলেশ্বর মন্দর দেখাই দেতা হৈ। আমরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে মন্দিরের চত্বরে গিয়ে পৌঁছলাম। মন্দিরের সামনেই একটি বড় পাথরের কুঁয়া। কুঁয়ার স্বচ্ছ জল টেনে তোলার জন্য বাঁশের মাথায় দড়ি বালতি ঝুলানো আছে। সেখানকার একজন লোক আমাদেরকে জল তুলে দিল। আমরা হাত পা মুখ ধুয়ে মন্দিরের বারান্দায় গিয়ে উঠলাম, নর্মদার জল ভরা কমণ্ডলু হাতে করে। মন্দিরটি ছোট। কুঁয়াতে জল তোলার অদ্ভুত ব্যবস্থার প্রশংসা করতে ওয়াঙ্কি সর্দার হাসতে হাসতে বলল – ইসকো ঢেঁকু কহা যাতা হ্যায় ইসমে বহুৎ আসানি সে পানি উঠালো যাতা হ্যায়। হামারা ভূচেগাঁওমে ভি এ্যায়সা একঠো কুঁয়া মে ইন্তেজাম হ্যায়। মন্দিরে ঢুকে আমরা একে একে ভীলেশ্বররের মাথায় ভক্তিভরে জল ঢাললাম, শিবমন্ত্র পাঠ করতে করতে। ভীলরাজের উপর কৃপা বশতঃ কোন অতলস্পর্শী গহ্বর হতে পাথর ভেদ করে যে এই শিবলিঙ্গ বাইরে বেরিয়ে এসেছেন, তা আমাদের অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রায় এখনও এখানে শতাধিক ভীলের বাস। ওয়াঙ্কি সর্দার জানালেন, ভীল পুরোহিত সকাল ৯টায় এসেই পূজা করে চলে গেছেন। তাঁর প্রদত্ত ফুল বেলপাতা এবং আকন্দ ফুলের মালা সরিয়ে আমরা দেখলাম, শিবলিঙ্গের অর্ধভাগ রক্তবর্ণ এবং অর্ধভাগ শ্বেত মার্বেল পাথরের মত সাদা। শিবলিঙ্গের উপর ডম্বরু এবং ত্রিশূল চিহ্নও স্পষ্টভাবে অঙ্কিত আছে। আমি সাথী দণ্ডী সন্ন্যাসীদেরকে জানালাম – আমি শিলাচক্রার্থবোধিনী নামক একখানি বাংলা বইএ দেখেছি, ত্রিশূলডমরুধরং শুভ্র রক্তার্থ ভাগতঃ। অর্ধনারীশ্বরাহ্বানং সর্বদেবৈরভীষ্টদম্॥ কাজেই লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, ইনি অর্ধনারীশ্বর। সর্বাভীষ্টপূরণকারী। হরানন্দজী বললেন – আমাদের গুরুদেবের অভিমত হল – শিব শিবই, তাঁর লক্ষণ বিচার করতে নাই। দর্শন মাত্রেই প্রণাম ও পূজা করলেই যথেষ্ট। শিব অন্নপূর্ণা ছাড়া থাকেন না। তাই প্রত্যেকটি স্বয়ম্ভু লিঙ্গই অর্ধনারীশ্বর। তাঁর কথায় আমি চুপ করে গেলাম। আমরা কিছুক্ষণ জপ সেরে

মন্দিরাভ্যন্তর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, সেই মহল্লার সর্দার সহ ২০/২৫ জন নারী পুরুষ ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে। সেখানকার সর্দারের একবর্ণ ভাষাও বুঝার ক্ষমতা আমাদের নাই। ভুচেগাঁও এর ওয়াক্কি সর্দারই দোভাষীর কাজ করে আমাদেরকে জানাল – ইধরকা সর্দার ভিক্ষা কো লিয়ে বহুৎ মিনতি কর রহে। বেলা তখন বারটা বেজেছে। সেখানকার সর্দারের ইঙ্গিতে তখনই একটা বড় দুগ্ধবতী গাভী সেখানে টেনে আনল একটা লোক। এসেই সে দুধ দুইতে সুরু করল। হরানন্দজী তাঁর কমণ্ডলুটা এগিয়ে দিলেন। কমণ্ডলু দুধে ভর্তি হতেই তিনি সেই কমণ্ডলুর দুধ নিয়ে গিয়ে ঢাললেন শিবলিঙ্গের মাথায়। কয়েক ছড়া পাকা কলাও তারা এনে হাজির করল। মহল্লার সর্দার আমাদের প্রত্যেকের কাছে এসে হাত জোড় করতে লাগলেন। তার পীড়াপীড়িতে প্রত্যেকেই আমরা পেটভরে দুধ এবং কলা খেলাম। আমাদের সর্দারকেও সেখানকার সর্দার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে পেট ভরে খাইয়ে দিল। প্রেমানন্দ আমাদের সর্দারকে বলল – তুমি এদেরকে জানিয়ে দাও, এদের আদর আপ্যায়নে আমরা খুব খুশী হয়েছি। মহল্লার সাদরী নাম সার্থক।

ওয়াক্কি সর্দার আমাদের বক্তব্য বুঝিয়ে বলতেই তারা সবাই আনন্দে হেসে উঠল। আমরা ভীল্লেশ্বর মহাদেবকে পুনরায় প্রণাম করে পাহাড়ের তলায় পৌঁছে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে উঠতে লাগলাম পাহাড়ের উপর দিকে। অশ্বত্থামার গুহা থেকে কিছুটা দূর হতে আমরা উৎরাই-এর পথে নামতে নামতে মহানন্দস্বামী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন – আপনি যে সাদরী মহল্লায় যাওয়ার পথে সবিতৃদেব এবং সূর্যের কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করলেন – মাধ্যন্দিন সূর্যই বিষ্ণু, এ সম্বন্ধে বৈদিক ঋষিরা কি এমন কিছু বলেছেন যাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মাধ্যন্দিন সূর্যই বিষ্ণু ? তাঁরা কি শালগ্রাম শিলাকে বিষ্ণু বলে পূজা করতেন না ? মাধ্যন্দিন সূর্যকে প্রণাম জানালেই কি প্রকৃতভাবে বিষ্ণু প্রণাম হবে ?

– অবশ্যই। অবশ্যই। শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুর পূজার বিধি পৌরাণিক যুগ হতে প্রচলিত। গলায় শালগ্রাম শিলা বেঁধে বৈদিক ঋষিরা বনে জঙ্গলে পর্বতে ঘুরে বেড়াতেন, এমন কোনও উপাখ্যান আমি বৈদিক সাহিত্যে কোথাও পড়িনি। বৈদিক ঋষিরা কোথাও স্পষ্টভাবে, কোথাও বা শব্দার্থের ব্যঞ্জনা এবং লক্ষণায় সূর্যকেই বিষ্ণু বলে অভিহিত করেছেন। সূর্য যেমন তাঁর তিনটি পদ বিক্ষেপে ভূলোক দ্যুলোক অন্তরীক্ষকে পরিক্রমা করেন, ত্রিজগৎকে ধারণ করে থাকেন, তেমনি বিষ্ণুর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মহর্ষি উতথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি তাঁর ধ্যানোপলব্ধিতে প্রকাশ করেছেন – (১ম/১৫৪ সূ/১)

বিষ্ণোর্নু কং বীর্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিনমে রজাংসি।
যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ ॥

– আমি বিষ্ণুর বীর কর্মের কীর্তন করছি। তিনি পার্থিব লোক পরিমাপ করেছেন। তিনি উপরিস্থ জগৎ স্তম্ভিত করেছেন। তিনি তিনবার পদক্ষেপ করেছেন। লোকে তাঁর প্রভূত স্তুতি করে।

ঐ দশম মণ্ডলেরই ১৫৪ নম্বর সূক্তের পঞ্চম মন্ত্রে দীর্ঘতমা বলেছেন – উরু বিক্রমী বিষ্ণুর পরম পদে মধুর উৎস আছে, তিনি প্রকৃতই বন্ধু – উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণো পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ।

নিরুক্তকার যাস্কের মতে আকাশ হতে যখন অন্ধকার যায়, কিরণ বিস্তৃত হয় সেই হল সবিতার কাল। সায়ণাচার্যের মতেও সূর্যের উদয়ের পূর্বে যে মূর্তি, তাই সবিতা, উদয় হতে অস্ত পর্যন্ত যে মূর্তি, তিনিই সূর্য। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলে ২২ নং সূক্তের ৫ নম্বর, ১৬ নম্বর, ১৭ নম্বর এবং ২০ নম্বর ঋকে সূর্যই যে বিষ্ণু কিংবা বিষ্ণুই যে সূর্য সে সম্বন্ধে স্পষ্ট আভাস দিয়ে গেছেন বেদদ্রষ্টা ঋষি মেধাতিথি।

যদ্যথা – হিরণ্যপাণি মূর্তয়ে সবিতারমুপহ্বয়ে। স চেত্তা দেবতাপদম্ ॥

– হিরণ্যপাণি অর্থাৎ স্বর্ণোজ্জ্বল রশ্মিযুক্ত সবিতাকে আমি রক্ষণার্থ আবাহন করি। তিনি আমাদেরকে আমাদের প্রাপ্য পদ বুঝিয়ে দিবেন ॥ ৫

অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে। পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ ॥ ১৬

– বিষ্ণু সপ্তকিরণের সাথে যে ভূপ্রদেশ হতে পরিক্রমা করেছিলেন, সে প্রদেশ হতে দেবতাগণ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূলহমস্য পাংসুরে ॥ ১৭

– বিষ্ণু এ জগৎ পরিক্রমা করেছিলেন, তিন রকম পদবিক্ষেপ করেছিলেন। তাঁর রশ্মিযুক্ত পদে জগৎ আবৃত হয়েছিল।

তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ ২০

– আকাশে সর্বতোবিস্তারী যে চক্ষু যেমনভাবে সব কিছু দেখতে পায়, বিদ্বান ব্যক্তিরা অর্থাৎ ক্রান্তদর্শী ঋষিরা বিষ্ণুর পরমপদ সেইভাবেই প্রদীপ্ত দেখতে পান।

বিষ্ণু ও সূর্যের তত্ত্ব নিয়ে বৈদিক ঋষিরাও নিজেদের মধ্যে বিচার করেছিলেন। পরবর্তী যুগেও বেদজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছিল, বেদে উল্লিখিত বিষ্ণু কে ? তাঁর তিনপ্রকার পদবিক্ষেপই বা কি ? যাস্ক বলেন – যদিদং কিঞ্চতদ্‌বিক্রমতে বিষ্ণুঃ। ত্রেধা নিধত্তে পদম্। এই ভূমণ্ডলে যা কিছু দেখা যায়, সর্বত্রই সর্বতোবিস্তারী সূর্যরশ্মিরূপে বিষ্ণুই পদবিক্ষেপ করছেন। মহাত্মা শাকপুনিঃ নিরুক্তকার যাস্কের এই কথাকে স্পষ্টতর করার জন্য লিখেছেন – ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যাং অন্তরীক্ষ দিবি ইতি। বিষ্ণুর তিনটি পদবিক্ষেপ বলতে পৃথিবীতে অন্তরীক্ষে এবং আকাশে সূর্যের পরম প্রকাশকেই বুঝায়। নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য কথার মধ্যে কোন ধোঁয়ার সৃষ্টি না করে নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছেন – বিষ্ণুরাদিত্যঃ অর্থাৎ বিষ্ণুই আদিত্য। পার্থিবোঽগ্নির্ভূত্বা পৃথিব্যাং যৎকিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদধিষ্ঠতি। অন্তরীক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা। দিবি সূর্যাত্মনা। বিষ্ণু আমরা কাকে বলি ? ব্যাপ্নোতি ইতি বিষ্ণুঃ – বিষ্ণু হচ্ছেন সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছেন যিনি। সূর্য শক্তিই পৃথিবীর সর্ববস্তুতে অগ্নিরূপে অনুস্যূত। সেইটি তাঁর প্রথম পদবিক্ষেপ। 'অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ শক্তিরূপে তাঁর দ্বিতীয় পদবিক্ষেপ। শূন্যমণ্ডলে স্বর্গলোকে আত্মশক্তিরূপে সূর্যের তথা বিষ্ণুর তৃতীয় পদবিক্ষেপ। সমারোহনে উদয়গিরৌ উদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে। বিষ্ণুপদে মাধ্যন্দিনেঽন্তরীক্ষে। গয়শিরস্যস্তং গিরৌ ইতি ঔর্ণবাভ আচার্য মন্যতে। ঔর্ণবাভ আচার্য মনে করেন – উদয়কালে উদয়গিরিতে সূর্যের প্রথম প্রকাশ বিষ্ণুর প্রথম পদক্ষেপ। মধ্যাহ্নকালে বিষ্ণুশক্তিরূপে মাধ্যন্দিন সূর্য্যের প্রকাশ তাঁর দ্বিতীয় পদক্ষেপ এবং গয়শির অর্থাৎ অস্তগিরিতে সূর্যের অস্তগমন বিষ্ণুর তৃতীয় পদবিক্ষেপ। এক কথায় সূর্যের উদয়গিরিতে আরোহণ, মধ্য আকাশে স্থিতি এবং অস্তাচলে অস্তগমন এই তিনটি বিষ্ণুর পদবিক্ষেপ বলে বেদে বর্ণিত হয়েছে। এই উপমা হতে পরে পরে বামন অবতার, গয়াসুর প্রভৃতির কত যে পৌরাণিক গল্প সৃষ্টি হয়েছে, তার ইয়ত্তা নাই। প্রকৃতপক্ষে আসল কথা হল মাধ্যন্দিন সূর্যই হলেন বিষ্ণু। বৈদিক ঋষিদের এই সুস্পষ্ট অভিমত।

আমাদের কথা যখন শেষ হল, তখন আমরা ভূচেগাঁও-এ পৌছে গেলাম। তখন বেলা ৪টা বাজতে যায়। পঞ্চায়েত গৃহের বরান্দায় কিছুক্ষণ বসলাম। হরানন্দজী একে একে মহানন্দস্বামী ত্রিদিবানন্দ জ্যোতির্ময়ানন্দ এবং যতীশ্বরানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন – কি হে তোমাদের এখন শরীরের অবস্থা কি রকম বুঝছ ? কাল ৬ই ফাল্গুন শুক্রবার সকালেই এখান থেকে যদি আবার আমরা পরিক্রমার পথে বেরিয়ে পড়ি, তোমরা আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে ত ? তাঁরা একসঙ্গেই জবাব দিলেন 'স্বচ্ছন্দে। এই ত সাদরী মহল্লা থেকে ফিরে এলাম। যাতায়াত প্রায় তিন মাইল হাঁটা হল। আমরা গায়ে পায়ে কোমরে কোন ব্যথা অনুভব করি নি। কাজেই আগামীকাল সকালে যাত্রা করলে আমাদের হাঁটতে কোন

অসুবিধা হবে না।' হরানন্দজী বললেন – তাহলে আমরা আজ নর্মদা স্পর্শ করে মাকে প্রণাম করে আসি চল। এই বলেই তিনি উঠে পড়লেন। আমরা তাঁর সঙ্গে গিয়ে নক্টা চৌকির কাছে গিয়ে নর্মদা স্পর্শ করে, বন্দনা করে এসে পঞ্চায়েৎ গৃহে ঢুকলাম, তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ওয়াক্কি সর্দার ইতিমধ্যে ঘর দোর পরিষ্কার করে ঘরের মধ্যে দুটি চুল্লীতে কাঠ দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে। বারান্দায় আমাদের অসুস্থ সাথীদের দুজন চিকিৎসক অর্থাৎ ওঝা দুজনও বসে আছে। হরানন্দজী ঘরে ঢুকেই তাঁর ঝোলা থেকে প্রায় ৪ ডজন সুঁচ বের করে এনে সর্দারকে বললেন – কাল সকালেই আমরা এখান থেকে চলে যাবার মনস্থ করেছি। তোমরা আমাদের অসুস্থ সাথীদের জন্য যা করেছ, তা আমাদের চিরকাল মনে থাকবে। আমরাও এখানে আসার পর থেকে দুধ ফল ভিক্ষা করে, তোমাদের আদর আপ্যায়নে খুবই তৃপ্তি পেয়েছি। আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের কাছে এই রকম সামান্য জিনিষ ছাড়া আর কিছু নাই। তোমাদের হয়ত কাজে লাগতে পারে। এই বলে দু ডজন সুঁচ সর্দারের হাতে দিলেন আর দু ডজন সুঁচ দিলেন দুজন ওঝার হাতে। এই সামান্য জিনিষেই তাদের মনে আনন্দ দেখে কে? তাদেরকে বিদায় দিয়েই আমরা ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই হরানন্দজী বললেন – 'এদের সঙ্গে কথা বলার পরিশ্রম ছাড়া আর কিছু দুঃখ আমরা পাই নি। ভগবান এদের মঙ্গল করুন। সন্ধ্যা ঘ. .য়ে আসতে আমরা যে যার আসন ও বিছানা পেতে সান্ধ্যক্রিয়া করতে বসলাম। মহানন্দস্বামীরা চলে গেছেন তাঁদের ঘরে। বলতে ভুলে গেছি, গত পরশুই আমরা আমাদের কাছ থেকে ভাগাভাগি করে যার কাছে যা extra ছিল, তার থেকেই ভীলদের দ্বারা নির্যাতীত ঐ ৪জন দণ্ডীকে কাপড় ল্যাঙ্গট্ এবং জামা চাদর ইত্যাদি দিয়েছি। তাঁদের হাতে দণ্ডও ছিল না। সর্দারকে অনুরোধ করায় সে ৪টি শাল কাঠের লাঠি তাঁদের জন্য তৈরী করে দিয়েছেন। সান্ধ্যক্রিয়া সেরেই আমরা শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল সকাল সাড়ে ৬টায়। দরজা খুলে বাইরে বেরোতে গিয়েই দেখি, কুয়াশায় ঘিরে আছে চারদিক। দরজা ঝটিতি বন্ধ করে আমরা ঝোলা ও গাঁঠরী গুছিয়ে নিতে লাগলাম। 'ঠক্ ঠক্ ঠক্' – দরজায় কেউ যেন ধাক্কা দিচ্ছে। মুহূর্তের জন্য চমকে উঠেই মনে পড়ে গেল যে, সকাল হয়ে আসছে, আমরা বনের মধ্যে অসহায় অবস্থায় আচমকা কোন হিংস্র জন্তুর মুখে পড়ি নি! এটা বহু ওয়াক্কি অধ্যুষিত ভূচেগাঁও-এর পঞ্চায়েৎ গৃহ। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। দেখলাম ৫ জন ওয়াক্কি বুড়ী এসেছে, সুঁচ চাইতে। তারা শুনেছে যে, ওয়াক্কি সর্দার এবং ওঝা দুজন এখান থেকে সুঁচ পেয়েছে। মহানন্দস্বামীরাও লাঠি হাতে তৈরী হয়ে এসেছেন। প্রত্যেকের হাতেই একটি করে ছোট পুটলি। তাঁরা দুজন বুড়ীকে দেখিয়ে বললেন – এদের দেশে সুঁচের বড় আকাল। অথচ কাঁথা বা ছেঁড়া কাপড় সেলাই করতে সুঁচ অপরিহার্য। এই দুজন বুড়ী দাবা বেটে এবং গরম জল এনে দিয়ে খুব সেবা করেছে। সুঁচ থাকলে এদেরকে দিন। ফিস্ ফিস্ করে আরও বললেন সাদা বাংলায় এই দুজন ওঝাকে টাকা থাকলে গোটা পাঁচেক করে টাক দিন। এক ডজন করে সুঁচ ৫ জন বুড়ীকে দিতেই তারা আনন্দে কল্‌কল্ করতে করতে চলে গেল। রঞ্জন তার ঝুলি থেকে দুটো ৫ টাকার নোট দিল দুজন ওঝার হাতে। তারাও সম্মার্জনী মুদ্রায় দণ্ডবৎ জানিয়ে চলে গেল। রঞ্জনের ঘড়িতে সাড়ে সাতটা বাজতে যায় দেখেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। নক্টা চৌকির কাছে পৌঁছে মা নর্মদাকে দর্শন ও প্রণাম করেই পুলিশ ফাঁড়ির একজন রক্ষীকে হরানন্দজী পথের হদিস জানতে চাইলেন। সে বনের মধ্যে একটা পথের হদিস্ দিল। বলল – ইসি রাস্তাসে করীব ১০ মিল হাঁটনেসে আপলোগ বহাদল সংগম মেঁ পহুঁচ যাবেগী। বহাদল সংগম সে করীব এক মিল উস্ তরফ উত্তরতট মেঁ হাতনী সংগম হ্যায়। বহাদল নদীকা সংগম ইসী দক্ষিণতটপর পড়েগা

পাশ মেঁ বহাদল মহল্লা হৈ। উধর ভীল বেগেরা পাহাড়ী লোগোকাঁ বাস হ্যায়। পথ মেঁ তিনঠো পাহাড় আপকো অতিক্রম করনে হোগা। মার্গ জঙ্গল আউর পর্বতকা হৈ। লেকিন্ প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর হৈ।

পুলিশ রক্ষীকে 'নমো নারায়ণায়' জানিয়ে আমরা বনের পথ ধরে সোজা পূর্ব দিকে হাঁটতে লাগলাম নর্মদার গতিপথের দিকে লক্ষ্য রেখে। বনে অত্যন্ত আগাছা, বিশেষতঃ আগের দেখা সেই ওকড়া জাতীয় ফল। ক্রমশঃ নিবিড় থেকে নিবিড়তর বনে ঢুকে গেলাম। এমন বনের চেহারা অমরকন্টকের জঙ্গলে দেখেছি, দেখেছি সিন্দুরী সংগম এবং ডেহরী সঙ্গমের দুরারোহ পর্বতে। কিন্তু অদ্ভুত সৌন্দর্য এই বনের। বিশাল বিশাল বনস্পতির মাথায় কম্‌প্রিটাম আর ডিকেনড্রামের সাদাপাতা গজিয়ে ঠিক ফুলের মত দেখাচ্ছে। অপূর্ব শোভা। ডেহরী সংগমের নিকটস্থ পাহাড়ে এবং জঙ্গলের এই দুটো লতা বড় বড় গাছকে জড়িয়ে আছে দেখেছি কিন্তু এ গাছ এত উঁচুতে যে উঠতে পারে তা এখানে না এলে বুঝতাম না। প্রায় মাইল দেড়েক উঠে একটা পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছলাম। পাহাড়ের চূড়ার দিকে দেখে মনে হল, পাহাড়টা প্রায় দু হাজার ফুট উঁচু হবে। পাহাড়ে চড়াই-এর পথে কাঁঠাল নামক এ দেশী গাছের জঙ্গল, বড় বড় শাল গাছ, কাঁঠাল গাছ, বেল গাছ মহুয়া গাছ, মোটা মোটা কতরকম ডালপালা একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে দুষ্প্রবেশ্য করে রেখেছে এই পাহাড়। প্রাণপণ চেষ্টায় লাঠির উপর ভর দিয়ে, কোথাও বা ছোট ছোট গাছ, অনেক সময় বড় বড় গাছের নুয়ে পড়া ডাল ধরে উঠে চলেছি ক্রমশঃ উপরের দিকে। ওকড়া জাতীয় শুকনো ফল সারা গায়ে এমন কি যে সব সন্ন্যাসীর মাথায় বড় বড় চুলের জটা আছে তাতেও পর্যন্ত আটকে যাচ্ছে। চলেছি ত চলেছি, প্রায় ২ ঘণ্টা হেঁটেও কিছুতেই পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছতে পারলাম না। চূড়ায় উঠতে কিছুটা বাকী আছে দেখলাম ১০/১২টা ভালুক দল বেঁধে নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। আমরা ঘাপটি মেরে বসে রইলাম বড় বড় গাছের আড়ালে। ভালুকের দল চলে যেতেই আমরা আবার হাঁটতে লাগলাম চড়াই--এর পথে। একস্থানে পৌঁছে দেখতে পেলাম একটা ছোট ঝর্ণা একটি ছোট cascade সৃষ্টি করে বয়ে চলেছে ধীরে। ঝর্ণার জলে ভিজা এক জায়গায় বাঘের পায়ের ছাপ, বাইসনের পায়ের দাগও দেখলাম। হাতীর নাদ আর পায়ের দাগ ত অজস্র। এ বনে যে তেনাদের বাস আছে, তা ঐ সব দাগ দেখে বুঝতে হবে না। মা নর্মদার অশেষ দয়া যে আমরা তাঁর সামনে পড়িনি।

আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে উপরের পথটা ছেড়ে মালভূমির নিচের দিকে নামতে লাগলাম উপত্যকার সমতলে। কাঁটায় এবং কন্টকময় বন ফলে প্রায় ছ' মাইল রাস্তা হাঁটতে পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে ঝি ঝি করে জ্বলছে। কিন্তু নেমে গিয়ে হঠাৎ যে অপূর্ব সৌন্দর্যভরা দৃশ্য খুলে গেল, তার বর্ণনা দেওয়া বড় কঠিন। দেখতে পেলাম স্বচ্ছ জলের একটা বড় জলপ্রপাত। অনেক বড় বড় চৌরস পাথরের বড় বড় boulder ঝর্ণার মুখে পড়ে আছে। এখানে বড় বড় বনস্পতি আছে কিন্তু ধারে কাছে কোন কাঁটা গাছ নাই। একটু আগে এইমাত্র একটা ছোট ঝর্ণা দেখে এসেছি। কিন্তু লৌহ প্রস্তরের গা বেয়ে এই জলপ্রপাতটা যে কোন বড় ঝর্ণা থেকে বয়ে আসছে, তা আমরা কেউই এদিক ওদিক চূড়ার দিকে তাকিয়ে কিছুতেই ঠাওর করতে পারলাম না। নর্মদাতটের কোন জঙ্গলে চন্দন গাছ আছে বলে এ পর্যন্ত কখনও কারও কাছে শুনি নি। কিন্তু এখানে পৌঁছে চন্দন গন্ধের যে আঘ্রাণ পাচ্ছি! শুধু আমি নয়, সবাই চন্দনের সৌরভে আমোদিত হয়ে উঠেছেন। হরানন্দজী বললেন – রঞ্জন দেখতো হে, তোমার ঘড়িতে কটা বেজেছে? রঞ্জন 'পৌনে বারটা' বলতেই তিনি এইখানেই ঝর্ণার জলে স্নান করে ছাতু ভিজিয়ে খেয়ে নিতে বললেন। শুধু বলা নয়, তিনি নিজের বড় কমণ্ডলুটা সেই ঝর্ণার জলে ধুয়ে তাতেই ছাতু ভিজিয়ে

ফেললেন। মহানন্দস্বামীকেও বললেন, তাঁর কমণ্ডলুতেও ছাতু ভিজাতে। আমরা ঝর্ণার জল মাথায় দিয়ে কোন মতে মন্ত্র স্নান করে ফেললাম। হরানন্দজী বললেন – আসলে আমার খুব ক্ষুধা পেয়েছে। মহানন্দ প্রভৃতি চারজনকে কিছুটা বিশ্রাম করতেও দিতে চাই। তাই আমার এই স্নানাহারের ত্বরিত সিদ্ধান্ত। হঠাৎ ত্রিদিবানন্দ বলে উঠলেন, একটু উপরের দিকে তাকিয়ে ঐ দুটো মোটা শালগাছের ফাঁক দিয়ে একটা বড় গুহার মুখ দেখা যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন কি! গুহার প্রবেশ পথে মাথার উপরে কিছু যেন লেখাও আছে দেখতে পাচ্ছি। চলুন গিয়ে ঐ গুহাটা দেখি, অন্ততঃ কি লেখা আছে দেখে নিতে চাই। "কি দরকার আছে ঐ সব বাহাদুরী ফলিয়ে? যদি ঐ গুহার মধ্যে কোন বাঘ থাকে?" হরানন্দজী এভাবে ঝাঁঝিয়ে উঠলেও ত্রিদিবানন্দ ও মহানন্দস্বামী ততক্ষণে গুহার কাছাকাছি উঠে গেছেন। তাঁদের পিছন পিছন রঞ্জনও উঠে যাচ্ছে। অগত্যা ছাতুর কমণ্ডলু হাতে হরানন্দজী, আমি এবং বাকী সকলেই ক্রমে ক্রমে পৌঁছতে লাগলাম গুহার কাছে। গুহার মাথায় পাথরের উপর ক্ষোদাই করা আছে দেবনাগরী অক্ষরে – ব্যাঘ্রপাদ। অক্ষরটি পড়েই হরানন্দজী চেঁচিয়ে উঠলেন – মূর্খ সব! বাঘের পা লেখা আছে দেখেও গুহার কাছাকাছি এগিয়ে যাচ্ছ কেন? মরবে নাকি সবাই? 'ব্যাঘ্রপাদ' শব্দটার পাশেই যে লেখা আছে উপমন্যু তা কি আপনার চোখে পড়ছে না? হেসে উঠে বললেন মহানন্দস্বামী, 'আমার মনে হয় ব্রহ্মর্ষি ব্যাঘ্রপাদ এবং মহর্ষি উপমন্যুর তপস্থলী এটি। তাঁদের তপোবন ছিল বলেই এই বন এখনও চন্দন সুবাসিত', এই কথা বলেই মহানন্দস্বামী ত্রিদিবানন্দ সেখানে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। আমাদেরকেও বললেন – আপনারা এসেও প্রণাম করুন। আমাদের মহা সৌভাগ্য যে আজ তপোভূমি নর্মদায় এসে ব্রহ্মর্ষি ব্যাঘ্রপাদ এবং মহর্ষি উপমন্যুর সাধন গুহা দর্শন করতে পেলাম। মহাভারতে অনুশাসন পর্বের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে স্বয়ং বেদব্যাস তাঁদের বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করে গেছেন। পথে যেতে যেতে বলছি চলুন।' হরানন্দজী সহ আমরা বাকী সকলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। গুহা থেকে কিছুটা নেমে এসেই সেই বড় ঝর্ণাটার জলের ধারা নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে দেখে তারই পাশ দিয়ে উৎরাইএর পথ ধরলাম। হরানন্দজী বললেন – তাই তো বলি, এই দুষ্প্রবেশ্য ব্যাঘ্র ও বহু হিংস্র জন্তু অধ্যুষিত জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেও আমরা কেন বাঘ ভালুকের কোন সাড়া শব্দ পাচ্ছি না? মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে বলে গেছেন – অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসান্নিধ্যৌ বৈরত্যাগঃ অর্থাৎ কেউ যদি মনে প্রাণে অহিংস হয়, তাহলে তাঁর সন্নিহিত হওয়া মাত্রই খল ও হিংস্র ব্যক্তির মন থেকে হিংসা চলে যায়, মনে বৈরি ভাবও নষ্ট হয় মহর্ষি পতঞ্জলি বোধ হয় এ কথা জানতেন না যে প্রকৃত ঋষির সান্নিধ্যে ত বটেই তাঁর তপস্যাপূত তপোবনে, তা পরে তাঁর দ্বারা পরিত্যক্ত হলেও সেই স্থানের এমন প্রভাব থেকে যায় যে, সেখানকার হিংস জন্তু জানোয়াররাও অন্য জীবকে হিংসা করে না। এই বলতে বলতে হরানন্দজী হোঁচট খেলেন। হোঁচট খেয়ে তিনি পড়ে যাচ্ছিলেন, রঞ্জন তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে ফেললেন। আমি তাঁর হাত থেকে ছিটকে পড়া লাঠিটা তাঁর হাতে দিয়ে বললাম – মহর্ষি পতঞ্জলির উপর আর কলম চালিয়ে লাভ নাই। এই রকম দুরারোহ পাহাড়ী পথে হাঁটতে হাঁটতে একহাতে ছাতু খাবেন আবার মহর্ষি পতঞ্জলির কথার উপর মন্তব্যও করবেন, এ কেমন করে প্রকৃতি সহ্য করবেন বলুন? অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত ঋষিদের শুধু সান্নিধ্য নয়, তাঁদের বহুকালের পরিত্যক্ত তপোবনেও যদি তাঁদের তপস্যার প্রভাবে বাঘ ভালুক হায়েনা বিষধর সাপ প্রভৃতিও যদি হিংসা ভুলে যায়, তাহলে রামায়ণে যে রাক্ষসরা এসে ঋষিদের উপর উপদ্রব করতেন, সম্ভব হলে তাঁদেরকে হত্যাও করতেন, বাল্মীকি ঋষি রামায়ণে ঐ সবের যে বর্ণনা আছে, তা কি মিথ্যা? আমার কথা শেষ হতে না হতে কর্ণপটহ বিদারী একটা হুঙ্কার উঠল বাঘের। আমরা ভয়ে সকলেই চমকে উঠলাম

উৎরাইএর পথে নামতে নামতে ত্রিদিবানন্দ বললেন – বিতণ্ডা থাক। মহানন্দ ভাই, আমরা যে উপমন্যুর সাধন গুহা দেখে এলাম, ইনি কি সেই মহাত্মা যিনি গুরু আয়োদধৌম্যের আশ্রমে অধ্যয়নকালে নিষ্ঠাভরে গরু চরানোর কাজে ব্যাপৃত থাকা কালে ভিক্ষা করে খেতেন ? তা গুরু কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় গুরুগতপ্রাণ উপমন্যু ভিক্ষা ত্যাগ করে গো দোহনান্তে যে ফেন উদ্‌গার করত তাই সে পান করতে লাগল। গুরু একদিন তা জানতে পেরে তা করতেও উপমন্যুকে নিষেধ করলেন। তখন গরু চরাতে চরাতে ক্ষুধায় কাতর হলে তিনি শুধু মাত্র আকন্দ পত্র চিবিয়ে খেতেন। এইভাবে সেই তিক্ত কটু রুক্ষ সেই আকন্দ পাতা খেতে খেতে তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন। অন্ধ হয়েও তিনি গুরুর কাজ করে যেতেন। একদিন মাঠে গোচারণরত অবস্থায় একটা কূপের মধ্যে তিনি পড়ে যান। শিষ্যের খোঁজে বেরিয়ে আয়োদধৌম্য তদবস্থায় উপমন্যুকে দেখতে পেয়ে শিষ্যদের সাহায্যে তাঁকে তুলে বললেন – তুমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উপাসনা কর। তুমি আবার চক্ষুষ্মান হবে, আমার আশীর্বাদে তুমি অচিরাৎ সর্বশাস্ত্রদর্শী হবে, শ্রেয়োলাভ করবে, সর্বশ্রেষ্ঠ মহর্ষি হবে। আয়োদধৌম্যের আশীবাদ অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। ইনি কি সেই উপমন্যু, যাঁর সাধনগুহা আমরা এইমাত্র দেখে এলাম ?

– হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনিই। তিনি আয়োদধৌম্যের শিষ্য হলেও তাঁর পিতার নাম ছিল মহর্ষি ব্যাঘ্রপাদ। তাঁর কনিষ্ঠ সহোদরের নাম ছিল ধৌম্য। নাম একই হলেও এই ধৌম্য এবং পাণ্ডবদের পুরোহিত দুজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। পাণ্ডবদের পুরোহিত ধৌম্য ছিলেন মহর্ষি অসিতের পুত্র এবং মহর্ষি দেবলের জ্যেষ্ঠ সহোদর। মহর্ষি উপমন্যু নর্মদাতটের এই স্থলে গুরু আয়োদধৌম্যের আশীর্বাদে তপোসিদ্ধির পর হিমালয়ে অষ্টম মনু নামে কথিত মহর্ষি সাবর্ণির তপস্থলীতে গিয়ে বাস করেন। ঐ সময় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে মহর্ষি উপমন্যুর আশ্রমে গেলে মহর্ষি তাঁর কাছে আত্ম পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন –

তৎ সর্বং নিখিলেনাদ্য কথয়িষ্যামি তেঽনঘ।
পুরাকৃতযুগে তাত ! ঋষিরাসীন্মহাযশাঃ।
ব্যাঘ্রপাদ ইতি খ্যাতো বেদ বেদাঙ্গ পারগঃ।
তস্যাহমভবং পুত্রো ধৌম্যশ্চাপি মমানুজঃ ॥

– বৎস ! পূর্বে সত্যযুগে মহযশা এবং বেদবেদাঙ্গ পারঙ্গম 'ব্যাঘ্রপাদ' নামে এক ঋষি ছিলেন। আমি তাঁর পুত্র এবং ধৌম্য আমার কনিষ্ঠ সহোদর।

ছাতু খেতে খেতেই মহানন্দস্বামী গল্প বলছিলেন। মুখের গ্রাস শেষ করে জল পান করে তিনি আবার বলতে আরম্ভ করলেন – এই মহর্ষি উপমন্যুর বাল্যজীবনের কথা বড়ই চিত্তাকর্ষক। তিনি ছোটবেলা একদিন ছোটভাই ধৌম্যের সঙ্গে খেলা করতে করতে কোন গৃহস্থের বাড়ীতে দুগ্ধদোহন পর্ব দেখেন। সেখানে তাঁরা গৃহস্থ প্রদত্ত দুধও পান করেন। পিতার আশ্রমে ফিরে মার কাছে দুগ্ধ মিশ্রিত অন্নাহারের জন্য আবদার করেন। মা দুগ্ধাভাবে পিঠুলী গোলা জলে ভাত মিশিয়ে খেতে দিয়েছিলেন। দুই ভাই-ই সেই পিঠুলী মিশ্রিত ভাত মুখে দিয়েই বলেন – মা, আমরা এক গৃহস্থের বাড়ীতে দুধ খেয়ে এসেছি, দুধের স্বাদ চিনি। এতো দুধের মত স্বাদু লাগছে না। মা তখন দুই ভাইকেই কোলে নিয়ে আদর করে বললেন –

কুতঃ ক্ষীরঃ বনস্থানাং মুনীনাং গিরিবাসিনাম্।
পাবনানাং মুনীশানাং বনাশ্রম নিবাসিনাম্ ॥
গ্রাম্যাহার নিবৃত্তানামারণ্য ফল ভোজিনাম্।
নাস্তি পুত্র ! পয়োঽরণ্যে সুরভীগোত্রবর্জিতে ॥
নদীগহ্বরশৈলেষু তীর্থেষু বিবিধেষু।
তপস্যা জপ্য নিত্যানাং শিবো নঃ পরমাগতিঃ ॥

– বৎস ! কখনও বনবাসী, কখনও বা পর্বতবাসী মুনিগণের এবং আত্মশোধনকারী মুনিশ্রেষ্ঠগণের নিত্য দুধ মিলবে কোথা হতে ? তাঁরা গ্রাম্য আহার করেন না, বন্যফল আহার করেন । পুত্র ! তাঁদের গো বর্জ্জিত বনে দুধ থাকতে পারে না । আমরা নদীর তীর, পর্বত গুহা, পর্বত শৃঙ্গ প্রভৃতি স্থানে থেকে তপস্যা করি এবং সর্বদা জপ করে থাকি; সুতরাং মহাদেবই আমাদের পরমগতি ।

তং প্রপদ্য সদা বৎস ! সর্ব ভাবেন শংকরম্ ।
তৎ প্রসাদাচ্চ কামেভ্যঃ ফলং প্রাপ্স্যসি পুত্রক !

– পুত্র ! তুমি সর্বপ্রকারে এবং সর্বদা সেই মহাদেবের শরণাপন্ন হও । তাঁরই অনুগ্রহে সমস্ত কামনার ফল তুমি লাভ করতে পারবে ।

মায়ের এই সকল কথা শুনে উপমন্যু কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর মাকে জিজ্ঞাসা করলেন –

কোঽয়মম্ব ! মহাদেবঃ স কথঞ্চ প্রসীদতি ।
কুত্র বা বসতে দেবো দ্রষ্টব্যো বা কথঞ্চ সঃ ॥

– মা ! এই মহাদেব কে ? তিনি কি প্রকারেই বা প্রসন্ন হন ? কোথায় বা তিনি বাস করেন ? কোন্ উপায়েই বা তাঁর দেখা পাওয়া যায় ?

মা বালক উপমন্যুর এই প্রশ্ন শুনে বললেন – বৎস ! অশোধিত চিত্তলোকের পক্ষে মহাদেবকে জানা দুষ্কর, চিত্তে ধারণ করা দুষ্কর, আরাধনা করা দুষ্কর, গ্রহণ করা দুষ্কর, এমন কি দর্শন করাও দুষ্কর । বিশ্বরূপী মহাদেব সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে জীব রূপে অবস্থান করেন । মহাদেব সর্বত্র সমকালে সর্বভূতে বিরাজমান । দেব দৈত্য গন্ধর্ব রাক্ষস পিশাচ এবং যে কোন পশু বা জন্তুর রূপ ধারণ করতে পারেন

সর্বলোকান্তরাত্মা চ সর্বগঃ সর্ববাদ্যপি ।
সর্বত্র ভগবান জ্ঞেয়ঃ হৃদিস্থঃ সর্বদেহিনাম্ ॥
যো হি যং কাময়েৎ কামং যস্মিন্নর্থেঽর্চ্যতে পুনঃ ।
তৎ সর্বং বেত্তি দেবেশস্তং প্রপদ্য যদীচ্ছসি ॥

– ভগবান মহাদেব সর্বলোকের অন্তরাত্মা, সর্বত্রগামী, সর্ববক্তা, সর্বত্র তাঁকে জানা যায় এবং তিনি সর্বদেহীর হৃদয়ে বিরাজমান । যে লোক যা কামনা করে তাঁর পূজা করেন, সে সমস্তই মহাদেব জানতে পারেন । অতএব তুমি যদি কোন বিষয় ইচ্ছা কর, তাহলে তাঁর শরণাগত হও ।

মাতৃবাক্যে অবিচলিত নিষ্ঠা রেখে তৎক্ষণাৎ মহাদেবের তপস্যায় রত হলেন উপমন্যু দীর্ঘকাল শিবগত প্রাণ হয়ে তপস্যা করার পর মহাদেব তাঁকে দর্শন দিয়ে বর দেন – ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ! তোমার অক্ষয় যৌবন এবং অগ্নিতুল্য তেজ হোক । সামান্য দুধের জন্য তুমি আমাকে লাভ করেছ, তোমার ইচ্ছা মাত্র ক্ষীর সমুদ্র তোমার সামনে এসে উপস্থিত হবে কল্পকাল পরে তুমি আমাতে লীন হবে ।

তিষ্ঠ বৎস ! যথাকামং নোৎকণ্ঠা করিষ্যসি ।
স্মৃতস্ত্বয়া পুনর্বিপ্র ! করিষ্যামি চ দর্শনম্ ॥

মহাদেব উপমন্যুকে আরও বললেন – তোমার ইচ্ছানুসারে যেথায় যতদিন ইচ্ছা অবস্থান কর, তবে আমার যখন তখন দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করো না । একান্ত প্রয়োজন হলে স্মরণ করা মাত্র, আমি আবির্ভূত হয়ে তোমাকে দর্শন করে যাব ।

এই কথা বলেই 'সূর্যকোটিসমপ্রভুঃ' অর্থাৎ কোটি সূর্যের মত দীপ্তিমান্ ভগবান মহাদেব অন্তর্হিত হয়ে গেলেন । মহানন্দস্বামী কথিত উপমন্যুর উপাখ্যানও শেষ হল, আমরাও এই বিস্তীর্ণ উপত্যকাতে নেমে এলাম । কিছুদূরেই মা নর্মদাকে বয়ে যেতে দেখলেন । আমরা যে জলপ্রপাতের গতি পথ ধরে এতদূর এলাম সেটা দেখলাম আমাদের ডান দিকে বেঁকে

চলে যাচ্ছে। বড় বড় শাল গাছ এবং মহুয়া গাছের ফাঁক দিয়ে আমরা আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আমরা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে প্রণাম করলাম উপমন্যুর সাধন গুহার উদ্দেশ্যে। মহানন্দস্বামী এই বলে শেষ করলেন যে মহর্ষি উপমন্যু ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের দীক্ষাগুরু। তিনি যখন হিমালয়ে মহর্ষি সাবর্ণের আশ্রমে অবস্থান করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁরই সাধনোপদেশে তীব্র তপস্যা করে পূর্ণকাম হয়েছিলাম। নর্মদার উত্তরতটের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেখানে চারদিকে স্তরে স্তরে ঘন নীল শৈলশ্রেণী, একটার পিছনে আর একটা, তার পিছনে আর একটা, থৈ থৈ করছে শুধুই পাহাড়। আমরা আরও কিছুটা এগিয়ে দেখতে পেলাম ৪/৫ জন পাহাড়ী যুবক শালকাঠ কেটে বেঁধে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করছে। তাদের মধ্যে একজনকে হরানন্দজী হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করে বসলেন – আমরা ভূচেগাঁও থেকে আসছি, ঐ পাহাড় থেকে এই মাত্র নেমে এসেছি ঐ সামনে যে জলের ধারাটা বয়ে যাচ্ছে, তারই গতিপথ লক্ষ্য করে, ঐ বহমান জলধারার পাশে পাশে। এ আমরা কোথায় এলাম ? সামনের কোন মহল্লায় রাত্রিবাস করার কোন আশ্রয় মিলবে কি ? একজন যুবক তার হাতের কুড়ুলটা নাচাতে নাচাতে অনেক কষ্টে ভাঙা হিন্দীতে উত্তর দিল সামনে মেঁ বহাদল মহল্লা ইয়া বহাদল সংগম। ওহি পাহাড় সে ইয়ে বহাদল নদী আতী হৈ। হম্‌লোগ ভীল হ্যায়। ছোকরার মুখে 'ভীল' শব্দটা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্মারাম খাঁচা ছাড়ার মত অবস্থা! আমাদের মুখে চোখে ভীত সন্ত্রস্ত ভাব ফুটে উঠতেই সেই ছোকরা খল্‌খল্ করে হেসে উঠল। তার সঙ্গীদেরকে আমাদের সম্পূর্ণ অবোধ্য ভীল ভাষায় কিছু কথা বলেই আমাদের দিকে তাকিয়ে ভাঙা ভাঙা খোড়িবোলী হিন্দীতে যা বলল, অতিকষ্টে তার অর্থ উদ্ধার করে আমরা এই বুঝলাম যে 'লুটেরা এবং নিষ্ঠুর' বলে ভীল জাতির দুর্নাম আছে। ভীলরা বড় অভাবী, তাদরে জন্মগত সংস্কার এই যে, কোন সন্ন্যাসীকে দেখলেই তারা মনে করে মা নর্মদাই সন্ন্যাসীদেরকে তাঁদের সামনে হাজির করে দিয়েছেন। আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে হিন্দু সন্ন্যাসীদের অধিকাংশই ধনাঢ্য। তারা জটার কুণ্ডলীতে, এমন কি ঘুঁটের মধ্যেও গিনি এবং টাকা রাখে। তাই আমাদের লোকরা তাদেরকে লুটপাট করে. বাধা দিলে মারধরও করে থাকে। কিন্তু আমাদের জাতির কেউ এ সুনাম করে না যে কোনও বিপন্ন যাত্রী আমাদের আশ্রয়প্রার্থী হলে আমরা তাদেরকে আহার্য এবং আশ্রয় দিয়ে থাকি। আপনারা নির্ভয়ে আমাদের সঙ্গে চলুন।

তার কথা শুনে হরানন্দজী বলে উঠলেন – আজকের রাতটায় মত আশ্রয় দাও ভাই। আমাদের কাছে টাকা কড়ি সোনাদানা কিছু নাই। পাহাড়ের কিঞ্চিৎ উপর ঘেঁসে তারা হাঁটতে লাগল। সবার আগে কুড়ুল হাতে সেই ছোকরা, পিছনে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে তাদের আর চারজন, তারপর তাদের পিছনে আমরা। নানারকম ভাবনা মন থেকে মুছে ফেলে ইষ্ট স্মরণ করতে করতে আমরা সাবধানে ছোট বড় পাথর, কাঁটা মনসার ঝোপ ইত্যাদি পেরিয়ে হাঁটতে লাগলাম। রঞ্জন জানাল বেলা আড়াইটা বেজেছে। যে জলধারার কাছ থেকে কিঞ্চিৎ দূরত্ব রেখে আমরা এতদূর হেঁটে এলাম ক্রমেই তার বিস্তার, খরস্রোত গর্জন বেড়ে যেতে দেখে বুঝলাম এইটাই তাহলে বহাদল নদী। এরই উৎসস্থল পাহাড়ের প্রায় শীর্ষদেশে সেই জলপ্রপাত এবং সেইখানেই আমরা আজ মহর্ষি উপমন্যুর সাধন-গুহা এবং তাঁর আবির্ভাব স্থল দেখে এসেছি। ধন্য সেই জলপ্রপাত, যেটি যুগপৎ একটি নদী এবং একজন মহর্ষির উৎপত্তিস্থল। সেখানে একটা বড় জলধারাই শুধু জন্মায় নি, বৈদিক সংস্কৃতির একজন মহত্তম ধারক বাহকও যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমাদের পথ প্রদর্শক সেই ভীল যুবক কথা বলতে ভালবাসে, সে খোড়িবোলি হিন্দীতে যা বলতে লাগল, তাতে অনেক কষ্টে এইটুকু মাত্র বুঝলাম যে তাদের মহল্লাতে মড়াইয়া বাবা বলে এক ভীল

সাধু থাকেন। প্রায় ২০ বৎসর বয়সে সে তার মা বাবাকে ত্যাগ করে এক হিন্দু সন্ন্যাসীর সঙ্গে পালিয়ে যায়। প্রায় ২০ বৎসর পরে নিজেই তার স্বগ্রামে সাধু হয়ে ফিরে এসেছেন। এসে দেখেন, মা বাবা মারা গেছে। নিজেদের ভিটাতেই একটা আশ্রম বানিয়ে রয়েছেন। আজ বছর চারেক হল সামনের ঐ বহাদল সঙ্গমে স্নান করতে গিয়ে পাথরের একটা নর্মদা মূর্তি কুড়িয়ে এনে আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর আশ্রমে একখানা ঘর আছে। সাধু সন্ন্যাসী দেখলে মড়াইয়া বাবা নিজেই তাঁর ঐ আশ্রমস্থ ঘরে ডেকে এনে থাকতে দেন। আপনাদেরকে তাঁর আশ্রমেই নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের ভীলদের নিজেদের স্বতন্ত্র দেবদেবী আছেন। তাঁদের পূজা না করে নর্মদার পূজা করেন বলে প্রথম প্রথম আমাদের স্বজাতিদের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক বিক্ষোভ হয়েছিল। পরে তাঁর গুণে আমরা বশ হয়েছি। তিনি মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বলতে পারেন, জল পড়া তেলপড়া দিয়ে অনেক রোগ ভাল করে দিতে পারেন। ছোকরা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বহাদল নদী এবং নর্মদার সঙ্গমের কাছে এসে পড়েছি। বড় বড় boulder-এর গুঁতোগুঁতি এবং হুড়োহুড়িতে কানে তালা লাগার জোগাড়। কারও কথা শোনা বা বুঝার উপায় নাই। যাইহোক, কোন মতে আমরা হর নর্মদে ধ্বনি দিয়ে সঙ্গম স্থলকে প্রণাম করে সেই ভীল যুবকের সাথে মড়াইয়া বাবার আশ্রমে এসে উঠলাম। যুবক সাধুর ঘরে ঢুকে আমাদের সম্বন্ধে কিছু বলল বলে মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে কম্বল জড়িয়ে মড়াইয়া বাবা বেরিয়ে এসে হর নর্মদে হর নর্মদে বলে আবাহন জানালেন। আশ্রমের মধ্যে তিনটি ঘর। একটিত নিজে থাকেন, একটি ঠাকুর ঘর। সে দুটি পাথরের বলে মনে হল। আর একটি বড় ঘর ১০/ ১২ জন লোক সহজেই শুতে পারে, তবে ঘরের দেওয়াল বলতে বাখারির বেড়া এবং তার উপর বাঁশের চাঁচ। খেজুর ও তাল পাতার ছাউনি। এই মহল্লার অধিকাংশ কুটীরই দেখছি এই রকম। ভীলরা সত্যই দরিদ্র। তাদের সীমাহীন দারিদ্র্যই তাদেরকে লুটেরাতে পরিণত করেছে বলে মনে হল। রুক্ষ পাথুরে জায়গায় নাম মাত্র শস্য হয়। বেলা ৪টা বেজেছে, কিন্তু তার মধ্যেই পাহাড়ী গ্রামে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে বলে মনে হল। আশ্রমের মধ্যেই হেনা চাঁপা এবং আরও অনেক রকম ফুল ফুটে আছে। চারদিক সুগন্ধিতে ভরে আছে। শান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশে বেশ আশ্রমটি। চার পাঁচজন ভক্ত এসে গেল আশ্রমে। আমাদেরকে দেখেই দুজন দু কুঁদা জল বয়ে এনে দিল পা হাত মুখ ধোয়ার জন্য। দুজন বড় ঘরটাতে ঢুকে একটা কাঠের চুল্লী সাজিয়ে তাতে আগুন ধরালো ঘর গরম করার জন্য। ঠাকুর ঘর এবং সাধুর ঘরে দুটো প্রদীপ জ্বলে উঠল, আমাদের ঘরেও একটা প্রদীপ জ্বেলে দিল। প্রদীপ সরষের তেল দিয়ে নয়, সাজা গাছের তেল দিয়ে। আমরা বড় ঘরটায় ঢুকে নিজেদের বিছানা পেতে নিলাম। সাধুর ঘরে শাঁখ বেজে উঠতেই আমরা সকলেই ঠাকুর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। যে মূর্তিটি প্রধান ঠাকুর, যেটি তিনি বহাদল সংগমের ঘাট থেকে পেয়েছেন, যাঁর নাম আসার পথে সেই ভীল ছোকরার মুখে শুনেছিলাম মা নর্মদা, তাঁর ৪টি হাত দেখা গেলেও সেই চতুর্ভুজার মুখে এবং সর্বাঙ্গে এত সিঁদুরের প্রলেপ পড়েছে যে তাঁকে নর্মদা বলে চেনার উপায় নাই। সেই নিরাভরণ সিন্দুর লিপ্ত মূর্ত্তি, কোন পুরুষ বা নারীর তাও ঠাওর করা কঠিন। তাঁরা নর্মদা বলেছেন, তাই সই। আমরা সকলে প্রণাম করলাম। হরানন্দজী কর্পূরদানীতে ভরে এক ডেলা কর্পূর এগিয়ে দিতেই সাধু তা জ্বেলে ঘুরিয়ে আরতি করতে লাগলেন আর সুর করে গাইতে লাগলেন —

রেবা তেরী দরশ সহজ সুখ দাই ॥
অমরকণ্টক সে বরুণ দিশা কো
চলী নাগগতি পাই।
ভারত খণ্ড খণ্ড দো কীনে

জাকর সিন্ধু সমাই ॥
বড় বড় নগ তোড়ে - ফোড়ে
ঝাড়ী কাঠ বহাই।
ওঁকার সে বেট পেট মেঁ
গজব তেরী গহরাই ॥
মার্কণ্ডে নে বায়ুপুরাণ মেঁহ্
ঘাট ঘাট স্তুতি গাই।
মহা মহা তুম পাপী তারে
সব বিধি করী ভলাই।
জয় জয় জয় রেবা মাই ॥

প্রাঞ্জল হিন্দীতে সাধুর গান আমাদের বোধগম্য হল। আরতির শেষে 'রেবা মাইকী পরসাদী' বলে প্রত্যেকের হাতে পানজেরী অর্থাৎ ধনে গুঁড়ো আর চিনি দিলেন। আমরা ফিরে এলাম আমাদের নির্দিষ্ট ঘরে। সান্ধ্যক্রিয়াতে বসার উদ্যোগ করছি এমন সময় একজন ভীল ভক্ত এসে একটা বড় কাঠের পিঁড়ি পেতে দিলেন, তার পিছনে পিছনেই কর্পূরদানীটি হাতে করে এনে সাধু এসে বসলেন। সাধুর মুণ্ডিত মস্তক। বয়স অনুমান করলাম বছর পঞ্চাশেক হবে। চোখ দুটি ছোট ছোট কিন্তু অস্বাভাবিক ভাবে উজ্জ্বল। আমরা সকলেই তাঁকে নমো নারায়ণায় জানালাম। তিনি নারায়ণ ! নারায়ণ ! বলতে বলতে প্রতি নমস্কার জানালেন। হরানন্দজী তাঁকে ওপারে যে থরে থরে পাহাড় শ্রেণী দেখা যাচ্ছে, সেই স্থানের নাম কি জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বলতে লাগলেন – উত্তরতটকা উহ্ স্থান কী নাম হাত্নী সংগম হৈ। য়হ স্থান অলীরাজপুর গ্রাম মেঁ হৈ। যহাঁ পর তেজোনাথ মহাদেবজীকা মন্দর হৈ। প্রাচীনকাল মেঁ উহাঁ পর পাণ্ডবো নে আউর অনেক বৈদিক ঋষিয়োঁ নে যজ্ঞ কিয়ে থে জিসকো সুগন্ধিত ভস্ম আভিতক মিলতী হৈ। মার্গ পর্বতকা হৈ।

এই বলেই তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন হাতনী সংগম কা বারে মেঁ হম সে আপকো ইয়ে দোস্ত জ্যাদা জানতে হৈ। বলেই দু মিনিট চুপ করে গেলেন। আমি তাঁর কথায় চমকে উঠলাম। কারণ, সবে মাত্র এখানে এসেছি, এখনও তাঁর সঙ্গে ভাল করে বার্তালাপ হয় নি ; তিনি কি করে জানলেন যে আমি উত্তর তটের হাতনী সংগম ঘুরে এসেছি ?

কিন্তু আমার চমকে উঠা তখনও বাকী ছিল। একটু পরেই তিনি হরানন্দজীকে পুনরায় আপন মনে বলে উঠলেন – ইধর কোঈ ডাকঘর আভিতক নেহি হুয়া জী ! মুঝে পতা হৈ আপ্ ডেহরী সংগম সে আনেকা বখৎ চারো তরফ ডাকঘর ঢুঁড়তা হৈ। ইঁয়া সে আউর সাতমিল জানে সে খারয়া কী চৌকী মেঁ ডাকঘর মিল সকতে হৈ। ডেহরী কা পাহাড় মেঁ আপকো নয় আদমী পাহাড় সে গির কর খতম হো চুকে। উনকা কর্মকা ফল উনকো ফাঁসা দিয়া, জাহান্নম্ মেঁ ভেজ দিয়া। উহ্ খবর জরুর আপ্‌কো গুরুজীকো ভেজ্‌না আবশ্যক হৈ, আপ্‌কো লিয়ে মুনাসিব হৈ।

আমাদের দণ্ডী সন্ন্যাসীদের মুখ চোখ দেখে বুঝতে পারছি, মড়াইয়া বাবার কথায় সকলেই স্তম্ভিত ও হতচকিত হয়ে গেছেন। আমিও কম আশ্চর্য হই নি। প্রেমানন্দ হাতজোড় করে জিজ্ঞাসা করলেন – স্বামীজী ! আমরা এই ৮ জন নিরাপদে অমরকণ্টকে পৌঁছে মায়ের উদ্‌গম স্থলে গিয়ে মাকে প্রণাম করতে পারব ত ? মড়াইয়া বাবা জবাব দিলেন – আট নেহি সাত। মৎ শোচিয়ে, এক আদমী রাস্তে মেঁ খতম হো জাবেগা। রঞ্জনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন – ওঁকারেশ্বর ক্ষেত্র মেঁ উনকা গুরুকা সাথ ভেট হোগা। উহ্ উধার হি ঠার যাবেগা। আপ্‌কো সঙ্গ ছোড় দেগা। এই বলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বললেন – 'খারয়া কী চৌকী সে ১০ মিল

জানেকা বাদ আপ হিরণফাল মেঁ মহর্ষি বিশ্বামিত্রজীকা তপস্থলী মেঁ পৌছে যাবেগা। উধর্ শ্রীনর্মদাজীকে দোনো তরফ উঁচু উঁচু পাহাড় হৈ। মার্গ মেঁ পর্বত শ্রেণীয়ো কো শোভা তথা নিচে নর্মদাজী কী ধারা দেখনে যোগ্য হৈ। হর নর্মদে।

এই বলেই তিনি আমাদের মস্তিষ্কে ঝড় তুলে দ্রুত তাঁর ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। তাঁর বসার পিঁড়িটা পর্যন্ত পড়ে রইল।

হরানন্দজী পিঁড়িটা হাতে নিয়ে তাঁর কাছে দিয়ে আসার জন্য বাইরে বেরিয়ে পড়ে ছিলেন, কিন্তু সাধুর ঘরের দরজা বন্ধ দেখে ফিরে এলেন। আমি বললাম – 'পিঁড়ি নিয়ে আপনি এত চঞ্চল হচ্ছেন কেন ? তাঁর পিঁড়ি এখানেই রেখে গেলে চলবে। এখন বলুন দেখি, মড়াইয়া বাবাকে কি সাধারণ জ্যোতিষী বা Thought Readingএ ধুরন্ধর ব্যক্তি বলে মনে হয় ?'

'না, না, কখনই নয়', বলে উঠলেন হরানন্দজী। মহানন্দস্বামী গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন – তপোভূমি নর্মদায় কে যে কোথায় কি মূর্তি নিয়ে বিরাজ করছেন তা বুঝা বড় কঠিন। শৈলেন্দ্রজীর উত্তরতট পরিক্রমা, ডেহরী সংগমের নিকটস্থ পাহাড়ে প৲ক্রমার পথে পাহাড়ে ধ্বসে পড়ে গিয়ে হিরন্ময়ানন্দজী প্রভৃতি ৯ জন দণ্ডী সন্ন্যাসীর অপমৃত্যু, একটা ডাকঘরের সন্ধানে হরানন্দজীর ব্যস্ততা, ওঁঙ্কারেশ্বর মহাতীর্থে রঞ্জন ভাই এর গুরুলাভ এবং সেইখানেই স্থিতি বিষয়ে মড়াইয়া বাবা যে সব কথা গড়গড় করে বলে গেলেন, তাতে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, তিনি সাধারণ মানুষ ত নন-ই, সাধারণ যোগীও নন, তিনি অত্যন্ত উচ্চকোটির যোগী। তাঁর সব কথাই অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে, কেবল রঞ্জন ভাই-এর সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যৎ বাণীই কেবল আমাদের দেখতে বাকী। এখন বুঝতে পারছি, এঁর পুণ্য সংস্পর্শে এসেই স্বভাব দুর্বৃত্ত ভীলরাও কত মিষ্টভাষী এবং সদালাপী হয়েছে। আজ যারা আমাদেরকে এখানে পথ দেখিয়ে এনেছিল, তাদের ব্যবহারেই তা বুঝা যায়। হরানন্দজী বললেন, আগুনে কাঠ চাপিয়ে এখন গুরুদেবকে প্রণাম করে শুয়ে পড়ি এস। রাত্রি ৯টা বেজে গেছে। সকালেই আবার বেরিয়ে পড়তে হবে।'

আমরা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। আজ সারাদিন খুব পরিশ্রম এবং উদ্বেগ ভোগ করেছি। কাজেই শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন যখন ঘুম ভাঙল, তখন সকাল সাড়ে ৬টা বেজে গেছে। কাঠের আগুন নিভে গেছে। শীতে সকলে কাঁপছি। তবুও চারদিক ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে বলে বাইরে বেরোতে পারলাম না। সকলেই জবুথবু হয়ে বসে জপ করতে লাগলাম। ৭টা নাগাদ প্রাতঃকৃত্যের তাগিদে আটজনেই বহাদল নদী এসে মিলেছে যেখানে সেই দিকে গেলাম। সঙ্গমস্থলে কী প্রচণ্ড গর্জন।

নর্মদার উপর সাদা কুয়াশা; উত্তরতটের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না, পাহাড়ের চূড়াগুলো সব তুষারাবৃত। তুষার বাষ্প থিক থিক করছে নর্মদার জলে।

আমরা মা নর্মদাকে প্রণাম ও স্পর্শ করে ফিরে এলাম সাধুর আশ্রমে। নিজেদের ঝোলা গাঁঠরী গুছিয়ে নিয়ে ঠাকুর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে যখন প্রণাম করছি, তখন মড়াইয়া বাবা তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হরানন্দজীর হাতে প্রায় ৩ সের আন্দাজ খোয়া ক্ষীর দিয়ে বললেন – কাল একাদশী থা, আনেকা বখৎ সিরিফ ছাতু কমণ্ডলুমে ভিজা কর এক দো গৌড়া পায়া। ইয়ে আজ পারণকে লিয়ে ভিক্ষা। চলিয়ে হম ভি থোড়া সা মিলভর আপকা সাথ মে যাবেগা। আমরা মা নর্মদাকে প্রণাম করে তাঁর পিছনে হাঁটতে লাগলাম। মড়াইয়া বাবাকে বাদ দিয়ে আমি আর চারজন সন্ন্যাসীর পিছনে ছিলাম। আমার পাশে ছিলেন ত্রিদিবানন্দ। তাঁকে আমি ফিস্ ফিস্ করে বললাম – সাধুর অবিদিত কিছুই নাই দেখছি। গতকাল সত্যই একাদশী তিথি ছিল, পরিক্রমাকালে আমরা অবশ্য নিত্যই একাদশী

পালন করছি বললেই হয়। কিন্তু মহর্ষি উপমন্যুর সাধনগুহা দর্শন করে উৎরাইএর পথে নামবার সময় কমণ্ডলুর জলে ছাতু ভিজিয়ে হরানন্দজী এবং মহানন্দস্বামী আমাদের প্রত্যেকের হাতে এক দু গোঁড়া করে ছাতু খেতে দিয়েছিলেন সে ঘটনাও এই মহাত্মার জানা দেখছি!

মড়াইয়া বাবাই আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে থাকলেন। যাত্রা পথে প্রথমেই একটা প্রায় দু হাজার আড়াই হাজার ফুট উঁচু পাহাড় পড়ল। শাল বহেড়া এবং গাছের ঘন জঙ্গল। স্থানে স্থানে সূর্যরশ্মি পর্যন্ত বনে ঢোকে বলে মনে হয় না। ঠুকে ঠুকে ছোট বড় পাথর ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে কখনও বা শাল তাল বেল জাম ও প গাছের গুঁড়ি বা ডাল ধরে ধরে উঠতে লাগলাম উপর দিকে। প্রায় হাজার বারশ ফুট উঠার পর এমন এক জায়গায় এসে পৌছলাম যেখানে পাহাড়ের ঢালে বদরী কুন্দ পুন্নাগ চাঁপা অশোক এবং কোবিদার গাছের জটলা। । সেখানেই দেখলাম, সুউচ্চ পাহাড়ের স্তরে একটা পায়ে চলার রাস্তা চলে গেছে সোজা পূর্ব দিকে। আমাদের মাথার একটা স্তরে আর একটা রাস্তার দাগ দেখতে পাচ্ছি। পাহাড়ের স্তরে স্তরে যখন দাগ পড়ে, তখন দূর থেকে দেখলে মনে হয় পাহাড়টাকে কেউ যেন রুল ও কম্পাসের সাহায্যে গোলাকৃতি রেখা টেনে চিহ্নিত করেছে। আমরা লাঠির সাহায্যে গাছের ডালপ সাহায্যে উঠে এসেছি। কিন্তু মড়াইয়া বাবার হাতে কোন লাঠিও নাই। অথচ বেশ দ্রুততালেই তিনি পাহাড় বেয়ে আমাদের সঙ্গে এই পর্যন্ত অবলীলাক্রমে উঠে এ তাঁর হাতে প্রথম থেকেই দেখছি, একটি পোঁটলা আছে। কি যে আছে তা বুঝতে না, তবে যাই থাকুক, তা যে কলাপাতায় মোড়া তা বুঝতে পারছি। এইখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বাঁ দিকে বেশ দূরে নিচের উপত্যকা দিয়ে নর্মদা বয়ে চলেছেন আমরা হাতজোড় করে মা নর্মদাকে প্রণাম করছি, এমন সময়ে উপর দিকে পাহাড়ের আ একটা স্তরে মড়াইয়া বাবা অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখালেন – একঠো গণ্ডার যা রহে হৈ। গণ্ডারের গাত্র চর্ম দেখলাম মোটা ভীষণ পুরু, ঘোর পাঁশুটে বর্ণের। তার মুখের খড়গাকৃতি কোন দাঁত সোজা খাড়া হয়ে উঠে আছে উপরের দিকে। সূর্য কিরণে মাঝে ঝলসে উঠছে। মড়াইয়া বাবা বললেন – গণ্ডারকা সামনে মেঁ বুনো হাতী ইয়া পড়নেসে ভী, উহ্ উস্ জানোয়ারকে ওহি দাঁত সে ফাড় দেতে হৈ। কোঈ জানোয়ার ইস্‌কা সামনে মেঁ আনে নেহি মাঁগতা। বন্দুক কা গোলি সে ভী ইস্‌কো কাবু কঠিনাই হৈ। গোলি ইসকো চামড়া ভেদ আসানি সে নেহি কর সেকে। লেকিন্ বেচা বৈঠনে ইয়া লেটনে ভি নেহি সকতা। যব নিদ্ আতা হৈ, উহ কোঈ পেড় মে ঠেকা কর নিদ যাতা হৈ। শিকারী লোক বহোৎ হোঁসিয়ারী কা সাথ আয়েস্তা উহ পেড়কো কাট দেনে সে পেড় কা সাথ উহ ভি পত্থর কা উপর গির যাতা হৈ। গি যানে সে উহ্ কাবু হো যাতা হৈ। তব্ শিকারী লোক পায়ের মে মোটে মোটে লাগাকর উসকো কব্জা কর লেতে হৈ। দুনিয়া মেঁ তেজীয়ান ইনসানকো ভি এ্যায়সাই হোতা হৈ। উনকো কোঈ কাবু কর না পাঈ। শোক দুঃখ মেঁ ভী উনো টলতা নেহি, হিলতা নেহি। যব বখৎ পুরা হোত হৈ তব্ কাল ইয়া নিয়তি আকর্ উনকে ছিন কর লে যাতা হৈ।

এই বলে মড়াইয়া বাবা আমাদের কাছে বিদায় চাইলেন – আভি হম চল পড়ে হাতের পোঁটলাটি মহানন্দস্বামীর হাতে দিয়ে বললেন – ইস্‌মে এক কিসিমকা ভস্ম হৈ বিল্ববৃক্ষকী লকড়ী কা সাথ আউর দু কিসিমকা আয়ুর্বেদী লতা জ্বালকর ইয়ে ভস্ম বানা যা হৈ। যাতনা ভী জাড়া হো, ইসকো মাখকর লেট জানেসে বিলকুল জাড়া মালুম হোগা। ইস্ ভস্ম মাখনেসে শঙ্খিনী সেবন কা কোঈ জরুরত নেহি। আপলোগ

কা এহি স্তরমে, এহি ঢালমে সিধা পাঁচ মিল যানেসে উৎরাই কা পথ মিলে গা। ব্যস্ উতার যানেসে আপ খাড়া চৌকী মেঁ পৌছেগী। হর নর্মদে।

এই বলে তিনি নমস্কার করেই পিছন ফিরলেন। আমরা প্রতি নমস্কার করারও সুযোগ পেলাম না। তিন চার মিনিট কাল তাঁর চলার পথের দিকে তাকিয়ে আমরা হর নর্মদে ধ্বনি তুলে হাঁটতে আরম্ভ করলাম সামনের দিকে বহু নিচে বহমানা নর্মদার ধারার দিকে লক্ষ্য রেখে। কিছুক্ষণ জঙ্গল পথে হেঁটে হরানন্দজী মন্তব্য করলেন – সাগরের নিচে যেমন অজস্র বহুমূল্য মণিমুক্ত লুকিয়ে থাকে সাধারণ মানুষ তার সন্ধান পায় না, তেমনি এই তপোভূমি নর্মদার পাহাড়ে জঙ্গলে যে কত উচ্চকোটি তপস্বী আত্মগোপন করে আছেন বাইরের দুনিয়ায় তাঁদের কোন প্রচার নাই। ত্রিদিবানন্দ বললেন – মড়াইয়া বাবা 'মিল ভর' আমাদের সঙ্গে পথ দেখানোর জন্য আসবেন বলেছিলেন কিন্তু খাড়া বা খারয়া কী চৌকীতে পৌছতে আর পাঁচ মাইল বাকী আছে বলায় বুঝতে পারছি, আমরা বহাদল সঙ্গম থেকে এ পর্যন্ত ২ মাইল পথ অতিক্রম করে এসেছি। এ পথে ত দেখছি জঙ্গল সর্বত্র সমান আছে কিন্তু তিনি পাহাড়ের এই স্তরের পথটি দেখিয়ে দেওয়ায় ক্রমাগত উঠা নামা করতে হচ্ছে না। বট, অশ্বত্থ, কপিত্থ, অর্জুন, কেতক মহুয়া, শাল প্রভৃতি বহু গাছে এই জঙ্গল সমাকীর্ণ হলেও ছোট বড় পাথর ডিঙ্গিয়ে আমাদের হাঁটতে বিশেষ কষ্ট হচ্ছে না। তবে একথা ভুলা চলবে না যে এই জঙ্গলে গণ্ডার আছে। বেলা এখন ১০টা। সাবধানে চারদিকে লক্ষ্য রেখে হাঁটতে হবে। সমানে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে আমরা হাঁটতে লাগলাম। নিচের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম এই দু আড়াই হাজার ফুট উঁচু সুদীর্ঘ বিস্তীর্ণ পাহাড়ের গায়ে আরও অন্ততঃ তিন চারটি ছোট পাহাড় এসে মিলিত হয়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটার পর আমি ত্রিদিবানন্দ এবং মহানন্দস্বামীকে লক্ষ্য করে বললাম, আমি হরানন্দজীর কাছে শুনেছি আপনারা দুজনেই নাকি ব্যাকরণ শাস্ত্র এবং মহাভারতে ধুরন্ধর পণ্ডিত। মহর্ষি উপমন্যুর উপাখ্যান মহানন্দস্বামী যে ভাবে শ্লোকের পর শ্লোক উদ্ধৃত করে সুন্দরভাবে বর্ণনা করলেন, তাতে আমি মাঝে মাঝে ভাবছি, আপনারা দুজনে বেদ পড়েন নি কেন ? আপনাদের যে প্রতিভার পরিচয়ে পেয়েছি, তাতে আমার মনে হয়, আপনারা বেদ পড়লে বৈদিক সাহিত্যের অনেক সেবা করতে পারতেন।

'কে বলল যে আমরা বেদ পড়তে চেষ্টা করি নি ? আমি এবং মহানন্দস্বামী দুজনেই একসঙ্গে গুরুদেবের প্রেরণায় কাশীর কেদারঘাটে একজন দক্ষিণী পণ্ডিতের কাছে বেদ পড়তে গেছিলাম। বছর তিনেক পড়ার পর কি কারণে আমরা বেদ পড়া ছেড়ে দিলাম, তা আমার চেয়ে মহানন্দ স্বামীই ভাল করে বলতে পারবেন। আপনি ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন, কারণটা কি ?' ত্রিদিবানন্দের কথায় আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মহানন্দ স্বামীর দিকে তাকাতেই তিনি বলতে থাকলেন – বেদের মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থপরতার কথা এমন উলঙ্গভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে সেগুলি পাঠ করার সময় আমরা দুজনেই মর্মবেদনা ভোগ করেছি। স্বার্থপরতার এমন অবাধ উচ্চারণ একমাত্র মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী বা আরও দু'একটি পুরাণ ছাড়া আর কোন আর্ষ গ্রন্থে কোথাও দেখতে পাই নি। তাহলে বেদ এবং পুরাণে তফাৎ রইল কি ? চণ্ডীতে যেমন বারবার উচ্চারতি হয়েছে, 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষং জহি,' তেমনি ঋগ্বেদের দশ সহস্রাধিক মন্ত্রের অন্ততঃ এক দশমাংসে ঋষিদের মুখে কেবল 'আমাকে ধন দাও, গোধন দাও, অশ্ব দাও, শত্রুদেরকে চূর্ণ বিচূর্ণ কর' ইত্যাদি উচ্চারিত হতে দেখেছি। ঋষির এই স্বার্থচেতনা, স্বার্থপর দৃষ্টিভঙ্গী নিতান্তই ব্যক্তি কেন্দ্রিক। ঋষিরা অনুদার চিত্তে বারবার দেবতাদের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন – আমার শত্রুকে মেরে ফেল, ধ্বংস কর, তাদের সকল ধন আমাকেই দাও, অন্য কাউকে দিও না। কেবল আমারই মঙ্গল কর। আবার অনেক ঋকে দেখেছি, ইন্দ্রকে সোমরস পান করিয়ে,

তাঁকে রীতিমত উন্মত্ত বা মাতাল করে তাঁকে দিয়ে আপন কার্যসিদ্ধির পরিকল্পনা করেছেন ঋষিগণ। ঋষি ও যজমানদের এ ধরণের সংকীর্ণ মনোবৃত্তি আমাদের আদৌ ভাল লাগে নি। আমাদের মনে বারবার প্রশ্ন জেগেছে, বেদজ্ঞ বেদপাঠী ঋষিদের মধ্যে এই ধরণের হীন মনোবৃত্তি কি করে আশ্রয় পেল ? এই রকম সংকীর্ণ মনোবৃত্তি ত্যাগ করে তাঁরা আরো একটু উদার হতে পারলেন না কেন ? কেন ? কেন ? আমাদের শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তর তাঁদের কাছে আরও অনেক বড় জিনিষ আশা করেছিল। তাই নিরাশ হৃদয়ে একদিন গুরুদেবকে যথাযথ কারণ দেখিয়ে দুজনেই বেদাধ্যয়ন ছেড়ে দিলাম।

আমি মহানন্দস্বামীর বক্তব্য শুনে তাঁকে জবাব দিলাম – আপনারা যে আচার্যের কাছে বেদ পড়েছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই সেকেলে পণ্ডিত ছিলেন। সায়ণ এবং মহীধরের ভাষ্যই হয়ত তাঁর উপজীব্য ছিল। মহর্ষি দয়ানন্দ, শবরস্বামী, সহজানন্দ, বোধানন্দস্বামী প্রভৃতির ভাষ্য বা টীকা টীপ্পনী পড়লে বা আমার বাবার মত কোন জ্ঞানতপস্বীকে আচার্য পেলে আপনাদের এ দুর্দশা হত না। ঋগ্বেদের অজস্র ঋকে ঋষিদের উদার মনোবৃত্তি, সর্বোদার দৃষ্টির হাজার হাজার পরিচয় আছে। আমি কিছু কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন ধরুন ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ১২০ নম্বর সূক্তের ১২ নম্বর ঋকটি ; সেখানে মহর্ষি দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান ঋষি বলছেন – অথ স্বপ্নস্য নির্বিদেহভুঞ্জতশ্চ রেবতঃ। উভা তা বস্রি নশ্যতঃ॥ অর্থাৎ ঋষি এই বেদমন্ত্রে বলছেন – আমি স্বপ্নকে ঘৃণা করি, যে ধনবান লোক পরকে দরিদ্রকে প্রতিপালন করে না তাকেও ঘৃণা করি। উভয়েই শীঘ্র নাশ প্রাপ্ত হয়। লক্ষ্য করুন, কী সুন্দর ! হঠাৎ ঝলসে উঠা একটি অপূর্ব বাক্য। দরিদ্র পালন এবং দানের প্রতি নিখিল মানব সমাজের দৃষ্টি কত সুন্দর ভাবেই না আকৃষ্ট করা হয়েছে এখানে। পরোপকারের প্রতি উৎসাহ দান করাই এই ঋকের মূল লক্ষ্য।

ঐ ১ম মণ্ডলেরই ১৮৫ সূক্তের অন্তর্গত ৮, ৯, ১০ এবং ১১ নম্বর মন্ত্রে ঋষির কণ্ঠে যে পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ শুনেছি, তা কেমন সার্বজনীন এবং সদাশয়তা পূর্ণ, তা লক্ষ্য করুন –

দেবান্বা যচ্চকৃমা কচ্চিদাগঃ সখায়ং ক সদমিজ্জাস্পতিং বা।
ইয়ং ধীর্ভূর্যা অবযান মেষাং দ্যাবাঃ রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥ ৮

– আমরা দেবতাদের নিকট সর্বদাই যে সকল অপরাধ করে থাকি, সারাজীবনের সীমাবদ্ধতার জন্য বন্ধু এবং প্রিয়জনের প্রতি যে পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে অপরাধ করে ফেলি, আমাদের এ যজ্ঞ সে সকল অপরাধ ও ত্রুটি অপনোদন করতে সমর্থ হোক।

আপন জনের প্রতি মানুষের যে দুর্বলতা, সেটাও যে এক রকমের অপরাধ, এ কেবল ঋষির বিচারশীল মনেই ধরা পড়া সম্ভব।

উভা শসা নর্যা মাম বিষ্টামুভে মামূতী অবসা সচেতাম্।
ভূরি চিদর্যঃ সুদাস্তরায়েষা মদন্ত ইষয়েম দেবাঃ ॥ ৯

– স্তুতিযোগ্য এবং সকল মানুষের হিতকর দ্যাবা পৃথিবী আমাদের সকলকে আশ্রয় প্রদান করুন। আশ্রয়দাতা দ্যাবা পৃথিবী আশ্রয় দিবার জন্য আমাদের সাথে মিলিত হোন। হে দেবগণ ? আমরা তোমাদের স্তোতা। অন্ন দ্বারা তোমাদের এবং আর্ত যারা তাদেরও যাতে তৃপ্তি সাধন করতে পারি, এ জন্য প্রচুর অন্ন ইচ্ছা করি।

এখানে লক্ষ্য করুন, ঋষি বেদমন্ত্রে অন্ন প্রার্থনা করছেন বটে সে কেবল আপন ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, কেবল নিজ নিজ স্ত্রীপুত্রদের জন্য নয়, দেবতা অর্থাৎ বিদ্বানদের এবং আর্ত মানুষের সেবার জন্যই তাঁরা চাচ্ছেন।

ঋতং দিবে তদবোচং পৃথিব্যা অভিশ্রাবায় প্রথমং সুমেধাঃ।
পাতামবদ্যাদ্দুরিতাদভীকে পিতা মাতা চ রক্ষতাম বোভিঃ ॥ ১০

– আমি প্রজ্ঞাবান, আমি দ্যাবা পৃথিবীর উদ্দেশ্যে চারদিকে প্রকাশের জন্য অতি উৎকৃষ্ট স্তোত্র রচনা করেছি। পিতামাতা নিন্দনীয় পাপ হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং আমাদেরকে সর্বদা নিকটে রেখে তৃপ্তিকর বস্তু দিয়ে আমাদের সকলকে পালন করুন।

ইদং দ্যাবাপৃথিবী সত্যমস্তু পিতর্মাতর্য দিহোপব্রুবে বাম্।
ভূতং দেবানামবমে অভোর্বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্॥ ১১

অর্থাৎ হে পিতঃ। হে মাতঃ! এই যজ্ঞে তোমাদের উদ্দেশ্যে যে স্তোত্র উচ্চারণ করছি, হে দ্যাবা পৃথিবী। তা সার্থক হোক। আশ্রয় দান দ্বারা তোমরা স্তোতৃগণের সমীপবর্তী হও; ধূলি ধূসরিত ধরণীর সকল সন্তানরাই যেন অন্ন বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারে।

মহানন্দস্বামী! বলুন এখানে কি ঋষির কণ্ঠে কি কোন স্বার্থচেতনার কোন গন্ধ পেলেন? এ মন্ত্র ত সার্বজনীন, সকলের হিতের জন্য ঋষির কণ্ঠে আকুতি ফুটে উঠেছে। তাই নয় কি?

দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৬ সূক্তের ৬ নম্বর মন্ত্রে ঋষির উদাত্ত ও উদার কণ্ঠে কেমন একটি মানবতাবাদী মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে শুনুন –

ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহি চিত্তিং দক্ষস্য সুভগত্বমস্মে।
পোষং রয়ীণামরিষ্টিং তনূনাং স্বাদ্মানং বাচং সুদিনত্বমহ্নাম্॥ ৬

– হে ইন্দ্র। তুমি আমাদের সকলকে উত্তম ধন প্রদান কর। সকলেই যেন স্ব স্ব বৃত্তি এবং কর্মে বিচক্ষণতার সুখ্যাতি লাভ করতে পারে। আমাদের ধন দান কর। সকলেরই ধন বৃদ্ধি করে দাও। আমাদের শরীর রক্ষা কর, কথায় মিষ্টতা, নম্রতা প্রদান কর। আমাদের প্রতিটি দিবসকে সুদিন করে দাও।

এই প্রার্থনার মধ্যে গৃৎসমদ ঋষির কণ্ঠের পরিচ্ছন্নতা সকলেরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করার কথা। ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনার সীমা অতিক্রম করে ঋষির ধ্যান ধারণায় এই রকম ব্যাপকতা যখন লক্ষ্য করি, তখন আনন্দিত না হয়ে পারি না।

নিজকৃত পাপ জয়ের জন্য ঋষির আর একটি মন্ত্রোচ্চারণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মন্ত্রটি প্রথম মণ্ডলেরই অন্তর্গত ১৮৬ সূক্তের চার নম্বর মন্ত্র। সেখানে অগস্ত্য ঋষি প্রার্থনা করছেন – হে দেবগণ! আমরা দিন রাত তোমাদের চরণে ভূলুণ্ঠিত হয়ে পাপজয়ের জন্য দোহবতী ধেনুর মত তোমাদের নিকট উপস্থিত হচ্ছি। আমাকে পাপ মুক্ত কর, আমাকে সৎ কর, সত্যে প্রতিষ্ঠিত কর – এই প্রার্থনাই ঋষির যোগ্য প্রার্থনা, এই দৃষ্টিই ঋষির যোগদৃষ্টি।

শুনতে ভাল লাগে যখন ঋষিকে উদাত্ত কণ্ঠে বলতে শুনি –

মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো মধুমন্নো ভবতু অন্তরীক্ষম্।
ক্ষেত্রস্য পতির্মধুমান্নো অস্ত্বরিষ্যন্তো অন্বেনং চরেম॥ ৪/৫৭/৩

– ওষধী সমূহ আমাদের জন্য মধু যুক্ত হোক; দ্যুলোক সমূহ, জল সমূহ এবং অন্তরীক্ষ আমাদের জন্য মধু যুক্ত হোক, ক্ষেত্রপতি আমাদের জন্য মধুযুক্ত হোন। আমরা শত্রু কর্তৃক অহিংসিত হয়ে তাঁকে অনুসরণ করে চলব। এখানে ঋষির কণ্ঠে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার মৃত্যু ঘটেছে সন্দেহ নাই।

তারপর ঋষিদের যাত্রা সুরু হয়েছে পাপ থেকে পুণ্যের দিকে, অন্ধকার হতে আলোকের পথে। ইন্দ্রের কাছে তাঁদের সানুনয় প্রার্থনা –

উরুং নো লোকমনু নেষি বিদ্বান্ত্স্বর্বজ্জ্যোতিরভয়ং স্বস্তি।
ঋষ্বা ত ইন্দ্র স্থবিরস্য বাহূ উপ স্থেয়াম শরণা বৃহন্তা॥ ৬/৪৭/৮

– হে ইন্দ্র! তুমি আমাদেরকে বিস্তীর্ণ লোকে এবং সুখময় ভয়শূন্য আলোকে নির্বিঘ্নে নিয়ে চল।

চিন্তা ভাবনায় এই যে উত্তরণ, এই হল বৈদিক ধর্মের স্বক্ষেত্র এবং স্বর্ণময় উজ্জ্বল বিস্তার। মহামরণ পারে অমৃত পিয়াসী মানবাত্মার এই যে বিপুল যাত্রা – এ দেখে আমাদের সমগ্র সত্তা সুগভীর উল্লাসে উচ্ছ্বাসে নির্বাক হয়ে যায়। ঋগ্বেদের সর্বশেষ ঋকে

যে মহৎ প্রার্থনাটি উচ্চারিত হয়েছে সেটি আমাদের এক দুর্লভ প্রাপ্তি। দশম মণ্ডলের ১৯১ সূক্তে চতুর্থ মন্ত্রে ঋষিরা গেয়ে উঠেছেন –

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥

– তোমাদের অভিপ্রায় এক হোক, অন্তঃকরণ এক হোক, মন এক হোক, তোমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হও।

এর থেকে বড় প্রার্থনা, সার্বজনীন প্রার্থনা আর কি হতে পারে ?

আমার কথা শেষ হতে না হতেই, আমাদের চলার পথের নিচের ঢালে প্রচণ্ড হুঙ্কার শুনে সকলেই চমকে উঠলাম। আমরা থমকে দাঁড়িয়ে কোথায় কি ঘটছে, তা দেখার জন্য এদিকে ওদিকে উঁকি মারছি, জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আবার একটা হুঙ্কার উঠল। একবার দেখতে পেলাম দুটো চিতাবাঘ দু দুটো বৃহদাকার বাইসনের উপরে সামান্য আগে পিছে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বাইসনগুলো বিকট গোঁ গোঁ শব্দে পাথরের উপর পড়ে গিয়ে ছটপট করছে। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছি সবাই ; আমরা দ্রুতপদে এক রকম প্রায় দৌড়াতেই লাগলাম, প্রাণপণে ছোট বড় পাথর ডিঙ্গিয়ে। মিনিট দশেক এইভাবে দৌড়াবার পর আমরা জঙ্গল পেরিয়ে একটা রুক্ষ নাঙ্গা পাহাড়ে এসে পৌঁছলাম। নাঙ্গা বলছি এইজন্য যে, পাহাড়টাতে গাছপালা খুবই কম। এক জায়গায় দেখছি কতকগুলো তালগাছ এবং বড় আমড়া গাছ মাত্র আছে। আমরা সেই পাহাড়ের উপর মিনিট দশেক বসে জিরিয়ে নিয়ে আবার হাঁটতে লাগলাম। যখন তালগাছ আমড়া গাছগুলোর কাছাকাছি হয়েছি, তখন হরানন্দজী চীৎকার করে উঠলেন – খ-ব-র-দা-র ! তিনিই আগে আগে হাঁটছিলেন। আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তিনি আমাদেরকে দেখালেন – একটা মোটা আমড়া গাছের ডাল হতে ডালটাকে জড়িয়ে জড়িয়ে নেমে এসে একটা অজগর একটা হরিণকে ছোবল মেরে ফেলে দিয়ে তার একটা ঠ্যাংকে গিলছে ! হরিণটা নেতিয়ে পড়েছে। এই বীভৎস দৃশ্য দেখে আমাদের কেউ কেউ বিশেষতঃ [illegible]র্মানন্দ ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। মহানন্দস্বামী তাঁর হাতটা জাপটে [illegible] একটু উপরের দিকে হাঁটতে লাগলেন। আমরাও ভয়ে ভয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে থাকলাম। কিন্তু এই নাঙ্গা পাহাড়টায় নুড়িগুলো এমনই তীক্ষ্ণ যে কিছুটা হেঁটে যেতেই আমাদের পাগুলো রি রি করে জ্বলতে লাগলো।

হরানন্দজী বললেন – এগিয়ে এসো তোমরা। সামনেই কিছুদূরে একটা পাহাড় থেকে নেমে যাবার পথ দেখতে পাচ্ছি। নিচেও ত নর্মদার ধারা যাচ্ছে। এসো, এই উৎরাই-এর পথ ধরে নর্মদার কাছে পৌঁছে দেখি এই পথ কোথায় আমাদেরকে নিয়ে যায়। তখন কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক তা বিচার করার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা হরানন্দজীকে অনুসরণ করে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে ধুঁকতে ধুঁকতে উৎরাইএর পথে নেমে যেতে লাগলাম। প্রায় আধঘণ্টা হেঁটে আমরা নেমে এলাম উপত্যকায়। মা নর্মদাকে দেখতে পেয়ে ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল। মিনিট কয়েক ঝোপঝাড় এবং শালচারার ছোটমত জঙ্গল পেরিয়ে আমরা নর্মদার ঘাটে এসে পৌঁছলাম। বেলা তখন ১টা। দুজন ভীল ছোকরা ঘাটে স্নান করছিল। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে তারা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল – 'খাড়ুয়া কী চৌকী'। খাড়ুয়া কী চৌকী বা খাড়া চৌকীতে পৌঁছে আমরা সকলেই নর্মদাতে হাঁটু পর্যন্ত জলে নেমে স্নান ও তর্পণ করলাম। মাথার উপর সূর্য কিরণ। মড়াইয়া বাবার প্রদত্ত খোয়া ক্ষীর বের করে হরানন্দজী সকলকে ভাগ করে দিলেন। সেখান থেকেই নর্মদার উভয়তীরে সারি সারি পর্বত শ্রেণী দেখে আমাদের খুবই ভাবনা হল; ভগবান শূলপাণীশ্বর মহাদেবের মন্দির পেরিয়ে এ পর্যন্ত আমরা অনেক দুরারোহ পাহাড় পর্বত পেরিয়ে এলাম।

এখনও সামনে যে দিকেই চোখ যায়, দেখছি কেবল পাহাড় আর পাহাড়। পাহাড় আর জঙ্গলের কি শেষ নাই ? উপায় ত নাই, পথে যখন বেরিয়েই পড়েছি, তখন এগিয়ে যেতে হবেই। পরিতৃপ্তি সহ খোয়া ক্ষীর খেয়ে নর্মদার জল পেট পুরে খেলাম। মড়াইয়া বাবার সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা হল নিজেদের মধ্যে। কারও ধারণা তিনি যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ, কেউ বা এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে মড়াইয়া বাবা কালজ্ঞ। তাই তাঁর পক্ষে কোন লোককে দেখা মাত্রই তাৎকালিক ঘটনা সঙ্গে সঙ্গেই বলে ফেলা সম্ভব হয়। আমি বললাম, বৃথা আলোচনায় আর কালক্ষেপ করে কি লাভ, বুঝাইত যাচ্ছে আজ আর পাহাড় জঙ্গল পথে হাঁটা সম্ভব নয়, বেলা ৩টা বাজতে যায়। ৪টা বাজতে না বাজতেই চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে, এখন বেলা থাকতে থাকতেই কোথায় রাত কাটানো যায়, তার জন্য একটা নিরাপদ আস্তানা খোঁজা দরকার। হরানন্দজী বললেন, ছেলে দুটো ত বলে গেল কাছাকাছি কোথাও একটা পুলিশ চৌকী আছে, আগে তাদের কাছে গিয়ে পৌছাই চল, তারপর মা নর্মদার যা ইচ্ছা হবে তাই ঘটবে। আমরা নর্মদার ঘাট থেকে উঠে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে চললাম। পাহাড়ের তলদেশে দুচারটে করে পাহাড়ী লোকদের কুঁড়ে ঘর চোখে পড়ছে। ঘাট থেকে উঠে উঁচুর দিকে কিছুটা হেঁটে যেতেই আমরা শুনতে পেলাম, কেউ যেন সুর করে তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠ করছে।

এক বাণী করুণা নিধান কো সো প্রিয় জাকে গতি ন আনকী।

– করুণাময়ের সেই একই রীতি, যার অন্য কোন গতি নাই, সহায় সম্বল নাই, সেই তাঁর প্রিয়।

অস অভিযান জাই জনি ভোরে
মৈঁ সেবক রঘুপতি গতি মোরে।

– এ হেন অভিমান ভ্রমেও যেন ভুলে না যাই যে – আমি সেবক আর রঘুপতি আমার প্রভু।

তুমহি নীক লাগৈ রঘুরাই
সো মোহি দেহু দাস সুখ দাই ॥

– হে প্রভু ! দাসের সুখ বিধান তোমার লীলা। তোমার যা অভিরুচি তাই আমাকে দাও।

আমরা হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে পুলিশ ফাঁড়িতে পৌছে গেলাম। নর্মদার দক্ষিণ পাড়েই প্রায় বিঘাখানিক জায়গা ঘিরে এই ফাঁড়ি ; প্রায় ৬/৭ জন লোক বসে রামায়ণ পাঠ করছে। দুজন বন্দুকধারী লোক রামায়ণ শুনতে শুনতে পাহারা দিচ্ছে।

চৌকীর আবেষ্টনীর মধ্যে দেখলাম গোটা চারেক শালগাছ, দুটো কেঁদ, দুটো চাঁপাগাছ এবং দুটো বেলগাছ। দুখানি পাথরের একতলা ঘর, সেখানেই তাঁরা থাকেন। আমাদেরকে দেখেই তাঁরা পাঠ ছেড়ে উঠে এসেই নমো নারায়ণায় জানালেন। হরানন্দজী তাঁদেরকে জানালেন – আপলোগোঁনে জরুর সমঝ গিয়া হমলোগ পরিক্রমবাসী হুঁ। আজ রাতভোর ইধরই ঠারনেকে অনুমতি মাংগতা হুঁ।

– জরুর, জরুর ! বেশক্ আপ্ ঠার সকতে হো। লেকিন, ইধর কোঈ ছাউনী ত নেহি হ্যায়। ঠাণ্ডা মেঁ আপকো তকলিফ হোগা।

– কোঈ হরজা নেহি। ক্যাতনা পাহাড় ঔর জঙ্গলমেঁ আকাশ কী তলে মেঁ হমলোগ বীতায়া হৈ। ঠাণ্ডা কো কব্জা করনেকে লিয়ে দাবা হমলোগ কা পাশ হৈ। আপকা ইধর ঠারনেসে কমসে কম এ তো সুবিস্তা হোগা, কোঈ শের বগেরা আকর আচানক হামলোগোকা উপর হামলা করেগা নেহি।

– ইয়ে বাত তো সহি হ্যায়। হমলোগ রাতভোর বন্দুক লেকর পাহারা দেতা হুঁ।

এই বলে তাঁরা দুটো বড় সতরঞ্চি পেতে দিল তাঁদের লনে। আমরা তাতেই কোনমতে কম্বলাদি পেতে যে যার বিছানা করে নিলাম। পুলিশরা গোটা কয়েক মশাল জ্বেলে চৌকীর আবেষ্টনীর ধারে ধারে পুঁতে দিল। হরানন্দজী বললেন – এই মড়াইয়া বাবার কেরামতি পরখ করি এস। এই বলে ঝুলি থেকে সেই ভস্মের পুটলীটা বের করে আপাদমস্তক সেই ভস্ম মাখতে লাগলেন। তাঁর দেখাদেখি, আমরাও মাখলাম। ভস্ম মেখেই তার উপর জামা সোয়েটার পরে, মাথায় পট্টি বেঁধে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসলাম। পাহারাদারদের মধ্যে একজন সোয়েটার ওভারকোট মাথায় গরম টুপি অর্থাৎ ধড়াচূড়া ইত্যাদি এঁটে আমাদের কাছে এসে ২/৪ বার ঘুরপাক খেয়ে গাঁজার কল্কেতে টান দিবার ভঙ্গী দেখাল। হরানন্দজী তাকে বললেন – হামলোগ কোঈ গাঁজা পিতা নেহি বেটা! ইধর কিসীকা পাশ গাঁজা মিলেগা নেহি। লোকটি নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার আর একজন বয়স্ক লোক আমাদের কাছে এসে হরানন্দজীকেই তার দুঃখের কাহিনী জানাল, খোড়িবলি হিন্দীতে সে জানালো যে তার বাড়ী অমরকণ্টক জেলায়। তার ঠাকুরদাদা এবং বাবাও এই পুলিশ বিভাগে নোকরী করত। সেই সুবাদে সেও এই নোকরী পেয়েছে। তার রিটায়ার্ড করতে আর মাত্র দুবছর বাকী। আপনজন ছোড়কে এই দূরে পাহাড় ও জঙ্গল দেশে বাস করতে কী যে অবর্ননীয় কষ্ট, তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কারও মালুম হবে না। হরানন্দজী লোকটির কথা ধৈর্য ধরে শুনেই তাকে সরাসরি প্রশ্ন করে বসলেন – হিরণফাল তীর্থ হিঁয়াসে ক্যাতনা দূর বা? পথঘাট কা বারেমেঁ থোড়াসা বাতাইয়ে ত?

– হিঁয়াসে হিরণফাল করীব ১০ মিল হোগা। সিধা পূব দিশামেঁ জানে পড়েগা। মার্গ ঘোর জঙ্গলকা হৈ। উধর, শ্রীনর্মদাজী পর্বত কো চট্টানমে সে বহতী হৈ। উনকো জো ধারায়েঁ হো গঈ হৈ বে ইতনী সকড়ী হৈ কি হিরণ এক তরফ সে দুসরী তরফ কুদ সকতা হৈ। চৌড়াই ১২ সে ২০ ফুট তক হৈ। ধারা বড়ী তেজসে বহতী হৈ। করীব এক মীল কে বাদ সব ধারায়োঁ এক ধারা জো ৪০ গজ সে অধিক চৌড়ী নহী হৈ। ইয়ে ধারা বড়ে বেগসে কহী কহী উঁচাই সে গিরতী হৈ। কোঈ ভী নাব ইস্ ধার মেঁ, নহী জা সকতী। উহাঁ সে পুরানা নেমাড় প্রান্ত সমাপ্ত হো জাতা হৈ। পর্বত আউর চট্টানো কে কারণ ইস স্থানকে আগে তিলকবাড়া তক নাবেঁ নেহি জাতী। য়হাঁ হিরণ্যাক্ষ নে তপ করকে সিদ্ধি পাই থী।

– ম্যায় নে শোনা, ইয়ে বাত কভী আপ শোনো, উধর হিরণফাল মেঁ দুর্বাশা জীনে ভী তপস্যা করকে সিদ্ধি পাঈ থী।

– স্বামীজী! মুঝে পতা নেহি। উধর বৈখানস মহারাজ বিরাজমান হৈ। উনোনে সমাবিধান যোগী হৈ, হরবখৎ সমাধি মেঁ রহতা হৈ। উনোনে কহ সকতা হৈ।

'রাম রাম' বলে লোকটি উঠে গেল। সে উঠে যেতেই হরানন্দজী বলতে লাগলেন – ওহে তোমরা শুনলে ত? এ লোকটা যে বলে হিঁরণফাল হিরণ্যাক্ষের তপস্যা ক্ষেত্র। দুর্বাশা মুনির তপস্যার ক্ষেত্র কিনা, তা ওর জানা নেই।

আমি বললাম – তা শুনে আপনার চঞ্চলতার কারণ নাই। মড়াইয়া বাবা ত বলেছেন হিরণফাল দুর্বাসার তপস্যার ক্ষেত্র। বেচারা ত বৈখানস মুনির কাছে খোঁজ নিতেও বলে গেল। আর হিরণফাল যদি হিরণ্যাক্ষ বা দুর্বাশা মুনি কারও তপস্যাক্ষেত্র নাও হয়, তবুও আমাদেরকে যেতে হবে ত? এড়িয়ে যাওয়ার ত পথ নাই। কাজেই এত বিচার বিবেচনা করে লাভ কি? রাত্রি ৮টা বাজতে যায়, এবার সান্ধ্যক্রিয়াতে মন দিই আসুন। আমরা আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে সকলেই জপ করতে বসলাম। সান্ধ্যক্রিয়া যখন শেষ হল, তখন রঞ্জনের ঘড়িতে রাত্রি ১১টা বেজেছে। চারদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। আমাদের সঙ্গী প্রেমানন্দ দণ্ডী সন্ন্যাসী হলেও নানাবিধ কুসংস্কারের ডিপো। বার ব্রত এবং পাঁজির তিথি নক্ষত্র প্রতিদিন পাঁজি দেখে ঠিক করে থাকেন। পাঁজি না হলে তাঁর দিন কাটে না।

এটা তাঁর বহুদিনের অভ্যাস। ভারোচ থেকে আসার সময় তিনি একটি হিন্দী ভাষায় ছোট পাঁজি কিনে এনেছেন সঙ্গে ; তাঁকে আজ কি তিথি জিজ্ঞাসা করতেই বললেন – আজ কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি, বাংলা ১৩৬১ সালের ৭ই ফাল্গুন। ইংরাজী ১৯৫৫ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী। সকাল হলেই ত্রয়োদশী তিথি, সর্বশুদ্ধা ত্রয়োদশী। হরানন্দজী বললেন – মড়াইয়া বাবার কেরামতিটা তারিফ করার মত। এর আগেও আমরা জঙ্গলের মধ্যে মুক্ত আকাশের তলায় কত রাত্রি কাটিয়ে এসেছি। কিন্তু সে সব স্থানে নিজেদের চারদিকে কত অগ্নিকুণ্ড জ্বালতাম। কিন্তু মড়াইয়া বাবার ভস্মের গুণে আজ আগুন না জ্বেলেও নর্মদার তটের উপর আকাশের তলায় বসে আছি। গায়ে শীত লাগছে বলে মনেই হচ্ছে না। আমরা যে যার শরীর কম্বলে ঢেকে শুয়ে পড়লাম। আমাদের যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন সাড়ে ছটা বেজে গেছে। গোটা রাত্রি অবাধে শিশির পড়ে আমাদের কম্বল ও মাথার পট্টি বা পাগড়ী ভিজে সপ্‌সপে হয়ে গেছে। তবু শীতের জ্বালায় আমাদের ঘুম ভাঙ্গে নি। শঙ্খিনী খেলেও আমরা শরীরে গরম অনুভব করি বটে, ঘুমও খুব গাঢ় হয়, কিন্তু মড়াইয়া বাবা যে ভস্ম দিয়েছিলেন, তা মেখে এই নদীর তীরে পাহাড়ী ঠাণ্ডা অবলীলাক্রমে কাবু করতে পারলাম আগুনের সাহায্য না নিয়েই। আমাদের বড্ড ভুল হয়েছে কি গাছের কাঠ এবং কি কি লতা দিয়ে এই ভস্ম তৈরী হয়, তা জেনে নেওয়া উচিত ছিল। নর্মদার উত্তরতটের দিকে তাকিয়ে দেখি, পাহাড় পর্বত গাছপালা সবই যেন সাদা বরফে ঢাকা পড়েছে। নর্মদার জলে সাদা সাদা বাষ্পের ধোঁয়া। আমরা সকলে নতজানু হয়ে মা নর্মদা এবং মহাদেবকে প্রণাম করলাম। তারপর যে যার শিশিরে ভেজা কম্বল ও মাথার পাগড়ী ভাল করে নিগড়ে নিয়ে গাঁঠরী বেঁধে নিলাম। একে একে প্রাতঃকৃত্য সেরে খাড়া চৌকীর পাহারাদারদের কাছে বিদায় নিয়ে যখন হাঁটতে সুরু করলাম, তখন সকাল ৮টা বাজতে মিনিট পাঁচেক বাকী। পূর্বদিকে হাঁটতে লাগলাম, পাহাড়ের উপত্যকা দিয়ে পাহাড়ের উপর সূর্যোদয় হয়ে গেছে। শাল আসান প্রভৃতি গাছের ফাঁক দিয়ে রৌদ্র এসে পড়েছে আমাদের গায়ে। বড়ই আরাম বোধ করছি। মহানন্দস্বামী পথে হাঁটতে হাঁটতেই স্বগতোক্তি করলেন – আশ্চর্য ভস্মের গুণ, আগুন ছাড়া এভাবে শুয়ে থাকলে আলবৎ আমাদের ডবল বা চার ডবল নিমুনিয়া হত, সন্নিপাতিক জ্বরে মৃত্যু আমাদের অনিবার্য ছিল। চমৎকার আলো ছায়ার খেলা জঙ্গলে। নিবিড় ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে রোদ এসে পড়েছে, বন্য পাখীর কূজন, বামপাশে নর্মদার কলতান, ডানদিকে প্রায় দুশ গজ দূরে পাহাড় শ্রেণীর সবুজ শোভা কী সুন্দরই না লাগছিল। পথে তিনরকম ফুল অজস্র ফুটে আছে, সাদা কুর্চিফুল, থোকায় থোকায় বন্য পিটুনিয়া এবং আর একরকমের সুগন্ধ বিশিষ্ট হলদে ফুল। হলদে ফুলের গাছ আগেও দেখেছি কিন্তু ফুলগুলোর নাম জানি না। ৬/৭টা ময়ূর উপত্যকার মাঠে তালে তালে নাচছিল। তাদের সুন্দর রঙ এবং নৃত্যদোদুল ছন্দ দেখে মিনিট দুই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম কিন্তু আমাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ হয়ে তারা তক্ষুণি কেকা রব করতে করতে উড়ে গিয়ে বসল নিকটস্থ একটা বটগাছের ডালে। পাহাড়ের গায়েই এই বটগাছটা। রাস্তার গতিপথ দেখে বুঝলাম, এই বটগাছের তলা দিয়েই আমাদেরকে পাহাড়ে উঠতে হবে। আমরা সেই পথ দিয়েই হাঁটতে লাগলাম। অজস্র ছোট বড় নুড়ি পাথর হাতের লাঠি দিয়ে সরিয়ে কখনও বা ডিঙিয়ে চড়াইএর পথে শাল আসান কেঁদ এবং কুসুম গাছ অজস্র। বনের মধ্যে তিন চার স্থানে দেখলাম ধনেশ পাখী গাছের ডালে বসে ডাকছে। প্রায় হাজার খানিক ফুট এসে দেখলাম একটা ঝর্ণা পাহাড়ের চূড়া থেকে কলতানে বয়ে আসছে। ঝর্ণার পাশেই বহুদূর পর্যন্ত স্থান যেন মাকড়া পাথর দিয়ে বাঁধানো। কত শত বছর ধরে এই ঝর্ণা লোকচক্ষুর অন্তরালে যে বয়ে যাচ্ছে তার হিসাব কারও জানা নাই। ঝর্ণার ধারা পাহাড়ের উপরের স্তর ক্ষয়িয়ে তুলে ফেলে

এমনভাবে তলাকার পাথর বের করে ফেলেছে যে, সে পাথরেরও নানা স্থানে মৌচাকের মত অজস্র গর্ত ও ছিদ্র সৃষ্টি হয়েছে। অতিকষ্টে সেই স্থানটা অতিক্রম করে উঠতেই একটা বিস্তীর্ণ মালভূমি দেখতে পেলাম। বেলা তখন সাড়ে দশটা। আমরা সেখানে কিছুক্ষণ বসার সিদ্ধান্ত নিলাম। রাত্রির শিশিরে ভেজা কম্বল এবং পাগড়ী ইত্যাদি সেখানে রোদে শুকাতে দিলাম। বড় জোর আধঘণ্টা কাপড় চোপড়ে রোদ লেগেছে, এমন সময় ত্রিদিবানন্দ বললেন – ডান দিকের ঢালে তাকিয়ে দেখুন একদল নেকড়ে কতকগুলো সম্বর হরিণকে তাড়া করে দৌড়াচ্ছে। কম্বলাদি সব গুটিয়ে নিয়ে এ স্থান যত শীঘ্র পারি ছেড়ে যাই চলুন। আমরা সঙ্গে সঙ্গেই কম্বলাদি রোদ থেকে তুলে নিয়ে হাঁটতে সুরু করলাম মালভূমির উপর দিয়ে। হরানন্দজী ত্রিদিবানন্দকে বললেন – ভাই, খাড়া চৌকীর পুলিশটা বলল – হিরণফালে নাকি হিরন্যাক্ষ তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিল। হিরণ্যাক্ষ ত হিরণ্যকশিপু দৈত্যের ভাই। দৈত্য মাত্রই দেবতা বিদ্বেষী এবং ভয়ংকর হিংস্র হয়ে থাকে। সেই দৈত্যের মনে হঠাৎ কবে বৈরাগ্য এবং তপস্যায় রুচি জন্মাল, তা জানতে বড় ইচ্ছা হয়। তুমিও ত পুরাণ ও মহাভারত ভালভাবেই অধ্যয়ন করেছ, তুমি হাঁটতে হাঁটতে বলতে থাকে, আমরা শুনি। ইচ্ছা করলে শৈলেন্দ্রনারায়ণজীও হিরণ্যাক্ষের এবং দুর্বাশার কাহিনী শোনাতে পার। আমি বললাম, মাপ করবেন, আমি যথোচিতভাবে পুরাণশাস্ত্রের চর্চা করিনি। আমি বাল্যকাল হতে বেদ ও পাণিনি পাঠেই সময়ক্ষেপ করেছি। হিরণ্যাক্ষ একজন দুর্ধর্ষ দৈত্য ছিল শুধু এইটুকুই জানি। দুর্বাসা সম্বন্ধে এইটুকু জানি যে, তিনি অত্যন্ত কোপন স্বভাবের ঋষি। বিন্দুমাত্র অপরাধ হলেই তিনি কাউক ক্ষমা করতেন না। মহাকবি কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ গ্রন্থে পড়েছি, কণ্বমুনির আশ্রমে শকুন্তলা যখন প্রতিপালিতা হচ্ছিলেন, সেই সময় যুবতী শকুন্তলার সঙ্গে মহারাজ দুষ্মন্তের প্রেম এবং পরিণয় হয়। বিবাহের পর, দুষ্মন্ত তাঁর রাজ্যে ফিরে গিয়ে দীর্ঘকাল আর কণ্বমুনির তপোবনে ফিরেন নি। বিরহক্লিষ্টা শকুন্তলা একদিন দুষ্মন্তের চিন্তায় যখন তদ্গত চিত্ত হয়ে পড়েছিলেন, সেই সময় হঠাৎ সেখানে মহাতপা দুর্বাসা এসে উপস্থিত হন। তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য দিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ায় দুর্বাসা মুনি হুঙ্কার ছাড়েন – আঃ কথমতিথিং মা পরিভবসি ? বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্। স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন, কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব।

– আঃ! কি আস্পর্ধা! আমার মত লোক অতিথিরূপে এলাম, আমাকে তুচ্ছজ্ঞানে অবমাননা করলি ? একাগ্র চিত্তে যে লোকের চিন্তায় তুই তন্ময় হয়ে আছিস, অতিথি রূপে সমাগত এই তাপসের সম্বর্ধনা করলি না, সুরাপানে মত্ত ব্যক্তি যেমন প্রথমে যে কথা বলে পরক্ষণে সে কথা ভুলে যায়, আর স্মরণ করতে সমর্থ হয় না, তুইও সেইরকম তোর প্রেমাস্পদকে যথেচ্ছ স্মরণ করলেও সেই লোক কোনমতেই তোকে স্মরণ পথে আনতে পারবে না। এইবলেই দুর্বাসা দ্রুতবেগে সেখানে থেকে চলে গেলেন। শকুন্তলার প্রিয় সখী অনুসূয়া দৌড়ে গিয়ে তাঁর পায়ে পড়ে কাতরভাবে শকুন্তলার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করলে ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট এই ঋষি কৃপাবশে বলে যান – আমার কথা কদাচ অন্যথা হবার নয় তবে যদি অভিজ্ঞান স্বরূপ কোন অলংকার সেই লোককে দেখাতে পারলে, তবে এই অভিশাপের মোচন হবে। এই কথা বলতে বলতেই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারপর দুষ্মন্ত প্রদত্ত আংটি দেখিয়ে কিভাবে দুজনের মিলন ঘটল, তার সুন্দর আলেখ্য এঁকে গেছেন মহাকবি কালিদাস।

দুর্বাসা সম্বন্ধে চিন্তা করলেই তাঁর সম্বন্ধে প্রাকৃত ভাষায় অনসূয়ার উক্তিটিকেই আমার যথার্থ বলে মনে হয় – সহি! শরীরী বিঅ কোবো কসস্ অগ্নুলঅং ন গেহ্নদি অর্থাৎ দুর্বাসা যেন রোষের প্রতিমূর্তি। কারও অনুনয় বিনয় সহসা গ্রাহ্য করার লোক তিনি নন।

আমি এবার ত্রিদিবানন্দকে বললাম – বলুন না ! হিরণ্যাক্ষের কথা । এই মহাভয়ঙ্কর জঙ্গলে ঐ মহাভয়ঙ্কর দৈত্য তপস্যা করতে এসেছিল এ ত কম কথা নয় । বলতে আরম্ভ করুন । আমরা নর্মদার দিকে তাকিয়ে প্রণাম করে ছোট বড় তিন চারটা পাহাড় দেখতে পেলাম । সারি সারি এই পাহাড় শ্রেণী মনে হচ্ছে, আমরা যে মূল পাহাড়ের উপর দিয়ে হাঁটছি, তার সঙ্গে এসে যেন সারিবদ্ধ ভাবে মিশে গেছে । হঠাৎ পরপর তিনবার বাঘের গর্জন শুনলাম । নিচের দিকে তাকিয়ে সকলেই দেখতে পেলাম, একটা ঝর্ণার ধারে দুটো বড় বড় হরিণ রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে । দুটোরই খাবলা খাবলা মাংস খেয়ে রয়াল বেঙ্গল টাইগারের মত একটা বিশালদেহী ব্যাঘ্র মহারাজ পরম পুলকে জলপান করছে । আমরা বড়বড় পাথর ডিঙ্গিয়ে হেঁটে চলেছি । ফিস্ ফিস্ করে ত্রিদিবানন্দ বললেন – এখন কথা বলা কি ঠিক হবে ? 'আপনি ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করুন না । অনেক নিচে আছে বাঘ । বাঘ বন্য জন্তু বা মানুষ শিকার করেই হুঙ্কার ছাড়ে, পরিতৃপ্তির প্রাণবিদারী হুঙ্কার । এখন ত উনি জলপানে ব্যস্ত, তাছাড়া কাছেই পড়ে আছে ভোজ্য । কাজেই এদিকে এখন চোখ আর মন দিবার তাঁর সময় নাই ।' আমরা মিনিট পনের কুড়ি হেঁটেই আর একটা পাহাড়ের গায়ে এসে পৌছলাম । দুই পাহাড়ের মাঝখানে বেশ কিছুটা ফাঁক । দুই দিকেরই পাহাড়ে শাল আসান প্রভৃতি গাছের জটলা । আমরা এই পাহাড় থেকে সামনের পাহাড়ে যাবার জন্য ফাঁকটা অতিক্রম করার জন্য নীচে নামতে লাগলাম । এবারে দেখছি, নামার পথে অনেক বড় বড় পাথর, তার ফাঁকে ফাঁকে বৈঁচকুলের মত ঝোপ, কাঁটায় ভরা । লাঠি ঠুকে ঠুকে সাবধানে সবাই নামতে লাগলাম । কাঁটাকুলের ঝোপ লাঠি দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে । প্রায় শতখানিক ফুট নেমে পাশাপাশি দুই পাহাড়ের গায়ে একটা স্তর পেলাম । সেই স্তর ধরে বড় বড় পাথর ডিঙিয়ে সামনের পাহাড়ের মাথায় উঠে এলাম । এখন একটু হাঁটবার সুবিধা হল । অল্পবিস্তর সবাই কাঁটার ঘা খেয়েছি । ত্রিদিবানন্দ এবারে হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের উপাখ্যান বলতে সুরু করলেন – মহর্ষি কশ্যপের দুই স্ত্রী – দিতি এবং অদিতি । অদিতির পুত্র আদিত্য এবং অন্যান্য অমরবৃন্দ । একদিন সন্ধ্যাকালে দিতি কশ্যপের কাছে এসে এক দেবদৈত্যজয়ী বলবান পুত্র ভিক্ষা করে বসলেন । মহর্ষি তাঁকে গর্ভদান করে বললেন, তোমার চিত্ত অপবিত্র এবং তুমি অত্যন্ত কামাতুরা, সন্ধ্যাকালে পুত্র প্রার্থনা করলে । তাই তোমার দুই অধম পুত্র জন্মাবে । সকলকে পীড়ন করবে । জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হবে হিরণ্যকশিপু এবং কনিষ্ঠের নাম হিরণ্যাক্ষ । হিরণ্যকশিপুর পুত্র বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ হতে তোমার কুল পবিত্র হবে । তবে তোমার দুই পুত্রই বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হবে । ব্রহ্মার বরে দুর্ধর্ষ হয়ে হিরণ্যাক্ষ যুদ্ধের জন্য স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত হয়, ভয়ে দেবতারা পালিয়ে যান । তখন হিরণ্যাক্ষ জলক্রীড়ার জন্য সমুদ্রে অবতরণ করে । সেখানে সে বরুণের প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে বরুণকে যুদ্ধে আহ্বান করে । বরুণ তাকে বলেন – এখানে তোমার সমকক্ষ কেউ নাই । একমাত্র ভগবান বিষ্ণুই তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ, তুমি তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান কর । তখন হিরণ্যাক্ষ বিষ্ণুর সন্ধানে রসাতলে প্রবেশ করে বরাহরূপী বিষ্ণুকে দেখে তাঁকে জলচর বরাহ মনে করে আক্রমণ করে । সেই বরাহ হিরণ্যাক্ষকে আক্রমণ করে, দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর বরাহরূপী বিষ্ণু দন্ত দ্বারা হিরণ্যাক্ষকে বিদীর্ণ করে নিহত করে । পুরাণান্তরে আছে, হিরণ্যাক্ষ ত্রিলোক জয় করে পৃথিবীকে সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করে । বিষ্ণু বরাহরূপে হিরণ্যাক্ষকে বধ করে দন্তাগ্রে রসাতল হতে পৃথিবীকে উদ্ধার করে । ত্রিদিবানন্দ কথিত উপাখ্যান শুনতে শুনতেই হরানন্দজী ভাবাবেগে হাততালি দিতে দিতে গেয়ে উঠলেন –

> বসতি দশন শিখরে ধরনীতব লগ্না
> শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না ।
> কেশবধৃত শূকর রূপ – জয় জগদীশ হরে ॥

অর্থাৎ জয়দেবকৃত দশাবতারস্তোত্রম্ এর তৃতীয় স্তবকে ভক্তকবি উচ্ছ্বসিত হয়ে বন্দনা করছেন, চন্দ্রে কলঙ্করেখা যেমন তার সৌন্দর্য বর্ধকরূপে অবস্থিত সেই রকম হে বিষ্ণু

তোমার দন্তাগ্রে সংলগ্ন হয়ে পৃথিবীও সেই রকম অবস্থান করে ; হে কেশব, হে বরাহরূপী জগদীশ্বর, হে হরি, তোমার জয় হোক।

হরানন্দজীর উচ্ছাসও শেষ হল, আমরা পাহাড়ের ধারেই নিচে নামবার রাস্তা দেখতে পেলাম। এখানকার পাহাড়ী লোকরা নিশ্চয়ই এই পথে যে কোন কারণে যাতায়াত করে। তারই একটা পথরেখা পড়েছে। আমরা মা নর্মদাকে স্মরণ করে সেই পথেই নামতে লাগলাম। উৎরাই এর পথ সাধারণতঃ চড়াই পথ থেকে সুগম হয়। লাঠি ঠুকে ঠুকে ছোট ছোট গাছের মাথা ধরে, কখনও বড় বড় গাছের ডাল যা নিচের দিকে ঝুকে এসেছে, তার অগ্রভাগ ধরে নামতে লাগলাম। পাহাড়ের ঢালেই একটা বড় অশ্বত্থ গাছ পাথর ভেদ করে উঠেছে। আমরা তার তলায় এসে দাঁড়ালাম। হঠাৎ কতকগুলো বন্য কুকুরের অবিশ্রান্ত ঘেউ ঘেউ চিৎকার শুনে আমরা চমকে উঠলাম। বন্য কুকুররা যে কিরকম দজ্জাল, হিংস্র এবং উন্মাদ প্রকৃতির হয়, উত্তরতটের জঙ্গলে আমি তা দেখে এসেছি। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতেই আমরা কুকুরের ঘেউ ঘেউ বিকট চিৎকার অনুসরণ করে দেখতে পেলাম, প্রায় ২০০ ফুট দূরে পাহাড়ের ঢালে বনের ছোট ছোট ঝোপ ও লতাগুল্ম যেন দলিত মথিত হচ্ছে। গোটা ছয়েক বন্য বরাহকে ঘিরে ধরেছে একদল বন্য কুকুর। বরাহ দেখতে বড় বড় শূকরের মত, সামান্য মাত্র তফাৎ এই যে এদের লম্বাটে মুখে ছোট ছোট দাঁত উঁচু হয়ে আছে। বন্য কুকুররা একসঙ্গে তিনচারটা ঝাঁপিয়ে পড়ছে এক একটা বন্য বরাহের উপর। তারা যেমন কামড়ে আঁচড়ে বন্য বরাহগুলোকে রক্তাক্ত করে অস্থির করে তুলছে, তেমনি বরাহগুলোও দাঁতে কেটে কুকুরগুলোকে নাজেহাল করে মারছে। দাঁতের কামড়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলেই কুকুরগুলো কাঁই-কাঁই করে কাঁদছে। আমি হরানন্দজীকে বললাম, নিন এবার বরাহরূপী বিষ্ণুর স্তব করুন বিহ্বল কণ্ঠে। এমন বিষ্ণু আর কোথায় পাবেন, যাঁর স্মরণ মাত্রই আবির্ভাব ঘটে ? প্রেমানন্দ বললেন ওঁকে আর বিদ্রূপ করে কি হবে। এখন যত তাড়াতাড়ি পারি পালিয়ে চলুন এখান থেকে। আমরা নানারকম কাঁটাঝোপ এবং ছোটবড় মাকড়া পাথরের নুড়ি পেরিয়ে তরতর করে নেমে এলাম উপত্যকায়। সামনেই নর্মদা কিন্তু নর্মদার এই রূপ এর আগে কোথাও দেখি নি। জল খুব কমই দেখছি। নর্মদার বুকে পাথরের চট্টান, তারই উপর দিয়ে নর্মদা খরবেগে বয়ে চলেছে। নর্মদার গা ঘেঁষে এদিকেও পাহাড় উত্তরতটেও পাহাড় উঠে গিয়েছে উপর দিকে। একটি পাহাড়ী বুড়ীমা সঙ্গে একটি ১০/১২ বৎসরের বালককে নিয়ে নর্মদার ঘাটে স্নান করে উঠে আসছিল। বালকের কোমরে শুধু মাত্র একটা ময়লা লেংটি, বুড়ীমায়ের কোমরে এক ঘশলি এবং বুকে একফালি নেকড়ার মত কাপড় কোনমতে লজ্জা নিবারণের কাজ করছে। হরানন্দজী মায়ীর কাছে এগিয়ে গিয়ে এই জায়গার নাম কি জিজ্ঞাসা করলেন – মায়ী উত্তর দিল হিরণফাল। প্রায় আধমাইল দূরে পাহাড়ের উপর তিনটা তাঁবু দেখে, হরানন্দজী সে সম্বন্ধেও কিছু জিজ্ঞাসা করলেন, তাতে তিনি যা উত্তর দিলেন, তাতে অনেক কষ্টে বুঝা গেল যে বড়বাণী ষ্টেটের রাজার গুরু বৈখানস মুনি কখনও কখনও এখানে শিবরাত্রির সময় এসে পৌছান এবং মাসখানিক থেকে চলে যান।

বেলা তখন দেড়টা বেজেছে। আমরা নর্মদার ঘাটে নামলাম। জল এক হাঁটুর অনেক কম। কোনমতে জলের মধ্যে বসে গামছা ভিজিয়ে গা রগড়ে কমণ্ডলু ভরে জল নিয়ে মাথা ধুলাম। এইভাবে স্নান করতে করতে লক্ষ্য করলাম, গোটা নর্মদার বুক জুড়ে পাথর আর পাথর। যাকে বলে পাথরের চট্টান (নদীর গর্ভে জলের পরিবর্তে পাথর বেরিয়ে থাকলে তাকে চট্টান বলে)। নর্মদার ধারা তারই উপর দিয়ে ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে আঁকাবাঁকা গতিতে। মনে পড়ল মড়াইয়া বাবার গান – অমরকন্টক সে বরুণ দিশা কো চলী নাগগতি পাই। নাগগতিই বটে ! সাপের মতই এঁকেবেঁকে চলেছে নর্মদার ধারা।

দুই তটেরই পাহাড় এমন কাছাকাছি এসে পড়েছে, উভয়তটের মধ্যে নর্মদার পরিসর বিশ পঁচিশ ফুটের বেশী নয়। কোথাও বা দশবার ফুট ব্যবধানে এসে ঠেকেছে। একটা হরিণ লাফ দিয়ে এ তট থেকে ঐ তটে কিংবা ও পাশের তট থেকে এই তটে অবলীলাক্রমে লাফিয়ে যেতে এবং আসতে পারে।

হরিণফাল বা হিরণফাল নাম সার্থক।

হরানন্দজী স্নান করে আমাদের একটু আগে উঠে এসে কমণ্ডলুতে ছাতু ভিজিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা স্নান করে উঠে আসতেই তিনি বললেন – ছাতু শেষ। কাল থেকে হরিমোটরও জুটবে না! আজকের মত এক গোঁড়া দু গোঁড়া করে খেয়ে নাও। আমরা তাই খেয়ে আকণ্ঠ জলপান করলাম। যেদিকেই দৃষ্টি পড়ছে, দেখছি কেবল পাহাড় আর পাহাড়। উভয়তটের প্রকৃতি একই রকম, এখানে নর্মদার উভয়তটই হিরণফাল নামে পরিচিত। যতদূর দৃষ্টি যায়, কোনও লোকালয় চোখে পড়ছে না! আমরা বৈখানস মুনির তিনটি তাঁবুর দিকে লক্ষ্য রেখে এগোতে লাগলাম। তাঁবুগুলির কাছাকাছি এসে দেখতে পেলাম, তাঁবুর বাইরে জনা কয়েক সাধু ঘোরাফেরা করছেন। দুজন বন্দুকধারী সিপাহীও পাহারা দিচ্ছে দেখতে পেলাম। আমরা তাঁবুর কাছাকাছি হতেই বৈখানস মুনির কোনও শিষ্য আমাদের পরিচয় জানতে চাইতে হরানন্দজী উত্তর দিলেন – আমাদের ৮ জনের মধ্যে ৬ জন কাশীস্থ কামরূপ মঠের পরিক্রমাবাসী শিষ্য। বাকী দুজনের সঙ্গে পরিক্রমা পথে সাক্ষাৎ হয়েছে! আপনাদের গুরুদেবের দর্শন পাওয়া যাবে?

– জরুর সাক্ষাৎ মিলেগী। লেকিন বাতচিৎ আভি নেহি। আপলোগ আইয়ে গুরুজীকো দর্শন কর লিজিয়ে। এই বলে তিনি একটি ছোট তাঁবুর কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁবুর পর্দা সরিয়ে দিলেন। আমরা দেখলাম, বিশালদেহী এক জটাজুট সাধু ধ্যানাসনে সমাসীন। দেখে মনে হল, তাঁর বাহ্যজ্ঞান নাই। কিছুক্ষণ পরে মনে হল, মহাত্মার যেন বারেকের জন্য ধ্যানভঙ্গ হল। আরক্ত চক্ষে চারদিকে একবার ক্ষণেকের জন্য তাকিয়ে আবার তিনি চক্ষু মুদ্রিত করলেন।

আমরা প্রণাম করে তাঁবুর কাছ হতে ফিরে এলাম। সেই সন্ন্যাসীটি আমাদেরকে পথ দেখিয়ে ৩ নম্বর তাঁবুতে নিয়ে এসে তাঁবুর পর্দা সরিয়ে বললেন – ইধর আপলোগ রাত্রিবাস করেঙ্গে। ইধর তিন চার মিল তক কোঈ লোকালয় নেহি। ঠারনেকা কোঈ জ্যাগা ভি নেহি। হরানন্দজী সেখানকার সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন – আপকা সম্প্রদায়কা কেয়া নাম হ্যায়। সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন – বৈখানস শব্দকা ব্যুৎপত্তি – বি-খন্ + অস, কর্তৃবাচ্যে। বৈখানস + ষ্ণ ইদমর্থে ভি বৈখানস শব্দ সিদ্ধ হোতা হৈ। শব্দকা মতলব বানপ্রস্থী, ফল-মূলাহারী সন্ন্যাসী। গুরুজী শৈবাগম তন্ত্রকা মহাসাধক হ্যায়। বড়বাণীকা রাজাবাহাদুর ঔর গুজরাটকা বড়া বড়া শেঠজী ভি ইনকো বহোৎ মানতা হৈ। ইয়ে জো সিপাহী দেখতে হ্যায়, গুরুজীকা পাশ ভেজ দিয়া বড়বাণীকা রাজাবাহাদুর। গুরুজী রুণ্ডা পরিক্রমা ঔর জলেহরি পরিক্রমা কর চুকা।

সন্ন্যাসী চলে যেতেই আমরা তাঁবুর ভিতর ঢুকে যে যার বিছানা পেতে নিলাম। তাঁবুর চারপাশেই দেখলাম, বড় বড় আটার বস্তা, ডালের বস্তা আর ঘি এর টিন সযত্নে রক্ষিত আছে। সে সব থাকলেও আমাদের ৮ জনের ৮টা বিছানা পাততে কোনও অসুবিধা হল না। বিছানা পেতে আমাদের ঝোলা গাঁঠরী রেখে বাইরে বেরিয়ে দেখি, সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছেন। বেলা বড় জোর ৪টা বেজেছে। তার মধ্যেই সন্ধ্যার ছায়া নেমে এসেছে। আমরা সাবধানে নর্মদার ঘাটে নেমে নর্মদা স্পর্শ করে এসেই তাঁবুতে ঢুকলাম। হরানন্দজী স্বগতোক্তি করলেন – মা নর্মদার কি অসীম দয়া! পাহাড়ী পথে ১০ মাইল হেঁটে এসে যদি লোকালয় বর্জিত এই দুর্গম স্থানে থাকবার স্থান না জুটত, তাহলে আমাদের কী

দুর্দশাই না হত ! কিন্তু দয়াময়ী মা ঠিক এই সময়েই বৈখানস মুনিকে এখানে টেনে এনেছেন, তার এই অধম সন্তানদের নিরাপদে রাত্রিবাসের সুবন্দোবস্থ করে রেখেছেন । পরিক্রমায় না এলে এই দৈবী কৃপার অনুভব জীবনে মিলত না ।

একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন – সবই ভাল তবে যে তন্ত্রকে আমি চিরকাল ঘৃণা করেই এসেছি, হিরণফালে এসে সেই এক তান্ত্রিকেরই সাহায্য এবং সেবা নিতে হচ্ছে !

আমি বললাম – মহাত্মন ! শৈবাগমতন্ত্র আর বাংলাদেশ ও আসামে তথাকথিত তান্ত্রিকদের যে সব বীভৎস বাহ্যাচার এবং পঞ্চ 'ম' কারের সাধনা চলে আসছে, তা কখনই এক নয় । কাশ্মীরী শৈবাগমতন্ত্রের সাধনা অতি উচ্চকোটির সাধনা । বৈদিক সাধনার চেয়ে তা কোন অংশে ছোট বা হেয় নয় । সর্বাংশে বরং শ্রেয়তর । পরিক্রমার শেষে কাশীতে ফিরে গিয়ে কাশ্মীরী শৈবাগমের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা শ্রী জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্ভব হলে সঙ্গ করবেন । তাহলে শৈবাগমতন্ত্রের গভীরতা এবং উপাদেয়তা উপলব্ধি করতে পারবেন । তাছাড়া সেখানে আছেন সর্বশাস্ত্রদর্শী মহামহোপাধ্যায় শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ । হাজার বছরেও যেমন আর একজন রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশে জন্মাবেন না, তেমনি আর একজন গোপীনাথের আবির্ভাবও সুদুষ্কর । তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলেও শৈবাগমতন্ত্রের রহস্য জেনে কৃতকৃত্য হবেন । আমি বাবার কাছে কাশ্মীরী শৈবাগমের একটি রহস্যগ্রন্থ 'প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ম' পড়বার এবং মাঝে মাঝে কাশীতে গিয়ে বাবার নির্দেশে ঐ দুই মহামনীষীর কাছে ঐ গ্রন্থের মর্মকথা আলোচনা করে বুঝে নিবার সুযোগ পেয়েছিলাম, তাতে বুঝেছি যে শৈবাগম এমন একটি সাধন-শাস্ত্র, যাতে প্রবেশের অধিকার সেই সাধকেরই যাঁর মধ্যে পরমেশ্বরের কৃপায় এবং শক্তিপাতের ফলে প্রাতিভ জ্ঞানের উন্মীলন ঘটেছে । অন্যান্য শাস্ত্র নিজের অধ্যয়ন বা অনুশীলনের ফলে কিছুটা আয়ত্ত বা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব । কিন্তু শৈবাগম সাধনার সঙ্গে অভিন্নভাবে যুক্ত যে বিদ্যাপাদ তার অভিজ্ঞ ব্যাখ্যাতা আজকাল সহজে মেলে না । মন্ত্র কি, মন্ত্রের চৈতন্য বলতে কাকে বুঝায়, গুরুই বা কে দীক্ষাই বা কি, কুণ্ডলিনী জাগরণ বলতেই বা কি বুঝায়, পরকুণ্ডলী কি, এসব নিয়ে আমাদের দেশে সিদ্ধ সাধু মহাপুরুষদের মধ্যে নানারকম আজগুবি ধারণা এবং উদ্ভট মনগড়া কল্পনা আছে । আরও মজা এই, ঐ সব সাধুর ভড়ং এ মুগ্ধ হয়ে তাঁদেরই লক্ষ লক্ষ্য শিষ্য ক্রমেই বিভ্রান্তির পথে ছুটে চলেছে, অন্ধেন নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ ।

শৈবাগমের সবচেয়ে বড় কথা, সে মানুষকে জাগাতে চেয়েছে । জাগরণই জীবন । আমরা যে জীবনে জেগে আছি বলে মনে করি, তা ইন্দ্রিয়ের সুখ-সুপ্তি যা মরণেরই সামিল ! আমাদের স্বরূপের মহিমা সম্বন্ধে আমরা অচেতন । তেমনি যাঁরা ব্রহ্মস্বরূপে লীন হয়ে যান, তাঁরাও আত্মার অনন্ত ঐশ্বর্য সম্বন্ধে সমান অচেতন । শৈবাগমের ঋষিরা তাই শুধু ইন্দ্রিয়ের স্বাতন্ত্র থেকে মুক্তিলাভে বা প্রকৃতির নাগপাশ হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু নির্মল চিৎস্বরূপ পুরুষের কৈবল্যে তৃপ্ত হতে পারে নি । পাশ বিযোজন মাত্রই তার লক্ষ্য নয়, তার উপর সে চেয়েছে শিবত্ব যোজন । শিবের অমল মহিমার মধ্যে স্বাতন্ত্র শক্তির উল্লাসই তান্ত্রিক দৃষ্টিতে পূর্ণতা এনে দিয়েছে । শৈবাগমের তাই প্রকাশ স্বরূপের সঙ্গে অভিন্ন তনু হয়ে প্রকাশ পেয়েছেন বাক্‌রূপিনী বিমর্শশক্তি । এই বাক্ হতেই সৃষ্টি আবার সেই বাকেই সৃষ্টির লয় । বাকেই বন্ধন এবং বাকের মাধ্যমেই মুক্তি । শৈবাগমের তাই বর্ণমালার রহস্য সবচেয়ে গভীর ও ব্যাপক । বর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দজালেই আমরা আবদ্ধ হয়ে আছি, আমাদের বিবিধ বিকল্পের মূলে এই শব্দ । তাই নির্বিকল্প স্বরূপে স্থিতিলাভ করতে এই শব্দরাশিকে বিগলিত করা বা ভেদ করা আবশ্যক । রহস্য পরিভাষায় একেই বলা হয় সূর্যমণ্ডল ভেদ, কারণ শব্দব্রহ্মরূপী এই রবিই (রৌতি শব্দং করোতি ইতি রবিঃ) সৃষ্টির মূলে । ইনিই সবিতা, জগৎপ্রসবকারিণী মহাশক্তি । উপনিষদের ভাষায় এই রবি বা

আদিত্যই 'বিদুষাং প্রপদনং নিরোধো অবিদুষাং।' শৈবাগমের ঋষিদের মতে সমিদ্ধ কুণ্ডলিনীর প্রদীপ্ত অগ্নিতেই বর্ণের বিগলন সম্ভব হয় এবং সেই কুণ্ডলিনীর জাগরণ ঘটে, শিবতত্ত্ববিদ্ শৈবগুরুর শক্তিপাত জনিত দীক্ষার ফলে।

সহসা গুডুম্ গুডুম্ বন্দুকের আওয়াজ শুনে আমরা ঘাবড়ে গেলাম। যে সন্ন্যাসী আমাদেরকে এই তাঁবুতে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছলেন তিনি একটা মশাল হাতে দৌড়ে এসে বলে গেলেন – 'আপলোগ রাতমেঁ তাঁবুকে বাহারমেঁ মৎ নিকলে। একপাল নেকড়ে তাঁবুকা পাশ আয়ে থে। সিপাহীনে গোলী ছোঁড়া। ডরনেকো কোঈ বাত নেহি। মা নর্মদাজীকা কৃপামেঁ হমলোগকা কুছ হানি নাহি পৌছায়েগা।' এই বলেই তিনি চলে গেলেন। আমরা সান্ধ্যক্রিয়াতে বসলাম। সান্ধ্যক্রিয়ার পর যে যার বিছানায় কম্বল গায়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল সকাল সাড়ে ছটায়। অন্যান্য তাঁবুতে তাঁবুতে তখন শাঁখ ঘণ্টা এবং ডম্বরুর আওয়াজ উঠেছে। বুঝলাম, আজ ৮ই ফাল্গুন শিবচর্তুদশী। শেষ রাত থেকে মহাত্মার তাঁবুতে শিবপূজা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। শীতের প্রকোপ একটু কমেছে বলেই মনে হল। আমরা প্রাতঃকৃত্য সেরে নর্মদায় স্নান করতে নামলাম যখন, তখন সাড়ে আটটা বেজেছে। পূর্বেই বলেছি, এখানে নর্মদার জল কম। কালকের মতই কমণ্ডলু ডুবিয়ে ডুবিয়ে গায়ে মাথায় জল ঢেলে স্নান করছি, এমন সময় সেই সন্ন্যাসী আমাদের কাছে এসে বলে গেলেন – আজ বেলা বারা বাজনেসে গুরুজীকা সাথ আপলোগোঁকা ভেট হোগা। এই বলে পাড়ে উঠতে উঠতে বললেন – হিঁয়াসে করবী দুশো গজ বাঢ় জানেসে এহি দক্ষিণতটমেঁ এক জ্যাগামেঁ পানি গহেরা হ্যায়। উধর পানিমেঁ হরবখৎ শিবলিঙ্গ ধাবড়ী কুণ্ডকা মাফিক ঠিকরাতা হৈ। নর্মদামায়ীকা কৃপাসে শিবলিঙ্গ মিল যায় ত আজ শিবরাত্রিমেঁ পূজাকা মোকা মিল যাবেগা। আমরা তাঁর কথায় বেশ কতকটা এগিয়ে যাওয়ার পর পাহাড়ের খোরে নর্মদার জল জমে আছে দেখলাম। জল প্রায় ৪/৫ ফুট গভীর বলে মনে হল। আমরা সেই জলে তর্পণাদি ক্রিয়া করতে আরম্ভ করলাম। আমাদের তর্পণকালেই মাঝে মাঝে একটা দুটো করে ছোট ছোট শিবলিঙ্গ ঠিকরে এসে পড়তে লাগল। ১০টা শিবলিঙ্গ ঠিকরে এসে পড়েছিল চট্টানের উপরে। ছোট ছোট শিবলিঙ্গ। আমরা প্রত্যেকেই এক একটা কুড়িয়ে নিয়ে বাকী দুটো মাথায় ঠেকিয়ে জলের মধ্যে ছেড়ে দিলাম। তাঁবুতে ফিরে যত্ন করে ঝোলাতে রেখে জপ করতে বসলাম। জপ সেরে যখন উঠলাম, তখন সাড়ে ১০টা বেজে গেছে। একটু পরেই সেই সন্ন্যাসী একজন ব্রহ্মচারীর সাহায্যে প্রায় দু ডজন কলা এবং কিছু মূল নিয়ে এসে বললেন – আপকো ভিক্ষাকে লিয়ে। সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীকে নিয়ে চলে যেতেই আমরা ফলমূলের সদ্‌ব্যবহার করতে লাগলাম। ভোজনের পর ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম সবাই। কখন ১২টা বাজে সেই আশায়। সাড়ে ১১টা বাজলো, রঞ্জন তার ঘড়িটা আমাদের সামনেই রেখে দিয়েছে। বারটা বাজ্‌তে মিনিট দুই বাকী, আমরা সকলেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বৈখানস মুনির তাঁবুটি যেখানে, তার উপরভাগে অনেক উঁচুতে পাহাড়ের উপর একটা বিশাল বটগাছ চোখে পড়ল ; বহুকালের বটগাছ। তার প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা। গতকাল আসার পরেই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছিল। কাজেই চোখে পড়েনি। আজ সকালে হয়ত আলতোভাবে দেখেছিলাম, কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করি নি। আজ লক্ষ্য করতেই দেখতে পেলাম, এই বিশাল বটের ঝুরি বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। বহু পুরাতন বলে ঝুরিগুলোই মোটা হয়ে গেছে। মূল শিকড়গুলো নর্মদাতটের উপর পাথরের গা বেয়ে নেমে নর্মদা জলের রস টেনে নিতে নিতে তার কূলের উপর যেন দাঁড়িয়ে আছে। বটগাছের ছায়া এসে পড়েছে সাধুর তাঁবুর উপর। সূর্য তখন মধ্যগগনে। মাধ্যন্দিন সূর্যকে প্রণাম করে সাধুর তাঁবুর ভিতর ঢুকবার উদ্যোগ করছি, সহসা নাসিকায় এ কি অপূর্ব সুবাস! ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যেন এক ঘনীভূত

আনন্দ মস্তিষ্কের কুহরে কুহরে প্রবেশ করে মুহূর্তে আমার সমস্ত সত্তাকে আনন্দ-শিহরণ কন্টকিত করে তুলল। সে অনুভব যেন আমাকে একটা সুখ সমুদ্রের মধ্যেই ডুবাতে চাচ্ছে। সমস্ত ইন্দ্রিয় শিথিল; মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয়ভাবে সেই সুধাসারে ডুবে যেতে চায়। কিন্তু সর্বাবস্থায় সজাগ আমার সত্ত্বা কারণ অনুসন্ধিৎসু মন তাতেই মগ্ন হতে চাইল না। কোথা হতে এ সুগন্ধ আসছে তা বুঝবার জন্য একবার বৈখানস মুনির তাঁবুর ভিতরটা, একবার সেই উপরের বটগাছের দিকে পুনঃ পুনঃ তাকাতে লাগলাম। গন্ধটা সুপরিচিত, যেন ভাল জাতের বহু গোলপফুল অতি নিকটেই আছে, কিন্তু তার সম্ভাবনা কোথায়? এই পাহাড়ী জায়গায় গোলাপফুল কোথা হতে আসবে। তাঁবুর ভিতর একটা বড় তাম্রকুণ্ডে একটা বড় বানলিঙ্গ। সাধু পূজা করছেন। বিল্বপত্র এবং অনেক বনপুষ্প শিবলিঙ্গের মাথায়। কিন্তু একটা গোলাপফুলও ত দেখছি না। সাধু আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে উঠলেন – আগচ্ছ! আগচ্ছ! অত্র অধিষ্ঠানং কুরু। আমরা সকলেই তাঁকে নমো নারায়ণায় জানিয়ে বসে পড়তেই তিনি বললেন – ওহি পুষ্পসার সৌরভ ইধরসে নেহি, উহ্ আতা হৈ বটবৃক্ষসে। কেঁও কি, উধর কোঈ বখৎ শৈবাচার্য দুর্বাসা মুনি আকার তপ কিয়ে থে। আজ শিবরাত্রি হৈ। ম্যয় শোচতা হুঁ, শিবস্বরূপ মহর্ষি দুর্বাসাজীকা উধর আবির্ভাব হুয়া। এই বলেই তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

আমি হরানন্দজীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললাম – মড়াইয়া বাবার কথা যে সত্য, তা মহাত্মার এক কথাতেই প্রমাণ হয়ে গেল।

প্রায় ২৫ মিনিট পরে ২/৩বার ঝাঁকুনি খেয়ে বৈখানস মুনি ব্যুত্থিত হলেন সমাধি হতে। সমাধি ভঙ্গের পরেই মহানন্দস্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন – আজ এই শিবরাত্রির মত পবিত্র দিনে স্বয়ং শিবের অংশ মহর্ষি দুর্বাসার পুণ্যজীবন অনুধ্যান করেই দিবাভাগ কাটাতে চাই। তাঁর সম্বন্ধে যা জান, তা বলতে থাক। তুমি তোমার মাতৃভাষাতেই বল, আমি বুঝতে পারব।

বৈখানস মুনির আদেশ শিরোধার্য করে মহানন্দস্বামী বলতে লাগলেন – ঋগ্বেদে এবং অথর্ববেদের বহু মন্ত্রের দ্রষ্টা অত্রি ঋষির ঔরষে এবং কর্দম প্রজাপতির কন্যা মহাসতী অনসূয়ার গর্ভে দুর্বাসা ঋষির জন্ম হয়। নর্মদার উত্তরতটে ওঁকার মান্ধাতার নিকটস্থ এক পর্বতে অত্রি এবং অনসূয়া পুত্রলাভ কামনায় যখন তপস্যা করছিলেন, সে সময় একদিন অনসূয়ার সতীত্ব পরীক্ষার জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ব্রাহ্মণ-অতিথি রূপে তাঁর দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হন। ঐ সময়, অত্রি ঋষি ধ্যানমগ্ন ছিলেন। অনসূয়া অতিথি সৎকারের উদ্যোগ করতেই ব্রাহ্মণ বেশধারী ঐ তিন দেবতা তাঁকে জানালেন যে, পুত্ররূপে তাঁদেরকে কোলে নিয়ে ভোজন করাতে হবে, নতুবা তাঁরা আতিথ্য গ্রহণ করবেন না। অনসূয়া ঐ তিন অতিথির গায়ে স্বামীর পাদোদক ছিটিয়ে দিয়ে বললেন – বালো ভব। ঐ তিন দেবতা পাদোদকের প্রভাবে বালকরূপে রূপান্তরিত হয়ে যেতেই অনসূয়া তাঁদেরকে কোলে বসিয়ে খাইয়ে দিলেন। সতীর এই মহিমায় মুগ্ধ হয়ে তিন দেবতাই তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মার অংশে সোম, বিষ্ণুর অংশে দত্তাত্রেয় এবং মহেশ্বরের অংশে দুর্বাসা। দুর্বাসা তপঃপ্রভাবে তেজের আধার ছিলেন বটে তবে অত্যন্ত কোপন স্বভাবের ছিলেন। তাঁর কোপানলে অনেকেই দগ্ধ হন। ঔর্ব মুনির কন্যা কন্দলীকে তিনি বিবাহ করেন। বিবাহের সময় দুর্বাসা প্রতিজ্ঞা করেন যে স্ত্রীর শত অপরাধ তিনি মার্জনা করবেন। তদনুসারে তিনি কন্দলী দেবীর শত অপরাধ মার্জনা করার পর তাঁকে ভস্ম করে ফেলেন।

দুর্বাসার প্রসন্ন আশীর্বাদে অনেকের আবার সিদ্ধিলাভ ঘটেছিল। পাণ্ডব-জননী কুন্তী যখন কুন্তীভোজের গৃহে ছিলেন সে সময় তাঁর সেবায় তুষ্ট হয়ে দুর্বাসা তাঁকে আহ্বান মন্ত্র দান করেন। যার ফলে সূর্য, ধর্ম, পবন, ইন্দ্র প্রভৃতিকে আহ্বান করে কুন্তী কর্ণ, যুধিষ্ঠির,

ভীম ও অর্জুনকে পুত্র রূপে লাভ করতে পেরেছিলেন। একবার দুর্বাসা ভ্রমণ করতে করতে এক অপ্সরার শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে 'সন্তানক' পুষ্পমাল্য লাভ করেন। তিনি ইন্দ্রকে দেখতে পেয়ে 'সন্তানক' মালা দিয়ে আশীর্বাদ করেন। কিন্তু স্বর্গরাজ সেই মালা নিয়ে ঐরাবতের গলায় নিক্ষেপ করে, মদমত্ত হস্তী শুঁড়ে করে তা নিয়ে ছিন্নভিন্ন করে মাটিতে ফেলে দেয়। ক্রুদ্ধ মহর্ষি অভিসম্পাত করেন – 'শীঘ্রই তুই স্বর্গভ্রষ্ট ও শ্রীভ্রষ্ট হবি।' তাঁর শাপে ইন্দ্র যে শ্রীভ্রষ্ট হয়ে চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিলেন, তা মহাভারত ছাড়াও একাধিক পুরাণে লিপিবদ্ধ আছে। স্বয়ং বেদব্যাস মহাভারতের ১২৮তম অধ্যায়ে, যে সকল মুনি সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টিকর্তার তুল্য এবং লোকপাবন রূপে কীর্তিত হন, তাঁদের নামোল্লেখ করতে গিয়ে মহামুনি দুর্বাসারও নামোল্লেখ করেছেন। তদ্‌যথা –

স্রষ্টারঃ সর্বভূতানাং কীর্তিতা লোকপাবনাঃ।
সংবর্তো মেরুসাবর্নো মার্কণ্ডেয়শ্চ ধার্মিক ॥
সাংখ্যযোগৌ কপিলশ্চ দুর্বাশাশ্চ মহানৃষিঃ।
অত্যন্ত তপসো দান্তাস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ॥

– সংবর্ত, মেরুসাবর্ন, মার্কণ্ডেয়, সাংখ্য প্রণেতা কপিল, যোগরচয়িতা পতঞ্জলি, নারদ ও মহর্ষি দুর্বাসা – ইহারা অত্যন্ত তপস্বী, জিতেন্দ্রিয় এবং ত্রিভুবনে বিখ্যাত।

পাণ্ডবদের বনবাস কালে দুর্যোধন দুর্বাসাকে অনুরোধ করেন, ১০ হাজার শিষ্য নিয়ে পাণ্ডবদের অতিথি হতে।

ঋষি দুর্যোধনের দুষ্ট অভিপ্রায় জেনেও পাণ্ডবদের অতিথি হন। সে সময় তাঁদের মধ্যাহ্ন ভোজন হয়ে গেছল। তাঁরা তাঁদের একমাত্র 'শরণং সুহৃদ্' শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন আকুল হয়ে। রন্ধন স্থালীর এককোণে একটা শাকের টুকরো পড়েছিল, তাই খেয়ে পুণ্ডরীকাক্ষ উদ্‌গার তুললেন; তাতেই সশিষ্য দুর্বাসা স্নানের ঘাট হতেই পালিয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তি বলে দুর্বাসার কোপ হতে পাণ্ডবরা সেবারে কোনমতে রক্ষা পান। দুর্যোধন ভেবে চিন্তে বনবাসী দারিদ্র্যক্লিষ্ট পাণ্ডবদের অতিথি হতে বেছে বেছে দুর্বাসাকেই পাঠিয়েছিলেন কারণ তিনি দুর্বাসাকে জানতেন, কোপনস্বভাব ঐ একমাত্র ঋষি যিনি 'তুষ্ট রুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে।' পাণ্ডবরা তুষ্ট করতে না পারলে তাদের সর্বনাশ অনিবার্য।

শ্রীকৃষ্ণ একবার দুর্বাসার স্বরূপ প্রকাশ করতে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন –

স চাপি ব্রাহ্মনো ভূত্বা দুর্বাশা নাম বীর্যবান্।
দ্বারবত্যাং মম গৃহে চিরং কালমুপাবসৎ।

মহাদেবের অপার মহিমার কথা বর্ণনা করতে করতেই শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকটি উচ্চারণ করেছিলেন। কাজেই এখানে 'স চাপি' শব্দটির অর্থ সেই মহাদেবই বা স্বয়ং মহাদেবই দুর্বাসা নামে দ্বারকানগরে আমার গৃহে অতিথি হিসাবে বাস করেছিলেন। কাজেই শ্রীকৃষ্ণও দুর্বাসাকে যে স্বয়ং শিবস্বরূপ জ্ঞান করতেন তা এখানে প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন।

বেদব্যাস মহাভারতের ১৩৭-তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে দুর্বাসার একটি জীবন্ত আলেখ্য ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ পুত্র প্রদ্যুম্নকে বলছিলেন –

অবসন মদ্‌গৃহে তাত! ব্রাহ্মনো হরিপিঙ্গলঃ।
চীরবাসী বিল্বদণ্ডী দীর্ঘশ্মশ্রুঃ কৃশো মহান্ ॥
দীর্ঘেভ্যশ্চ মনুষেভ্যঃ প্রমাণাদধিকে ভুবি।
স্ব স্বৈরং চরতে লোকান্ যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ ॥

– 'বৎস! একবার আমার ঘরে পিঙ্গলবর্ণ, কৌপীনধারী, বিল্ববৃক্ষের দণ্ড ধারণকারী, দীর্ঘশ্মশ্রু, কৃশকায় এবং জগতের দীর্ঘকায় মানুষদের মধ্যে দীর্ঘতম এক ব্রাহ্মণ বাস করেছিলেন। তিনি ইচ্ছানুসারে স্বর্গে এবং মর্ত্যে বিচরণ করতে পারতেন। তিনি পথে প্রান্তরে সভায় একটি গাথা গেয়ে বেড়াতেন – আমি দুর্বাসা। কে আমাকে তার গৃহে স্থান দিতে পারবে?

ইমাং গাথাং গায়মানশ্চত্বরেষু সভাসু চ।
দুর্বাসসং বাসয়েৎ কো ব্রাহ্মণং সৎকৃতং গৃহে ॥

কোন প্রাণী অত্যন্ত অল্প অপরাধ করলেও দুর্বাসা তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে থাকেন। আমার এই প্রকৃতি জেনে কে আমাকে আশ্রয় দিতে ইচ্ছা করে ? কোনমতেই আমার ক্রোধের সঙ্কার করা চলবে না।

তাঁর কঠোর নিয়ম শুনে কেউ তাঁকে স্বগৃহে অতিথিরূপে আবাহন করতে সাহস করল না। আমি তখন স্বগৃহে ডেকে এনে বাস করাতে আগ্রহী হলাম।

ম স্ম ভুঙ্ক্তে সহস্রাণাং বহূনামন্নমেকদা।
একদা সোঽল্পকং ভুঙ্ক্তে ন চৈবৈতি পুনর্গৃহান্ ॥
অকস্মাচ্চ প্রহসতি তথাকস্মাৎ প্ররোদিতি।
ন চাস্য বয়সা তুল্যঃ পৃথিব্যামভবত্তদা ॥

– দুর্বাসা এক কালেই বহু সহস্র লোকের ভোজ্য ভোজন করতে পারতেন এবং কখনও বা অত্যল্প আহার করতেন; ভোজনের পর আচমন করবার জন্য বাইরে গিয়ে আর ফিরে আসতেন না। তিনি বিনা কারণে হাসতেন, বিনা কারণে কাঁদতেন, তৎকালে বয়সে তাঁর তুল্য প্রবীণ কেউ ছিলেন না। তিনি শোওয়ার ঘরে শয্যার আস্তরণ বস্ত্র এবং কন্যাগণের চিত্রপট সকল দগ্ধীভূত করে চলে যেতেন। একদিন তিনি কৃষ্ণের কাছে গরম পায়েস খেতে খেতে সেই অত্যুষ্ণ পায়েস তাঁর সর্বাঙ্গে লেপন করে দিতে বলেন। ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিবশতঃ তাঁর পদতল ছাড়া সর্বাঙ্গে পায়েস লেপে দিলাম। সেখানে রুক্মিনী দাঁড়িয়েছিলেন। সহসা দুর্বাসা সেই গরম পায়েস রুক্মিনীর সর্বাঙ্গে লেপন করে দিয়ে তাঁকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে রথে চড়ালেন এবং বেত্রাঘাত করতে করতে রথ চালিয়ে নিয়ে যেতে হুকুম করলেন। রুক্মিণী যথাসাধ্য রথ চালাতে চালাতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। রুক্মিনীকে ক্লান্ত দেখে আরও জোরে কশাঘাত করতে থাকেন দুর্বাসা। রুক্মিনীর এই দুর্দশা দেখে যদুবংশীয় বীররা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন কিন্তু হাতজোড় করে তাঁদেরকে শান্ত করলাম। ঐ সময় তিনি রথ থেকে নেমে দক্ষিণ দিকে চলে যাবার জন্য দৌড়াতে আরম্ভ করতেই আমি ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে পড়ে মিনতি জানাতে থাকলাম। তখন তিনি তুষ্ট হয়ে বললেন – কৃষ্ণ! তুমি স্বভাবতই ক্রোধ জয় করে ফেলেছ। আমি তোমার কোন অপরাধ দেখতে পাই নি। এইজন্য তোমাকে বর দিচ্ছি – 'যতকাল মানুষের অন্নের আকর্ষণ থাকবে, ততদিন তোমার উপরেও তাদের আকর্ষণ থাকবে।'

ত্রিষু লোকেষু তবেচ্চ বৈশিষ্ট্যং প্রতিপৎস্যসে।
সুপ্রিয়ঃ সর্বলোকস্য ভবিষ্যসি জনার্দন!

– হে জনার্দন তোমার বৈশিষ্ট্য এবং কীর্তি জগতে ঘোষিত হবে। তুমি সমস্ত লোকের অত্যন্ত প্রিয় হবে।

পরে তিনি রুক্মিনীকেও আশীর্বাদ করে বললেন – শোভনে, তুমি নারী সমাজে এমন কি কৃষ্ণের ১৬ হাজার পত্নীর মধ্যে তুমি সর্বোত্তমা হবে।

ন ত্বাং জরা বা রোগো বা বৈবর্ণ্যং চাপি ভাবিনি।
স্প্রক্ষন্তি পুণ্য গন্ধ্যা চ কৃষ্ণমারাধয়িষ্যসি ॥

– সৎস্বভাবে! জরা রোগ বা বিবর্ণতা কখনও তোমাকে স্পর্শ করবে না। তুমি পবিত্র ও সৌরভশালিনী হয়ে কৃষ্ণের সেবা করতে পারবে।

তারপর শ্রীকৃষ্ণকে বললেন যে পদতল বাদ দিয়ে তুমি সর্বাঙ্গে পায়স লেপন করেছ বলে আমি দুঃখিত হয়েছি। পদতল ছাড়া সর্বাঙ্গই তোমার দুর্ভেদ্য হবে। তোমরা এবার ঘরে প্রবেশ করে দেখ যে তোমার যে যে দ্রব্য ছিন্নভিন্ন বা দগ্ধ করেছিলাম, সে সমস্তই সেইরূপই কিংবা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়ে গেছে।

শ্রীকৃষ্ণ প্রদ্যুম্নকে দুর্বাসা-চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন –

'প্রবিষ্টমাত্রশ্চ গৃহে সর্বং পশ্যামি তন্নবম্ ।
যত্তিন্নং যচ্চ বৈ দগ্ধং তেন বিপ্রেন পুত্রক ।'

– আমরা ঘরে প্রবেশ করেই দেখলাম, দুর্বাসা যে সব দ্রব্য বিদীর্ণ বা দগ্ধ করেছিলেন, সে সমস্তই নূতন হয়ে গেছে ।

দুর্বাসার আশীর্বাদে কৃষ্ণের পদতল ছাড়া যে সর্বাঙ্গ সুন্দর শোভন এবং দুর্ভেদ্য হয়েছিল, তার প্রমাণ স্বরূপ আমরা পরে দেখি যে, ব্যাধের বান কৃষ্ণের পদতলে বিদ্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটায় ।

রামায়ণেও দেখি, রামচন্দ্র যখন নির্জনে বসে কালপুরুষের সঙ্গে বাক্যালাপ করছিলেন, তখন দুর্বাসা তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হন । কালপুরুষের কাছে রাম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তাঁদের আলাপকালে কোন তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত হলে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে । দুর্বাসার অভিসম্পাতের ভয়ে লক্ষ্মণ সেই পরামর্শ স্থলে উপস্থিত হয়ে দুর্বাসার আবির্ভাব সংবাদ দিতে বাধ্য হওয়ায় রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বর্জন করেন ।

এই সমস্ত বিবরণ থেকে এইটাই প্রমাণিত হয় যে, মহাতেজা দুর্বাসার ভয়ে মানুষ ত ছার ! দেবতা এমন কি অবতারকল্প মহাবীররাও ভয়ে থরথরি কম্পমান হতেন ।

যতক্ষণ মহানন্দস্বামী দুর্বাসা বিষয়ে আলোচনা করছিলেন, ততক্ষণ বৈখানস মুনি চোখ বন্ধ করে একমনে শুনে যাচ্ছিলেন । মহানন্দস্বামী নীরব হতেই তিনি নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে মহানন্দস্বামীর দিকে মিনিট খানিক তাকিয়ে বলে উঠলেন – তোমার আলোচনা খুবই মনোজ্ঞ হয়েছে । তাঁর মুখে বাংলা শুনে আমরা অবাক হলাম । তিনি মহানন্দস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন – সমগ্র মহাভারত কি তোমার মুখস্থ আছে ? মহানন্দস্বামী উত্তর দিবার আগেই হরানন্দজী বললেন – হ্যাঁ, মুনিজী । সমগ্র মহাভারতের অন্ততঃ তিন চতুর্থাংশ মহানন্দস্বামীভাই-এর কণ্ঠস্থ । কাশীতে মহাভারতের কথক হিসাবে মহানন্দস্বামীভাইএর খুবই নাম । গুরুদেবের চাতুর্মাস্য কালে ইনিই তাঁকে প্রতিদিন মহাভারত পাঠ করে শোনাতেন ।

বৈখানস মুনি বললেন – বহুৎ আচ্ছা ! বহুৎ আচ্ছা ! তবে এতক্ষণ ধরে মহর্ষি দুর্বাসার সম্বন্ধে যে সব কথা পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বলেছ, বলেছ মহাভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে । এতে মহর্ষির অতুলনীয় যোগৈশ্বর্যের কাহিনী ফুটে উঠেছে বটে, কিন্তু এও বহিরঙ্গ । মহর্ষির অন্তরঙ্গ দিক ফুটে ওঠে তাঁর সাধনতত্ত্ব আলোচনা করলে ।

দুর্বাসার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়, তিনি শৈবাগমতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ।

ব্রহ্মযামল গ্রন্থে বহুসংখ্যক শিবজ্ঞান প্রবর্তক ঋষির নামোল্লেখ পাওয়া যায় । তাঁদের মধ্যে উশানা, দধীচি, বৃহস্পতি, সনৎকুমার, নকুলীশ প্রভৃতি ঋষির নাম আছে । আর জয়দ্রথ যামলে মঙ্গলাষ্টক প্রকরণে শৈবাগমতন্ত্র প্রবর্তক বহু ঋষির নাম পাওয়া যায়; তাঁদের মধ্যে দুর্বাসা, সনক, বিষ্ণু, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র, সংবর্ত, গালব, গৌতম, যাজ্ঞবল্ক্য, শাতাতপ, আপস্তম্ব, কাত্যয়ন, ভৃগু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । এঁদের মধ্যে দুর্বাসার নামই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য । শৈবাগমের মূল লক্ষ্য শিবের উপাসনা । শিবতত্ত্ব এবং পরশিবতত্ত্বের বিস্তৃত সাধনপ্রণালীর বর্ণনা আছে মূল শৈবাগমতন্ত্রে আর শৈবাগমের যে অংশটিতে শ্রীবিদ্যা সাধনার সমস্ত প্রক্রিয়ার বর্ণনা আছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে শৈবাগমতন্ত্র । জয়দ্রথ যামলে বর্ণিত যে সব ঋষির নামোল্লেখ করেছি, তাঁদের মধ্যে দুর্বাসার নামই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ! ত্রিপুরসুন্দরী মহিম্ন স্তোত্র টীকাতে নিত্যানন্দনাথ বলেছেন – সকলাগমাচার্যচক্রবর্তী সাক্ষাৎ শিব এব অনসূয়া গর্ভসম্ভূতঃ ক্রোধভট্টারকাখ্যো দুর্বাসা মহামুনিঃ । এছাড়াও ললিতাস্তবরত্ন এবং পরশিবমহিম্ন স্তোত্র অথবা পরশম্ভুস্তুতি প্রভৃতি গ্রন্থে দুর্বাসাকে 'রুদ্রাবতার' বলে বর্ণনা করা হয়েছে ।

এই রকম প্রসিদ্ধি আছে যে, দুর্বাসা শ্রীকৃষ্ণকে চৌষট্টি অদ্বৈতকলা বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করেছিলেন'। সাধক সমাজে এই রকম কিংবদন্তী আছে যে কলিযুগে দুর্বাসাই আগমশাস্ত্রের প্রকাশকর্তা ছিলেন। নেপাল দরবারের গ্রন্থালয়ে সযত্নে সুরক্ষিত মহিম্নস্তোত্রের এক হস্তলিখিত পুঁথিতে লেখা আছে দেখেছি – 'সর্বাসামুপনিষদাং দুর্বাসা জয়তি দেশিকঃ প্রথমতঃ।' আমি নেপাল থেকে কপি করে এনে হোলকার ষ্টেটের লাইব্রেরীতে রেখে দিয়েছি।

মহর্ষি দুর্বাসা শ্রীমাতার উপাসক ছিলেন। শ্রীমাতার দ্বাদশ উপাসকের মধ্যে তাঁরও নাম আছে। শোনা যায়, তাঁর উপাস্য দেবী ছিলেন ষড়ক্ষরী বিদ্যা।

মিনিট খানিক চুপ করে থেকে তিনি বললেন – সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে, শিবরাত্রির পূজানুষ্ঠানে বসতে হবে, তোমাদেরকেও মহাদেবের পূজা করতে হবে। সুযোগ থাকলে ষড়ক্ষরী বিদ্যার আলোচনা করতাম। এখন তোমরা নিজেদের তাঁবুতে ফিরে গিয়ে সকালে প্রাপ্ত শিবলিঙ্গের উপাসনা কর। একজন শিষ্যের দিকে তাকিয়ে বললেন – 'ইন্ লোগোঁকো দুঠো বড়া মোমবাতিয়া দে দো। পঞ্চামৃতকা ভি ইন্তেজাম কর দিজিয়ে জী।'

আমরা 'নমো নারায়ণায়' জানিয়ে উঠে এলাম। রঞ্জন তার টর্চ টিপে টিপে তাঁবুতে নিয়ে এল। একটু পরেই সেই সন্ন্যাসীটি জ্বালবার জন্য দুটো বড় মোমবাতি, প্রচুর বিল্বপত্র এবং একটা বড় তাম্রকুণ্ডে কতকটা পঞ্চামৃত দিয়ে গেলেন। মোমবাতি জ্বেলে আমরা পূজায় বসবার উদ্যোগ করতে থাকলাম। আমাদের কাছে পূজার বাসন ইত্যাদি নাই। তাই আমি বললাম – এই পঞ্চামৃত ভরা তাম্রকুণ্ডেই আটটি শিব বসিয়ে দিয়ে আপনারা পূজা করুন, শিবপূজার যথোচিত বিধান আমার চেয়েও আপনারা ভাল জানেন। আমি আদিতে একটি বিল্বপত্র নিবেদন করে মহর্ষি তণ্ডি কর্তৃক মর্ত্যলোকে সর্বপ্রথম অবতারিত যে অষ্টোত্তর সহস্র শিবনাম তা আমি পাঠ করতে থাকব। পাঠের শেষে আর একটি বিল্বপত্র শিবের মাথায় দিয়ে প্রণাম করব। আমি এইভাবেই শিবপূজা করে থাকি। তাঁরা দয়া করে আমার প্রস্তাব মেনে নিলেন। তাঁরা আচমনাদি করে শিবপূজায় বসে গেলেন। আমি ঝোলা থেকে মহাত্মা প্রলয়দাসজী প্রদত্ত হস্তলিখিত পুঁথিটি বের করে মোমবাতির কাছে বসে মনে মনে পাঠ করতে লাগলাম। রাত্রি ১১টায় আমার পাঠ শেষ হল। প্রথমেই একটি বিল্বপত্র শিবের মাথায় দিয়েছিলাম, পাঠের শেষেও একটি বিল্বপত্র দিয়ে প্রণাম করলাম সাষ্টাঙ্গে। কিছুক্ষণ আগেই আমার সাথীদেরও পূজা শেষ হয়ে গেছে, তাঁরাও প্রণাম করে বসে আছেন। মহানন্দস্বামী আমাকে বললেন, 'মহর্ষি তণ্ডিকৃত যে স্তব এইমাত্র আপনি পাঠ করলেন, ঐটি ত সাধারণ স্তব নয়, স্তবরাজ। মহাভারতে অনুশাসন পর্বের ষোড়শ অধ্যায়ে ঐ স্তব যেখানে আরম্ভ হয়েছে, তার ঠিক পূর্বে আছে, মহর্ষি উপমন্যু শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন –

তেজসামপি যত্তেজস্তপসামপি যত্তপঃ।
শান্তানামপি যঃ শান্তো দ্যুতিনামপি যা দ্যুতিঃ॥
দান্তানামপি যঃ দান্তো ধীমতামপি যা চ ধীঃ।
দেবানামপি যো দেব ঋষিনামপি যস্ত্বৃষিঃ॥
যজ্ঞানামপি যো যজ্ঞঃ শিবানামপি যঃ শিবঃ।
রুদ্রানামপি যো রুদ্রঃ প্রভা প্রভবতামপি॥
যোগিনামপি যো যোগী কারণানাঞ্চ কারণাম্।
যতো লোকাঃ সম্ভবন্তি ন ভবন্তি যতঃ পুনঃ॥
সর্বভূতাত্মভূতস্য হরস্যাতিতেজসঃ।
অষ্টোত্তর সহস্রন্তু নাম্নাং সর্বস্য মে শনু।
যচ্ছুত্বা মনুজব্যাঘ্র! সর্বান্ কামানবাপ্স্যসি॥

অর্থাৎ যিনি তেজেরও তেজ, যিনি তপস্যারও তপস্যা, যিনি শান্তদের মধ্যে প্রধান শান্ত, যিনি প্রভা সকলেরও প্রভা, যিনি দান্তদের মধ্যে প্রধান দান্ত, যিনি জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, যিনি দেবতাদেরও দেবতা, যিনি ঋষিগণেরও ঋষি, যিনি যজ্ঞসমূহেরও যজ্ঞ, যিনি মঙ্গলকারীদেরও মঙ্গলকারী, যিনি রুদ্রগণেরও রুদ্র, যিনি প্রভাবশালীদেরও প্রভাব, যিনি যোগিগণের মধ্যে প্রধান যোগী, যিনি কারণেরও কারণ এবং যাঁ হতে লোকসকলও উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই লয় পায়। সর্বভূতের আত্মা, সংহারকর্তা এবং অমিততেজা সেই মহাদেবের অষ্টোত্তর সহস্রনাম তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর, মনুষ্যশ্রেষ্ঠ। তুমি যা শুনে অভীষ্ট লাভ করতে পারবে।

মহাভারতে পড়েছি, মহর্ষি উপমন্যুর কাছে দীক্ষালাভের পর ঐ স্তবরাজের সহায়তায় কঠোর শিবসাধনা করেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

মহানন্দস্বামীর কথা শেষ হতেই আমরা সবাই শুয়ে পড়লাম। বৈখানস মুনির তাঁবুতে রাত্রি সাড়ে সাতটা থেকে যে শঙ্খঘণ্টা ডম্বরু ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল, তা এখনও সমানে বেজে চলেছে। বুঝলাম, বৈখানস মুনির দুটো তাঁবুতেই খুব ঘটার সঙ্গে শিবপূজা হচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল সকাল সাতটায়। তাঁবুর পর্দা সরিয়ে দেখি এখানে নর্মদার উভয়তটের মধ্যে ব্যবধান খুব কম বলে সাদা বাষ্পে ঢাকা উভয়তটের পাহাড়শ্রেণীকে একটা সুদীর্ঘ একই পাহাড়ের শ্রেণী বলে মনে হচ্ছে। হরানন্দজীকে দেখলাম, কিছুক্ষণ কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে থেকে বিছানাপত্র গুটিয়ে গাঁঠরী বাঁধতে থাকলেন। আমাদেরকেও বললেন – তোমরা সবাই সব গুছিয়ে নাও হে। ভাল করে রোদ উঠলেই সাধুর তাম্রকুণ্ড এবং মোমবাতি দুটো ফেরৎ দিয়েই আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব। আমি বললাম – কী হল! আজকের দিনটাও এখানে থেকে বৈখানস মুনির কাছে শৈবাগম তত্ত্ব বা শ্রীবিদ্যা সাধনের ষড়ঙ্গীর বিদ্যা সম্বন্ধে আরও কিছু জেনে শুনে নিলে হত না?

– তা তোমার ইচ্ছা হলে থেকে যেতে পার। আমি আর এখানে সময় কাটাতে রাজী নই। নর্মদা মাথায় থাকুন, শূলপাণির ঝাড়িতে এই একটানা পাহাড় জঙ্গলে হাঁটতে হাঁটতে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।

হরানন্দজীর দৃঢ় মনোভাব দেখে আর তাঁকে ঘাঁটাতে সাহস হল না। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে যে যার ঝোলা গাঁঠরী বেঁধে ফেলে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বৈখানস মুনির তাঁবুর দিকে যেতে যেতেই আমাদের পূর্ব পরিচিত সন্ন্যাসীকে দেখতে পেলাম। তাঁর হাতে তাম্রকুণ্ড এবং দগ্ধাবশিষ্ট মোমবাতি দুটি দিয়ে হরানন্দজী বললেন – আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি। সাধুজীকে একবার প্রণাম করে যেতে চাই। সেই সন্ন্যাসী বললেন – আভি উনকা সাথ ভেট করনা বহোৎ মুস্কিলকা বাত হ্যায়। রাতভোর শিবপূজা করনে কা বাদ, ক্যা মালুম উনোনে আভি নিদ্ যাতা হৈ ইয়া সমাধিমেঁ হৈ। হরানন্দজী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন – ঠিক হ্যায়, উনকো নিবেদন কর দেনা, হমলোগ যাতা হুঁ। আপকো ভেইয়া বহোৎ বহোৎ সুক্রিয়া।

আমরা সাধুজীর ১ নম্বর তাঁবুর কাছে গিয়ে পাহাড়ের উপরে মহর্ষি দুর্বাসার তপঃস্থলী বলে কথিত সেই বিশাল বটবৃক্ষের দিকে তাকিয়ে সকলেই হাতজোড় করে নমস্কার করলাম। তারপর ধীরে ধীরে নেমে গেলাম নর্মদার ঘাটে। ঘাটে নেমে পাহাড়ের খোরে খোরে অতি সাবধানে লাঠির উপর ভর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। এখানে পাহাড় এমনভাবে নর্মদার ধার পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে এবং নর্মদার প্রবাহ যুগ যুগ ধরে সেই সব পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে পাহাড়কে ক্ষয়িয়ে দিয়েছে যে, আমরা যে পাহাড়ের কোলে কোলে হাঁটছি, কোন কোন জায়গায় পাহাড় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মাথার উপর দিয়ে এমনভাবে ঝুলে পড়েছে যে, তার ঝুলে পড়া অংশ যদি ধ্বসে যায় তাহলে পাথর চাপা পড়ে আমাদের জীবন্ত

কবর হয়ে যাবে। কিন্তু তবুও সেই পথ দিয়ে বাধ্য হয়ে হাঁটতে হচ্ছে কারণ পাহাড়ের উপর এমনই দুর্ভেদ্য এবং দুর্গম ঘন জঙ্গল যে, পাহাড়ে উঠে সেই জঙ্গলে হাঁটতে আমাদের সাহস হল না। এইভাবে পাহাড়ের খোরে খোরে আধমাইলটাক হেঁটে শেষ পর্যন্ত নর্মদার চট্টানের উপর দিয়ে হাঁটতে সুরু করলাম। জল কোথাও ৪ ইঞ্চি বা ৬ ইঞ্চি, কোথাও বা তাও নাই। প্রায় দু মাইল আড়াই মাইল হাঁটার পর দেখলাম, সামনে নর্মদার প্রবাহ অনেক বেড়ে গেছে। জলও গভীর ; সেখানে নর্মদার গতিপথ মোটেই সংকীর্ণ নয়। আমরা বাধ্য হয়ে পাহাড়ের উপরে উঠে এলাম। পাহাড়ের চট্টানের উপর হাঁটতে হাঁটতে নর্মদার বুকের উপর চট্টানে অগুনতি শিবলিঙ্গ পড়ে আছে দেখে প্রত্যেকেই দু চারটা করে কুড়িয়ে নিলাম। দুর্গম জঙ্গলে মিনিট কুড়ি চড়াই এর পথে উঠে এসে ভাল রাস্তা পেলাম। পাহাড়টা ছোট, প্রায় শ ছয়েক ফুট হবে, শাল কেঁদ মহুয়া, ভূর্জগাছের মধ্যে মাঝে মাঝেই আছে কাঁটা কুলের ঝোপ। অনেক কষ্টে লাঠি দিয়ে সেগুলো সরিয়ে দেখি চমৎকার একটি মালভূমি, সেখানেও বড় বড় বনস্পতি। তবে সে পথে হাঁটতে আমাদের বিশেষ কোন কষ্ট হল না। অপেক্ষাকৃত ভাল রাস্তা পেয়ে ছোট বড় পাথর ডিঙিয়ে যেতে যেতে হরানন্দজী বললেন – হিরণফাল পেরিয়ে আসতে আসতে মহর্ষি দুর্বাসার তপস্থলী হিসাবে বর্ণিত সেই বিশাল বটবৃক্ষটিকে দেখে আমার আজ আদিগুরু মহাযোগী অতিবৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দ দেবের কথা স্মরণে আসছে। আমি তাঁর কথা প্রথম শুনি, আমাদের কামরূপ মঠেরই পূজনীয় মণীষ্যানন্দ তীর্থ নামক একজন পূর্বতন আচার্যের মুখ থেকে। মোক্ষপুরী কাশীধামের পথে ঘাটে স্মরণাতীত কাল পূর্ব হতেই আচার্য শংকরের অনুবর্তী দণ্ডী সন্ন্যাসীরা হর হর বম্ বম্ শব্দ মুখে নিয়ে আজও ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মণীষ্যানন্দ ছিলেন, তাঁর আমলের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত। অদ্বৈত বেদান্তের সবচেয়ে বড় আচার্য। তিনি বলেছিলেন, 'এদেশের পশ্চিমা হিন্দুস্থানীদের মনে 'মছলিখোর' বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে একটা অবজ্ঞার ভাব আছে। এদেশীয় অনেক স্মার্ত পণ্ডিত গৌড়দেশে গেলে প্রায়শ্চিত্য করতে হয়, এ বিধানও দিয়ে গেছেন, কিন্তু যেখানে 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র মত মহাগ্রন্থ রচয়িতা অদ্বিতীয় অদ্বৈতবাদী মহাজ্ঞানী মধুসূদন সরস্বতী, শৈবাগমতন্ত্রের মহাসাধক অতিবৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দ দেব বাঙালী শরীর ধারণ করে জন্মেছিলেন, অতীশ দীপঙ্করের মত মহাজ্ঞানী জন্মেছিলেন, আজও যেখানে সমগ্র পৃথিবী প্রসিদ্ধ সর্বশাস্ত্রদর্শী মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের মত বাঙালী পণ্ডিত সমগ্র ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে মুকুটমণি স্বরূপ রূপে বিবেচিত হন, সেখানে বাংলাদেশ বা বাঙালী কোনমতেই অবজ্ঞার পাত্র নয়।'

শ্রোতাদের মধ্যে একজন আদিগুরু ব্রহ্মানন্দ দেবের পরিচয় জানতে চাইলে মণীষ্যানন্দজী বলেন – "প্রায় উনিশ শত বৎসর পূর্বে গঙ্গাসাগর সঙ্গমের নিকটে ক্ষুদ্রকায় কাকদ্বীপে আদিগুরু মহাযোগী অতিবৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দ দেব বাস করতেন। তাঁর আশ্রমের নাম ছিল 'আনন্দমঠ'। সেই আনন্দমঠে এক বিশাল বটবৃক্ষমূলে এক বিশাল প্রস্তর খণ্ডের উপর তিনি বসে থাকতেন। তাঁর কোন কুটীরও ছিল না। গ্রীষ্মের দাবানল বা শীতের প্রকোপও তিনি গ্রাহ্য করতেন না। সেই মহাযোগী দীর্ঘকাল নর্মদাতটের হিরণফালে এসে তপস্যা করেছিলেন। দীর্ঘকাল তপস্যা করার পর তিনি নিজ মাতৃভূমি ঐ কাকদ্বীপে ফিরে যান। সাগর-সঙ্গমে যাঁরা যান, তাঁরা যেমন কপিলমুনির আশ্রমে গিয়ে প্রণাম করতেন, তেমনি ঐ ব্রহ্মানন্দ দেবের শিলাতলেও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে আসতেন।

একবার স্বয়ং শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদ প্রচার করতে করতে বাংলাদেশে পৌছে কাকদ্বীপে গিয়ে আদিগুরু ব্রহ্মানন্দ দেবের নিকট বিচার প্রার্থনা করে বসেন। তিনি বলেন – 'মহাত্মন! আমি দক্ষিণদেশ জয় করে রামেশ্বর ক্ষেত্রে শৃঙ্গেরী মঠ প্রতিষ্ঠা করেছি যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৬৪৮ সালে। ঐ মঠের মহাবাক্য – 'তত্ত্বমসি।'

পশ্চিম প্রদেশ জয় করে যুধিষ্ঠিরাব্দ* ২৬৫০ সালে সারদা মঠ প্রতিষ্ঠা করেছি। ঐ মঠের মহাবাক্য -- 'অহং ব্রহ্মাস্মি'।

আর্যাবর্তের উত্তর প্রদেশে অদ্বৈতমতের বিচারে জয়লাভ করে বদরিকার মুক্তিক্ষেত্রে যোশী মঠ বা জ্যোর্তিমঠ প্রতিষ্ঠা করেছি ২৬৫২ সালে। ঐ মঠের মহাবাক্য – 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। এখন আপনাকে বিচারে পরাভূত করে বঙ্গদেশে অদ্বৈতমতের চতুর্থ মঠ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আপনার সঙ্গে বিচার প্রার্থনা করি।

আচার্য শংকরের কথা শুনে মহাযোগী বলেন -- বৎস! তাহলে তুমি স্পষ্ট করে বল তোমার বিচার্য বিষয় বেদান্তের অদ্বৈতবাদ!

আচার্য – হ্যাঁ, পূর্বেই স্পষ্ট করে বলেছি; আমার বিচার্য বিষয় অদ্বৈতবাদ।

মহাযোগী – বৎস! তোমার যথার্থ অদ্বৈতজ্ঞান জন্মাতে এখনও বহু বিলম্ব।

শংকর – আপনি কি করে তা জানছেন, তা খুলে বলুন।

মহাযোগী – বৎস! প্রকৃত অদ্বৈতবাদ বুঝলে, অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে, তুমি তোমার এবং আমার মধ্যে কোন প্রভেদ দেখতে পেতে না, তুমি এবং আমি যে দুটি স্বতন্ত্র জীব এ বোধ এখনও তোমার যায় নি। তাই তুমি আমাকে বিচারযুদ্ধে আহ্বান করতে পারছ। তোমার দ্বৈতজ্ঞান এখনও তিরোহিত হয় নি বলেই তুমি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তোমা হতে স্বতন্ত্রজ্ঞানে বিচারে আহ্বান করছ। যখন তোমার এই দ্বৈতভাব চলে যাবে তখন তোমাতে আমাতে সর্বভূতে কোন পার্থক্য দেখতে পাবে না, দেখবে চারদিকে তখন এক অখণ্ড ব্রহ্ম, জগৎময় অদ্বৈত ব্রহ্মলীলা। আমি-বোধ গেলেই তুমি-বোধ আসে, আমিত্ব ঘুচে গেলেই তুমি আসে। তুমি ছাড়া আমি নাই, আমি ছাড়া তুমি নাই –

তুঁ তুঁ করতা তুঁহি রহা
মুঝমে তুহিনা হুঁ।
বলিহারি তেরে রূপ কি
যিৎ দেখুঁ তিৎ তুঁ॥

অর্থাৎ তুমি তুমি করতে করতে আমি তুমিময় হয়ে গেছি, তুমি ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমার মধ্যে। তুমি ছাড়া আর কোথাও কিছু খুঁজেও পাচ্ছি না। আমার আমিত্ব লুপ্ত হওয়ায় আমি তোমার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়েছি। প্রভু, তোমার রূপের বলিহারি যাই, যে দিকেই দৃষ্টি পড়ে, দেখি সেখানেই তুমি – তুমি ছাড়া জগতে আর কিছু নাই।

মহাযোগীর কথার মর্ম উপলব্ধি করে শঙ্করাচার্য অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি মহাযোগীর পদধূলি নিয়ে বলে উঠেন – বাংলাদেশে পৃথক কোন মঠ স্থাপনের কোন উপযোগীতা দেখছি না, আপনার আনন্দমঠের কীর্তি চারদিকে ঘোষিত হোক।

এই বলে শংকরাচার্য কাকদ্বীপ ত্যাগ করে পূর্বদিকে পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ ধামে সমুদ্রতীরে তাঁর চতুর্থ মঠ গোবর্দ্ধন মঠ স্থাপন করেন।"

অতিবৃদ্ধ মহাযোগীর আনন্দমঠই ছিল শৈবাগমতন্ত্রের পীঠস্থান। আমরা পাহাড় থেকে নামার একটা পথের নিশানা পেয়ে উৎরাইএর পথে নর্মদার তীরে এসে পৌছলাম। এখানে আর নর্মদার প্রবাহ সংকীর্ণ নয়, নাগগতিও নয়। নর্মদা পরিপূর্ণ জলসম্ভার নিয়ে প্রবল গতিতে বয়ে চলেছেন পূর্বদিকে। প্রায় কুড়ি পঁচিশ মিনিট হেঁটে আমরা একস্থানে গিয়ে দেখলাম, বহু স্ত্রীপুরুষের ভীড়। একজনকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল – মায়ীকি ইয়ে দক্ষিণতটমেঁ বীজাসেন তীর্থ হৈ। রুদ্রাণী বীজাসেনী ইধর বহুৎ তপ কিয়ে থে। জেনানা আদমী যিস্‌কো গর্ভনাশ হো জাতা হৈ, ইধর তপ জপ দান করনেসে গর্ভকা নাশ নেহি

* যুধিষ্ঠিরাব্দের ২৫০১ সালে খৃষ্টাব্দে আরম্ভ।

হোতা। বীজাসেন তীর্থ সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জানতে পারলাম, তাতেই আমাদের আর ভীড়ের মধ্যে ঢুকতে ইচ্ছা হল না। বেলা ১০টা বেজে গেছে। আমি বললাম, নর্মদা মায়ের এই তীর্থ গর্ভিনী নারীদের জন্য। মন্দির বলতে ত কিছু নাই, একটা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে, তবুও এত নারীপুরুষের ভীড় দেখে মনে হচ্ছে ভক্তরা হয়ত এখানে প্রত্যক্ষ ফললাভ করে। আমাদের এখানে অপেক্ষা করার কি প্রয়োজন? এগিয়ে গেলেই ত হয়? কিন্তু আমার কথা শেষ হতে না হতেই হরানন্দজী ত্রিদিবানন্দকে সঙ্গে নিয়েই দ্রুতপদে গিয়ে ঢুকে গেলেন ভীড়ের মধ্যে। প্রায় মিনিট দশেক পরেই ফিরে এলেন হাসতে হাসতে। এসেই নিজেদের ঝোলা গাঁঠরী তুলে নিয়ে হাঁটতে থাকলেন পাহাড়ী জঙ্গলের দিকে। আমরা তাঁদেরকে অনুসরণ করলাম। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে হাঁটতে হাঁটতেই হরানন্দজী বলতে লাগলেন – আমি ভালভাবেই জানি হে, যে আমাদের মধ্যে কেউ গর্ভিনী নাই, কারও গর্ভিনী নারীর সংস্পর্শে আসারও সম্ভাবনা নাই! বলেই হাসতে হাসতে হোঁচট খেলেন, তাঁর গাঁঠরী ছিটকে গিয়ে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে। জ্যোতির্ময়ানন্দ বহুকষ্টে গাঁঠরীটি কুড়িয়ে আনলেন। গাঁঠরীটি হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলতে লাগলেন হরানন্দজী – পুরোহিতজীর কাছে জেনে এলাম পাহাড়ের এই ঢাল দিয়ে তিন মাইল হেঁটে গেলেই আমরা নর্মদার তটেই ভৌতি নামে একটা গ্রাম পাবো। সেখানে গোয়দ বা গৌরবার্তা নামক একটা পাহাড়ী নদীর সঙ্গম হয়েছে নর্মদার সঙ্গে। সেই সংগমস্থলের নিকটেই অনঙ্গেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। মায়ের কুঠার আছে। 'মায়ের কুঠার' বলতে মায়ের কুড়ুল নয়। বড়বাণীর রাজার তরফ হতে পরিক্রমাবাসীদের জন্য সদাবর্ত আছে। সেখানে গিয়ে আমরা কিছু না কিছু খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করতে পারব। সঙ্গে ত কোন খাবারই নাই। হিরণফালে পৌঁছে আমাদের শেষ সম্বল ছাতুও নিঃশেষ হয়ে গেছে। বীজাসেন তীর্থের উৎপত্তি সম্বন্ধেও interesting কাহিনী শুনে এলাম। বশিষ্ঠ সংহিতাতে নাকি আছে, আমরাও সবাই জানি, রাবণ মহাদেবের পরমভক্ত ছিলেন, তিনি একবার একাদশ রুদ্রানীর খুব ভক্তি সহকারে পূজা করেন, রুদ্রানীরা তাঁর পূজায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিতে চাইলে রাবণ এক অদ্ভুত বর প্রার্থনা করে বসেন – আমাকে এমন এক কন্যা দান কর যে লঙ্কায় প্রতিটি নারীর গর্ভ নষ্ট করে দিতে পারে। রুদ্রানীরা সেই বরই তাঁকে দেয়। ফলে বীজাসেন নামের এক রুদ্রানী কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে লঙ্কার প্রতিটি গর্ভিনীর গর্ভ নষ্ট করে দিতে থাকে। এই শুনে আমার মনে হচ্ছে, রাবণের সহস্র পত্নী ছিল, তাঁর এক লক্ষ পুত্র এবং সওয়া লক্ষ নাতিও জন্মে গেছল। তাই তিতিবিরক্ত হয়ে রাবণের মাথায় পরিবার নিয়ন্ত্রণ বা family planning এর মতলব জেগেছিল। বীজাসেন রুদ্রানী রূপে জন্মে প্রতিটি গর্ভ নাশ করে দিতে থাকেন। ফলে লঙ্কাতে নবজাতকের জন্ম বন্ধ হয়ে যায়। রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ বধের পর মহাদেব বীজাসেন রুদ্রানীকে ডেকে নিয়ে বলেন, বশিষ্ঠ সংহিতার ভাষায় – মহাদেবজীনে বীজাসেনীকো ইহাঁ নর্মদাতটমে বুলা কর আজ্ঞা দী, তুম্ ইহাঁ রহকর তপস্যা করো। ঔর গর্ভনাশকা পরিবর্তে জেনানাকো গর্ভ রক্ষা কিয়া করো।

সেইজন্য পাহাড়তলীর বাসিন্দারা মেয়েদের গর্ভসঞ্চার হলেই বীজাসেন তীর্থে পূজা করতে ভীড় জমায়। তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই মাদল টিনের ক্যানেস্তার প্রভৃতি বাজাতে বাজাতে প্রায় জনা ত্রিশেক পাহাড়ী হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে ছুটে আসছে তীর ধনুক কাটা প্রভৃতি হাতে নিয়ে। আমরা ভয় পেয়ে কয়েকটা শালগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তারা আমাদেরকে দেখতে পেয়েই জিজ্ঞাসা করতে লাগল, ইধর আপনে কোঈ শের দেখা? জানতে পারলাম, তাদের দুটো 'বখরী' কে টেনে নিয়ে গেছে বাঘে ১৫/২০ মিনিট আগে। আমরা তাদেরকে ঘাড় নেড়ে না বলতেই তারা পূর্ববৎ হৈ রৈ করতে করতে

ছুটতে লাগল সামনের দিকে। আমরা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়েই কিছুটা এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলাম সামনেই পাহাড়ের উপর থেকেই একটা জলের ধারা নেমে আসছে। অনুমান করলাম, এইটাই বুঝি সেই গোয়েদ বা গৌরবার্তা নদীর ধারা, যেটা নিচে নেমে নর্মদার সঙ্গে মিশেছে। আর একদল পাহাড়ীকেও তীর ধনুক লাঠি সোটা হাতে নিয়ে জল পেরিয়ে আসতে দেখলাম। আমরাও জলে নেমে পেরোতে লাগলাম। জলের ধারা বড় জোর কুড়ি ফুট চওড়া, আমরা ছোটবড় নুড়ি পাথর পেরিয়ে কোনমতে দাঁড়িয়ে পাহাড়ীদের পেরিয়ে যাওয়া দেখছি, এমনসময় তাদের দলের শেষ লোকটি সবে মাত্র পেরিয়ে ও পাশের ঢালে পা দিবে, তখনও তার এক পা জলে এবং এক পা একটা baulder এর উপর, এমন সময় বিদ্যুৎগতিতে কোথা থেকে যে একটা বাঘ এসে ঝাঁপিয়ে পড়েই টেনে নিয়ে গেল বনের মধ্যে, তা দেখে সকলেই আমরা একে অপরের উপর জড়াজড়ি করে পড়ে গেলাম। আবার নূতন করে আর্তনাদ চিৎকার হট্টগোল সুরু হয়ে গেল। তখন আমাদের হাত পা এমনভাবে থরথর করে কাঁপছে যে, একে অপরের উপর ভর দিয়েও উঠে দাঁড়াতে পারছি না। কোনমতে একটুখানি সামলে নিয়ে পাহাড়ের ঢালে নামতে লাগলাম। নিচে নেমে দেখলাম সেই জলের ধারা এসে নর্মদাতে মিশেছে। সঙ্গমের কাছ হতেই আর একটি পাহাড় উপরের দিকে উঠে গেছে। পাহাড়টি ঘন জঙ্গলে ঢাকা। পাহাড়ের ঢালে বহু কুটীর দেখলাম। এই পাহাড়ের গা ঘেঁষে একটি বড় শিবমন্দির। এই মন্দিরেই অনঙ্গেশ্বর মহাদেব বিরাজমান। বহু প্রাচীন শিবমন্দির। মন্দিরে কোন দরজা নাই। প্রায় তিনফুট উঁচু শিবলিঙ্গ, নাম অনঙ্গেশ্বর কিন্তু তাঁর অঙ্গকান্তিতে কোন লাবণ্য দেখলাম না। ধূসর বর্ণের শিবলিঙ্গ কিন্তু ললাটে অর্ধচন্দ্রটি বড় উজ্জ্বল। আমরা প্রণাম করে গৌরবার্তা নদী এবং নর্মদার সঙ্গমস্থলে স্নানরত একজন বয়স্ক লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, সে মুখে কোন উত্তর না দিয়ে ঘাট থেকে উঠে এসে পাহাড়ের ঢালে একটি একতলাবিশিষ্ট পাথরের বাড়ী অঙ্গুলি সংকেতে দেখিয়ে দিল। পাহাড়ের ঢালে সেই বাড়ী, শাল এবং চালতা গাছে ঢাকা পড়েছে। আমরা প্রায় শতখানিক ফুট উপরে উঠে এসেই সেই বাড়ীর কাছে দাঁড়ালাম। বাড়ীটির গায়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম সেখানে বড় বড় অক্ষরে দেবনাগরীতে লেখা আছে 'মায়ীকি কুঠার', বড়বাণীকা রাজা বাহাদুর। হরানন্দজী বললেন – চোখের সামনে একটা জলজ্যান্ত মানুষকে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই বাঘ ঝাপটা মেরে নিয়ে গেল, সেই দৃশ্য দেখে এখনও আমার বুকের কাঁপুনি থামে নি। যা চাইবার তোমরা চেয়ে নাও। এই বলে তিনি বসে পড়লেন পাথরেরই উপরে। ত্রিদিবানন্দ এবং মহানন্দস্বামী এগিয়ে গিয়ে হর নর্মদে ধ্বনি দিয়ে দাঁড়ালেন মায়ীকি কুঠারের দরজার সামনে। সেখানে ঘরের ভিতর ৪জন লোক, ঘরের বাইরেও জনা ছয়, তার মধ্যে খাকি জামা এবং লাল হাফপ্যান্ট পরা একজন লোকের হাতে একটা বন্দুকও আছে দেখলাম। সেই বোধহয়, এখানকার পাহারাদার। ঘরের ভিতর থেকে একজন লোক জিজ্ঞাসা করলেন – স্বামীজী! কেয়া পায়েঙ্গে ? বাজরাকা আটা ইয়া ছাতু ? ত্রিদিবানন্দ উত্তর দিলেন – 'ছাতু'। লোকটি ত্রিদিবানন্দের ঝোলায় সের তিনেক ছাতু ঢেলে দিলেন। রঞ্জন ঐ সময় মহানন্দস্বামীকে বলল – বেলা ১২টা বেজে গেছে। এখানে রাত কাটাবার কোথাও কোন জায়গা মিলবে কিনা জিজ্ঞাসা করুন না। মহানন্দস্বামী একজন বয়স্ক লোককে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলে উঠল – হমারা অনঙ্গেশ্বর মহাদেবজীকা মন্দিরকা পাশমেই এক কোঠি থা। উহ্ আভি গির গিয়া। বড়বাণীকা রাজা আভি আচ্ছিতরেসে দেখভাল নাহি করতা হৈ। নেহি ত আপলোগো নেঁ ইধরই ঠার সকতে থে। লেকিন্ আভি ত ঠারনেকো জ্যাগা নেহি হৈ। ইধর সে সিরফ দো মীল এহি ঢালমে সিধা চল জানেসে আপকো মেঘনাদ তীর্থ মিলেগী। ওহি মন্দরমেঁ আপকো জ্যাগা জরুর মিলেগা। আপলোগোনেঁ হমারা অনঙ্গেশ্বর

ভগবানজীকো দর্শন কিয়ে ত ? বাবা বড়া জাগ্রত হৈ। উনকা বারেমেঁ রেবাখণ্ডকী ৪০ অধ্যায় মেঁ বিস্তৃত বর্ণনা হ্যায়। বাবা অনঙ্গেশ্বরকী মহিমাসে ভক্তকো মনোভিলাষ ভী পূর্ণ হোতা হৈ। ইসলিয়ে ভৌতি ঘাটকো মনোরথ তীর্থ ভি কহা জাতা হৈ।

ঔর আগাড়ী দো মীল বাদ যো তীর্থ মেঁ আপলোগ পৌছেগো, উস্ তীর্থকা নাম মেঘনাদ তীর্থ কৈসে হুয়া ওভী শুন লিজিয়ে। ইস্ সম্বন্ধী কী রেবাখণ্ডমেঁ ৫৬ অধ্যায় মেঁ কথা হৈ। ত্রিভুবনজয়ী পরম শৈব রাক্ষসরাজ রাবণ ঔর মন্দোদরীজীকা পুত্র মেঘনাদ হ্যায়। পিতাকী সদৃশ য়হভী শিবভক্ত থে। উনোনে বিন্ধ্যপর্বত পর ঘোর শিবসাধনা কী। আশুতোষ ভোলে বাবা দর্শন দে কর্ বর মাগনে কো কহা – মেঘনাদ নে য়হী বর মাঁগা – 'মৈঁ আপকো সেবা মে হী সংলগ্ন রহুঁ।' ইস সে প্রসন্ন হোকর শিবজী উসী পূজা কে নিমিত্ত আপনো দো শিবলিঙ্গ দিয়ে। মেঘনাদ উন্‌হে লিয়ে হুয়ে আকাশমার্গসে প্রসন্নতা পূর্বক লঙ্কাপুরীকো জা রহা থা। যব বিন্ধ্যপর্বতসে নর্মদাজীকো পার করনে লগা, তব উসকা হাতসে এক শিবলিঙ্গ ছুট কর নর্মদাজীকে ধারামেঁ গির পড়া। ইসে নর্মদাজীকী কৃপাহি সমঝকর উসনে উসী স্থান পর শিবলিঙ্গকী স্থাপনা কী। তভী সে ইস নামসে মেঘনাদ তীর্থস্থান বিখ্যাত হুয়া। উহাঁ ভী শ্রাদ্ধ, তর্পণ, ব্রহ্মভোজ কা অন্যস্থানো সে সাতগুনা মাহাত্ম্য বতায়া গয়া হৈ।'

ভদ্রলোককে দেখে মনে হল, বকবক করতে, বেশী কথা বলতে ভালবাসেন। আরও হয়ত কিছু বলতেন, কিন্তু চার পাঁচ বছরের একটি বাচ্চা ঐ সময় 'দাদি দাদি' বলতে বলতে এসে জড়িয়ে ধরতেই তিনি 'পোতা হৈ' বলেই তাকে কোলে নিয়ে 'মায়ীকী কুঠার' এর পেছনে শশব্যস্তে চলে গেলেন। তাঁর চলার পথ অনুসরণ করে আমরা দেখতে পেলাম, সদাবর্তের পিছনেই তিনটি বিল্ববৃক্ষের তলায় ৩টি খাপরেলের কুটীর। সেখানেই অনঙ্গেশ্বরের পূজারী সপরিবারে বাস করেন।

পুরোহিতের নাতিই আমাদেরকে রক্ষা করল। আমরা নর্মদা এবং মহাদেবকে প্রণাম করে সেই পাহাড়ের ঢাল দিয়েই হাঁটতে লাগলাম। নর্মদা গর্ভ হতে প্রায় ৬০০ ফুট উপরে এই পাহাড়ের ঢাল দিয়েই মনে হয় পাহাড়ী লোকেরা এই পথেই চলাচল করে। কেননা, পথ কঙ্করময় হলেও রাস্তার ধারে ধারে কাঁটাঝোপগুলো কেটে পরিস্কার করা হয়েছে। তাই হাঁটতে বিশেষ কষ্ট হচ্ছে না। আমরা হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে হাঁটতে লাগলাম। ডানদিকে চেয়ে দেখি পাহাড়ের ঢালে পাহাড়ের তলদেশ পর্যন্ত অজস্র পাহাড়ী লোকের বাস। বাঁদিকে পাহাড়ের উপর দিকে ঘন জঙ্গল, বড় বড় বনস্পতি গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে উপর দিকে উঠে গেছে। হরানন্দজী মন্তব্য করলেন, পাহাড়ের উপর দিকে তাকালে মনে ভয় হয় বটে কিন্তু ডানদিকে নিচের দিকে তাকালে বস্তির লোকজনের মুখ দেখে আশ্বস্ত হই। পাহাড়ের গায়ে যেদিকটায় পাহাড়ীদের বাস সেদিকটায় তাদের কুটীরের কাছাকাছি যত বড় বড় গাছ সব কেটে সাফ করে ফেলেছে তারা। অনেক গরু মহিষ এবং ছাগলকেও চরতে দেখলাম। হরানন্দজী বললেন – গতকাল শুধু কন্দমূল আর কলা খেয়ে দিন কেটেছে। তাই ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছি, তোমরাও সবাই নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত। গল্প করতে করতে পথ হাঁটলে অত ক্লান্তি লাগবে না। শৈলেন্দ্রনারায়ণকে অনুরোধ করছি অনঙ্গেশ্বর মহাদেব ত দেখে এলাম। অনঙ্গদেব সম্বন্ধে কিছু কথা শোনাও, আমি বললাম, আমি নিজে শুধু এইটুকু জানি যে, তিনি আজকালকার আর পাঁচটা ফক্কড় বা চ্যাংড়া ছোকররা মত ধ্যানমগ্ন ধূর্জটিকে, তাঁর কাছেই পার্বতীকে দেখতে পেয়ে কামচঞ্চল করবার জন্য কামবান নিক্ষেপ করেন, তাতেই ক্রুদ্ধ হয়ে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে মহাদেব তাঁকে পুড়ে ছাই করে ফেলেন। অঙ্গহীন হয়েছিলেন, তাই কামদেব অনঙ্গদেব নামে প্রসিদ্ধ হন। এর বেশী কিছু আমার জানা নাই।

কামদেব বলতে বুঝি, সর্বজীবের যৌনক্ষুধা এবং কামভাবের দেবতা তিনি। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যৌনচেতনা উদ্রিক্ত করাই তাঁর একমাত্র কাজ। তবে অথর্ববেদে দেখেছি, সেখানে কাম অর্থে যৌনকাঙ্খা নয় – সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলাকাঙ্খা। কাম সেখানে শ্রেষ্ঠ দেবতা বা স্রষ্টারূপে পূজিত হয়েছেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে কাম ধর্ম ও শ্রদ্ধার পুত্র হিসাবে বর্ণিত। এর বেশী আমি কিছু জানি না। এ বিষয়ে পুরাণ বিশারদ ত্রিদিবানন্দ বা মহানন্দস্বামী বললেই ভাল হয়। ত্রিদিবানন্দ তখন বলতে আরম্ভ করলেন – ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে, সতী দেহত্যাগ করে হিমালয়ের কন্যা পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করে মহাদেবকে স্বামীরূপে লাভ করার জন্য হিমালয়ে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হন। সে সময় মহাদেবও হিমালয়ে তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। পার্বতী সে কথা কোনভাবে জানতে পেরে প্রতিদিনই মহাদেবের পূজা করতে থাকেন। ইন্দ্র তা অবগত হয়ে কামদেবকে সেখানে গিয়ে মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করতে বলেন। বিল্ববৃক্ষ মূলে ধ্যানমগ্ন মহাদেবের উপর কামদেব তাঁর পুষ্পশর নিক্ষেপ করে বসেন। ক্রুদ্ধ মহাদেবের ললাটস্থ তৃতীয় নেত্রের অগ্নিতে কামদেব সঙ্গে সঙ্গে ভস্মীভূত হয়ে অনঙ্গদেবে পরিণত হয়ে যান। কামদেবের পত্নীর নাম রতি। স্ত্রীপুরুষ যৌন উন্মাদনায় মত্ত হয়ে যখন উভয় মিলিত হয়ে উভয়ে সঙ্গমকালে বা সঙ্গমের পূর্বমুহূর্তে পরস্পর যে রতিক্রীড়া করে থাকেন, তারই প্রতীক রতিদেবী। কামদেব ভস্মীভূত হয়ে গেলে রতিদেবী স্বামীর শোকে বিহ্বল হয়ে মহাদেবের পায়ে পড়ে কাঁদতে থাকেন। তাঁর কান্নায় অভিভূত হয়ে আশুতোষ অনঙ্গ কামদেবকে কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন রূপে জন্মগ্রহণ করতে বলেন। পরের জন্মে বিদ্যাধরদের পিতারূপে, তার পরের জন্মে দেবত্ব লাভ করে কামদেবে পরিণত হবেন।

ব্রহ্মবৈবর্তে কামদেবের দেহের যে বর্ণনা দিয়েছে, তাতে দেখা যায়, তাঁর আকৃতি পরম রূপ ও লাবণ্যে মণ্ডিত। কামদেবের নাসিকা সুচারু, উরু দুটি ও জঙ্ঘা সুবৃত্ত; বক্ষ সুবিশাল, চোখ মুখ পদতল নখ আরক্তবর্ণ, কুঞ্চিত কেশদাম। গায়ে সর্বদা বকুলের সৌরভ। মকর তাঁর বাহন, ইনি পুষ্পময় পঞ্চশর এবং কুসুমকার্মুকে শোভিত। স্বয়ং ব্রহ্মা এবং মুনিদের চিত্ত মথিত করতে পেরেছিলেন, বলে এঁর নাম হয় মন্মথ। এ জগতের সমস্ত লোককে ইনি কামভাবে উত্তেজিত ও উন্মত্ত করতে পারেন বলে ইনি 'মদন' নামেও অভিহিত। মহাদেবের দর্পচূর্ণ করতে পেরেছিলেন বলে এঁর অপর নাম 'কন্দর্প'। এঁকে বলা হয় 'অভিরূপ' অর্থাৎ সুন্দর। এর অপর নাম 'কলকেলী', কারণ তিনি উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক এবং শৃঙ্গার যোনি। এঁর রথের পতাকা মকর চিহ্নিত বলে এঁকে মকরকেতু বা মকরকেতনও বলা হয়। এঁর শ্রী হস্তে সর্বদাই মধু নামক পুষ্প থাকে বলে এঁকে মধুস্মিত বা পুষ্পকেতনও বলা হয়ে থাকে। এছাড়াও কামদেবের আরও কতকগুলি নাম আছে যথা – আজ, ইধম্‌, কঞ্জন, কিঙ্কিন, মদ, রম, রমন, স্মর, মনোজ, দর্পক, দীপক, মার এবং মধুদীপ।

ত্রিদিবানন্দের অনঙ্গদেব প্রসঙ্গ শেষ হয়েছে এমন সময় দূর থেকেই দেখতে পেলাম যে রাস্তা দিয়ে আমরা হাঁটছি, সেই রাস্তার উপরেই একদল স্ত্রীপুরুষ মণ্ডলাকারে দাঁড়িয়ে আছে, বাঁশী বাজছে, ডুগডুগি বাজছে। বেলা তখন রঞ্জন জানালো দেড়টা। মনের মধ্যে চিন্তা হল, কি হচ্ছে এখানে ? অন্য কোন পথও নেই যে, আমরা তাদেরকে এড়িয়ে যাই। দুতিন মিনিট সেখানে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, হরানন্দজী এগিয়ে গিয়ে আগে দেখে আসুন, তারপর আমরা এগুবো। মা নর্মদার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে হরানন্দজী এগিয়ে গেলেন। আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। আমরা দেখতে পাচ্ছি, হরানন্দজী গিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেলেন। ঢুকে গেলেন ত গেলেন, আর তাঁর দেখা নাই। প্রায় ১০ মিনিট কেটে যাওয়ার পর আমরা ভীষণ চঞ্চল হয়ে পড়লাম। বিদেশ বিভূঁই, পাহাড়ী

দেশ, এদের রীতিনীতি আমাদের জানা নাই, যে কোন বিদেশী লোককে মেরে ফেলতে এদের হাত কাঁপে না ! এই রকম সাতপাঁচ ভেবে আমরা আর স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারলাম না, আমরাও সেদিকে হাঁটতে লাগলাম । কয়েক কদম এগিয়েছি, এমন সময় দেখলাম হরানন্দজী ভীড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে হাসিমুখে হাত নেড়ে আমাদেরকে ডাকছেন । তাঁর হাসিমুখ দেখে আমাদের বুক থেকে যেন গুরুভার পাষাণ নেমে গেল । আমরা কঙ্করময় পথে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব, সেইভাবে ছোট বড় পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে এগিয়ে গেলাম । গিয়ে দেখলাম শতাধিক পাহাড়ী স্ত্রীপুরুষ তিন সারিতে সারিবদ্ধ ভাবে মণ্ডলাকারে দাঁড়িয়ে আছে । ভীড় ঠেলে হরানন্দজী আমাদেরকে দ্বিতীয় সারিতে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালেন । গিয়ে যা দেখলাম তাতে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম । সাদা বাংলায় বলতে গেলে বলতে হয় আমাদের 'চক্ষু চড়ক গাছ বা আক্কেল গুড়ুম' হয়ে গেল । একদল পাহাড়ী মেয়ে পায়ে ঘুঙুর, গলায় লাল ফুলের মালা, খোঁপায় জবাফুল গুঁজে নাচছে । তাদের নাচের তালে তালে কয়েকজন যুবক ডুগডুগি বাজাচ্ছে, বাঁশী বাজাচ্ছে । নৃত্যরতা মেয়েদের সামনে আছে ৪জন বয়স্ক ওঝা । তারা দুর্বোধ্য পাহাড়ী ভাষায় মন্ত্রপাঠ করে যাচ্ছে । ওঝাদের সামনেই দুটো সাড়ে তিন ফুট চার ফুট লম্বা সাপ ফণা বিস্তার করে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে লক্‌লকে জিহ্বা বের করে একটা মোটা তেঁতুলগাছের দুধার থেকে মাঝে মাঝেই বেরিয়ে এসে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েই কামড়া-কামড়ি করে, আবার তেঁতুল গাছের দুদিকে সরে যাচ্ছে । যখন সাপদুটো কামড়া-কামড়ি করছে, তখন ওঝারা টুকরো টুকরো নেকড়া ছুঁড়ে দিচ্ছে সাপদুটোর ফণার উপর এই মন্ত্র পড়তে পড়তে – ওম বোম্‌ বর্ণ্যা বাউরী ডামরা ডামরীর পায় ছেদভেদ বায় ছায় ভাং জাং হ্লুং স্বাহা ।

হরানন্দজী আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস্‌ করে বললেন – কালো কুচকুচে সাপটা জাত খরিস্‌, তেঁতুলের মত রং যেটার ওটার নাম তেঁতুল্যা খরিস্‌ । দুটোই সাক্ষাৎ মৃত্যু । কিছুক্ষণ সাপ দুটো পরস্পরের ফণা দিয়ে পরস্পরকে দংশন করে তেঁতুল গাছটার দুদিকে সরে যাচ্ছে । তখন ওঝাগুলো মন্ত্রপাঠ করতে থাকে – ওম্‌ বুং বুং ভুং ভুং বুং ফট্‌ ।

দুতিন মিনিট সমস্বরে একই মন্ত্র পাঠ করে ৪জন ওঝাই চারটে ডমরু বাজাতে থাকল, বাঁশী ও ডুগডুগিও বাজতে থাকল মেয়েদের নাচের তালে তালে । মিনিট দুই পরেই দেখা গেল, তেঁতুল গাছটার দুদিক থেকেই দুটো সাপই ফোঁস ফোঁস শব্দে আবার ফণা বিস্তার করে এগিয়ে আসতে লাগল পরস্পরের দিকে challenge এর ভঙ্গীতে । ওঝারা হাত দুলিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে আবাহনের ভঙ্গীতে মন্ত্রপাঠ করতে থাকল –

সহবল্লীং বল্লীং করবল্লীং কাম পিশাচীং ডামরা ডামরীং কামং গ্রাহয় গ্রাহয় ।

ডামরী-ডামরাং আনয় আনয় বন্ধয় বন্ধয় শিরিং (শ্রীং ?) ফট্‌ ।

নমঃ শিবায়ৈ নমঃ শিবান্যৈ ডামরা ডামরীং, ডামরী ডামরাং বশং আনয় ফট্‌ ।

এই বলে চারজন ওঝাই মুঠো মুঠো সিঁন্দুর ছুঁড়ে দিতে লাগল দূর থেকে সাপ দুটোর গায়ে ।

নমঃ কামদেবায় সহদশফলং সহদশং সহমমং সহেলী মে বশং আনয় আনয় হ্লুং ফট্‌ । এই বলে হাতজোড় করে চারজন ওঝাই সাপ দুটোকে নমস্কার করে একটা জ্বলন্ত নেকড়া ছুঁড়ে দিল সাপ দুটোর কাছে । আগুনে দেখে সাপদুটো তীব্র বেগে ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ শব্দে উঠে গেল পাহাড়ের উপর দিকে । জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল ।

এর পরেই হুড়োহুড়ি পড়ে গেল সমবেত পাহাড়ী স্ত্রীপুরুষদের মধ্যে । কাড়াকাড়ি পড়ে গেল শতচ্ছিন্ন নেকড়ার এক টুকরো বা সিঁন্দুর একটুখানি কুড়াবার জন্য । আমরা আর সে দৃশ্য দেখবার জন্য দাঁড়ালাম না । আমরা ভীড় থেকে বেরিয়ে আমাদের [illegible]

লাগলাম সেই সোজা ঢালের পথে। কিছুটা আসার পরেই আমরা নর্মদাকে দেখতে পেলাম, পাহাড়ের ঢাল থেকে নর্মদার ধারে নেমে যাবার পথও পেলাম। আমরা সকলেই এবড়ো - খেবড়ো পাথরে ভর্তি পথ বলে পথের দিকে তাকিয়ে লাঠি ঠুকে ঠুকে হাঁটছিলাম যে যার নিজেকে সামলে সামলে। উৎরাই এর মুখে নামবার সময় দাঁড়িয়ে দেখি হরানন্দজী বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়েছেন। আমরা পিছন ফিরে দেখলাম, তিনি একজন বৃদ্ধ পাহাড়ী লোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে আসছেন। মহানন্দস্বামী বললেন, এই মাত্র আমরা পাহাড়ীদের যে সব দুর্বোধ্য মাথামুণ্ডুহীন আজগুবি মন্ত্রপাঠ এবং ক্রিয়াকলাপ দেখে এলাম, ঐ সব অভিচার বিদ্যা ডাকিনী তন্ত্রের অন্তর্গত বলে মনে হচ্ছে। হরানন্দজী লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের কাছে পৌছে বললেন – এই লোকটির কাছে জানলাম, নিচে নর্মদার ধারে যে বিশাল শিবমন্দিরটি দেখা যাচ্ছে, ঐটাই মেঘনাদ তীর্থ। মন্দিরের কাছাকাছি মহল্লাতেই লোকটির বাস। এরা ভীল বা ওয়াক্কি নয় – বাঞ্জারা। এর কাছেই জানতে পেরেছি ঐ মন্দিরের একটা হলঘরে বা মণ্ডপ গৃহে আমাদের থাকার স্থান সংকুলান হয়ে যাবে। আমরা যেখানে পথের মধ্যে পাহাড়ী লোকদের ক্রিয়াকলাপ এবং বিষধর দুটো ভয়ংকর কাল নাগের নৃত্য দৃশ্য দেখে এলাম, সেই ভীড়ের মধ্যে এই লোকটিও তার মহল্লায় ফেরার পথে আমাদের মতই আটকে পড়েছিল। এর কাছে জানতে পারলাম, যে দৃশ্য আমরা দেখে এলাম ঐটা স্থানীয় পাহাড়ীদের এক রকমের অভিচার ক্রিয়া। ওরা বিশ্বাস করে সাপের গা বা মাথা থেকে যে তাদের নিক্ষিপ্ত সিঁদূর ঝরে পড়ছিল, তা কপালে পরে স্ত্রীপুরুষ তাদের বাঞ্ছিত পুরুষ বা নারীকে বশে আনতে পারে। আর সর্পদৃষ্ট বা সর্পস্পৃষ্ট নেকড়ার ছিন্ন অংশ গায়ে মাথায় বুলিয়ে দিলে যে কোন কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধি হতেও আরোগ্য লাভ করা যায়। তাই সিঁদূর এবং নেকড়ার টুকরো কুড়াবার জন্য ওদের মধ্যে অত কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। কথা বলতে বলতেই আমরা মেঘনাদ প্রতিষ্ঠিত সেই সুপ্রাচীন শিবমন্দিরে এসে পৌছে গেলাম। নর্মদার বিস্তার এখানে বেশ প্রশস্ত, তবে তা দ্বিধা বিভক্ত। মন্দির থেকে কিছুদূর উজান পথে নর্মদা গর্ভেই একটা ছোটখাট পাহাড় বা পাহাড়ের টিলা উঁচু হয়ে আছে দেখতে পেলাম। সেই টিলার জন্য নর্মদার একই ধারা দুই ভাগে ভাগ হয়ে বয়ে যাচ্ছে। আমরা প্রথমেই মন্দিরের দরজা খুলে মহাদেবের উদ্দেশ্যে সকলেই প্রণাম করলাম। প্রথমেই মণ্ডপ গৃহ, বেশ সুপ্রশস্ত। মণ্ডপ গৃহ পেরিয়েই উঁচু বেদীর উপরেই স্বয়ং মহাদেব প্রদত্ত মেঘনাদ কর্তৃক আকাশপথে বাহিত শিবলিঙ্গ সমাসীন। তখন বেলা আড়াইটা বেজে গেছে, আমরা মন্দিরের বারান্দায় ঝোলা গাঁঠরী রেখে নর্মদাতে নামলাম স্নান করতে। হরানন্দজী বাঞ্জারা লোকটিকে অনুরোধ করলেন, তার মহল্লা কাছেই যখন আরও কিছুক্ষণ থেকে যেতে। আমরা স্নান তর্পণাদি সেরে কমণ্ডলু ভরা জল নিয়ে শিবলিঙ্গের মাথায় ঢেলে প্রণাম করলাম। প্রণাম করে বেরিয়ে এসেই হরানন্দজী মাখিয়ে সবাইকে এক গৌড়া দু গৌড়া করে দিলেন। সেই লোকটির হাতেও ছাতুর বড় গৌড়া দিয়ে তাকেও খেতে অনুরোধ করলেন। লোকটি সসঙ্কোচে অত্যন্ত নম্রভাবে ছাতু খেয়ে নর্মদাতে নেমে আকণ্ঠ জলপান করে এল। আমাদের আহার পর্ব শেষ হতে ৪টা বাজল। লোকটি আমাদেরকে দণ্ডবৎ জানিয়ে চলে গেল। পাহাড়ের মাথার উপর সূর্যাস্তের ছায়া পড়েছে। রঞ্জন তার ঝোলা থেকে টর্চ বের করে জ্বাললো। আমরা মণ্ডপ গৃহে ঢুকে যে যার বিছানা পেতে নিলাম। দুটো বড় মোমবাতিও জ্বাললাম। মন্দিরের দরজাটা ভালভাবে পরীক্ষা করে হরানন্দজী মন্তব্য করলেন – এই মন্দির এত প্রাচীন কিন্তু দরজাকে অত প্রাচীন বলে মনে হচ্ছে না। মনে হয়, পুরাতন দরজা জীর্ণ হয়ে পড়ে যেতেই নূতন কাঠ দিয়ে এই দরজা ইদানীং কালে তৈরী করা হয়েছে। পিছনেই খিল দিবার ব্যবস্থা আছে দেখে মনে হয়, এখানে বোধহয় পরিক্রমাবাসী এসে আশ্রয় নেন।

তাই এখানকার মন্দিরের কর্তৃপক্ষ হয়ত নিরাপত্তার কথা ভেবে এই ব্যবস্থা করেছেন। কাছেই ত পাহাড় এবং জঙ্গল। তাই এই ব্যবস্থা দেখে আমার খুবই আনন্দ হচ্ছে। দরজায় খিল তুলে দিয়ে তিনি বিছানায় এসে বসলেন। আমরা সবাই সান্ধ্যক্রিয়াতে বসলাম। কিন্তু আজ সারাদিন পাহাড়ে হেঁটে হেঁটে সবাই ভীষণ ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। কোনও মতে মিনিট দশেক বসেই হরানন্দজী বললেন – নিয়মরক্ষার জন্য নিয়মরক্ষা করতে বসলাম কিন্তু কিছুতেই জপে মন বসছে না। রাবণের পুত্র মেঘনাদ, এক রাক্ষস প্রতিষ্ঠিত এই শিবমন্দির বলে এখানে তপজপ দুঃসাধ্য বলেই মনে হচ্ছে ; আমি উঠলাম। বহু প্রাচীন মন্দির বলে ঘরের মধ্যে একটা ভ্যাপসা গন্ধ উঠছে। আমি একটা ধূপ জ্বালি। তাঁর কথায় সকলেরই মন বিক্ষিপ্ত হল। আমরা একে একে সবাই উঠে পড়ে মহাদেবকে প্রণাম করে যে যার বিছানায় বসলাম। ধূপ জ্বেলে এসে বসতেই আমি হরানন্দজীকে বেশ ঝাঁঝালো কণ্ঠেই বললাম, রাক্ষস পূজিত এবং রাক্ষস প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির বলে আপনার জপে মন বসছে না, এ আপনার কিরকম কথা ? আপনি ত দেখছি পরিক্রমাবাসী সন্ন্যাসী হয়েও শিবভূমিতে এসেও ধর্মীয় গোঁড়ামী এবং বিকৃত মানসিকতার শিকার হয়ে পড়েছেন। দেব দানব দৈত্য গন্ধর্ব মানুষ সর্বযোনির সর্বশ্রেণীর ভগবৎ সৃষ্ট প্রাণী মাত্রেরই ইষ্ট এবং উপাস্য হলেন মহাদেব। ভক্তের জাতি বিচারে ভগবানের জাতি বিচার হয় না। ভগবানের মন্দিরে বসে তাঁর ভক্তের প্রতি কটাক্ষ করলে ভগবান রুষ্ট হন। আমাদের দেশে ধর্মীয় গোঁড়ামির বিষ এত বেশী যে তার ফলেই এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মের লোককে অশ্রদ্ধা করতে শিখেছে। একশ্রেণীর লোকের উপাস্য দেবতাকে অন্য শ্রেণীর অন্য দেবতার উপাসকরা ভেদ ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে শিখে অধঃপাতে যেতে বসেছে। শিবভক্তরা কৃষ্ণভক্তকে দেখতে পারে না, রামভক্তরা শিবভক্তকে বা কালীভক্তকে সহ্য করতে পারে না। ভক্ত তাঁর ভগবানকে যত ইচ্ছা উপাসনা করুন, যে যত ইচ্ছা আপন প্রিয় দেবতার মহিমা বর্ণনা করুন তাতে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়, কিন্তু নিজের দেবতাকে বড় করতে হবে, অপর দেবতাকে ছোট করে দেখাতে হবে, এ কি রকম কথা ? আপনি অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী; অদ্বৈত পথের পথিক হয়ে আপনার মধ্যে এত ভেদজ্ঞান কেন ? এই পাহাড়ী পথে হাঁটতে হাঁটতে আপনি হাঁপিয়ে উঠেছেন, আপনি কি করে পারবেন দুরারোহ ও দুর্গম ঐ বিন্ধ্যপর্বতের গুহায় বসে ইন্দ্রজিতের মত শীত গ্রীষ্ম বর্ষার বিড়ম্বনা এবং প্রকৃতির সব রকম দৌরাত্ম্য সহ্য করেও একাগ্রচিত্তে শিবচিন্তায় বিভোর হয়ে যেতে ? আপনি কি শিবদর্শন করেছেন ? ইন্দ্রজিৎ কিন্তু শিবের দর্শন পেয়েছিলেন। এখন আমরা যাঁর মন্দির এসে বসে আছি, ঐ শিবলিঙ্গ কিন্তু স্বয়ং শিব নিজ হাতে দিয়েছিলেন ইন্দ্রজিৎকে। কতখানি অনন্য ভক্তি এবং তপস্যার শক্তি থাকলে তবে শিবের প্রত্যক্ষ-প্রসাদ লাভ সম্ভব হয় ? মেঘনাদকে রাক্ষস বলে আপনি ভ্রূকুঞ্চিত করছেন। কিন্তু তিনি কি রকম রাক্ষস ? স্বয়ং ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য ঋষির পৌত্র ত্রিভুবন জয়ী মহাবীর রাবণের পুত্র মেঘনাদ, ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির প্রপৌত্র ইন্দ্রজিৎ নিজেও একজন শ্রেষ্ঠ তপস্বী, এই মন্দির এবং মন্দিরের দেবতাই তার প্রমাণ। আপনি নিশ্চয়ই সজ্ঞানে এ সব কথা চিন্তা করে বলেন নি। রাবণ যেহেতু রামচন্দ্রের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন এজন্য বাল্মীকি কৃত্তিবাস তুলসীদাস প্রভৃতি রামভক্তগণ তাঁদের স্বরচিত গ্রন্থে রামের শত্রু রাবণের বিকৃত চরিত্র অঙ্কন করে নিজেদের ইষ্টভক্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। আপনি সেইসব গ্রন্থ বাল্যকাল থেকে পড়ে শুনে রাবণ ও রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে পাপিষ্ঠ ও দুরাত্মা বলে ভাবতে শিখে এসেছেন।

সমগ্র আর্যাবর্তে রামচন্দ্রের ভগবৎতুল্য মর্যাদা। রামচন্দ্রকে আর্যাবর্তে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই 'পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ বলে ভেবে থাকেন। আবার দক্ষিণাত্যে গিয়ে দেখুন সেখানে দ্রাবিড়রা রামচন্দ্রকে ঘৃণা করেন। সমগ্র আর্যাবত জুড়ে সর্বত্র যেমন দুর্গাপূজার পর বিজয়া

দশমীর দিনে ঘটা করে রাবণের মূর্তি তৈরী করে সেটাকে দগ্ধ করে, দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড়রা তেমনি রাবণের পূজা করে রামচন্দ্রের মূর্তিকে সোল্লাসে অগ্নিদগ্ধ করে তার প্রতিশোধ নেয়। এই দুই-ই হল ধর্মীয় গোঁড়ামীর বিষময় ফল। এতে কিন্তু রাম রাবণের স্ব স্ব মহিমা কোনমতেই ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না।

ধর্মীয় কুসংস্কার এবং গোঁড়ামীর ফলে ভক্তদের চিত্তবৃত্তি সংকীর্ণ হয়। স্বাধীন চিন্তা ও বিচারশক্তি ভক্তদের থাকে না। তাই কুলদ্রোহী দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক ঘরভেদী বিভীষণকেও রামভক্তরা ভক্তবীর বলে পূজা করে সম্মান করে অথচ মাতৃপিতৃভক্ত মহাশৈব মহাবীর ইন্দ্রজিতকে তারা ঘৃণা করে। বাংলাদেশের স্বাধীন চিন্তার অন্যতম অগ্রদূত মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত অমরকাব্য মেঘনাদ বধ কাব্য কি আপনি পড়েছেন ? মাইকেল সাধারণ রামভক্তদের মত নিজের বিবেকবুদ্ধি এবং স্বাধীন বিচারশক্তি গোঁড়ামির পদতলে যেহেতু mortgage দিয়ে বসেন নি সেইজন্য তিনি ঐ কাব্যে ইন্দ্রজিতের শৌর্যবীর্য পরাক্রম তপস্যা এবং সৌজন্যবোধের এক সুন্দর জীবন্ত আলেখ্য ফুটিয়ে তুলেছেন। ঘরভেদী বিভীষণ যখন নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করার জন্য গুপ্তপথ দিয়ে সশস্ত্র লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রজিতের পূজাগৃহে সংগোপনে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁরা গিয়ে কি দেখলেন ? মাইকেল মহাসাধক ইন্দ্রজিতের কেমন রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন দেখুন। তাঁরা গিয়ে দেখলেন –

"কুশাসনে ইন্দ্রজিৎ পূজে ইষ্টদেবে
নিভৃতে ; কৌষিক বস্ত্র কৌষিক উত্তরী,
চন্দনের ফোঁটা ভালে, পুষ্পমালা গলে
পুড়ে ধূপদানে ধূপ; জ্বলিছে চৌদিকে
পূত ঘৃতরূপে দীপ; পুষ্প রাশি রাশি,
গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষাকোষী ভরা
হে জাহ্নবি, তব জলে কলুষনাশিনী
তুমি ! পাশে হেম ঘণ্টা, উপহার নানা
হেমপাত্রে; রুদ্ধদ্বার; বসেছে একাকী
রথীন্দ্র, নিমগ্নতপে চন্দ্রচূড় যেন –
যোগীন্দ্র – কৈলাস গিরি, তব উচ্চচূড়ে" !

মহাকবি অঙ্কিত ইন্দ্রজিতের এই রূপ কোন মহাসাধকের না রাক্ষসের ? আমার কথা শুনে হরানন্দজী মহানন্দস্বামীকে বললেন – আপনি দয়া করে মেঘনাদের বিষয় বলতে থাকুন। তাঁর চর্চাতেই রাত যদি কেটে যায় যাক্। ভক্তের চরিত্র ব্যাখ্যানে ভগবান তুষ্ট হবেন।

মহানন্দস্বামী আরম্ভ করলেন – সুবর্ণলঙ্কার অধিপতি রক্ষসরাজ রাবণের প্রধানা মহিষী মন্দোদরীর গর্ভে ইন্দ্রজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। জন্মকালে তিনি, মেঘগর্জনের মত গম্ভীর শব্দে ক্রন্দন করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয় – মেঘনাদ। মহামায়ার পূজা করে তিনি মায়াবল লাভ করেন। ইনি অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, রাজসূয়, গোমেধ, বৈষ্ণব প্রভৃতি সপ্তযজ্ঞ সম্পন্ন করে দুঃসাধ্য মহেশ্বর যাগ নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন বলে স্বয়ং পশুপতি এঁকে দর্শন দেন এবং তাঁর বরে মেঘনাদ কামচারী, আকাশগামী স্যন্দন, তামসী, মায়াশক্তি অক্ষয় তূনীর নানারকম শত্রুনাশক অস্ত্রশস্ত্র সকল লাভ করেন। দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেন। দিগ্বিজয় করার উদ্দেশ্যে রাবণ মর্ত্যলোকের সমস্ত শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গকে পরাজিত করে স্বর্গ আক্রমণ করেন সেই সময় মেঘনাদ ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তকে পরাজিত করেন এবং মহাদেবের বরে মায়া প্রভাবে অদৃশ্য থেকে ইন্দ্রকে মায়াতে আচ্ছন্ন শরজালে অবসন্ন ও বন্দী করে লঙ্কাতে নিয়ে যান।

দেবতারা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে ইন্দ্রের মুক্তি ভিক্ষা করতে আসেন। ব্রহ্মা মেঘনাদকে ইন্দ্রজিত আখ্যা দেন। ইন্দ্রের মুক্তির বিনিময়ে ইন্দ্রজিৎ অমরত্ব প্রার্থনা করে বসেন। ব্রহ্মা অমরত্ব দিতে অস্বীকার করে অন্য বর প্রার্থনা করতে বলায়, ইন্দ্রজিৎ প্রার্থনা করেন – 'আমি যখন যথাবিধি বৈদিক নিয়মে অগ্নির পূজা করে যুদ্ধ যাত্রা করব, তখন আমার জন্য অগ্নি থেকে অশ্ব সমেত রথ উত্থিত হওয়া চাই এবং সেই রথে যতক্ষণ অবস্থান করব ততক্ষণ আমি যেন অমর হই। ইন্দ্রের মুক্তির বিনিময়ে ব্রহ্মা সেই বরই দিতে বাধ্য হন। তবে এই শর্ত আরোপ করেন যে পূজার জপ ও হোম অসমাপ্ত রেখে যুদ্ধযাত্রা করলেই তিনি বধ্য হবেন।

রামচন্দ্র সীতা উদ্ধার কল্পে বানর সৈন্যের সাহায্যে যখন লঙ্কায় প্রবেশ করেন, তখন ইন্দ্রজিৎ প্রথমেই রাবণজয়ী বানর রাজ বালীর পুত্র অঙ্গদের কাছে পরাস্ত হন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে রাম লক্ষণকে নাগপাশে আবদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত গরুড়ের কৃপায় তাঁরা উভয়েই মুক্তিলাভ করেন। তারপর কুম্ভকর্ণ, অতিকায় ত্রিশিরা প্রভৃতি রাবণের প্রধান সেনাপতিরা যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলে, ইন্দ্রজিৎ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে রাম লক্ষণকে অর্ধমৃত এবং অচৈতন্য করে ফেলেন। কিন্তু হনুমান গন্ধমাদন পর্বত হতে বিশল্যকরণী এনে রাম লক্ষণকে সঞ্জীবিত করে তুলেন। মেঘনাদ মায়াবলে মায়া সীতা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রদর্শন করে কৌশলে রামচন্দ্রকে নিরুদ্যম এবং হতাশ করে ফেলার চেষ্টা করেন। কিন্তু রামচন্দ্র তাঁর এই চাতুরী বুঝতে পারায় মেঘনাদের কৌশল ব্যর্থ হয়। তখন ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে অজেয় হওয়ার জন্য নিকুম্ভিলা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে যুদ্ধে যাবার সংকল্প করেন কিন্তু তাঁর আপন খুল্লতাত গৃহশত্রু ঘরভেদী বিভীষণ ব্রহ্মার বরের কথা জানতেন বলে গুপ্তপথে লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে যজ্ঞস্থলেই ইন্দ্রজিৎকে আক্রমণ করিয়েছিলেন। লক্ষ্মণ এই হীন উপায়ে যজ্ঞরত অবস্থায় অত্যন্ত অন্যায়ভাবে ইন্দ্রজিৎকে আক্রমণ করে নিহত করেন।

মহানন্দস্বামীর মেঘনাদ সম্বন্ধে যখন কথা শেষ হল তখন রাত্রি ১১টা বেজে গেছে। হরানন্দজী বললেন – মেঘনাদ প্রতিষ্ঠিত এই শিবমন্দির সম্বন্ধে তখন যে মন্তব্য করেছিলাম এখন বুঝছি তা আমার পক্ষে খুবই অন্যায় হয়েছে। আমি শুনে এসেছি, এখান থেকে ৬ মাইল রাস্তা নর্মদাতট দিয়ে হেঁটে গেলই আমরা রাজঘাট নামক স্থানে পৌছে যাব। অল্প রাস্তা শীতের প্রকোপও কিছুটা কমে এসেছে। কাজেই ভাবছি কাল সকালে উঠেই স্নান করে মন্দিরের মহাদেবকে পূজা করে যাত্রা করব। শুনেছি, এই মেঘনাদ তীর্থের পাশেই কোথাও রাবণ ও কুম্ভকর্ণ তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু ঠিক কোনখানটায় তা তো জানি না। এইখান থেকেই সেই দুটি তপস্থলীর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে যাব। এখন শুয়ে পড়া যাক।

আমরা সকলেই শুয়ে পড়লাম। এক ঘুমেই সকাল হল, ঘুম যখন ভাঙল তখন সকাল ৭টা বেজেছে। মন্দিরের দরজা খুলে আমরা বাইরে বেরিয়ে এসেই দেখি, কালকের সেই বাঞ্জারা জাতীয় লোকটি আর একটি বয়স্ক লোককে সঙ্গে নিয়ে বসে আছে। হরানন্দজী তাকে দেখেই খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। লোকটি তার ভাষায় খোড়িবোলী হিন্দী মিশিয়ে যা বলল, তাতে এইটুকু মাত্র বুঝলাম যে, কিছু দূরেই তাদের বস্তী। পরিক্রমার পথেই তাদের গ্রামের মধ্য দিয়েই আমাদেরকে যেতে হবে। তাই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তারা এসেছে। আমি সাথীদেরকে বললাম এই না হলে কি বাঞ্জারাদের উপর মা নর্মদার এত কৃপা হয়। আপনারা অমরকণ্টকে পৌছে মায়ের উদ্গম ক্ষেত্র যখন দেখবেন, তখন জানতে পারবেন যে এক বাঞ্জারা অধিনায়কের উপর কৃপা করেই মা নর্মদা প্রকট হয়েছিলেন। মায়ের সেই উদ্গম ক্ষেত্রেরই কাছেই কোটিতীর্থের ঘাটে বাঞ্জারা নায়কের একটি মন্দিরও আছে। এই উপজাতিদের লোকরা খুবই সৎ এবং ইমানদার হয়। আগে এরা যাযাবরই ছিল। ভেড়া গরু ঘোড়া ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের ধারে ধারে ঘুরে

বেড়াত। এই রকম ঘুরে বেড়াতে বেড়াতেই একদিন এদেরই একজন অমরকণ্টকের এক বাঁশবনের মধ্যে নর্মদার উৎসস্থান আবিষ্কার করে বসে। এদের কথা শুনে মনে হচ্ছে, এখন এরা কোথাও কোথাও বসতি স্থাপন করে বাস করছে। লোক দুটি বসে থাকল, আমরা নর্মদার ঘাটে নামলাম স্নান করতে। স্নান তর্পণাদি সেরে, আমরা মন্দিরে ঢুকে মেঘনাদ প্রতিষ্ঠিত প্রায় ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ অপূর্ব পিঙ্গলবর্ণের শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢালতে আরম্ভ করলাম। আমরা যখন ভক্তিভরে জল ঢেলে ঢেলে শিবলিঙ্গটিকে মার্জনা করছি, তখন দেখলাম সেই দুজন বাঞ্জারা দুটি বিল্বপত্রের ডাল দিয়ে গেল। আমরা সেই ডাল থেকে বিল্বপত্র নিয়ে মহাদেবের মাথায় মন্ত্রপাঠ করতে করতে দিতে লাগলাম। হরানন্দজীকে দেখলাম, সাশ্রুনেত্রে বেদীর ওপর মাথা ঠুকতে ঠুকতে স্তব পাঠ করতে লাগলেন –

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় সর্বজ্ঞায় শুভাত্মনে।
জগদানন্দকন্দায় পরমানন্দ হেতবে ॥
অরূপায় সরূপায় নানারূপ ধরায় চ।
বিরূপাক্ষায় বিধায় বিধিবিষ্ণুস্তুতায় চ ॥
স্থাবরায় নমস্তুভ্যং জঙ্গমায় নমোঽস্তুতে।
সর্বাত্মনে নমস্তুভ্যং নমস্তে পরমাত্মনে ॥
কালায় কালকালায় কালকূট বিষাদিনে।
ব্যালযজ্ঞোপবীতায় ব্যালভূষণ ধারিণে ॥
নমঃ শক্ত্যর্ধ দেহায় বিদেহায় সুদেহিনে।
সকৃৎ প্রণাম মাত্রেণ দেহিদেহানবারিণে ॥

অর্থাৎ শান্ত শুভাত্মা সর্বজ্ঞ শিবকে নমস্কার করি, জগদানন্দ পরমানন্দের হেতুভূত মহেশ্বরকে নমস্কার করি। হে প্রভো! রূপহীন অথচ স্বরূপ ও নানারূপধর! হে বিধি বিষ্ণুস্তুত! হে বিরূপাক্ষ! হে বিধে! আপনাকে নমস্কার। হে স্থাবর জঙ্গম রূপীন্! আপনাকে নমস্কার! হে সর্বাত্মন! হে পরমাত্মন! আপনাকে নমস্কার। আপনি কালস্বরূপ, আপনি কালেরও কাল, মহাকাল, হে কালকূট বিষ ভক্ষক! সর্প আপনার আভরণ, সর্পই আপনার যজ্ঞসূত্র। হে শক্ত্যর্ধশরীর! হে বিদেহ। হে সুদেহিন্! আপনাকে একমাত্র প্রণাম করলেই দেহধারণ রূপ ক্লেশ নিবারিত হয়।

মহর্ষি জৈগীষব্য কৃত এই সিদ্ধ স্তোত্র পাঠ করে হরানন্দজী ব্যাকুলভাবে কাঁদতে কাঁদতে মেঘনাদ পূজিত মহাদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

তিনি প্রণাম করে উঠতেই আমরা সকলেই ঝোলা গাঁঠরী বেঁধে নিয়েই মন্দিরের মণ্ডপ গৃহ হতে বাইরে বেরিয়ে এলাম। মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়েই সেই দুজন বাঞ্জারার সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম। নর্মদা গর্ভ হতে পাহাড়ের উপত্যকায় উঠে এসে হাঁটতে লাগলাম সোজা পূর্বদিকে। রাস্তা কঙ্করময় তবে চলার পথ আছে। ডানদিকে পাহাড় উঠে গেছে, উপর দিকে ঘন জঙ্গলে ভরা। আমরা বাঁ দিকে নর্মদার ধারার দিকে লক্ষ্য রেখে হাঁটতে লাগলাম। বেলা তখন ৯টা। জ্যোতির্ময়ানন্দ বললেন – এক ফাঁকে পাঁজি দেখে নিয়েছি আজ ফাল্গুন মাসের ১০ তারিখ, মঙ্গলবার, তিথি অমাবস্যা। মাইলখানিক হাঁটার পরে সেই বাঞ্জারা দুজনের গ্রামে এসে পৌঁছলাম। অজস্র কুটীর, গরু ভেড়া ছাগল অজস্র চরে বেড়াচ্ছে। আমি বাঞ্জারা দুজনকে জিজ্ঞাসা করলাম – এখানে কি কেবল বাঞ্জারারাই বাস করে? আমাদের বোধগম্য যাতে হয় সেজন্যই ভাঙা ভাঙা খোড়িবোলী হিন্দীতে অতিকষ্টে জবাব দিল – বাঞ্জারা জ্যাদা হ্যায় পঁচাশ ঘর ভীলকা ভী হ্যায়। হমলোগ মিলজুলকে বাস করতা হুঁ। হিঁয়াকা ভীল লোগোঁ নে আচ্ছাই হ্যায়।

আমি আবার প্রশ্ন করলাম – পাহাড় ঔর জঙ্গল ত বহোৎ নজদিগ্ হ্যায়। আপকো গাও ভৈস ভেড়াকো উপর, লেড়কা লেড়কীকা উপর কোঈ জানোয়ার কা হামলা নেহি হোতা হ্যায় ত। ইয়ে পাহাড় ঔর জঙ্গলমেঁ শের ভাল্লু বগেরা হ্যায় কি নেহি ?

– হ্যায় ত জরুর। হামলা ভি হোতা হৈ, লেকিন্ রেবা মায়ীকা ভরোসা মেঁ হম্ বাস করতা হুঁ।

আমি সাথীদেরকে বললাম – এই সাধারণ পাহাড়ী লোকেদের মা নর্মদার উপর কতখানি শরণাগতি দেখুন। এই শরণাগতি আমাদের থাকলে আমরা তরে যেতাম।

রাস্তার উপর অজস্র মেহরীন্ গাছ। ধূসরবর্ণের এই গাছ অমরকন্টকেও আমরা দেখে এসেছি। মেহরীণ গাছের তলায় তলায় ফাঁকে ফাঁকে বাঞ্জারাদের বাস। মেহরীন গাছের তলায় একটি কুটিরের কাছে গিয়ে আমাদের সঙ্গী দুজন বাঞ্জারা ডাকতে লাগল – সোয়ামীজী ! সোয়ামীজী ! ভিতর থেকে একজন মেয়েছেলের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম – বাবুজী ! থোড়া বৈঠিয়ে উনোনে আভি আতা হ্যায়। কুটীরের সামনে কয়েকটি বড় বড়, পাথর পড়েছিল। আমরা সেখানেই বসলাম। প্রথম থেকে হরানন্দজীর সঙ্গে মেঘনাদ তীর্থে ঢোকার পথে যার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, সে দ্রুত চলে গেল বস্তির দিকে। তার সঙ্গী বাঞ্জারা আমাদের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। হরানন্দজী তাকে 'সোয়ামীজী' কে – জিজ্ঞাসা করতে যে যা জানালো তা শুনে আমরা চমকে গেলাম। সে বলল – সোয়ামীজী একজন সন্ন্যাসী। সে একদল পরিক্রমাবাসী সন্ন্যাসীদের দলে ঢুকে অমরকন্টক থেকে পরিক্রমা করতে করতে এখানে এসে অতিসার রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। দিনে রাতে অজস্রবার 'টাট্টি' করতে করতে যখন সে মৃতপ্রায় হয়, তখন সন্ন্যাসীর দল তাকে এখানে ফেলে রেখে চলে যায়। এই লছু সর্দারই গাছগাছড়ার সাহায্যে তাকে সারিয়ে তুলে। তাও প্রায় ১০ বছর হয়ে গেল। লছু সর্দারের মেয়ের সেবা যত্নেই সে বেঁচে উঠেছে। পরে সে লছু সর্দারের মেয়েকেই বিয়ে করে আমাদের 'দামাদ' হয়ে আমাদের মতোই বাস করছে। তাদের একটি ছেলেও হয়েছে। কথা বলতে বলতেই লছু সর্দার তার কুটীর থেকে একটি মাটির কলসীতে করে ভেড়ার দুধ এনে তা পান করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। যতক্ষণ না আমরা রাজী হলাম, ততক্ষণ লছু সর্দার হরানন্দজীর পা ছাড়ল না। জড়িয়ে ধরে পড়ে রইল। অগত্যা আমরা দুধ পান করতে রাজী হলাম। লছু সর্দার প্রত্যেকের কমণ্ডলুর জল আধটা করে ফেলে দিয়ে তাতে এক পো বা দেড়পো করে ভেড়ার দুধ ঢেলে ভাল করে নেড়ে চেড়ে খেয়ে নিতে বলল। আমরা যখন দুধ পান করছি, তখন সেখানে ত্রিশূল হাতে করে একজন ৩৪/৩৫ বৎসরের একজন যুবক এসে উপস্থিত হন। পরনে গেরুয়া রং এর একটা কাপড়, তাকে নেকড়া বললেও হল। গায়ে একটা শতচ্ছিন্ন জামা, দু হাতের বাহুতে লাল নীল নানা রকমের পাথর এবং গলায় একটা রুদ্রাক্ষের মালা। সে এসেই আমাদেরকে 'নমো নারায়ণায়' বলে দণ্ডবৎ জানাল। বিশুদ্ধ হিন্দীতে বলল – কাল রাত মেঁ শ্বশুরাল আপকো বারে মেঁ মুঝে সব কুছ বাতায়া। হমলোগ ধন্য হৈ যো আপলোগোনে ইধর পধারেঁ। তার গলার শব্দ পেয়ে তার দুতিন বছরের একটা বাচ্চা বা-বা বলতে বলতে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়েই হাঁক দিল বাচ্চার মাকে। ভদ্রমহিলা 'সোয়ামীজীর' ডাক শুনে বাইরে আসতেই আমাদেরকে প্রণাম করতে বলল। সোয়ামীজী করজোড়ে 'নমো নারায়ণায়' বলতে বলায় মহিলা তাই উচ্চারণ করে নমস্কার করলেন। মহিলার দুপায়ে দুটো ভারী তাড়বালা দুটো কানই ফুটো করে দশটা তামার গোল গোল রিংএ ঢেকে আছে। হরানন্দজী দেশ কাঁহা থে জিজ্ঞাসা করতেই সোয়ামীজী উত্তর দিল – বিহারকা নওয়াদা জিলা মেঁ। আমি হরানন্দজীকে বললাম, দেখছেন ত, প্রেমের ফাঁদ পাতা আছে ভুবনে। কোথায় কে ধরা পড়ে কে জানে,

এই কথা কত সত্য ! প্রেম কোন জাত পাত মানে না । বিহারের লোক সুদূর মধ্যপ্রদেশে এসে এই বড়বাণী জেলার এক অখ্যাত মহল্লায় এসে কেমনভাবে ফাঁদে আটকে গেছে দেখুন । অনঙ্গেশ্বর মহাদেবের মন্দির ত আমরা দেখে এসেছি । অনঙ্গদেবের পুষ্পশর কখন যে কার উপর নিক্ষিপ্ত হয়ে তাকে জর্জরিত করে তুলবে তার কেউ হিসেব কষতে পারবে না । হরানন্দজী তাঁর কম্বলটি লছু সর্দারকে দিয়ে রঞ্জনকে বললেন, মেয়েটির হাতে দিতে বললেন । বাপ-বেটি দুজনেই কিছুতেই কম্বল বা টাকা কিছুতেই হাতে করতে চাইল না । কিন্তু আমাদের সকলের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তারা নিতে বাধ্য হল । ১০টা বাজতে যায় দেখে আমরা তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম । 'সোয়ামীজী' রাজঘাট পর্যন্ত আমাদেরকে এগিয়ে দিয়ে আসতে আগ্রহ প্রকাশ করতে আমরা সাগ্রহে তাতে সম্মত হলাম । 'দামাদ'কে সঙ্গে না নিলে লছু সর্দার আমাদের সঙ্গে যেত, তার চেয়ে দামাদই ভাল হল কারণ লছু সর্দারের ভাষা আমরা বুঝি না কিন্তু 'দামাদ সোয়ামীজী' বিশুদ্ধ হিন্দীতে কথা এখনও বলতে পারে । আমরা বাঞ্জরাদের কাছে বিদায় নিয়ে মা নর্মদার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে হাঁটতে লাগলাম । 'সোয়ামীজী' আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে । উত্তরতটের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখলাম এই দক্ষিণতটের চেয়ে উত্তরতটের পাহাড় ও জঙ্গলের আধিক্য বেশী । উত্তরতটের আমরা উজ্জ্বল রৌদ্র কিরণে দেখতে পাচ্ছি একটি জলধারা বয়ে একটা পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে এসে মিলিত হয়েছে নর্মদার সঙ্গে । সেই জলধারার কাছেই একটা বড় শিবমন্দির দেখা যাচ্ছে । 'সোয়ামীজী'কে হরানন্দজী ঐ স্থানের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই সে পরিচয় দিল – উহ্ হ্যায় বাগলী নদী । নর্মদা কা সাথ সংগম হুয়া । উহাঁ বিশ্রবা ইয়া পৌলস্ত্য তপ করকে মহাদেওজীকো প্রসন্ন কিয়া থা । বিশ্রবা কা পুত্র কুণ্ড নামক দানব নে কুণ্ডেশ্বর মহাদেওকী মন্দির প্রতিষ্ঠা করকে বহুৎ তপ কিয়া । উত্তরতট কী শূলপাণী ঝাড়ি উঁহাসে হী আরম্ভ হোতি হৈ ।

প্রেমানন্দ মহানন্দস্বামীকে অনুরোধ করলেন – আপনি আমাদেরকে বিশ্রবার কথা শোনাতে থাকুন । এখনও দেখছি পাহাড় ও জঙ্গল চারদিকে । পাহাড়ের উপর দেখছি কেবল মেহরীন আর বাবলা গাছের ভীড় । নুড়ি, পাথর আর কাঁটা সামলে সাবধানে হাঁটতে থাকুন গল্প করতে করতে । মহানন্দস্বামী বিশ্রবা সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করলেন – মহর্ষি পুলস্ত্যের ঔরষে এবং রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা হরির্ভূর গর্ভে বিশ্রবার জন্ম হয় । ইনি পুলস্ত্যের পুত্র বলে পৌলস্ত্য নামেই সমধিক পরিচিত । বেদপাঠ শ্রবণ কালে এঁর জন্ম হয় বলে ইনি বিশ্রবা নাম পান । বিশ্রবা তাঁর পিতার মতই তপোনিরত ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন । মহামুনি ভরদ্বাজের কন্যা দেববর্ণিনীর সঙ্গে এঁর বিবাহ হয় । এই বিবাহের ফলে বৈশ্রবণ বা কুবের জন্মগ্রহণ করেন । কিছুকাল পরে রাক্ষস সুমালীর রূপবতী কন্যা কৈকসী বা নিকষা কুবেরের মত পুত্রলাভের আশায় বিশ্রবাকে পতিত্বে বরণ করেন । প্রদোষকালে কামে জর্জরিত হয়ে বিশ্রবার সঙ্গে মিলিতা হওয়ার ফলে কৈকসীর (নিকষার) গর্ভে রাবণ কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ নামে তিনপুত্র এবং সূর্পনখা নাম্নী এক কন্যার জন্ম হয় । রামায়ণে ওঁদের সকলেরই চরিত্র বাল্মীকি মুনি বর্ণনা করেছেন ।

কথিত আছে, রাকা নামে এক রাক্ষসীর গর্ভে বিশ্রবার খর নামে এক পুত্র জন্মলাভ করে । বিশ্রবার আদেশে কুবের ত্রিকূট পবর্তের উপর বিশ্বকর্মা নির্মিত স্বর্ণলঙ্কাতে অধিষ্ঠিত হন । কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রহ্মার বরে বলদৃপ্ত রাবণ লঙ্কার সুবর্ণপুরী অধিকার করতে চাইলে বিশ্রবা কুবেরকে কৈলাসে গিয়ে বাস করতে আদেশ করেন ।

লিঙ্গপুরাণ ও কূর্মপুরাণ মতে বিশ্রবার চার স্ত্রী, প্রথমা স্ত্রী বৃহস্পতির কন্যা । দেববর্ণিনী হতে কুবের, দ্বিতীয়া স্ত্রী মাল্যবান রাক্ষসের কন্যা বলাকা হতে ত্রিশিরা, দূষণ ও বিদ্যুজ্জিহ্ব নামে তিন পুত্র ও মালিকা নামে এক কন্যা, তৃতীয়া স্ত্রী মাল্যবান রাক্ষসের কন্যা পুষ্পোৎকটা

হতে মহোদর, মহাপার্শ্ব ও খর নামক তিন পুত্র এবং কুম্ভনসী নামে এক কন্যা এবং চতুর্থ স্ত্রী কৈকসী বা নিকষার গর্ভে যে রাবণ কুম্ভকর্ণাদি জন্মেছিল সে কথা আগেই বলেছি।

আমি এই সময় বলে উঠলাম, থাক্ থাক্ এক ঘেঁয়ে পুরাণ প্রসঙ্গ বন্ধ করুন। বিশ্রবা বিষয়ে ত মোটামুটি সব কথাই জানা হয়ে গেল। আমার কথায় মহানন্দস্বামী ঈষৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন – কেন বলুন ত পুরাণের কথায় আপনি এত তেঁতে উঠেন কেন ? পুরাণ ছাড়া অতীত যুগের ইতিহাস জানা যাবে কি করে ?

– ইতিহাস না বলে বলুন বিকৃত ইতিহাস। আপনি নর্মদাতটে হেঁটে আসতে আসতে যে সব পৌরাণিক ইতিবৃত্ত শোনাচ্ছেন, তার মধ্যে কত যে পরস্পর বিরোধী কথা আছে তার ইয়ত্তা নেই। এইমাত্র যে বিশ্রবার কাহিনী শোনালেন, তাতে একবার বললেন, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে মহামুনি ভরদ্বাজের কন্যা দেববর্ণিনীর গর্ভে বিশ্রবার ঔরষে বৈশ্রবণ অর্থাৎ কুবেরের জন্ম হয়। আবার আপনারই শ্রীমুখ থেকে জানতে পারলাম, দেববর্ণিনী ভরদ্বাজের কন্যা নয়, লিঙ্গপুরাণ ও কূর্মপুরাণ মতে দেববর্ণিনী বৃহস্পতির কন্যা, কুবেরের জননী। আপনি একবার বললেন, রাকা নামে এক রাক্ষসীর গর্ভে খর জন্মগ্রহণ করেছিল। আবার পরক্ষণেই লিঙ্গপুরাণ ও কূর্মপুরাণের কাহিনী মতে মাল্যবান রাক্ষসের কন্যা পুষ্পোৎকটাকে খরের জননী বলে অভিহিত করলেন। আপনার পুরাণ কাহিনী থেকেই জানা গেল যে পূর্বকালে তপঃসাধ্যায় নিরত মুনি ঋষিদের সংযোগের কোন বালাই ছিল না। ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণের মতে বিশ্রবার তিন পত্নী দেববর্ণিনী এবং কৈকসী অর্থাৎ নিকষা এবং রাকা। পর মুহূর্তেই জানালেন – বিশ্রবার ৪জন ধর্মপত্নী (১) দেববর্ণিনী (২) মালবান রাক্ষসের কন্যা বলাকা (৩) ঐ মাল্যবান রাক্ষসের আর এক কন্যা পুষ্পোৎকটা (৪) কৈকসী। আরও অভিনব তত্ত্বের সন্ধান পেলাম, পূর্বকালে ঋষিরা যদৃচ্ছা বহুবিবাহ করতে পারতেন এবং মেয়েরাও স্বেচ্ছাবৃত হতে পারতেন অর্থাৎ সমাজের কোন দৃঢ়বদ্ধ ও সুসংবদ্ধ শাসন বা বিধিনিয়ম ছিল না। আপনার মান্য পুরাণকারদের বর্ণনা হতে তাঁদের আর একটি মনোবৃত্তি ধরা পড়ছে, তাঁরা সুকৌশলে জানিয়ে দিচ্ছেন যে রাকা, বলাকা এবং কৈকসী প্রভৃতি রাক্ষস কন্যারা প্রদোষকালে কামজর্জর চিত্তে গিয়ে বিশ্রবার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল বলেই যেন তাদের খর, ত্রিশিরা, দূষণ, বিদ্যুজ্জিহ্ব, রাবণ কুম্ভকর্ণাদি দুরন্ত রাক্ষসপুত্র জন্মেছিল, আর তপোনিরত ধর্মপরায়ণ ঋষিবর যে প্রদোষকালে তপজপাদি সান্ধ্যক্রিয়া বাদ দিয়ে উৎকট কাম লালসায় মেতে উঠেছিলেন তাতে তাঁর কোন দোষই হয় নি।

পুরাণকারদের এই রকম মনোভাব ও পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা থেকে একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন ঐ সব পুরাণ বেদব্যাস প্রণীত ত নয়ই কোন ঋষি প্রণীত শাস্ত্রও নয়, এমনকি কোন একজন ব্যক্তি দ্বারাও লিখিত হয় নি।

এর আগে হিরণফাল হতে আসার সময় দুর্বাসা চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে আপনি শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেছিলেন বেদব্যাস নাকি বর্ণনা করেছেন শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র ধর্মপত্নী ছিলেন, তাঁর মধ্যে দুর্বাশার বরে রুক্মিণী ছিলেন সর্বোত্তমা। কি রকম অবাস্তব মিথ্যা কথা ভেবে দেখুন। পূর্বযুগে বহু বিবাহ ছিল ধরে নিলেও একজন লোকের ষোল হাজার বৌএর মন জুগিয়ে চলা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। কৃষ্ণেরও ষোল হাজার বৌ ছিল না। কেউ হয়ত অন্যান্য হাজার শ্লোকের মত ঐ শ্লোকও নিজে লিখে ব্যাসের নামে চালিয়ে দিয়েছে। মহাভারতে লক্ষাধিক শ্লোক নাই। আমি নিজে একবার সহাধ্যায়ীদের সঙ্গে গুণে দেখেছি, সংযোজিত ও বিবর্ধিত আকারে বর্তমানে প্রচলিত মহাভারতে শ্লোক সংখ্যা ৯৫৪২৬টি, এই বিপুলায়তন মহাভারতের রচয়িতা যে বেদব্যাস নন প্রচলিত মহাভারতের যে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ যে প্রক্ষিপ্ত তার প্রমাণ মহাভারতেই আছে। আদিপর্বের ১ম অধ্যায়েই আছে –

উপাখ্যানৈঃ সহ জ্ঞেয়মাদ্যং ভারতমুত্তমম্ ।
চতুর্বিংশতিং সাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম ॥ ১০

অর্থাৎ ব্যাসদেব উপাখ্যান ভাগ ত্যাগ করে ২৪০০০ শ্লোক দ্বারা ভারত সংহিতা রচনা করেছিলেন। পণ্ডিতরা সেই ২৪০০০ শ্লোককেই মূল মহাভারত বলে মনে করে থাকেন।*

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু গবেষক পণ্ডিত এ বিষয়ে একমত যে বেদব্যাসের মহাভারত এত বড় ছিল না। পরিক্রমার শেষে কাশীতে ফিরে গিয়ে আপনি এই বইগুলি পড়লে জানতে পারবেন –

(1) Max Muller — History of Ancient Sanskrit Literature.
(2) R. C. Majumdar — Ancient Indian History.
(3) Winternitz — A History of Indian Literature.
(4) Macdonell — Sanskrit Literature
(5) চিন্তামণি বিনায়ক বৈদ্য — মহাভারত-মীমাংসা।

ঐ সব গ্রন্থ ছাড়াও শ্রীবৈদ্য 'মহাভারতকা উপসংহার' নামে মারাঠী ভাষায় এবং The Mahabharat : A criticism নামক ইংরাজী গ্রন্থে মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশ নিয়ে বহু গবেষণা করেছেন। পণ্ডিত শ্রী মাধব রাও সপ্রে বৈদ্যজীর গ্রন্থের 'ভারত-মীমাংসা' নাম দিয়ে একটি হিন্দী সংস্করণও বের করেছেন। শ্রী বৈদ্যজী লিখেছেন – ব্যাসজীকে মূলগ্রন্থ ঔর বৈশম্পায়ণকে ভারত মেঁ বহুৎ অন্তর ন হোগা। পরন্তু ভারতমেঁ ২৪০০০ শ্লোক থে ঔর মহাভারত মেঁ লাখ শ্লোক হো গয়া হৈ। তব হমে মাননা পড়তে হৈ কি য়হ্ অধিক সংখ্যা সৌতি কী জোড়ী হুই হৈ।'

মহাভারতের আদিপর্বের প্রথম অধ্যায় ধৃতরাষ্ট্রোক্ত 'যদাশ্রোষং' পদযুক্ত যে ৬৭টি শ্লোক আছে এবং মহাভারতের আরও বহু প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ১৬০০০ পত্নী, হস্তিনাপুরে শ্রীকৃষ্ণের বিরাট রূপ প্রদর্শন প্রভৃতি অলৌকিক ও অবাস্তব বহু আখ্যায়িকাকে শ্রীবৈদ্য সৌতির দ্বারা সংযোজিত বলে মনে করেন। ঐ গুলি কোনমতেই ব্যাস লেখেন নি। শ্রীবৈদ্য তাঁর 'মহাভারত-মীমাংসাতে' বেশ স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, বৈদিক যুগে মূর্তিপূজা ছিল না। আর্য অনার্য সংমিশ্রণে যে আচার পদ্ধতি দেখা দিয়েছিল তারই ফলে হিন্দু সামাজের এক অংশে মূর্তিপূজা দুর্গার স্তব প্রভৃতি অবৈদিক প্রসঙ্গও মতলববাজ পণ্ডিতরা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত করে দিয়েছিলেন। মহাভারতে বৌদ্ধস্তূপ পূজারও নিষেধ আছে। এতেই কি প্রমাণ হয় না যে – বৌদ্ধ যুগে যখন বুদ্ধের মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়েছিল, তখনই হিন্দু পণ্ডিতগণ হিন্দুদেরকে বৌদ্ধ প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য বৌদ্ধ স্তূপ পূজার নিষেধ বাক্য মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত করে দিয়েছিলেন ?

পাহাড়ী পথে হাঁটতে হাঁটতে আমরা এইসব আলোচনা করছিলাম। হঠাৎ একটি পাথরে ঠোক্কর খেলেন মহানন্দস্বামী আমি তাঁর পাশেই ছিলাম, তাঁর হাতটা ধরে ফেললাম। আছাড় খেতে দিলাম না। তিনি কোনমতেই সামলে উঠতেই আমি হাত ধরা অবস্থাতেই বললাম – আমি আপনার ভাইএর মত। আমার কোন অপরাধ নিবেন না। এইসব কথায় আমার যদি কোন প্রগলভতা হয়ে থাকে ক্ষমা করবেন। এইসব কথা বললাম বলে অমরকণ্টক পর্যন্ত যাওয়ার পথে যদি কোন পুরাণ প্রসিদ্ধ স্থান পড়ে, তা বর্ণনা করার সময় 'খামুস' হয়ে যাবেন না। মহাভারতের তিন-চতুর্থাংশ আপনার মুখস্থ আছে। এ কি কম কথা! আপনার মত পুরাণ বিশারদ, স্মৃতিশক্তিধর আমাদের সঙ্গে আছেন, এ ত আমাদের সৌভাগ্য। কে বিশ্বাস করল কি, করল না। তা আপনার দেখার দরকার নাই।

লেখক প্রণীত 'আলোক-বন্দনা গ্রন্থের পৃঃ ৬৬-৬৯ দ্রষ্টব্য।

আমাদের দুজনের কথা শেষ হতে না হতেই সেই বাঞ্জারার দামাদ 'সোয়ামীজী' বলে উঠল – ইয়ে হ্যায় রাজঘাট। সামনে মে যো পাহাড় দেখাই দেতা হৈ, উহ হ্যায় বাবলা গজা। পাহাড়াকা উপর জৈন লোগোঁকা আখড়া হৈ। ব্যস, ইধরই শূলপাণীকি ভীষণ ঝাড়ি খতম হো চুকা।

সোয়ামীজীর মুখ দিয়ে এ কথা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হরানন্দজী উর্দ্ধবাহু হয়ে আনন্দে তৎক্ষণাৎ নৃত্য করতে শুরু করে দিলেন। তিনি বলতে লাগলেন – জয় মা নর্মদা, জয় মা নর্মদা! তোমার দয়ায় এতদিনে কোনমতে যমের দক্ষিণ দুয়ার থেকে ফিরে এলাম। কাশীখণ্ডে পড়েছি, মোক্ষপুরী কাশীতে বাস করে কেউ যদি পাপানুষ্ঠান করে, তাহলে তাদেরকে ভৈরব যাতনা ভোগ করতে হয়। শূলপাণীশ্বর তীর্থ মোক্ষধাম। এখানে পরিক্রমাকালে জ্ঞানতঃ কোন অপরাধ না করলেও শূলপাণীশ্বরের ভৈরব আমাদেরকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা দিয়েছেন। আমাদের ৯ জন যাত্রীকে গ্রাস করেছেন। সব সময় মৃত্যুকে শিয়রে রেখে হেঁটেছি। সেই শূলপাণির ঝাড়ি অতিক্রম করে এলাম মানে নবজন্ম লাভ করলাম। এই ভয়ঙ্কর ঝাড়ির কথা আমার অন্ততঃ আমৃত্যু মনে থাকবে। নর্মদার ধারার দিকে থাকিয়ে খুব করুণ কণ্ঠে করজোড়ে বলতে লাগলেন – মা গো! তুমি এই আর্শীবাদ কর, আর যেন এ জন্মে ত বটেই অন্যান্য জন্মেও যেন এই ভয়ঙ্কর বিকট প্রাণঘাতী ঝাড়িতে প্রবেশ করতে না হয়।

হরানন্দজীর আবেগ উচ্ছ্বাস কথঞ্চিৎ প্রশমিত হতেই সোয়ামীজী আমাদেরকে বলল – আভি এক বাজ গিয়া হোঙ্গে। আভি হম লোটেঙ্গে। ঔর দো চার কথা শুন লিজিয়ে। ইয়ে যো রাজঘাট হ্যায় ইধর রোহিণী তীর্থ হ্যায়। বড়বাণী রাজ্যকা অন্তর্গত হ্যায়। বড়বাণী শহর হ্যায়। ইধর নর্মদামায়ীকা পাক্কা ঘাট সে বড়বাণী শহর তক আপকো সিরিফ তিন মীল চলনে হোগা। বড়বাণী নগর করীব ৪০০ বর্ষ পুরাণা হৈ। বড়বাণীকা রাজাসাহেব শহরমেঁই নিবাস করতা হৈ। বড়বাণীমেঁ মহল ধর্মশালা, বাগীচা, অস্পতাল, ডাকঘর, হাইস্কুল, অন্য পাঠশালা ভী হ্যায়। উধর বারোঠো মন্দির হৈ, যিন মেঁ শ্রীগণপতিজী শ্রীবাণী বিনায়ক, কালিকা মাতা, অগস্ত্য মুনি ঔর শ্রীতুলসীদাসজীকা মন্দির মুখ্য হৈ। য়হাঁ কী চম্পা বাবড়ী প্রসিদ্ধ হৈ। রাজঘাটকো বাবণ গঙ্গা ভী কহতে হৈ।

উসপার দেখিয়ে। নর্মদাজীকে উত্তরতট পর জো দো মন্দির দেখাই দেতা হৈ উনকা নাম (১) নীলকণ্ঠেশ্বর (২) হরিহরেশ্বর। উস্ স্থান কা নাম হৈ – চিখলদা। উহাঁ সপ্তর্ষি বিশ্বামিত্র, জামদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম অত্রি বশিষ্ঠ ঔর কশ্যপ নে তপ করকে আত্মসিদ্ধি প্রাপ্ত কী থী। উধর উহ সপ্ত ঋষিয়ো নেঁ অগ্নীশ্বর মহাদেও কো স্থাপনা কী থী। নমো নারায়ণায়! নমো নারায়ণায়!

এই বলে সোয়ামীজী মেঘনাদ তীর্থে ফিরে যাবার উপক্রম করতেই প্রেমানন্দ তাঁর এক পুরানো পুরা হাতা সোয়েটার এবং পাঁচটা টাকা তার হাতে দিলেন। আমরা সকলে মিলে তাকে অনেক ধন্যবাদ জানালাম। সে হৃষ্ট চিত্তে ফিরে গেল। আমাদের দুর্গম স্থানের বন্ধুর হাঁটার দিকে লক্ষ্য রেখে আমি বলতে থাকলাম, 'তাহলে সারকথা এই দাঁড়াল যে ভারোচ থেকে দক্ষিণতট পরিক্রমাকালে পিপরিয়া নামক গ্রামে পিপ্পলাদ আশ্রমে এসে আমরা শূলপাণীশ্বরের ঝাড়িতে প্রবেশ করেছিলাম। দক্ষিণতটের এই বড়বাণী রাজ্যের অন্তর্গত রাজঘাটে এসে শূলপাণীর ঝাড়ি শেষ হল। যাঁরা অমরকণ্টক হতে দক্ষিণতট দিয়ে পরিক্রমা করেন, তাঁদেরকে তাহলে এখানে এসে শূলপাণির ঝাড়িতে প্রবেশ করতে হয় এবং বহুদূরে গিয়ে তাঁরা শূলপাণীশ্বর মহাদেবের দর্শন পাবেন। আমরা কিন্তু ভারোচ থেকে আসার পথে পিপরিয়া গ্রাম থেকে মাত্র ১২ মাইল এসেই শূলপাণীশ্বরের দর্শন পেয়েছিলাম। সোয়ামীজী দ্রুতপদে হেঁটে আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। আমরা এখন এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি আসুন। তারপর নর্মদাতটে গিয়ে নর্মদা স্পর্শ করে রাত্রিবাসের স্থান অনুসন্ধান করবো।' ঝোলা গাঁঠরী ইত্যাদি রেখে আমরা সকলে বিশ্রাম করতে বসলাম।